মহাভারতের
ছয় প্রবীণ
নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

মহাভারতের ছয় প্রবীণ

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০০২
প্রকাশক: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
প্রচ্ছদ: সমীর সরকার

শত সাংসারিক অনটনের মধ্যেও কৈশোর-যৌবনের অবুঝ
হৃদয়হীন তাড়নায় যাঁর স্বেচ্ছোন্মুক্ত টিনের বাক্স থেকে
আমি মাঝে-মাঝে একটি-দুটি টাকা চুরি করেছি এবং যাঁর
দুরন্ত দার্শনিক প্রশ্রয়ে কৈশোর-মাতৃহীন এই
পান্থজীবনে আমার বৃদ্ধি ঘটেছে, আমার পরম প্রিয়
সেই মেজদাদার ভাগবত জীবন আরও দীর্ঘ-দীর্ঘতর হোক।

শ্রীঅজিতকুমার ভাদুড়ীর করকমলে এই গ্রন্থার্ঘ্য
নিবেদিত হল।

ছোটবেলায় সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীতেই আমার পিতাঠাকুর স্যামুয়েল স্মাইলস-এর ‘ক্যারেকটার’ নামক গ্রন্থটি পড়াতে আরম্ভ করেন। এখন বুঝি পড়ানো ছাড়াও তাঁর আর একটি উদ্দেশ্য ছিল—পুত্র এবং ছাত্রের চরিত্র-গঠন। স্মাইলস-এর এই গ্রন্থটিতে চরিত্র-তৈরির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞানের জগতের বহুতর মহান মনীষীদের জীবন এবং তাঁদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথাও উদাহরণ হিসেবে এসেছে। সেই বয়সে ইংরেজি বই পড়ার আনন্দ ছাড়া আমার চরিত্র-গঠনে এই গ্রন্থের অন্য কোনও উপকারিতা আমার অনুভূত হয়নি। আমার ধারণা—ভারতবর্ষের মানুষের ক্ষেত্রে চরিত্র-গঠনের রীতি-নীতি একেবারেই আলাদা। যেমন ধরুন—উপরিউক্ত গ্রন্থে বেন জনসন থেকে নিউটন, চসার থেকে শেলী—সবারই জীবনোদাহরণ আছে, কিন্তু ওদেশের মহাকাব্যের যে-সব বীর-চরিত্র আছে, অথবা যে-সব দেব-চরিত্র আছে, তার একটিও আদর্শ হিসেবে আসেনি। অথচ ভারতবর্ষে দেখুন—কেউ এখানে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র কিংবা মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বোস হতে বলে না; অন্তত আমাদের সময়েও বলত না। হয়তো বা আমরাও পুরোনো দিনের লোক, তাই কেরিয়ারের ক্ষেত্রে বড় বড় আদর্শ উচ্চারণ করার থেকেও আমাদের পিতা-মাতারা গার্হস্থ জীবনের ভ্যালুগুলির দিকে বেশি নজর দিতেন। ফলে আমাদের কাছে রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম, জ্যেষ্ঠের কারণে ভরত এবং লক্ষ্মণের আত্মত্যাগ—এই সবই আমাদের কাছে আদর্শ হিসেবে এসেছে।

আশ্চর্যের কথা, রামায়ণ মহাকাব্যের রাম-সীতা, লক্ষ্মণ-ভরতের কথা আমাদের কাছে আদর্শ হিসেবে এলেও মহাভারতের কোনও শুদ্ধ অথবা বৃদ্ধ চরিত্র কখনও আমাদের কাছে আদর্শের বালাই নিয়ে আসেন না। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃষ্ণা, কুন্তী, এমনকী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও কারও উচ্চারণে আদর্শ হিসেবে আসেননি। আর কৃষ্ণ তো ননই, কারণ স্বয়ং পুরাণ-বক্তা শুকদেব একেবারে সহুংকারে সকলকে বারণ করে দিয়ে বলেছেন—কৃষ্ণের আদর্শ যেন মনে-মনেও কেউ অনুসরণ কোরো না, তাতে নিজের বিপদ বাড়বে—নৈতদ্ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।

মহাভারতের চরিত্রগুলি যে ভারতের গার্হস্থ জীবনে আদর্শ হিসেবে এল না, তার একটা বড় কারণও আছে। সবচেয়ে বড় কথা, মহাভারতের প্রত্যেকটি চরিত্র বড় জটিল। তার ওপরে প্রত্যেকটি মুখ্যচরিত্রের মধ্যে ধর্ম এবং ধর্মসংকট একত্র মিশে থাকায় সেই জটিলতা আরও বেড়েছে। চরিত্রগুলি যখন চিরাচরিত ধর্মের অনুশাসনের মধ্য দিয়ে নিজের জীবনচর্যা চালাতে থাকে তখন কোনও সমস্যা নেই, চরিত্রগুলিও তখন আপন আন্তর শক্তিতে অধিকতর দীপ্তিমান হয়ে ওঠে। কিন্তু যে মুহূর্তে মহাভারতের মুখ্য চরিত্রগুলির সামনে প্রতিকূল সংকট উপস্থিত হয় এবং সেই সংকটের সমাধান ঘটতে থাকে সাধারণের অনভ্যস্ত পথে, তখনই মহাভারতের মুখ্য চরিত্রগুলি অননুকরণীয় পদ্ধতিতে কঠিন এবং জটিল হয়ে ওঠে। সাধারণ পাঠক তখন স্বভাবসিদ্ধ দুর্বলতায় চরিত্রগুলির বিভিন্ন দিক নিয়ে সংশয়িত হতে থাকেন। হয়তো এই সংশয়ের ফলেই মহাভারতের কোনও চরিত্র কখনোই আদর্শ হিসেবে আমাদের গার্হস্থ জীবন। প্রাণিত করেনি।

সাধারণ মানুষ, মধ্যবুদ্ধিজীবী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, এমনকী অনেক বিদ্বজ্জনের মুখেও আমি মহাভারতের বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন শুনেছি। শুনেছি এমন বিপরীত মন্তব্যও—যা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, মহাভারত অনেক পড়া থাকলেও এই গ্রন্থের বিশালতা সম্পর্কে তাঁদের বোধ সম্পূর্ণ হয়নি। এমন নয় যে, সব কিছুই আমরা ‘জাস্টিফাই’ করতে চাই। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে, মহাভারতের তাৎক্ষণিক মুহূর্তগুলি দিয়ে মহাভারতের মুখ্য চরিত্রগুলির বিচার করলে চলবে না। আসলে মহাভারতের চরিত্রগুলির সঙ্গে তৎকালীন সমাজের ধর্ম, দর্শন, মানবিকতা, ক্ষত্রিয়ধর্ম, রাজধর্ম এমনভাবে মিশে গেছে

যে, সেখানে একটি কি দুটিমাত্র ঘটনার নিরিখে চরিত্রগুলির সাময়িক বিচার করাটাও নিতান্ত বাতুলতা। কৌরবসভায় দ্রৌপদীর অপমানের আগে যুধিষ্ঠির যে তাঁকে পণ রেখেছিলেন, তার জন্য যুধিষ্ঠিরকে যেমন এইকালেও বহুল তিরস্কার সইতে হয়, তেমনই সেকালেও তিনি কম কথা শোনেননি। একইভাবে সেই অপমান-সভাতে কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মের কাছে নিজের চরম অপমানের জন্য বিচার চেয়েছিলেন দ্রৌপদী। ভীষ্ম তাঁর যুক্তি দিয়ে যথাসম্ভব দ্রৌপদীর প্রশ্ন বিচার করা সত্ত্বেও তাঁকে সুরক্ষা দিতে পারেননি। এর জন্য সেকালেও ভীষ্মকে কথা শুনতে হয়েছে, একালেও তাঁকে শুনতে হয়।

ঠিক এইখানেই আমাদের মতো মহাভারত-ব্যসনীর কিছু বক্তব্য আছে। আসলে মহাভারতের চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য বিচার করতে গেলে প্রথমেই বোঝা দরকার যে, এখানে বেশির ভাগ প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে এক ধরনের মহাকাব্যিক শক্তি কাজ করে। এ-শক্তি খুব সাধারণ শক্তি নয়; এ-শক্তি ভারতীয় সমাজের ধর্ম, দর্শন এবং নীতির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে এক-একটি চরিত্রকে এক পরম ব্যাপ্ত প্রতীকে পরিণত করেছে। অন্যদিকে অত্যন্ত বিপ্রতীপভাবে যেখানে ধর্ম নেই, নীতি নেই, সেই অন্যায়-অনীতিও এক-একটি চরিত্রের মধ্যে এমন মহাকাব্যিক বিশালতায় উদাহৃত যে, তার গতি এবং শক্তিও কিছু কম নয়। ঠিক এইখানেই মহাভারতের সার্বিক ভাবনার প্রশ্ন আসে।

আমি জানি, যিনি সমালোচক হন, যুক্তি-তর্কের সিদ্ধি তাঁর আপন করায়ত্ত থাকায় নিন্দাবাদের গণতান্ত্রিক অধিকার তিনি প্রয়োগ করতেই পারেন, বিশেষত প্রশংসা করাটা তাঁর বাধ্যবাধকতাও নয়। কিন্তু এখানে দেখার আছে এইটুকুই যে, নিন্দা যিনি করবেন, তাঁর শক্তি, বুদ্ধি এবং অনুশীলন কতটা আছে। তর্ক-যুক্তি তো সাজানোই যায়, আর প্রধানত যাঁরা পূর্বাহ্নেই অন্য কোনও বিষয় এবং ভাবনার দ্বারা ভাবিত এবং অভিভূত থাকেন, তাঁদের তর্ক-যুক্তিও সেই পূর্বভাবিত বিষয়ের পথেই চালিত হয়। ফলে এঁরা যখন বিচার করেন, তখন মহাভারতের বিশাল সমুদ্র থেকে এক খামচা জল তুলে এনে এক-একটি বিরাট চরিত্রের উদ্দেশে তিলাঞ্জলি রচনা করেন। মনে রাখতে হবে, মহাভারতের প্রত্যেকটি চরিত্রের একটা 'ফোক্যাল পয়েন্ট' আছে। যেমন ভীষ্মের চরিত্র চিন্তা করতে গেলে ভরত বংশের সমগ্র উত্তরাধিকারীদের জন্য তাঁর উদার আত্মত্যাগই যেমন প্রণিধানযোগ্য হয়ে ওঠা উচিত, তেমনই ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্র-বিবেচনায় তাঁর স্নেহানুবন্ধী সংকীর্ণতার সঙ্গে তাঁর অন্তর্গত দ্বিধাদীর্ণ সম্ভাবনাগুলিও উল্লেখ্য হওয়া উচিত।

মহাভারতের চরিত্র-ভাবনায় আরও একটা দিক আমাদের চোখে পড়েছে। দেখেছি—এমনও কেউ কেউ আছেন যাঁরা বহুচর্চিত খলনায়কদের জীবন সম্বন্ধে অনুকম্পাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এমন দেখেছি যাঁরা ব্যাস-ভীষ্ম-বিদুরের মতো উদার-বিশাল ব্যক্তির ওপর কলঙ্কের ভার ন্যস্ত করে দুর্যোধন-কর্ণের গরিমায় মুগ্ধ হয়ে পড়ে। মুগ্ধ হওয়ার কারণ যে একেবারে নেই, তা আমরা মনে করি না। কেননা মহাকাব্যের খল-নায়কের চরিত্রেও এমন কিছু গরিমা, এমন কিছু দৃঢ়তা এবং এমন কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকে, যা সাধারণ খল-নায়কের থেকে তাঁকে বীরোচিত এককে পরিণত করে। রামায়ণের রাবণ অথবা মহাভারতের দুর্যোধন এই ধরনের একক। এঁদের দৃঢ়তা, এঁদের অহঙ্কার এবং জীবনের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত এঁদের হার না-মানা স্বভাবটুকু এমনভাবেই মহাকাব্যের কবির প্রসাদ লাভ করে যে, ভবিষ্যতের মহাকবিরা তাঁদের কবিজনোচিত বেদনা মাখিয়ে সেই চরিত্রগুলিকে রীতিমত করুণরসের আধার করে তোলেন। মাইকেল মধুসূদন রাবণকে তাই করেছেন, রবীন্দ্রনাথ দুর্যোধন-কর্ণকে তাই করেছেন—আমরা এই চরিত্রগুলির প্রতি মমতাকুল হয়ে পড়ি।

কিন্তু কবিপ্রতিভার এই নবনবোন্মেষশালিতায় যদি প্রাবন্ধিকের হৃদয় দীর্ণ হয়ে ওঠে এবং তিনি যদি অতঃপর মূল মহাভারত পড়ে, বা না পড়ে স্বকীয় প্রতিভা বিকীর্ণ করে মহাকাব্যের

খলচরিত্রকে মহান প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেন, তাহলে বিপদ বাড়ে। আজিকালি এই ধরনের কিছু অল্পপ্রাণ প্রাবন্ধিকের দেখা মেলে, যাঁরা অত্যল্প পড়াশুনো করে এবং তার থেকেও কম বুঝে চিরন্তন বিশ্বস্ত কল্পগুলিকে অস্বীকার করার মধ্যে এক ধরনের চটকদারি খুঁজে পান। এঁরা ভীষ্ম-দ্রোণ-বিদুরের মতো বিরাট চরিত্রকে আপন সংকীর্ণ মানসিকতায় বিবৃত করে দুর্যোধন-কর্ণের অশোধ্য দোষগুলিকেও গুণপক্ষে আধান করেন। এঁদের বোঝানো যায় না যে, সমালোচক-প্রাবন্ধিক মাইকেল-রবীন্দ্রনাথ নন, কবিজনের স্বাধীনতা তাঁর প্রাপ্য নয়। তাঁকে যদি মহাভারতের চরিত্র সমালোচনা করতে হয় তবে মহাভারতের কবির প্রসারিত হৃদয়ের অনুবর্তী হয়েই তা করতে হবে। ভারতবর্ষের মনন, দর্শন এবং ভাবনা দিয়ে তিনি যে চরিত্র-সৃষ্টি করেছেন, তাকে উপস্কার-পরিষ্কারের মাধ্যমে ভাঙা-গড়া করা যায়, কিন্তু সে-চরিত্রের মূল আলোকপাতটুকু অতিক্রম করা যায় না, করা উচিত নয়।

করা যে উচিত নয় তার কারণও আছে। কারণ যিনি মহাভারতের অথবা মহাভারতীয় চরিত্রের সমালোচক হবেন, তাঁকে যেমন মহাভারতের কবির হৃদয় বুঝতে হবে, যেমন করে ভারতবর্ষের তদানীন্তন মনন-চিন্তন বুঝতে হবে, তেমনই তাঁকে নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের গণ্ডীটুকুও ছাড়িয়ে যেতে হবে। উপরন্তু সেই সমালোচকের যেন এক প্রেমিকের হৃদয়ও থাকে, কেননা একমাত্র সেই হৃদয় দিয়েই মহাভারতের প্রত্যেকটি চরিত্রের সৌন্দর্য-মাধুর্য-গভীরতাগুলি অনুভব করা যায়, অনুভব করা যায় প্রতিনায়কের দুষ্টতা, খলতা এবং অবশ্যই তাঁর বিশিষ্টতাও। এই সমালোচকের সহনশীলতা কোথাও কোথাও ক্ষুণ্ণ হবে বই কী, কিন্তু সেই অসহনও হবে প্রেমিকের মতোই, যাতে করে তিনি তাঁর মাননীয় প্রার্থিত চরিত্রটিকে অন্য সমস্ত দ্বিতীয়-মানের চরিত্র থেকে পৃথক সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। আমি সেই প্রেমিকের গর্ব এবং অসহন নিয়েই বলতে চাই—আমি ব্যাস-ভীষ্ম-ধৃতরাষ্ট-বিদুরের চরিত্র-রচনায় পুনরায় এক প্রেমের তপস্যায় বসেছিলাম এবং সেই প্রেমেই বুঝেছি যে,—ভীষ্ম-বিদুরের মতো চরিত্রসৃষ্টির পিছনে মহাভারতের কবির যে গভীরতা ছিল, সেই একই গভীরতা দিয়ে তিনি ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধন অথবা কর্ণের চরিত্রও চিত্রায়ণ করেছেন—অথচ এঁরা প্রত্যেকে কী পৃথক এবং স্বতোবিশিষ্ট এবং স্বতোবিভিন্ন।

মহাভারতের এই চরিত্রগুলি লিখবার সময় আমার মধ্যে কোথাও যেন একটা ‘হেনোথিইস্টিক্ অ্যাটিটুড্’ কাজ করেছে। একই সঙ্গে আমি ভুলিনি যে, মহাভারতের সমাজটাও একটা জীবন্ত সমাজ ছিল। এমন একটা সমাজ যেখানে আমাদের আজকের দিনের মতোই স্নেহ-প্রেম-হিংসা-পক্ষপাত আবর্তিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ ভরতবংশের উত্তরাধিকারীদের সুস্থ প্রতিষ্ঠার জন্য ভীষ্ম আত্মবলি দেন বটে, কিন্তু সেই বংশের পিতামহ হিসেবে সারাটা জীবন তিনি শুধু দেখে গেলেন, সেবা করে গেলেন, কিন্তু সংসার-মুক্তি নিয়ে চলে গেলেন না। এমন নির্মোহ উপায়ে সংসারে থেকে যাওয়াটা যে সর্বত্যক্ত সন্ন্যাসীর চেয়েও বড় মুক্ত পুরুষের লক্ষণ, সেটা মহাভারতের কবি ছাড়া আর কে এমন করে দেখাতে পারতেন।

বিদুর একটি চরিত্র, যিনি নিতান্তই তাত্ত্বিকভাবে রাজনীতিক অথবা তাত্ত্বিক নেতা। জাতিবর্ণে তিনি হীন, অথচ শক্তি, শীল এবং দৃঢ়তায় তিনি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকেও অতিক্রম করেন। অন্যায়ের সঙ্গে তিনি কখনও আপোস করেন না। তিনি যেহেতু মন্ত্রী, অতএব রাজার হিত তাঁকে উচ্চারণ করতেই হবে, নইলে তিনি ধর্ম থেকে চ্যুত হবেন—ঠিক এই ভাবনা থেকেই বিদুরের চরিত্র প্রসারিত; অথচ কী অদ্ভুত দেখুন, যে ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি প্রায় সারা জীবন হিতের কথা বলে গেলেন, সেই ধৃতরাষ্ট্র কিন্তু বিদুরের কথা শুনে চলেননি, এমনকী মাঝেমধ্যে তিনি বিদুরের সঙ্গে তঞ্চকতাও করেছেন। আর তিরস্কার! সে তো ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন, কর্ণ—সকলেই সময়ান্তরে, মাঝে-মাঝেই বিদুরকে করে গেছেন কর্তব্যের মতো। এতৎসত্ত্বেও ব্যাসের এই হৃদয়জাত পুত্রটি জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রকে কখনও ত্যাগ করে

যাননি এবং প্রত্যেক বিপন্ন মুহূর্তে তাঁর পাশে থেকেছেন, সান্ত্বনা দিয়েছেন। বিদুর-চরিত্রের মহিমা এইখানেই।

চরিত্রগত দিক দিয়ে ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম-বিদুরের চেয়ে একেবারেই পৃথক। স্বার্থান্ধতা, স্নেহান্ধতা এবং সর্বোপরি সিংহাসনের সার্থক উত্তরাধিকারী না হওয়ার আক্ষেপ ধৃতরাষ্ট্রকে চিরকাল আকুল করেছে। এই নিরিখে ভীষ্ম-বিদুরের পাশে তাঁর স্থান হওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তিনি অন্ধ রাজা এবং তারও ওপরে তিনি ব্যাসের ঔরসজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র। ন্যায়-নীতি এবং সত্য তিনি বোঝেন না, তা নয়। তিনি বোঝেন এবং যথেষ্টই বোঝেন, তবুও নিজের অক্ষম জীবনের অপ্রাপ্য রাজপদবি অনুপযুক্ত স্বার্থান্বেষী পুত্রের ওপর ন্যস্ত করতে চেয়ে তিনি স্নেহান্ধতার পরিচয় দিয়েছেন, এই পরিচয় আমাদের চেনা। ব্যাস দেখাতে চেয়েছেন—শারীরিক অন্ধতা নয়, যে অন্ধতা পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে অতিক্রম করে, যে অন্ধতা প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা ব্যাহত করে—সেই অন্ধতা কখনও প্রজাকল্যাণের আধার হতে পারে না। জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যে মোহ আমাদের গ্রাস করে, শুভ চৈতন্য থাকা সত্ত্বেও যে স্বার্থৈষণা আমাদের অন্ধ করে রাখে, ধৃতরাষ্ট্র সেই বিষামৃতের মিলনাধার।

আমরা পূর্বে যে দ্বিতীয় মানের চরিত্রের কথা বলেছি—সে চরিত্র আছে এবং থাকবে, কিন্তু সেই চরিত্রের বিপদ-নির্দেশ হল এইরকম যে, সে তার নিজস্ব জীবনের গুণ এবং বঞ্চনার মাধমে এমন একটা প্ররোচনা তৈরি করে, যাতে মনে হয় তাঁর মধ্যে গ্রহণীয়তা ছিল, মান্যতা ছিল। বৃহৎ জলাধারের তীরস্থিত শান্ত পর্বতের ছায়া জলাধারের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হলে, সেই ঝিলিমিলি ছায়া যেমন পর্বতের রূপ অনুকরণ করে, দ্বিতীয় মানের চরিত্রের মধ্যেও সেই শুভ, ভদ্র নীতি-নিয়মের অনুকার থাকে—তাতে তার ওপরে আমাদের মায়া হয়, মমতা হয়, কিন্তু তবু সে সত্য নয়, সে শান্ত পর্বত নয়, সে পর্বতের ছায়ামাত্র। ধৃতরাষ্ট্র চরিত্র এই ভ্রম-সংশোধনের রূপায়ণ। মহাভারতের পাঠক যাতে বোঝেন—দ্বিতীয় মানের চরিত্রের মধ্যে জগৎ ও জীবনের যে অনুকৃতি থাকে, তা দেখতে ভাল লাগলেও, তার প্রতি মায়া-মমতা হলেও সে প্রশ্রয়যোগ্য নয়। এমন যে ধৃতরাষ্ট্র, যিনি ঋষি ব্যাসের ঔরসজাত পুত্র, তাঁর মধ্যে ব্যাস-প্রণোদিত শুভবুদ্ধি আছে, কিন্তু স্বার্থের তাড়নায় সেই শুভ-বুদ্ধি তিনি ধরে রাখতে পারেন না, তিনি বিচলিত হন, ঠিক যেমন শান্ত পর্বতের অনুকারিণী ছায়া আপন জীবনাধার জলের মধ্যে বাইরের হাওয়ায় বিচলিত হয়। দ্বিতীয় মানের এই চরিত্রের কাজ প্রথম মানের সত্য চরিত্রগুলিকে প্রতিতুলনায় আরও প্রকট করা। সেই কারণে এই সংকলনে ভীষ্ম-বিদুরের পাশে ধৃতরাষ্ট্রেরও স্থান হয়েছে।

দ্রোণাচার্য এবং কৃপাচার্য—এরা দুজনেই হস্তিনাপুরের রাজবাড়ির কোনও পরম্পরাপ্রাপ্ত পুরুষ নন। কৃপাচার্য যদিও বা শিশুকাল থেকেই রাজবাড়ির ছত্রছায়ায় মানুষ হয়েছেন, কিন্তু দ্রোণাচার্য কুরুবাড়িতে এসেছেন অনেক পরে। যদিও পাঞ্চাল দ্রুপদের ওপর প্রতিহিংসা মেটাতে তিনি কুরুবাড়িতে অস্ত্রাচার্যের পদ অঙ্গীকার করেন, তবু এটা লক্ষণীয় যে, প্রতিহিংসা মিটতেই দ্রোণাচার্য কিন্তু অন্য মানুষ হয়ে যান। কুরুবাড়িতে তাঁর এতটাই প্রতিষ্ঠা ঘটে যে, বিভিন্ন সময়ে তাঁর সঙ্গে এমনটাই ব্যবহার করা হয়েছে যাতে মনে হয়—তিনি গুরুরও অধিক শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত। ভীষ্ম, বিদুর এমনকী ধৃতরাষ্ট্রও তাঁকে সেই শ্রদ্ধাতেই দেখেছেন। গুরু হিসেবেও দ্রোণাচার্যের মধ্যে সেই বাৎসল্য ছিল, যাতে কৌরব-পাণ্ডবের প্রতি তিনি সমদৃষ্টি রেখে চলেছেন। কিন্তু এই সমদৃষ্টির ব্যত্যয় ঘটেছে ন্যায়-নীতির প্রতি দ্রোণাচার্যের পক্ষপাতে। তিনি কুরুবাড়ির অন্ন-বৃত্তি লাভ করেছেন, ফলে হস্তিনাপুরের জন্য তিনি জীবন দিয়েছেন, কিন্তু এই জীবনদান সত্ত্বেও রাজনৈতিকভাবে বিরুদ্ধপক্ষ পাণ্ডবদের প্রতি তাঁর দুর্বলতা চিরবিদিত ছিল এবং এই দুর্বলতা ধর্ম-ন্যায়-নীতির জন্যও বটে।

এই গ্রন্থে সংকলিত চরিত্রগুলির পাশে কৃপাচার্য নিতান্তই অনুজ্জ্বল। কিন্তু তবুও তাঁর চরিত্র যে শেষপর্যন্ত লিখেছি, তার কারণ তিনি ভীষ্ম-দ্রোণের অনুষঙ্গী চরিত্র। তিনি ভীষ্মও নন, দ্রোণও নন, কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অনেক আগে প্রায় ভীষ্মের সমসাময়িক কালে হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে তাঁর প্রবেশ ঘটেছে এবং যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থানের আগে তাঁর ওপরে কুমার পরীক্ষিতের ভার দিয়ে রাজধানী ছেড়ে যান। এই যে এতটা কাল ধরে পরজীবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি হস্তিনাপুরের সঙ্গে জড়িয়ে রইলেন, এই বিশাল সময়টাই বুঝি তাঁকে চিরজীবিতা দিয়েছে। আর সেই কারণেই ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ—এই বৃদ্ধত্রয়ীর একত্র প্রাবাদিক উচ্চারণ আমরা অস্বীকার করতে পারিনি। কৃপের কথা একটুও না লিখলে ভীষ্ম-দ্রোণের বৃত্তটুকুই সম্পূর্ণ হয় না।

পরিশেষে ব্যাস, সত্যবতী-হৃদয়নন্দনো ব্যাসঃ। ব্যাস মহাভারতের কবি, মহাভারতের বক্তা। প্রসিদ্ধ কুরুবংশের ইতিহাস রচনা করার পিছনে এই প্রেরণাও হয়তো কাজ করে থাকবে যে, এই ইতিহাসের তিনিও এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। পাণ্ডবের কৌরবের এক পিতামহ নয়, দুই পিতামহ। একদিকে ভীষ্ম, যিনি কৌরবগৃহের সাক্ষাৎ গৃহস্থ হয়েও সন্তান-পরম্পরা তৈরি করলেন না। অন্য জন ব্যাস, যিনি সন্ন্যাসী ঋষি হয়েও মায়ের আদেশে, রাষ্ট্রের প্রয়োজনে কুরুবাড়ির সন্তান-সাধনার সিদ্ধি দান করলেন। ক্ষেত্রজ পুত্রের পিতা বলে হয়তো সরাসরি তিনি কুরুবাড়ির শাসনতন্ত্রের সঙ্গে জড়িত নন, কিন্তু পাণ্ডব-কৌরব—সকলেরই বিপন্ন মুহূর্তগুলিতে ব্যাসকে উপস্থিত হতে দেখেছি। কুরুবাড়িতে সন্তান-ন্যাসের সূত্রে এই রাজবাড়ির ওপর তাঁর যে মায়াটুকু তৈরি হয়েছিল, তাতে তাঁর পারাশর্য্য ঋষিত্ব কতটুকু আহত হয়েছিল, আমরা জানি না, কিন্তু এতে তাঁর নব-রস-রুচিরা কবিত্ব-শক্তি যে বেড়েছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

শাস্ত্রে কাব্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস ঈশ্বরের অন্যতম অবতার হিসেবে চিহ্নিত। অন্তত তাঁর মধ্যে সেই বিভূতিময় সত্ত্ব অবশ্যই আছে, যাতে তাঁকে পরম ঈশ্বরের অংশসম্ভব তেজ বলেই মনে হয়। এই তেজ তাঁর কবিত্বের, এই তেজ ধর্মের। ধর্মস্থাপনার সঙ্গে কবিত্বের তেজ মিশে যাওয়ায় ব্যাসের অন্তর্গত হৃদয় যতখানি সূর্যের মতো দীপক, ততখানিই চন্দ্রের মতো আহ্লাদক। কেউ তাঁর করুণা থেকে বঞ্চিত নন। সূর্য-চন্দ্র যেমন একই সঙ্গে পণ্ডিত এবং চণ্ডালের ঘরে আলোক বিতরণ করে, তেমনই ভারতবর্ষের জাতি-বর্ণ-বিবর্ণ সমাজ ব্যাসের প্রসন্নতায় একাকার হয়ে গেছে। সূত-শূদ্র-ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ মহাভারতের সমাজে এতই মেশামিশি করেছে যে, মহাভারতের পরিণতি-পর্বে সেই প্রসন্ন-গম্ভীর-পদা সরস্বতীর উচ্চারণ শুনতে পাই ব্যাসের মুখে—ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ—মানুষ, মানুষের চেয়ে বড় কিছু নেই।

সমগ্র মহাভারত জুড়ে তাই মানুষের ধর্ম কথিত হয়েছে। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—সমস্ত মানুষের ভাবনা, চিন্তা, আকাঙ্ক্ষা এবং প্রাপ্তির সব এই চারটি বর্গের মধ্যেই আবর্তিত হয়। ব্যাস এমন করেই ভরত-বংশের বৃহদ্-ইতিহাস রচনা করেছেন, যাতে প্রত্যেক মানুষ তার জীবনের স্বতোবিভিন্ন আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং প্রাপ্তির আদর্শ খুঁজে পাবেন মহাভারতে। যা কিছুই আমরা চাই, অথবা চাই না, অথবা চাওয়া উচিত নয়, যা কিছুই আমরা পাই, অথবা পাই না, অথবা পাওয়া উচিত নয়—তার সবটাই রূপ-রস-স্পর্শ-গন্ধ-শব্দের কাহিনী-তন্ময়তায় ধারণ করে ব্যাস পরম নির্লিপ্ততায় সেই কাহিনীর পাশাপাশি হেঁটে গেছেন। কখনও তিনি কাহিনীর মধ্যে সশরীরে ঢুকে পড়ছেনও, তার পরের মুহূর্তেই কাহিনীর পাশাপাশি ঋষির পরিব্রাজন।

এমন একটি চর্মাম্বর কৃষ্ণবর্ণ মানুষের চরিত্র আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে পরম কৌতূহলপ্রদ মনে হয়েছে। আমি এখানে ব্যাসকে কবি হিসেবে দেখিনি, মহাভারতের মধ্যে

মহাকাব্যিক নৈপুণ্য অথবা তাঁর 'বৈদগ্ধ্য-ভঙ্গী-ভণিতি' নিয়েও আমার কোনও মাথা-ব্যথা নেই। মহাভারতের টুকরো টুকরো ঘটনা এবং তাঁর বক্তব্য থেকে আমি শুধু মানুষ ব্যাসকে দেখতে চেয়েছি, যিনি ঋষি হয়েও মায়ের ডাক শুনে আসেন, স্নেহে আবিল হন, ভালবাসেন, বকেন, সান্ত্বনা দেন, আর সবার শেষে বলেন—মানুষের থেকে বড় কিছু নেই—ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ।

এই সংকলনের প্রত্যেকটি চরিত্র-রচনা বিভিন্ন বৎসরে পূজার উপচার হিসেবে সজ্জিত হয়েছিল। উপচারিকা ছিলেন কাকলি চক্রবর্তী। পূজার বেদি ছিল বর্তমান পত্রিকার পুজোসংখ্যা। একমাত্র কৃপাচার্যের স্থান হয়েছিল বর্তমান পত্রিকার ধারাবাহিক রবিবাসরে। এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ এঁকেছেন সমীর সরকার। প্রচ্ছদখানি দেখার পর আমার মুগ্ধ অভিনন্দন না জানিয়ে পারিনি—প্রবীণতা-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এমন রাজভাবও ব্যঞ্জনায় প্রতিষ্ঠা করাটা মহাকাব্যিক চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ছিল।

গ্রন্থ প্রকাশিত হলেই যাঁদের কথা স্মরণে আসে তাঁরা তাঁরাই—যাঁরা আমাকে ভালবাসেন, স্নেহ করেন এবং আমার ত্রুটিগুলি ক্ষমা করেন। আমার প্রথম লেখাটি যেদিন আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তখন আমার বয়স ছিল একত্রিশ বছর। আর এই সংকলন যখন পুস্তকাকারে বেরোচ্ছে, তখন আমার বয়স একান্ন বছর। এই কুড়ি কুড়ি বছরের পারে এসেও যাঁরা আমাকে ভালবাসেন, স্নেহ করেন এবং ত্রুটিগুলি ক্ষমা করেন, তাঁদের আমিও ভালবাসি, স্নেহ করি এবং তাঁদের কাছে অনুগৃহীত বোধ করি। যতটা বয়স হয়েছে, তাতে নিজেকে বৃদ্ধ মনে করি না বটে, তবে বৃদ্ধত্বের চর্চা করি এবং সেই চর্চাতে কর্ম, কর্মফল, লেখা, লেখার ফল নিয়ে তেমন আর মাথা ঘামাতে ইচ্ছে হয় না। এখন যা কিছুই হয় না বা ঘটে না, সেখানেই ঈশ্বরেচ্ছা নেই বলে মনে হয়। আর যা কিছুই ভাল হয় বা শুভ হয়—যেমন এই গ্রন্থ পড়ে কেউ যদি সুখী হন—তবে সেটা ঈশ্বরের করুণা বলে মনে হবে। অতএব আমার পরম উপাস্য দেব কৃষ্ণের প্রতি প্রণাম—বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতিশতবৃতং ব্রহ্মগোপালবেশম্—তিনি বর্তমান লেখকের সঙ্গে অখিল পাঠককুলের সমান-হৃদয়তা বিধান করুন।

-নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

সূচি

আবেদন

নুক্‌, কিন্ডেল, কবো বা ট্যাব ছাড়া ই-বই পড়ার অদম্য আগ্রহ থেকেই এই ইপাব তৈরি যা খুব সহজেই হাতের স্মার্টফোনে যে কোন অবসরেই পড়ে ফেলা যায়। আলাদা করে ই-বুক রিডার কেনার কোন প্রয়োজন নেই বা পিডিএফের মত জুম করে ডান-বা দিকে সরিয়ে পড়ারও দরকার নেই।

কিন্তু অন্তর্জালে পছন্দের বাংলা বইয়ের পিডিএফ যাও বা পাওয়া যায়, ইপাব অপ্রতুল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রচারের জন্য তাই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইন ইত্যাদিতে) এই ইপাব ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রচ্ছদ, প্রকাশনা, উৎসর্গ ও ভূমিকা (যদি কিছু থাকে) ইত্যাদি প্রথম দিকের পাতাগুলো দেখতে না পেলে ঠিক বই বই বুঝতে অসুবিধা হয়, তাই তথাকথিত এই অপ্রাসঙ্গিক পাতাগুলিও রাখা হয়েছে।

অন্তর্জাল থেকে পছন্দের বইয়ের পিডিএফ নামিয়ে টেক্সটে রূপান্তরিত করা- এ কাজে ভি-ফ্ল্যাটের এখনো কোন জুড়ি নেই। এবার একে ওয়ার্ড বা অন্য কিছুতে এডিট করে ক্যালিবার এর সাহায্যে ইপাব। এটাই সহজ পদ্ধতি।।

ভি-ফ্ল্যাটের সাহায্যে পিডিএফ থেকে তৈরি, ভুল থাকলে জানান। বইটির বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যেই উপলব্ধ। সমালোচনা, মন্তব্য, প্রতিবেদন, শিক্ষাদান, বৃত্তি এবং গবেষণার মতো অলাভজনক শিক্ষামূলক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, বাণিজ্যিকভাবে বিতরণের জন্য কখনোই নয়।

ব্যাস দ্বৈপায়ন

সেকালের দিনের কবি-সাহিত্যিকদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজারা এবং কখনও কখনও রানিরাও, যদি তাঁরা অবশ্য শিক্ষা এবং সংস্কৃতির রসজ্ঞা হতেন। কর্ণাট রাজ্যের রানি ছিলেন যেমন এক বিদগ্ধা রমণী, তেমনই একটু গর্বোদ্ধত স্বভাবের। তাঁর কাছে এসে কোনও এক সহৃদয় ব্যক্তি কালিদাসের নাম করেছিল। কালিদাস তখন উদীয়মান কবি, সবে মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক আর কুমারসম্ভব রচনা করে উত্তর-মধ্যভারতে প্রসিদ্ধিলাভ করতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু কর্ণাটের রানি এখনও তাঁর কবিত্বের স্বাদ পাননি। এতদিন বাল্মীকি-ব্যাসের মহাকাব্য শুনে শুনেই তাঁর দিন রাত্রি ভরে গেছে, তিনি কোনও নতুন কবির নাম আর শুনতে পারছেন না। কালিদাসের নাম শুনেই তিনি ঝংকার দিয়ে বলে উঠলেন, রাখো তোমার কালিদাস। কবি বলতে আমি চিনি তিন জনকে। প্রথম জন ব্রহ্মা প্রজাপতি। এই বিরাট কাব্যসংসারে তিনি হলেন প্রথম কবি, যাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল শব্দ। প্রকাশিত হয়েছিল বাণীরূপা সরস্বতী। দ্বিতীয় হলেন সেই মুনি, যিনি জন্মেছিলেন কল্লোলিনী কালিন্দীর বুকে চর পড়ে-যাওয়া এক দ্বীপে। তাঁর নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। আর আমার তৃতীয় কবি হলেন বল্মীকজন্মা আদিকবি বাল্মীকি। কর্ণাটের রানি এবার ধমক দিয়ে বললেন—এই তিন জন ছাড়া আর যদি কেউ গদ্য-পদ্য রচনার চমৎকারে আমার চিত্ত মোহিত করতে চান, তা হলে তাঁর মাথায় আমি আমার এই বাঁ পাখানি ঘষে দিই—তেষাং মূর্ধ্নি দধামি বামচরণং কর্ণাটরাজপ্রিয়া।

কালিদাসের অলৌকসামান্য প্রতিভার নিরিখে কর্ণাটের রানিকে তাঁর বক্তব্য সংশোধন করতে হয়েছিল বলেই জানি, কিন্তু চতুর্থ এই কবির কারণে ব্যাস-বাল্মীকির প্রতিভা তাঁর কাছে ম্লান হয়ে যায়নি। আরও একটা কথা—বাল্মীকিকে আমরা আদি কবি বলে জানি, কর্ণাটের রানি কিন্তু ব্যাসের নাম করেছেন বাল্মীকিরও আগে। পণ্ডিতেরা অনেকে মনে করেন—মহাভারতের মূল স্তর কাব্যে গ্রন্থিত হয়ে গিয়েছিল রামায়ণের মূল স্তরবিন্যাসের আগেই। হয়তো সেই জন্যেই কর্ণাটের রানির অনুক্রমণিকায় ব্যাসের নাম এসেছে বাল্মীকিরও আগে। এমনও অবশ্য হতে পারে যে, মহাভারতের সম্পূর্ণ আখ্যানভাগ রামায়ণের সরল কাহিনীর চেয়ে অনেক বেশি জটিল এবং রোমাঞ্চকর, অতএব সেই কারণেই সহৃদয় পাঠকের কাছে ব্যাসকৃত মহাভারতের আবেদন রামায়ণের চেয়ে অনেক বেশি। হয়তো কর্ণাটের রানির কাছেও তাই।

আজকাল অবশ্য মহাভারতের শবব্যবচ্ছেদ করে, রচনা স্তরের মধ্যে বহুরকম লেখার 'স্টাইল' দেখে অনেক পণ্ডিত বলেছেন—ব্যাস একজন নন মোটেই। বরঞ্চ বলা উচিত—ব্যাসের মূল রচনার ওপরে গভীর স্থূল হস্তাবলেপ ঘটেছে এবং তা করেছেন অন্য অর্বাচীন কবিরা। আমরা বলি—একথা পণ্ডিতেরা নতুন করে কী বলবেন, একথা তো মহাভারতেই আছে!

ব্যাস-কথিত মহাভারতকাহিনী বিবৃত করতে গিয়ে মহাভারতের কথকঠাকুর রোমহর্ষণি উগ্রশ্রবা সূত বলেছেন—এর আগেও কবিরা এই মহাভারতকাহিনী বলেছেন, পরের কবিরাও বলবেন—আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাক্ষতে পরে। এখন আমি এই কাহিনী বলছি। বস্তুত এই বার বার বলার জন্য মহাভারতের মূল কাহিনীও পরিবর্তিত হয়ে গেছে বলে আমি মনে করি না। এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন আসরে বসে যাঁরা মহাভারত-পুরাণ ব্যাখ্যা করেন, তাঁরা যে আসনে বসেন তাঁকে 'ব্যাসাসন' বলে এবং সাময়িকভাবে সেই পুরাণ-বক্তাকেও ব্যাসরূপে কল্পনা করা হয়। আমার বক্তব্য, পুরাণ-বক্তা যত ব্যাখ্যাই করুন, তিনি কখনও পুরাণের মূল বক্তব্যকে অতিক্রম করেন না। অন্যদিকে কথকঠাকুরেরা, বিশেষত যাঁরা রোমহর্ষণ, উগ্রশ্রবার মতো কথকঠাকুর—তাঁরা যেহেতু প্রায় সাক্ষাৎ পরম্পরায় মহাভারতের পাঠ

নিয়েছেন, তাই মহাভারতের মূল পরিবর্তন করার সাধ্য ছিল না তাঁদের। কাজেই বর্তমান অবস্থার মহাভারতটুকু পড়লেও মহাভারতের ব্যাসকথিত মৌল অংশ অনুধাবন করতে কারও অসুবিধে হবার কথা নয়। স্থূলহস্তাবলেপ অবশ্যই কিছু আছে এবং তাতে সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন বুঝতে আরও সুবিধে হয়। মনে রাখা দরকার, পুরাকালে বেদবিভাগকারী ঋষিমাত্রকেই ব্যাস বলা হত। বিষ্ণুপুরাণে আমরা অন্তত আটাশটি ব্যাসের নাম পাই, যার মধ্যে, কী আশ্চর্য—বাল্মীকিরও নাম আছে। তবে বেদবিভাগকারী ঋষিরা ব্যাস-নামধারী হলেও মহাভারতের রচনাকার ব্যাসকে কিন্তু আমরা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বলেই জানি এবং মানি। আমাদের কাছে সবচেয়ে লক্ষণীয় হল—ব্যাস এবং বাল্মীকি—এই দুজনেরই প্রেরণা হলেন সেই প্রথম কবি—প্রজাপতি ব্রহ্মা—যিনি অলৌকিক এবং লৌকিক জগতের সারস্বত সেতু।

দেবী সরস্বতী ব্রহ্মার মুখ থেকে জন্মেছিলেন বলে তিনি ব্রহ্মার কন্যা বলে পুরাণগুলিতে বলা হয়েছে, কিন্তু এই কন্যার জন্মের পরেই পুরাণগুলির মধ্যে ব্রহ্মাকে কন্যার রূপমুগ্ধ প্রেমিক পুরুষ হিসেবে কল্পনা করায় অনেকে এই সম্বন্ধের মধ্যে একটা ‘ইনসেস্চুয়াস রিলেশন’ও খুঁজে পেয়েছেন। পৌরাণিক এই কল্পের মধ্যে যেটা আসলে বোঝবার, সেটা হল —শব্দস্বরূপা বাণী-সরস্বতীর সঙ্গে ব্রহ্মার নিত্যসম্বন্ধের কথাটি। এই নিত্যসম্বন্ধের জন্যই সরস্বতীকে একবার কন্যারূপে কল্পনা করেও আবার স্ত্রীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। যেখানে যেখানে শব্দস্বরূপা সরস্বতীর অধিষ্ঠান, সেখানে সেখানেই সরস্বতীর জন্মদাতা ব্রহ্মার অধিষ্ঠান কল্পনা করি আমরা। এখনও পর্যন্ত সরস্বতীপুজোর সময় মন্ত্র পড়ি—যেমন নাকি লোকপিতামহ ব্রহ্মা তোমাকে ছেড়ে এক মুহূর্তের জন্যও কোথাও যান না, তেমন করেই আমাদেরও তুমি ছেড়ে যেয়ো না—

> যথা ন দেবো ভগবান্ ব্রহ্মা লোক-পিতামহঃ।
> ত্বাং পরিত্যজ্য সন্তিষ্ঠেৎ তথা ভব বরপ্রদা॥

প্রজাপতি ব্রহ্মার সঙ্গে সরস্বতীর এই নিত্যসম্বন্ধের নিরিখেই একথা বলতে হচ্ছে যে, যেখানে আদিকবির প্রথম কবিতা উৎসারিত হচ্ছে, অথবা মহাকবি ব্যাস যেখানে মহাকাব্য সরস্বতীর ভাবনা করেছেন, সেখানে প্রথমেই ব্রহ্মার উপস্থিতি ঘটবে না, এমনটি হতেই পারে না। ঠিক এই কারণেই ভারতবর্ষের দুই মহাকাব্য সৃষ্টির উপন্যাসমাত্রেই কবিদের প্রথম-স্ফুরিতা সরস্বতীর কল্পকুঞ্জ বনে আমরা প্রথমেই ব্রহ্মার পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি।

রামায়ণ-রচয়িতা ব্রহ্মার নির্দেশ পেয়েছিলেন—মনুষ্যলোকের শ্রেষ্ঠ পুরুষ রামের চরিত্র-কীর্তনের জন্য। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের বেলায় সেরকম কিছু হয়নি। মহাভারত আখ্যান রচনার পরিকল্পনা তাঁর আগে থেকেই ছিল। ব্রহ্মা তাঁর কাছে এলে ব্যাস তাঁকে বলেছিলেন —আমার কাব্যের ভাবনা শেষ—কৃতং ময়েদং ভগবন্ কাব্যং পরমপূজিতম্। এসব ক্ষেত্রে কৌতূহলী সহৃদয়ের যেমন জিজ্ঞাসা হয়—তেমনই ব্রহ্মার মনেও সেই জিজ্ঞাসা ছিল নিশ্চয় —কাব্যের কীরকম পরিকল্পনা, নায়ক কে, নায়িকা কে, প্রতিনায়ক কে অথবা ঘটনার গতি এগোচ্ছে কীভাবে? এখানে ব্যাসের কোনও অসুবিধে ছিল না। বেশিরভাগ ঘটনাই তাঁর প্রত্যক্ষ এবং সব ঘটনার সঙ্গেই তাঁর আত্মিক যোগ আছে। ব্যাস ব্রহ্মার কাছে স্বভাবিত মহাকাব্যের সংক্ষিপ্ত খসড়া দাখিল করে জানালেন যে, তিনি তাঁর মহাকাব্যের মধ্যে বেদ উপনিষদের তত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে লোকশিক্ষা, ন্যায়শিক্ষা, চিকিৎসা, ইতিহাস, ভূগোল, অ্যানথ্রপোলজি, যুদ্ধকৌশল এবং এই বিরাট কালচক্রের রহস্য—সব সবিস্তারে সাজিয়েছেন। কিন্তু এই বিরাট গ্রন্থখানি লিখে দেবার মতো একটা উপযুক্ত লোক তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁর গ্রন্থখানি তো শুধু মহান নয়, ভারীও বটে—মহত্ত্বাদ্ ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে।

ব্রহ্মা বুঝলেন—এত বড় একজন মহাকাব্যকারকে বৃথা পরিশ্রম করতে দেওয়া যায় না। ব্যাস নিজেও এই 'ডবল' পরিশ্রম করতে রাজি নন। আর সত্যিই তো, একে এই বিরাট কাব্য পরিকল্পনার পরিশ্রম, তার মধ্যে যদি আবার তাঁকেই বসে বসে সেটি লিখতে হয়, 'কপি' করতে হয়, এত ধকল একজন মহাকবি সইবেন কেন? তখনকার দিনে 'লেখক' চেয়ে বিজ্ঞাপন দেবার রীতি এবং উপায় কোনওটাই ছিল না, কিন্তু সব অব্যাপারে ব্যাপার তৈরি করার ঘটকঠাকুর প্রজাপতি ব্রহ্মা 'লেখক' হিসেবে নাম প্রস্তাব করলেন গণেশঠাকুরের।

মহাভারতের মতো বিরাট এক মহাকাব্য সৃষ্টি করতে গেলে শুধুই যে কবিকল্প দিয়ে কাজ হয় না, এই তার প্রমাণ। মহাকবির হৃদয়স্থিতা কাব্যসরস্বতীর প্রকাশের জন্য তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন লোকপিতা ব্রহ্মা, এবার গ্রন্থকার্যের স্থূল পরিশ্রমটুকু করবার জন্য ব্রহ্মা গণেশের নাম প্রস্তাব করলেন। কেন, গণেশ কেন? আর দেবতা ছিলেন না? ইন্দ্র, যম, বরুণ এত সব বড় বড় দেবতা থাকতে গণেশ কেন? গণেশ এইজন্য যে, মহাভারত শুধু আর্যতন্ত্র বা ব্রাহ্মণ্যের ইতিহাস নয়, মহাভারত সমগ্র ভারতবর্ষের জনজাতির ইতিহাস, সমগ্র ভারতবর্ষের সমাজনীতি, ধর্মনীতি, রাজনীতি আলোড়িত এবং আবর্তিত হয়েছে বিশালবুদ্ধি ব্যাসের কবিহৃদয় জুড়ে। কাজেই সেই বিশালত্ব ধারণ করে প্রকাশ করার জন্য এমন একজনের লেখনী প্রয়োজন, যিনি শুধুমাত্র বেদ এবং ব্রাহ্মণ্যের প্রতীক নন; যিনি সমস্ত মানুষের হৃদয় বোঝেন, যিনি গণতত্ত্ব বোঝেন, সেই গণপতি গণেশকে এই বিশাল কবিকল্প অক্ষর-স্বরূপে প্রকাশ করার জন্য ডাকা হয়েছে। ব্রহ্মার কথায় ব্যাস তাঁকে আবাহন করে বলছেন—তুমি গণনায়ক বলে কথা। সমগ্র ভারতবর্ষের এই গণহৃদয় তোমাকেই প্রকাশ করে দিতে হবে—লেখকো ভারতস্যাস্য ভব ত্বং গণ-নায়ক।

গণনায়ক গণেশকে মূর্খ ভাবেন অনেকে। গলার ওপর হাতির মাথা থাকায় এই ধারণা আরও পুষ্ট হয়েছে। কিন্তু একথা কেউ ভাবলেন না যে, হস্তিমুণ্ড হল সেই বিরাটত্ব, গাম্ভীর্য এবং বিজ্ঞতার প্রতীক, যে বিরাটত্ব, গাম্ভীর্য এবং বিজ্ঞতা মহাভারতের মধ্যেও আছে। পণ্ডিত কুমারস্বামী জানিয়েছেন—গণ শব্দটি কি দুটি অর্থ বোঝায়। প্রথম অর্থে শিবগণ, কেননা রুদ্র-শিবের যারা গণ, তাঁদের আধিপত্য পেয়েছিলেন গণেশ। আর দ্বিতীয় অর্থ নাকি গ্রন্থসমূহ। হয়তো সেই গ্রন্থ সম্বন্ধেই গণেশ ব্যাসকৃত মহাকাব্যের প্রথম লেখক। আমরা পুরাণের প্রমাণে জানি—গণেশের মতো জ্ঞানী নেই। তাঁর জন্মলগ্নেই দেবী সরস্বতী তাঁকে 'বর্ণলোচনা' লেখনী দিয়েছিলেন একখানি, আর স্বয়ং ব্রহ্মা তাঁকে দিয়েছিলেন জপমালা—সরস্বতী দদৌ তস্মৈ লেখনীং বর্ণলোচনাম্। জপমালার মধ্যে যে ধ্যানগম্ভীরতা আছে, আর লেখনীর মধ্যে যে দতলেখন-পটুতা আছে—এই দুটিই ব্যাসের এখন প্রয়োজন।

গণেশকে ব্যাস বললেন—আমি এই বিশাল মহাকাব্যের কল্পনা করেছি। আমি শ্লোক বলব, তুমি লিখবে—ময়ৈব প্রোচ্যমানস্য মনসা কল্পিতস্য চ। প্রত্যেক কাজের লোকেরই নিজের কাজের গুমোর থাকে, 'ইগো' থাকে। গণেশ বললেন—সে না হয় আমি লিখে দিলুম। কিন্তু আমি ঝড়ের বেগে লিখব এবং লিখতে বসলে আমি থামব না। কবি ভাবলেন—এ আবার কী উটকো বিপদ। ভারতবর্ষের ইতিহাস নিয়ে মহাকাব্য হবে—সে কি ঝড়ের বেগে লেখা চলে! না হয় পরিকল্পনাটা করাই আছে, তাই বলে কবির হৃদয় দিয়ে যখন অপূর্ব নির্মাণপটু পদ-পদার্থের সম্বন্ধ ঘটানো হবে, তখন কি না ভেবে, না চিন্তে বললেই চলবে, নাকি শুধু লিখলেই চলবে! ওদিকে লেখক হিসেবে গণেশঠাকুরকেও তাঁর চাই। ব্যাস তখন বুদ্ধি করে বললেন—তোমার শর্তে আমি রাজি বটে, তবে যাই তুমি লিখবে, বুঝে লিখবে। না বুঝে কিছু লিখো না—অবুদ্ধা মা লিখ ক্বচিৎ।

মহাভারত-পাঠকের কাছে এই কথাটা একটা 'মেসেজ'। পণ্ডিতেরা অনেকেই বলেন যে, মহাভারতের রচনা নিয়ে এ গল্প তৈরি হয়েছে অনেক পরে। আমরা বলি—তা হতেও পারে।

কিন্তু মহাভারত পাঠের ক্ষেত্রে এ ‘মেসেজ’টা জরুরি। মহাভারতে বলা হয়েছে যে, গণেশকে মাঝেমধ্যেই চিন্তিত মস্তিষ্কে বসিয়ে রাখার জন্য ব্যাস তাঁর লেখার মধ্যে এখানে ওখানে কতকগুলি কূট সমস্যা উপন্যস্ত করলেন এবং সেই সমস্যা যখন বোঝার চেষ্টা করছেন গণেশ, সেই অবসরে ব্যাস শ্লোক রচনা করে চললেন নিরর্গল। এ গল্প বুঝতে অসুবিধে নেই। মহাভারতের মধ্যে যে ব্যাসকূট আছে, সেগুলো বুঝতে গেলে সময় লাগবে, তাও বুঝি। কিন্তু ওই যে ব্যাস বলেছিলেন—অবুদ্ধা মা লিখা ক্বচিৎ—না বুঝে লিখে না বাপু—এই নির্দেশটা শুধু বহুকথিত ব্যাসকূট সম্বন্ধেই খাটে না, তা খাটে মহাভারতের বহু বিচিত্র বিষয়ের ক্ষেত্রেই— যেখানে পাঠককে থামতে হবে, তাঁকে স্মরণ করতে হবে বৈদিক পরম্পরা, সমসাময়িক সামাজিক সমস্যা, রাজনৈতিক সমস্যা, ধর্ম, সত্য এবং সর্বোপরি মানুষের গভীর গহন মনের বিচিত্র গতিপ্রকৃতির কথা। থামতে হবে ব্যাস-জননী সত্যবতীর সঙ্গে মহর্ষি পরাশরের কুজ্ঝটিকা-মিলনের সময়, থামতে হবে ক্ষত্রিয় কৌরববংশে যখন ব্যাসের রক্ত সংক্রমিত হবে বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রে। পাণ্ডব-কৌরবের জ্ঞাতিবিরোধ যখন তুঙ্গে উঠবে, কুলবধূ দ্রৌপদীকে যখন টেনে আনা হবে রাজসভায় তখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দিকে অসহায়ভাবে তাকাতে হবে এবং ঠিক তখনই বিচার করতে হবে দ্রৌপদীর তর্কযুক্তি এবং প্রতিবাদের। ভুলে গেলে চলবে না সেই মুহূর্তের বিদুরকেও—যাঁর জন্মে ব্যাস আনন্দিত হয়েছিলেন এবং যে কৌরবসভায় বিদুর ছিলেন একক প্রতিবাদী।

এইরকম শত শত স্থানে আপনাকে থামতে হবে এবং বিচার করতে হবে ব্যাস প্রযুক্ত শব্দবন্ধের মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা, নইলে আজকের এই যান্ত্রিক যুগে বসে মহাকবির অযান্ত্রিক মন বুঝে ওঠা নিতান্তই দায় হয়ে উঠবে। যে মহাকবি আজ থেকে দু-আড়াই হাজার বছর আগে বুঝেছিলেন—মানুষের চেয়ে বড় কিছু নেই—ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ—তাঁর কবিহৃদয় যদি বুঝতেই হয়, তবে তাঁর শব্দ, অলঙ্কার, ভাব, রস এবং সামাজিক, রাজনৈতিক টিপ্পনীগুলি থেমে থেমেই বুঝতে হবে, নইলে আধুনিক পণ্ডিত সম্প্রদায়ের অতিসরলীকৃত মন্তব্যের জেরে অতিসাধারণ ঘটনা অতি-গুরু হয়ে উঠবে, আর অতি-গম্ভীর বস্তু অতি-লঘুতায় পর্যবসিত হবে।

প্রথমেই আমার ভুল হল। আমি ব্যাসের কথা বলতে গিয়ে মহাভারতের কথা বলতে আরম্ভ করেছি। আসলে এ ভুল আমার ইচ্ছাকৃত। ব্যাসের কথা না উঠলেই মহাভারতের কথা না বলে ব্যাসের কথা বলাই যায় না।

একই সঙ্গে মনে রাখা দরকার, মহাভারতই ব্যাসের একমাত্র কীর্তি নয়। ব্যাসের প্রথম কৃতিত্ব—তিনি বেদ বিভাগ করেছিলেন। বেদ বিভাগ ব্যাপারটা সাধারণজনে কেউ বোঝেনই না, বোঝেনই না যে, এটা কত কঠিন কাজ। লোকে যাকে চতুর্বেদ বলে, এই চার রকমের বেদ আগে ছিল না। বেদ ছিল একটাই। মন্ত্র, গান, যজ্ঞীয় কর্ম সব মিলেমিশে একাকার ঘণ্ট পাকিয়ে ছিল। সেই পিণ্ডিত বস্তু থেকে মন্ত্রাংশগুলি বেছে ঋগ্‌বেদ, গেয় অংশগুলি পৃথক করে সামবেদ, আহুতি দেবার কাজে লাগে এমন মন্ত্ররাজি নিয়ে যজুর্বেদ এবং মারণ, উচাটন, অভিচার, শান্তিক্রিয়া এবং খানিকটা রাজধর্মের বিষয়বস্তু নিয়ে অথর্ব বেদকেও যে পৃথক করে ফেলা হল—এই কঠিন কাজটা করেছিলেন ব্যাস। সেই জন্যই তাঁর নাম বেদব্যাস।

এই যে পৃথক করার পদ্ধতি, একে ইংরেজিতে বোধহয় ‘এডিটিং’ বলা চলে। এই এডিটিং-এর কাজ অনেক আগেই আরম্ভ হয়েছিল। যাঁরা একটু একটু করে বেদকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সাজাচ্ছিলেন, তাঁদেরই ব্যাস বলা হয়েছে এবং সেই কারণেই আমরা অন্তত আটাশ জন ব্যাসের নাম পেয়েছি বিষ্ণুপুরাণে। কিন্তু সমস্ত ব্যাসদের থেকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের পার্থক্য হল—তিনি নিশ্চয়ই পূর্বসূরিদের প্রারব্ধ কার্য অত্যন্ত যোগ্যতার

সঙ্গে এবং আরও সুষ্ঠুভাবে শেষ করেন। ফলত বেদ বিভাগকর্তা হিসেবে অন্য সব ব্যাসের নাম চাপা পড়ে গেল এবং একা নিজের যোগ্যতায় টিকে রইলেন শুধু মহামুনি ব্যাস। তাঁর গুরুত্ব আরও বেড়েছে এই কারণে যে, বেদ বিভাগ করেই ব্যাস বসে ছিলেন না, তাঁর ভাবনা, রীতি, পদ্ধতি তিনি বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করলেন তাঁর চারজন শিষ্যের মাধ্যমে। অর্থাৎ বেদের বিভাজন তত্ত্বত এবং তর্কত প্রতিষ্ঠা করে তিনি তাঁর প্রায়োগিক উপচারটুকুও দেখিয়ে গেছেন শিষ্যদের দ্বারা প্রচার করে। পৈল নামে ব্যাসের যে শিষ্যটি, তিনি ব্যাসের বেদ বিভাজন মেনে ধারণ করলেন ঋগ্‌বেদ। জৈমিনি গ্রহণ করলেন সামবেদ। বৈশম্পায়ন পেলেন যজুর্বেদ এবং সুমন্তু পেলেন অথর্ববেদ।

এই চার প্রধান শিষ্য ছাড়াও আরও একজন সম্পূর্ণ বেদ-শিক্ষা লাভ করলেন। তিনি ব্যাসপুত্র শুকদেব। শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে পৈল, জৈমিনি, বৈশম্পায়ন এবং সুমন্তু একান্তে ব্যাসের কাছে বিনীত প্রার্থনা জানিয়ে বললেন—আমরা এই আপনার চার শিষ্য, আর আছেন আমাদের গুরুপুত্র শুকদেব। সম্পূর্ণ বেদ যেন এই পাঁচ জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আপনার ষষ্ঠ কোনও শিষ্য যেন এ ব্যাপারে অধিকারী না হয়—ষষ্ঠো শিষ্যো ন তে খ্যাতিং গচ্ছেদত্র প্রসীদ নঃ।

শিষ্য যদি অত্যন্ত উপযুক্ত তথা গুরুর অতি প্রিয় হয়, তবে গুরুরা তাঁদের আবদারও রাখেন। অতিপ্রিয় বিদ্যার্থীর প্রতি গুরুর এই পক্ষপাত আগেও যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে, ভবিষ্যতেও তেমনই থাকবে। কিন্তু বিশালবুদ্ধি ব্যাস বলেই হয়তো শিষ্যদের ওই বিনীত অনুরোধ তিনি স্বীকারও করলেন একভাবে, আবার অস্বীকারও করলেন বোধহয়। কেননা অন্যান্য প্রার্থিত বরদানের ক্ষেত্রে যেমন বহুশ্রুত 'তথাস্তু', 'তাই হোক'—শব্দগুলি শোনা যায়, ব্যাস তেমন কিছু বললেন না। তিনি নিজে আর কাউকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করবেন না—এ কথা স্পষ্টত উচ্চারণ না করেও যে কথা আরও স্পষ্ট করে বললেন, তার মানে দাঁড়ায়—আমি না হয় আর কোনও শিষ্য গ্রহণ করলাম না, কিন্তু তাই বলে বেদবিদ্যাকে আবদ্ধ করে রাখা চলবে না। তাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। বরঞ্চ তোমরা পাঁচ জনেই অনেক হও—তোমাদের শিষ্য-প্রশিষ্যের পরম্পরায় বিস্তারিত হোক এই বেদবিদ্যা—ভবন্তো বহুলাঃ সন্তু বেদো বিস্তার্য্যতাময়ম্।

চিরকাল শুধু এই শুনেছি—বেদকে গোপনে রাখো। নিজে জানো এবং জিতেন্দ্রিয়, সদাচারী, শুশ্রূষু ব্রাহ্মণকে জানাও। এ কথা ব্যাসও তাঁর সমকালীন সমাজের তাগিদে অস্বীকার করেননি। কিন্তু বাড়তি একটি নতুন কথা তাঁর মুখে আমরা শুনেছি। ধর্মশাস্ত্র এবং অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্রে বার বার বলা হয়েছে—শূদ্রের সামনে বেদ পড়বে না, বেদের একটি বর্ণও যেন তাঁদের কর্ণগোচর না হয়। চিরন্তন ব্রাহ্মণ সমাজ এই বাক্য মস্তকে ধারণ করে বেদের মর্যাদার সঙ্গে আপন মর্যাদাও বৃদ্ধি করেছেন বেদকে গোপন গহনে আবদ্ধ রেখে। কিন্তু মহাভারতে এই প্রথম ব্যাসের মুখে শুনলাম যে,—হ্যাঁ নিশ্চয়ই, ব্রাহ্মণকে তো সামনে রাখতেই হবে। শুদ্ধাচার সদাচার এবং পরম জ্ঞানের ধারক এবং বাহক যাঁরা সেই ব্রাহ্মণরা প্রমুখ আসনে বসে থাকুন, কিন্তু তাঁদের সামনে রেখে চতুর্বর্ণকেই বেদ শ্রবণ করাতে হবে—শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্ কৃত্বা ব্রাহ্মণমগ্রতঃ।

আমরা তো চিরকাল শুনেছি—বেদ-শ্রবণে শূদ্রের কোনও অধিকার নেই, স্ত্রীলোকেরও অধিকার নেই; কিন্তু কই, ব্যাস তো তা বললেন না। তিনি যে বললেন—বেশ তো, বামুনকে সামনে রাখো, তবে চতুর্বর্ণকেই বেদ শোনাও। বেদকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন ব্যাস। সবার মধ্যে আসমুদ্র-হিমাচল, আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্যন্ত—বেদো বিস্তার্য্যতাময়ম্। আমরা জানি, ব্যাস এই রকমই চাইবেন, কেননা এই চাওয়ার পিছনে তাঁর নিজের জীবন আছে; আর আছে কবিজনোচিত বেদনাবোধ। তাঁর পিতা মহামুনি পরাশর বটে, কিন্তু মাতা সত্যবতী! তিনি তো

ধীবরগৃহে লালিতা, ধীবরকন্যা বলেই পরিচিত। জননীর হৃদয় ব্যাসের মতো মহাকবি অস্বীকার করবেন কী করে? আপনার মধ্যে সদা-প্রবহমান তাঁর শোণিতবিন্দু অস্বীকার করবেন কী করে? মনুমহারাজের রক্তিম শাসন তাঁর জানা ছিল। মনু বলেছিলেন—যে ব্রাহ্মণ একবার শূদ্রার অধররস পান করিয়াছে—বৃষলীফেনপীতস্য—কিংবা তাহার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিয়াছে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও ফল নাই।

ব্যাস জানেন—তাঁর জন্মলগ্নে এই প্রায়শ্চিত্তের অতীত অপরাধ ঘটেছিল, কিন্তু মহামুনি বলে তাঁর পিতা সর্বভুক্ বহ্নির মতো আপন তেজে দীপ্যমান থাকলেও তাঁর শূদ্রা জননীর সতত কম্পমান হৃদয়টুকু তিনি অনুভব করতে পারেন। তা পারেন বলেই পিতা পরাশরের সাগ্নিক ব্রাহ্মণ্য যেমন তাঁর লেখনীর মধ্যে ক্রিয়া করে, তেমনই শূদ্রা ধীবরজননীর সমাজ-ভয়-ভীত কম্প্র শোনিতবিন্দুগুলিও তাঁর অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে। সেই কতকাল আগে তাঁর জন্ম হয়েছিল, তারপর যুগ-যুগান্তের ওপার থেকে তাঁর সম্বন্ধে লোকে বলেছে—কী আর করবে বল, যাঁরা পুরাণ লিখে গেছেন, তাঁদের ব্যভিচার, কেচ্ছার কথা ভেবে লাভ নেই। দেখো না, মহাভারত লিখেছেন, পুরাণ লিখেছেন, অত বড় সম্মানী মানুষ যে ব্যাস, তাঁর বাবাও ছিলেন ব্যভিচারী, তিনি নিজেও ছিলেন ব্যভিচারী—পুরাণকর্তা ব্যভিচারজাত স্তস্যাপি পুত্রো ব্যভিচারজাতঃ—ব্যভিচারের ফলেই ব্যাসেরও পুত্রজন্ম।

আমাকে অনেকেই এসব কথা বলেন। বলেন—মশাই! আর বলবেন না। আপনাদের মুনি ঋষিরা এত তপস্যা, সংযম আর ব্রত-নিয়ম পালন করে এক-এক জন মুহূর্তের বিভ্রমে মেনকা-রম্ভার মতো অপ্সরাদের যেভাবে ভোগ করে গেছেন, তাতে আর তপস্যা-নিয়মাচারের উপকার এবং মূল্য কিছু আছে বলে মনে হয় না। খুব সংক্ষেপে হলেও লৌকিক এবং অলৌকিক—দুইভাবেই মুনিঋষিদের ওই তথাকথিত অসংযমের ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। ষোড়শ খ্রিস্টাব্দের দার্শনিক-ধুরন্ধর শ্রীজীব গোস্বামী বলেছেন—প্রারব্ধ কর্ম এমনই বস্তু, এমনই অলক্ষণীয় তার নিয়ম যে, মুনি ঋষি, সাধুপুরুষেরা জ্ঞান, তপস্যা অথবা ঈশ্বরকৃপার বলে তা লঙঘন করার ক্ষমতা রাখলেও, তা লঙঘন করেন না। ফলে মুনি-ঋষিদের মধ্যেও 'দগ্ধপটবৎ' কতগুলি 'কষায়' অবশিষ্ট থেকে যায়, যা কখনও তাঁদের ভোগসুখেরও সৃষ্টি করে, আবার কখনও বা রোগভোগও। দুটোই তাঁদের কাছে একইরকম, কেননা পুণ্য এবং পাপ দুটিই বন্ধন এবং ভোগের কারণ। পুণ্যের ফল সুখ ভোগ, পাপের ফল রোগব্যাধি ভোগ। এইভাবে প্রারব্ধ কর্মের ভোগটুকু যে ঘটে, সেটা বিশিষ্ট সাধুপুরুষেরা অস্বীকার করেন না। ঠিক এই কারণেই মেনকা-রম্ভার মতো অপ্সরা-সম্ভোগও যেমন তাঁদের কপালে জুটেছে কখনও, আবার কখনও বা জুটেছে কঠিন রোগব্যাধির দুর্ভোগ। সাধুপুরুষ এই দুটোকেই সমদৃষ্টিতে দেখেন।

আবার লৌকিক দৃষ্টিতে কথাটা ভাবুন একটু। সারা জীবন ব্রত-নিয়ম, সদাচার, তপস্যা যাঁরা করেন, তাঁরাও তো মান। রক্তমাংসের তৈরি ইন্দ্রিয়বৃত্তিসম্পন্ন মানুষ। ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে শুষ্ক রুক্ষ মুনিবৃত্তিতে যাঁদের জীবনে সায়াহ্ন গড়িয়ে যায়, তাঁদের কেউ যদি কখনও বসন্তের উতলা হাওয়ায় আন্দোলিত হয়ে ক্ষণিকের জন্যও অসংহত হয়ে পড়েন, তা হলে সেটা কি খুব অস্বাভাবিক! নাকি সেটাই পরম দোষের? সাধারণ জন, যারা সর্বক্ষণই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আহার জুটিয়ে জুটিয়েই ইন্দ্রিয়বৃত্তি শিথিল করে ফেলেন, তারা এমনই মজার মানুষ যে, মুনি ঋষি এবং সাধুপুরুষের এই ক্ষণিকের অসংযম বা বিচ্যুতির ওপরেই সমস্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাঁদের সারা জীবনের জ্ঞানতপস্যা সাধারণের কাছে এক মুহূর্তেই মূল্যহীন হয়ে যায়।

একটা জিনিস এরা বোঝে না যে, জীবনভর ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করে একদিন কি দশদিন উপবাস আর গীতাপাঠ করে যেমন সংযমী সাধু বনে যাওয়া যায় না, তেমনই সারা জীবন

যাঁরা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করে জ্ঞান আর তপস্যার তেজে দীপ্র হয়ে উঠেছে, একদিন কি দশদিনের অসংযমে তাঁদের জ্ঞানতপস্যার আলো ক্ষণিকের জন্য আবৃত হলেও তা লপ্ত হয়ে যায় না। যেতে পারে না, কোনও যুক্তিতেই তা যেতে পারে না।

পিতৃশ্রাদ্ধের সময় দশ দিন মাত্র হবিষ্যি খাওয়ার পর মৎস্যমুখীর দিন দশ-দিবস-সংযত সেই পুরুষ যখন হামলে মাছমাংস খায়, তখন সে কিন্তু বোঝে না যে, জীবনভর যাঁরা ব্রত-নিয়ম-সংযম পালন করেছেন, সেই বৈরাগী পুরুষ যদি ভোগলালসায় দশ দিনও মত্ত হন তব একাদশ দিনেই তাঁর অনুতাপ আসবে—এ আমি কী করলাম। সারা জীবন ঈশ্বর আরাধনা করে, এ আমি কী করলাম! এই অনুতাপই তাঁর তমসাবৃত জ্ঞানকে আবারও পুনরুন্মীলিত করে। নষ্ট জ্ঞান পুনর্লব্ধ হয় তখনই।

আরও একটা অদ্ভুত ঘটনা এখানে লক্ষ করার মতো। পুরাণ-ইতিহাসে যতবারই আমরা মুন ঋষিদের কামনা বাসনায় লুপ্তসংও হতে দেখছি, একেবারে সর্বক্ষেত্রে না হলেও বেশির ভাগ সময়েই দেখা যাচ্ছে, কামনা তৃপ্ত হতেই তাঁরা চলে যাচ্ছেন। তাঁরা থাকছেন না অথবা ঘরসংসার পেতে মায়াময় মধুচক্র রচনা করছেন না। অর্থাৎ মুহূর্তের জন্য যে বিচ্যুতি ঘটল, মুহূর্তের মধ্যেই তা কাটিয়ে উঠছেন তাঁরা। বলতে পারেন, আধুনিকের তীক্ষ্ণতায় আপনি বলতেই পারেন—এ আবার কেমন ব্যবহার? এ তো মধুকর বৃত্তি! যে রমণীকে তিনি পথভ্রষ্ট করছেন, যাঁর কুমারীত্ব তিনি লঙঘন করছেন, তাঁর কথা চিন্তা করে সেই সব মুনি ঋষিদের তো উচিত ছিল যাতে মহূর্তের মিলন এক দায়িত্বপূর্ণ বৈবাহিক সম্পর্কে রূপান্তরিত হয়।

আজকের সামাজিক ভাবনায় কথাটা খুব অযৌক্তিক নয় এবং যুক্তি দিয়ে মুনি ঋষিদের ওই আকুল ব্যবহারের প্রতিষ্ঠাও করা যাবে না, কেননা পৃথিবীতে বিবাহপূর্ব কোনও মিলনের মধ্যেই অথবা বৈবাহিক সম্পর্কহীন কোনও মিলনের মধ্যেই তৎকালীন আকুলতা এবং ভালবাসা ছাড়া অন্য কোনও যুক্তি থাকে না। তা ছাড়া ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং দার্শনিকতার যুক্তি ছাড়া মুনি ঋষিদের অন্য সব ব্যবহারে খুব যুক্তিপূর্ণ সাংসারিক আচরণও লক্ষ করা যায় না। অভিশাপ এবং বরদানের ক্ষেত্রগুলিতেও বৃহত্তর কোনও অভীষ্ট সম্পন্ন হয়ে থাকলেও মুহূর্তের বিচারে মুনি ঋষিদের অভিশাপ এবং বরদানও সব সময় সযৌক্তিক হত না।

আসলে সারা জীবন যাঁরা ত্যাগ-বৈরাগ্যের সাধনে যুক্ত থাকতেন, তাঁরা যদি বসন্তের উতলা হাওয়ার তাড়নায় কখনও যদি বা মার্গভ্রষ্ট হতেনও, তবু মায়াময় সংসারসুখে মত্ত হয়ে ওঠাটা তাঁদের ধাতেও সইত না, জ্ঞান-তপস্যার দৃষ্টিতেও সেই মায়ার বন্ধন ছিল তাদের কাছে অন্য এক প্রতিবন্ধকতার সামিল। ঠিক এই কারণেই দেখবেন, বেশির ভাগ সময়েই—মিলন সম্পূর্ণ হলেই মুনি ঋষিরা আর সেখানে থাকছেন না, তাঁরা ফিরে যাচ্ছেন নিজেদের ব্রত-নিয়মের আসনে। পুরাণে-ইতিহাসে অবশ্য যেসব রমণীদের সঙ্গে ঋষি মুনিদের হঠাৎ সঙ্গত হতে দেখছি, সেই সব রমণীদের মধ্যে অধিকাংশই হলেন অপ্সরাজাতীয়—উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী অথবা মিশ্রকেশী।

অপ্সরারা মূলত অভিজাত গণিকা বলে পরিচিত এবং প্রায় সব সময়েই তাঁরা অন্যের প্ররোচনায় মনি ঋষিদের ধ্যানভঙ্গ করার অপকর্মে লিপ্ত হতেন এবং তাঁদের তাঁরা প্রলুব্ধ করতেন শারীরিক প্রলোভনে। এসব ক্ষেত্রে মুনি ঋষিদের দোষ দেবেন কী করে? সাময়িক শারীরিক মুক্তি ঘটানো মাত্রেই এসব ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেদের ওপর নিজেরাই ক্ষুব্ধ হতেন এবং সেই ক্রোধের ফল ভুগতে হত প্রলোভিকা রমনীকেও। কিন্তু এইসব ক্ষেত্র ছাড়া আর যে সব জায়গায় মুনি ঋষিদের শারীরিক মিলনে তৃপ্ত হতে দেখছি, সেই সব জায়গায় মহৎ এবং বিশাল সৃষ্টিরই দ্যোতনা আছে। অনেক সময় কন্যাত্ব লঙ্ঘিত হলেও এমন মহান পুরুষের অথবা এমন কন্যারও জন্ম সম্পন্ন হচ্ছে, যাকে অভ্যুদয় ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

মহাভারতের সৃষ্টিকর্তা ব্যাসও এই পৃথিবীতে এক বিশাল অভ্যুদয়। অবশ্য উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, কেউ সেদিন মহামুনি পরাশরের ধ্যান ভঙ্গ করতে আসেননি। অন্য আর সব দিনের মতই তীর্থ-পরিক্রমণ করতে করতে মহর্ষি পরাশর সেদিন খেয়াঘাটে এসেছিলেন নদী পার হবার জন্য। কিন্তু প্রতিদিন যে খেয়া পারাপার করে, সেই মানুষটি সেদিন উপস্থিত ছিল না। সে জাতিতে ধীবর। হয়তো মৎস্যজীবিকার কারণেই সে অন্যত্র ব্যস্ত ছিল। তা ছাড়া দিনের এই শেষভাগে যাত্রীও তেমন থাকে না বলে সে তার পালিতা কন্যাটিকে নৌকো চালানোর ভার দিয়ে অন্য কাজে গিয়েছিল। ধীবরের কন্যার নাম সত্যবতী, মৎস্যজীবীদের আশ্রয়ে বেড়ে ওঠার ফলে তার গা দিয়ে আঁশটে গন্ধ বেরোয়। ফলে মৎস্যগন্ধা বলেও লোকে তাকে ডাকে। তবে সাধারণ ঘরে কালো মেয়ে জন্মালে যেহেতু অনেক সময় এখনও তার ডাকনাম হয় কালী, তাই কালীই ছিল তার আদরের ডাকনাম।

গায়ের রং কালো বটে, কিন্তু সে অতিশয় সুন্দরী। তার রূপের মাদকতা ছিল এতটাই যে, পুত্র হয়েও ব্যাসকে লিখতে হয়েছে—সে রূপ তপঃসিদ্ধ মুনি ঋষিদেরও মনোহরণ করে—অতীবরূপসম্পন্নাং সিদ্ধানামপি কাঙিক্ষতাম্। বাস্তবেও তাই হল। কেননা পরাশর তীর্থযাত্রার কারণে নদীতীরে উপস্থিত হয়ে একাকিনী সত্যবতীকে নৌকোর ওপর বসে থাকতে দেখেই মনে মনে আকুল আকর্ষণ বোধ করলেন তার প্রতি—দৃষ্ট্বৈব স চ তাং কন্যাংশ্চকমে চারুহাসিনীম্। অবশ্য এই আকর্ষণের এক অতিবাস্তব নিমিত্তকারণ ছিল। পরাশরকে যাত্রী হিসেবে পেয়ে নৌকোয় বসা সত্যবতী স্মিতহাস্যে তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল নৌকোয় বসার জন্য। এই ভুবনমোহিনী আমন্ত্রণী হাসির সঙ্গে তার কদলীস্তম্ভসদৃশ উন্মুক্ত ঊরুস্থল মহর্ষি পরাশরের মনে যে অন্য আবেদন তৈরি করেছিল রমণী হয়তো তা তেমন করে বোঝেনি। কিন্তু পরাশরের কাছে এটাই হয়তো ছিল প্রকৃত আমন্ত্রণ। অন্তত সেই মুহূর্তে।

অন্য সময় হলে কী হত। ঋষি আসতেন, নৌকোয় উঠতেন এবং নদীর ওপারে চলে যেতেন। কিন্তু এখন তা হল না। তরুণী রমণীর সঙ্গে প্রথম দেখা এবং ভাল লাগার পর এখনও যেমন তরুণ পুরুষ ভাব জমানোর ইচ্ছেতেই শুধু অনর্থক বাক্য সৃষ্টি করে, বয়স্ক প্রাচীন ঋষির ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হল না। কারণ স্ত্রীলোকের মন যাচাই করার জন্য প্রথম আলাপচারিতার লক্ষণ চিরকালই একরকম। পরাশর বললেন—হ্যাঁগো সুন্দরী! এখানে প্রতিদিন যে নৌকো বেয়ে ওপারে নিয়ে যায়, সেই নেয়ে গেলেন কোথায়—ক্ব কর্ণধারো নৌর্যেন নীয়তে ব্রূহি ভামিনি। মৎস্যগন্ধা সত্যবতী অত্যন্ত 'স্মার্ট'। পুরুষের প্রশ্ন শুনে লজ্জাবতী লতার মতো সে এলিয়ে পড়ল না। বলল—আমার পিতা ধীবরদের মুখ্য পুরুষ। কিন্তু তাঁর ছেলে নেই। আমিই তাঁর একমাত্র মেয়ে। তবে মেয়ে বলে নৌকো নিয়ে ওপারে যেতে পারব না, এমন ভাববেন না যেন। হাজার মানুষ এলেও আমি তাঁদের এই নৌকোয় উঠিয়ে পার করে দেব ঠাকুর।

এমন সপ্রতিভ জবাবের জন্য বোধহয় প্রস্তুত ছিলেন না ঋষি। তিনি ঠেকে গিয়ে বললেন—না না, সে তো বেশ ভাল কথা। তা হলে আর দেরি কীসের, নৌকো ছেড়ে দাও। আজকে তোমার খেয়াতরীর শেষ যাত্রী হলাম আমি। তুমি নৌকো ছাড়ো—অহং শেষো ভবিষ্যামি নীয়তামচিরেণ বৈ। মৎস্যগন্ধা সত্যবতী নৌকো ছেড়ে দিল। যমুনার নীল জলে নৌকো চলতে লাগল তির তির করে। প্রথম সন্ধ্যার অস্তরাগ কালো যমুনার জলের মধ্যে যদি কোনও মায়া সৃষ্টি করে থাকে, তবে সেই অনুরাগবতী সন্ধ্যা তার রক্তিম আভাটুকু সত্যবতীর কৃষ্ণকান্তি কপোলেও সঞ্চারিত করেছিল। কারণ স্ত্রীলোকের স্বভাবসিদ্ধ তৃতীয় নয়নে সত্যবতী দেখতে পাচ্ছিলেন—মহর্ষি পরাশর সতৃষ্ণ নয়নে তাঁর কদলীস্তম্ভসদৃশ উন্মুক্ত ঊরুস্থলের দিকে দৃষ্টিপাত করছেন, দৃষ্টিপাত করছেন তাঁর শরীরের উচ্চাবচ সংস্থানের প্রতি—বীক্ষমাণং মুনিং দৃষ্টা প্রোবাচেদং বচস্তদা।

রমণীমাত্রেই পুরুষের এই দৃষ্টিপাতের অর্থ বোঝে। সত্যবতী মহর্ষির সানুরাগ দৃষ্টিটুকু বুঝতে পারলেন এবং তাঁকে খানিকটা অন্যদিকে চালনা করার জন্যই বললেন—মহর্ষি! আমি ধীবররাজার মেয়ে। তাঁর কাছেই আমি মানুষ হয়েছি। লোকে আমাকে মৎস্যগন্ধা বলে ডাকে। আমার আসল বাবা-মা কে, তাও আমি জানি না। সে জন্য অনেক দুঃখও আছে আমার মনে। আপনি কি জানেন সেসব কথা? দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি পরাশর মৎস্যগন্ধার পূর্বজন্মের ইতিহাস শোনালেন। এই পূর্বজন্মের ইতিহাসের মধ্যে হয়তো সত্যবতীর জন্মগরিমা কিছু বেড়েছে। ধীবরদের জাতি-নিম্নতার পরিবর্তে সত্যবতীর জন্ম সম্বন্ধে খানিকটা রাজরক্ত এবং খানিকটা দৈবাবেশ ঘটেছে পরাশরের বক্তব্যে। কিন্তু পরাশরের বয়ান এবং তাঁর সঙ্গে সত্যবতীর প্রথম মিলনের সময় এইসব জাতি-তত্ত্বের বিচার শুনে মনে হয়—এই বৃত্তান্ত যেন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অর্থাৎ ওই মুহূর্তে যেন এসব কথা আসে না এবং ভবিষ্যতে মহাভারতের রচয়িতা ব্যাসের জননী হয়েছেন বলেই যেন সত্যবতীর জন্মকথা পরিবেশন করতে হয়েছে নতুনভাবে মহিমান্বিত করে। হয়তো স্বয়ং ব্যাসের রচনায় এই কাহিনী ছিল না, কিন্তু পরবর্তী কালে ব্যাসের প্রতিভা এবং অমানুষী ক্ষমতার নিরিখে অন্য কোনও মহাজন ব্যাসজননীর পূর্ব-জন্মমাহাত্ম্য খ্যাপন করেছেন স্বয়ং ব্যাসপিতা পরাশরের মুখ দিয়ে। বোঝাতে চেয়েছেন, যেন ব্যাসের মতো মহাকবি এবং দার্শনিক কোনও অনভিজাত গর্ভের জাতক হতে পারেন না।

আমাদের আধুনিক বুদ্ধিতে আমরা যা বুঝি, তাতে আমরা ব্যাসের রচিত কাহিনীর মূল ধারাই অনুসরণ করব। আমরা সেই যমুনার তরঙ্গবাহিত নৌকাটির ওপরে ফিরে যাব, যেখানে মহর্ষি পরাশরকে সত্যবতীর যৌবনোদ্ধত অঙ্গসংস্থানের ওপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে দেখেছি। পরাশরের সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে সত্যবতী খানিকটা সংকুচিত বোধ করতেই মুনি অত্যন্ত ভদ্রভাবে তাঁর কাছে সবিনয় প্রার্থনা জানিয়ে বলেছেন—আমি তোমার কাছে একটি পুত্রসন্তান কামনা করি, ভদ্রে—যে পুত্র আমার বংশধারা রক্ষা করবে, আর সেই জন্যই আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গত হতে চাই, কল্যাণী—সঙ্গমং মম কল্যাণি কুরুষ্বেত্যভ্যভাষত।

সত্যবতী তাঁর স্ত্রীজনোচিত অনুভবে পরিষ্কার বুঝতে পারছিলেন যে, মহর্ষি কী চান। তবু মহর্ষির ব্যবহারে কোনও কামোন্মত্ততা ছিল না, ছিল না সেই তাড়াহুড়ো যাতে কোনও বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়। তিনি তাঁর ঈপ্সিত কামনা অপরিস্ফুট রাখেননি এবং সেই ঈপ্সা নিবেদন করেছেন অলঙ্ঘ্য এক যৌক্তিকতায়—তিনি একটি বংশরক্ষক পুত্র চান—যাচে বংশকরং সুতম্। অর্থাৎ শুধুই কামচরিতার্থতা নয়, সেকালের দিনের সামাজিকতার নিরিখে এই পুত্রলাভের আকাঙ্ক্ষা নিতান্তই এক ধর্মীয় প্ররোচনা, যার গৌণফল রতিলিপ্সা। সত্যবতী যতখানি সুন্দরী, ততখানিই বুদ্ধিমতী। পরাশরের মিলনেচ্ছাকে তিনি সযৌক্তিভাবেই গ্রহণ করেছেন, কিন্তু রমণীর স্বাভাবিক সলজ্জ প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেছেন—কীভাবে এই শরীর-সঙ্গম সম্ভব হবে, মহর্ষি! যমুনার পরপারে আরও কত মুনি ঋষিদের দেখা যাচ্ছে। আপনার দিকেও তাঁরা চেয়ে রয়েছেন এবং হয়তো আপনার নির্বিঘ্ন নদী-তরণের প্রতীক্ষাতেই এই চেয়ে থাকা। কিন্তু এইভাবে তাঁরা আমাদের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলে কীভাবেই বা আপনার ঈপ্সিত মিলন সম্ভব—আবয়ো-র্দৃষ্টয়ো-রেভিঃ কথং নু স্যাৎ সমাগমঃ! পরাশর বুঝলেন—তাঁর ঈপ্সিত মিলন সত্যবতী প্রত্যাখ্যান করেননি, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করেননি বলেই পৌরুষেয়তার তাড়নায় যা ইচ্ছে তাই করা যায় না। সত্যবতীর মান, সম্ভ্রম এবং তাঁর স্ত্রীজনোচিত লজ্জার সম্মান রাখবার জন্য তপঃসিদ্ধ মুনি এবার আপন যোগপ্রভাবে নিজেদের চারিদিকে ঘনিয়ে নিলেন ঘন কুয়াশার আবরণ। মনে হল যেন যমুনাতরঙ্গবাহিনী নৌকোর চারদিকে নেমে এল ঘন অন্ধকার প্রেমনত নয়নের দীর্ঘচ্ছায়াময় পল্লবের মতো—যেন দেশঃ স সর্বস্তু তমোভূত ইবভবৎ।

মহর্ষির অলৌকিক যোগপ্রভাবে ঘন নীহার সৃষ্টি হতে দেখে সত্যবতী বুঝলেন যে, মহর্ষির

প্রতীক্ষিত মিলন কোনওভাবেই আর বিলম্বিত করা যাবে না। এবারে তাঁর মনে একটু শঙ্কা হল। মনের মধ্যে জেগে উঠল প্রখর বাস্তব। তাঁর কথার সম্মান রেখেই মুনি এই ঘন নীহারিকার সৃষ্টি করেছেন, এখন তাঁর কথা না শুনলে তিনি যদি অভিশাপ দেন! আবার মুনির কথামতো তাঁর সঙ্গে মিলিত হলে এবং গর্ভবতী হলে ঘরে তাঁর পিতা কী বলবেন? এক দিকে মুনির অভিশাপ, অন্য দিকে পিতার তিরস্কার—যুগপৎ এই দুই ভয়ে সত্যবতী বেশ সন্ত্রস্ত বোধ করলেন এবার—তমহং শাপভীতা চ পিতুর্ভীতা চ ভারত।

কুমারীর মনে এ এমনই এক সন্ত্রাস, যা কিছুতেই চেপে রাখা যায় না। সত্যবতী তাই সবিনয়ে ঋষিকে জানালেন—মহর্ষি! আমি কুমারী এবং পিতার অধীন। আপনার সঙ্গে যদি এইভাবে মিলিত হই, তবে লঙ্ঘিত হবে আমার কুমারীত্ব, সেই অবস্থায় আমি ঘরে ফিরব কী করে, বাঁচবই বা কী করে? আমার ভয় করছে ঋষি! আমি ঘরে ফিরে যেতে চাই—গৃহং গন্তুমৃষে চাহং ধীমন্ ন স্থাতুমুৎসহে। আমার সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব বিবেচনা করে আপনি যা করবার হয় করুন। সত্যবতীর কথায় পরাশর অসন্তুষ্ট হলেন না। বরঞ্চ খুশি হয়ে বললেন—আমার প্রিয়কার্য সম্পন্ন করার পর তুমি আবারও কুমারীত্ব লাভ করবে। কোনও ভয় নেই তোমার। এ ছাড়া আরও যদি তোমার ইচ্ছে কিছু থাকে তো বলো, আমি পূরণ করব।

আগেই বলেছি, মৎস্যজীবীদের ঘরে মানুষ হওয়ায় সত্যবতীর গায়ে মাছের আঁশটে গন্ধ বেরোত। অন্য রমণীদের সঙ্গে নিজের তুলনা করে, এই গন্ধ নিয়ে নিশ্চয় বিব্রত হতেন তিনি। অতএব পরাশরের কাছে বর চাইবার সময় তিনি আর অন্য কিছু খুঁজে পেলেন না। তাঁর গায়ে যাতে উত্তম সুগন্ধের সৃষ্টি হয়—শুধু এইটুকু প্রার্থনা করে মুনির সঙ্গে তাঁর ঈপ্সিত মিলন সম্পন্ন করলেন সত্যবতী। যোগসিদ্ধ মুনির কাছে এই সামান্য বর-প্রার্থনায় মহাকবি হিসেবে স্বয়ং ব্যাস আশ্চর্য হননি। আপন জননীর এই ব্যবহারের মধ্যে মহাকবি দেখতে পেয়েছেন স্ত্রীজনোচিত চিরন্তন সৌন্দর্য-মাধুর্যের আকাঙক্ষা, যে কারণে অন্য কোনও দুর্লভ বর প্রার্থনা না করে শুধু সুগন্ধবতী হবার আশীর্বাদ চেয়েছিলেন সত্যবতী—ততো লব্ধবরা প্রীতি স্ত্রীভাবগুণভূষিতা।

ধীবরকন্যা সত্যবতীর সঙ্গে পরাশর মুনির যে ঈপ্সিত মিলন হল, আমাদের সমাজের প্রাচীন অভিভাবক মনুমহারাজের এতে সায় ছিল না মোটেই। আমি আগেই বলেছি তিনি তাঁর আপন গ্রন্থে প্রায় ধমক দিয়ে বলেছিলেন—যে ব্রাহ্মণ শূদ্রার অধররস পান করিয়াছে—বৃষলীফেনপীতস্য—কিংবা তাহার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিয়াছে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও নিস্তার নাই। কিন্তু পরাশরের আপন যুগে সমাজের বন্ধন কিছু শিথিল ছিল বলেই হোক, অথবা তিনি সর্বতোভাবে এই মনুমতের গুণগ্রাহী ছিলেন না বলেই হোক, অথবা মহাপুরুষের আকস্মিক ইচ্ছায় এবং লগ্নের অনুকূলতায় ভারত-মহাকবির অভ্যুদয় ঘটবে বলেই হয়তো মহর্ষি পরাশরের সঙ্গে ধীবরকন্যার মিলন সম্পন্ন হল। মহাযোগীর ক্ষণিক ইচ্ছায়, ক্ষণিক মিলনে, সত্যবতীর সদ্যোগর্ভ প্রকাশিত হল এবং যমুনার অন্তর্বর্তী এক দ্বীপের মধ্যে জন্ম হল ব্যাসের। তিনি জন্মেই বড় হয়ে উঠলেন পিতা পরাশরের অলৌকিক প্রভাবে। মাতা সত্যবতীর এমন কোনও দায় থাকল না যাতে তিনি বলতে পারেন যে, তাঁর গর্ভসঞ্চারী পরাশর এবং তাঁর গর্ভস্থ সন্তান ব্যাস তাঁর স্বাভাবিক এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় আর কোনও ব্যাঘাত ঘটিয়েছেন। ঠিক সেই জন্যই বুঝি পরবর্তী পৌরাণিকেরা লিখেছেন—জয় হোক সেই পরাশরাত্মজ ব্যাসের, যিনি মাতা সত্যবতীর হৃদয়ের আনন্দ কন্দস্বরূপ।

যেমনটি বলেছিলাম, অভীষ্ট পুত্র লাভ করার পর মহর্ষি পরাশর রতিক্রীড়ার মায়াময় যান্ত্রিকতায় আবদ্ধ হবার জন্য আর সেখানে থাকেননি, এমনকী সত্যবতীকে একবার বিদায়সম্ভাষণ জানিয়েও বলেননি যে—ভদ্রে! আবার দেখা হবে তোমার সঙ্গে। ভবিষ্যতে যিনি নিষ্কাম এবং নির্বিঘ্নভাবে মহাভারত মহাকাব্যের সৃষ্টি করবেন, তাঁর পরম অভ্যুদয়

ঘটিয়েই পরাশর চলে গেছেন। আর জন্মমাত্রেই তাঁর পুত্রের আচরণ কীরকম! জন্মমাত্রেই তিনি জননী সত্যবতীকে বলছেন—আমি তপস্যার জন্য যাচ্ছি মা! কোনও প্রয়োজন উপস্থিত হলেই আমাকে স্মরণ করবেন আপনি, আমি চলে আসব—স্মৃতো'হং দর্শয়িষ্যামি কৃত্যেষ্বিতি চ সো'ব্রবীৎ।

ব্রাহ্মণ পিতা পরাশরের পূর্ণ পুত্রাভিলাষ ধীবরকন্যা সত্যবতীর গর্ভমাধ্যমে সঞ্চারিত হল এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মধ্যে, যেখানে তিনি একাকী অথচ সেখান থেকে আর সকলকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন। জন্মলগ্নে শূদ্রা ধীবরজননীর হৃদয়-দহন ব্যাসের মনে ছিল; ব্রাহ্মণ পিতার গৌরবের সঙ্গে তাই মায়ের হৃদয় মিশে এমন এক মহামানবের সৃষ্টি হয়েছিল, যাঁর পক্ষে মহাভারতের মতো বিচিত্র গ্রন্থ লেখা সম্ভব হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ একটি অদ্ভুত সুন্দর কথা বলেছে। বলেছে—স্ত্রী, শূদ্র এবং পতিত ব্রাহ্মণদের বেদ শ্রবণ করবারও অধিকার ছিল না, ব্যাস শুধু এঁদের প্রতি করুণা করেই মহাভারত গ্রন্থখানি লিখেছেন—ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্। মায়ের দৃষ্টান্তেই হোক কিংবা শূদ্রদের সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই হোক, ব্যাসের মনে যে সংকরজাত সন্তানের সহানুভূতি ছিল, সেকথা মেনে নেওয়াটাই সযৌক্তিক হবে। এ কথা ঠিক যে, সেকালের ব্রাহ্মণপ্রধান সমাজের ব্রাহ্মণ্য সংস্কার তাঁকে মানতে হয়েছে এবং মাঝে মাঝেই তাঁকে ভারতকথা বিলম্বিত করতে হয়েছে সদর্থক ব্রাহ্মণ্যের জয়কারে। সেটা অন্যায়ও নয়, অস্বাভাবিকও নয়। কিন্তু সময় সুযোগ যখনই এসেছে, তখনই কিন্তু বার বার তাঁর মুখে শুনেছি যে, ব্রাহ্মণ পিতার ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মালেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না; প্রকৃত প্রয়োজন ব্রাহ্মণের গুণ—ত্যাগ, দয়া, ধর্ম, চরিত্র। আর এই সাংঘাতিক প্রশ্ন তিনি সেইসব বিপন্ন মুহূর্তেই তুলেছেন, যখন মানুষ সত্য বই মিথ্যা বলে না।

মহাভারতের বনপর্বে শেষ মুহূর্তটি স্মরণ করুন। ধর্মরূপী যক্ষের প্রভাবে চার পাণ্ডববীর বিষপুষ্করিণীর তীরে শুয়ে আছেন। যক্ষের কথার উত্তর না দিয়ে পুষ্করিণীর জলস্পর্শ করার ফল ভোগ করছেন। যুধিষ্ঠির এলেন সর্বশেষে। মৃত ভাইদের দেখে করুণ বিলাপ করবার পরেই তিনি যক্ষের প্রশ্নের মুখোমুখি হলেন। মহামতি ব্যাস যক্ষের মুখে যেসব প্রশ্ন রেখেছেন, চিরাচরিত ক্লিশে হয়ে গেলেও যুধিষ্ঠিরের উত্তরগুলি কিন্তু একেবারেই চিরাচরিত নয়। বেশ বুঝতে পারি—সমাজের বিভিন্ন স্তরে এই প্রশ্নগুলি উঠত, ব্যাস সময়মতো সুযোগ বুঝে এক অলৌকিক সত্তা যক্ষের মাধ্যমে এই প্রশ্নগুলি রেখেছেন এবং উত্তর দেবার জন্য তিনি এমন একজনকে বেছেছেন যিনি বিপন্ন অবস্থাতেও ধর্মের নিয়ম থেকে চ্যুত হন না। যক্ষ বললেন—বংশ, চরিত্র, না বেদপাঠ, নাকি আচার্যের মুখে শোনা বেদার্থবোধ—কোনটি দিয়ে ব্রাহ্মণত্বের নির্ণয় হবে। যুধিষ্ঠির কাটা জবাব দিয়ে বললেন—বংশ নয়, কুল নয়, নিয়ত বেদপাঠ অথবা গুরুর কাছে বেদার্থের ব্যাখ্যা শুনেও ব্রাহ্মণত্ব তৈরি হয় না। ব্রাহ্মণত্বের কারণ গুণ এবং চরিত্র—কারণং হি দ্বিজত্বে চ বৃত্তমেব ন সংশয়ঃ।

যক্ষ-যুধিষ্ঠিরের যুগলবন্দিতে পরিস্ফুট হয়েছে ব্যাসের মর্মকথা। যুধিষ্ঠিরের মুখ দিয়ে তিনিই বলেছেন—চারখানা ঢাঁই ঢাঁই বেদ পড়েও যে ব্রাহ্মণ দুশ্চরিত্র, সে শূদ্রের বাড়া—চতুর্বেদো'পি দুর্বৃত্তঃ স শূদ্রাদ্ অতিরিচ্যতে। এই উত্তরে তবু ব্রাহ্মণত্বের সংজ্ঞা অস্পষ্ট থেকে যায়। কারণ, অন্যায় অধর্ম এখানে ব্রাহ্মণকে অধঃপতিত শূদ্রে পরিণত করছে, অন্যায় থেকে মুক্ত হলেই সে আবার ব্রাহ্মণত্বের গর্ব করবে। ব্যাস এই প্রশ্নটাকে তাই অত সহজে ছাড়েননি। এই প্রশ্ন তিনি আবারও তুলেছেন শান্তিপর্বে, আরও সমাহিত অবস্থায় ভৃগু-ভরদ্বাজ সংবাদে। ভৃগু বললেন—বর্ণের ভিত্তিতেই যদি এমন চতুর্বর্ণের বিভাগ—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়... এইসব বিভাগ, তা হলে তো বড়ই বিপদ। আকছার দেখছি এক বর্ণ আর এক বর্ণের মেয়ে বিয়ে করে সংকর হয়ে যাচ্ছে—সর্বেষাং খলু বর্ণানাং দৃশ্যতে বর্ণসংকরঃ। এসব ক্ষেত্রে আপনি জাতি ঠিক করবেন কী করে—কুতো বর্ণবিনিশ্চয়ঃ?

সংকরজন্মা ব্যাসের মহাভারতে এ প্রশ্ন উঠবেই। ভরদ্বাজ তো তো করে বললেন—তা ঠিক বটে। এমন করে বিশেষ বর্ণ ভেদ করা সম্ভবই নয়। কাজকর্ম, জীবিকা, বৃত্তি পালটে ব্রাহ্মণও অনেক সময় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এমনকী শূদ্রও বনে যায়। প্রশ্নকর্তা ভৃগু এই উত্তরে তুষ্ট

হননি, ভৃগুর ওরফে তুষ্ট হননি ব্যাসও। ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ্যের শূদ্রগতির কথা বলেছেন, কিন্তু সে তো জাতিব্রাহ্মণের শূদ্রসংজ্ঞা। যিনি সমগ্র ভারতের হৃদয় নিয়ে মহাভারত রচনা করছেন, সেই ব্যাস এই সংজ্ঞায় তুষ্ট হবেন কী করে? ব্রাহ্মণ যে অধঃপতিত শূদ্রাধম হয়ে গেলেও ব্রাহ্মণত্বের গর্ব করে।

বর্তমান লেখক একবার বাজারে কলা কিনতে গিয়ে বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। দোকানে কলা বেশি ছিল না। অতিনিকৃষ্ট কতগুলি বৃন্তহীন কনিষ্ঠিকা-প্রমাণ কলা দেখিয়ে দোকানদার সেগুলির চড়া দাম হেঁকে বসল। আমি বললাম—এই জঘন্য কলা! তার এত দাম? চটুল হেসে দোকানদার জবাব দিল—বাবু! এ কলা জাতে বামুন। মর্তমান কলা।

এই মুহূর্তে আমার ব্যাসের অসন্তুষ্টির কথা মনে এল। এ হল সেই পূর্বোক্ত ভরদ্বাজের কথা—চেহারা, রং, বৃত্তি সব পালটে ব্রাহ্মণ শূদ্র হয়ে গেলেও সে বলে—আমি জাতে বামুন। সংরক্ষণশীল পণ্ডিতের তুষ্টি হতে পারে এই জবাবে, কিন্তু যিনি মহান ভারতের গণহৃদয় আপন হৃদয়ে ধারণ করে শূদ্রা সত্যবতীর হৃদয়নন্দন ব্যাস হয়েছেন তিনি এই জবাবে তুষ্ট হবেন কী করে। তিনি প্রশ্নকর্তা ভৃগুর অন্তরশায়ী হয়ে প্রশ্ন করলেন—বেশ তো, ব্রাহ্মণ কী করে শূদ্র হয়ে যায়, সে তো বললেন। এবারে বলুন তা হলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় কেমন করে—ব্রাহ্মণঃ কেন ভবতি? ভরদ্বাজের আর উপায় রইল না, কারণ এবারে যে তিনি সমাজের মর্মজ্ঞ কবি ব্যাসের মুখোমুখি। ব্যাসই তো ভৃগুর অন্তরশায়ী হয়ে প্রশ্ন করছেন মহাকাব্যের ছত্রচ্ছায়ায় বসে। ভরদ্বাজ প্রথমে অনেকগুলি সদগুণের তালিকা দিলেন—ত্যাগ, তিতিক্ষা, সমদৃষ্টি, দয়া, সত্য, দান অদ্রোহ—যা ব্রাহ্মণের মধ্যে থাকতে হবে। তারপর বললেন—এই সত্যাদি সপ্ত গুণ যাঁর মধ্যে থাকবে, তিনিই ব্রাহ্মণ। যদি মানুষটি জাতি-জন্মে শূদ্র হন এবং তাঁর মধ্যে যদি এই গুণগুলি থাকে, অপিচ যদি মানুষটি জন্ম-জাতিতে ব্রাহ্মণ হন এবং তাঁর মধ্যে যদি এই গুণগুলি না থাকে, তা হলে শূদ্রও শূদ্র হবেন না, ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ হবেন না।

ব্যাসের বুঝি শান্তি হল। আদিপর্বের সেই প্রথম দিকে মহর্ষি বৈশম্পায়নের মুখে ব্যাসের জন্মকথা শোনা গেছে। ব্যাস জানতেন—তাঁর এই প্রিয় শিষ্যটি গুরু ব্যাসের জন্মকথা বলেই গুরুবন্দনা করবে। কাজেই আদিপর্বে শূদ্রা মাতার সেই বেদনা-অভিমান সেই শান্তিপর্ব পর্যন্ত বয়ে নিয়ে এসে ভরদ্বাজের মুখে পরিষ্কার কথা আদায় করে ভারত হৃদয়ের সহৃদয় কবি শান্তি পেলেন। বেশ বুঝি, সংকরজন্মের বেদনা বা অভিমান ব্যাসের মনে কোনও মিশ্রক্রিয়া তৈরি করে থাকবে। গীতায় স্বয়ং ভগবানের মুখেও তিনি জন্মগত ব্রাহ্মণ্যের জয়কার ঘোষণার কোনও সুযোগ দেননি। ভগবানকে বলতে হয়েছে—জন্ম নয়, গুণ এবং জীবিকা কর্মের ভিন্নতায় আমি চতুর্বর্ণের সৃষ্টি করেছি—চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।

এমনকী গীতার আরম্ভে তাঁর হাঁটুর বয়সি অর্জুন যে সর্বনাশা বর্ণসংকরের বিপদ উল্লেখ করে দুনিয়ার দুষ্টু মেয়েদের দায়ী করেছিলেন—স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসংকরঃ—সেদিন ব্যাসের নিশ্চয় মায়ের কথা মনে পড়েছিল। পাণ্ডবদের স্নেহময় ঠাকুরদাদাটি সেদিন মহান এবং ভারী মহাভারতের আড়াল থেকে মুচকি হেসেছিলেন। ভেবেছিলেন—দুষ্টুমি তো শুধু তাঁর মা-ই করেননি পিতা পরাশরও করেছিলেন। এরপর কৃষ্ণ যখন পার্থসারথির ভূমিকায় দাঁড়িয়ে চতুর্বর্ণের বিচারে জন্মের কথা উল্লেখই করলেন না, সেদিন ব্যাস মনে মনে হাততালি দিয়ে বলেছেন—কেমন পাকা ছেলে, হল তো এবার। দুষ্টুমির কথা যদি বলি, তো তোর মা-ঠাকুমা—কুন্তী, অম্বালিকা—এঁরা কোথায় যাবেন! এরপর শান্তিপর্বে এসে কৌরব-পাণ্ডবের আর-এক পিতামহ ভীষ্মের মুখে ভৃগু-ভরদ্বাজের সংবাদ শুনিয়ে সেই বর্ণসংকরের প্রশ্নই তুলেছেন আরও সোজাসুজি এবং চরম সমাধান দিয়েছেন ভরদ্বাজের মুখে। নিশ্চয়ই আহ্লাদিত হয়েছেন ব্যাস—তাঁর আপন সংস্কৃত (নাকি সংকৃত!) রক্ত পাণ্ডব-কৌরবের

রাজরক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পেরেছেন বলে।

কষায়-স্বভাব পণ্ডিতজন তবু সমালোচনা করে বলবেন—মহাভারতে জাতিমাত্রেই ব্রাহ্মণের মাহাত্ম-ঘোষণাও যথেষ্ট আছে, তার কী? আমরা বলি—আছে নিশ্চয় আছে। কিন্তু আপনারা মহাভারত খুঁজে খুঁজে সেইগুলিই বার করে দাখিল করবেন, আর এগুলি বাদ দিয়ে বলবেন—এগুলি ঠিক, এগুলি প্রক্ষিপ্ত, তা হলে মানব না। এঁরা আবার দিব্যচক্ষে মহাভারতের স্তরবিন্যাস করেন—'স্টাইলে'র নিরিখে, সমাজ পরিবর্তনের নিরিখে। আমরা বলি—একই সমাজে দুইরকম ভাবনাই থাকতে পারে। সংরক্ষণশীল এবং প্রগতিশীল, দুইই থাকতে পারে একই সমাজে। মহাকাব্য সেই সমাজেরই চিত্রণ করে যার মধ্যে সব আছে—এত আছে, অত আছে।

পুরাণ-ইতিহাসকে যাঁরা ব্রাহ্মণ্য অত্যাচারের দলিল বলে মনে করেন, তাঁদের বলি—অমন একচক্ষু হরিণের মতো একদিকে মুখ গুঁজে গবেষণা করবেন না, সবটা দেখুন। আমি বিশ্বাস করি—স্ত্রী-শূদ্রজনের প্রতি ব্যাসের হৃদয়ে অদ্ভুত এক মমতা ছিল। তার প্রমাণও আছে বহু জায়গায়—মহাভারতে তো আছেই, পুরাণগুলিতেও সেকথা বহুবার উচ্চারিত। বিষ্ণুপুরাণে দেখি—দেখি একসময়ে মুনি ঋষিদের মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়েছিল। তাঁদের তর্ক ছিল—কোন সময়ে ঈশ্বরীয় ধর্মের স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠানেও ফল বেশি হয়। মীমাংসু ঋষিরা যখন এই প্রশ্ন নিয়ে মহামতি ব্যাসের কাছে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি গঙ্গায় স্নান করতে নেমেছেন। মুনিরা যতক্ষণে জাহ্নবীর তীরে এসে পৌঁছোলেন ব্যাস ততক্ষণ অর্ধেক জলে। মুনিরা প্রশ্ন করার আগেই ব্যাস জলে ডুব দিলেন। এক ডুব দেবার পরেই ব্যাস বলে উঠলেন—কলিকালই দেখছি ভাল, কলিই ভাল। তীরে অপেক্ষমাণ মুনিরা অবাক হলেন ব্যাসের কথা শুনে। ব্যাস ততক্ষণে দ্বিতীয়বার ডুব দিয়ে উঠে বললেন—শূদ্ররাই দেখছি ভাল, শূদ্রই ভাল। মুনিদের আরও অবাক হবার ছিল। ব্যাস তৃতীয়বার গঙ্গায় ডুব দিয়ে বললেন—স্বীলোকই দেখছি ভাল, স্ত্রীলোকই ভাল—সত্যিই তো স্ত্রীলোকের চেয়ে ভাল আর কে আছে—যোষিতঃ সাধুধন্যাস্তা-স্তাভ্যো ধন্যতরো'স্তি কঃ?

ব্যাস স্নান সেরে উঠতেই মুনিরা তাঁকে ঘিরে ধরে তাঁর অভিনব এবং অশ্রুতপূর্ব বাণীগুলি ব্যাখ্যা করতে বললেন। কেননা, তাঁদের সমকালের ব্রাহ্মণ্য-বিস্তৃত সমাজে এসব কথা তাঁদের কাছে নতুন লাগছে। ব্যাস বললেন—হাজারো ধ্যানযোগ করে সত্যযুগে যা হয় না, নানারকম যজ্ঞ করে ত্রেতাযুগে যা হয় না, বহুতর অর্চনা-বন্দনায় দ্বাপরে যে পুণ্য মেলে না, কলিযুগে শুধুমাত্র ভগবানের নাম করলেই তা পাওয়া যায়। তাই বলেছি—কলিই সাধু। এই একইভাবে শূদ্র এবং স্ত্রীলোকরাও কেন ভাল, সে কথাও ব্যাস ব্যাখ্যা করেছেন, যদিও তাঁর স্ত্রী-শূদ্রের গুরুত্বব্যাখ্যায় চিরাচরিত ব্রাহ্মণ্য আদর্শের ছাপ পড়েছে, তবুও স্ত্রী-শূদ্রের অধিক মান্যতা ব্যাখ্যা করা—তা যেভাবেই হোক—ব্যাস ছাড়া অন্য কারও পক্ষে বলাই সম্ভব হত না হয়তো। ব্যাস বলছিলেন—ব্রাহ্মণেরা শত ব্রহ্মচর্য আর যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করে যা পায় না, শূদ্ররা শুধু তিন বর্ণের সেবা করেই সেই উত্তম গতি লাভ করেন, ঠিক যেমনটি স্ত্রীলোকেরা সেই উত্তম গতি লাভ করে শুধু স্বামীর সেবা করেই।

জানি, সমাজ সংস্কারকেরা এই কথার কী মানে করেছেন। তারা বলেছেন—এ হল সেই ধান্ধা, যাতে করে শূদ্রজনকে খানিকটা তোল্লাই দিয়ে উচ্চবর্ণের সেবায় আরও ভাল করে নিযুক্ত করা যায় এবং স্ত্রীলোককেও স্বামীর দাসীতে পরিণত করা যায়। মানি, একথা মানি যে, সমাজ সংস্কারকের এই অভিযোগ মিথ্যা নয়। কেননা সেকালের সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাসের কথায় স্ত্রী-শূদ্রের আপন মর্যাদা কিছু প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কেননা ব্যাসও তাঁর সমকালীন সমাজের বাইরে নন এবং চিরন্তন 'অর্ডার'কে তিনি এক ফুৎকারে উড়িয়েও দেন না। কিন্তু তাঁর কথাটা যদি কলিধর্ম হরিনামের মাহাত্ম্য অনুযায়ী বিচার করেন তা হলে দেখবেন—এই

সেই উদার ধর্মের প্রচার আরম্ভ হয়েছে, যেখানে হরিনাম-উচ্চারণের সহজ উপায়ে স্ত্রী-শূদ্রের সামাজিক বিড়ম্বনা কমতে আরম্ভ করেছে—মহাভারতের অন্তর্গত গীতার মধ্যে এই কথার প্রতিধ্বনি শুনছি—ভগবান নামে চিহ্নিত সেই পুরুষোত্তমের মুখে—আমাকে একান্তভাবে আশ্রয় করলে স্ত্রী, শূদ্র, বৈশ্য সকলেই পরমা গতি লাভ করে—স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তে'পি যান্তি পরাং গতিম্।

আরও একটা কথা লক্ষ করতে হবে পূর্বোক্ত বিষ্ণুপুরাণের প্রসঙ্গে। দেখা যাচ্ছে—স্ত্রী-শূদ্রের কথা বলতে গিয়ে ব্যাস তথাকথিত আচারমার্গীদের ত্রুটির উল্লেখ করছেন। এই উল্লেখ এমনই, যাতে মনে হবে—ব্রাহ্মণ্য আচারের আয়াস এবং পরিশ্রম ব্যাসকে যেন ক্লান্ত করে তুলেছিল। সমস্ত ব্যাপারেই শাস্ত্রীয় বাধ্যবাধকতা তাঁকে যেন বিরক্ত ক্লিষ্ট করে তুলছে কোথায়। তিনি বলেছেন—ব্রাহ্মণকে বড় কষ্টে এবং বড় পরাধীনতার মধ্যে দিয়ে নিজের পারলৌকিক গতি লাভ করতে হয়—পারতন্ত্রং সমস্তেষু... ক্লেশেন মহতা দ্বিজাঃ। ব্যাসের বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে গেলে আরও অনেক কথা বলতে হয় পুরাণগুলি থেকে এবং সেই পরম্পরার শেষে এসে পাবেন শ্রীচৈতন্যকে—যিনি কালধর্ম হরিনাম এবং স্ত্রী-শূদ্রের সেতুবন্ধন করেছিলেন ব্যাসের ধারণামতো। আমাদের বক্তব্য—বিষ্ণুপুরাণের কাল থেকে চৈতন্য মহাপ্রভুর কালভেদ হাজার-বারোশো বছরেরও বেশি। যে বক্তব্য সমাজে প্রতিষ্ঠা করার জন্য হাজার-বারোশো বছর কেটে গেছে, সেই বক্তব্য ব্যাস প্রকাশ করেছিলেন অত্যন্ত স্বাধীনভাবে প্রায় বৈপ্লবিক রীতিতে। আমি বিশ্বাস করি—সেকালের সমাজে জাহ্নবীর বুকে দাঁড়িয়ে সমবেত মুনি-মহাজনের সামনে কলি, শূদ্র এবং স্ত্রীলোকের জয়ঘোষ রচনা করার জন্য যে বুকের পাটা দরকার, সেই বুকের পাটা তাঁর তৈরি হয়েছিল সংকর-জন্মের বিড়ম্বনায়। সেই জন্মঋণ তিনি শোধ করে গেছেন উদার এবং স্বাধীন মত প্রতিষ্ঠা করে।

আর্য পুরুষদের যেসব বহিরঙ্গীয় ব্যাপারে গর্ব ছিল—ফরসা গায়ের রং, টিকোলো নাক, শুদ্ধ বংশধারা—ইত্যাদি সবকিছুর মুখে তিলাঞ্জলি দিয়ে ভারতবর্ষের মাটিতে জন্মালেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। তাঁর নাসিকার সংস্থান সূচ্যগ্র ছিল কিনা, সে খবর আমরা সঠিক কোথাও পাইনি, কিন্তু এটা খুব ভালভাবে জানি যে, তিনি দেখতে বেজায় কালো ছিলেন এবং তাঁর জন্মের মধ্যেও যে তথাকথিত আর্যজনোচিত বিশুদ্ধতা ছিল না, সেকথা যেমন মহাভারত থেকে প্রমাণিত হয়, তেমনই প্রমাণিত হয় পরবর্তী পৌরাণিকদের সংশয়াকুল মন্তব্যে। পুরাণগুলির এখানে ওখানে দেখবেন যে, ব্যাসের জন্মবিবরণ বর্ণনা করার পরেই পুরাণবক্তা কথকঠাকুর শংকিত হচ্ছেন—এই বুঝি সাধারণ মানুষ ব্যাসকে খারাপ ভাবে, অথবা তাঁর পিতা-মাতার আচরণে লজ্জিত হয়। দেবী ভাগবতের পৌরাণিক তো শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন—এই আমি ভগবান ব্যাসের জন্মকথা বললাম। কিন্তু দেখো বাপু! তাঁর জন্মের বিষয়ে কোনও সন্দেহ রেখো না মনে। বড় মানুষ আর মুনিদের চরিত্রের মধ্যে গুণটুকুই গ্রহণ কোরো, দোষটুকু নয়—মহতাং চরিতে চৈব গুণা গ্রাহ্যা মুনেরিতি।

পৌরাণিকের এই শংকাসংকুল মন্তব্য থেকে বুঝতে পারি যে, সাধারণ্যে ব্যাসের জন্মকথা যদি সম্ভ্রম না জাগায়, তার জন্য তাঁরা আগে থেকেই সাফাই গাইছেন এবং ভবিষ্যতে ব্যাসের মহত্ব এবং বিশালত্বের কথা মনে রেখে তাঁরা অলৌকিকতার আশ্রয় নিয়ে বলছেন—যে, ব্যাসের মতো বিশাল ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হবে বলেই হয়তো কোনও অলৌকিক কারণে সত্যবতীর জন্ম হয়েছিল জেলের ঘরে, আর তেমন কারণ না থাকলে মহামুনি পরাশরই বা কেন মুহূর্তের জন্য কামাকুল হয়ে উঠলেন—অন্যথা তু মুনেশ্চিত্তং কথং কামাকুলং ভবেৎ। সেই অলৌকিক কারণ কী? না, সকলের চমৎকার সৃষ্টি করে বিশালবুদ্ধি ব্যাস জন্মাবেন বলেই পরাশর-সত্যবতীর অমন আশ্চর্য নিয়মবহির্ভূত মিলন—সকারণেয়মুৎপত্তিঃ কথিতাশ্চর্য্যকারিণী।

দেবীভাগবত পুরাণের কথকঠাকুর যদি আজকের দিনের মানুষ হতেন, তা হলে ব্যাসের এই জীবন-বীজ বর্ণনায় তাঁকে এত দ্বিধাগ্রস্ত হতে হত না। তিনি বুঝতেন যে, মহাভারতের মতো মহাকাব্যের সৃষ্টি করতে যিনি পারেন, তাঁকে জন্ম থেকেই সমাজের প্রচলিত এবং অভ্যস্ত চলমানতার বাইরে দিয়ে চলতে হয়। তাঁর জন্মই শুধু নয়, সংক্ষেপে তাঁর জীবন যদি কোনওভাবে পুনর্গঠন করতে পারি, তা হলে দেখবেন ব্যাস কখনওই সাধারণ চলতি পথের পথিক নন। তাঁকে যদি বিরাট এক ঋষি হিসেবে দেখেন, তা হলে দেখবেন—তিনি প্রচলিত ঋষির চেয়েও বড়—অনেক বড় এক মানুষ। তাঁকে যদি ভগবানের ঐশ্বর্যময়তায় দেখেন, তা হলে দেখবেন—তিনি ভগবানের চেয়েও বড় ঐশ্বর্যশালী এক মানুষ। তাঁকে যদি কবির দৃষ্টিতে দেখেন, তা হলে দেখবেন—তিনি কবির চেয়েও বড় এক মানুষ কবি। অর্থাৎ যতখানি তিনি কবি, তার চেয়েও অনেক বড় এক মানুষ।

আসলে মানুষ, একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ হওয়াই সবচেয়ে কঠিন কাজ। শম-দমাদি সাধন আর মুমুক্ষুত্বের জোরে একজন যদি ঋষিপদবাচ্য হয়ে ওঠেন, তবে তাঁর মধ্যেও ঋষিত্ব বিরাগিত্বের অহং জন্মাতে পারে, ক্ষত্রিয় বীরপুরুষের তো অহঙ্কার স্বাভাবিক, এমনকী দাসত্বেরও অভিমান আছে, কিন্তু ঋষি কবি যাকে বলেছিলেন—সবার রঙে রং মেশাতে হবে—তেমন একজন মানুষ পাওয়া বড় কঠিন। ব্যাস তাঁর মহাভারতের মধ্যে হংসগীতা নামে অসাধারণ একটি কথোপকথন সংকলিত করেছেন। এমন হতে পারে—এই সংকলনটুকু তাঁর নিজের লেখা নয়, কিন্তু প্রাচীন এই সংবাদটুকু তাঁর এতই পছন্দ ছিল, যে তা তিনি মহামতি ভীষ্মের মুখে বসিয়ে দিয়েছেন—শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দেবার সময়। যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করে বলেছিলেন—বিদ্বান-সজ্জনেরা সত্য, দম, ক্ষমা, প্রজ্ঞা—এসবের খুব প্রশংসা করেন, তা এ সম্বন্ধে আপনার কী মত? ভীষ্ম নিজে এর সোজাসুজি জবাব দেননি। এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি ব্যাস সংকলিত একটি অসাধারণ কথোপকথনের উল্লেখ করে প্রজাপতিরূপী হংসের উপদেশের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—দেখো! আমাকে অভিশাপ দিলেই আমি উলটে অভিশাপ দিই না। কাম-ক্রোধ-লোভ দমন করার যে ক্ষমতা, তাই হল অমৃতলাভের দ্বারস্বরূপ। আর সবচেয়ে গূঢ়-গোপন, সবচেয়ে বড় কথাটা কী জান—এ জগতে মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কিছু নেই—গুহ্যং ব্রহ্ম তদিদং বো ব্রবীমি/ ন মানুষাচ্ছ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ।

ব্রাহ্মণ্য-চর্চার সবচেয়ে উর্বর সময় এবং পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে যিনি মানুষ, জাতি-বর্ণ-বিশেষহীন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ববাচক এই শব্দগুলি মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করতে পারেন, সেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের মধ্যে ঋষিত্ব, কবিত্ব, দেবত্বের চেয়েও মানুষের সত্তাটুকু বেশি আছে। তাঁর ঋষিত্ব তাঁকে এই পৃথিবীর মানুষকে বুঝবার গভীরতা এবং দার্শনিকতা দিয়েছে। তাঁর দেবত্ব তাঁকে মানুষের চিরন্তন কাম-ক্রোধ-লোভাক্রান্ত হৃদয়কে ক্ষমা করতে শিখিয়েছে। আর তাঁর কবিত্ব তাঁকে কবিজনোচিত বেদনা এবং সমান-হৃদয়তায় মানুষের বিচিত্র কর্মাবলি নির্বিন্নভাবে দেখতে শিখিয়েছে। কারণ মানুষ হয়ে ওঠার মধ্যে যে ব্যথা, যন্ত্রণা এবং অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য থাকে, জন্ম থেকে শেষ পর্যন্ত সেই ব্যথা, যন্ত্রণা এবং মানুষের বিষম-বৃত্তি দেখে দেখেই তাঁর কবির অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ হয়েছে। সেই জন্যই অন্য পাঁচটা শাস্ত্রগ্রন্থের মতো মহাভারতকে তিনি সম্পূর্ণ মোক্ষশাস্ত্র বানিয়ে তুলতে পারেননি। মহাভারতকে তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস তৈরি করে ফেলেছেন, বলতে চেয়েছেন—দেখো বাপু! ভারতবর্ষের মানুষ এইরকম ছিল—ইতি হ আস—তোমরা কি অন্যরকম কিছু! আর এই মহাভারতের ইতিহাস তাঁর পক্ষে লেখা সম্ভব হয়েছে এই কারণেই, যেহেতু এই ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর নিজের জীবনের যোগ আছে। যোগ আছে প্রতিকর্ম প্রতিমর্মের সঙ্গে।

কী অদ্ভুত এক 'ফ্ল্যাশ্‌ব্যাক'-এর মাধ্যমেই না মহাভারতের কাহিনী কথিত হল। কুরুবংশের শেষ সন্তানবীজ জনমেজয় তখন রাজত্ব করছেন হস্তিনায়। কিছুকাল আগেই সর্পদংশনে তাঁর পিতা পরীক্ষিৎ মারা গেছেন। সমগ্র সর্পকুলের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি সর্পমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন বটে, কিন্তু আস্তীক ঋষিরা অনুরোধে সেই যজ্ঞ তিনি বন্ধ করতে বাধ্য হলেন। ওদিকে জনমেজয় শুধুমাত্র প্রতিশোধস্পৃহায় এমন নিদারুণ যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন শুনে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস শিষ্যদের নিয়ে উপস্থিত হলেন জনমেজয়ের সভায়। এসে দেখলেন—যজ্ঞ বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি খুশি হয়ে আসনে বসতেই একেবারে প্রপৌত্রসুলভ আবদারে জনমেজয় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—কুরুদের এবং পাণ্ডবদের আপনি একেবারে সামনে থেকে দেখেছেন—কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ ভবান্ প্রত্যক্ষদর্শিবান্—বলুন না পিতামহ, তাঁদের জীবনকথা, কেমন করে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি লেগেছিল তাঁদের, আর কেনই বা সেই বিরাট যুদ্ধ হল—যাতে করে সমস্ত কুলটাই ধ্বংস হয়ে গেল—ভূতান্তকরণং মহৎ।

এ কথাটা শুনতে কেমন লাগল পিতামহেরও বেশি ব্যাসদেবের। কুরু এবং পাণ্ডবদের সামনে থেকে দেখা তো সামান্য কথা, এই সমগ্র কুলের সঙ্গে যে তাঁর আত্মার যোগ আছে, এই বংশের জন্মদাতা পিতাও যে তিনি। হস্তিনাপুরের রাজবংশের পরম্পরায় তাঁর কোনও ভূমিকা থাকবার কথাই ছিল না, কিন্তু তৎকালীন সমাজের নীতি-নিয়মের বিড়ম্বনায় এবং আপন জননীর অনুরোধে দ্বৈপায়ন ব্যাস কিছুতেই নিজেকে আর বিচ্ছিন্ন রেখে দিতে পারলেন না এক দ্বীপের মধ্যে। তিনি থাকতে পারলেন না বিরাগী এক তপস্বীর বিচ্ছিন্নতায়। দ্বৈপায়ন ব্যাসকে প্রবেশ করতে হল ভারতবর্যের অন্যতম প্রধান এক রাজতন্ত্রের শরীরের মধ্যে। নিভৃতে নির্জনে মুনিবৃত্তির মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখলে মানুষের মধ্যে যে চিরন্তন দুঃখ-সুখের খেলা চলে, তা হয়তো এমন করে বুঝতেন না ব্যাস। মায়া, মমতা, ক্রোধ, লজ্জা, অভিমান যে মানুষকে পদে পদে লীলায়িত করে, সে কথা হয়তো এমন করে বুঝতেন না ব্যাস, যদি তাঁর মা জননী সত্যবতী 'ব্রহ্ম-সত্যে'র দ্বীপবাস থেকে তাঁকে ডেকে এনে এমন করে তাঁর অনুপ্রবেশ না ঘটাতেন সংসারের আবর্তে।

ব্যাস সত্যবতীকে কথা দিয়েছিলেন—তোমার কোনও কাজ থাকলে আমায় ডেকো, মা! স্মরণ করলেই আমি তোমার কাছে আসব—স্মৃতো'হং দর্শয়িষ্যামি কৃত্যেষ্বিতি চ সো'ব্রবীৎ। কিন্তু সে কাজ এমনতর হবে, তাকে জানত! তাঁর কুমারী জননী সত্যবতীর বিধিসম্মত বিবাহ হয়েছে হস্তিনাপুরের রাজা শান্তনুর সঙ্গে—এ কথা ব্যাস ভালই জানতেন। জানতেন মহামতি ভীষ্মের কথাও। কিন্তু জানলেও অযথা রাজবাড়িতে গিয়ে সত্যবতীকে মা বলে সম্বোধন করে কখনও শান্তনুরও অস্বস্তি ঘটাননি ব্যাস। কিংবা যাননি তখনও, যখন তাঁর ভ্রাতৃপ্রতিম চিত্রাঙ্গদ বা বিচিত্রবীর্য রাজত্ব করছেন হস্তিনাপুরে। তাঁর যাবার ইচ্ছেও হয়নি, প্রয়োজনও বোধ করেননি কোনও। কিন্তু চিত্রাঙ্গদ-বিচিত্রবীর্য যখন মারা গেলেন নিতান্ত অকালে এবং সত্যবতী কিছুতেই যখন ভীষ্মকে রাজ্যগ্রহণে রাজি করাতে পারলেন না, তখনই প্রয়োজন পড়ল ব্যাসের।

সত্যবতী এখনও কারও কাছে নিজের জীবনের এই গোপন কাহিনীটুকু বলেননি—মহারাজ শান্তনুর কাছেও না, পিতা দাশরাজার কাছেও না, পুত্রদের কাছে তো নয়ই। কিন্তু আজ যখন হস্তিনাপুরের মহান বংশ উচ্ছিন্ন হতে বসেছে এবং যে ভীষ্ম তাঁরই বিবাহের কারণে রাজ্যপাট ত্যাগ করে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করেছেন, সেই ভীষ্মের কাছে সত্যবতী কিন্তু তাঁর কন্যা-অবস্থার সেই রহস্য-মিলন-কাহিনী বিবৃত করলেন। বললেন মহর্ষি ব্যাসের কথা। ততদিনে ব্যাস অখণ্ড বেদমন্ত্রকে যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিকভাবে সাজিয়ে ঋক্-সাম ইত্যাদি বিভাগ করে ফেলেছেন। এই অসম্ভব কাজ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর বিশাল খ্যাতি তৈরি

হয়েছিল এবং এই খ্যাতির কথা মহামতি ভীষ্মও জানতেন। কাজেই ভীষ্ম যখন নিজেই সত্যবতীর কাছে প্রস্তাব করলেন যে, গুণবান কোনও ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করে নিয়োগপ্রথায় বিচিত্রবীর্যের স্ত্রীদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করা হোক, তখন সত্যবতী আর ব্যাসের জন্মকথা না বলে পারেননি এবং তাঁর গুণের কথা বলতে গিয়ে গর্বিতা জননীর বুক ফুলে উঠেছে। বলেছেন—পরাশরপুত্র ব্যাস এখন এক মহাযোগী এবং মহর্ষি হিসেবে বিখ্যাত হলেও সে আমারই ছেলে। চারটে বেদ ভাগ করেছে বলে এখন তার নাম ব্যাস হয়েছে বটে, কিন্তু আসলে সে আমার কন্যাকালের পুত্র, দ্বীপের মধ্যে জন্মেছিল বলে ওর নাম ছিল দ্বৈপায়ন—কন্যাপুত্রো মম পুরা দ্বৈপায়ন ইতি শ্রুতঃ।

হয়তো সত্যবতী এখন ব্যাসের যত খবর রাখেন, হস্তিনাপুরের এই মহান প্রাজ্ঞ ব্যক্তিটি ব্যাসের সম্বন্ধে তার চেয়েও আরও বেশি জানেন। পিতা শান্তনুর সময় থেকে এই বিচিত্রবীর্যের সময় পর্যন্ত তাঁকে হস্তিনাপুরের রাজত্বভার সামলাতে হয়েছে চার দিকে তাল রেখে। অতএব তিনি এতদিনে মহর্ষি ব্যাসের কথা শোনেননি, তা হতেই পারে না। তিনি অবশ্যই শুনেছেন এবং এখন জননী সত্যবতীর সঙ্গে তাঁর একান্ত মাতৃ-সম্বন্ধ আছে শুনে ভীষ্ম মনে মনে অত্যন্ত হর্ষলাভ করলেন। সত্যবতীর মুখে ব্যাসের নাম শুনেই ভীষ্ম শ্রদ্ধায় যুক্তকর হলেন তাঁর উদ্দেশে—মহর্ষেঃ কীর্তনে তস্য ভীষ্মঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ। বললেন—দেখো মা! প্রত্যেক কাজের মধ্যেই—সে ধর্মই হোক, অর্থই হোক অথবা কাম—প্রত্যেক কাজের সঙ্গেই তার ফলটুকু ভাবতে হয়। ভাবতে হয়—সামান্য সামান্য দোষ বার করার ফলে কাজটা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল কিনা, অথবা কাজটা এখন যা করছি, ভবিষ্যতে তা বেশি ফল দেবে কি না। তুমি যেমনটি বলছ মা, তাতে এই বংশের হিত হবে সবচেয়ে বেশি এবং সেটা এখন অধর্মও নয়—তদিদং ধর্মসংযুক্তং হিতঞ্চৈব কুলস্য নঃ। তোমার এ প্রস্তাব খুব ভাল, তুমি ডাকো তোমার ছেলেকে।

ভীষ্মের কথায় মনে জোর পেলেন সত্যবতী। তিনি সানন্দে স্মরণ করলেন তাঁর প্রথমজন্মা কুমারীকালের পুত্রকে। একজনের স্মরণমাত্রেই অপর জন বুঝতে পারছেন—এই অলৌকিক যোগশক্তির কথা আধুনিক কালে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু যোগের তত্ত্ব-দর্শন সম্বন্ধে যাঁরা অবহিত, তাঁরা বুঝবেন চিত্তবৃত্তিনিরোধের ফলে মানুষ কত অসম্ভব সম্ভব করতে পারে। ব্যাসের যোগশক্তিতে বিশ্বাসই করুন আর নাই করুন, জননী সত্যবতীর সংকল্পিত স্মরণ অনুভব করলেন ব্যাস। অথবা যে মুহূর্তে তাঁর কাছে সত্যবতীর সংকল্পদূত এসে খবর দিল যে, তাঁকে ডেকেছেন সত্যবতী, তখন তিনি বেদ পড়াচ্ছিলেন—স বেদান্ বিব্রুবন্ ধীমান্ মাতুর্বিজ্ঞায় চিন্তিতম্। কিন্তু মায়ের ডাক এসে পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপনা ছেড়ে উঠে পড়লেন ব্যাস। মুহূর্তের মধ্যে উপস্থিত হলেন মায়ের সামনে। অবশ্যই যোগবলে।

কতকাল পরে সত্যবতী দেখলেন তাঁর প্রথমজ পুত্রকে। এই পুত্রই তাকে প্রথম মা বলে ডেকেছিল। কিন্তু সেদিন সেই কন্যাবস্থায় মহর্ষি পরাশরের সঙ্গে তাঁর মিলনটুকুই এমন আকস্মিক ছিল যে, পুত্রজন্মের আবেগ-মাধুর্য তিনি কিছুই অনুভব করতে পারেননি। কিন্তু হস্তিনাপুরের রাজরানি হবার পরে যখন একে একে তাঁর স্বামী-পুত্র সব মারা গেছে, তখন এই পুত্রটির জন্য তাঁর মন বহুবার আকুলিব্যাকুলি করেছে। তবু বলতে পারেননি কাউকে। আজ প্রৌঢ়তার উপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে কুরুবংশের এই বিপন্নতার সময় তাঁর এই পূর্বজাত পুত্রটির কথা বলতে সংকোচ করেননি সত্যবতী। অন্যদিকে সর্বজনমান্য এই ঋষিপুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরতেই তাঁর সুচিরকালসঞ্চিত রুদ্ধ স্নেহধারা এমনভাবেই উদগত হল যে তিনি যেমন কাঁদতে থাকলেন, অমনই তাঁর স্নেহকরুণ স্তনযুগল ক্ষরিত হল পুত্রস্নেহের অতিব্যাপ্তিতে—পরিষ্বজ্য চ বাহুভ্যাং প্রস্রবৈরভিষিচ্য চ।

জন্মলগ্নেই যে পুত্র সংসার ত্যাগ করে ঋষিধর্ম পালন করেছেন, ত্যাগ-বৈরাগ্যে যাঁর বুদ্ধি স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভ করেছে, তাঁর হৃদয় জননীর স্নেহে মথিত হলেও তিনি ধীর অবিচলিত থাকলেন। তপস্বীর সর্বতোভদ্র মঙ্গলকামনায় ব্যাস তাঁর কমণ্ডলুতে ভরা সর্বতীর্থের জল ছিটিয়ে দিলেন সত্যবতীর মাথায়। সত্যবতীর অসংখ্য স্নেহবাচনের উত্তরে ব্যাস শুধু নম্র-কৃতজ্ঞ অভিবাদন জানালেন জননীকে—তামদ্ভিঃ পরিষিচ্যার্তাং মহর্ষিরভিবাদ্য চ। তার পরেই জিজ্ঞাসা করলেন—মা! তোমার যা অভীষ্ট, আমি তাই করতে এসেছি। মা, তুমি সমস্ত ধর্মের তত্ত্ব জানো। তুমি আদেশ করো—তোমার কী প্রিয়কার্য করতে পারি আমি? মহর্ষি ব্যাস সত্যবতীর পুত্র বলে তাঁর সঙ্গে যতই ব্যক্তিগত কথাবার্তা হোক, ব্যাস হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে এসেছেন, অতএব রাজবাড়িরও কিছু কৃত্য আছে তাঁর ব্যাপারে। সেই জন্য রাজপুরোহিত এসে পৌঁছোলেন মাতাপুত্রের কথোপকথনের মাঝখানেই। তিনি যথোচিত পূজা-অভ্যর্থনা করে সুখাসনে বসালেন ব্যাসকে।

জননী সত্যবতী এবার তাঁর প্রস্তাবিত বক্তব্য পেশ করলেন সামান্য ভনিতা করে। সত্যবতী বললেন—সমস্ত ছেলেরা বাপ-মায়ের সহায়ক হয়েই জন্মায়। ছেলের ওপর বাপের যেমন অধিকার, মায়েরও তেমনই—তেষাং যথা পিতা স্বামী তথা মাতা ন সংশয়ঃ। তুমি মহর্ষি পরাশরের ঔরসে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে আমার গর্ভে জন্মেছিলে বলেই যেমন তুমি আমার প্রথম পুত্র, তেমনই বিচিত্রবীর্য ছিল আমার কনিষ্ঠ পুত্র। পিতার দিক থেকে ভীষ্ম যেমন বিচিত্রবীর্যের বড় ভাই, মায়ের দিক থেকে তুমিও তেমনই বিচিত্রবীর্যেরও বড় ভাই।

ব্যাস বোধ হয় বুঝতে পারছিলেন জননীর কথার গতিপথ। সত্যবতী বললেন—ভীষ্মকে আমি অনেক বলেছি। বিচিত্রবীর্যের দুই স্ত্রীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করে বংশরক্ষা করার জন্য যথোচিত অনুরোধ করেছি তাঁকে। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের সত্যপ্রতিজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তাঁর পক্ষে আমার অনুরোধ রাখা সম্ভব হয়নি। সত্যবতী এবার সানুনয়ে ব্যাসকে বললেন—তাই তোমাকে বলছি, বাবা! হস্তিনাপুরের প্রজাদের দিকে তাকিয়ে, সকলের সুরক্ষার দিকে তাকিয়ে, আমার স্বামীহারা দুই পুত্রবধূর মুখের দিকে তাকিয়ে তোমায় যে অনুরোধ করছি মন দিয়ে শোনো, বাবা!

এতক্ষণে ব্যাস বুঝে গেছেন—জননী তাঁকে নিয়োগপ্রথায় বিচিত্রবীর্যের বধূদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করতে বলছেন। কিন্তু নিয়োগের কতগুলি নিয়ম আছে, শাস্ত্রীয় বিধি আছে, সেগুলি পূরণ করা না হলে ব্যাস যে এই কর্মে রাজি হবেন না, সেকথা হস্তিনাপুরের রাজমাতা সত্যবতীর জানা আছে। এ প্রশ্ন উঠতেই পারে এবং অনেক অর্বাচীন লেখক-লেখিকা এই ভুল সিদ্ধান্ত করেওছেন যে, সত্যবতী সুযোগ বুঝে নিতান্ত স্বার্থপ্রণোদিত উপায়ে আপন পূর্বজ পুত্রের বংশধারা হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে সংক্রমিত করেছেন। এসব অর্বাচীনেরা তৎকালীন দিনের সামাজিক নিয়মকানুন কিছুই জানেন না, শুধু মূর্খের মতো গালি দিতে পারেন। এ কথা মনে রাখা দরকার, বংশের উত্তরাধিকারের প্রয়োজনে সেকালে যখন নিয়োগপ্রথার আশ্রয় নেওয়া হত, তখন গুরুজনদের মন্ত্রণা একান্ত জরুরি ছিল। বংশ, সমাজ এবং অবশ্যই ব্যক্তিগত প্রয়োজন বুঝে বাড়ির বয়স্ক গুরুজনেরা এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতেন। ক্রমান্বয়ে শান্তনু এবং তাঁর ঔরস রাজপুত্রদের মৃত্যুর পর সত্যবতী অবশ্যই কুরুকুলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

কিন্তু এটাও ঠিক, শান্তনুর ঔরসপুত্র ভীষ্ম এখনও বহাল তবিয়তে বেঁচে রয়েছেন। শুধু তাই নয়, পিতা শান্তনুর সময় থেকে তাঁর পুত্রদের মৃত্যু পর্যন্ত সময়ে হস্তিনাপুরের রাজনীতির মূলাধার ছিলেন ভীষ্ম। হস্তিনাপুরের রাজত্বসংক্রান্ত ব্যাপারে ভীষ্মের মতই ছিল তখনও শেষ কথা। এদিক থেকেও বটে আবার শান্তনুর ঔরসজাত বলেও ভীষ্মের অধিকারও কিছু কম তো ছিলই না, বরং তা সত্যবতীর চেয়ে বেশিই ছিল। কাজেই সত্যবতী যদি

স্বার্থপ্রণোদিতভাবে কিছু করতেন, তা হলে ভীষ্ম তাঁকে প্রথম বাধা দিতেন এবং তা প্রচণ্ডভাবেই দিতেন। বিশেষত হস্তিনাপুরের রাজবংশের স্বার্থে যদি ঘা পড়ত, তা হলে ভীষ্মের তখনও তাঁর যা প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল, তাতে অবশ্যই সত্যবতীকে বাধা দিতেন। ভীষ্ম বুঝেছিলেন—হস্তিনাপুরের রাজবংশের প্রয়োজনেই তখন নিয়োগপ্রথার আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সে নিয়োগে তিনি যেহেতু সত্যরক্ষার কারণে জড়িত হবেন না, এবং যেহেতু বাইরে থেকে গণ্যমান্য একজন ব্রাহ্মণকে এনেই সেই নিয়োগ ঘটাতে হবে, সেখানে ব্যাসের মতো পরমর্ষিকে লাভ করতে পারলে তাঁর আপত্তি কী থাকতে পারে! সত্যবতীর কথায় তিনি রাজি হয়েছেন ব্যাসের কথা শুনেই।

যে দু-তিনটি কারণে ব্যাসের দিক থেকে অনৌচিত্যের আশঙ্কা ঘটতে পারে, সত্যবতী সে সম্বন্ধে পূর্বাহ্ণেই সচেতন ছিলেন বলে পুত্র-উৎপাদনের প্রসঙ্গ উঠতেই তিনি ব্যাসকে বুঝিয়ে দিলেন যে, এ বিষয়ে গৃহের গুরুজনেরা প্রয়োজন বোধ করছেন তথা এ বিষয়ে তাঁর নিরপেক্ষ ভূমিকা আছে যাকে মহাভারত বলেছে 'আণৃশংস্যাৎ'। তিনি বললেন— তোমার ভাই বিচিত্রবীর্যের মঙ্গল এবং আমাদের বংশরক্ষার কারণে মহামতি ভীষ্ম এই নিয়োগে সম্মতি দিয়েছেন। অতএব তাঁর সম্মতি এবং আমার আদেশ মেনে আমাদের বংশরক্ষার জন্য তোমার কনিষ্ঠ ভাইয়ের বধূদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করো— ভীষ্মস্য চাস্য বচনান্নিয়োগাচ্চ মমানঘ।

এ নিয়োগের ক্ষেত্রে বধূদেরও যে কোনও আপত্তি নেই, সেটাও জানাতে ভুললেন না সত্যবতী। তিনি বললেন—প্রয়াত বিচিত্রবীর্যের দুই স্ত্রীর কোনও পুত্র নেই। তাঁরা রূপবতী যৌবনবতী হওয়া সত্ত্বেও স্বামীহারা এবং তাঁদের পুত্রকামনাও তৃপ্ত হয়নি। এই অবস্থায় অন্তত পুত্রলাভ করলেও তাঁরা খুশি হবেন—রূপযৌবনসম্পন্নে পুত্রকামে চ ধর্মতঃ। পরবর্তী সময়ে বিচিত্রবীর্যের বধূরা ব্যাসের সঙ্গে মিলনে যে অনীহা দেখিয়েছেন তাতে ব্যাসের মতো বিকট চেহারার মানুষের সঙ্গে মিলনে তাঁদের ব্যক্তিগত রুচির প্রশ্ন ওঠে বটে, কিন্তু তাঁদের পুত্রকামনার ব্যাপারে কোনও সংশয় সেখানে ওঠে না।

প্রাথমিকভাবে এই নিয়োগে ব্যাসের একটা অনিচ্ছা থাকতে পারে, সেই কথা ভেবে অন্তত দু-তিনরকমভাবে বধূদের প্রসঙ্গ ব্যাসের কাছে উপস্থাপন করলেন সত্যবতী। সত্যবতী বিদগ্ধা রমণী, প্রথমেই তিনি বললেন—তোমার ছোট ভাইয়ের দুটি স্ত্রী, স্বর্গসুন্দরীদের মতো তাদের দেখতে। যেমন রূপবতী তেমনই যৌবনবতী। সত্যবতী কি ব্যাসকে নিয়োগে প্রবৃত্ত করার জন্য সামান্য লোভ দেখালেন? হতেও পারে। কিন্তু এই দুটি শব্দের পরেই স্বামীহারা দুই পুত্রবধূর জীবনের যে হাহাকারটুকু প্রকাশ করেছেন, তাতে অর্থ দাঁড়ায় অন্যরকম। সত্যবতী বলেছেন—ওদের রূপ আছে যৌবন আছে তবু ওদের কোলে কোনও ছেলে নেই। এই নিয়োগের ক্ষেত্রে বধূদেরও যে কোনও আপত্তি নেই, সেটাও একটু প্রকট করে সত্যবতী বললেন—ওরা স্বামী হারিয়েছে বটে কিন্তু ওদের পুত্রকামনা তৃপ্ত হয়নি, ওরা পুত্র চায় এবং তা চায় ধর্মের নিয়ম মেনেই—যা নিয়োগ ছাড়া সম্ভব নয়—পুত্রকামে চ ধর্মতঃ।

জননীর সনির্বন্ধ অনুরোধ শুনে ব্যাস বললেন—ধর্মের দুরকম পথই তোমার জানা আছে, মা! নিবৃত্তিমূলক ধর্মও যেমন তুমি জান, তেমনই জান প্রবৃত্তিমূলক ধর্মের কথাও। আমাকে যা তুমি করতে বলছ, তা প্রবৃত্তিমূলক এবং গুরুজনদের সকলের সম্মতি আছে বলেই এখানে প্রবৃত্তিও ধর্মের মধ্যেই পড়বে। তুমিও ধর্মানুসারেই আমাকে অনুরোধ করেছ বলে তোমার ইচ্ছে আমি পূরণ করব এবং তা করব শুধু ধর্ম সিদ্ধ হচ্ছে বলেই—তস্মাদহং তন্নিয়োগাদ্ ধর্মমুদ্দিশ্য কারণম্। মায়ের ইচ্ছে পূরণ করবেন বলেও ব্যাস কিন্তু একটা শর্ত দিলেন। বললেন—ঠিক আছে মা! তোমার পুত্রবধূরা দেবতার মতো পুত্র লাভ করবেন। কিন্তু একটা কথা তোমার পুত্রবধূদের মেনে চলতে হবে। সেটা হল—এই এক বছর ধরে

তাঁরা ব্রত-নিয়ম পালন করে নিজেদের শুদ্ধ করুন—সংবৎসরং যথান্যায়ং ততঃ শুদ্ধে ভবিষ্যতঃ। তারপর তাদের গর্ভে আমি পুত্র উৎপাদন করব।

ব্যাস যে শুদ্ধিপ্রক্রিয়ার নির্দেশ দিলেন, তার একটা কারণ আছে। জন্মলগ্নেই তিনি পিতা পরাশরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জ্ঞান এবং তপস্যার মাধ্যমে যে স্থিরতা লাভ করেছিলেন, তা ছিল নিবৃত্তিমূলক ধর্ম। কিন্তু ব্যাসের জননী যে আদেশ করেছেন, তার মধ্যে ধর্মের নির্দেশনা থাকলেও প্রবৃত্তির অভিসন্ধিও আছে। প্রবৃত্তিকে ধর্মের অনুবন্ধে স্থাপন করার জন্যই ব্যাস তাঁর প্রবৃত্তিমূলক মিলনের আধারদুটিকে ব্রত-নিয়মে শুদ্ধ করে নিতে চান। কেননা দৃষ্টিমাত্রেই হঠাৎ মিলনের মধ্যে যে কামনার প্রেরণা আছে, ব্যাস সেটাকে ধর্মের প্রেরণায় শুদ্ধ করে নিতে চান। তিনি জননীকে স্পষ্ট করে বলেছেন—যার মধ্যে ব্রত-নিয়মের কোনও শুদ্ধতা নেই, তার কোনও অধিকার নেই আমার সঙ্গে মিলিত হওয়ার—ন হি মাম্ অব্রতোপেতা উপেয়াৎ কাচিদঙ্গনা।

ব্যাসের কথা থেকে বোঝা যায়—বিবাহের মধ্যে যে সামাজিক ধর্ম আছে, তাতে যদি বা হঠাৎ দেহসর্বস্ব মিলনের যুক্তি থাকে, নিয়োগের ক্ষেত্রে সে যুক্তি নেই। এখানে পুত্রলাভের জন্যই মিলিত হওয়া, দেহানুসন্ধানের কোনও অবসর নেই এখানে। ঠিক সেই কারণেই বিচিত্রবীর্যের দুই বধূকে তিনি ব্রত-নিয়ম পালন করে পুত্রলাভের মানসিক প্রস্তুতি নিতে বলেছেন প্রায় তপস্যার মাধ্যমে। কিন্তু পুরো এক বৎসর সময় সত্যবতী অপেক্ষা করতে রাজি হলেন না। শান্তনুর রাজ্যে বিচিত্রবীর্যের পর আর রাজা নেই কোনও। জ্যেষ্ঠপ্রতিম ভীষ্ম সত্যবতীর সঙ্গে আলোচনা করে রাজকার্য পরিচালনা করে যাচ্ছেন। রাজাহীন রাজ্যের প্রজারা নিজেদের নাথবৎ বোধ করে না, মাৎস্যন্যায় আরম্ভ হয়ে যায় যত্রতত্র। সত্যবতী রাজবাড়ির রাজমাতা, রাজ্যের শাসনযন্ত্রকে তিনি চেনেন। পুত্র ব্যাসের প্রস্তাবে একটি সম্পূর্ণ বছর তিনি অপেক্ষা করতে চাইলেন না। তার মধ্যে পুত্রটি তাঁর ঋষি মানুষ, কখন তাঁর কী মতিগতি হয়, তার কি ঠিক আছে! ব্যাসপিতা পরাশরকে তো তিনি দেখেছেন।

সত্যবতী ভরসা পেলেন না। পুত্রকে বললেন—রাজ্যে রাজা না থাকলে প্রজারা অসহায় বোধ করে। সমস্ত প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকর্মের গতি রুদ্ধ হয়ে যায়। তার চেয়ে আমার বন্ধুরা যাতে এখন এখনই গর্ভ লাভ করতে পারে, সেই চেষ্টাই দেখো তুমি—সদ্যো যথা প্রপদ্যেতে দেব্যৌ গর্ভে তথা কুরু। তুমি যদি এখনই এই ব্যবস্থা করো তবে সময় পাওয়া যাবে খানিকটা, তার মধ্যে নিশ্চয় মহামতি ভীষ্ম এই সন্তানগুলিকে শিক্ষায়-দীক্ষায় বড় করে তুলবেন—তস্মাৎ গর্ভং সমাধৎস্ব ভীষ্ম সংবর্ধয়িষ্যতি। অর্থাৎ এক মহান ব্যক্তিত্বের বীজোদ্ভূত সন্তান মানুষ করবেন আর এক মহাপুরুষ—সত্যবতী যেন নিশ্চিন্ত করতে চাইলেন ব্যাসকে।

কিন্তু ব্যাস খুব খুশি হলেন না, জননীর এই উপরোধ অবশ্য তিনি ঠেলতেও পারলেন না। তিনি সন্তানদের পালনশৈলী নিয়ে ভাবছেন না, তাঁদের গর্ভাধান নিয়ে ভাবছেন। তিনি আবারও শর্ত দিলেন—যদি বধূদের ব্রত-নিয়মহীন অবস্থায় অকালেই এমন ব্যবস্থা করতে হয় আমাকে, তবে আমার এই বিরূপতা সহ্য করতে হবে তাঁদের—এটাই হোক তাঁদের ব্রত—বিরূপতাং মে সহতাম্ তয়োরেতৎ পরং ব্রতম্। ব্যাসকে দেখতে কতটা সুপুরুষ তা আমাদের জানা নেই। তবে তিনি নিজেই যেমন বলেছেন তাতে অন্তত সেই মুহূর্তে তাঁর মতো কদাকার ব্যক্তি রাজবধূদের ক্ষেত্রে সহনীয় ছিল বলে মনে হয় না। একে তো তাঁর গায়ের রং ঘন কৃষ্ণবর্ণ। তার মধ্যে তপস্যার রুক্ষতায় তাঁর মাথায় এখন কনকপিঙ্গ জটাকলাপ। মুখে একরাশ দাড়ি। পরনে চামড়ার আবরণ। চোখদুটি কৃষ্ণবর্ণ মুখের মধ্যে আগুনের মতো জ্বলছে। ব্যাস নিজেও তাঁর এই চেহারার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। নিজেই তিনি সত্যবতীকে বলেছেন—আমার এই চেহারা, এই পরিধান-বেশ, গায়ের এই বিকট গন্ধ—এসব যদি তোমার বউরা সহ্য করতে পারে—যদি যদি মে সহতে গন্ধং রূপং বেশং তথা বপুঃ—তা হলে

আজই হোক সেই মিলন। তবে হ্যাঁ, বধূদের তুমি শুচি বস্ত্র পরিধান করে সালঙ্কারে শয্যায় উপস্থিত থাকতে বলবে।

ব্যাস যে নিজের বিকট রূপ এবং বিকৃত গাত্রগন্ধ সহ্য করতে বললেন বধূদের, তা অনেকটাই নিয়োগপ্রথার বিধান মেনে। যাঁরা ভাবেন—সেকালে নিয়োগপ্রথার মাধ্যমে সমাজের উচ্চবর্ণ পুরুষেরা প্রচুর স্ত্রীসম্ভোগের সুযোগ পেতেন, তাঁরা একেবারেই ভুল ভাবেন। একটা কথা জেনে রাখুন, যে বিকৃতমনা পুরুষ সম্ভোগে লালায়িত, তার সেকালেও মেয়েছেলের অভাব হত না, একালেও নেই। কিন্তু নিয়োগপ্রথা এই কারণে তৈরি হয়নি, তা তৈরি হয়েছে সামাজিক প্রয়োজনে। অল্প বয়সে যে স্ত্রী স্বামী হারাল, সে ব্যভিচারের মধ্যে না গিয়েও অন্তত যাতে তার বাৎসল্যের পুষ্টিসাধন করে জীবন কাটাতে পারে—এটা হল নিয়োগপ্রথার মূল উদ্দেশ্য। এর সঙ্গে জুটেছে অন্যান্য সামাজিক এবং ব্যক্তিগত কারণ। বংশরক্ষা, পিণ্ডপ্রয়োজন—ইত্যাদি স্মার্ত প্রয়োজন ছাড়াও সম্পত্তির উত্তরাধিকার যাতে আপন বংশের ধারাতেই আসে—এটাও একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিয়োগের। আরও একটা কথা—নিয়োগের ক্ষেত্রে পুরুষের কামনার উদ্রেকটি যাতে যান্ত্রিকভাবে হয়, তার দিকেও একটা অদ্ভুত লক্ষ ছিল সামাজিকদের। সাধারণ নিয়মে নিযুক্ত পুরুষকে মিলিত হবার আগে নিজের গায়ে দই, লবণ, ঘি ইত্যাদি দ্রব্য জ্যাবজাবে করে মেখে নিতে হত। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, নিযুক্তা রমণী যেন স্বামী-ভিন্ন পুরুষটির প্রতি কামনাগ্রস্ত না হয়ে পড়েন। পুরাণ মুনি বেদব্যাস নিজের গায়ে প্রথামাফিক দই লবণ মাখেননি। কিন্তু তপস্যাক্লিষ্ট শরীরের বিকট গন্ধ, বিকৃত চেহারা এবং বিকট বেশ সেই বিকর্ষণ বা 'রিপালশন'-এর কাজটি করবে যা নিয়োগপ্রথায় অনুচ্চারিতভাবে ঈপ্সিত। অন্যদিকে ব্যাস তাঁর দুই ভ্রাতৃবধূকে যে শুচিবস্ত্রে সালংকারে শয্যায় উপস্থিত হতে বলেছেন, তার কারণ, তাঁদের দেখে নিবৃত্তির ধর্মে প্রতিষ্ঠিত মুনির যান্ত্রিকভাবেও যাতে কামনার উদ্রেক হয় সেই জন্য। তা না হলে পুত্রোৎপাদনের তাৎপর্যটাই যে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

সত্যবতী ব্যাসের প্রস্তাব শোনামাত্রেই তাঁর পুত্রবধূদের কাছে উপস্থিত হয়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে নিজের অসহায়তা এবং নিরুপায় ভাবটি প্রকাশ করে বলেছেন—আমার কপালের দোষে আজ প্রসিদ্ধ ভরতবংশ উচ্ছিন্ন হতে চলেছে। বংশে একটিও পুত্রসন্তান বেঁচে নেই। এই অবস্থায় আমাকে পীড়িত এবং দুঃখিত দেখে মহামতি ভীষ্ম আমাকে এই বুদ্ধি দিয়েছেন। কিন্তু যে বুদ্ধি আমরা করেছি, তা সফল করতে পার একমাত্র তোমরাই। তোমরাই ভরতবংশকে উদ্ধার করতে পার নিয়োগজাত পুত্রকে গর্ভে ধারণ করে—নষ্টঞ্চ ভারতং বংশং পুনরেব সমুদ্ধর। বধূদের কোনওমতে রাজি করিয়ে সত্যবতী ঋষি-মুনি-ব্রাহ্মণ-অতিথিদের খাবার ব্যবস্থা করতে গেলেন।

রাত্রির আঁধার ঘনিয়ে এলে সত্যবতী আবারও বধূদের কাছে এসে বললেন—তোমরা তৈরি হও, বাছারা! তোমাদের দেবর আসবেন তোমাদের সঙ্গে মিলিত হতে। তোমরা দ্বিধাহীনচিত্তে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে থেকো শয্যায়। তিনি আসবেন রাত গভীর হলে—অপ্রমত্তা প্রতীক্ষৈনং নিশীথে হ্যাগমিষ্যতি। সত্যবতীর কথা মান্য করে জ্যেষ্ঠা বধূ সুস্নাত এবং অলঙ্কৃত অবস্থায় অপেক্ষা করতে লাগলেন শয্যায়। মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন ভীষ্ম, শান্তনু ইত্যাদি কুরুপুঙ্গবদের কথা, যাতে তাঁদের মতোই বীর পুত্র হয়। নির্জন শয়নকক্ষে আলো জ্বলছিল। ব্যাসের নির্দেশেই হয়তো এই ব্যবস্থা, যাতে তাঁর বিরূপ, বিকৃত চেহারা বধূদের দৃষ্টিগোচর হয়। দীপ্যমান প্রদীপালোকে ব্যাসকে যখন আপন শয়নকক্ষে উপস্থিত দেখলেন অম্বিকা তখন ঘৃণায়, অনীহায় তাঁর চক্ষু মুদে গেল। ব্যাসের ওই কালোকোলো চেহারা, মাথায় পিঙ্গল জটাভার, আগুনের ভাটার মতো দুটি তপোদীপ্ত চক্ষু কালো মুখের গহ্বরে, পাঁশুটে গোঁফ। অম্বিকা তাকে দেখে ভয়ে অনীহায় চোখ বন্ধ করে ফেললেন—বভ্রূণি চৈব শ্মশ্রূণি দৃষ্টা দেবী ন্যমীলয়ৎ। তবু মিলন সম্পন্ন হল, কেননা জননী

সত্যবতীকে কথা দিয়েছেন ব্যাস।

মিলন শেষে বিশ্রান্ত ব্যাসকে সত্যবতী জিজ্ঞাসা করলেন—আমার বধূটি গুণবান একটি রাজপুত্রের জননী হবে তো? ব্যাস তাঁর অতিলৌকিক দৃষ্টিতে জবাব দিলেন—অনেক শক্তি, অনেক বুদ্ধি নিয়ে এই ছেলে জন্মাবে। সে হবে বিদ্বান এবং রাজপ্রতিম, কিন্তু এর মায়ের দোষে এ ছেলে অন্ধ হয়েই জন্মাবে। সত্যবতী হাহাকার করে বললেন—একটি অন্ধ ছেলে তো কখনও কুরুবংশের রাজা হতে পারে না। তুমি বাছা দ্বিতীয় একটি সন্তানের সম্ভাবনা করো, যে এই বংশের রক্ষক হবে, রাজা হবে। ব্যাস জননীকে কথা দিলেন, সত্যবতীও যথাসম্ভব সচেতন করে দিলেন দ্বিতীয়া বধূ অম্বালিকাকে কিন্তু তিনিও যখন ব্যাসকে তাঁর শয়নকক্ষে দেখলেন, তখন তিনি অম্বিকার দৃষ্টান্ত স্মরণ করে চোখ বন্ধ করলেন না বটে, কিন্তু সেই দীপ্তচক্ষু, জটাশ্মশ্রু দর্শন করে তিনি ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেলেন—বিবর্ণা পাণ্ডুসঙ্কাশা সমপদ্যত ভারত। মিলন সম্পূর্ণ হলে ব্যাস বললেন—আমাকে বিরূপ দেখে তুমি যে এমন হয়ে গেলে, তাতে তোমার ছেলেটিও পাণ্ডুবর্ণ হবে এবং ওর নামও হোক পাণ্ডু।

অম্বালিকার ঘর ছেড়ে ব্যাস যখন চলে যাবার উপক্রম করছেন তখন সত্যবতী আবারও ব্যাসকে জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন হবে এই পুত্র? ব্যাস পূর্বোক্ত কথাগুলি বললেন সত্যবতীকে। ব্যাসের কথামতো সময় পূর্ণ হলে অম্বিকার গর্ভ থেকে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র জন্মালেন, অম্বালিকার গর্ভে জন্মালেন পাণ্ডু। সত্যবতী ভাবলেন—দুই রানির গর্ভে দুটি পুত্র এল অথচ দুটির মধ্যেই কিছু খুঁত রয়ে গেল। তার চেয়ে ব্যাসকে তিনি আরও একবার অনুরোধ করবেন, যাতে বড় রানি অম্বিকার গর্ভে আরও একটি পুত্র লাভ করা যায়। মায়ের শেষ অনুরোধে ব্যাস রাজি হলেন। সত্যবতীও সময়কালে ঋতুমুক্তা অম্বিকাকে আবারও বলে-কয়ে রাজি করালেন। কিন্তু সত্যবতীর সামনে তিনি রাজি হলেও যখনই ব্যাসের বিকট আকৃতি আর বিকৃত গাত্রগন্ধের কথা তাঁর মনে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে সেই পূর্বতনী অনীহা জুগুপ্সা জন্ম নিল অম্বিকার মনে।

ক্রান্তদর্শী কবি রাজরানির মনের ব্যথা বোঝেন। তিনি নিজেই লিখেছেন—অম্বিকা দেবকন্যার মতো সুন্দরী, দেবোপম সুখবিলাসে তিনি অভ্যস্ত। বিকটাকার কৃষ্ণকায় দুর্গন্ধ ঋষির সঙ্গ তাঁর পছন্দ হয়নি বলেই তিনি শাশুড়ী সত্যবতীর কথা মানতে পারলেন না—নাকরোদ্ বচনং দেব্যা ভয়াৎ সুরসুতোপমা। অম্বিকা এই পূর্বনির্ধারিত ধর্ষণপ্রায় মিলন থেকে বাঁচবার জন্য আপন দাসীটিকে রতনে-ভূষণে সাজিয়ে পাঠিয়ে দিলেন ব্যাসের কাছে।

মনে রাখা দরকার, এই দাসী কোনও সাধারণ দাসী নয়। সেকালের দিনে রাজা-রাজড়ারা কেউ কেউ রাজরানিদের শারীরিক বিরহ একেবারেই সহ্য করতেন না। পঞ্চদিবসব্যাপী ঋতুকাল স্বচ্ছন্দে কাটানোর জন্যই দাসীগ্রহণের এই বিকল্প ব্যবস্থা। কোনও কোনও সময় বিবাহকালেই দাসীদের সরবরাহ করা হত কন্যাপিতার বাড়ি থেকে। এঁরা রাজার ভোগ্যা স্ত্রী ছিলেন বলে এঁদের প্রভাবপ্রতিপত্তিও কিছু কম হত না, এবং এঁদের সামাজিক সম্মান খানিকটা কম থাকলেও দাসীগর্ভজাত পুত্রেরা সামাজিকভাবে স্বীকৃত হতেন। রাজার ভোগ্যা স্ত্রী বলে তাঁরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যথেষ্ট রূপবতী হতেন—যেমন অম্বিকা যে দাসীটিকে সাজিয়ে দিলেন—তিনি স্বর্গের অপ্সরার মতো সুন্দরী। ঋষি ব্যাস কিছু বুঝতে পারবেন না এবং তাঁকেই বিচিত্রবীর্যের প্রথমা স্ত্রী ভেবে নেবেন—এই ভাবনায় দাসীকে নিজের রাজকীয় অলঙ্কারে সজ্জিত করে অম্বিকা তাঁকে নিজের শয়নকক্ষে পাঠিয়ে দিলেন—প্রেষয়ামাস কৃষ্ণায়..ভূষয়িত্বাপ্সরোপমাম্।

এতদিন যা ঘটেছে, ব্যাস মায়ের আদেশ পালন করে গেছেন বিনা বাধায়। কিন্তু যেখানে তাঁকে আমন্ত্রণ আপ্যায়ন করে ব্যক্তির প্রয়োজন এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনে পুত্র উৎপাদনের

জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে, সেখানে রাজবধূদের দিক থেকে ওই ঘৃণা এবং অনীহা তাঁকে মনে মনে খানিকটা লজ্জিত এবং অপমানিত করেছে নিশ্চয়ই। নিয়োগ যেহেতু, অতএব তাঁদের দিক থেকে কামাতিশয্য ব্যাসের কাছে কাম্য ছিল না নিশ্চয়ই, কিন্তু পুত্রলাভার্থীর কাছে ঘৃণা কিংবা অনীহাও তো তাঁর প্রাপ্য ছিল না। তিনি কী দোষ করেছেন? হতে পারে, তিনি জটা-শ্মশ্রুর বিবর্ধনে কুৎসিত-দর্শন ছিলেন; হতে পারে তাঁর গায়ে বিকট গন্ধ ছিল; হতে পারে, তাঁর জটাজূটমণ্ডিত কৃষ্ণবর্ণ মুখের মধ্যে চক্ষুদুটি আর্ষতেজে উজ্জ্বল ছিল, কিন্তু তাতে তিনি তো নিজেকে নিজেই ঘৃণা করেন না। কোন কুৎসিত দর্শন পুরুষ বা রমণী আপন রূপে অসন্তুষ্ট হয়। কাজেই ব্যাস একটু অপমানিত বোধ করেই ছিলেন।

ঠিক সেই অপমানক্লিষ্ট মনে তিনি যখন মায়ের আদেশ পালন করার জন্যই শুধু জ্যেষ্ঠা রাজবধূ অম্বিকার শয়নকক্ষে পুনরায় উপস্থিত হলেন, তখন দেখলেন এক অপূর্ব রূপবতী রমণী তাঁকে দ্বারমুখেই এগিয়ে এসে অভিবাদন জানাল—সা তমৃষিমনুপ্রাপ্তং প্রত্যুদ্গম্যাভিবাদ্য চ। পূর্বে তো এমন ঘটেনি। ব্যাস অবাক হলেন নিশ্চয়। যিনি রাজবধূর দ্বিতীয় মানসিক প্রত্যাখ্যানের জন্য নিজে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে এসেছেন, সেই তাঁকে দুয়ার পর্যন্ত এগিয়ে এসে সাদর সম্ভাষণে অভিবাদিত করছে—এ কোন রমণী! ব্যাস মুহূর্তের মধ্যেই বুঝলেন—ইনি রাজবধূ অম্বিকা নন, তাঁর স্থলাভিষিক্তা হয়েছে অন্য কেউ।

বিচিত্রবীর্যের ভোগ্যা দাসী রাজবধূ নন বলেই তত আত্মসচেতন নয়। বিশেষত অভিবাদন-প্রত্যুদ্গমনেই তো সে চিরকাল অভ্যস্ত। তা ছাড়া এ তো তার কাছে স্বপ্ন। রাজবাড়িতে বিচিত্রবীর্যের বিচিত্র ভোগ সম্পূর্ণ করা ছাড়া আর তো কোনও অধিকার ছিল না তার। তারও তো রাজবধূদের মতো মা হতে ইচ্ছে করে। শরীর সে পূর্বেই নিবেদন করেছে বিবাহের বিধিনিয়মের বাইরে গিয়ে। কাজেই ব্যাসের সঙ্গে শারীরিক মিলনে সে কুণ্ঠিত নয়। কিন্তু তারও তো স্বপ্ন ছিল—কাউকে সে এমন করে চাইবে, যে তার সত্তার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তার কুক্ষিতে পরম কাম্য এক সন্তানের জন্ম দেবে। অন্যদিকে নিবৃত্তিমূলক মার্গ ত্যাগ করে ব্যাস আজকে মায়ের আদেশে প্রবৃত্তিমূলক ধর্মের পরিসরে নেমে আসতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি যেখানে শারীরিক মিলনে উদ্‌যুক্ত হচ্ছেন, সেখানে নিয়োগ-মিলনের যান্ত্রিকতা থাকলেও হত, কিন্তু ঘৃণাও তো তাঁর প্রাপ্য ছিল না। অতএব আজকের এই অর্ধরাত্রের উজ্জ্বল দীপালোকে যখন তিনি অম্বিকার সুন্দরী দাসীটিকে আপন অভ্যর্থনায় নিযুক্ত দেখলেন তখন তাঁর মধ্যেও আর নিয়োগপ্রথার যান্ত্রিকতা থাকল না। তিনি দাসীর সাদর আমন্ত্রণে নন্দিত হয়ে তাঁর রমণগৃহের শয্যায় উপবিষ্ট হলেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের মতো বিখ্যাত ঋষি মিলনকামী হয়ে এসেছেন ঘরে। অহো ভাগ্য মনে করে অম্বিকার দাসী তাঁর চরণ ধুইয়ে দিল। যিনি এই দাসীর অন্তরে ফাল্গুন বাতাসে ভেসে আসা আশার অরূপ বাণী হয়ে ছিলেন, যিনি বনের আকুল নিঃশ্বাসের মধ্যে এই দাসীর ইচ্ছে হয়ে ছিলেন, তিনি আজ এই দাসীর স্বপ্নদুয়ার ভেঙে অন্তর থেকে বাইরে এসে পৌঁছেছেন এই আকুল শয্যাতলে। দাসী অনেক আদরে তাঁর পা ধুইয়ে দিল, হয়তো এলোকেশে মুছিয়ে দিল বেদব্যাসের চরণ। হাতে ব্যজন নিয়ে বাতাস করল মনোভারাক্রান্ত ঋষিকে—সৎকৃত্যোপচাচর হ। "উপচচার বাতব্যজনাদিনা শুশ্রূষিতবতী"। রাজরানি, রাজার দুলালি যা সহ্য করতে পারে না, দাসী তা পারে। তার নাকে কোনও দুর্গন্ধও লাগল না, ব্যাসের জটাকলাপশোভিত মুখখানিও তার কাছে অশোভন কুৎসিত মনে হল না। কেননা চাওয়ার ওপরেই ভাল-মন্দ নির্ভর করে অনেকটা। মহর্ষিকে সে প্রাণ থেকে চাইল।

রাজবধূ অম্বিকা, অম্বালিকা—কেউ তো ঘৃণায় কথাই বলেনি তাঁর সঙ্গে। দাসী কথা বলল। মুনিও কথা বলতে বলতে মনের ভাব প্রকাশ করলেন। মনের ভাবপ্রকাশ করতে করতে অনুরাগ ব্যক্ত করলেন। সুস্থ মিলনের ক্রম তো এইগুলিই। বেদব্যাস মুনি হলেও

তিনি তো নিশ্চয়ই মোক্ষাভিসন্ধানের জন্য রমণগৃহে প্রবেশ করেননি। ধর্মানুসারেও যে মিলন ঘটে, সেই মিলনের মধ্যেও তো সকামভাব থাকবে। দাসীর সঙ্গে মিলনে নিয়োগের যান্ত্রিকতা নেই বলেই মুনি সানুরাগে দাসীর প্রত্যঙ্গ স্পর্শ করলেন—বাগ্‌ভাবোপপ্রদানেন গাত্রসংস্পর্শনেন চ। মিলন সম্পূর্ণ হল। বেদব্যাস প্রবৃত্তিমূলক ধর্মের সম্পূর্ণ আস্বাদ গ্রহণ করে পরম তুষ্ট হলেন দাসীর সঙ্গে মিলনে—কামোপভোগেন রহস্তস্যাং তুষ্টিমগাদৃষিঃ।

যে অম্বা-অম্বালিকার দাম্পত্যসুখ দেখেছে প্রথম থেকে, যে চিরকাল বিচিত্রবীর্যের ভোগ্যা দাসী হয়ে থেকেছে, অথচ বধূর সম্মান পায়নি, তার কষ্ট ঠিক কোথায়—ক্রান্তদর্শী ঋষি তা বোঝেন। কাজেই তার সঙ্গে সারারাত্রি কাটিয়ে মিলনে সন্তুষ্ট হয়েই বেদব্যাস প্রথম যে আশীর্বাদ করলেন, তা হল—আজ থেকে আর তুমি কারও দাসী হয়ে থাকবে না—অব্রবীচ্চৈনাম্ অভুজিষ্যা ভবিষ্যসি। আর আজ এই যে তোমার গর্ভাধান করলাম সেই গর্ভে আসবেন এক শ্রেষ্ঠ পুরুষ। সমস্ত ধার্মিক এবং জগতের সমস্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তির মধ্যে তিনি হবেন শ্রেষ্ঠ—ধর্মাত্মা ভবিতা লোকে সর্ববুদ্ধিমতাং বরঃ। বিচিত্রবীর্যের শূদ্রা দাসীর গর্ভে ধর্মস্বরূপ বিদুর জন্মালেন। মহাভারতের কবি এর আগে লিখেছিলেন—অম্বিকার গর্ভে জন্মালেন ধৃতরাষ্ট্র, অম্বালিকার গর্ভে জন্মালেন পাণ্ডু, কিন্তু বিদুরের জন্ম বলতে গিয়ে বললেন—আর কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ছেলের নাম হল বিদুর—স জজ্ঞে বিদুরো নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়নাত্মজঃ। অর্থাৎ বিচিত্রবীর্যের বধূদের গর্ভে নিজের আর্ষ বীজ উপহার দিয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁদের পিতৃত্ব স্বীকার করলেন বটে, কিন্তু একটি সন্তানকে 'ওন্' করার যে ভাবনা পিতার অন্তরে থাকে, দাসীর গর্ভজাত সেই সন্তানকেই তিনি প্রকৃত 'আত্মজ' বলে মনে করেছেন। শূদ্রা রমণীর প্রতি এ যেন বেদব্যাসের পক্ষপাত। হয়তো নিজে বংশপরিচয়হীন ধীবরের গৃহলালিতা মৎস্যাগন্ধা জননীর গর্ভে জন্মেছিলেন বলেই শূদ্রার সম্ভোগেই তিনি তৃপ্তি লাভ করেছেন এবং শূদ্রার গর্ভস্থ সন্তানের মধ্যেই তিনি আপন আর্ষ স্বরূপটি খুঁজে পেয়েছেন। এ তাঁর জননীর রক্তের উত্তরাধিকার, তিনি মাতৃঋণ পরিশোধ করেছেন ঋষিজনোচিত করুণায়, জাতিবর্ণের ঊর্ধ্বে স্থিত হয়ে।

জ্যেষ্ঠা রাজবধূ অম্বিকাকে পুনরায় পুত্রজন্মে নিযুক্ত করে সত্যবতী অধীর আগ্রহে পুত্র ব্যাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। অম্বিকার শয়নগৃহে যে অন্য কেউ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন সত্যবতী তা জানতেন না। ব্যাস যেখানে উত্তমর্ণের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে আছেন, সেখানে রাজবাড়ি বা রাজবধূদের তোয়াক্কা করে চলার লোক তিনি নন। কাজেই শয়নগৃহ থেকে নির্গত হয়েই ব্যাস অম্বিকার প্রতারণার কথাও যেমন সত্যবতীকে জানালেন, তেমনই শূদ্রা দাসীর গর্ভে আপন—একেবারে একান্ত আপন পুত্রজন্মের সানন্দ সংবাদও তিনি সত্যবতীকে জানিয়ে গেলেন—প্রলম্ভমাত্মনশ্চৈব শূদ্রায়াং পুত্রজন্ম চ।

প্রসিদ্ধ ভরতবংশে ঋষি ব্যাসের মাধ্যমে যেভাবে বংশধারা সৃষ্টি হল তাতে ভরতবংশের প্রধান উত্তরাধিকারীর কাছে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা লাভ করলেন ব্যাস। মহামতি বিদুর যখন বড় হয়েছেন, রাজপুত্রদের যখন বিয়ে দেবার সময় এসেছে, তখন ভরতবংশের প্রধান উত্তরাধিকারীর—আসলে যাঁর রাজা হবার কথা ছিল, যাঁর প্রথম অধিকার ছিল বংশধারা রক্ষা করার—সেই ভীষ্ম কিন্তু মহর্ষি ব্যাসকে সম্পূর্ণ 'ক্রেডিট' দিয়ে চলেছেন—মহারাজ শান্তনুর বংশ আবার আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি এবং বংশপ্রতিষ্ঠায় যাঁরা প্রধানভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে আমি তো আছিই, আছেন মাতা সত্যবতী, আর আছেন ঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস—ময়া চ সত্যবত্যা চ কৃষ্ণেন চ মহাত্মনা।

কী অদ্ভুত এক শৈলী কাজ করছে এখানে। রাজা এবং রানি। শান্তনু এবং সত্যবতী। তাঁদের শাস্ত্রবিধিসম্মত বিবাহের ফলে যে সন্তান দুটি হয়েছিল, তাঁরা দুজনেই মারা গেছেন। কিন্তু যে দুটি সন্তান তথাকথিতভাবে অবৈধ, শান্তনুর বংশ রক্ষা করছেন তাঁরাই। একজন

সন্তান রানির। তিনি যমুনানদীর মাঝখানে অবিবাহিত অবস্থায় মহর্ষি পরাশরের মনোভীষ্ট পূরণ করতে গিয়ে কানীন অবস্থায় ব্যাসের জন্ম দিলেন। রানি সত্যবতী নিজেও জন্মলগ্নেই যমুনানদীর সঙ্গে সার্বিক সম্বন্ধযুক্ত। তিনি যমুনায় নৌকো বাইতেন আবার তাঁর পুত্রেরও জন্ম হল যমুনার মধ্যদ্বীপে। অন্যদিকে রাজার যিনি ছেলে সেই ভীষ্মও কিন্তু শান্তনুর সামাজিক নিয়মে বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভজাত নন। শান্তনুর প্রেমে এবং স্বর্গলোকের অলৌকিক অভিসন্ধিতে গঙ্গার গর্ভে ভীষ্মের জন্ম। ভীষ্মের শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনপূর্ব বয়স পর্যন্ত জীবন কেটেছে গঙ্গার ঘরেই, হস্তিনাপুরে নয়। অন্যদিকে ব্যাসও জন্মের পরেই মায়ের স্মরণমাত্রে উপস্থিতির প্রতিজ্ঞা করে চলে গেছেন পিতা পরাশরের সঙ্গে।

তা হলে দেখুন, যমুনার অন্তরবর্তী দ্বীপজন্মা বেদব্যাস এবং গঙ্গার গর্ভজাত ভীষ্ম—রাজা ও রানির গূঢ়জাত দুই সন্তান—যাঁরা কিন্তু রাজবাড়ির সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে সম্বন্ধিত নন, তাঁরাই কিন্তু প্রসিদ্ধ বংশের কুলতন্ত্র স্থাপন করছেন—সমবস্থাপিতং ভূয়ো যুষ্মাসু কুলতন্তুষু। একজন ভরতবংশের বীজন্যাস করে গেলেন, অন্যজন সেই বীজাঙ্কুর বিবর্ধিত করছেন। মাঝখানে যোগাযোগটুকু ঘটাচ্ছেন সত্যবতী—যিনি ভারী সুন্দরভাবে ব্যাসকে বলেছেন—তুমি বীজ আধান করো, ভীষ্ম সেই বীজ বিবর্ধন করবেন—তস্মাদ্ গর্ভং সমাধৎস্ব ভীষ্মঃ সংবর্ধয়িষ্যতি। অন্যদিকে দেখুন—গঙ্গা এবং যমুনা—এই দুই নদীই তো বৈদিকোত্তর যুগে সিন্ধু-সরস্বতীর আর্য উত্তরাধিকার উত্তর এবং মধ্যভারতে প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং বিবর্ধিত করেছিল। আমরা যদি বলি—যামুনেয় নদী সভ্যতার প্রতিনিধি ব্যাস এবং গাঙ্গেয় সভ্যতার প্রতিনিধি ভীষ্ম—এই দুই পিতামহের সংযোগেই মধ্য এবং উত্তর ভারত জুড়ে ভরতবংশের সুপ্রতিষ্ঠা ঘটল—তা হলেই ঠিক বলা হয়। পাণ্ডবের কৌরবের এক পিতামহ নন, দুই পিতামহ। দু'পক্ষই ব্যাস এবং ভীষ্মকে পিতামহ বলেই ডাকতেন। অন্যদিকে মহাভারতের সময়কালীন যে রাজবংশ উত্তর-মধ্য ভারতের ব্রাহ্মণ্য এবং ক্ষাত্র সংস্কৃতি ধারণ করে রেখেছিল, তা প্রধানত যমুনানদী এবং গঙ্গানদীর আববাহিক সংস্কৃতি এবং এই সংস্কৃতির ব্রাহ্মণ্য বীজ রাজবংশের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল ব্যাসের মাধ্যমে এবং তার ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার ঘটেছিল ভীষ্মের মাধ্যমে।

একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে—ব্যাস যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বহন করে এনেছিলেন, তা ফুল-বেলপাতা-নৈবেদ্যের ব্রাহ্মণ্য নয়, কিংবা তা নয় চাতুর্বর্ণ্যের বিভেদসৃষ্টিকারী শুদ্ধীকরণের সংস্কার। তিনি নিজে শূদ্রা জননীর মায়াশোণিত ধারণ করেছেন নিজের ধমনীতে, আর আপন আত্মজ বলে তিনি যাঁর জন্ম দিয়েছেন, তিনিও শূদ্রার গর্ভজাত, অথচ তাঁর সম্পূর্ণ স্বরূপটিই ধর্মের। বিদুরের জন্ম দিয়ে তিনি সেই সর্বাশ্লেষী ধর্মের জন্ম দিয়েছেন—যে ধর্ম রাজাকে সততা এবং ন্যায়ের পথে সদা সঞ্চালিত করে এবং মানুষের কল্যাণ করে—কারণ বিদুর শূদ্র বলেই তিনি আম-জনতার প্রতিভূ। অন্য দিকে ভীষ্মকে দেখুন—তিনি ভরতবংশে শান্তনুর প্রথম উত্তরাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি রাজা নন। তিনি গৃহস্থ হলেও বিবাহিত নন। ভরতবংশের জাতকদের নিঃস্বার্থভাবে মানুষ করা এবং তাঁদের রাষ্ট্রসংবর্ধনে সাহায্য এবং সেবা করাটাই তাঁর ধর্ম। ব্যাস সন্ন্যাসী হতে গিয়ে গৃহস্থের কাজ করে গেলেন রাজবংশ বিস্তার করে, অন্যজন ভীষ্ম গৃহস্থ হয়েও সন্ন্যাসীর মানসিকতায় রাজবংশের সেবা করে গেলেন স্বার্থহীন সেবকের মর্যাদায়। এঁরা দুজনে মাতুতো আর বাবাতুতো ভাই, সত্যবতী বলেছিলেন—যথৈব পিতৃতো ভীষ্মস্তথা ত্বমপি মাতৃতঃ—ভীষ্ম যেমন তাঁর বাবার সম্বন্ধে আমার ছেলে, তেমনই তুমিও মায়ের দিক থেকে শান্তনুর ছেলে।

লোককথায় শুনেছি—আজন্ম ব্রহ্মচারী বেদান্তী শঙ্করাচার্যকেও নাকি কোনও এক বিচারসভায় হেরে যাবার পর কামশাস্ত্র পড়তে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর সমস্ত পাঠটুকুই ছিল প্রয়োজনের তাড়নায় সম্পন্ন, অতএব যান্ত্রিক। ব্যাসকে সেদিক দিয়ে আমি এক খাঁটি মানুষ মনে করি। তাঁর এক অযান্ত্রিক মন ছিল বলেই তিনি অত বড় কবি। সত্যবতীর নিয়োগ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে ব্যাসের আর রাজবাড়িতে থাকবার উপায় ছিল না। তিনি থাকেনওনি। নিজের পূর্ববিহিত ধর্মকার্য সম্পন্ন করার জন্য তিনি নিশ্চয়ই তাঁর আশ্রমে ফিরে গেছেন। কিন্তু অন্যান্য মহা মহা ঋষির ক্ষেত্রে যা দেখেছি, এক্ষেত্রে যেন তার অন্যথা হল। অন্যান্য ঋষিরা আপন কামনার উপসর্গেই হোক, অথবা অন্যতরা রমণীর সকাম লাস্যে আমোদিত হয়েই হোক, মিলন সমাধা হলেই তাঁদের আর প্রায়ই উপস্থিত দেখি না। স্বয়ং ভরতমাতা শকুন্তলাকেই আমরা পিতামাতার লালনহীন অবস্থায় পক্ষীর পক্ষছায়ায় অবহেলিত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছি। কিন্তু ব্যাসের মনে অদ্ভুত এক মায়া আছে। এ মায়া হয়তো ঋষি ধর্মের বিপরীত ধর্ম, কিন্তু ভবিষ্যতে যিনি মহাভারতের মতো মহাকাব্য লিখবেন, তাঁর হৃদয়ে আর্যভাব যতখানি আছে, তার চেয়ে বেশি আছে কবিজনোচিত বেদনাবোধ। ঠিক সেই কারণেই বোধ হয় আপন নিক্ষিপ্ত বীজের প্রতি তাঁর মমতা আছে, মায়া আছে। এ মায়া আবার ঠিক বন্ধনও নয়, যাতে বলা যায়—তিনি মোহগর্ভে নিপতিত হয়েছিলেন। কিন্তু মাতা সত্যবতী যেহেতু তাঁকে পুত্রোৎপত্তিতে নিযুক্ত করেছিলেন, তাই সেই পুত্রদের বীজসম্বন্ধের দায়টুকু তিনি কখনওই এড়িয়ে যান না। তিনি বার বার ফিরে আসেন হস্তিনাপুরীতে। নিস্তব্ধ আশ্রম ছেড়ে বার বার তিনি আসেন ধর্মের গার্হস্থ্য প্রয়োগটুকু ঘটানোর জন্য, বোঝানোর জন্য।

মহামতি ভীষ্ম, যিনি ব্যাসের গৃহস্থ 'কাউন্টার-পার্ট', তিনি হস্তিনাপুরে তাঁর অভিভাবকত্বের কাজটুকু সুসম্পন্ন করেছেন দুইভাবে। প্রথমত বালকদের যেভাবে শিক্ষা দেবার দরকার, তা তিনি দিয়েছেন এবং সে শিক্ষা এমনই যে ধৃতরাষ্ট্রের মতো অন্ধ ব্যক্তিও তাতে রাজা হবার মানসিক শক্তি লাভ করেছেন। রাজা অবশ্য তিনি হতে পারলেন না অন্ধত্বের কারণেই। রাজা হলেন পাণ্ডু। দ্বিতীয়ত রাজকুমারদের বিবাহের ব্যাপারটা ভীষ্ম খুব ভালভাবে চিন্তা করেছিলেন। পিতা শান্তনুর অপর দুই পুত্র চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্য যেভাবে নিঃসন্তান অবস্থায় স্বর্গত হয়েছেন এবং কুরু-ভরতবংশের পরম্পরাগ্রন্থি রক্ষা করার জন্য তাঁর যত দুশ্চিন্তা গেছে, তেমনটি যাতে আর না হয়, সেজন্য তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রদের জন্য এমন ধরনের বধূ নির্বাচন করতে চাইলেন, যাঁদের পুত্রলাভের ক্ষমতা পূর্বাহ্নেই নিশ্চিত।

কুমারদের বিবাহকর্ম সম্পূর্ণ হয়ে যাবার পর পরই আমরা মহামতি ব্যাসকে হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে প্রবেশ করতে দেখছি। নিজের আশ্রমে গিয়ে হয়তো সম্পূর্ণ থিতু হয়ে বসার তাঁর উপায় হয়নি। এতদিন নানা আশ্রম নানা তীর্থ তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। লোকমুখে তাঁর নিয়োগজাত সন্তানদের বিবাহ-বার্তাও কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর কানে পৌঁছে গেছে। তাঁরই নিহিত বীজ পুনরায় পরম্পরা লাভ করবে হয়তো এই চিন্তাই তাঁকে টেনে এনেছে হস্তিনাপুরে। সেদিন তিনি বড়ই শ্রান্ত ছিলেন, পথশ্রমে ক্ষুধায় পিপাসায় দীর্ণ হয়ে তিনি রাজবাড়িতে উপস্থিত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের ঘরে উঠেছেন। পুত্রবধূ গান্ধারী তাঁকে পরম যত্নে আপ্যায়ন করে তৃষ্ণার জলপান দিয়েছেন, ক্ষুধার অন্ন দিয়েছেন। গান্ধারীর সেবায় মহর্ষি ব্যাস এতই খুশি হয়েছেন যে, তিনি বর চাইতে বলেছেন গান্ধারীকে। গান্ধারী লোভী নন। তিনি বিবাহের আগেই শিবের কাছে শতপুত্রের জননী হবার বর পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় এই সুযোগ আসতে তিনি অন্ধ স্বামীর মর্যাদা সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে বর চেয়েছিলেন—যেন তিনি স্বামীর মতোই সমগুণী পুত্র পান— সা বব্রে সদৃশং ভর্তুঃ পুত্রাণাং শতমাত্মনঃ।

গান্ধারীকে বর দিয়েছেন বেদব্যাস। কিন্তু সেটা খুব বড় কথা নয়। আমাদের জিজ্ঞাসা হয়

—ব্যাসের বিভিন্ন যাত্রাপথে আর কি আশ্রম, জনপদ বা রাজ্য ছিল না! যদি বা তিনি এলেন —তাও কারও সঙ্গে দেখা না করে, জননী সত্যবতীর মহলে না উঠে তিনি ধৃতরাষ্ট্রের ঘরে উঠেছেন কেন? ঠিক এইখানেই ব্যাসকে ঋষির চেয়েও, কবির চেয়েও বড় বেশি এক মানুষ মনে হয়। তিনি বার বার ফিরে আসেন সেই রাজগৃহের মহলে যেখানে তাঁর পুত্রেরা আছেন। অদ্ভুত তাঁর এই মায়া, এই মমতাবোধ, মাতা স্মরণ করার আগে যাঁকে একবারও দেখা যায়নি হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে, তাঁকেই এখন সামান্য ছুতোয়, ক্ষুধা-তৃষ্ণার সামান্য অন্নপানের অছিলায়—ক্ষুৎশ্রমাভি-পরিগ্লানম্—ধৃতরাষ্ট্রগৃহে উপস্থিত দেখছি। শুধু এখনই নয়, এরপর থেকে কুরুবাড়ির অনেক সুখে, দুঃখে, আপদে, বিপদে, উৎসবে, যজ্ঞে ব্যাসের এই চংক্রমণ ঘটবে, যেখানে মানুষ ব্যাসকে আমরা দেখতে পাব।

এই যে এখনও তিনি কুরুবাড়ির অন্দরমহলে গান্ধারীর সেবাসুখ গ্রহণ করছেন, এর জন্য তাঁর ক্ষুধাতৃষ্ণা যতখানি দায়ী, তার থেকে অনেক বেশি মনে হয়—তিনি তার আত্মজাত পুত্রদের বধূমুখ দর্শন করতে এসেছেন। গান্ধারীকে তিনি যে বর দিলেন, তা বুঝি জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূর প্রতি তাঁর প্রথম উপহার। কুন্তী-মাদ্রীর কাছে তাঁর যাওয়া হয়নি, কারণ ততদিনে দাদা ধৃতরাষ্ট্রের হাতে রাজ্যভার ন্যস্ত করে পাণ্ডু বনবাসী হয়েছেন। অবশ্য বনবাসী হলেও পাণ্ডুর কোনও খবর ব্যাস জানতেন না, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন।

কারণ মুনি-ঋষিমাত্রেই বিভিন্ন স্থান পর্যটন তাঁদের স্বভাবসিদ্ধ ছিল। অতএব পাণ্ডুর খবর অবশ্যই তাঁর কানে পৌঁছেছে। বিশেষত গান্ধারীর কাছে তিনি যখন উপস্থিত হয়েছিলেন, পাণ্ডু তখন রাজ্য ছেড়ে বনবাসী হওয়ায় তাঁর মনে সংশয়েরও অবকাশ ঘটেছে নিশ্চয়ই। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধতার জন্য জ্যেষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও রাজা হতে পারেননি, অথচ পাণ্ডু রাজা হয়েও স্ত্রীদের নিয়ে বেশ কিছু কাল বনবাসী হয়েছেন এবং কিছুতেই ফিরছেন না—এই ঘটনার ইঙ্গিত কোন দিকে, ক্রান্তদর্শী ঋষি-কবি তা ঠিক বুঝতে পারেন এবং সেই বোধ নিয়েই তিনি প্রস্থান করেছেন।

শিবের বর এবং শ্বশুরের বর-পাওয়া গান্ধারী গর্ভধারণ করলেন অনতিকাল পরেই। কিন্তু দু বছর প্রায় চলে যায়, অথচ তাঁর গর্ভও মুক্ত হয় না, পুত্রও হয় না। এরই মধ্যে হস্তিনাপুরে গান্ধারীর কাছে খবর এল যে, কুন্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠির জন্ম গ্রহণ করেছেন। খবরটা গান্ধারীর কাছে সুখকর ছিল না এবং তা হয়তো ধৃতরাষ্ট্রের কারণেই। ধৃতরাষ্ট্র নিজে অন্ধতা নিবন্ধন রাজ্য পাননি বলে তিনি নিশ্চয়ই বারংবার আক্ষেপ করতেন যে, তাঁর পুত্র কোনওমতে বংশ-জ্যেষ্ঠ হলেই সে রাজ্য পাবে। কিন্তু কুন্তীর পুত্র হওয়ায় সে আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল ভেবে গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে কিছু না জানিয়েই নিজের গর্ভপাত ঘটানোর চেষ্টা করলেন। অমন যে ধৈর্যশীলা গান্ধারী—মহাভারতের প্রারম্ভেই যাঁর ধৈর্যের গুণগান করেছেন স্বয়ং ব্যাস, সেই গান্ধারী কুন্তীর প্রতি ঈর্ষায়, অসূয়ায় গর্ভে অকারণ আঘাত করে গর্ভপাত ঘটালেন—সোদরং পাতয়ামাস গান্ধারী দুঃখমূর্ছিতা।

গর্ভপাতের ফলে লৌহপিণ্ডের মতো কঠিন একটি মাংশপেশি জন্মাল। দুই বৎসর পর্যন্ত যা তিনি গর্ভে ধারণ করে ছিলেন, সেটিকে একটি মাংসপিণ্ডমাত্র মনে করে গান্ধারী ফেলেই দিচ্ছিলেন। কিন্তু এই সময়েই ব্যাসকে আমরা ত্বরিতে উপস্থিত দেখছি হস্তিনাপুরে। মহাভারত বলেছে—ব্যাস মাংসপেশি প্রসবের খবর পেয়েই তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছেন হস্তিনাপুরে—অথ দ্বৈপায়নো জ্ঞাত্বা ত্বরিতঃ সমুপাগমৎ। মহাভারতে প্রবীণ অনুবাদকেরা শ্লোকার্ন্তর্গত ‘জ্ঞাত্বা’ শব্দের অর্থ করেছেন—‘ধ্যানে জানিতে পারিয়া’। হয়তো ব্যাসের প্রতি মর্যাদাবশতই এই ধ্যানযোগের কথা এসেছে। কিন্তু আমরা মনে করি—গান্ধারীর প্রসবকালে তিনি হয়তো দূরে অবস্থিত ছিলেন না। স্থুল কঠিন মাংসপেশি প্রসবের পরেই তাঁকে খবর দেওয়া গেছে এবং তিনি ত্বরিতে এসেছেন গান্ধারীকে বিপন্মুক্ত করতে, কেননা তিনি নিজে যাঁকে

শতপুত্রের জননী হবার আশীর্বাদ করেছিলেন, সেখানে তাঁর কিছু দায় আছে।

কতরকম বিদ্যাই না সেকালের ঋষিরা জানতেন। বেদজ্ঞান এবং 'মিড্ওয়াইফারি'র মধ্যে অনেকটাই পার্থক্য আছে। কিন্তু বেদজ্ঞান আছে বলেই অথর্ববেদের অন্তর্গত এই প্রসব পরিচর্যা তিনি জানেন। তিনি এসেই মাংশপেশিটি দেখলেন এবং গান্ধারীকে জিজ্ঞাসা করলেন—এটাকে নিয়ে তুমি কী করতে যাচ্ছিলে-কিমিদং তে চিকীর্ষিতম্? সত্যবাক্ গান্ধারী অকপটে সব কবুল করলেন ঋষি শ্বশুরের কাছে। একটু অভিমান করেও বললেন—কুন্তীর অমন সুন্দর একটি ছেলে হয়েছে শুনে আমি ঈর্ষায় কাতর হয়ে আপন গর্ভপাত ঘটিয়েছি। কিন্তু আপনি যে আমাকে শতপুত্রের জননী হবার আশীর্বাদ করেছিলেন, সেই শতপুত্রের কী পরিণতি হয়েছে দেখুন, একটি মাংসপেশি মাত্র জন্মেছে—ইয়ঞ্চ মে মাংসপেশী জাতা পুত্রশতায় বৈ। গান্ধারীর কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাসের বিভূতিময় ঋষিসত্তা উজ্জীবিত হয়ে উঠল। তিনি বললেন—আমি যা বলেছি, তার অন্যথা হতে পারে না। আমি তো সামান্য আলাপের মধ্যেও কখনও মিথ্যে কথা বলিনি। সেখানে আমার ওই আশীর্বাদও মিথ্যে হবে না—বিতথং নোক্তপূর্বং মে স্বৈরেষ্বপি কুতো'ন্যথা।

ব্যাস আর সময় নষ্ট না করে কাজের কথায় এলেন। বললেন—খুব শীঘ্র ঘিয়ে ভরা কলসি নিয়ে এসো একশোটা। সেগুলো সব আলাদা আলাদা রাখো। তারপর এই মাংসপিণ্ডটি খুব ঠান্ডা জলে ভিজোতে থাকে। যেমনটি ব্যাস বলেছিলেন, তেমনটি করতে করতেই সেই মাংসপিণ্ডটি অনেকগুলি ভাগে বিশ্লিষ্ট হয়ে গেল। বিশ্লিষ্ট ভাগগুলিকে পৃথক পৃথক ঘৃত কুম্ভে স্থাপন করলেন গান্ধারী। ব্যাস সেগুলিকে সুরক্ষিতস্থানে সাবধানে রেখে গান্ধারীকে বললেন—ঠিক এক বৎসর পরে এই কলসিগুলির মুখগুলি খুলবে, দেখবে তুমি শতপুত্রের জননী হয়েছ।

ব্যাসের এই সন্তান-সৃষ্টির প্রক্রিয়া অদ্ভুত মনে হতে পারে, হয়তো এই প্রক্রিয়ার উপাদানগুলি আধুনিক ভাবনার সঙ্গে মেলে না; কিন্তু আধুনিক যেসব পণ্ডিতেরা 'টেস্টটিউব' বেবি' নিয়ে গবেষণা করেন, তাঁরা কিন্তু এই কথা ভেবে আশ্চর্য হন যে, আড়াই-তিন হাজার আগের যুগে একটি ঋষি মানুষ নালিকা-সন্তানের বদলে কৃত্রিমভাবে অন্তত কুম্ভ-সন্তানের কথা ভেবেছিলেন। এমনকী তাঁর প্রক্রিয়ার মধ্যে শীতল জলের প্রস্তাবটুকুও এখনকার দিনের বীজ রক্ষার ধরনটা স্মরণ করায়। কিন্তু কী জানেন, ঘি মানে প্রাচীনশাস্ত্রে শুধুই ঘি নয়। যা কিছুই সেকালে প্রাণদায়ী ছিল, সেগুলিও ঘৃতের অভিধায় চিহ্নিত হত—আয়ুর্বৈ ঘৃতম্। তবে এই ঘৃত শব্দের দ্যোতনার ওপরেও কিন্তু আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ওই 'কুম্ভ' শব্দটি। মহাভারতে বলা হচ্ছে—সেই একশোটি কুম্ভের মধ্যে গর্ভগুলিকে স্থাপন করা হল—ততস্তাংস্তেষু কুম্ভেষু গর্ভান্ অবদধে তথা। এই কুম্ভের মধ্যে গর্ভ স্থাপন ব্যাপারটা অন্য কোনও মাতৃগর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের বীজস্থাপন নয় তো?

আশ্চর্য কী জানেন—কুম্ভ, কুণ্ড এই ধরনের শব্দগুলি প্রাচীন সংস্কৃতে বিবাহিত স্ত্রী ছাড়া অন্য অবৈধ মিলনের আধার কোনও দাসী বা বেশ্যাকে বোঝাত। এখন এই কুম্ভ যদি অবৈধ মাতৃগর্ভ হয় তা হলে কিছু বলার নেই, কিন্তু অন্য দাসীগর্ভে যদি এই বীজ স্থাপন করা হয়ে থাকে, বিশেষত ব্যাস যেহেতু একটি প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, তা হলে এই কুম্ভের গুরুত্ব বাড়ে।

একই সঙ্গে বলি—দেখুন, আমি প্রাচীন প্রক্রিয়ার অতিবাদী কোনও প্রচারক নই—আমি পরমার্থত বিশ্বাস করি না যে, পুষ্পক রথের প্রমাণে সেকালে বিমান চলাচল করত বলে মনে করা যায়, অথবা পৃথিবীধ্বংসী ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগকে পরমাণু-বিস্ফোরণের সমতুল্য মনে করা যায়। কাজেই আমি একবারও বলছি না যে, ব্যাস নালিকা-সন্তানের সৃষ্টিবিধি জানতেন

অথবা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা সব নালিকা-সন্তান। আমি শুধু এইটুকু মানি যে, 'টেস্টটিউব বেবি' সৃষ্টি করার মধ্যে যদি কোনও 'সায়েন্স' থাকে—যে 'সায়েন্স' সত্যিই আছে, তবে সেই 'সায়েন্সে'র 'ফিকশন'টা ব্যাসদেবই প্রথম লিখেছেন। দা ভিঞ্চি বিমান দেখেননি বটে তবে বিমানের যে চিত্রকল্পনা তাঁর মনে ছিল, সেও কিছু কম নয়।

এইচ. জি. ওয়েলস চাঁদের মাটিতে যে মানুষের পদসঞ্চার ঘটিয়েছিলেন, তা তখন বাস্তব ছিল না নিশ্চয়ই, কিন্তু তাই বলে ওয়েলসকে বাহবা না দিয়ে যেমন পারা যায় না, তেমনই ব্যাসদেবকে অন্তত নালিকা-সন্তানের প্রথম কল্পসৃষ্টিকারী হিসেবে অভিনন্দন জানাতেই হবে। আর যদি এমন একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির শতাংশের পাঁচ ভাগও তিনি কোনও-না-কোনওভাবে বাস্তবে রূপায়িত করে থাকেন, অথবা যদি 'থিয়োরি' হিসেবেও লিখে থাকেন এসব কথা, তবে বলতেই হবে যে, তাঁর কবিজনোচিত ক্রান্তদর্শিতার মধ্যে বিজ্ঞানীর 'ভিশন'টুকুও ছিল যথেষ্ট।

যাই হোক, গান্ধারীকে পুত্রজন্মের বিষয়ে নিশ্চিন্ত করে ব্যাস তপস্যার জন্য হিমালয়ে চলে গেলেন। হঠাৎ এই ভাব পরিবর্তনে আমাদের একটু আশ্চর্য লাগে। গান্ধারীর পুত্রজন্ম সফল করার জন্য তাঁকে যে গান্ধারীর প্রয়োজন হবে—এ কথা নিশ্চয় তিনি বুঝেছিলেন বলেই তিনি খুব দূরে কোথাও চলে যাননি। কিন্তু এই মুহূর্তে যে তিনি তপশ্চর্যার জন্য হিমালয়ে চলে গেলেন, তাতে মনে হয় তাঁর মনে কিছু অস্থিরতা এসেছিল এবং তা কুরুবাড়ির ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই। মহাভারতে যে শ্লোকে ব্যাসের হিমালয় যাত্রার প্রসঙ্গ আছে, তার অব্যবহিত পরের শ্লোকেই বলা হচ্ছে—জন্ম সময়ের প্রমাণে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরই যে কুল-জ্যেষ্ঠ হলেন—সে কথা ভীষ্ম এবং বিদুরকে বলে দেওয়া হল। কে বললেন? কেন বললেন? ভীষ্ম এবং বিদুর এ কথা জানতেন না নাকি?

মহামতি সিদ্ধান্তবাগীশের বঙ্গানুবাদ এখানে যথাযথ মনে হয় না। ব্যাস তপস্যার জন্য হিমালয়ে গেলেন, তার পরের শ্লোকে আছে—কিন্তু যুধিষ্ঠির যে জন্মের প্রমাণে সকলের বড়, সে কথা ভীষ্ম এবং বিদুরকে বলে দেওয়া হল—জন্মতস্তু প্রমাণেন জ্যেষ্ঠো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ। তদাখ্যাতস্তু ভীষ্মায় বিদুরায় চ ধীমতে॥ হরিদাস লিখেছেন—সুতরাং জন্ম অনুসারে যুধিষ্ঠিরই জ্যেষ্ঠ হইলেন। তাহার পর, কোনও লোক যাইয়া ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের সেই জন্মবৃত্তান্ত ভীষ্ম এবং বিদুরের নিকট বলিল। এই বাংলা ঠিক হয়নি। ব্যাসের হিমালয় যাত্রার পরেই এই শ্লোক থাকায়, বিশেষত এখানে যুধিষ্ঠিরই সকলের বড়—এই পঙক্তির পরেই 'তদ্' শব্দ থাকায় এই শ্লোকের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের জন্মের খবর দেওয়া হচ্ছে—এ প্রসঙ্গ আসেই না। যা আসে, তা হল—স্বয়ং ব্যাসই তাঁর হিমালয় যাত্রার পূর্বে এ কথা ভীষ্ম এবং বিদুরের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে গেলেন যে, জন্মের হিসেবে যুধিষ্ঠিরই দুর্যোধনের থেকে বয়সে বড় এবং রাজা হওয়ার যোগ্যতাও তাঁরই—তদাখ্যাতস্তু ভীষ্মায় বিদুরায় চ ধীমতে।

মনে রাখতে হবে—নিজের কারণেই হোক অথবা ধৃতরাষ্ট্রের প্ররোচনায়—পরম ধৈর্যশীলা গান্ধারীও যে পুত্রজন্মের ব্যাপারে কুন্তীর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন, তাঁর প্রথমতম সাক্ষী ছিলেন ব্যাস। তিনি গান্ধারীর এই স্বীকারোক্তি প্রথম শ্রবণ করেন। পাণ্ডু বনবাসী হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রপরিচালনকারীমাত্র ধৃতরাষ্ট্রের পত্নীর মুখে এই তথ্যভাষণে ব্যাস সুখী হতে পারেননি। আপাতদৃষ্টিতে কুরু-পাণ্ডবের এই মুনি-পিতামহ রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত কোনও ব্যাপারে না জড়ালেও সত্য এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাসই এ কথা কুরু রাষ্ট্রের প্রশাসক পিতামহকে জানিয়ে গেছেন। আর জানিয়ে গেছেন সত্যধর্মের চিরভাষক আপন পুত্র বিদুরকে—প্রশাসনের সঙ্গে তিনিও সমানভাবে জড়িত। যুধিষ্ঠির এবং দুর্যোধনের জন্মনক্ষত্রের অস্পষ্ট আলোকে ব্যাস শান্তনুবংশের ভবিষ্যৎ-বিপদের কথা প্রত্যক্ষ পাঠ করতে পেরেছিলেন বলেই সত্য এবং ন্যায় বিধানের জন্য তিনি সেই দুটি মানুষকে সতর্ক

করে দিয়ে গেছেন, যাঁরা প্রশাসনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। খেয়াল করে দেখবেন—ব্যাসের ভবিষ্যৎ-ভাবনা কতটা ছিল। ধৃতরাষ্ট্র প্রথম পুত্র দুর্যোধন জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে সভা ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—যুধিষ্ঠিরের পর তাঁর পুত্রটিই রাজা হবেন তো? যুধিষ্ঠির তখন হস্তিনাপুরের দৃশ্যপটেই আসেননি, অথচ ধৃতরাষ্ট্র চিন্তা করছেন তাঁর পরে কে রাজা হবে। ধৃতরাষ্ট্রের ঘরে এসে, তাঁর পুত্রজন্মের ব্যাপারে সাহায্য করতে গিয়ে ব্যাস যে ভয়ংকর ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন, তাতে শঙ্কিত হয়েই তিনি হয়তো হিমালয়ে তপস্যা করে উদ্‌বিগ্ন মনকে শান্ত করতে চেয়েছিলেন।

ঘটনার গতি পরিবর্তিত হল খুব আকস্মিকভাবে এবং খুব শীঘ্র। পঞ্চপুত্রের মুখদর্শন করে বনবাসী পাণ্ডু বনেই মারা গেলেন। শতশৃঙ্গ পর্বতের আরণ্যক ঋষিরা পঞ্চপাণ্ডব এবং পাণ্ডুর প্রথমা স্ত্রী কুন্তীকে সঙ্গে নিয়েই ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় এলেন। পাণ্ডু এবং মাদ্রীর শবাধার ধৃতরাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত করে তাঁরা পাণ্ডুপুত্রদের পরিচয় দিয়ে গেলেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। পাণ্ডুর শ্রাদ্ধ যখন মিটে গেল, তখন মহামতি ব্যাসকে আমরা আবার হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে প্রবেশ করতে দেখছি। পাণ্ডু তাঁর নিয়োগজাত সন্তান হলেও বীজী পিতা হিসেবে পুত্রের এই অকালমৃত্যু নিশ্চয়ই তাঁর হৃদয় স্পর্শ করেছিল। নইলে এই সময় তিনি ফিরে আসবেন কেন? তবে হস্তিনাপুরে এসে ধৃতরাষ্ট্রের মতিগতি দেখে তাঁর নিশ্চয়ই ভাল লাগেনি। বুঝতে তাঁর সময় লাগে না। বিশেষত ঋষিরা সেকালে রাজনীতির চর্চা যথেষ্ট করতেন, হস্তিনাপুরের রাজনীতি বুঝতে ব্যাসের সময় লাগেনি। তিনি যখন হস্তিনাপুরে এসেছেন, যুধিষ্ঠিরের বয়স তখন যোলো। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর রাজ্যের কার্যনির্বাহক রাজা হওয়া সত্ত্বেও যুধিষ্ঠিরকে তাঁর পিতৃরাজ্য ফিরিয়ে দেবার নামও করেননি, এবং তিনি তাঁর পুত্র দুর্যোধনের ভবিষ্যৎ নিয়ে অঙ্ক কষছেন।

ব্যাস সব বুঝেছেন। এবার তিনি ধৃতরাষ্ট্রের ঘরেও ওঠেননি, প্রশাসনের কোনও কর্তাব্যক্তির সঙ্গেও তিনি কথা বলেননি। তিনি উপস্থিত হয়েছেন জননী সত্যবতীর কাছে। সত্যবতীকে তিনি ভাল চেনেন, তাঁর পিতৃবংশের তেমন কৌলিন্য না থাকলেও তিনি যে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং রাজনীতিও যে তিনি খুব ভাল বোঝেন এটা ব্যাস জানেন। বিশেষত সত্যবতীর ব্যক্তিত্ব এতটাই অসাধারণ যে তিনি বেঁচে থাকলে হস্তিনাপুরে কোনও রাজনৈতিক সংকট উপস্থিত হলে সেখানে মাথা গলাবেন না, এটা হতেই পারে না, কেননা এতকাল তিনি মাথা ঘামিয়ে এসেছেন। কিন্তু ব্যাস শঙ্কিত হচ্ছিলেন, বুঝি এইবার তিনি অপমানিত না হন। যে সত্যবতীর কথা ভীষ্ম পর্যন্ত কোনওদিন অবহেলা করেননি, সেই সত্যবতী তাঁর বৃদ্ধ বয়সে যদি কোনও অনভ্যস্ত রূঢ়তার মুখোমুখি হন, এবং তা যদি হন ব্যাসেরই আত্মজ পুত্রের কাছ থেকে—তা হলে সত্যবতী যেমন তা সহ্য করতে পারবেন না, তেমনই পারবেন না ব্যাসও।

ব্যাস তাই জননীর কাছে এসেছেন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্রবধূ অম্বালিকার পুত্র পাণ্ডুর মৃত্যুতে তিনি শোকস্তব্ধ মূর্ছিতপ্রায়। ব্যাস এই সময়টাই বেছে নিয়েছেন জননীকে সংসারের ক্লিন্ন মোহ থেকে মুক্ত করার জন্য, কেননা সংসারে যেকোনও প্রিয়জনের মৃত্যুতে মন আপনিই খানিকটা বৈরাগ্যযুক্ত থাকে। বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার এই উপযুক্ত সময়। ব্যাস জননীকে গিয়ে বলেছেন—তোমার সুখের কাল চলে গিয়েছে, মা! সামনে যে সময় আসছে, সে ভীষণ খারাপ। ভীষণ ভীষণ খারাপ সময় আসছে—অতিক্রান্তসুখাঃ কালাঃ পর্যপস্থিতদারুণাঃ। দিনকে দিন পাপে ভরে যাবে এই পৃথিবী। নানা কপটতা আর শঠতা তুমি দেখতে পাবে, নানা দোষে আকীর্ণ হয়ে উঠবে এই সমাজ। পৃথিবীর যৌবনকাল চলে গেছে, মা। দিনের পর দিন পাপে ভরে উঠবে পৃথিবী—শ্বঃ শ্বঃ পাপিষ্ঠদিবসাঃ পৃথিবী গতযৌবনা।

পৃথিবীর যৌবন শেষ হয়ে গেছে—এই একটিমাত্র পঙ্‌ক্তি যে কালে, যে ব্যঞ্জনায়, যে উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, তা শুধু মহাকবি বলেই ব্যাস বলতে পেরেছেন। বস্তুত পৃথিবীর যৌবন

কখনও যায় না। আসলে মানুষ যখন বৃদ্ধ হয়ে যায়, তখন পুত্রের যৌবনারূঢ় কালকে অথবা নাতি-নাতনিদের সময়টাকে আর পছন্দ করতে পারে না, নিজের বৃদ্ধ মানসিকতাকে মেলাতেও পারে না সমকালীন আধুনিকতার সঙ্গে। ফলে একটা 'ক্ল্যাশ্' তৈরি হয়, খটাখটি বাধতে থাকে পূর্বজ বৃদ্ধের সঙ্গে উত্তরজন্মা আধুনিকের এবং তাতে বৃদ্ধই মানসিকভাবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন পরবর্তী প্রজন্মের তুলনায়—কেননা তাঁর সময়ের যৌবনবতী পৃথিবী কালের নিয়মে বিশ্বাসঘাতিনী হয়ে আলিঙ্গনে ধরা দেয় যৌবনারূঢ় প্রজন্মের কাছে। ঠিক এই বাস্তব কারণেই সেকালে বানপ্রস্থের ব্যবস্থা ছিল—পঞ্চাশোর্ধ্বে বন ব্রজেৎ। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও আমি অনেক বৃদ্ধা-বৃদ্ধাকে কাশী কিংবা বৃন্দাবনবাসী হতে দেখেছি স্বেচ্ছায়। আজ স্বেচ্ছায় যাঁরা যাননি, মায়া-মোহের কারণে যাঁরা থেকে গেছেন পুত্র-পুত্রবধূর সংসারে, তাঁদের অনেককেই দেখেছি পরবর্তী প্রজন্মের চাপে কুঁকড়ে যেতে; দুঃখ-কষ্ট এবং অসহ্য বিড়ম্বনা-অবহেলায় কাল কাটাতে দেখেছি তাঁদের। নিজের বয়ঃপরিণতির সঙ্গে পৃথিবী এইভাবেই বৃদ্ধ-বৃদ্ধার কাছে বৃদ্ধা হয়ে যায়।

ব্যাস তাই জননী সত্যবতীকে পৃথিবীর পঙ্কিল আবর্ত থেকে, সংসারের মোহ থেকে মুক্ত করতে এসেছেন। বলেছেন—চলো মা, বেরিয়ে পড়ো এখান থেকে। নানা দোষ, নানা অধর্মে কলুষিত এই সংসার থেকে বিদায় নাও। খুব খারাপ সময় আসছে—ঘোরঃ কালো ভবিষ্যতি। এখানে যত থাকবে, ততই খারাপ দেখতে পাবে—কৌরবদের অন্যায়-অধর্মে এই পৃথিবী আর সুস্থ থাকবে না। তার চেয়ে চলো তুমি, তপোবনে বসে যোগ অবলম্বন করো। এই কৌরব বংশের অনিবার্য অবক্ষয় এখানে বসে বসে দেখতে যেয়ো না, তাতে তোমার কষ্ট বাড়বে, তুমি আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ো—মা দ্রাক্ষীস্ত্বং কুলস্যাস্য ঘোরং সংক্ষয়মাত্মনঃ।

সত্যবতী পুত্র ব্যাসের কথার মূল্য অনুভব করলেন। যিনি এককালে অতি অল্প সময়ের জন্য মহাঋষি পরাশরের জাগতিক তৃপ্তি ঘটিয়ে নির্লিপ্তভাবে ঋষিপুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন, তাঁর এই নির্লিপ্তির সংস্কার থাকবারই কথা। ব্যাসের কথা শুনেই তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়েছেন এবং অন্দরমহলে গিয়ে শেষবারের মতো ধৃতরাষ্ট্রের মা অম্বিকাকে বললেন—শোনো হে বউ! আমার ছেলে যা বলল, তোমার নাতি দুর্যোধনের অন্যায়-অধর্মে এই বংশ এবং এই রাষ্ট্র-জনপদ নাকি ধ্বংস হয়ে যাবে। অতএব তুমি যদি চাও, তবে এই মৃতপুত্রা পাণ্ডুজননী অম্বালিকাকে নিয়ে চলো আমরা তপোবনে চলে যাই। পুত্রবধূ অম্বিকা শাশুড়ি সত্যবতীর প্রখর বাস্তববোধকে শ্রদ্ধা করে তাঁকে মেনে এসেছেন চিরকাল। তিনি কোনও আপত্তি না করে ছোট বোন অম্বালিকাকে নিয়ে প্রাগ্রসরা সত্যবতীর সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন কুরুবংশের প্রশাসক ভীষ্মের কাছে।

ভীষ্মের অনুমতি পেতে দেরি হয়নি। সবচেয়ে আশ্চর্য, রাজাসনে অধিষ্ঠিত ধৃতরাষ্ট্রের একটি বিলাপবাক্যও শোনা যায় না এখানে, অথচ তাঁর মা অম্বিকা, অপরা জননী অম্বালিকা এবং কুরুবংশধারিণী সত্যবতী—যাঁরা এককালে এই কুরুবংশের চালিকাশক্তি ছিলেন—তাঁরা সকলেই ব্যাসের বাক্য মান্য করে তপশ্চর্যার জন্য বনে চলে গেলেন। ভারী কৌতূহল অনুভব হয় একটি কথা ভেবে যে, অম্বিকা এবং অম্বালিকা—এই দুই কাশী-রাজকন্যাকে ভীষ্ম প্রায় অপহরণ করে নিয়ে এসে বিয়ে দিয়েছিলেন বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে, কিন্তু বিচিত্রবীর্যের স্বামিত্বের অংশ তাঁদের জীবনে কতটুকু? যাঁর শক্তিতে এঁরা সন্তানবতী হয়ে সার্থক জননী হলেন, এঁরা কিন্তু তাঁদের পুত্রের জনক সেই স্বামীর অনুগামিনী হয়েই ঘর ছাড়লেন তপস্যার জন্য। পাণ্ডব-কৌরবের এক পিতামহ এই দুই রমণীকে হস্তিনার রাজবধূ করে নিয়ে এসেছিলেন, পাণ্ডব-কৌরবের আর এক পিতামহ তৎকালীন দিনের সার্থক স্বামীর মতো তাঁদের নিয়ে গেলেন গৌরবজনক মুক্তির পথে। সঙ্গে নিয়ে গেছেন জননী সত্যবতীকে—যিনি হস্তিনার রাজবাড়িতে থাকলে আরও কষ্ট পেতেন, কেননা অতিব্যক্তিত্বময়ী সেই বৃদ্ধার পক্ষে সব কিছু সয়ে যাওয়া সম্ভবপর হত না। ক্রান্তদর্শী ব্যাস এইভাবে জননীর কষ্টও দূর

করেছেন, দূর করেছেন দুই রাজবধূর আবিবাহ যন্ত্রণা—ব্যাসই যে তাঁদের আসল স্বামী।

ব্যাস বুঝেছিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্রকে অচক্ষুত্বের কারণে রাজা না করাটা ন্যায়সঙ্গত হলেও ধৃতরাষ্ট্রের মনে এ বিষয়ে ক্ষোভ আছে। এদিকে পাণ্ডু মারা গেছেন। হস্তিনার সাময়িক ভার বহুদিনই ন্যস্ত হয়েছে ধৃতরাষ্ট্রের ওপর এবং এখনও সে ভার চলছে। ব্যাস বুঝেছিলেন যে, এরপরে যখন জ্যেষ্ঠতা-কনিষ্ঠতার বিচারে রাজ্যের ওপর পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের উত্তরাধিকার জোরদার হয়ে উঠবে, তখনই বিবাদ-বিগ্রহের সূত্রপাত হবে। ব্যাস এটা বুঝেছিলেন বলেই হস্তিনাপুরের ভাবী-পঙ্কিল রাজনীতি থেকে আপন জননী সত্যবতীকে তথা গর্ভাধানের সূত্রে ক্ষণপরিচিতা স্ত্রীপর্যায়িনী দুই কুলবধূকে সংসারমুক্ত করে নিয়ে গেছেন বনে। ব্যাস মুনি বলে কথা, মোক্ষধর্মে তিনি আরূঢ় ব্যক্তি। তিনি যে আপন প্রিয়জনকে সংসার-বৈরাগ্যের পথ দেখাবেন, তাতে আর আশ্চর্য কী! কিন্তু শুদ্ধ-বুদ্ধ মুনির এ আবার কেমন ভাব যে, তিনি বার বার কী এক টানে হস্তিনাপুরের রাজ্যসভায় ফিরে আসেন, এবং অংশও নেন পাণ্ডব-কৌরবের গার্হস্থ্য কার্যকলাপে!

ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রিসভায় তিনি সর্বক্ষণের কোনও পূর্ণমন্ত্রী ছিলেন না, কিন্তু মাঝে মাঝেই তিনি ধৃতরাষ্ট্রের সভায় এমনভাবে বসে থাকেন যে, তাঁকে দেখে সভাসদবর্গের একজন বলে মনে হয় যেন। সেকালের দিনে ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর কোনও অভাব ছিল না, কিন্তু সেই অর্থে ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রিসভার তিনি কেউ নন। সব চেয়ে বড় কথা, এই যে তিন-তিনটি মুমুক্ষু স্ত্রীলোককে তিনি দুরন্ত ভাষণে সংসার-বৈরাগ্যের পথ দেখালেন, তার কিছুদিন পরেই কিন্তু সেই ব্যাসকে আমরা ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় চুপটি করে বসে থাকতে দেখছি। পাণ্ডব-কৌরব কুমারদের অস্ত্রশিক্ষা তখন শেষ হয়ে গেছে, গুরু দ্রোণাচার্য ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় এসে ধৃতরাষ্ট্রকে যখন কুমারদের অস্ত্রশিক্ষার প্রদর্শনী আয়োজন করতে বলছেন, তখন ভীষ্ম, বিদুর এবং বাহ্লীকের মতো রাজমন্ত্রীদের সঙ্গে ব্যাসকেও আমরা উপস্থিত দেখছি—গাঙ্গেয়স্য চ সান্নিধ্যে ব্যাসস্য বিদুরস্য চ। জিজ্ঞাসা হয়—এটা কি কোনও জরুরি সভা তলব করা হয়েছিল, যেসব জরুরি সভায় মাঝে মাঝে উপস্থিত হতেন ব্যাস। অস্ত্রশিক্ষার প্রকৃত প্রদর্শনী যখন হয়েছিল, তাতে শব্দত ব্যাসের নাম পাই না বটে, কিন্তু ব্যাস নিশ্চয়ই তাঁর নাতিদের অস্ত্রশিক্ষা ঋষির বিস্ময় নিয়ে দেখে থাকবেন। নিজের ঔরসপুত্রদের সন্তানেরা যেখানে নিবিড় অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শন করছেন, সেখানে তিনি হিমালয়ের পাদদেশে বসে বৈরাগ্যসাধনা করছিলেন না।

আসলে বৈরাগ্যসাধনা তাঁর শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু সংসারও তাঁর কাছে অতীত বিষয়। কিন্তু মহামুনি হলেও ব্যাসের হৃদয়ে এমনই এক মমতা-মাখানো প্রত্যয় থেকে থাকবে, যাতে সর্বদাই তিনি অনুভব করতেন যে, তিনি পাণ্ডব-কৌরব বংশের বীজী জনক। রাজসভায় মাঝে মাঝে তিনি ভাবলেশহীন সাক্ষিচৈতন্যের মতো বসে থাকেন। দেখাতে চান বুঝি—মুনির ঔরসে মুনিই জন্মায় না, রাজনীতি, সমাজনীতি, পরিবেশ এবং সংসার-কূট একেক জনকে একেক ভাবে তৈরি করে এবং আপন প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায় মহাকাল। ব্যাস ক্রান্তদর্শী কবি, কবির মতো করেই তিনি জানেন—মহাকালের চাতুরি কাকে কোন দিকে বয়ে নিয়ে যাবে। তবু তিনি নিরপেক্ষ সাক্ষী নন সব সময়; কবি যখন, অতএব কবিজনোচিত বেদনাবোধে তিনি অত্যাচারিতের পক্ষপাতী হয়ে পড়েন এক সময়। ঠিক সেই কারণেই তাঁকে এবার দেখছি প্রবঞ্চিত পাণ্ডবকুলের সঙ্গে গোপনে মিলিত হতে।

তখন জতুগৃহ দগ্ধ হয়ে গেছে। জননী কুন্তীর সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবের দগ্ধ হয়ে মরার খবর তখন বেশ প্রচারিত। আমরা জানি—ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনদের এই কূটকৌশল এখানে সফল হয়নি। পাণ্ডবরা তখন তপস্বী ব্রাহ্মণের বেশে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং রাক্ষসী-সুন্দরী হিড়িম্বার সঙ্গে ভীমের বিয়ে পর্যন্ত তখন হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও তাঁদের একটা স্থায়ী

আবাস তৈরি হয়নি অথবা অন্তত কিছু দিনের জন্য থাকা যায়, এমন একটা জায়গাও তাঁরা খুঁজে পাননি এখনও। মাথায় জটা, পরিধানে বল্কল-অজিন, আর কাজটাও তাঁরা করছেন তপস্বীর মতোই—তাঁরা বেদ, বেদাঙ্গ, নীতিশাস্ত্র পড়েন, আর দিনান্তে ভিক্ষান্নের দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। ঠিক এইরকমই এক অধ্যয়নকালে তাঁরা দূর থেকে পিতামহ ব্যাসকে দেখতে পেলেন—দদৃশুস্তে পিতামহম্।

এমন হতে পারে—যে মুনি 'চরৈবেতি'র মন্ত্রে পরিব্রাজকতা করে বেড়ান, তিনি আপনিই ঘুরতে ঘুরতে আসছিলেন বনপথে এবং পাণ্ডবরা তাঁদের পরিচিত পিতামহকে দেখতে পান। কিন্তু এমনটা না হওয়াই সম্ভব। কেননা ব্যাসকে দেখামাত্রই পাণ্ডবরা যখন জননী কুন্তীকে নিয়ে তাঁর সামনে হাতজোড় করে দাঁড়ালেন, তখন ব্যাস বললেন—তোমাদের এই বিপদের কথা আমি আগেই মনে মনে জানতে পেরেছি—ময়েদং ব্যসনং পূর্বং মনসা বিদিতং নৃপাঃ। ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা যে অন্যায়ভাবে তোমাদের বারণাবতে নির্বাসিত করেছিল—সেটা জেনেই আমি এসেছি তোমাদের এখানে। তোমাদের সুপরামর্শ দিয়ে যদি তোমাদের ভাল কিছু করতে পারি, সেইজন্যই এখানে আমার আসা—তত্‌বিদিত্বাস্মি সম্প্রাপ্তশ্চিকীর্যুঃ পরমং হিতম্।

আমাদের ধারণা-পিতৃহীন পাণ্ডবদের বারণাবতে নির্বাসন এবং জতুগৃহের আগুনে তাঁদের মৃত্যুর কথা যখন প্রচারিত হয়ে গেল, তখন সেকথা ব্যাসের কানেও নিশ্চয়ই পৌঁছেছে। হস্তিনাপুরে তাঁর যথেষ্টই যাতায়াত ছিল, অতএব ঘটনার সত্যতা বোঝাবার জন্য নিশ্চয়ই তিনি সেখানে এসেছিলেন। চিন্তিত ব্যাসকে নিশ্চয়ই আশ্বস্ত করেছিলেন তাঁর আত্মজ পুত্র বিদুর এবং তিনি নিশ্চয়ই পাণ্ডবদের সম্ভাব্য গতিপথ সম্বন্ধেও তাঁকে অবহিত করে থাকবেন। কারণ বিদুরই তাঁদের গুপ্তপথের সন্ধান দিয়েছিলেন। ব্যাস যে পাণ্ডবদের বলেছেন—মনে মনে তোমাদের বিপদের কথা জেনেছি—মনসা বিদিতং নৃপাঃ—আমরা বাস্তববুদ্ধিতে বুঝি—বিদুরই তো ব্যাসের মনোময় দেহ। বিদুর পাণ্ডবদের বাঁচার উপায় বলে দিয়ে, তাঁদের গভীর সুড়ঙ্গপথ দিয়ে বার করে দিয়ে এবং গঙ্গা পার করিয়ে দিয়ে বিপন্মুক্ত করে দিয়েছেন। অতএব অর্ধেক পথ তাঁর জানা থাকায় গঙ্গার পরপারের সম্ভাব্য গতিবিধিটুকু ব্যাসের পক্ষে বুঝে নেবার অসুবিধে হয়নি। নইলে অমন 'ক্যাসুয়াল'-ভাবে তিনি বলতেন না—তোমাদের ভালর জন্যই আজ আমি এখানে এসেছি।

বনে বনে ভ্রাম্যমান পাণ্ডব-রাজপুত্রদের দেখে তিনি তাঁদের প্রতি সমব্যথায় বলেছেন—তোমরা দুঃখ পেয়ো না একটুও। জেনে রেখো—সব তোমাদের মঙ্গলের জন্যই ঘটছে—ন বিষাদো'ত্র কর্তব্যঃ সর্বমেতৎ সুখায় বঃ। ব্যাস পাণ্ডব-কৌরবদের জন্মমূল পিতামহ, কাজেই প্রশ্ন হতে পারে হস্তিনাপুরের ভারপ্রাপ্ত শাসকের বিপরীত ক্ষয়স্থানে তিনি উপস্থিত হলেন কেন, সে বংশও তো তাঁরই সৃষ্টি। বাস নিজেই এর উত্তর দিয়ে বলেছেন—হস্তিনাপুরের ওরা এবং তোমরা—দুই পক্ষই যদিও আমার কাছে সমান—সমাস্তে চৈব মে সর্বে যুয়ং চৈব ন সংশয়ঃ—কিন্তু তোমরা এখনও বালক। আত্মীয়স্বজনের স্নেহ এবং পক্ষপাত তাদের ওপর বেশি হয়, যারা দুর্বল অবস্থায় আছে অথবা যারা অসহায়,—দীনতো বালতশ্চৈব স্নেহং কুর্বন্তি বান্ধবাঃ। ব্যাস বুঝিয়ে ছিলেন—তিনি কেবলমাত্র পিতামহের নিম্নগামিনী স্নেহধারায় সিক্ত হয়ে এখানে আসেননি, পিতৃহীন পাণ্ডবদের যেভাবে বঞ্চনা করা হয়েছে, যেভাবে অন্যায়-অধর্মের পথে কূটকৌশলে তাঁদের নিগৃহীত করা হয়েছে, তাতে তিনি খুশি হননি। খুব বাস্তব কারণেই তাঁর স্নেহ-পক্ষপাত বর্ষিত হয়েছে পাণ্ডবদের ওপর এবং এতে আশ্চর্য কিছু নেই, কেননা আত্মীয়-পরিজনেরা এইভাবেই বঞ্চিত ব্যক্তির পক্ষপাতী হয়ে পড়েন। সাধারণ সংসারের নিয়ম উল্লেখ করেই ব্যাস নিজের কথা বললেন। বললেন—সংসারে এমনটি হয় বলেই তোমাদের ওপরেই এখন আমার স্নেহ পক্ষপাত উদ্বেল হয়ে উঠেছে—তস্মাদভ্যধিকঃ স্নেহঃ যুস্বাসু মম সাম্প্রতম্। আমি সেই স্নেহেই তোমাদের কিছু উপকার করতে এসেছি।

বেদ-উপনিষদের শাস্ত্রীয় জ্ঞানে যাঁর বুদ্ধি পরিনিষ্ঠিত হয়েছে, সেই তপস্যাশান্ত মুনির দৃষ্টিতে তো মল-চন্দন, দুঃখ-সুখ, জয়-পরাজয় সব একরকমই হওয়া উচিত ছিল এবং সত্যই ব্যাসের কাছে তা একরকমই। কিন্তু ব্যাস যেহেতু কুরুবংশে পুত্রের জন্ম দিয়ে সংসারধর্মের সীমার মধ্যে এসেছেন, অতএব সংসারের ধর্মই তাঁকে স্নেহের পক্ষপাতে লীলায়িত করেছে। ঠিক এইখানেই ব্যাস অন্য অন্য শুষ্ক-রুক্ষ মুনি-ঋষির মতো নির্লিপ্ত নন। তিনি এখানে বড়ই সজীব এবং সেই জন্যই তিনি মহাকাব্যের কবি। পাণ্ডবদের ওপরে বঞ্চনার জন্য তিনি গিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে গালাগালি দেননি, কিংবা ওপক্ষের নাতি দুর্যোধন-দুঃশাসনকে তিনি কান ধরে ওঠবোস করাননি। তিনি মহাকালের গতি রোধ করেন না, কিন্তু যে ভাল, যে নীতিযুক্ত, যে দীন-বঞ্চিত—তিনি তাঁর পক্ষে এসে দাঁড়ান।

ব্যাসের এই পাণ্ডব-পক্ষপাতিতা নিরীক্ষণ করে বেশ সযৌক্তিক একটা আলোচনা করেছিলেন সালিভান সাহেব—Bruce M. Sullivan. মিথলজির দিক থেকে ব্যাসের চরিত্র বিচার করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—ব্যাসের সঙ্গে একটা অদ্ভুত মিল আছে লোকপিতামহ ব্রহ্মার। দেবতা এবং অসুর, দুই পক্ষকেই তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং দুই পক্ষই তাঁকে পিতামহ বলেই ডাকে। একইভাবে পাণ্ডব-কৌরবদের মধ্যে যে ভয়ংকর কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ হয়েছিল, সাহেব তার পৌরাণিক প্রতিকল্প খুঁজেছেন দেবাসুর যুদ্ধের মধ্যে। মহাভারতের অংশাবতরণ পর্বে প্রথমেই পাণ্ডব-কৌরবদের দেবাসুরকল্পগুলি দেওয়া আছে। পাণ্ডবরা দেবতার অংশে এবং কৌরবরা সবাই পৌলস্ত্য রাক্ষসদের অংশে দুর্যোধনের সহায় হয়ে এই পৃথিবীতে জন্মেছিলেন, দুর্যোধন নিজে ছিলেন বিবাদের প্রতীক কলির অংশজাত। কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব-কৌরবের যুদ্ধ ব্যাপারটাকেও মাঝে মাঝে দেব-দৈত্যের 'মিথলজিক্যাল' যুদ্ধের উপমায় দেখানো হয়েছে—দৈতেন্দ্রসেনেব চ কৌরবাণাং/ দেবেন্দ্রসেনেব চ পাণ্ডবানাম্।

যদিও ব্যাসকে মহাভারতে কোথাও সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার অংশ হিসেবে দেখানো হয়নি, তবুও ব্রহ্মা যেমন দেবতা এবং দৈত্য-রাক্ষসদের পিতামহ, ব্যাসও তেমনই দেবকল্প পাণ্ডবদের তথা দৈত্যাসুরকল্প কৌরবদেরও পিতামহ। অন্যদিকে দেখুন—দেবাসুর যুদ্ধের চরম পরিণতিরও একটা 'মিথলজিক্যাল প্যাটার্ন' আছে এবং সে 'প্যাটার্ন' পাণ্ডব-কৌরবের চরম যুদ্ধ-পরিণতির সঙ্গে বেশ মেলে। অসুর-রাক্ষসদের ক্ষেত্রে যেমন হয়—তাঁদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে অমঙ্গল সূচিত হয় এবং তেমনটিই দুর্যোধনের ক্ষেত্রেও হয়েছে। রাক্ষস-দৈত্যরা কী করেন? তাঁরা স্বর্গরাজ্যের সার্বভৌমত্ব লাভ করার জন্য চেষ্টা করেন। এই প্রক্রিয়ায় সাফল্যের জন্য তাঁরা ব্রহ্মাকে তপস্যায় তুষ্ট করেন এবং ব্রহ্মার কাছে প্রায় অজেয়ত্বর বরলাভ আসে এবং দেবতারা রাজত্ব হারিয়ে গিরি-গুহা নদী-পর্বতে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। অবশেষে শ্রান্ত-বিধ্বস্ত হয়ে ব্রহ্মার শরণাগত হন। প্রাঞ্জলি হয়ে তাঁর পরামর্শ চান করণীয় বিষয়ে। প্রথাগতভাবেই অসুর-রাক্ষসদের বরদানের ব্যাপারে ব্রহ্মার একটা কৌশল থেকে যায়—অথবা সেটাকে 'লুপ্‌হোল' বলাই ভাল। ব্রহ্মা সেই কৌশলগত দিকটা জানিয়ে দেন দেবতাদের এবং পরামর্শ দেন—কী উপায়ে অসুর-রাক্ষসেরা পরাজিত হবেন। দেবতারা সেই পরামর্শমতো চলে পুনরায় স্বর্গের অধিকার লাভ করেন।

এই হল 'মিথলজিক্যাল প্যাটার্ন'। ব্রহ্মার সঙ্গে ব্যাসের অনুপুঙ্খ স্বরূপ নিশ্চয়ই মেলে না, কেননা তিনি মনুষ্য-সত্তায় বিরাজিত। কিন্তু ব্যাসের ক্রিয়াকর্মও তাই। যজ্ঞক্রিয়ার সম্পূর্ণতা এবং চতুর্বর্গের প্রথম বর্গ ধর্মের সম্পূর্ণতাও নির্ভর করে ব্রহ্মার ওপর। এই ধর্ম গার্হস্থ্য ধর্ম এবং সে ধর্মও প্রবৃত্তিমূলক। প্রবৃত্তিমূলক বলেই সেই ধর্ম থেকে সৃষ্টি হয়। প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রথম লোক সৃষ্টি করেন তপস্যায় বসে। ব্যাসও তপস্যায়, বেদাধ্যাপনায় রত ছিলেন। সেই অবস্থা থেকে তিনি মায়ের আদেশে প্রবৃত্তিমূলক ধর্মে নিযুক্ত হন এবং সন্তান সৃষ্টি করেন।

ব্রহ্মার চতুর্মুখ থেকে চার বেদের সৃষ্টি, ভগবান ব্যাস চতুর্বেদ বিভক্ত করে বেদব্যাস নামে পরিচিত। ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত বলেই তাঁর চরিত্র মোক্ষানুসন্ধানী নয়। ব্যাসকেও মহাভারতে আমরা এক বানপ্রস্থী পরিব্রাজকের ভূমিকায় দেখি। মাঝে মাঝেই তিনি রাজবাড়িতে আসেন, বিভিন্ন যজ্ঞে প্রাধান্যের সঙ্গে পৌরোহিত্যও করেন—যজ্ঞের প্রধান পুরোহিতকে কিন্তু যাজ্ঞিকেরা 'ব্রহ্মা' নামে ডাকেন।

এবারে দেবাসুর যুদ্ধের 'প্যাটার্নে' পাণ্ডব-কৌরবদের দেখুন। গান্ধারী কিন্তু ব্যাসকে তুষ্ট করেই শতপুত্রের জননী হবার বর লাভ করেন এবং তাঁর সেই পুত্রজন্মে প্রধান সহায় কিন্তু ব্যাস। ঠিক যেমনটি দৈত্য-রাক্ষসরাও তপস্যার মাধ্যমে ব্রহ্মার প্রথম সহায়তাটুকু পান, তেমনই কৌরবরাও পিতামহ ব্যাসের প্রথম সহায়তা লাভ করে রাজ্য লাভ করেছেন এক সময়ে এবং দেবতাদের স্বর্গ থেকে তাড়ানোর মতোই দেবকল্প পাণ্ডবদেরও তাঁরা নির্বাসিত করেছেন হস্তিনার রাজ্যাধিকার থেকে। কিন্তু এই যে পাণ্ডবরা বনে বনে ঘুরে কষ্ট পাচ্ছেন—এইবার কিন্তু পিতামহ ব্যাস বঞ্চিত নির্বাসিত দেবকল্প পাণ্ডবদের সাহায্য করতে এবং সুপরামর্শ দিতে চলে এসেছেন বনের মধ্যে। বলেছেন—কীভাবে সস্নেহে তোমাদের মঙ্গল সাধন করতে এসেছি, শোনো—স্নেহপূর্বং চিকীর্ষামি হিতং বস্তু নিবোধত।

অসুরকল্প কৌরবরা জানতেও পারলেন না যে তাঁদের অন্যায়-অধর্মে অসন্তুষ্ট ব্যাস এবার পিতৃহীন নির্বাসিত পাণ্ডবদের পক্ষ নিয়েছেন। পথের দিশাহীন পাণ্ডবদের তিনি পথ দেখাচ্ছেন সস্নেহে। ব্যাস বললেন—সামনেই একটা সুন্দর শহর আছে। শহরটি ভাল, রোগ-ব্যাধির প্রকোপও তত নেই সেখানে। তোমরা সেইখানে ছদ্মবেশেই থাকবে এবং কবে আমি আবার ফিরে আসি—তার প্রতীক্ষা করবে—বসতেহ প্রতিচ্ছন্না মমাগমনকাঙিক্ষণঃ। ব্যাস আঙুল তুলে উদাসীনের মতো শহরের রাস্তা দেখিয়ে চলে যাননি। তিনি সমাতৃক পাণ্ডবদের নিয়ে নিকটবর্তী নগরের দিকে চললেন। দৈত্যতাড়িত দেবকুলকে ব্রহ্মা যেভাবে আশ্বস্ত করে সমৃদ্ধির পথ দেখান, ব্যাসও তেমনই পথে যেতে যেতে কুন্তীকে বললেন—তুমি বেঁচে থাক বাছা! তোমার এই যে পুত্রটি যুধিষ্ঠির, সে সদাসর্বদা ধর্মের পথে চলে—জীবপুত্রি সুতস্তে'য়ং ধর্মনিত্যো যুধিষ্ঠিরঃ। সে একদিন ধর্মের পথেই এই পৃথিবী জয় করে ধর্মরাজ হয়ে রাজসিংহাসনে বসবে। যুধিষ্ঠিরের এই ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে ক্ষাত্রশক্তির প্রয়োজন, তার জোগান দেবে ভীম এবং অর্জুন। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো—তোমার এবং মাদ্রীর ছেলেরা একদিন সমস্ত ভোগ এবং সম্পদ-সুখ লাভ করে পিতৃপিতামহের রাজ্য শাসন করবে—পিতৃপৈতামহং রাজ্যমিমে ভোক্ষ্যন্তি তে সুতাঃ।।

কুন্তীকে তাঁর পুত্রদের রাজ্যলাভের ব্যাপারে আশ্বস্ত করে চলতে চলতেই যে নগরীতে এসে পৌঁছোলেন ব্যাস—তার নাম একচক্রা পুরী। ব্যাস সেখানে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে কথা বলে তাঁর বাড়িতেই পাণ্ডবদের থাকার ব্যবস্থা করলেন। যাবার সময় বলে গেলেন—আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমরা এই বাড়িতেই অপেক্ষা করবে। আমি আবারও আসব—ইহ মাং সম্প্রতীক্ষধ্বম্ আগমিষ্যাম্যহং পুনঃ। শেষে বললেন—দেশ এবং কাল যদি ঠিক ঠিক বুঝতে পার, তবে এক সময় পরম সুখ লাভ করবে তোমরা।

শব্দ দুটি শুনতে সহজ বটে, তবে এ একেবারে রাজনৈতিক উপদেশ। দেশ এবং কালকে বুঝতে হবে। দুর্যোধন পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছেন কূট কৌশলে অথচ তাঁরা বেঁচে আছেন। কাজেই এই সময়টা বুঝে চলতে হবে। হঠাৎ করে আত্মপ্রকাশ করলে এই সময়ে ধৃতরাষ্ট্র-দুযোর্ধনেরা তাঁদের সহজে ছেড়ে দেবেন না—এটা এককথায় বুঝিয়েছেন ব্যাস এবং সেটাই কাল-বোধ। দ্বিতীয়ত, দেশ। নির্বাসিত পাণ্ডবরা এই সময়েই ভিন্ন দেশের, বিশেষত কুরুরাষ্ট্রের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন কোনও শক্তিশালী রাজশক্তির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে নিজেদের শক্তি বাড়িয়ে নিতে পারেন। ব্যাস তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন—'দেশ' শব্দটি

উল্লেখ করে। পাণ্ডবরাও পিতামহের এই সংক্ষেপোক্তি বুঝেছেন এবং বলেছেন—বেশ আমরা তাই করব।

মহাভারত বলেছে-ব্যাস তাঁর পূর্বোক্ত উপদেশ শুনিয়ে যেখান থেকে এসেছিলেন, সেখানেই চলে গেলেন—জগাম ভগবান্ ব্যাসো যথাগতমৃষিঃ প্রভুঃ। কোথা থেকে এসেছিলেন ব্যাস, কোথায়ই বা গেলেন? এর কিছুদিন পরেই দেখছি, ব্যাস আবার পাণ্ডবদের দেখতে এসেছেন—আজগামাথ তান দ্রষ্টুং ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ। এসেই তো সেই পিতামহের মতো সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন—সব ভাল চলছে তো বাছারা! ধর্মের পথ আর শাস্ত্রবাক্য মেনে চলছ তো? সাধারণ কুশল বিনিময়ের পরেই বাস পঞ্চাল-রাজ্যের মেয়ে দ্রৌপদীর কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন। কেমন করে যজ্ঞের আগুন থেকে যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদী জন্মেছেন, দ্রোণাচার্যের সঙ্গে কীভাবে পাঞ্চাল দ্রুপদের শত্রুতা হল এবং সেই শত্রুতার প্রতিশোধ-স্পৃহা থেকে কীভাবে দ্রৌপদীর সৃষ্টি হল—সে-সব কথা পাণ্ডবদের বললেন ব্যাস।

ঘটনা হল—পাণ্ডবরা দ্রৌপদীর কথা কিছুদিন আগেই শুনেছেন। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর উপলক্ষে রাজারা যেমন পঞ্চালে এসে পৌঁছোচ্ছিলেন, তেমনই দক্ষিণাকামী, ভোজনকামী ব্রাহ্মণরাও দূর-দূরান্ত থেকে দ্রুপদের রাজ্যে এসে পৌঁছোচ্ছিলেন। এমনই এক ব্রাহ্মণ পঞ্চালে যাবার আগে একচক্রানগরীতে ওই পাণ্ডবদের বাড়িতেই রাত্রিবাসের জন্য সাময়িক আশ্রয় নিয়েছিলেন। দ্রৌপদীর কথা তিনিই বলে গেছেন সবিস্তারে, ব্যাস সেই ব্রাহ্মণের মুখে-বলা দ্রৌপদীসম্ভব-কাহিনী পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র—বিচিত্রাশ্চ কথাস্তাস্তাঃ পুনরেবেদমব্রবীৎ। ব্যাস দ্রৌপদীর সম্বন্ধে বিশেষ বার্তা যেটুকু দিলেন, সেটা হল—তিনি নাকি পূর্বজন্মে তপস্যাতুষ্ট শিবের কাছে পাঁচ পাঁচ বার স্বামী-লাভের বর চেয়েছিলেন। তাতে শিব তাঁকে বলেছিলেন—পাঁচবার যখন একই কথা বললে, তখন তোমার স্বামীও হবে পাঁচজন। কাহিনী জানিয়ে ব্যাস বললেন—সেই মেয়েই দ্রৌপদী হয়ে জন্মেছে। তোমাদের পাঁচজনের সেই একমাত্র স্ত্রী হিসেবে নির্দিষ্ট হয়ে আছে—নির্দিষ্টা ভবতাং পত্নী কৃষ্ণা পার্ষত্যনিন্দিতা। তাই বলছিলাম তোমরা পঞ্চাল নগরে যাও। তাকে লাভ করলে তোমরা সব দিক থেকেই সুখী হবে বলে আমি মনে করি—সুখিনস্তামনুপ্রাপ্য ভবিষ্যথ ন সংশয়ঃ।।

ব্যাস যেভাবে পাণ্ডবদের একচক্রায় অপেক্ষা করতে বলে গিয়েছিলেন এবং যেভাবে ফিরে এসে কথাগুলি বললেন, তাতে বেশ মনে হয়—তিনি এতদিন পঞ্চালেই ছিলেন। পঞ্চালরাজ দ্রুপদ যে দ্রোণাচার্যের কারণে কুরুরাষ্ট্রের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, তাও তিনি জানতেন। অতএব শত্রুরাজ্যে বসতি করলে পাণ্ডবরা একদিকে যেমন দুর্যোধনের গুপ্তঘাতকদের বিরুদ্ধে রাজকীয় সুরক্ষাও পাবেন, তেমনই বৈবাহিকসূত্রে পঞ্চালদের সঙ্গে পাণ্ডবদের বন্ধুত্ব স্থাপিত হলে পাণ্ডবদের যে রাজনৈতিক দিক থেকে মান্য করে চলতে হবে কৌরবদের—সেকথাও ব্যাস বুঝেছিলেন। সেই কারণেই ব্যাস বলেছিলেন—দ্রৌপদীকে লাভ করলে তোমরা সুখী হবে।

অসুরকল্প কৌরবদের বিরুদ্ধে পিতামহ ব্যাস পাণ্ডবদের কীভাবে সহায়তা করছেন দেখুন। ধৃতরাষ্ট্রের অন্যায় ব্যবহারে ক্ষুব্ধ পাণ্ডবদের সঙ্গে একান্তে মিলিত হয়ে ব্যাস যে শুধু তাঁর পক্ষপাত দেখালেন তাই নয়, তাঁদের রাজনৈতিক সিদ্ধির পথ পরিষ্কার করে দিয়ে পরম স্নেহে নিজের নাতবউটিকেও পছন্দ করে দিয়ে গেলেন। পাণ্ডবদের কাছে অসামান্যা এক কন্যার খবর দিয়ে তিনি যে সেখানে বসে থাকলেন, তা নয় মোটেই। তিনি স্বয়ং উপস্থিত হলেন দ্রুপদের রাজ্যে। না, দ্রুপদকে তিনি কিছুই বলেননি, বলা তাঁর স্বভাবও নয়। বিধাতার মতো ঘটনা ঘটার পথ পরিষ্কার করে দিয়ে তিনি নির্লিপ্ত বসে থাকেন, যা ঘটবার তা ঘটতে থাকে ব্যক্তির কর্ম এবং উদ্যোগ অনুযায়ী।

পঞ্চালে যাওয়ার কথাটা পাণ্ডবদের আগে থেকেই ঠিক ছিল। ব্যাস চলে যেতেই পাণ্ডবরা সেখানে যাবার তোড়জোড় শুরু করলেন এবং পঞ্চালে পৌঁছে খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরির পরেই কিন্তু ব্যাসের সঙ্গে পাণ্ডবদের দেখা হয়ে গেল—দদৃশুঃ পাণ্ডবা বীরা মুনিং দ্বৈপায়নং তদা। পঞ্চাল রাজ্যে পাণ্ডবদের প্রথম স্বাগত জানালেন ব্যাসই। তাঁর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা হল এবং কথার শেষে পাণ্ডবরা দ্রুপদের মূল রাজধানীর ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং নিজেদের সাময়িক আবাস হিসেবে এক কুম্ভকার-গৃহে আশ্রয় নিলেন। তাঁদের ছদ্মবেশ ব্রাহ্মণের মতো, অতএব তাঁদের বৃত্তিও ব্রাহ্মণী বৃত্তি—ভিক্ষা করে দিন চালানো।

দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে অর্জুন লক্ষ্যভেদ করলেন, কিন্তু অন্য রাজাদের হতাশা এবং অহংকারে স্বয়ংবরসভা যুদ্ধমঞ্চে পরিণত হল। এদিকে পঞ্চাল রাজ্যের দরিদ্র পর্ণকুটিরে বসে জননী কুন্তী মনে মনে ভাবছেন—বেলা পড়ে এল, তবু ছেলেরা ভিক্ষা নিয়ে ফিরল না। রাস্তায় কী ওদের অসুর-রাক্ষসে ধরল, নাকি, ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা ওদের খুন করল? এত সব দুর্ভাগ্যের আশঙ্কা করতে করতেই কুন্তী ব্যাসের কথা স্মরণ করলেন। তাঁর এই বৃদ্ধ শ্বশুরমশাই তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন—তোমার ছেলেরা ধর্মের পথেই একদিন এই সসাগরা পৃথিবী জয় করবে। তা হলে কি ব্যাসের মতো মহাজনের কথাও মিথ্যে হয়ে গেল—বিপরীতং মতং জাতং ব্যাসস্যাপি মহাত্মনঃ। সেই বৃষ্টিঝরা অন্ধকার দুর্দিনে জননী কুন্তী যে কোনওমতে পুত্রদের বিপদাশঙ্কা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন সে শুধু ব্যাসের ভরসায়। তাঁর ছেলেরা ফিরে এসেছিলেন তাঁর পুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়ে।

দ্রৌপদীকে চোখে না দেখেই কুন্তী যে বলে দিয়েছিলেন—ভিক্ষা যা এনেছ, সবাই একসঙ্গে ভাগ করে নাও—সেই কথার মধ্যে দৈবের অভিসন্ধি যতই থাকুক, বাস্তব প্রয়োজন ছিল অনেক বেশি। যুধিষ্ঠির দেখেছিলেন—কৃষ্ণা পাঞ্চালীকে যিনি লক্ষ্যভেদ করে জিতেছেন সেই অর্জুন ছাড়া আর সব ভাইয়েরাই দ্রৌপদীকে লাভ করার জন্য যথেষ্ট উৎসুক এবং সে ঔৎসুক্য এতটাই যে, অর্জুন বীরোচিত ভদ্রতায় দ্রৌপদীর ওপর তাঁর প্রেমের দাবি ছেড়ে দিলে অন্য পাণ্ডব ভাইরা যেভাবে, যে কামনায় দ্রৌপদীর ওপর দৃষ্টি-নিবেশ করেছিলেন, তার মধ্যে গভীর বিপদের আশঙ্কা ছিল। ঠিক এই মুহূর্তে ব্যাসের কথাই প্রথম স্মরণে আসে যুধিষ্ঠিরের—দ্বৈপায়নবচঃ কৃৎস্নং সস্মার মনুজর্ষভঃ। কেননা তিনিই একমাত্র ব্যক্তি—যিনি সমস্ত লৌকিক লজ্জার ঊর্ধ্বে উঠে বলেছিলেন—তোমাদের পাঁচজনেরই পত্নী হবেন দ্রৌপদী। অসম্ভব তাঁর বাস্তব বুদ্ধি এবং সেই বাস্তব বুদ্ধিতেই তিনি বুঝেছিলেন যে, দ্রৌপদীর মতো অসামান্যা এক রমণী পঞ্চ পাণ্ডবের একজনের স্ত্রী হলে, অন্য ভাইরা সেই সৌভাগ্যবান ভ্রাতার প্রতি ঈর্ষাযুক্ত হয়ে পড়বেন এবং তাতে নিজেদের মধ্যেই বিভেদ তৈরি হবে। যুধিষ্ঠির ব্যাসের এই মর্মকথা স্মরণ করেই সিদ্ধান্ত দিলেন—আমাদের সকলেরই স্ত্রী হবেন দ্রৌপদী।

অবশ্য যুধিষ্ঠিরের এই সিদ্ধান্ত দ্রৌপদীর পিতা দ্রুপদ এবং ভাই ধৃষ্টদ্যুম্নকে সহজে মানানো যায়নি। যুধিষ্ঠির এবং দ্রুপদের তর্ক-প্রতর্ক চলছে, ঠিক এই সময় দ্বৈপায়ন ব্যাস এসে দ্রুপদের রাজসভায় উপস্থিত হলেন। মহাভারত বলেছে—'যদৃচ্ছয়া' অর্থাৎ এই ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎই তিনি উপস্থিত হলেন যেন। কিন্তু আমরা জানি মোটেই তা নয়। তিনি পঞ্চাল রাজ্যেই এতদিন ছিলেন এবং দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের খবর তিনি আগেভাগে পাণ্ডবদের কাছে পৌঁছে দিয়ে ঘটকালিও করে গেছেন খানিকটা। আবারও তিনি নিশ্চয়ই পঞ্চালেই ফিরে এসেছেন, নইলে পঞ্চালের মূল রাজধানীতে ঢোকবার আগেই পাণ্ডবদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল কেমন করে? তার ওপরে দ্রুপদের স্বয়ংবরের আয়োজনে যেখানে নানা দিগ্‌দেশ থেকে ব্রাহ্মণ এবং মুনি ঋষিরা এসে উপস্থিত হয়েছেন, সেখানে ব্যাসের মতো শীর্ষস্থানীয় মহর্ষি দ্রুপদসভায় উপস্থিত ছিলেন না, তা হতেই পারে না। অর্জুনের লক্ষ্যভেদে নিশ্চয়ই

তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে গেছেন এবং ঠিক সেই সময় রীতিমতো অঙ্ক কষেই তিনি দ্রুপদসভায় উপস্থিত হয়েছেন। কারণ তিনি বুঝেছেন—দ্রুপদের মতো এক ব্যক্তিত্বকে সামাল দেওয়া একা যুধিষ্ঠিরের কর্ম নয় অথবা এই সময় যুধিষ্ঠিরের সাহায্য প্রয়োজন বলেই তিনি 'যদৃচ্ছয়া' উপস্থিত হয়েছেন দ্রুপদসভায়। সেই ব্রহ্মার স্বরূপে এখন তিনি দেবকল্প যুধিষ্ঠিরকে সাহায্য করছেন।

যুধিষ্ঠির মায়ের কথা বলে দ্রুপদকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন এবং এই সমস্যার ক্ষেত্রে তাঁর আপন ধর্মবিষয়িনী বুদ্ধি তথা সজ্জনের আত্মতুষ্টির প্রমাণ দাখিল করে দ্রুপদকে নিজের অনুকূলে আনার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দ্রুপদ তা বোঝেননি এবং বোঝার কথাও নয়। যুধিষ্ঠির ব্যাসের কথা দ্রুপদকে বলেননি, কিন্তু দ্রৌপদীর ওপর পাঁচ ভাইয়েরই যে একটা অধিকার বোধ তৈরি হয়েছিল, সে তো ব্যাসেরই কথায়। ব্যাস নিজে এসে যেখানে বলেছিলেন—দ্রৌপদীই তোমাদের পাঁচ ভাইয়ের একতমা পত্নী নির্দিষ্ট হয়ে আছেন—সেখানে অন্য ভাইরা পিতামহের এই প্রসাদবাক্য থেকে বঞ্চিত হবেন কেন, কেনই বা তাঁরা মোহমুক্ত হবেন দ্রৌপদীর ভোগাংশ থেকে। দ্রৌপদী যতই বীরভোগ্যা হোন, ব্যাসের কথায় নকুল-সহদেবের মতো বালখিল্যের মনেও যে দ্রৌপদীর রসসঞ্চার ঘটে থাকবে, তাতে আশ্চর্য কী! ঠাকুরদাদা ব্যাস বিয়ের আগেই ঘটকালি করে গেছেন, অতএব সেই দায়িত্ব নিয়েই তিনি ঠিক সময়মতো উপস্থিত হয়েছেন দ্রুপদসভায়।

দ্রুপদ প্রায় ধমকের সুরেই জ্যেষ্ঠ জামাতৃ-পদের দাবিদার যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন—একটিমাত্র মেয়ে, সে পাঁচজনের ধর্মপত্নী হবে—এ কেমন কথা? 'সংকর'-এর প্রশ্ন আসবে না—কথমেকা বহূনাং স্যাৎ ধর্মপত্নী ন সংকরঃ? 'সংকর' শব্দটা শুনেই বুঝি ব্যাসের অন্তর্হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। নিজের কথা, আত্মজ বিদুরের কথাও বুঝি বা মনে হল তাঁর। মনে হল—সেই তুলনায় এ তো অনেক পরিষ্কার ব্যাপার—এখানে আবার সংকরের প্রশ্ন কোথায়? অন্য ক্ষেত্র হলে ঋষি মুনিদের অভ্যাস—প্রশ্ন শুনেই তাঁরা উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। এক্ষেত্রে ব্যাস কিন্তু তা করলেন না, বরঞ্চ দ্রুপদ রাজার মুখে তথাকথিত লোক-বেদ-বিরোধী বিবাহের তত্ত্ব শোনার আগে তাঁদেরই বাজিয়ে নিতে চাইলেন। বললেন—যাঁরা যাঁরা মনে করছেন—এখানে ধর্মের চ্যুতি ঘটছে, বেদধর্ম এবং লোকধর্ম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাঁরা যা বলবার আগে বলুন, আমি শুনছি—যস্য যস্য মতং যদ্ যচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি তস্য তৎ!

দ্রুপদ তাঁর সংশয় জানালেন, ধৃষ্টদ্যুম্নও এই অদ্ভুত বিবাহে তাঁর অস্বস্তির কথা জানালেন। যুধিষ্ঠির জানালেন তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য। এমনকী কুন্তীও কী বলতে কী বলে দিয়েছেন—এইভাবে নিজের অসহায়ত্ব জ্ঞাপন করলেন। ব্যাস কোনও উত্তর দেবার আগে কুন্তীকে সর্বপ্রথম সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—তুমি যে মিথ্যাচারের ভয় পাচ্ছ, সেই দুশ্চিন্তা থেকে তুমি এখনই মুক্ত হবে, ভদ্রে—অনৃতান্মোক্ষ্যসে ভদ্রে ধর্মশ্চৈষ সনাতনঃ। কুন্তীর সঙ্গে কথা শেষ করেই ব্যাস পঞ্চাল দ্রুপদকে সম্বোধন করে বললেন—আমরা এখানে ধর্মের চ্যুতি ঘটাতে আসিনি। যাতে ধর্ম রক্ষিত হয়, সেই কথাই তোমাকে বলব এবং কৌন্তেয় যুধিষ্ঠির যা বলেছেন—তার মধ্যে অধর্মও আমি কিছু দেখছি না।

দ্বৈপায়ন ব্যাস এইভাবে সাধারণ নির্দেশ জারি করেই দ্রুপদ পঞ্চালের হাত ধরে তাঁর রাজকক্ষে প্রবেশ করলেন—হয়তো একান্তে তাঁকে কিছু বোঝানোর জন্য। খানিকক্ষণের মধ্যেই কুন্তী তাঁর পুত্রদের নিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে সেই কক্ষে প্রবেশ করলেন—যেখানে অপেক্ষা করছিলেন ব্যাস এবং দ্রুপদ। ব্যাস এবার দিব্য আবেশে পাণ্ডবদের দৈবজন্মের কথা বলতে আরম্ভ করলেন। প্রসঙ্গত কৃষ্ণ-বলরাম ইত্যাদি অবতার পুরুষের কথাও এল। ব্যাস প্রমাণ করে ছাড়লেন যে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন—এঁরা সব দেবরাজ ইন্দ্রেরই অংশভূত, আর দ্রৌপদী হলেন স্বর্গলক্ষ্মীর স্বরূপ, কাজেই তিনি পাণ্ডবদের জন্যই সৃষ্ট হয়েছেন—

কেননা, স্বর্গলক্ষ্মীকে দেবরাজ ইন্দ্রের অংশভূত পাণ্ডবদেরই স্ত্রী হতে হবে, এই তো বিধাতার বিধান। ব্যাস দ্রৌপদীর পূর্বজন্মের কথাও শোনালেন—যে কথার মধ্যে ভগবান শঙ্করের কাছে তাঁর পাঁচবার বর চাওয়ার অভিসন্ধিও ব্যক্ত হল।

এসব তো গেল তত্ত্বের কথা, ধর্মবিরোধ নিরসনের জন্য পৌরাণিক নীতিযুক্তি। এইসব নীতিযুক্তি ব্যবহার করেই তন্ত্রবার্তিকের লেখক ভট্টকুমারিল দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামিত্ব স্থাপনও করেছেন। কিন্তু সাধারণ্যে লোকবিরোধী বলে যা পরিচিত, তার থেকেও বড় সত্য হল বাস্তব। ব্যাস দ্রুপদকে যা বলেননি অথচ যুধিষ্ঠিরকে নিশ্চয়ই বলেছিলেন, তা হল—দ্রৌপদীর রূপ এবং ব্যক্তিত্ব এমনই যে, তাঁর অধিকার থেকে যে ভাই-ই বঞ্চিত হবেন, তিনিই মনে মনে ক্রুদ্ধ হবেন। অপিচ যুধিষ্ঠির দেখেছিলেন—অর্জুন ভদ্রতা করে নিজের অধিকার ছেড়ে দিলে কীভাবে তাঁর ভাইরা প্রত্যেকে দ্রৌপদীর দিকে সকাম দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন এবং কীভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম মথিত করে দ্রৌপদীকে লাভ করার মোহ তাঁদের আতপ্ত করে তুলেছিল—সংপ্রমথ্যেন্দ্রিয়গ্রামং প্রাদুরাসন্মনোভবঃ। অতএব ভাইদের মধ্যে বিরোধ ঘটাবে যে জিনিস—মিথো ভেদভয়াৎ—তার থেকে মুক্তির জন্যই পিতামহ ব্যাস দ্রৌপদীকে পাঁচ পাণ্ডবেরই একতমা পত্নী হতে বলেছেন। যতই ‘লোক-বেদ বিরোধী’ হোক না কেন, ব্যাসের মধ্যে সেই ব্যক্তিত্ব ছিল, যাতে করে আপাত লোকাচার বিরোধী বস্তুকেও তিনি নীতিপক্ষে স্থাপন করতে পেরেছিলেন প্রয়োজন অনুযায়ী। দ্রুপদ পাঞ্চাল অবশ্য নিজ কন্যার বিভূতিময় সত্ত্ব তথা ভগবান শঙ্করের আশীর্বাদের কথা শুনেই ব্যাসের কথা মেনে নিয়ে বললেন—আপনার কথা না শুনেই—অশ্রুত্বৈবং বচনং তে মহর্ষে—আমি অনেক কথা বলেছি, কিন্তু ভগবান শঙ্কর যখন এমন বর দিয়েছেন, তাতে ধর্ম হোক, অধর্ম হোক, আমার কোনও অপরাধ থাকল না—ধর্মো'ধর্মো বা না মমাপরাধঃ।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যেদিন বারণাবতে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলেন, সেদিন থেকেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস মনে মনে পাণ্ডবদের পক্ষে চলে গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে ব্যাস যেভাবে কৌরবদের শত্রুরাষ্ট্র পঞ্চালের সঙ্গে পাণ্ডবদের যোগ ঘটালেন, একই সঙ্গে বৃষ্ণি-যাদব গোষ্ঠীর প্রধান কৃষ্ণের সঙ্গেও যেভাবে পাণ্ডবদের যোগাযোগ ঘটল, তাতে এমন একটা রাজনৈতিক ‘অ্যাক্সিস’ তৈরি হল, যাতে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের রাজ্যভাগ বুঝিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। খাণ্ডবপ্রস্থের যে জায়গায় পাণ্ডবদের রাজ্য দিলেন ধৃতরাষ্ট্র সে জায়গাটা ছিল উষর, শস্যহীন জঙ্গল। কিন্তু সেই নগরেই যখন নগর প্রতিষ্ঠার জন্য শান্তিঘট স্থাপন করতে চললেন পাণ্ডবরা তখন নগর স্থাপনের মঙ্গলমন্ত্র উচ্চারণ করতে দেখছি ব্যাসকেই—নগরং স্থাপয়ামাসুর্দ্বৈপায়ন-পুরোগমাঃ।

সেকালের দিনে যিনি যত বড় রাজাই হোন না কেন, বড় বড় মুনি, ঋষি এবং ব্রাহ্মণেরা যদি তাঁর অনুকূলে না থাকতেন, তবে বোঝা যেত—সে রাজা অন্যায় কার্যে জড়িত এবং ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধতা থাকলে তিনি জনপ্রিয়তা হারাতেন। যুধিষ্ঠির যখন খাণ্ডবপ্রস্থকে ইন্দ্রপ্রস্থে পরিণত করে ময়নির্মিত রাজধানীতে আবাস প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন ব্রাহ্মণেরা অনেকেই চলে এলেন ইন্দ্রপ্রস্থে—তত্রাগচ্ছন্ দ্বিজা রাজন্ সর্ববেদবিদাং বরাঃ। শুধু ব্রাহ্মণেরাই নন, তাবড় তাবড় মুনি ঋষিরাও অনেকেই চলে এলেন যুধিষ্ঠিরের সভায়। এই স্বেচ্ছাগত ঋষিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়েন ব্যাস। ধৃতরাষ্ট্র তাঁর আত্মজ হওয়া সত্ত্বেও ব্যাস তাঁর ব্রহ্মবাদী পুত্র শুকের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের সভায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন—বকো দাল্ভ্যঃ স্থূলশিরাঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ শুকঃ। মহাভারতের বক্তা বৈশম্পায়ন পূর্বকথা স্মরণ করে পাণ্ডবদের নাতি জনমেজয়কে সগর্বে বলেছিলেন—আমরা যাঁরা ব্যাসের শিষ্য হয়েছিলাম—আমার সহাধ্যায়ী সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল এবং আমিও—আমরা সবাই তখন যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় সদস্য হিসেবে ছিলাম—সুমন্তুর্জৈমিনিঃ পৈলো ব্যাসশিষ্যা স্তথা বয়ম্। এই কথা থেকে বোঝা যায়—শুধু ব্যাসের কারণেই তখনকার অনেক পণ্ডিত ঋষি-ব্রাহ্মণেরা

যুধিষ্ঠিরের সভায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।

ইন্দ্রপ্রস্থের সভারম্ভের উৎসব শেষ হয়ে গেলে অনেক মুনি ঋষিই হয়তো ফিরে গিয়েছিলেন, ব্যাস কিন্তু যুধিষ্ঠিরের রাজসভাতেই থেকে গেছেন। এটা বোঝা যায়। কেননা এর পরেই ভবঘুরে নারদমুনি যখন যুধিষ্ঠিরের কাছে রাজ্যশাসনের নানান প্রক্রিয়া-প্রণালীর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে শেষমেশ যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ করতে বললেন, তখন দেখছি— যুধিষ্ঠির অন্যান্য ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রধান তাঁর কুলপুরোহিত ধৌম্য এবং তার পরেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের সঙ্গে আলোচনা করছেন রাজসূয়ের ইতিকর্তব্যতা নিয়ে। পরে দিগ্‌বিজয়ের শেষে যুধিষ্ঠির যখন কৃষ্ণ-বাসুদেবের কাছে আপন ঋণ স্বীকার করছেন, সেখানেও যুধিষ্ঠির এবং তাঁর ভাইদের পাশে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। রাজসূয় যজ্ঞে পুরোহিত ধৌম্যের সঙ্গে দ্বৈপায়ন ব্যাসই যে অতিথি-ঋত্বিক্ হিসাবে কাজ করেছেন, সেটা বুঝতেও সময় লাগে না—ধৌম্য-দ্বৈপায়নমুখৈঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ পুরুষর্ষভ। আবার রাজসুয়ের শেষে মহামতি ভীষ্মের উপদেশে যুধিষ্ঠির যখন কৃষ্ণকে সম্মান-অর্ঘ্য দান করলেন, তখনও দ্বৈপায়ন ব্যাস সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কেননা কৃষ্ণকে, অর্ঘ্যদান করায় শিশুপাল ক্ষিপ্ত হয়ে যাঁদের অর্ঘ্য লাভের যোগ্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন, সেখানে অনেক নামের মধ্যে ব্যাসের নামও আছে। শিশুপাল কৃষ্ণের উদ্দেশে সোপহাস মন্তব্য করে যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন—যদি তুমি মনে কর একজন মহান ঋত্বিক্‌কে অর্ঘ্যদান করবে, তা হলেও কি কোনওভাবে কৃষ্ণের কথা ভাবা যাবে, বিশেষত যেখানে দ্বৈপায়ন ব্যাসের মতো মহান ব্যক্তিত্ব উপস্থিত রয়েছেন—দ্বৈপায়নে স্থিতে বৃদ্ধে কথং কৃষ্ণো'র্চিতস্ত্বয়া। অনুমান করা যায়—এই রাজসূয়ের আসরেই নিজের চোখের সামনে কৃষ্ণের চক্রনিক্ষেপে শিশুপালের মৃত্যুও দেখেছেন ব্যাস।

শিশুপাল বোঝেননি—ব্যাসের জন্মভূমি যমুনার অন্তর্গত এক দ্বীপ এবং সেই যমুনার তটভূমিতে যিনি এককালে মধুর মুরলীর পঞ্চম খেলিয়ে দিয়েছিলেন—সেই কৃষ্ণ নামের মানুষটি তাঁর কাছে কত প্রিয়। নতুন যুগের এই নায়কের কথা তিনি সবিস্তার পূর্বেই শুনিয়েছিলেন পঞ্চাল রাজ্যের দ্রুপদ-সভায়। পাণ্ডবদের সঙ্গে তখন কৃষ্ণের দেখা হয়ে গেছে। এখন এই রাজসূয়ের আসরে নতুন নায়ক কৃষ্ণকে অভিবাদিত হতে দেখে তিনি নিশ্চয়ই পুলকিত হয়েছেন। ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ মহাভারত জুড়ে কৃষ্ণের অসামান্যতা বর্ণনা করবেন তিনি। মহাভারতের শেষে তাঁকে বলতে হবে—আমি এতক্ষণ যা বলেছি, তা বাসুদেব কৃষ্ণেরই কীর্তিকাহিনী—বাসুদেবো'ত্র কীর্ত্যতে। সেই বাসুদেব কৃষ্ণকে যখন পাণ্ডবদের পথপ্রদর্শক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা গেল, ব্যাস তখন থেকেই নিশ্চিন্ত হয়েছেন অনেকটা। আমার কাছে সবচেয়ে যেটা আশ্চর্য লাগে, সেটা হল—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস হলেন মহাভারতের সবচেয়ে বৃদ্ধ কালো মানুষ। তিনি কৃষ্ণবর্ণা কালী সত্যবতীর ছেলে। সেই কালো মানুষটি কালোবরণ অর্জুনের সঙ্গে মিলন ঘটিয়েছেন 'সুশ্রোণী শ্যামা' কৃষ্ণা পাঞ্চালীর সঙ্গে এবং সেই কালো মানুষটিই মথুরার 'নীরদঘনকান্তি' চিকন-কালা কৃষ্ণের উত্থান দেখে নিশ্চিন্ত হলেন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে। মহাভারতে কৃষ্ণবর্ণের পূর্ণ জয়কার ঘোষণার কবি-ই হলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস।

ব্যাস যখন বুঝলেন—পাণ্ডবদের সখা-সহায় হিসেবে কৃষ্ণের স্থান সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে, যখন বুঝলেন—কর্তব্যবোধহীন স্বার্থপর ধৃতরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পাণ্ডবরা এখন সনাথ, তখন থেকেই ব্যাসকে আমরা অনেক দায়মুক্ত দেখছি। এতদিন ব্যাসকে আমরা নিঃশব্দে পাণ্ডবদের পক্ষে বিচরণ করতে দেখেছি। জতুগৃহ-দাহের অন্যায় আরম্ভ হতেই তিনি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে উপস্থিত হয়েছেন সেই অরণ্যভূমিতে, যেখানে পিতৃরাজ্যের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত পাণ্ডবেরা নির্বাসিত হয়ে রয়েছেন। সেই দিন থেকে এই রাজসূয় যজ্ঞ পর্যন্ত সময়ে-অসময়ে ব্যাস কিন্তু পাণ্ডবদের পাশে পাশেই আছেন। তাঁদের স্বাধীন কর্মের ক্ষেত্রে তিনি কোনও বাধা দেন না, সব জায়গায় তিনি অযাচিত উপদেশও বিতরণ করেন না, কিন্তু পিতামহের স্নেহসিক্ত পক্ষপাতটুকু ঠিক তিনি যুধিষ্ঠিরের আনত মস্তকের ওপর সঞ্চিত করে রেখেছেন।

ব্যাস যখন দেখলেন—রাজসূয় যজ্ঞের সুবাদে যুধিষ্ঠির অনেকটাই প্রতিষ্ঠিত, তখন তিনি বিদায় চাইলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। কৃষ্ণ তখন দ্বারাবতীতে ফিরে গেছেন, দুর্যোধন আর শকুনি তখনও যুধিষ্ঠিরের নবনির্মিত সভা দেখে ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে মরছেন, ব্যাস এই অবস্থায় সশিষ্য উপস্থিত হলেন সভাসীন যুধিষ্ঠিরের কাছে। যুধিষ্ঠির তাঁকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে স্বর্ণসিংহাসনে বসিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে রইলেন নম্রভাবে। ব্যাস তাঁকে বসালেন আসনে। সভ্রাতৃক যুধিষ্ঠিরকে বললেন—ভাগ্যি মানি আজ তুমি এই সাম্রাজ্য পেয়েছ। তোমার জন্য সমস্ত কুরুকুল আজ সমৃদ্ধ হয়েছে। আমি এখানে থেকে তোমাদের অনেক সম্মান-সমাদর লাভ করেছি, এবার আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় চাই—আপৃচ্ছে ত্বাং গমিষ্যামি পূজিতো'স্মি বিশাম্পতে।

যুধিষ্ঠির এতকাল ব্যাসের উত্তম সঙ্গ লাভ করে আর তাঁকে ছেড়ে দিতে চান না। বললেন —অনেক অনেক ব্যাপারে আমার সন্দেহ-সংশয় আছে পিতামহ! সেইসব সন্দেহ মুক্ত করার ব্যাপারে আপনি ছাড়া আর তো কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারবে না—তস্য নান্যো'স্তি বক্তা বৈ ত্বামৃতে দ্বিজপুঙ্গব। যুধিষ্ঠির আরও বললেন—এই যে নারদমুনি আমায় নানান উৎপাতের কথা বলে গেলেন, তার মধ্যে রাজা-রাজড়ার উৎপাতও আছে। আমি জিজ্ঞাসা করি—রাজসূয় যজ্ঞের আসরে চেদিরাজ শিশুপাল যে মারা গেলেন, তাতেও কি প্রচ্ছন্ন কোনও উৎপাত ঘটল আমার—অপি চৈদস্য পতনাচ্ছন্নম্ ঔৎপাতিকং মহৎ।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকে কেন্দ্র করে মগধরাজ জরাসন্ধের পতন এবং তাঁর ডানহাত শিশুপালের মৃত্যু থেকেই ভারতবর্ষের রাজনীতির যে নতুন মেরুকরণ সূচিত হয়েছে, সেটা যুধিষ্ঠির খানিকটা বুঝতে পারছিলেন হয়তো, নইলে সে প্রশ্নটা ব্যাসের সামনে তুললেন কেন? কিন্তু তাঁর রাজসূয় যজ্ঞই যে এ ব্যাপারে 'টার্নিং পয়েন্ট' সেটা যুধিষ্ঠির তেমন করে বোঝেননি, যেমনটি বুঝেছিলেন ব্যাস। তিনি অবশ্য এই সরল জ্যেষ্ঠ নাতিটিকে অসরল রাজনীতি বোঝাতে যাননি। বরঞ্চ খানিকটা গাণনিক জ্যোতিষীর মতো অযথা যুধিষ্ঠিরকে ভয় না দেখিয়ে বলেছিলেন—সামনের যে তেরোটা বছর, সে বড় উৎপাতের সময় তোমার। তোমাকেই কেন্দ্র করে এমন একটা যুদ্ধ ভবিষ্যতে লাগবে, যাতে সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস হয়ে যাবে—ত্বমেকং কারণং কৃত্বা...ক্ষয়ং যাস্যতি ভারত। ব্যাস আরও পরিষ্কার করে বললেন—ভবিষ্যতের এই যে সর্বনাশ আসছে, তার একদিকে থাকবে দুর্যোধনের অন্যায় অপরাধ আর অন্যদিকে থাকবে ভীম-অর্জুনের শক্তি—দুর্যোধনাপরাধেন ভীমার্জুনবলেন চ।

এই মহাক্ষয়ের প্রতীক হলেন প্রলয়কালীন রুদ্র-শিব। ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে বললেন—রাত্রির শেষ যামে প্রলয়মূর্তি শিবকে তুমি দেখতে পাবে। অর্থাৎ এই মহাক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। তবে আমি বলব—এর জন্য তুমি চিন্তা কোরো না; মহাকালের গতি কেউ রোধ করতে পারবে না

—মা তৎকৃতে হনুধ্যাহি কালো হি দুরতিক্রমঃ। ব্যাস সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—তোমার মঙ্গল হোক। আমাকে এবার কৈলাসে ফিরে যাবার অনুমতি দাও। তুমি অহঙ্কারশূন্যভাবে তোমার কর্তব্য পালন করে যাও। ইন্দ্রিয় জয় করে স্থিরভাবে এই রাজ্য প্রতিপালন করো—অপ্রমত্তঃ স্থিতো দান্তঃ পৃথিবীং পরিপালয়।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ দেখে সমকালীন রাজনীতির গতিপ্রকৃতি বেশ ভালই বুঝতে পেরেছিলেন ব্যাস। তিনি বুঝেছিলেন যে, যুধিষ্ঠিরের ওই বাড়বাড়ন্ত তাঁর শত্রুপক্ষীয় নেতা-নায়কদের মোটেই সহ্য হবে না। গৃহভেদী যুদ্ধ একদিন না একদিন লাগবেই। নিজেরই আত্মজ বংশধরদের মধ্যে এই ক্রমবর্ধমান বিরোধও বোধ হয় আর তাঁর ভাল লাগছিল না। আপাতত তাই তিনি কৈলাসে গিয়ে মুক্তি পেতে চাইলেন। কিন্তু যাবার আগে যুধিষ্ঠিরের যে প্রতিষ্ঠা তিনি দেখেছেন, তার মধ্যেই যে উত্তর-ধ্বংসের বীজ নিহিত ছিল, সে কথাটা খুব ভালভাবে ধরা আছে মহাভারতের পরিশিষ্ট বলে পরিচিত হরিবংশে। সেখানে দেখছি—পাণ্ডবদের প্রপৌত্র জনমেজয় তাঁর পূর্বপুরুষ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের ব্যাপারে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। দূরনিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইতিহাসের ফলাফল খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে বলেই যুধিষ্ঠিরের এই উত্তরপুরুষ জনমেজয় বুঝে গেছেন যে, রাজসূয়ের যজ্ঞাগ্নি থেকেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সূচনা হয়েছে, সেখানেই কুলক্ষয়ের আরম্ভ—হেতুঃ কুরূণাং নাশস্য রাজসূয়ো মতো মম।

ক্ষুব্ধ জনমেজয় কিন্তু পিতামহের পিতামহ ব্যাসকেই দায়ী করেছেন এ ব্যাপারে। বলেছেন—কেন আপনি আমার প্রপিতামহ যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ করতে বারণ করেননি—রাজসূয়ো মহাযজ্ঞঃ কিমর্থং ন নিবারিতঃ? জনমেজয়ের প্রশ্নবাণে জর্জরিত এই অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ খুব ভাল জবাব খুঁজে পাননি। শুধু বলেছেন—নিঃসন্দেহে রাজসূয় যজ্ঞই যুধিষ্ঠিরের কাল হয়ে দাঁড়াল এবং আমি বারণ করলেও যুধিষ্ঠির এই যজ্ঞ বন্ধ করতেন না। কেননা কাল হল এমনই এক বস্তু যার চালনায় মানুষ বিপরীত আচরণ করে, তোমার পূর্বপিতামহরাও কালপ্রেরিত হয়েই যা করা উচিত ছিল না তাই করেছেন—কালেন বিপরীতাস্তে তব পূর্বপিতামহাঃ।

সত্যিই, বাসের কথাই সত্যি বটে। মহাভারতে দেখি—নারদ ইত্যাদি মুনি-ঋষিরা যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ করতে বললেন আর যুধিষ্ঠিরও যেন নেচে উঠলেন। ভীম এবং অর্জুনের শক্তি ছিল এবং তার সঙ্গে জুটল কৃষ্ণের বুদ্ধি। কৃষ্ণের মতো অতিবুদ্ধি ব্যক্তিও যুধিষ্ঠিরকে সতর্ক করেছিলেন জরাসন্ধের কথা বলে। কিন্তু সতর্ক করলেও তিনি রাজসূয় বারণ করেননি। মাঝখান থেকে জরাসন্ধ কৃষ্ণের বুদ্ধিতে মারা গেলে রাজসূয় যজ্ঞের দিগ্‌বিজয় পর্ব খুব সহজ হয়ে গেল বটে, কিন্তু জরাসন্ধের মৃত্যুর পরে রাজনৈতিক একটা ‘পোলারাইজেশন’ তৈরি হয়ে গেল, যা রোধ করা সম্ভব ছিল না। ব্যাস অসাধারণ একটি কথা বলেছেন এইখানে। বলেছেন—আমাকে তো যুধিষ্ঠির রাজসূয়ের ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্বন্ধে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করেননি। আর জিজ্ঞাসা না করলে আমি কোনও কথা বলি না—ন মাং ভবিষ্যং পৃচ্ছন্তি ন চাপৃষ্টো ব্রবীম্যহম্।

রাজসূয় যজ্ঞের সময় যুধিষ্ঠিরের যত জিজ্ঞাস্য ছিল, তা সবটাই রাজসূয় করা সম্ভব, না অসম্ভব, এই নিয়ে। কিন্তু এই যজ্ঞের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া যে কত গভীরে, তা যুধিষ্ঠির ব্যাসকে তো সেই সময়ে জিজ্ঞাসা করেনইনি এবং তা নিজেও খুব একটা বোঝেননি। বুঝলে, অমন ছেলেমানুষের মতো ভাইদের কাছে গিয়ে বলতেন না—শুনলে ভাই ব্যাসের কথা! আমাকে নিমিত্ত করেই নাকি এই ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস হবে। এর থেকে আমার মৃত্যু ভাল। ভাইয়েরা সব! এখন থেকে কারও সঙ্গে আর আমি খারাপ ব্যবহার করব না। জ্ঞাতিদের নির্দেশ মেনে চলব। ঝগড়া-বিবাদ দূরে রেখে সকলের প্রিয় আচরণ করব। তা হলেই আর কেউ আমার নিন্দে করবে না—বাচ্যতাং ন গমিষ্যামি লোকেষু মনুজর্ষভাঃ।

যুধিষ্ঠির যেমন বুঝেছিলেন—রাজনীতি জিনিসটা যদি তেমনই সহজ হত, তা হলে কোনও কথাই ছিল না। ব্যাস দেখেছিলেন—যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ শেষ হয়ে যাবার পর সকলে বাড়ি ফিরে গেলেও দুর্যোধন আর শকুনি তখনও রয়ে গেছেন ইন্দ্রপ্রস্থের রাজবাড়িতে। সভাগৃহের এক-একটি নির্মাণকৌশল তিনি দেখছেন এবং ঈর্ষালু হয়ে উঠছেন যুধিষ্ঠিরের ওপর। দুর্যোধনের এই অধিককাল অবস্থিতি কোনও ভাবেই যে ভালবাসার কারণে নয়, এ কথা কি যুধিষ্ঠির একটুও বুঝেছিলেন? কিন্তু ব্যাস নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন এবং এসব জ্ঞাতিবিরোধ সইতে না পেরে কৈলাসের শিবভূমিতে গিয়ে শান্তি পেতে চেয়েছিলেন। ব্যাস যেমনটি বুঝেছিলেন, দুই জ্ঞাতিরাজ্য ইন্দ্রপ্রস্থ এবং হস্তিনাপুরের রাজনীতি সেই পথেই চলল। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যশ্রী দুর্যোধনকে ঈর্ষা পরশ্রীকাতরতায় উত্তরোত্তর অসহিষ্ণু করে তুলল। পাশা খেলা হল; যুধিষ্ঠিরের সর্বস্ব হরণ করলেন দুর্যোধন। পিতা ধৃতরাষ্ট্রের সহমতে পাণ্ডবদের বনে পাঠালেন দুর্যোধন। এমনকী বনবাসেও যাতে পাণ্ডবদের ওপর চড়াও হয়ে তাঁদের হত্যা করা যায়, সেজন্য দুর্যোধন-কর্ণরা রথ নিয়ে বেরোলেন বনের পথে—নির্যযুঃ পাণ্ডবান্ হন্তুং সহিতাঃ কৃতনিশ্চয়াঃ।

পাণ্ডবদের এই অবস্থার খবর নিশ্চয়ই ব্যাসের কাছে পৌঁছেছে। মহাভারত বলেছে—ব্যাস দিব্য চক্ষুতে পাণ্ডবদের নির্বাসন-নির্যাতন দেখতে পেয়ে কৈলাস ছেড়ে চলে এসেছেন। কিন্তু আমরা জানি—ব্যাস তাঁর আত্মজ পুত্র ধৃতরাষ্ট্র এবং দুরাত্মা দুর্যোধনের অন্যায় আচরণ সহ্য করতে না পেরেই তাঁর শান্তির আবাস ত্যাগ করে আবারও নেমে এসেছেন হস্তিনাপুরে। তিনি পাণ্ডবদের কাছে না গিয়ে আগে হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করে যা বললেন, তার মধ্যে পাণ্ডবদের প্রতি তাঁর যত মমতা প্রকাশ পেয়েছে, তারচেয়ে অনেক বেশি প্রকট হয়েছে তাঁর বাস্তব বুদ্ধি। এই বাস্তব বুদ্ধির মধ্যে আত্মজ ধৃতরাষ্ট্রের জন্য তাঁর দুশ্চিন্তাও অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি বলেছেন—ধৃতরাষ্ট্র! তুমি তো প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বটে। একটু মন দিয়ে শোনো আমার কথা। এ কথা ঠিক যে, পাণ্ডবদের বনগমনের ঘটনায় আমি খুশি হইনি একটুও—ন মে প্রিয়ং মহাবাহো যদাতাঃ পাণ্ডবা বনম্। বিশেষত দুর্যোধন-শকুনিরা যেভাবে ছলচাতুরি করে তাদের সর্বস্ব অপহরণ করেছে, তাতে খুশি হওয়ার কারণও নেই।

ব্যাস পাণ্ডবদের ওপর অন্যায়-অত্যাচারের কথা বেশি বাড়ালেন না। কিন্তু এই অপকর্মের ভবিষ্যৎ ফল ধৃতরাষ্ট্রের এবং তাঁর পুত্রদের কতটা বিপদে ফেলবে, তার একটা আভাস দিলেন ব্যাস। বললেন—মনে রেখো, বনবাসের এই অসহ্য কষ্ট পাণ্ডবরা মনে মনে পুষে রাখবে। তারপর তেরো বছর পরে তারা যখন ফিরে আসবে, তখন এই ক্রোধবিষ তারা মুক্ত করবে কৌরবদের ওপরেই—বিমোক্ষ্যন্তি বিষং ক্রুদ্ধাঃ কৌরবেয়েষু ভারত। ব্যাস জানেন—পাণ্ডবদের ওপর এই অত্যাচারের পিছনে দুর্যোধন যতটুকু দায়ী, ধৃতরাষ্ট্রও ঠিক ততখানিই দায়ী। কিন্তু হস্তিনার শাসক রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি সোজাসুজি তিরস্কার না করে দুর্যোধনের নামে সেই তিরস্কারটুকু করেছেন। বস্তুত জন্মান্ধ তথা রাজ্যলোভী ধৃতরাষ্ট্রের ওপরে ব্যাসের অদ্ভুত এক মায়া ছিল। একটি অন্ধ পুত্র অথচ তার বিষয়ভোগের এমন অদম্য ইচ্ছা দেখে ঋষিজনোচিত করুণায় উদ্বেলিত হতেন ব্যাস। হয়তো সেই জন্যই কখনও সোজাসুজি তিনি বলতে পারতেন না যে, দুর্যোধন নয়, তুমি নিজেই আছ এই অপকর্মের পিছনে। তিনি তাই দুর্যোধনের নাম করে ধৃতরাষ্ট্রকে তিরস্কার করেন।

ব্যাস বললেন—তোমার ছেলে দুর্যোধনের বুদ্ধি অত্যন্ত খারাপ—তব পুত্রঃ সুমন্দধীঃ। রাজ্য পাবার লোভে সে সদাসর্বদা পাণ্ডবদের সঙ্গে হিংসা করে যাচ্ছে, তাদের মেরে ফেলারও চেষ্টা করছে সব সময়। আমি বলি কী—এই ছেলেকে তুমি থামতে বলো—শমং গচ্ছতু তে সুতঃ। নইলে একদিন নিজের প্রাণটাই তাকে দিতে হবে। ব্যাস অসাধারণ বাক্য-কৌশলে ধৃতরাষ্ট্রকে আপন গোষ্ঠীভুক্ত করে নিয়ে তাঁকে সাবধান করে বললেন—যেমনটি

ভীষ্ম অথবা দ্রোণ, এমনকী যেমনটি আমরাও, তুমিও তো তেমনই এক ভদ্রলোক—তথা সাধুর্ভবানপি। কিন্তু পাণ্ডবদের ব্যাপারে তোমার ছেলে যেমন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে, তাতে উদাসীন হয়ে বসে থাকলে খুব অন্যায় হয়ে যাবে। তারচেয়ে তুমি বরং এক কাজ করো—তোমার এই মন্দবুদ্ধি ছেলেটিকে একা বনে পাঠিয়ে দাও। সে পাণ্ডবদের সঙ্গে বনেই থাকুক—অথবায়ং সুমন্দাত্মা বনং গচ্ছতু তে সুতঃ। তাতে পাণ্ডবদের সঙ্গে থাকতে থাকতে যদি তার মধ্যেও ভাব-ভালবাসা জন্মায়, তবেই তুমি বেঁচে গেলে, মহারাজ! নইলে, আমি মনে করি—জন্মানোর পর থেকেই যার যেরকম চরিত্র গঠিত হয়ে যায়, মানুষ না মরা পর্যন্ত সে চরিত্র পালটায় না—নামৃতস্যাপসর্পতি। আমি যা বলছি, সে সম্বন্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুরই বা কী বলেন? তুমিই বা কী মনে করছ?

ঋষি পিতার সামনে ধৃতরাষ্ট্র কোনও কুটিল আচরণ করলেন না। তিনি নিজের দোষ স্বীকার করে নিয়ে বললেন—পাশা খেলার পর যেসব বিপরীত ঘটনা ঘটেছে, তা আমিও কোনওভাবে পছন্দ করতে পারিনি। কিন্তু এ যেন দৈবের দুর্বিপাক, আমাকে দিয়ে সব করিয়ে নিল। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, গান্ধারী কেউই চাননি পাশাখেলা হোক। কিন্তু পারিনি, দুর্যোধনকে আমি কিছুতেই ত্যাগ করতে পারিনি। পুত্রস্নেহ এমনই এক বস্তু যে, দুর্যোধনের সব অন্যায় জেনেও আমি তাঁকে ত্যাগ করতে পারিনি—পুত্রস্নেহেন ভগবন্ জানন্নপি প্রিয়ব্রত।

ব্যাস একটুও তিরস্কার করেননি ধৃতরাষ্ট্রকে। ত্যাগব্রতী মহর্ষি হয়েও পুত্রস্নেহেই তো তিনি বার বার রাজগৃহে ফিরে আসেন। মানুষের এই অমল মনের বন্ধন তিনি বোঝেন, তিনি যে কবি। কিন্তু কবির অন্তরের মধ্যে যে ঋষিটি বসে আছেন, তাঁর অন্তরের মধ্যে ভাল-মন্দ, নীতি-অনীতির পরামর্শ চলে সব সময়। তিনি চান পুত্রস্নেহ যেন কোনও পিতা-মাতাকে অন্ধ না করে, যেমনটি করেছে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে। ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রের কথা সাবেগে মেনে নিয়েছেন। তবু ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি সম্বোধন করেছেন কুরুবংশীয় সেই রাজার মর্যাদায়, যাঁর জন্য আত্মজ পুত্র হওয়া সত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি আপন পুত্র বলতে পারেন না। ব্যাস তাই স্বাভিমানে বলেছেন—ওহে বিচিত্রবীর্যের ছেলে! বৈচিত্রবীর্য নৃপতে! এই কথাটা তুমি একশো ভাগ সত্যি বলেছ। আমিও ঠিক একই কথাই ভাবি—সংসারে পুত্রস্নেহের বাড়া আর কিছু নেই। সংসারে পুত্রই সব চাইতে বড় স্বার্থের বস্তু হয়ে ওঠে—দৃঢ়ং বিদ্মঃ পরং পুত্রং পরং পুত্রান্ন বিদ্যতো স্নেহের রাজ্যে পুত্র-কন্যার সর্বাতিশায়িত্ব স্থাপন করেও ব্যাস কিন্তু নিজের মননটুকু ঠিকই বুঝিয়ে দিলেন ধৃতরাষ্ট্রকে। এই প্রসঙ্গে এমন একটি উদাহরণ তিনি দিলেন, যা আমাদের লৌকিক জীবনে অহরহ দেখি। ব্যাস নিজের স্নেহবৃত্তি বুঝিয়ে দেবার জন্য স্বর্গবাসিনী গোমাতা সুরভির সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্রের যে কথোপকথন হয়েছিল, তার সার কথাটুকু ধৃতরাষ্ট্রের সামনে বললেন।

মহাকাব্যের কল্প অনুযায়ী সুরভি পৃথিবীর সমস্ত গোরুদের আদি-জননী। তিনি নাকি একদিন বসে বসে কাঁদছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র গোমাতার ক্রন্দন দেখে স্বর্গরাজ্যের অমঙ্গলাশঙ্কায় সুরভির উদ্দেশে বললেন কাঁদছ কেন, মা! দেবতা, মানুষ—কার কষ্ট দেখে তুমি কাঁদছ। সুরভি তির্যকভাবে বললেন—আপনার প্রজারা সবাই ভাল আছে। দেবতা, মানুষ সবারই কুশল—কিন্তু আমি কাঁদছি আমার ছেলের কষ্টে। এই বলে সুরভি মর্ত্যভূমির এক বিজন দেশে একটি কৃষিক্ষেত্রের দিকে দেবরাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। দেখা গেল—একটি কৃষক তার জমিতে হাল দেবার জন্য দুটি বলদ নিয়ে এসেছে। একটি বলদ হৃষ্টপুষ্ট, জোয়াল কাঁধে নিয়ে জমি লাঙল করতে তার কোনও কষ্ট নেই। কিন্তু অন্য বলদটি চেহারাতেও ছোট, রোগা এবং দুর্বল। সারা শরীরে তার শিরা বেরিয়ে গেছে, কিন্তু কৃষক তাকে ছাড়ছে না। লাঙল নিয়ে সে এগোতে পারছে না দেখে কৃষক তাকে বার বার চাবুক মারছে এবং তাকে জোর করে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে—বধ্যমানঃ প্রতোদেন

তুদ্যমানঃ পুনঃপুনঃ।

সুরভি বললেন—আমার এই রোগা ছেলেটার কষ্ট সহ্য করতে পারছি না বলেই আমার চোখে এমন জল আসছে। দেবরাজ সান্ত্বনা দেবার জন্য বললেন—তোমার তো হাজার হাজার ছেলে আছে, আর কৃষকরাও তাদের প্রতিদিনই চাবুক মারছে। তবে ওই একটা ছেলের জন্য অত কষ্ট কীসের? সুরভি বললেন—নিশ্চয়ই। হাজার হাজার ছেলেও আমার আছে, তাদের প্রতি স্নেহদৃষ্টিও আমার সমান। কিন্তু যে ছেলেটা দুর্বল, যে ছেলেটা রোগা-ভোগা তার ওপরেই মায়ের বেশি স্নেহ থাকে—দীনস্য তু সতঃ শক্র পুত্রস্যাভ্যধিকা কৃপা। পুত্রস্নেহ এই রকমই।

ব্যাস এবার নিজের কথায় এলেন। যিনি ভবিষ্যতে মহাভারতের কবি হবেন লৌকিক জীবনের সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ-সুখ তাঁর নিবিড়ভাবে জানা আছে বলেই কৃষিক্ষেত্রের একটি দুর্বল পীড়িত লাঙলবাহী বৃষও তাঁর কবিজনোচিত বেদনার দৃষ্টি থেকে ভ্রষ্ট হয় না। ব্যাস বললেন—সুরভি যেমনটি জানিয়েছেন, তেমনই তোমারও সব পুত্রদের ওপর সমান ভাবটুকু থাকুক, কিন্তু দুর্বলের ওপর দয়াটা যেন বেশি থাকে তোমার। ব্যাস এবার বিচিত্রবীর্যের সামাজিক পরিচয়ের খোলসটুকু সরিয়ে দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে পুত্র সম্বোধন করে বললেন—বাছা! আমার কাছে পাণ্ডুও যেমন ছিল, যেমনটি আমার বিদুর, তেমনই তুমিও তো আমার কাছে সেই রকমই—যাদৃশো মে সুতঃ পাণ্ডুস্তাদৃশো মে’সি পুত্রক। কাজেই আমি স্নেহবশতই এ কথা বলছি যে, তোমার তো একশোটি ছেলে, কিন্তু পাণ্ডুর মাত্র পাঁচটি। তারা শঠতা-কুটিলতাও শেখেনি, কাজেই কাজ গুছোনোর ব্যাপারে তাদের পটুত্ব নেই। তোমার ছেলেদের তুলনায় তারা দুর্বল। সেই পাণ্ডুর ছেলেরা কী করে বাঁচবে, কী করে তারা জীবনে বড় হবে—কথং জীবেয়ুরত্যন্তং কথং বর্ধেয়ুরিত্যপি—সেই কথা ভেবে আমি বড় কষ্ট পাই—মনো মে পরিতপ্যতে। ব্যাস এবার চরম কথাটি বললেন ধৃতরাষ্ট্রকে। বললেন—তুমি যে এত পুত্রস্নেহের কথা শোনালে, তাতেই বলি—তুমি যদি তোমার ছেলেদের জীবিত দেখতে চাও, তা হলে ছেলেকে সামলাও, দুর্যোধন পাণ্ডবদের সঙ্গে এই শত্রুতা বন্ধ করুক—যদি পার্থিব কৌরব্যান্ জীবমানানিহেচ্ছসি।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—আপনি যা বলছেন, সবই ঠিক। এমনকী ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুরও ওই একই কথা বলছেন। কিন্তু দুর্যোধন কোনও কথাই শুনছে না। যদি আমার ওপর আপনার অনুগ্রহ থাকে, যদি এই কৌরবকুলের ওপর আপনার দয়া থাকে, তবে আমার মন্দমতি পুত্রটিকে আপনি একটু বোঝান—অনুশাধি দুরাত্মানং পুত্রং দুর্যোধনং মম। ব্যাস বললেন—আমি নয়, দুর্যোধনকে যা বলবার বলবেন ঋষি মৈত্রেয়। তিনি পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করে এই আসছেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। তুমি তাঁর কথা অনুসারে চলবার চেষ্টা করো, নইলে মৈত্রেয় মুনি তোমার পুত্রকে অভিশাপ দেবেন, তাতে বিপদ বাড়বে—অক্রিয়ায়স্তু কার্যস্য পুত্রস্তে শপ্স্যতে রুষা।

দ্বৈপায়ন ব্যাস দুর্যোধনের ঠাকুরদাদা। ঠাকুরদাদা জানতেন যে, দুর্যোধনকে তিনি বুঝিয়ে কিছুই করতে পারবেন না। বরঞ্চ তাঁর সঙ্গে কথা বলে যদি ক্রোধ উদ্দীপিত হয়, তবে সেই অবস্থায় কোনও অভিশাপ-বাক্য উচ্চারণ করে তিনি পিতামহের স্নেহ-মর্যাদা অথবা ঋষির গৌরব কোনওটাই নষ্ট করতে চাননি। তাঁর অনুমানও মিথ্যা নয়। মৈত্রেয় মুনি এবং দুর্যোধনের কথোপকথন শোনার জন্য ব্যাস আর কুরুবাড়িতে অপেক্ষা করেননি। অপেক্ষা করলে দেখতে পেতেন—মৈত্রেয়ের মুখে পাণ্ডবদের তথা তাঁদের বন্ধু-সহায় কৃষ্ণের প্রশংসা শুনে দুর্যোধন মাঝে মাঝে উরুতে থাপ্পড় মেরে আস্ফালন করছিলেন, আবার কখনও বা উদাসীনভাবে কিছুই শুনছিলেন না। মৈত্রেয়ের প্রতি নিদারুণ অবহেলা দেখিয়ে দুর্যোধন পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়ছিলেন অথবা ঈষৎ মাথাটি ঝুঁকিয়ে তাকিয়ে ছিলেন

অন্যদিকে—তমশুশ্রূযমান বিলিখন্তং বসুন্ধরাম্।

দুর্যোধন মৈত্রেয়ের মুখে ধ্বংসের অভিশাপ শুনেছিলেন কিন্তু সেই অভিশাপ অথবা দুর্যোধনের সেই অবহেলার ভঙ্গি দেখার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের গৃহে দাঁড়িয়ে থাকেননি ব্যাস। পায়ে পায়ে তিনি এসে পৌছেছেন দ্বৈতবনে, যেখানে যুধিষ্ঠির তাঁর ভাইদের সঙ্গে সপরিবারে বনবাসের সাময়িক আশ্রয়ে বিপর্যস্ত হয়ে আছেন। ব্যাস এবং মৈত্রেয়ের গন্তব্যের বিপর্যাস থেকে বোঝা যায়—এই দুই মহান-হৃদয় মুনি প্রথমে কৈলাস থেকে আসার পথেই ঠিক করে বেরিয়ে ছিলেন যে, একজন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে যাবেন বোঝাতে, আর অন্যজন পাণ্ডবদের অবস্থা সরেজমিনে দেখে আসবেন। পরে পাণ্ডবদের কাছ থেকে মৈত্রেয় আসবেন ধৃতরাষ্ট্রের বাড়িতে—দুর্যোধনের উদ্দেশে চরম সাবধানবাণী উচ্চারণ করতে এবং ব্যাস যাবেন পাণ্ডবদের শক্তিবৃদ্ধির পথ দেখাতে।

দ্বৈতবনের বনাশ্রয়ে পাণ্ডবদের মধ্যেও তখন এক উত্তপ্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পঞ্চস্বামী-গর্বিতা দ্রৌপদী স্বামীদের শান্ত ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে সতরক্ষী জ্যেষ্ঠ স্বামীকে খুব তিরস্কার করেছেন। তাঁর ইচ্ছে, সমস্ত সত্য শিকেয় তুলে রেখে কপটাচারী দুর্যোধনকে এখনই আক্রমণ করা হোক। দ্রৌপদীর কথার সূত্র ধরে ভীম আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে যুদ্ধের পথেই এগোতে বললেন যুধিষ্ঠিরকে। বহু-তিরস্কৃত যুধিষ্ঠির সুগভীর রাজনীতির প্রসঙ্গ তুলে ভীমকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু খুব যে সফল হলেন, তা নয়। কিন্তু তাঁর কথার মধ্যে অসাধারণ কিছু যুক্তি ছিল এবং সে যুক্তি ভীম পর্যন্ত উড়িয়ে দিতে পারেননি। যুধিষ্ঠির কৌরব-রাজনীতির মেরুকরণ পরিষ্কার করে দিয়ে বলেছিলেন—ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণের মতো ভয়ংকর যোদ্ধারা দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করবেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো শক্তি এখনও পাণ্ডবদের নেই। কাজেই অপেক্ষা করতেই হবে। ঠিক এইরকম একটা তর্কযুক্তির উত্তপ্ত পরিবেশের মধ্যে দ্বৈপায়ন ব্যাসের আগমন ঘটেছে দ্বৈতবনে যুধিষ্ঠিরের অরণ্য-কুটিরে।

ব্যাস যুধিষ্ঠিরের দুর্ভাবনার কথাগুলি শুনেছেন মনোযোগ দিয়ে এবং যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন—তোমার মনের দুর্ভাবনার কথা আমি জানি—বেদ্মি তে হৃদয়স্থিতম্। সেই জন্যই তাড়াতাড়ি করে এলাম। দেখো, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা অথবা স্বয়ং দুর্যোধনের যুদ্ধশক্তির ব্যাপারে যে আশঙ্কা এবং ভয় তোমার মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, আমি বেদবিহিত মন্ত্রের মাধ্যমে সে ভয় দূর করে দিচ্ছি। এরপর ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে নির্জনে নিয়ে গিয়ে বললেন—বনবাসের কাল কেটে গেলেই তোমার ভাল সময় আসবে—শ্রেয়সস্তে পরঃ কালঃ প্রাপ্তো ভরতসত্তমঃ। আমি তোমাকে 'প্রতিস্মৃতি' নামে এক বিদ্যা শিখিয়ে দেব এবং সেই বিদ্যা মূর্তিমতী সিদ্ধির মতো। তোমার কাছ থেকে অর্জুন এই বিদ্যা শিখে নিয়ে দিব্য অস্ত্র লাভ করার জন্য ইন্দ্র, রুদ্র, বরুণ, কুবের এবং যমের সাক্ষাৎ পাবে এবং তাঁদের কাছ থেকে দিব্য অস্ত্র লাভ করে ভবিষ্যতে যুদ্ধজয়ের অভীষ্ট কাজ সম্পন্ন করবে।

লক্ষণীয়, যে অর্জুন যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে 'প্রতিস্মৃতি' বিদ্যা শিখে ভবিষ্যতে শিবকে তুষ্ট করে পাশুপত অস্ত্র লাভ করবেন, ব্যাস কিন্তু সেই অর্জুনকে সোজাসুজি 'প্রতিস্মৃতি'-বিদ্যা শেখালেন না। শেখালেন যুধিষ্ঠিরকে। কেন? প্রশ্ন উঠেছে—কেন যুধিষ্ঠিরকে এই বিদ্যা দান করলেন ব্যাস। টীকাকারেরা উত্তর দিয়েছেন—যুধিষ্ঠির স্বভাবতই সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি। বৈদিক মন্ত্র ধারণের জন্য যে শম-দমাদি সাধন প্রয়োজন, যুধিষ্ঠিরের তা এমনিই আছে। অর্জুন যদি এই মন্ত্র গ্রহণ করতে চান, তবে তাঁকে সেই শম-দমের সাধন অভ্যাস করে কিছুকাল পরে সেই মন্ত্র গ্রহণ করতে হবে। ব্যাস অতকাল পাণ্ডবগৃহে অবস্থান করবেন না। তিনি আবারও তপস্যায় মনঃসংযোগ করবেন। অতএব যুধিষ্ঠিরকে তিনি ইন্দ্রদেবতার তুষ্টিজনক 'প্রতিস্মৃতি'-মন্ত্র দান করলেন। কেমন যুধিষ্ঠিরকে? মহাভারত বলছে—প্রপন্নায়

শুচয়ে। অর্থাৎ বিদ্যালাভের জন্য যিনি প্রপন্ন, শরণাগত। আরও কেমন? যিনি দেহে মনে পবিত্র, শুচি—শুচয়ে ভগবান্ প্রভুঃ। বিদ্যালাভের পর যুধিষ্ঠির নিজে সেই বিদ্যা অভ্যাস করতে লাগলেন। সংযতচিত্তে, বিদ্যা ধারণ করলেন মেধাবী শিষ্যের মতো—ধারয়ামাস মেধাবী...তদ্ব্রহ্ম মনসা যতঃ।

প্রতিস্মৃতি বিদ্যা যুধিষ্ঠিরকে শিখিয়ে ব্যাস চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু যাবার আগে যুধিষ্ঠিরকে এমন সুন্দর একটি উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন যা শুনলে এখনকার দিনের চিন্তাকীর্ণ মানুষেরা ব্যাসকে নতুন আলোকে চিনতে পারবেন। ব্যাস বলেছিলেন—একই বনে অনেক দিন থেকো না রাজা। এ বন সে বন ঘুরে বেড়াও। এক জায়গায় দীর্ঘকাল থাকা কারও পক্ষেই আনন্দজনক হয় না—একত্র চিরবাসো হি ন প্রীতিজনকো ভবেৎ। এই কথাটাই একটা দর্শন। ব্যাসের এই দর্শন পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর দর্শন। সত্যি ব্যাসকে আমরা কখনও এক জায়গায় বেশিদিন থাকতে দেখিনি। এই তিনি এই তীর্থে তপস্যা করছেন তো কিছুদিন পরে পরেই তিনি হস্তিনায় আসছেন। আবার সেখানেও তিনি বেশিদিন থাকেন না। কখনও বদরিকাশ্রম, কখনও কৈলাস, কখনও ইন্দ্রপ্রস্থ, কখনও বা বনে বনে নিরন্তর ঘুরে বেড়ানো। বেদোপনিষদের কবি লিখেছিলেন—চরৈবেতি, চরৈবেতি—চলো, চলতে থাকো। এক জায়গায় বসে থেকো না। চলতে চলতেই একদিন সেই মধুবিদ্যা লাভ করবে—চরন্ বৈ মধু বিন্দেত। ব্যাসকে আমরা এই চলার মন্ত্রে দীক্ষিত দেখেছি। এক জায়গায় থাকলে, সেখানকার গুণ-দোষ মানুষকে প্রভাবিত করে, জায়গাটার ওপর মায়া হয়, বন্ধন আসে, সংকীর্ণতা আসে। চৈতন্য পার্ষদ সনাতন গোস্বামীর কথা পড়েছি। তিনি এক গাছের তলায় একদিনের বেশি থাকতেন না, যদি সেই বৃক্ষতলটির ওপর মায়া জন্মায়!

ব্যাস সনাতনের মতো সন্ন্যাসী নন। মায়ের আদেশে তিনি পুত্র উৎপাদন করেছেন, কিন্তু তাঁদের মায়ায় তিনি হস্তিনায় বসে থাকেননি। তিনি পরিব্রাজকের মতো ঘুরে বেড়ান মধুতত্ত্বের সন্ধানে, আবার সংসারের গণ্ডীর মধ্যে এসে উপদেশও দেন ধর্মসংকটে। সেই উপদেশের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরকে চরৈবেতি-র মন্ত্রও শেখান—এক জায়গায় দীর্ঘকাল থাকা তাঁর পছন্দ নয়। পছন্দ না হওয়ার যে কারণটা, তা শুনলে আজকের পরিবেশবিদ পণ্ডিতেরা ব্যাসকে ধন্য ধন্য করবেন। ব্যাস বললেন—দেখ বাছা! এক বনে বেশিদিন থাকলে সে বনের পরিবেশ নষ্ট হয়, প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়। এক বনে বেশিদিন থাকলে খাদ্য হিসেবে পশুর বিনাশ ঘটবে। বৃক্ষ-লতা-ওষধির বিনাশ—মৃগাণামুপযোগশ্চ বীরুধোষধিসংক্ষয়ঃ। ব্যাস বলেছেন—বাছা যুধিষ্ঠির! এতদিন তোমরা একই বনে থাকছ মানে অরণ্যবাসী ঋষি মুনিদের মনে উদ্‌বেগ সৃষ্টি করছ। তপস্যাক্লান্ত মুনি ঋষিদের উদর ভরণের জন্য যতটুকু ফলমূল আহরণ করা প্রয়োজন, সেই প্রয়োজনে তাঁদের ব্যাঘাত ঘটবে, যদি তোমরাই এখানকার ফলমূল-খাদ্য শেষ করে দাও। তাই বলছিলেম—এই বন ছেড়ে এবার অন্য বনে আশ্রয় নেবার ভাবনা করো—বনাদস্মাচ্চ কৌন্তেয় বনমন্যদ্ বিচিন্ত্যতাম্।

পিতামহ ব্যাসের পরামর্শ শুনে যুধিষ্ঠির ভাইদের নিয়ে দ্বৈতবন ছেড়ে কাম্যক বনে চলে গেলেন, বনে বনে ঘুরতে থাকলেন। আমাদের ধারণা— বন থেকে বনান্তরে যুধিষ্ঠিরকে ঘুরতে উপদেশ দিয়ে ব্যাস আরও একটা কাজ সমাধা করেছেন। তিনি জানতেন—দুর্যোধন বনবাসী যুধিষ্ঠিরকেও ভয় পান। তাঁকে মারবার পরিকল্পনাও ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। এক বনে বেশি দিন থাকলে কৌরবরা অসহায় পাণ্ডবদের মাঝে মাঝেই উত্ত্যক্ত করতে পারেন এবং তাঁরা যে উত্ত্যক্ত করতে চাইছিলেনও—সে উদ্যোগ ব্যাস দেখেছেন। হয়তো দুর্যোধনের এই পূর্বপরিকল্পনার কথা মাথায় রেখেই ব্যাস পাণ্ডবদের বন থেকে বনান্তরে ঘুরে বেড়াতে বলেছেন।

বনবাস চলাকালীন সময়ে যখন দ্বিতীয়বার ব্যাস পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন,

তখন এগারো বছর পার হয়ে গেছে। বড় কষ্টেই তাঁদের এতদিন কেটেছে। সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠির তাঁর সত্য থেকে বিচ্যুত হননি। কিন্তু ভাইদের কষ্ট দেখে, দ্রৌপদীর মনোব্যথা অনুভব করে তিনিও মনে মনে কষ্ট কম পাচ্ছিলেন না। রাত্রে তাঁর ঘুম হয় না ভাল করে। পাশাখেলায় নিজের অপরাধের কথা স্মরণ করে অনুতাপে দগ্ধ হয় তাঁর হৃদয়—ন সুষ্বাপ সুখং রাজা হৃদি শল্যৈরিবার্পিতঃ। ভীম এবং দ্রৌপদী যদিও যুধিষ্ঠিরের শান্ত-বিজ্ঞ স্বভাব সব সময় মানতে পারেন না, তবুও তাঁরা যুধিষ্ঠিরের সম্মানার্থে বনবাসের কষ্ট সহ্য করে চলেছেন নিঃশব্দে। ফলমূল খেয়ে তাঁদের দিন কাটে, অশন-বসন-শয়নও ভাল জোটে না, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের দুঃখিত মুখের দিকে তাকিয়ে এবং দুঃখের দিনের অবসান ঘটতে আর তেমন দেরি নেই বলেই সমস্ত ভাইরা এবং দ্রৌপদীও সব দুঃখ সইছিলেন বড়মুখ করে—যুধিষ্ঠিরমুদীক্ষন্তঃ সেহুর্দুঃখমনুত্তমম্।

ঠিক এইরকমই এক দুঃখসহা দিনে মহর্ষি ব্যাস এসে পৌঁছোলেন কাম্যক বনে। দূর থেকে তাঁকে দেখতে পেয়েই যুধিষ্ঠির এগিয়ে গিয়ে তাঁকে ধরে বসালেন আসনে। পিতামহ ব্যাস দুঃখকষ্টে রোগা হয়ে যাওয়া নাতিদের দেখে মনে বড় ব্যথা পেলেন—তানবেক্ষ্য কৃশান্ পৌত্রান্ বনে বন্যেন জীবতঃ। অনভ্যস্ত আরণ্যক জীবন কাটাতে গিয়ে রাজপুত্রদের যে যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে, সেটা দেখে পিতামহ ব্যাসের চোখে জল ভরে এল—অব্রবীদ্ বাস্পগদ্‌গদম্। ব্যাস যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য দেখে, সুখে দুঃখে তাঁর নির্বিকার চেতনা দেখে ভূয়সী প্রশংসা করে বললেন—বাছা! তপস্যার কৃচ্ছ্রতা ছাড়া জগতে কোনও সুখ লাভ করা যায় না। সবচেয়ে বড় কথা—সুখ জিনিসটা কখনও নিরবচ্ছিন্ন নয়। ক্রমিক পর্যায়ে সুখ আসে, দুঃখ আসে। সুখ যখন আসে, তখন ভোগ করবে, আবার দুঃখ যখন আসবে, তখন সেটা সহ্য করতে হবে—সুখমাপতিতং সেবেদ্ দুঃখমাপতিতং সহেৎ। ঠিক যেমন কৃষক। বৎসরের সব ঋতুতেই সে সমান শস্য পায় না। সে যেমন বেশি শস্য পেলে সুখ ভোগ করে এবং কম পেলে সহ্য করে, মানুষকেও তেমনই পর্যায়ক্রমে ভোগ এবং সহ্য করতে হবে—কালপ্রাপ্তমুপাসীত শস্যনামিব কর্ষুকঃ।

আজকের দিনে যাঁরা মুনি ঋষি এবং রাজাদের সামন্ত্রতন্ত্রের বাহক বলে গালাগালি দেন, তাঁরা ব্যাসের এই উপমাটির কথা ভাববেন। দৈনন্দিন জীবনে সুখ-দুঃখের ভোগ এবং যন্ত্রণায় যে কৃষকের জীবনটাই আদর্শ, সেটা কিন্তু বলছেন একজন ব্রাহ্মণ ঋষি এবং সেটা যিনি শুনছেন তাঁর চরণদুটি কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসভায় বহু রাজন্যবৃন্দের মুকুটমণির রক্তিম আভায় রঞ্জিত হত। তবু কৃষক জীবনের এই বাস্তব সত্য বোঝানোটাই কিন্তু ঋষি-পিতামহের অভীষ্ট নয়। তিনি যুধিষ্ঠিরকে ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, ত্যাগ, সত্য এবং তপস্যার পথ বেয়ে সুখভোগের দুয়ারে পৌঁছোতে বলেছেন। ব্যাস মনে করেন—তপস্যার কৃচ্ছ্রতা সাধন করে যা পাওয়া যায়, সেটাই হল মহৎ পাওয়া—তপসো হি পরং নাস্তি তপসা বিন্দতে মহৎ। জীবনে সুখভোগ করার জন্য যথেচ্ছাচার পছন্দ করেন না ব্যাস। অন্যায়ভাবে যে ধনসম্পত্তি উপার্জন করা যায়, তার মধ্যে কোনও মহত্ত্ব দেখতে পাননি তিনি। আর ধনলাভের জন্য অপরের দাসত্ব করা কিংবা জীবন পণ করে ধন উপার্জন করার মধ্যেও ব্যাসের কোনও সম্মতি নেই। ব্যাস যুধিষ্ঠিরকেই সমর্থন করে বলেছেন—সত্য, ঋজুতা, অনসূয়া, দান, অহিংসা এইগুলিই মনুষ্যজীবনের অঙ্গ হওয়া উচিত এবং এইগুলিই হল তপস্যা। এমন তপস্যার মাধ্যমে যিনি সুখলাভ করেন, তিনি সুখেরও অনিত্যতা বোঝেন, দুঃখেরও অনিত্যতা বোঝেন। আর এই অনিত্যতা যিনি বোঝেন, রাজ্যলাভ করেও তিনি পরমার্থ লাভ করেছেন মনে করেন না, আবার বনবাস করেও তিনি সব হারিয়েছেন বলে মনে করেন না।

প্রায় ভগবদ্‌গীতার মতো উপদেশ দিয়েও ব্যাস কিন্তু গীতার ভগবানের মতোই বাস্তববাদী। ব্যাস মনে করেন—যার যা কাজ সেটি করে যেতেই হবে। তার ফলও পাওয়া যাবে সময়ে। যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বলেছেন—তুমি তোমার সমৃদ্ধ রাজ্য থেকে ভ্রষ্ট

হয়েছ বটে, কিন্তু যে কৃচ্ছ্রসাধন এবং তপস্যা তোমরা করে যাচ্ছ তাতে একদিন সে রাজ্য তুমি ফিরে পাবেই—রাজ্যাৎ স্ফীতাৎ পরিভ্রষ্টস্তপসা তদবাপ্স্যসি।

ব্যাসের কথা শুনে বনবাস-তপ্ত পাণ্ডবরা মনে শান্তি পেলেন অনেকটা। পিতামহ ব্যাসও শুষ্কপ্রায় শস্যের গায়ে বৃষ্টির ছোঁয়া লাগানোর মতো সান্ত্বনাবারি সেচন করে পাণ্ডবদের পুনরুজ্জীবিত করে পুনরায় চলে গেলেন তপস্যায়। তপস্যার একটা তেজ আছে। শম-দম-সাধনের তেজস্ক্রিয়তা এমনভাবেই কাজ করতে থাকে যাতে অন্য পক্ষ—যিনি তাঁর উপদেশ শোনেন, তাঁর মধ্যেও সেই তেজ কাজ করতে থাকে। ব্যাসকথিত সত্য এবং ধর্মের তত্ত্ব যুধিষ্ঠিরকে এমনই এক অন্তরশক্তি দিয়েছিল, যাতে যুদ্ধের উদ্যোগপর্বে আমরা তাঁকে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী দেখতে পাই। পাণ্ডবদের বনবাস, অজ্ঞাতবাস শেষ হয়ে যাবার পর যুদ্ধের প্রসঙ্গ বার বার উঠে আসছে এখন। ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে শান্তির জন্য পাঠালেও যুধিষ্ঠির কিন্তু এখন তাঁর প্রাপ্যটুকু সজোরে উচ্চারণ করছেন এবং তাঁর প্রাপ্য না পেলে ক্ষত্রিয়ের ধর্মানুসারে যুদ্ধ যে হবেই—সেটাও স্পষ্টই উচ্চারণ করছেন। সঞ্জয়ের সন্ধিপ্রস্তাবের পিছনে ধৃতরাষ্ট্রের যে কূট প্রস্তাব আছে অর্থাৎ তিনি মুখে সন্ধির কথা বললেও রাজ্য ফিরিয়ে দেবার ব্যাপারে যে তিনি নিস্তব্ধ থাকবেন—এটা যুধিষ্ঠির বুঝে গেছেন এবং তা ব্যক্ত করতেও ছাড়ছেন না। এতকাল সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকার ফলেই যে যুধিষ্ঠিরের মনে এই শক্তি এসেছে, হয়তো ব্যাস এটাকেই তপস্যা বলেছিলেন।

সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কথা বলে ফিরে আসলে ধৃতরাষ্ট্র বার বার তাঁকে পাণ্ডবপক্ষের বলাবল সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে লাগলেন। বোঝা যায়—তাঁর সন্ধির প্রস্তাবটি মেকি ছিল এবং সঞ্জয়কে যুধিষ্ঠিরের কাছে পাঠিয়ে তাঁর যুদ্ধশক্তিটুকুই জেনে নিতে চাইছিলেন তিনি। এ-প্রসঙ্গে অবশ্যই অর্জুনের অসম্ভব যুদ্ধক্ষমতা এবং পুরুষোত্তম কৃষ্ণের শক্তির কথাও এল। ধৃতরাষ্ট্র রাজসভায় বসে সঞ্জয়ের বক্তব্য শুনেছিলেন, কিন্তু দুর্যোধনের বিজয়লাভই যেহেতু তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ছিল, তাই সঞ্জয়কে তিনি নির্জনে ডেকে এনে একাকী অবস্থায় জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন পাণ্ডবদের শক্তি সম্বন্ধে। জিজ্ঞাসা করে বললেন—ঠিক করে বলো তো সঞ্জয়! ওদের যুদ্ধশক্তিই বেশি, নাকি তা আমাদের চাইতে কম—কিমেষাং জ্যায়ঃ কিন্নু তেষাং কনীয়ঃ? সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে চেনেন। তিনি জানেন—সভাস্থলে ধৃতরাষ্ট্র একরকম, নির্জনে তিনি আর একরকম। তিনি বললেন—না মহারাজ! নির্জন স্থানে আপনার সঙ্গে আমি কথা বলব না, তা হলে আমার ওপর অসূয়া সৃষ্টি হবে আপনার। ভাববেন—আমি বুঝি পাণ্ডবদের পক্ষ হয়ে কথা বলছি। তারচেয়ে আপনার সামনে ডাকুন আপনার মহাতপস্বী পিতাকে, ডাকুন মহিষী গান্ধারীকে—আনয়স্ব পিতরং মহাব্রতং/গান্ধারীঞ্চ মহিষমাজমীঢ়। এঁরা দুজনেই ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি, সমস্ত বিষয়েই তাঁরা নিপুণ। তাঁদের সামনেই আমি কৃষ্ণ এবং অর্জুনের বক্তব্য নিবেদন করতে পারি, নইলে নয়।

অগত্যা ধৃতরাষ্ট্রের কথায় বিদুর গিয়ে কোথা থেকে ধরে নিয়ে আসলেন ব্যাসকে। যুদ্ধের প্রস্তুতি যখন দুপক্ষেই চলছে, তখন আর তিনি তপস্যায় রত থাকতে পারেননি। চলে এসেছেন হস্তিনাপুরে। কিন্তু তিনি তো নিজে থেকে কিছু বলবেন না। তাঁকে ডেকে আনলেন বিদুর। গান্ধারীও এলেন সঞ্জয়ের আগ্রহাতিশয্যে। ব্যাস এসেই সঞ্জয়কে বললেন—তুমি সব বলো ধৃতরাষ্ট্রকে। যা তিনি শুনতে চান, কৃষ্ণ, অর্জুন যা যা তোমাকে বলেছে, সব বলো—আচক্ষ্ব সর্বং যাবদেষো'নুযুঙ্‌ক্তে। সঞ্জয় বলে চললেন কৃষ্ণ এবং অর্জুনের শক্তিমত্তার কথা এবং বেশি করে জানালেন কৃষ্ণের অলৌকিক দিব্য প্রভাবের কথা।

সঞ্জয় ভেবেছিলেন—মহান পিতা এবং ধর্মজ্ঞা মহিষীর সামনে ধৃতরাষ্ট্রকে সব কথা জানালে তিনি হয়তো খানিকটা আত্মস্থ হবেন। কিন্তু কিসের কী! ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী দুর্যোধনকে শত বুঝিয়েও কিছু করতে পারলেন না। ব্যাস কৃষ্ণের অলৌকিক প্রভাব নিয়ে

অনেক বক্তৃতা দিলেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। আপাতত মনে হল যেন ধৃতরাষ্ট্রও প্রভাবিত হয়েছেন ব্যাসের কথায়। সমকালীন সময়ে পৃথিবীর নায়কের ভূমিকায় যিনি অবতীর্ণ হন সেই নায়ককে সকলে চিনতে পারেন না, কিন্তু বয়স কম হলেও অধিদৃষ্টিসম্পন্ন ঋষি তাঁকে ঠিক চিনতে পারেন। ধৃতরাষ্ট্রের কাছে সেই জন্যই কৃষ্ণের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। কিন্তু ব্যাস জানতেন যে, ধৃতরাষ্ট্রের এই আপাত চৈতন্যোদয় অথবা শ্মশান-বৈরাগ্য বড়ই সাময়িক। দুর্যোধনের ওপর তাঁর স্নেহান্ধতা এমনই দুর্দম যে সত্যকে তিনি মেনে নিতে পারবেন না। অন্যদিকে আত্মজ পুত্রের এই অন্যায় অন্ধতা ব্যাস মেনে নিতে পারেননি বলেই উপমার অঙ্গুলি-আস্ফালনে পুত্রকে সচেতন করে দিয়ে তিনি বলেছেন—একজন অন্ধ ব্যক্তি যদি আর-এক অন্ধকে পথ দেখায়—অন্ধনেত্রা যথৈবান্ধৈঃ নীয়মানাঃ স্বকর্মভিঃ—তা হলে যে অবস্থা হয়, তোমার অবস্থাও হয়েছে সেইরকম। অর্থাৎ লোভে-ক্রোধে অন্ধ দুর্যোধন স্নেহান্ধ পিতাকে যেভাবে নিজের অনুকূলে ব্যবহার করছেন, ধৃতরাষ্ট্রের তা বোঝবারও শক্তি নেই। ব্যাস বললেন—কৃষ্ণ মানুষটা তোমার অপরিচিত কোনও ব্যক্তি নয়। সে তোমাকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। তার ওপরে সঞ্জয়ের মতো একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি তোমার দৌত্যকার্য করছে, সেও কৃষ্ণকে জানে ভাল। কাজেই তোমার সামনে একটাই পথ—এষ একায়নঃ পন্থাঃ—কৃষ্ণের কথা শুনলেই এই বিশাল মৃত্যু তুমি অতিক্রম করতে পারবে।

ধৃতরাষ্ট্র সব বুঝেও দুর্যোধনের বুদ্ধিতে কিছুই শোনেননি। শান্তির কার্যে প্রেরিত কৃষ্ণের আপ্যায়নের জন্য নগর থেকে নগরনটী সবাইকে সাজিয়ে সম্পূর্ণ কপটতায় তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন কৃষ্ণের জন্য। বিদুর সব বুঝেছিলেন। বুঝেই বলেছিলেন—আপনি যে এত সব ব্যবস্থা করেছেন, এর সবটাই ছল, মায়া। ধর্মের জন্যও নয়, কৃষ্ণের ভাল লাগার জন্যও নয়, যা আপনি করেছেন, সবটাই প্রলোভনের পদ্ধতি। এই প্রলোভনে কৃষ্ণ ভুলবেন না। দুর্যোধন-ধৃতরাষ্ট্রের এই মানস-চক্রান্ত ব্যাসও বুঝেছিলেন। সেই জন্যই আর তিনি অপেক্ষা করেননি হস্তিনাপুরে। এক অন্ধকে তিনি চলতে দিয়েছেন আর এক অন্ধের সঙ্গে। তিনি জানেন—ধৃতরাষ্ট্র সেই জাতের মানুষ, যিনি দেখে কিংবা শুনে শিখবেন না, ঠেকে শিখবেন।

কোনও ভাবেই যুদ্ধ রোধ করা গেল না। কৃষ্ণের দৌত্য বিফল হল। কুরুমুখ্যদের কোনও উপদেশই দুর্যোধন শুনলেন না। যুযুধান দুই পক্ষই শেষ পর্যন্ত কুরুক্ষেত্রের রণভূমিতে পরস্পরের মুখোমুখি হলেন। আসন্ন যুদ্ধের খবর ব্যাসের কানে গেছে। তিনি অবিলম্বে কুরুক্ষেত্রে পৌঁছে দেখলেন—পুব দিক জুড়ে কৌরব সৈন্য-সেনাপতিরা দাঁড়িয়ে আছেন, আর পাণ্ডবরা সসৈন্যে অবস্থিত আছেন পশ্চিম দিক জুড়ে। ব্যাস সব দেখলেন অনেকক্ষণ সময় নিয়ে—ততঃ পূর্বাপরে সৈন্যে সমীক্ষ্য ভগবান্ ঋষিঃ। আসন্ন এই যুদ্ধের ফল চোখের সামনে যেন তিনি দেখতে পেলেন। যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে তিনি উপস্থিত হলেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। এতদিন পুত্রের স্বার্থ অনুসারে পথ চলতে চলতে সামনে এই ভয়ংকর যুদ্ধ উপস্থিত হতে দেখে এখন কিন্তু তিনি উদ্‌বিগ্ন। ছেলেদের এতকালের অন্যায় এবং দুর্নীতির কথা স্মরণ করে তাঁর এখন ভয় করছে।

আর্ত, চিন্তিত ধৃতরাষ্ট্রের কাছে উপস্থিত হয়ে ব্যাস বললেন—মহারাজ! তোমার ছেলেদের এখন শেষ সময় উপস্থিত। অন্যান্য রাজারাও এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে পরস্পর হানাহানি করে মরবে। এমন যদি দেখ—মহাকালের বিপরীত আচরণে তোমার ছেলেদের অন্তিম কাল ঘনিয়ে এল, তা হলে যেন তুমি কষ্ট পেয়ো না। তুমি ভেবো—মহাকালের গতিতেই এই দুর্গতি ঘটেছে—কালপর্যায়মাজ্ঞায় মাস্ম শোকে মনঃ কৃথাঃ। তুমি যদি চাও, তা হলে এই সম্পূর্ণ যুদ্ধরঙ্গ দেখবার জন্য আমি তোমাকে চক্ষুদান করতে পারি—চক্ষুর্দদানি তে পুত্র যুদ্ধমেতন্নিশাময়। বড় সাংঘাতিক এই প্রস্তাব। আজন্ম যিনি অন্ধ, যিনি অন্ধতার জন্য রাজত্ব পেলেন না, অন্ধতার জন্য যিনি চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির প্রাপ্য সমস্ত সুখ থেকে বঞ্চিত, সেই

ধৃতরাষ্ট্রকে এতকাল কেউ চক্ষুদান করেনি, আজ অথচ সেই প্রিয় পুত্রদের নিশ্চিত মৃত্যু দেখবার জন্য দৃষ্টি দিতে চাইছেন ব্যাস। এ কেমন সাংঘাতিক প্রস্তাব!

ব্যাসের শাস্তি বোধ হয় এইরকমই। ব্যাস জানেন—অন্ধত্বের জন্য ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য পাননি বটে, কিন্তু হস্তিনাপুরের রাজা হয়ে আছেন তিনিই। সেই পাণ্ডবদের বনপ্রস্থানের আগে থেকে এখনও পর্যন্ত রাজ্যের অধিকার ভোগ করছেন তিনিই। কিন্তু অন্ধ অবস্থাতেও যাঁর রাজ্যলোভ এমন, তিনি চক্ষুষ্মান অবস্থায় রাজা হলে তো সম্পূর্ণ স্বৈরাচারী হতেন। তা ছাড়া ব্যাস নিজ পুত্রের প্রারব্ধ কর্ম লঙঘন করার জন্য নিজের অলৌকিক বিভূতি প্রয়োগ করবেন না। চক্ষুদানের প্রস্তাব তিনি সেই সংকটকালে করেছেন, যখন প্রতি মুহূর্তে ধৃতরাষ্ট্রের 'টেনশন' থাকবে—আমার ছেলেরা যুদ্ধ জিতল কি? ব্যাস তাঁকে এই উদ্‌বেগ থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। তার চেয়েও বড় কথা বোধহয় এটাই যে, যিনি কারও কোনও বৃদ্ধমত না শুনে অন্ধের মতো নিজেকে এবং সম্পূর্ণ বংশটাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেলেন, তাঁর বোধ হয় স্বচক্ষে দেখা দরকার ধ্বংস দেখতে কেমন লাগে। কেননা এই ধ্বংস স্বচক্ষে দেখবেন ভীষ্ম, এই ধ্বংস দেখবেন বিদুর, এই ধ্বংস দেখবেন দ্রোণ, কৃপ—যাঁরা সকলে মিলে এই প্রসিদ্ধ ভরতবংশকে লালন করেছেন। আর এই ধ্বংস দেখবেন স্বয়ং ব্যাস যিনি এই বংশের জন্মদাতা পিতা। ধ্বংস দেখতে কেমন লাগে—তাই বুঝি ব্যাস চক্ষু দিতে চাইছিলেন ধৃতরাষ্ট্রকে।

ধৃতরাষ্ট্র রাজি হননি। তিনি বেশ বুঝেছেন—এই অপমৃত্যু তাঁর পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। বরঞ্চ তিনি শুনবেন। ব্যাস সেই বরই দিয়েছেন। বলেছেন—এই সঞ্জয় তোমাকে সমস্ত যুদ্ধের বিবরণ জানাবে। যুদ্ধের সমস্ত বিষয় তাঁর প্রত্যক্ষ হবে। যুদ্ধক্ষেত্রে যা সামনে ঘটছে এবং যুদ্ধ পরিকল্পনাদির বিষয়, যা পিছনে ঘটছে, রাতে, দিনে, এমনকী যোদ্ধারা যা মনে মনে ভাবছে, তা সব জানতে পারবে এই সঞ্জয়। কোনও অস্ত্র এঁকে আঘাত করবে না, কোনও শ্রম এঁকে ক্লান্ত করবে না। যুদ্ধের সমস্ত বিপন্নতা থেকে মুক্ত থাকবে সঞ্জয়। সে সব তোমাকে বলবে—কথয়িষ্যতি তে যুদ্ধং সর্বজ্ঞশ্চ ভবিষ্যতি।

আজকের দিনে বসে ভাবি—কী অসাধারণ আধুনিক ছিল এই সাংবাদিকতার প্রত্যয়। অনেকেই ব্যাসের কথামতো ভাবেন—ব্যাসের দেওয়া দিব্যদৃষ্টি লাভ করে সঞ্জয় যুদ্ধের ধারাবিবরণী দিয়েছেন ধৃতরাষ্ট্রকে। অনেকের মনে এই প্রশ্ন আছে যে, ধৃতরাষ্ট্র কি তখন হস্তিনায় বসেছিলেন আর সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্রে না গিয়ে শুধু দিব্যদৃষ্টির ক্ষমতায় ধৃতরাষ্ট্রের কাছে ধারাবিবরণী দিয়ে গেছেন? লৌকিক দৃষ্টিতে যদি দেখেন, তবে একটা কথা বোঝা দরকার, দিব্যদৃষ্টি এমনই এক সূক্ষ্ম অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, যা সকলের থাকে না। যাঁর মধ্যে সেই অন্তর্ভেদের বীজ আছে, তাঁকেই উপযুক্ত উপদেশ দিয়ে বিশাল কর্মের জন্য প্রস্তুত করা যায়। সঞ্জয় যেমন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, তেমনই এই কুরুরাজ পরিবারের সঙ্গে তিনি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাঁর মধ্যে পক্ষপাতশূন্য নীতিদৃষ্টিও সর্বাংশে বর্তমান। অতএব ব্যাসের দেওয়া দিব্যদৃষ্টি লাভে তাঁর আন্তরশক্তি আরও সমৃদ্ধ হয়েছে মাত্র, আর কিছু নয়।

ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীরা সকলে হস্তিনাপুরীতেই ছিলেন। তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে যাননি, কিংবা ক্যাম্প করেও সেখানে থাকেননি। কিন্তু সঞ্জয় অবশ্যই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধভূমিতে উপস্থিত ছিলেন এবং এক-একটা দুর্ঘটনা বা বড় ঘটনা ঘটার পর তিনি হস্তিনায় এসে ধৃতরাষ্ট্রকে জানিয়ে গেছেন, যখন যেমন ঘটেছে, তখন তেমন। যেমন রণভূমিতে ভীষ্মের পতন ঘটলে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এসে প্রথমে ধৃতরাষ্ট্রকে সেই দিনের খবরটি দিয়েছেন—ভীষ্ম মারা গেছেন। তারপর ধৃতরাষ্ট্রের 'কোয়ারি' বুঝে দশ দিনের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে হস্তিনায় এসেছিলেন—অথ গাবল্গনির্বিদ্বান্ সংযুগাদেষ্য ভারত'। ব্যাস যে বলেছিলেন—সঞ্জয়ের গায়ে অস্ত্রাঘাত লাগবে না, যুদ্ধক্ষেত্রে সে যেখানে ইচ্ছে যেতে পারবে

—এ হল সেই আমলের সাংবাদিকের স্বাধীনতা। তখন যুদ্ধের মধ্যেও একটা নীতি ছিল। যেখানে কুরুপিতামহ ব্যাস এই নির্দেশ দিয়েছেন, সেখানে সমস্ত যোদ্ধা এই নির্দেশ মেনে নিয়েছেন। যুদ্ধের শেষ পর্বে দেখা যাচ্ছে—সঞ্জয় অর্জুনশিষ্য সাত্যকির হাতে ধরা পড়েছেন এবং সাত্যকি তাঁকে মেরে ফেলবার কথাও ভাবছেন। ঘটনা হল—যুদ্ধের শেষ পর্বে দুর্যোধন তখন যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাচ্ছেন। সাত্যকি দুর্যোধনের গন্তব্যস্থল জানার জন্য তাঁর পিছন পিছন গেছেন, তেমনই প্রত্যক্ষ সংবাদের প্রয়োজনে সঞ্জয়ও সেখানে গেছেন। কিন্তু সাত্যকি কিছু উগ্র স্বভাবের মানুষ। সঞ্জয়ের ওপরে তাঁর সন্দেহ জাগ্রত হয়। বিশেষত সঞ্জয়কে তিনি নিরন্তর ধৃতরাষ্ট্রের দৌত্য-কর্ম করতে দেখেছেন এবং নিরন্তর তিনি ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে আছেন বলেই সাত্যকির উগ্রস্বভাব উদ্বেলিত হয়েছিল। কিন্তু সাত্যকি তাঁর ইচ্ছা চরিতার্থ করতে পারেননি। মুহূর্তের মধ্যে আমরা সেখানে মহর্ষি ব্যাসকে উপস্থিত হতে দেখছি। তিনি হাত তুলে সাত্যকিকে কড়া নির্দেশ দিলেন—ছেড়ে দাও সঞ্জয়কে, একে মারবার চেষ্টা কোরো না—মুচ্যতাং সঞ্জয়ো জীবন্ন হন্তব্যঃ কথঞ্চন। ব্যাসের কথা শুনে সাত্যকি হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে ছেড়ে দিয়েছেন সঞ্জয়কে এবং বলেছেন—আমার ভুল হয়েছে, সঞ্জয়! তোমার কাজ তুমি করো—স্বস্তি সঞ্জয় সাধয়।

এই ঘটনার মাধ্যমে যে দুটি কথা আমি বলতে চাই, সেটা হল ব্যাসই বোধ হয় প্রথম ব্যক্তি যিনি এই নির্ভীক এবং প্রত্যক্ষগুণসমৃদ্ধ সাংবাদিকতার সৃষ্টি করেন। শুধু তাই নয়, ব্যাস নিজেও এই সম্পূর্ণ যুদ্ধভূমির মধ্যে ঘুরে ঘুরে দেখেছিলেন সব, নইলে সঞ্জয় এবং সাত্যকির সঙ্গে তাঁর দেখা হল কী করে? যিনি ভবিষ্যতে মহাকাব্যের কবি হবেন, তিনি যে শুধু আপন কল্পনার মিশ্রণ ঘটিয়ে কল্পকাহিনী লেখেননি শুধু, এই ঘটনা তা প্রমাণ করে। বস্তুত তিনিও যে ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখবেন এই প্রতিজ্ঞা তাঁর প্রথম থেকেই ছিল। ধৃতরাষ্ট্রের কাছে সমস্ত প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দেবার জন্য সঞ্জয়কে যেমন নির্দেশ দিলেন ব্যাস, তেমনই একই সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে তিনি নিজেও বললেন—আমিও কৌরব এবং পাণ্ডব—সকলের কীর্তিকাহিনী জগতের মানুষের কাছে বলব, তুমি দুঃখ কোরো না, রাজা—অহন্তু কীর্তিমেতেষাং কুরূণাং ভরতর্ষভ। পাণ্ডবানাঞ্চ সর্বেষাং প্রথয়িষ্যামি মা শুচঃ।

অর্থাৎ ভবিষ্যতে যে তিনি মহাভারতের এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করবেন সে প্রতিজ্ঞাটি এখানেই আছে। যুদ্ধের এই আরম্ভ-মুহূর্তে ব্যাস একেবারে কবিজনোচিতভাবে নির্বিকার। আত্মজ ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি বার বার বলছেন—তুমি শোক ত্যাগ করো। এ তোমার কপাল, এর জন্য কষ্ট পেয়ে লাভ নেই, কেননা এই যুদ্ধ রোধ করা যাবে না, তবে হ্যাঁ, জয় তো হবে সেই পক্ষে, যেখানে ধর্ম আছে—ন চৈব শক্যং সংযন্তুং যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।

এই এক অদ্ভুত কশাঘাত! ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুত করে দিচ্ছেন, যাতে একবারও তিনি না ভাবেন যে, এই যুদ্ধে জয় হবে তাঁর। কেননা তিনি ধর্মের পথে থাকেননি, নীতির পথে থাকেননি। এই অন্তিম যুদ্ধারম্ভের মুহূর্তেও—যখন দুই পক্ষের সৈন্যরা যুদ্ধভূমিতে পরস্পরের সম্মুখীন—তখনও ব্যাস চাইছেন এই যুদ্ধ বন্ধ করতে। ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি বলেছেন—একমাত্র তুমিই পারো—কৌরব-পাণ্ডব সকলকে ধর্মের পথ দেখাতে—ধর্ম্ম্যং দর্শয় পন্থানং সমর্থো হ্যসি বারণে। কুলক্ষয়ের সমস্ত দায় ধৃতরাষ্ট্রের ওপর চাপিয়ে দিয়ে ব্যাস বলেছেন—জ্ঞাতিবধ ব্যাপারটাকে খুব ক্ষুদ্র চরিত্রের লক্ষণ বলে মনে করেন পণ্ডিতেরা। আমি বার বার বলছি—আমার অত্যন্ত অপছন্দের এই কাজ তুমি কোরো না—ক্ষুদ্রং জ্ঞাতিবধং প্রাহুর্মা কুরুষ্ব মমাপ্রিয়ম্।

যে ভাবে, যে প্রক্রিয়ায় এবং যে স্বার্থভাবনায় দুর্যোধন যুদ্ধের দিকে এগিয়েছেন, সে ব্যাপারে ধৃতরাষ্ট্র মাঝে মাঝে সচেতন হলেও পুত্রের স্বার্থকে তিনি সব সময় ভ্রাতুষ্পুত্রদের ন্যায্য প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মনে করেছেন। মূল এই স্বার্থচেতনারই একটা পরিণতি

ঘটেছে একটু একটু করে এবং তা এখন যুদ্ধে পরিণত। ব্যাস বলেছেন—কাল। ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছেন—লোকক্ষয়ের প্রতীক যে কাল, সেই কালই তোমার ছেলে হয়ে জন্মেছে। আর অনর্থই তোমার রাজ্যের রূপ ধারণ করেছে। তুমি কালের প্রভাবেই বিপদের মতো সম্পদেও বিপথেই চলেছ। ফলটা এই হয়েছে—তোমার ধর্ম, ধর্মবোধ একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে। রাজ্য দিয়ে তুমি কী করবে? রাজ্য শুধু তোমার পাপ বাড়াবে, পাপ—কিংতে রাজ্যেন দুর্ধর্ষ যেন প্রাপ্তো'ষি কিল্বিষম্। এখনও তোমার সময় আছে, এখনও তুমি তোমার ধর্ম, যশ, কীর্তি রক্ষা করে স্বর্গলাভ করতে পার। কিন্তু তার জন্য পাণ্ডবদের ফিরিয়ে দিতে হবে তাঁদের রাজ্য এবং যুদ্ধের পথ ত্যাগ করে শান্ত হতে হবে কৌরবদেরও—লভন্তাং পান্ডবা রাজ্যং শমং গচ্ছন্তু কৌরবাঃ।

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র একটু ক্রুদ্ধই হলেন। সম্পূর্ণ উপেক্ষার সুরে তিনি ব্যাসকে বললেন—পিতা! মঙ্গল-অমঙ্গল এবং মন্দ-ভালর যে সমস্ত বিষয় আছে, সেসব আপনি যেমন জানেন, তেমনই আমিও জানি—যথা ভবান্ বেত্তি তথৈব বেত্তা—কিন্তু আমি কী করব? স্বার্থ গুছোবার জন্য সমস্ত মানুষের মোহ আছে, আমিও তো এই স্বার্থময় মনুষ্যলোকের বাইরে নই। মানুষ তো আমিও, তাই স্বার্থের মোহ আমাদের গ্রস্ত করে—স্বার্থে হি সংমুহ্যতে তাত লোকো/মাঞ্চাপি লোকাত্মকমেব বিদ্ধি। তা ছাড়া আমি কী করব? আমার ছেলেরা আমার সব কথা শোনে না। তার চেয়ে আপনি—আপনি তো কুরু-পাণ্ডব সকলের ঠাকুরদাদা, আপনি পথ দেখান সকলকে—ত্বং নো গতির্দর্শয়িতা চ ধীর।

এই কথার উত্তরে কী বলবেন ব্যাস? যিনি নিজের আত্মজ পুত্রকেই পথ দেখাতে পারলেন না, তিনি দুর্যোধনকে পথ দেখাবেন কী করে। ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে আর তিরস্কার করলেন না, বরঞ্চ ছেলের এই অবোধ করুণ অবস্থায় তাঁর যেন একটু মায়াই হল। অবোধ ধৃতরাষ্ট্র কিন্তু এখনও জয়ের আশা করেন এবং ব্যাসকে তিনি জিজ্ঞাসা করছেন—কী কী লক্ষণ দেখা গেলে বুঝতে হবে যে, যুদ্ধোদ্যোগীর জয় হবে। ব্যাস পরম ধৈর্য সহকারে যুদ্ধোদ্যোগীর জয়ের রহস্য শোনালেন। কাক-পক্ষীর ডাক থেকে আরম্ভ করে সৈন্যসামন্তের গতিপ্রকৃতি, তাদের সংঘবদ্ধতা এবং নেতৃত্ব সম্বন্ধে নানা কথা বললেন ব্যাস, যাতে ধৃতরাষ্ট্রও বুঝি বুঝতে পারলেন—কোন পক্ষের জয় হবে।

ব্যাসের এই সমস্ত বক্তব্যটার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা ছিল, তার মাধ্যমেও কিন্তু ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে বলতে চেয়েছেন যে, যুদ্ধ জিনিসটা বুদ্ধিমান রাজার রাজধর্ম নয়। রাজার পক্ষে সবচেয়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মেলে 'ডিপ্লোমেসি' বা কূটনীতির মধ্যে। অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে নিজের অনুকূলে আনা বা তাকে চাপের মধ্যে রাখার সবচেয়ে 'এফিশিয়েন্ট এক্সপিডিয়েন্ট' হিসেবে যুদ্ধকে মমাটেই পছন্দ করেন না ব্যাস, তাঁর মতে—বুদ্ধিমান এবং সদা-সতর্ক রাজা সব সময় নানাবিধ কূটনৈতিক উপায় প্রয়োগ করে প্রতিপক্ষকে জয় করবার চেষ্টা করবেন। ব্যাস মনে করেন—রাজা যদি সবার ওপরে নিজের কূটনৈতিক আধিপত্য স্থাপন করতে পারেন, তবে সেই জয়টাই শ্রেষ্ঠ জয়—উপায়বিজয়ং শ্রেষ্ঠম্—আর যুদ্ধের মাধ্যমে যে জয় আসে, সেটার মতো নিকৃষ্ট জয় আর কিছু নেই—জঘন্য এষ বিজয়ো যো যুদ্ধেন বিশাম্পতে। কেননা যুদ্ধে যে জয়লাভ ঘটে তাতে বিজেতার সৈন্যক্ষয়, রক্তক্ষয়ও কিছু কম হয় না। আর যুদ্ধক্ষেত্রে জয়ের ব্যাপারটাই অনিশ্চিত, দৈবাধীন। অনেক সৈন্য-সেনাপতি থাকলেই যে জয় হবে, তারও কোনও মানে নেই। কেননা অন্যান্য যুদ্ধে যাঁরা জয়লাভ করেছেন, তাঁরাও আবার কোনও যুদ্ধে পরাজিত হন—পরাজয় যদি নাও হয়, তবু ক্ষয় তো হয় প্রচুর—জয়বন্তো হি সংগ্রামে ক্ষয়বন্তো ভবন্ত্যুত।

ব্যাস যে কেন ঋষির সঙ্গে কবিও, তা এইসব জায়গা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যুদ্ধশৌণ্ড ব্যক্তি যুদ্ধে জয়লাভ করলেই ভাবে তার একমাত্র লাভ—সে যুদ্ধ জয় করেছে। কিন্তু বিশাল

এক যুদ্ধবিজয়ের মধ্যেও যে এক ধরনের পরাজয় লুকিয়ে থাকে, সেকথা যুদ্ধশৌণ্ড বোঝে না। একটা যুদ্ধের পর বিজয়ীর পক্ষেও রক্তক্ষয় হয়, রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থাও সংকটজনক হয়ে পড়ে। ব্যাস ঠিক এই দৃষ্টি থেকেই বলেছেন—জয়ের সঙ্গেও ক্ষয় আছে—জয়বন্তো হি সংগ্রামে ক্ষয়বন্তো ভবন্ত্যুত। কিন্তু মুশকিল হল—যুদ্ধশৌণ্ড ব্যক্তির 'ইগো' ব্যাপারটাই এমন যে, ক্ষয়ের কথা সে বুঝতে পারলেও ভাবতে চায় না। ধৃতরাষ্ট্রও ভাবতে চাননি। আসন্ন যুদ্ধের রাশ তিনি টেনে ধরেননি। কারণ তাঁর স্বার্থ—ধৃতরাষ্ট্র নিজেই ব্যাসের কাছে স্বীকার করেছেন—অন্য সাধারণ মানুষ যেমন স্বার্থে মুগ্ধ হয়, আমিও তেমনই স্বার্থের কারণেই মোহগ্রস্ত—স্বার্থে হি সংমুহ্যতে তাত লোকঃ। অগত্যা কী করবেন ব্যাস। চলে গেছেন। যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে নিজস্ব গতিতে।

সম্পূর্ণ যুদ্ধকাল জুড়ে ব্যাস কিন্তু খুব দূরে যাননি। ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি বলেছিলেন—কৌরবদের, পাণ্ডবদের যশ, কীর্তি সব আমি জগৎকে জানাব। হয়তো কবিজনোচিত এই মহাকাব্যিক প্রতিজ্ঞা রাখার জন্যই যুদ্ধটাকেও তিনি প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন এবং দু-পক্ষের সংশয়-সংকটে তিনি বক্তব্যও পেশ করেছেন সর্বাঙ্গীণ মমতায়। তাঁর বাস্তববোধ এমনই অসাধারণ যে, যুদ্ধক্ষেত্রে কে কখন কোন মহাস্ত্র ব্যবহার করছে এবং তার কারণই বা কী—তাও তিনি খবর রাখেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অন্তত তিনবার তাঁকে যেভাবে দেখেছি, তাতেও বোঝা যায় যে, তিনি এতকাল বঞ্চিত বিড়ম্বিত পাণ্ডবদের জয় চেয়েছিলেন। পাণ্ডবপক্ষে অভিমন্যু যখন মারা গেছেন এবং অর্জুন, যুধিষ্ঠির—প্রত্যেকে যখন শোকে মুহ্যমান, সেদিন ব্যাস এসেছিলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। যুধিষ্ঠির জানিয়েছিলেন—কীরকম অন্যায় করে মারা হয়েছে অভিমন্যুকে।

আতপ্ত ব্যাস সেদিন মৃত্যুর রহস্য শুনিয়েছিলেন যুধিষ্ঠিরকে। ব্যাস বলেছিলেন—এমন অকালমৃত্যুর সংকটেও তোমার মতো মানুষের মোহগ্রস্ত হয়ে পড়াটা মানায় না—ব্যসনেষু ন মুহ্যন্তি ত্বাদৃশা ভরতর্ষভ। মৃত্যু তো এমনই এক অনতিক্রমণীয় বিধান, যা দেবতা, দানব, মানব, গন্ধর্ব—সকলের ক্ষেত্রে একরকম। ব্যাস সেদিন এমন ধৈর্য নিয়ে মৃত্যুর রহস্য শুনিয়েছিলেন যাতে মনে হবে মৃত্যু যেন চরম এক বৈজ্ঞানিক সত্য। সত্যিই তো, পৃথিবীতে যা কিছুই জন্মাচ্ছে তার যদি কোনও বিনাশ না ঘটত, সবই যদি থেকে যেত অটুট অব্যর্থ হয়ে, তবে এই পৃথিবীও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বাসযোগ্য হত না। যুধিষ্ঠির ব্যাসের কথা বুঝেছিলেন। ব্যাস বলেছিলেন—মৃত্যু দেখে ভেঙে পড়লে চলবে না, সামনে যা করণীয় আছে, তা করে যেতে হবে—তস্মাচ্ছোকং পরিত্যজ্য শ্রেয়সে প্রযতেদ্ বুধঃ।

ব্যাসের এই উপদেশের মধ্যে আমি বিরাট দার্শনিকতা কিছু দেখিনি, কেননা ভারতবর্ষের মানুষ ভগবদ্গীতা শ্রবণ করেছে, মৃত্যুর শোক অপনোদন করে কর্মক্ষেত্রে ফিরতে হবে—এই উপদেশ ভারতবর্ষের মানুষ জানে। কিন্তু ব্যাস বুঝি এর চেয়েও একটা দামি কথা বলেছিলেন যুধিষ্ঠিরকে। বলেছিলেন—শোক যদি করতেই হয়, তবে তাদের জন্যই শোক করতে হয়, যারা বেঁচে আছে। পৃথিবীতে এত দুর্গতি, এত রোগ-ভোগ, এত ব্যর্থতা! তাই ভাবতে যদি হয়, কষ্ট যদি পেতে হয় তো জীবিত মানুষের জন্যই শোক করা উচিত; মরে গেলে আর কী, তার তো সব শেষ হয়ে গেল—জীবন্ত এব নঃ শোচ্যা ন তু স্বর্গগতানঘ। একজন ঋষির মুখে এই বক্তব্যটুকু আমার কাছে যতখানি আবেগহীন ঋষির অনুশাসন, তার থেকে অনেক বেশি কবিজনোচিত জীবনের জয়গান। জীবনের যাত্রাপথে যত বাধা, যত বিপদ, আশা-আকাঙ্ক্ষার যত অন্যায় তাড়না, তার মধ্যে ন্যায় অনুসারে জীবনযুদ্ধ জয় করে নিজেকে যারা প্রতিষ্ঠা করতে পারে—চিন্তা করতে হয় তাদের জন্যই—জীবন্ত এব নঃ শোচ্যাঃ।

জীবিত জনের জন্য ভাবার মধ্যে একটা প্রখর বাস্তববোধও কাজ করে এবং এই বাস্তব-বোধটুকু ব্যাসের একটু বেশিই ছিল। লক্ষ করে দেখুন—অভিমন্যুর শোকে অধীর যুধিষ্ঠির ব্যাসের কাছে মৃত্যুর দার্শনিকতা শুনে খানিকটা শোকমুক্ত হয়েছেন এবং ভাবছেন—অভিমন্যুর পিতা অর্জুনকে তিনি কী বলবেন, তাঁকেও কি এখন তিনি ব্যাসোক্ত উপদেশ শোনাবেন—কিংস্বিদ্ বক্ষ্যে ধনঞ্জয়ম্। ব্যাস কিন্তু যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কথা বলেই চলে গেছেন, কেননা অর্জুনকে শোকমুক্ত করতে তিনি চানইনি। তিনি জানতেন—অভিমন্যুর মৃত্যুতে অর্জুন যতখানি শোকার্ত হবেন, তারচেয়ে অনেক বেশি ক্রুদ্ধ হবেন তিনি। জীবনের বাধা-বিপত্তি উত্তীর্ণ হতে গেলে এই ক্রোধই এখন তাঁকে চালনা করবে এবং পাণ্ডবপক্ষে এটির প্রয়োজন আছে।

ব্যাসের এই বাস্তববোধটুক আবারও বোঝা যাবে—যখন ভীমের পুত্র ঘটোৎকচ মারা গেলেন। ঘটোৎকচ মারা গেলে যুধিষ্ঠির যখন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে আছেন, তখন ঘটোৎকচের মৃত্যুর কারণ বুঝিয়ে কৃষ্ণ কতগুলি অদ্ভুত যুক্তি সাজিয়ে তোলেন—যে যুক্তি যুধিষ্ঠিরের কাছে একান্তই অগ্রাহ্য ছিল। কৃষ্ণ বলেছিলেন—ঘটোৎকচ বহু ব্রাহ্মণদের ওপর অত্যাচার করেছেন, তার জন্যই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। যুধিষ্ঠির রীতিমতো বিরক্ত হয়েছেন কৃষ্ণের যুক্তিতে, কেননা ঘটোৎকচ ঠিক এই প্রকৃতির ব্যক্তি নন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের মুখের ওপরেই বলেছেন—ধর্মের যে নিয়ম, যে পথে চললে কৃতকর্ম ধর্মসঙ্গত হয়, সে আমি যথেষ্টই জানি, কৃষ্ণ! কিন্তু ব্রাহ্মণহত্যার অন্যায় অভিসন্ধিটুকু কী করে ঘটোৎকচের ক্ষেত্রে ঘটছে, তোমার এই যুক্তি আমার বোধগম্য হয়নি, হবেও না—ব্রহ্মহত্যাফলং তস্য যৎ কৃতং নাববুধ্যতে।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে যে কথাটা বলতে পারেননি—তা হল—ঘটোৎকচ মারা যাওয়ায় অর্জুনের জীবন রক্ষা পেয়েছে। কবচ-কুণ্ডল দান করার বিনিময়ে কর্ণ ইন্দ্রের কাছ একাঘ্নী বাণ পেয়েছিলেন—যা পঞ্চপাণ্ডবদের একজনকে হত্যা করতই। কর্ণ সেই বাণ একান্তে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন অর্জুনকে বধ করার জন্য। কৃষ্ণ এটা জানতেন বলেই ঘটোৎকচকে এমনভাবেই যুদ্ধে প্রোৎসাহিত করেছিলেন, যাতে কর্ণ একাঘ্নী মুক্ত করতে বাধ্য হন ঘটোৎকচের ওপর। কিন্তু কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কাছে তেমন করে একথা বলতে পারেননি। কেননা পুত্রতুল্য ঘটোৎকচের মৃত্যুতে যুধিষ্ঠির এতটাই মর্মাহত ছিলেন যে, অর্জুনের প্রাণের জন্য ঘটোৎকচকে মরতে হবে—এই ভাবনা তাঁকে বোঝানো যেত না। যুধিষ্ঠির সমস্ত ঘটনা সোজাসুজি বোঝেন। কর্ণের ওপর তাঁর ক্ষোভ এতই উদ্বেলিত হল যে, তিনি একা রওনা হলেন কর্ণকে মারবার জন্য। বললেন—এই কর্ণই অভিমন্যু হত্যার মূলে এবং এই কর্ণই ঘটোৎকচকে মেরেছে, আমি তাকে ছাড়ব না। আমি নিজে যাব প্রতিশোধ নিতে—ততো যাস্যাম্যহং বীর স্বয়ং কর্ণজিঘাংসয়া।

যুধিষ্ঠিরের এমন রাগ আগে কেউ দেখেনি। যুধিষ্ঠির এগোতেই অনেক সৈন্য-সেনাপতিরা তাঁর পিছন পিছন চলল বটে, কিন্তু কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করাটা যে অত সহজ ব্যাপার নয়, সেটা বুঝেই কৃষ্ণ অর্জুনকে নিয়ে রওনা হলেন যুধিষ্ঠিরের সাহায্যে। বস্তুত যুদ্ধেরও তো একটা রীতিনীতি, পরিকল্পনা আছে। এখানেও হঠাৎ কিছু করতে গেলে উলটো ফল ফলতে পারে। ঠিক এই অদ্ভুত বাস্তবটুকুও কিন্তু ব্যাস জানেন এবং সেই কারণেই—তিনি যখন যুধিষ্ঠিরকে কর্ণবধের জন্য দৌড়োতে দেখলেন এবং তাঁর পিছন পিছন অন্যদেরও—তং দৃষ্ট্বা সহসা যান্তং সূতপুত্রজিঘাংসয়া—তখন তিনি তাড়াতাড়ি এসে যুধিষ্ঠিরের পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। বললেন—তুমি এ কী করতে চলেছ, যুধিষ্ঠির? তুমি কি জান আজ কী হতে পারত? তুমি ঘটোৎকচের জন্য শোক করছ, সে তো নিশ্চয়ই শোক পাবার মতোই ঘটনা। কিন্তু আজ যদি অর্জুন মারা যেত? অর্জুন যে আজকে ভাগ্যবশত বেঁচে আছে, সে শুধু এই ঘটোৎকচ মারা গেছে বলেই—কর্ণমাসাদ্য সংগ্রামে দিষ্ট্যা জীবতে ফাল্গুনঃ। যুধিষ্ঠিরের কাছে সোজাসুজি এই ঝটিকা-সত্যের প্রয়োজন ছিল। হয়তো মুহূর্তের মধ্যে তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল মৃত অর্জুনের দেহকল্প। ব্যাস বললেন—তুমি কি জান—শুধু অর্জুনকে বধ করার জন্যই কর্ণ ইন্দ্রের দেওয়া সেই শক্তি রেখে দিয়েছিল। যেকোনও দ্বৈরথ যুদ্ধ হলে কর্ণ যদি অর্জুনের সঙ্গে এঁটে না উঠত, তা হলেই এই শক্তি সে মোচন করত অর্জুনের ওপর—বাসবীং সমরে শক্তিং ধ্রুবং মুঞ্চেদ্ যুধিষ্ঠির। আর তা হলে কী হত বলো তো? আমি তো বলব—ঘটোৎকচ নিজের প্রাণ দিয়ে অর্জুনকে বাঁচিয়েছে। ইন্দ্রদত্ত শক্তিকে নিমিত্ত করে মহাকাল ঘটোৎকচের প্রাণ নিয়েছে বটে, তবে সে তোমাকেই বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে—তবৈব কারণাদ্ রক্ষো নিহতং তাত সংযুগে। তাই বলছিলাম এইভাবে ক্রুদ্ধ হয়েও লাভ নেই, শোক করেও লাভ নেই। তোমরা পাঁচ ভাই মিলে সমস্ত সৈন্য-সেনাপতিদের নিয়ে কৌরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। আমার বিশ্বাস আর কিছুদিনের মধ্যেই তোমাদের জয় নিশ্চিত। শুধু মনে রেখো ধর্মের অনুশাসনটুকু। কারও ওপরে পক্ষপাত

রেখো না। তপস্যা, দান, ক্ষমা, সত্য—এই হল ধর্মের মূল কথা! আর ধর্ম যেখানে জয়ও সেখানে।

এত দ্বিধাহীন, এত স্পষ্টভাবে ব্যাস সেদিন বুঝিয়েছিলেন যুধিষ্ঠিরকে, যাতে মনে হতেই পারে—যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্য পাণ্ডবদের ওপরে তাঁর পক্ষপাতই আছে যেন। আমরা বলব, মনে হওয়া নয়। আছেই। আছেই এই পক্ষপাত এবং এই পক্ষপাত তৈরি হয়েছে ওই একটা শব্দেরই কারণে—ধর্ম। ধর্ম যেখানে, সেখানে যেমন জয়, তেমনই ধর্ম যেখানে, সেখানে ব্যাসও। পাঠকরা বলবেন—আবার সেই শব্দটা! ধর্ম, ধর্ম আর ধর্ম! কান ঝালাপালা হয়ে গেল মহাভারতের ওই বহু-আবৃত্ত শব্দটা শুনে শুনে। আমরা বলি—উপায়? মহাভারতের এই ধর্ম তো শুধু ফুল-বেলপাতা-নৈবেদ্যর ধর্ম নয়। এ-তো জীবনের ধর্ম, যেখানে উত্থান-পতন, ছলনা, হতাশা, সম্পদ-গৌরব—সব কিছুর মধ্যে সত্য, দয়া, তিতিক্ষা, ত্যাগ—এইসব একান্ত মানবিক ধর্মগুলি অনুস্যূত। ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনেরা এতকাল যে ছলনা বঞ্চনা করেছেন পাণ্ডবদের সঙ্গে, তাতে ক্ষাত্রোচিত যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে অন্যায়কে সিংহাসন থেকে টেনে নামানোটাই ব্যাস ধর্ম বলে মনে করেন। ব্যাস সেই ধর্মের পিছনে আছেন বলেই প্রত্যক্ষ যুদ্ধ দেখতে দেখতে ফিরে আসছেন পাণ্ডবদের কাছে। হতাশ ক্লিষ্ট যুধিষ্ঠিরকে তিনি বার বার প্রোৎসাহিত করছেন নিজের ন্যায্য প্রাপ্য ধর্মযুদ্ধের মাধ্যমে ঋদ্ধি লাভ করার জন্য।

যুদ্ধ যখন প্রায় শেষ হয়ে আসছে, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য সব কৌরবসেনাপতি যখন ভূপতিত, তখন সেই ভয়ংকর কাণ্ডটা ঘটল। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা দ্রোণবধের প্রতিশোধ নেবার জন্য পাণ্ডবদের পাঁচটি ছেলেকেই ঘুমন্ত অবস্থায় মেরে ফেলেছেন। এই অবস্থায় অশ্বত্থামাকে মেরেই ফেলার আবেদন করেছিলেন পুত্রহারা দ্রৌপদী। ভীম দুর্দম শক্তি নিয়ে এগিয়েছিলেন অশ্বত্থামার দিকে। বিপদ বুঝে কৃষ্ণ এবং অর্জুন—দুজনেই ছুটলেন ভীমকে সাহায্য করতে। পাণ্ডবদের ওইভাবে ক্রুদ্ধ অবস্থায় নিজের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে অশ্বত্থামা পিতৃদত্ত ব্রহ্মশিরা অস্ত্র মোচন করলেন। ব্রহ্মশিরা এমনই এক অস্ত্র যার তেজে ধ্বংস হয়ে যায় সমস্ত জগৎ। অশ্বত্থামার এই জগদ্‌বিধ্বংসী চেষ্টা দেখে কৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুনও গুরু দ্রোণের দেওয়া ব্রহ্মশিরা মুক্ত করলেন। উদ্দেশ্য—অস্ত্রের দ্বারা প্রশমিত হোক অস্ত্র।

আসন্ন ধ্বংসের ভয়ে প্রমাদ গণল সকলে। মহর্ষি নারদ এবং পিতামহ ব্যাস দুই পক্ষের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। দুইজনেই অনুরোধ করলেন যাতে দুই বীরই তাঁদের অস্ত্র ফিরিয়ে নেন। অর্জুন মহর্ষিদের দর্শনমাত্রেই অস্ত্র সংহারে মন দিলেন। বললেন—আমার কোনও উপায় ছিল না। অশ্বত্থামার এই অস্ত্র আমাদের সবাইকে ধ্বংস করত। সেখানে অস্ত্র দিয়ে যাতে অস্ত্র প্রতিহত করা যায়, আমি সেই চেষ্টা করেছি। অর্জুন অস্ত্র সংযত করার সঙ্গে সঙ্গে অশ্বত্থামা দ্বৈপায়ন ব্যাসের উদ্দেশে বললেন—এই অস্ত্র ফেরানোর ক্ষমতা নেই আমার। আমি ভীমসেনের ভয়ে নিজের প্রাণরক্ষার জন্য এই অস্ত্র ত্যাগ করেছি এবং এ অস্ত্র অবশ্যই পাণ্ডবদের হত্যা করে ছাড়বে। আমি পাণ্ডবদের ওপরে ক্রোধবশতই এই পাপকর্ম করেছি। এখন আর কিছুই আমার হাতে নেই।

ব্যাস যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন—পার্থ অর্জুনও এই অস্ত্রের অভিসন্ধি জানে। সে কিন্তু কোনওভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে তোমাকে হত্যা করার জন্য এই অস্ত্র ত্যাগ করেনি। তোমার অস্ত্র প্রতিরোধের জন্যই তার এই অস্ত্রমোক্ষণ, এবং প্রয়োজন হতেই সে অস্ত্র প্রতিসংহারও করেছে। অথচ এই মানুষটাকে তুমি ভাইদের সঙ্গে একত্রে মেরে ফেলতে চাও? কেন এমন ব্যবহার তোমার? তুমি কি জান না—যেখানে ব্রহ্মশিরার মতো অস্ত্র ব্রহ্মশিরার দ্বারাই প্রতিহত হয়, সেখানে এই দুই অস্ত্রের সংহারশক্তিতে রাষ্ট্রের এমন অবস্থা হয় যে, বৃষ্টি পর্যন্ত বর্ষায় না বহুদিন। ঠিক সেই জন্যই অর্জুন তার অস্ত্র উপসংহৃত করেছে। আর তাতে

পাণ্ডবরাও বাঁচবে, তুমিও বাঁচবে, আর বাঁচবে এই রাষ্ট্র—পাণ্ডবাস্ত্বঞ্চ রাষ্ট্রঞ্চ সদা সংরক্ষম্যেব হি। অতএব তুমিও তোমার অস্ত্র সংবরণ করো।

পরকে বাঁচানোর জন্য নিজের আত্মত্যাগ তখনই সম্ভব যখন আর মানুষ নিজের কথা ভাবে না। কিন্তু ব্যাস এই তত্ত্ব জানেন যে, মানুষের আত্মরক্ষার 'ইন্‌স্টিঙ্‌ক্ট' এমনই যে মানুষ আগে নিজে বাঁচার চেষ্টা করে। ব্যাস বুঝেছেন অশ্বত্থামা বাঁচতে চাইছেন যে কোনও উপায়ে। তিনি তাই বলেছেন—তোমারও ক্রোধ শান্ত হোক, পাণ্ডবরাও বাঁচুক। আর তুমি তোমার সহজাত মস্তকমণিটি দিয়ে দাও পাণ্ডবদের এবং তার বদলে নিজের প্রাণ বাঁচাও। পাণ্ডবরা ঠিকই করেছিলেন—গুরুপুত্র বলেই অশ্বত্থামাকে মারা চলবে না, অতএব তাঁর চরম সম্মানের প্রতীক ওই মণিটি নিয়েই তাঁরা ছেড়ে দেবেন গুরুপুত্রকে। অশ্বত্থামা আত্মরক্ষার জন্যই মণি দিতে সম্মত হলেন কিন্তু এই মুহূর্তেও তিনি এতটাই ক্রূর যে, পাণ্ডবদের একমাত্র সন্তানবীজ, যা নাকি অভিমন্যুর পত্নী উত্তরার গর্ভে এখনও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সম্ভাবনা হয়ে বেঁচে রয়েছে, অশ্বত্থামা সেটিকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে চাইলেন—কেননা অস্ত্র সংবরণের ক্ষমতা অশ্বত্থামার নেই। ব্যাস বললেন—উপায় কী, তাই হোক, উত্তরার গর্ভস্থ শিশুকেই হত্যা করুক এই অস্ত্র, তুমি যেন আর অন্য বুদ্ধি করার চেষ্টা কোরো না—এবং কুরু ন চান্যা তু বুদ্ধিঃ কার্যা ত্বয়ানঘ।

ব্যাস অশ্বত্থামার এই শিশুঘাতক প্রস্তাবে অগত্যা রাজি হয়েছেন এই কারণেই যে, এটাও এক মনস্তত্ত্বের পরিসর। গর্ভবতী স্ত্রীকে যদি বিকল্প দিয়ে বলা যায়—তুমি তোমার এই জীবন্ত স্বামীটির মৃত্যু চাও, নাকি গর্ভস্থ ছয় মাসের অজাতকের মৃত্যু চাও, তবে হাজার স্নেহ থাকা সত্ত্বেও গর্ভবতী কিন্তু জীবন্ত লোকটিকে বাঁচাতে চাইবে। লৌকিক প্রতিক্রিয়াতেও দেখেছি—যে শিশু গর্ভস্থ অবস্থায় স্রস্ত হয়ে গেল, সেই শিশুর চেয়ে এক দিন, দুদিনের জাতকও মায়ের কাছে অন্য মূল্য পায়, ছয় মাস এক বছরের জাতক হলে তো কথাই নেই। ব্যাস চেয়েছেন—যারা বেঁচে আছে, তারা বেঁচে থাক। উত্তরার গর্ভস্থ শিশুর বিনিময়ে প্রাণ রক্ষা হোক আর সকলের। উত্তরার গর্ভস্থ শিশুকে মরতে হয়নি অবশ্য। স্বয়ং কৃষ্ণ তার ভার নিয়েছেন। যেভাবেই হোক তিনি তাকে বাঁচিয়েছেন। কিন্তু শিশুহত্যায় অভ্যস্ত অশ্বত্থামার এমন ব্যবস্থা করেছিলেন কৃষ্ণ, যাতে তাঁকে অত্যন্ত হীন জীবন কাটাতে হয় এবং তা প্রায় নির্বাসনে। ব্যাস কৃষ্ণের এই ব্যবস্থা সমর্থন করে অশ্বত্থামাকে বলেছেন—তুমি একজন ব্রাহ্মণ হয়েও যে অন্যায় ক্রূর কর্মটি আজ করেছ, তাতে এইরকমটাই অবস্থা হওয়া উচিত তোমার। ব্যাসের এই প্রতিবচন শোনার পর অশ্বত্থামা কিন্তু বলেছেন—আমি আপনার সঙ্গেই থাকব, মহর্ষি! এই পৃথিবীতে থাকতে হলে আপনার সঙ্গেই আমি বাস করব—সহৈব ভবতা ব্রহ্মণ্ স্থাস্যামি পুরুষেষ্বিহ।

কী আশ্চর্য, যে ব্যক্তি অশ্বত্থামার ওপর বিরক্ত হয়েছেন, অশ্বত্থামা তাঁরই আশ্রয় নিচ্ছেন। এই হল ধর্ম। প্রায় নির্বাসিত এক ঘৃণিত ব্যক্তিত্ব এই ধর্মের কাছে আশ্রয় খুঁজে পায়। ব্যাস অবশ্যই অশ্বত্থামাকে নিয়ে এখনই বনে যেতে পারেননি। এখন এখানে অনেক কাজ বাকি আছে তাঁর। আপাতত কৃষ্ণ এবং পাণ্ডব ভাইরা সকলে ব্যাসকে সবার সামনে রেখে দ্রৌপদীর কাছে গেলেন। পুত্রহন্তা অশ্বত্থামার শাস্তি হওয়ায়, দ্রৌপদী একটু যেন শান্ত হলেন এবং পাণ্ডবশিবিরে যুদ্ধোত্তর সুস্থিতি ফিরে আসতেই ব্যাস কিন্তু ছুটেছেন হস্তিনাপুরে। সেখানে তাঁর আত্মজ পুত্র ধৃতরাষ্ট্র শতপুত্রের বিয়োগব্যথায় কাতর হয়ে পড়ে আছেন। আছেন পুত্রহীনা গান্ধারী। তাঁদের সান্ত্বনা দিতে হবে। বোঝাতে হবে জীবনের রহস্য এবং অবশ্যই ধর্ম। হস্তিনাপুরে ব্যাসের এই পৌর্বাহ্নিক গমনের পরোক্ষ সুবিধে পেয়েছিলেন যুধিষ্ঠির, যিনি পুত্রহারা জননী গান্ধারীর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেও ভয় পাচ্ছিলেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলেছিলেন—তুমি আগে যাও গান্ধারীর কাছে, তাঁর ক্রোধ প্রশমন করো। দেখবে সেখানে আমাদের পিতামহ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসও আছেন—পিতামহশ্চ ভগবান্ কৃষ্ণস্তত্র

ভবিষ্যতি।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের শেষ নায়ক দুর্যোধনের পতনের পর পরই অশ্বত্থামার এই ক্রূরকাণ্ডটি ঘটে। যেভাবেই হোক পাণ্ডবপক্ষের ভয়ংকর বিপদ রোধ করেই ব্যাস হস্তিনাপুরে চলে যান ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। শত পুত্রের মৃত্যুতে মুহ্যমান ধৃতরাষ্ট্রকে বিদুর এবং সঞ্জয় যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিচ্ছেন। দ্বৈপায়ন ব্যাস দেখলেন—বিদুর-সঞ্জয়ের কথায় ধৃতরাষ্ট্র শান্ত হচ্ছেন না। বার বার তিনি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন এবং পরমুহূর্তেই বিলাপ আরম্ভ করছেন পুত্রের জন্য। ব্যাস এবারে বলতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু ব্যাসের কথার মধ্যে নির্দোষ সান্ত্বনাবাক্যই শুধু ছিল না। আত্মজ ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি ছেড়ে দেননি। ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসকে বলেছিলেন—পুত্রনাশ, অর্থনাশ এবং জ্ঞাতিনাশে যে বিপর্যয় আমার ঘটেছে, তাতে এখন মরে যাওয়া ছাড়া আমার আর কোনও শান্তি নেই—যস্যান্তং নাধিগচ্ছামি ঋতে প্রাণবিপর্যয়াৎ। পিতা! আমি মরতে চাই।

আজকে এমন বললে তো হবে না। নিজের হাতে সব ধ্বংস করে আজকে মরতে চাইলে তো হবে না। যা পূর্বে করা যায়, তার ফল ভোগ করে ঋণ শোধ করে যেতে হবে—এই তো নিয়ম। ব্যাস তো ছেড়ে দেবার লোক নন। এই শোকমুহূর্তেও তিনি ধর্মসঙ্গত এবং ন্যায়সঙ্গত কথা শোনাচ্ছেন ধৃতরাষ্ট্রকে। বললেন—তুমি তো নির্বুদ্ধি মানুষ নও, পুত্র! যা জানবার আছে এই পৃথিবীতে, তাও তুমি সব জান। কাজেই এই পৃথিবীতে সবই যখন নশ্বর এবং অধ্রুব, তখন এই অযথা শোক করছ কেন—জীবিতে মরণান্তে চ কস্মাচ্ছোচসি ভারত। এ-তো চিরাচরিত সান্ত্বনার কথা। কিন্তু এখানে ব্যাসের বক্তব্য তা নয়। তিনি বোঝাতে চাইলেন—এখন যা ঘটেছে, তার বীজ ধৃতরাষ্ট্রই পুঁতে রেখেছেন বহুকাল আগে। ব্যাস বলেছেন—তোমার চোখের সামনেই এই ভয়ংকর শত্রুতার উদ্ভব ঘটেছে—প্রত্যক্ষং তব রাজেন্দ্র বৈরস্যাস্য সমুদ্ভবঃ। দুর্যোধনকে কারণ সাজিয়ে মহাকাল তার খেলা খেলেছে। কুরুদের যে এই পরিণতি হবে, সে তোমার জানাই ছিল। কাজেই এখন শোক করে লাভ কী?

ব্যাস বিদুরের প্রসঙ্গ টেনে বললেন—যদি এমন ভাব কর যে, না, এই পরিণতির কথা তোমার জানা ছিল না, তা হলে বলব—বিদুর তো তোমাকে অনেক সাবধান করে সতর্কবাণী শুনিয়েছিলেন, সে চেষ্টাও করেছিল যাতে কৌরবরা শান্তির পথ বেছে নেয়—যতিতং সর্বযত্নেন শমং প্রতি জনেশ্বর। কিন্তু এমনই দুর্দৈব—কেউ সে কথা শোনেনি।

মানুষ যখন এইভাবে ঘটনার অনুবর্তী হয়, তখন তাকে রোধ করা যায় না। ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে খানিকটা ব্যঙ্গের সুরেই বলেছেন—যে দেশে যেমন রাজা, তার লোকজনও তেমন হয়—যাদৃশো জায়তে রাজা তাদৃশো'স্য জনো ভবেৎ।

ব্যাসের এই কথাটি গভীর রাষ্ট্রনীতির কথা। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে সপ্তাঙ্গ রাজ্যের সমস্ত অঙ্গগুলি অর্থাৎ অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, কোশ, দণ্ড, মিত্র—ইত্যাদির ব্যাখ্যা শেষ করে বলেছেন—রাজা যেমনটি হন, তার সমস্ত ছায়াটি পড়ে অন্যান্য রাজ্যাঙ্গের ওপর। ব্যাস কৌটিল্যের বহু আগেই এ কথা জানিয়ে বলছেন—কোনও রাজ্যের রাজা যদি ধার্মিক হন তবে অধর্মও ধর্মে পরিণত হতে পারে। কেননা রাজ্যাধিকারী স্বামীর সব দোষ-গুণ তাঁর ভৃত্যদের মধ্যেও অনুপ্রবিষ্ট হয়—স্বামিনো গুণদোষেণ ভৃত্যা স্যুর্নাত্র সংশয়ঃ। দুষ্ট রাজার আশ্রয় নিয়ে তোমার সব ছেলেরা আজ বিনাশ লাভ করেছে।

'দুষ্ট রাজা'—এই শব্দদুটি ধৃতরাষ্ট্রকেও বোঝাতে পারে, দুর্যোধনকেও বোঝাতে পারে। ব্যাস হয়তো ধৃতরাষ্ট্রকেই বুঝিয়েছেন—কেননা তিনি তাঁর আত্মজ পুত্র। পিতা পুত্রকেই শোধরানোর চেষ্টা করেন। নানা উপদেশ দিয়ে ব্যাস যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের প্রসঙ্গ ধরে বলেছেন—দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে এসে কৌরব-পাণ্ডবদের ভবিষ্যৎ কলহের বীজটি দেখতে পেয়ে অনেক কথা বলেছিলেন। তুমি কি জান ধৃতরাষ্ট্র! আমি সেই কলহের

কথা যুধিষ্ঠিরকে বলতে তিনি বড় ব্যথা পেয়েছিলেন মনে। ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির সেই দিন থেকে চেষ্টা করে গেছেন যাতে কৌরবদের সঙ্গে তাঁর কোনও ঝগড়া-বিবাদ না হয়। কিন্তু কী করা যাবে, দৈবই এ ব্যাপারে বলবান—যতিতং ধর্মপুত্রেণ ..... দৈবন্তু বলবত্তরম্। ব্যাস শেষ কথা বলে ধৃতরাষ্ট্রকে জানালেন—বিধির বিধান দুরতিক্রমনীয়। যা হবার তা হয়ে গেছে। তুমি বুদ্ধিমান মানুষ। জীবন অনিত্য জেনে তুমি এই শোকমোহ ত্যাগ করো। তুমি তোমার প্রজ্ঞার জলসেচন করে পুত্রশোকের জ্বলন্ত অগ্নি নিভানোর চেষ্টা করো। সবচেয়ে বড় কথা, তুমি যেভাবে শোকগ্রস্ত হয়েছ, তাতে তোমার এই কষ্টকর অবস্থা দেখলে যুধিষ্ঠির নিজেই প্রাণত্যাগ করবেন। তাই বলছি—আমার কথা তোমায় শুনতেই হবে। কেননা, আবারও বলছি—দৈব অপরিবর্তনীয়। তুমি শান্ত হও এবং পুত্রতুল্য পাণ্ডবদের প্রতি করুণা করে তুমি তোমার এই অদম্য শোক ত্যাগ করো—এখনও তো বাঁচতে হবে—পাণ্ডবানাঞ্চ কারুণ্যাৎ প্রাণান্ ধারয় ভারত।

ব্যাসের কথায় ধৃতরাষ্ট্র অনেকটাই শান্ত হয়েছেন। এই জায়গাটায় আমাদের একটু আশ্চর্য লাগে—এই পুত্রশোকের মুহূর্তে, যখন চরম বৈরাগ্য এসেছিল ধৃতরাষ্ট্রের মনে, ব্যাস তো তখন ধৃতরাষ্ট্রকে রাজ্য ছেড়ে বানপ্রস্থে যাবার উপদেশ দিতে পারতেন, যেমনটি তিনি করেছিলেন জননী সত্যবতীর বেলায়। কিন্তু ব্যাস তা করেননি। হয়তো করেননি ধৃতরাষ্ট্রের কারণেই। তিনি বুঝেছিলেন—ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে এক অদম্য ভোগবাসনা আছে। অন্ধত্বের কারণেই হোক অথবা অন্য কোনও জন্মান্তরীণ কারণে বিষয়ভোগ ধৃতরাষ্ট্রকে প্রলুব্ধ করত। এটা একটা কারণ তো বটেই। আর একটা কারণ—যেন ধৃতরাষ্ট্রকে জীবন দিয়ে বুঝতে হবে যে, তিনি যদি বহু আগে যুধিষ্ঠিরকে রাজা মনোনীত করতেন, তা হলেও তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছু কমত না এবং তাঁর বিষয়ভোগও অতৃপ্ত থাকত না, অথচ রাষ্ট্র চলত ধর্মের অনুশাসন মেনে। পরবর্তী কালে যুধিষ্ঠির একটি কর্মও ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি ছাড়া করেননি এবং ব্যাস এই দৃষ্টান্তটি বোঝাতে চেয়েছেন ধৃতরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ অনুভবের মাধ্যমে। ধৃতরাষ্ট্র কিন্তু পরবর্তী কালে পুত্রশোকে অধীর হয়ে বনগমন করেননি, বহু কাল তিনি যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে ছিলেন উপযুক্ত সুখভোগ লাভ করেই।

মানুষের অন্তরকে ব্যাস এতটা পড়তে পারেন বলেই তিনি এত বড় কবি। আত্মজ পুত্রের ভোগবাসনাকে ব্যাস ঋষিজনোচিত নির্বিণ্নতায় উড়িয়ে দেননি, বরঞ্চ এই বাসনার ধর্মসঙ্গত পূরণের জন্য তাঁর মানবিক বেদনা আছে। ঋষি ব্যাস জন্মলগ্নেই মায়ের স্নেহ ছেড়ে পিতার সঙ্গে চলে গিয়েছিলেন তপস্যায়, কিন্তু এই তপস্যা তাঁকে মানুষের মর্মবেদে সিদ্ধি দান করে মানুষকে দেখতে-চিনতে শিখিয়েছে। মানুষ ব্যাস সেই যে মায়ের টানে হস্তিনাপুরে মমতায় জড়িয়ে পড়লেন, সেই মমতার টান তিনি ঋষির বৈরাগ্য-ধিক্কারে এড়িয়ে যাননি। রাজা পাণ্ডু, অর্থাৎ তাঁর রাজা ছেলের মৃত্যু হলে অনাথ পাণ্ডুপুত্রদের ওপর তিনি অন্তরের টান অনুভব করেছেন এতটাই যে, সে টান অনেকটাই যুক্তিসিদ্ধ পক্ষপাতে পরিণত হয়েছে। আবার দেখুন, এই ধৃতরাষ্ট্র—তিনি অন্ধ বলেই হোক, অবুঝ বলেই হোক এবং অন্যায়ী বলেই হোক—চিরটা কাল ব্যাস তাঁর প্রতি এক উলটো টান অনুভব করেছেন। যতবার তিনি এই পুত্রের হৃদয়ের কাছাকাছি আসতে চেয়েছেন, ততবারই এই পুত্রের রাজ্যলোভ, মতিভ্রংশ তাঁর মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে ঋষি ব্যাসকে। তিনি শোধরাতে চেয়েছেন পুত্রকে। পারেননি। বার বার তিনি ছিটকে গেছেন, বার বার ধৃতরাষ্ট্রকে ডেকেছেন রাজার সম্বোধনে—'বৈচিত্রবীর্য নৃপতে'। অর্থাৎ তুমি যেন আমার আত্মজ পুত্র নও, তুমি বিচিত্রবীর্যের ছেলে, বিচিত্রবীর্যের জীবনের অসংযমের পরম্পরা তুমি ধরে আছ, আমার নয়।

এইবার সে পালাও শেষ হল। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে অনেক সুখ-ভোগ প্রতিপত্তি লাভ করেও ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয় তৃপ্ত হল না। পুত্রশোকে তাঁর হৃদয় দীর্ণ পর্যুদস্ত। যুদ্ধের পর পনেরো বছর কেটে গেছে। বিদুর, সঞ্জয় এখনও তাঁকে বোঝান। পিতা ব্যাস বার বার তাঁর কাছে

আসেন তাঁর শোকতপ্ত হৃদয় শান্ত করতে—ব্যাসশ্চ ভগবান্নিত্যম্ আসাঞ্চক্রে নৃপেণ হ। কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ধৃতরাষ্ট্র বুঝেছেন—এই নিস্তরঙ্গ রাজত্ব তিনি চাননি, যুধিষ্ঠির তাঁকেই এখনও রাজা বলে মানেন, এই রাজশব্দ তাঁর কাছে এখন শাস্তি বলে মনে হয়। ধৃতরাষ্ট্রের বিষয়ভোগের ইচ্ছা স্তিমিত হয়ে গেছে—এবার তিনি বনে যেতে চান। আর তাঁর ভাল লাগে না। যুধিষ্ঠিরের কাছে এবার তিনি বানপ্রস্থে যাবার অনুমতি চাইলেন।

যুধিষ্ঠির তো হায় হায় করে বিলাপ করতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্রকে ছাড়া তিনি যে অনাথ হয়ে যাবেন, সে কথাও তিনি বার বার জানালেন ধৃতরাষ্ট্রকে। ব্যাস কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে আর অনুরোধ করতে বারণ করলেন। তিনি মনে করেন—বানপ্রস্থের জন্য একটি মানুষের আরও আগেই প্রস্তুত হওয়া উচিত। ধৃতরাষ্ট্র সংসার ভোগ করেছেন অনেককাল। অধর্ম এবং অন্যায়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রপরিচালনাও তিনি দেখেছেন, আবার ন্যায়সঙ্গত রাষ্ট্রচালনা দেখার জন্য তাঁকে থাকতে হয়েছে এতকাল। আর তাঁর কিছুই ভাল লাগে না। ব্যাস সেটা বুঝেই যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন—ধৃতরাষ্ট্র যেমনটি বলেছেন, তুমি তেমনটি করো, বাছা! ইনি বৃদ্ধ হয়েছেন, তার ওপরে অন্তরে তাঁর পুত্রশোকের জ্বালা আছে—অয়ং হি বৃদ্ধো নৃপতি-র্হতপুত্রো বিশেষতঃ। ওদিকে গান্ধারীর অবস্থাও দেখো। এই প্রাজ্ঞ পুত্রবধূ আমার। কত ব্যথাই না সয়েছে। আমিও তাই এই কথাই বলব—এবার তুমি এঁদের ছেড়ে দাও। এঁরা তোমার অনুমতি লাভ করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করুন। এখানে, বিনা কোনও তপস্যায় এঁরা মৃত্যুবরণ করুন—এ আমি চাই না—অনুজ্ঞাং লভতাং রাজা মা বৃথেহ মরিষ্যতি। ব্যাস একটা নীতির প্রতিভূ। তিনি বিশ্বাস করেন—রাজারা সঠিক রাজধর্ম পালন করে গেলেও ভোগ এবং ঐশ্বর্য ভোগ করাটা তাঁদের জীবনের অঙ্গ হয়ে যায়। ঐশ্বর্যের এই প্রয়াস বুড়ো বয়সেও যেতে চায় না রাজাদের। ব্যাস তাই মনে করেন—রাজাদের জীবনশেষের দিনগুলিতে ত্যাগ-বৈরাগ্যের বৃত্তি গ্রহণ করা উচিত। মোক্ষবৃত্তির কোনও সন্ধান না করেই শুধু ভোগবৃত্তিতে একটি জীবন কেটে যাবে, এমনটি ব্যাসের মনঃপূত নয়।

সেই জন্যই তিনি বলেছেন—পুরাতন প্রসিদ্ধ রাজারা বৃদ্ধবয়সে যা করেছেন, ধৃতরাষ্ট্রেরও তাই করা উচিত, কেননা রাজা যাঁরা হবেন, তাঁদের শেষ আশ্রয় হওয়া উচিত বন—তা হলেই একজন রাজা ঋষিতে পরিণত হতে পারেন—রাজর্ষীণাং হি সর্বেষাম্ অন্তে বনমুপাশ্রয়ঃ। সারা জীবন ভোগৈষণায় দিন-কাটানো ধৃতরাষ্ট্রকে অন্তত কিছুদিনের জন্য নিজের দিকে তাকানোর জন্য আত্মৈষণার পথ ধরতে বলছেন ব্যাস। তাঁর জীবনটা যেন বৃথা না হয়ে যায়—না বৃথেহ মরিষ্যতি।

ব্যাস কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে এই মোক্ষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত করেননি। যুধিষ্ঠির এমনিতেই শম-দমাদি চতুঃসাধন-সম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি তো শত্রুবিয়োগেও এত দুঃখিত ছিলেন যে, হস্তিনাপুরের রাজপদবিই তিনি গ্রহণ করতে চাননি। কেউ তাঁকে বোঝাতেও পারেননি, কিন্তু ব্যাস বুঝিয়েছিলেন। বুঝিয়েছিলেন—সংসারের মধ্যে যে দাঁড়িয়ে আছে, যার মধ্যে স্নেহ-মায়া-মমত্বের অপেক্ষা আছে, সে যদি এক লাফে মোক্ষলাভ করতে চায় তো মুশকিল হয়ে যায়। যৌবনের যে বিষয়ৈষিতা—যা নাকি রাজধর্মের মূল মন্ত্র, সেই রাজা যদি মোক্ষধর্ম অবলম্বন করেন, তবে প্রজারা, সাধারণ মানুষেরা কী করবে! ব্যাস মহাভারতের মধ্যে এই জীবনের ধর্মপরম্পরা ব্যাখ্যা করেছেন নিজের বংশপরম্পরার আখ্যান সাজিয়ে দিয়ে। ব্যাস মোক্ষকামী যুধিষ্ঠিরকে জীবনের কর্তব্য মেনে রাজ্যসমৃদ্ধি তথা অর্থলাভের রাজপ্রয়োজন বুঝিয়েছেন, আর চিরতরে অর্থকামী আত্মজ পুত্রকে সর্বহারা অবস্থায় বনের পথ দেখাচ্ছেন।

ধৃতরাষ্ট্রের কর্তব্যবিষয়ে যুধিষ্ঠির ব্যাসের কথা মেনে নিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে এমন একটি সুন্দর কথা বলেছেন—যা ব্যাস শুনতে চেয়েছিলেন তাঁর আত্মজ পুত্র ধৃতরাষ্ট্রের মুখে, কিন্তু শুনতে পাননি কোনও দিন। যুধিষ্ঠির বলেছিলেন—মুনিবর!

আপনিই আমাদের মান্য গুরু। এই রাজ্য এবং প্রসিদ্ধ বংশের আপনিই পরম আশ্রয়—ভগবানস্য রাজ্যস্য কুলস্য চ পরায়ণম্। আমি আপনার পুত্র এবং আপনি আমার গুরু এবং পিতা। পুত্র তো সব সময় পিতার নির্দেশ মেনেই চলে, আমিও তাই চলব। যুধিষ্ঠির সম্বন্ধে ব্যাসের পুত্র নন বটে, কিন্তু ওই যে শাস্ত্রে বলে—'আত্মা বৈ পুত্রনামাসীৎ' অর্থাৎ পিতার অন্তরাত্মাই পুত্ররূপে জন্মায়, সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে ব্যাসের ধর্মশুদ্ধ অন্তরাত্মাই তো যুধিষ্ঠির। তিনি পিতামহের কথা মেনে ধৃতরাষ্ট্রকে বানপ্রস্থে ব্রতী হবার জন্য সংসারমুক্তি দিয়েছেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের বনগমনের পথ ধরে সংসারমুক্তি গ্রহণ করেছেন গান্ধারী, কুন্তী এবং বিদুরও।

যুধিষ্ঠির যে বলেছিলেন—আপনি এই মহান কুলের আশ্রয়—কথাটা বোধ হয় ব্যাসের ক্ষেত্রে সর্বাংশে সত্যি। ঋষির অন্তরগত মানুষ ব্যাস জানেন—সারা জীবন ধরে স্নেহ-মমতার যে টানাপড়েন চলে, তাকে যেমন প্রশ্রয়ও দিতে নেই, তেমনই তাকে অবহেলাও করা যায় না। কতবার তো তিনি চলে গেছেন তপস্যায়, তীর্থে, মুনিসঙ্গমে, তবু ততোধিকবার তিনি ফিরেও এসেছেন হস্তিনায়—যেখানে তিনি ভরতবংশের কুলতন্তু বদ্ধ করে গেছেন নিজের সঙ্গে। পিতার ভূমিকা থেকে তিনি চ্যুত হন না। ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী-কুন্তীরা বনের মধ্যে তপশ্চর্যা আরম্ভ করলেন, সেখানেও তিনি ফিরে এসেছেন আশ্রয়দাতা পিতার ভূমিকায়। তিনি বোঝেন—এঁরা ত্যাগ-বৈরাগ্য সহকারে তপশ্চর্যা করছেন বলেই, ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী-কুন্তীরা দশদিনেই মুনি ঋষি হয়ে যাবেন না। তিনি বোঝেন—মমতা, মমত্ব এখনও তাঁদের হৃদয়কে পীড়িত করে। তপশ্চারী পুত্র-পুত্রবধূরা একদিন দয়ালু শ্বশুরের কাছে বলেই ফেললেন—ব্যাসের যদি কোনও বিভূতি থাকে তবে সেই শক্তিতে তিনি যেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মৃত পুত্রদের দেখাতে চেষ্টা করেন।

সেদিন সেখানে অনেকেই ছিলেন—দ্রৌপদী সুভদ্রা সবাই। ব্যাস সেদিন কল্পতরুর ভূমিকায়। তাঁর যত যোগবল আছে সব একত্র করে তিনি প্রত্যেকের চোখের সামনে হাজির করেছিলেন তাঁদের প্রিয়জনকে। গান্ধারী দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর পুত্রদের, কুন্তী দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর প্রথমজ কর্ণকে, সুভদ্রা দেখতে পেয়েছিলেন অভিমন্যুকে, এবং দ্রৌপদী দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর পঞ্চপুত্র এবং পিতা দ্রুপদ তথা ভাই ধৃষ্টদ্যুম্নকে। দিব্য চক্ষু পেয়ে ধৃতরাষ্ট্র প্রাণ ভরে দেখে নিলেন তাঁর মৃত পুত্রদের। বস্তুত সেদিন যিনি যতটুকু দেখতে চেয়েছিলেন, তারচেয়ে অনেক বেশি দেখতে পেয়েছিলেন। ব্যাস তাঁর অলৌকিক শক্তির সর্বময় স্ফুরণ ঘটিয়ে যুদ্ধমৃত ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ একটা আসর বসিয়ে দিয়েছিলেন জীবিত শোকার্ত সকলের সামনে।

এই অলৌকিকতার মধ্যে কতটুকু সত্য আছে জানি না। কেননা ব্যাসের মতো অতুলপ্রভাবশালী ব্যক্তি—যিনি মহাভারত রচনা করতে পারেন, তিনি যে আরও অনেক কিছুই করতে পারেন, সে ব্যাপারে সংশয়ের বদলে নিশ্চয় থাকাই ভাল। লক্ষণীয়, এই সম্পূর্ণ পিতৃলোক চোখের সামনে উজ্জাগরিত করে দেবার পরেই কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রকে আমরা যথার্থ নির্বিঘ্ন দেখতে পাচ্ছি। তিনি বুঝেছেন—এতকাল বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ ছিল বলেই বিষয় বিয়োগ তাঁকে শোক-তাপে দগ্ধ করেছে। তিনি এবার যথার্থ তপশ্চর্যায় মন দিয়েছেন এবং প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছেন সত্যে। ব্যাস বুঝিয়ে দিলেন—যার হৃদয়ের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ তথা বিষয়ের অপ্রাপ্তি ঘটলেই শোক বাসা বেঁধে থাকে, তার দ্বারা আর যাই হোক শুদ্ধ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। তাই বলে ব্যাস এও চান না যে, মানুষের ভিতর থেকে যদি সে তাগিদ না আসে, তবে কাম-লোভের গলায় হঠাৎ নিবৃত্তির খড়্গ চালিয়ে দিয়ে ভণ্ড-বৈরাগী হয়ে যাক মানুষ।

মহাভারতের মধ্যে ব্যাস এমনই এক জীবনচিত্র এঁকেছেন—যার মধ্যে হঠাৎ-বৈরাগ্য

অথবা হঠাৎ-সন্ন্যাসী হওয়ার অভিসন্ধি নেই। বৈরাগ্য অথবা সত্যপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাস এক নিয়ম-সংযত ক্রমিকতার কথা বলেন। ইন্দ্রিয়ের যে আহার প্রয়োজন, ব্যাস সেই আহার যুগিয়ে দেবার পক্ষে, কিন্তু তারমধ্যে যেন অতিরেক না থাকে, তারমধ্যে যেন ন্যায় থাকে। ধর্মসঙ্গত আসক্তির পথ ধরেই ব্যাসকথিত অনাসক্তির পথে পা বাড়াতে হবে। পণ্ডিতেরা বলেন—মহাভারতের প্রধান অঙ্গী রস নাকি শান্তরস—যা নাকি মোক্ষ বা মুক্তির রসসিদ্ধ মূর্তি। ব্যাস কিন্তু মহাভারতের পাঠককে এক ডিগবাজিতে মোক্ষভূমিতে পৌঁছে যাবার উপদেশ দেন না। সম্পূর্ণ মহাভারত ধরে তিনি যা দেখাচ্ছেন তা হল—মানুষের জীবনে সব আছে—কাম আছে, ক্রোধ আছে, লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য সব আছে। এগুলিকে বুঝে নিয়েই তবে মোক্ষভূমিতে পৌঁছোতে হবে।

মহাভারতের প্রথমেই তিনি এ কথা বলে নিয়েছেন মহাভারতের তাৎপর্য নির্ণায়ক দুটি শ্লোকে। তিনি বলছেন—দুর্যোধন একটা প্রকাণ্ড গাছের মতো। এই গাছ এই পৃথিবীতেই সুলভ—যে গাছ লোভ, ক্রোধ আর পরশ্রীকাতরতা দিয়ে তৈরি এবং এই গাছের মূল হলেন শুভবুদ্ধিহীন ধৃতরাষ্ট্র। অন্যদিকে যুধিষ্ঠিররূপী গাছটি হল ধর্মময়, যে গাছ দয়া, ক্ষমা এবং আত্মত্যাগ দিয়ে তৈরি এবং এই গাছের মূল হলেন ব্রহ্মস্বরূপ কৃষ্ণ, যিনি ভগবদ্‌গীতার উপদেশে মোক্ষের সন্ধান দেন অনাসক্ত কর্মের মাধ্যমে। ব্যাস ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্যোধনকে ঘৃণা করেন না, তাঁরাও ব্যাসের আত্মজ, আবার যুধিষ্ঠিরকেও তিনি অতিবৈরাগ্যে রাজধর্ম ত্যাগ করে রাজ্য ছেড়ে বৈরাগী হতে বলেন না। ব্যাস মনে করেন—প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মুক্তির চিন্তা অনুপ্রবিষ্ট আছে। একজনের এটা বেশি, ওটা কম। অন্যজনের এটা কম, ওটা বেশি। ধৃতরাষ্ট্রকে নিজের ঔরসে জন্ম দিয়ে এবং তার পরম্পরায় দুর্যোধনকে প্রসব করাতে সাহায্য করে তিনি এটা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, অন্যায়ী ব্যক্তিকে তিনি হেয় জ্ঞান করেন না। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্যোধন যেভাবে অর্থ-সমৃদ্ধি এবং কামনার পিছনে ধাবিত—এই প্রধাবনের সঙ্গে তিনি যুক্ত করতে চান ধর্মকে—যে ধর্মের মধ্যে ইন্দ্রিয়জয় থেকে আরম্ভ করে ন্যায়, নীতি, সংযমের মন্ত্রগুণ মিশ্রিত আছে। অর্থ এবং কামের সঙ্গে ধর্মের বোধটাকে যুক্ত করার জন্য মহাভারতের শেষে তিনি কান্নাধরায় গলায় চেঁচিয়ে উঠে বলেছেন—আমি দুহাত তুলে কেঁদে কেঁদে বলে বেড়াচ্ছি, কিন্তু কেউ আমার কথা শোনে না —ঊর্ধবাহু-র্বিরোম্যেষ ন চ কশ্চিৎ শৃণোতি মাম্—আমি বলে বেড়াচ্ছি—ওরে তোরা অর্থ, কাম—যার পিছনে ছুটে চল না কেন, তার সঙ্গে যুক্ত কর ধর্মকে। ধর্ম এবং ন্যায়ের পথে যদি চলিস, তবে অর্থ-সমৃদ্ধিও ঘটবে, কামনাও পূরণ হবে—তবু মানুষ অর্থ এবং কামের পিছনেই দৌড়োয়, ধর্মের সেবা করে না।

এত যে বার বার ধর্মের কথা বলছেন ব্যাস—তার একটা কারণ আছে। ধর্মের কথা বলে ব্যাস সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছোতে চাইছেন। তিনি জানেন—মোক্ষধর্ম সবার জন্য নয়। ইহলোকে কোনও ফলাকাঙক্ষা থাকবে না, পরলোকেও স্বর্গাদিবাসনা থাকবে না, অহং-মম থাকবে না,—এমন মানুষ, অথবা শম-দমের সাধনে যাঁরা দৃঢ় এবং যাঁরা মুক্তিলাভ করতে চান —তাঁরা যে সংখ্যায় গুটিকয়েক মাত্র, ব্যাস তা জানেন। মহাভারতে এই মোক্ষধর্মের কথা অবশ্যই আছে—কিন্তু সেটা এখানে প্রধান নয়। মোক্ষের কথাটা এখানে আছে চতুর্বর্গসাধনের অন্য তিন উপায় ধর্ম, অর্থ, কামের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। মহাভারতের প্রধান অঙ্গুলি-সংকেত তা হলে কোন দিকে? আমি যতটুকু বুঝেছি, তাতে বার বার মনে হয়েছে— মহাভারতের সমস্ত ঝোঁকটাই ধর্মের দিকে। আগেও বার বার বলেছি—ব্যাসের ধর্ম ফুল, বেলপাতা বা নৈবেদ্যের ধর্ম নয়। তাঁর ধর্ম বিশাল এই অনাদি-অনন্ত সংসার-পরম্পরা ধারণের ধর্ম। এমন এক শাশ্বত ধর্ম, যা শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, গাণপত্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ নয় —এই ধর্ম মানুষকে মানুষ করে তোলে। এই ধর্মকে কামের জন্য, ভয়ের জন্য, লোভের জন্য এমনকী জীবনের জন্যও ত্যাগ করা যায় না। অপর দিকে এই ধর্মের জন্য কাম, লোভ, ভয়—সব ত্যাগ করা যায়। ব্যাস সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কথা ভেবে এই ব্যবস্থা

দিয়েছেন।

মানুষের চরিত্র, বৃত্তি এবং কর্মভেদে এই ধর্মের ব্যবস্থা স্বতো বিভিন্ন, কিন্তু প্রত্যেক জায়গাতেই একটা সাধারণ মিল আছে—অর্থাৎ ক্ষেত্রবিশেষে সেটাই পরম নৈতিক বলে মনে হয়। যিনি জন্মমাত্রেই পিতার সঙ্গে তপস্যায় চলে গিয়েছিলেন, যিনি মোক্ষবৃত্তির সমস্ত তত্ত্ব সম্পূর্ণ অবগত, তিনি যে কেমন করে সর্বস্তরের মানুষের ধর্মের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে নিজেকে জড়িয়ে নিতে পেরেছিলেন, সেটা ভেবে অবাক হই। মোক্ষমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু সাধারণের জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন বেশি। মহাভারতের চরিত্রগুলির দিকে একবার তাকান। ভাবুন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথা। তিনি মহাভারতের অন্যতম প্রধান চরিত্র। ধর্মের প্রতীক হিসেবে তিনি চিহ্নিত। বারংবার তিনি ত্যাগবৈরাগ্যযুক্ত মুনিবৃত্তি এবং মোক্ষধর্মের পথে যেতে চেয়েছেন, তিনি তার উপযুক্তও ছিলেন বটে, কিন্তু ব্যাসের চরিত্র-চিত্রণে তাঁকে সংসারের আবর্তের মধ্যেই বেঁধে রাখা হয়েছে, এমনকী রাজা হবার সাধ এবং হয়তো বা উপযুক্ততাও কিছু না থাকা সত্ত্বেও যুধিষ্ঠিরকে রাজা হতে হয়েছে এবং তা শুধু এইটুকু বোঝানোর জন্য যে, কাম কিংবা অর্থ নয়, একমাত্র ধর্মই রাজসিংহাসনে বসবার পক্ষে উপযুক্ত। কারণ কুরুক্ষেত্রের যে যুদ্ধ হয়েছে, তা আসলে অন্যায়-অশুভের বিরুদ্ধে ধর্মের জয়। যুধিষ্ঠির সেই ধর্মের প্রতীক। ধর্মরূপী ধর্মরাজ হস্তিনাপুরের সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েছেন।

বিদুরকে দেখুন। কী প্রয়োজন ছিল বিদুরের। তিনি ক্ষত্রিয় নন, ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত নন, তিনি স্বয়ং ব্যাসের পুত্র এবং পূর্বজন্মে তিনি দেবস্বরূপ ধর্ম। সারাটা মহাভারত জুড়ে তিনি বিবেকের মতো দণ্ডায়মান, অন্যায় এবং অনীতির বিরুদ্ধে তিনি সার্বক্ষণিক এক প্রতিবাদ। তাঁর রাজশক্তি নেই, তবু তাঁর কথা না শুনে পারা যায় না। নৈতিকতার সমস্ত সংকটে তাঁকে ডাকতে হয়, তাঁর পরামর্শ নিতে হয়। আর আছেন কৃষ্ণ। তিনি ধর্মের কর্তা, বক্তা এবং অভিরক্ষিতা। মহাভারতের এই তিন প্রধান চরিত্রের বিপরীতে যাঁরা আছেন—তাঁদের কাছে কোন বস্তুটা পুরুষার্থ বলে গণ্য ছিল? ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন বা কর্ণের কাছে পুরুষার্থ হল অন্যায় কাম-লোভ এবং অবৈধ অর্থ এবং কপট-বিজিত রাজ্য। কিন্তু সেই বিপরীত পক্ষেও এক ওজস্বিনী নারীশক্তি সর্বদা জাগ্রত রয়েছে—তিনি স্বামীর লোভে প্রশ্রয় দেন না, পুত্রের অন্যায় বাড়-বাড়ন্তে তিনি কোনও স্নেহের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন না। পুত্র যুদ্ধজয়ের আশীর্বাদ চাইলেও গান্ধারী জননী বলেন—বাছা। যেখানে ধর্ম সেখানেই জয় হবে—যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।

মহাভারতের তাৎপর্য-নির্ণায়ক যে শ্লোকদুটি আছে, তাতেও ধর্ম এবং অধর্মের প্রতীকী চরিত্রদুটির প্রাধান্যই ব্যাসের ভাবনাটুকু প্রকাশ করে দেয়। একটি শ্লোকে বলা হচ্ছে—দুর্যোধন হলেন সেই অধর্মের প্রতিরূপ এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের মতো—দুর্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ—যে বৃক্ষ সৃষ্টিই হয়েছে ক্রোধ-দ্বেষ আর অসূয়া দিয়ে। এই বৃক্ষের কাণ্ড হলেন কর্ণ এবং শাখা হলেন শকুনি। দুঃশাসন ইত্যাদি ভাইয়েরা এই বৃক্ষের ফুলফল। আর এই লোভ-মোহ-সমন্বিত বৃক্ষের মূল হলেন শুভবুদ্ধিহীন স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্র। ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনের বিপরীত কোটিতে যে বিশাল বৃক্ষটি, সেটি হল ধর্মময়—যুধিষ্ঠিরো ধর্মময়ো মহাদ্রুমঃ। এই বৃক্ষের কাণ্ড হলেন অর্জুন। শাখা হলেন ভীম আর নকুল-সহদেব তার ফুলফল। এই ধর্মদ্রুমের মূল হলেন ব্রহ্মস্বরূপ কৃষ্ণ এবং সত্যব্রত ব্রাহ্মণেরা।

ধর্মের দিকে যাঁরা আছেন—তাঁদের প্রত্যেকে, কেউ প্রত্যক্ষভাবে, কেউ পরোক্ষভাবে, কেউ শক্তি দিয়ে, কেউ বুদ্ধি দিয়ে—প্রত্যেকেই ধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছেন। তার মধ্যে কোথাও অনীতির আভাস থাকলেও তা বৃহত্তর ধর্ম-প্রতিষ্ঠার কারণেই ব্যবহৃত এবং তা যুক্তি দিয়ে নির্ণয়ও করা যায়। ব্যাস এই ধর্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস লিখছেন এবং তা লিখছেন সাধারণ

মানুষের ন্যায়ধর্মের প্রতীতিগম্য করে।

সংসারের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে থেকেও অর্থ-কামের অন্যায় আকর্ষণ যেখানে বার বার মানুষকে প্রলুব্ধ করবে, সেই প্রলোভনের বিরুদ্ধে ধর্মের বর্ম পরে লড়াই করা—এটাই মহাভারত রচনার উদ্দেশ্য। কারণ সাধারণ মানুষের কাছেও অর্থ-কামের অবৈধ হাতছানিটাই বড় হয়ে ওঠে, ব্যাস তাই সাধারণ মানুষের কথা ভেবেই মহাভারত লিখেছেন। সাংসারিক সত্য এবং সংসারের সঠিক প্রয়োজন বোঝবার জন্য আজন্ম তপস্বী ব্যাস মাঝে মাঝেই ফিরে এসেছেন সংসারের ঠিকানায়। কেন ফিরেছেন, তার জন্য অসাধারণ যুক্তি আছে তাঁর, এবং যে যুক্তি তিনি প্রকাশ করেছেন এমন একটি জায়গায়, যেখানে স্বয়ং তাঁর পুত্র শুকদেব মোক্ষকামী হয়ে সংসার ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।

যুধিষ্ঠির শরশয়ান ভীষ্মের কাছে প্রশ্ন তুলেছিলেন—কেমন করে বৈয়াসকি শুক এমন নির্বিণ্ণ ব্রহ্মানন্দী হয়ে উঠলেন? ভীষ্ম ব্যাসের জীবনচর্যা উল্লেখ করে বলেছেন—ব্যাস তাঁর পুত্রকে বেদ-স্বাধ্যায় সমস্ত শিখিয়ে একদিন তাঁকে জীবন এবং অহং-মমতার অনিত্যতা বোঝাতে বসলেন। ব্যাসের সেই উপদেশের মধ্যে বেদ-বেদান্তের সারাৎসার দার্শনিকতা আছে। সেই দার্শনিকতায় সাধনসম্পন্ন উপযুক্ত ব্যক্তি অবশ্যই মুক্তিকামী হতে পারেন, কিন্তু ব্যাস তাঁর দার্শনিকতার আরম্ভ করেছিলেন ধর্ম থেকেই। বলেছিলেন—ধর্মং পুত্র নিষেবস্ব—তুমি ধর্মের সেবা করো। বলেছিলেন—সমস্ত জীবনের মধ্যেই একটা অন্ধকার আছে; আছে মৃত্যুর শীতলতা, কামনা-বাসনার হাতছানি। এই অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করতে হলে ধর্মময় একখানি প্রদীপ হাতে করে ঢুকতে হবে, আর মাঝেমধ্যেই ধর্মবুদ্ধির সলতেটুকু উসকে দিতে হবে—ক্রমশঃ সঞ্চিতশিখো ধর্মবুদ্ধিময়ো মহান্।

ব্যাস অনেক উপদেশ দিয়েছেন—মুক্তোর মতো এক-একটি উপদেশ। সবগুলির আলোচনার অবকাশ নেই এখানে। তবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যাসের যা বক্তব্য ছিল, তাতে এইটুকু বোঝা যায় যে, এই মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে যে মানুষ ন্যায়-নীতি-ধর্মের পথ প্রশস্ত করে নিজের কাজটুকু মন দিয়ে করে যেতে পারে সেই ব্যক্তিই ব্যাসের কাছে বুদ্ধিমান উপাধি পাবেন এবং তা না পারলে সে মোহগ্রস্ত মূর্খ—ধর্মং হি যো বর্ধয়তে স পণ্ডিতো/ য এব ধর্মাচ্চ্যবতে স মুহ্যতি। ঠিক এই উপদেশটাই বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি গৃহস্থ আশ্রমে থাকা কর্মপরায়ণ ব্যক্তিটির সঙ্গে আরণ্যক নির্বিণ্ণ মুমুক্ষু ব্যক্তির একটা তুলনা করেছেন—যে তুলনা ব্যাসের মতো সাহসী যুক্তিবাদী ছাড়া আর কারও পক্ষে করা সম্ভব নয়, মনে হয়।

আমরা কী ভাবি? আমরা ভাবি—যাঁরা অরণ্যে মুনিবৃত্তি গ্রহণ করে আজন্ম ত্যাগ-বৈরাগ্যের সাধন করছেন, তাঁদের চেয়ে মহত্তর সত্তা পৃথিবীতে থাকতেই পারে না। ব্যাস বললেন—কথাটা সর্বাংশে ঠিক নয়। তিনি যুক্তি দিয়ে বললেন—তপোবনেই যাঁরা জন্মালেন এবং ত্যাগ-বৈরাগ্যের সাধনশেষে তপোবনেই যাঁদের দেহপাত ঘটল—তাঁরা যে ধর্মের সাধনে খুব বড় মানুষ—তা বলব না। কেননা মনুষ্যলোকের স্বাভাবিক যে কাম-লোভ-ভোগের বাসনা—সে তো তাঁরা উপলব্ধিই করতে পারলেন না। কামনা-বাসনা মানুষকে কতটা আকর্ষণ করে, ভোগসুখ মানুষকে কতটা মোহিত করে—এ ব্যাপারটাই যাঁরা জানেন না—তাঁদের জিতেন্দ্রিয়তার পরীক্ষাটাই তো হল না। নির্বিণ্ণ ভোগবিরক্ত ব্যক্তি আরও বৈরাগ্য করলেন—এতে কী হল? ব্যাস তাই বললেন—বৈরাগ্যের পরিবেশে জন্মে যাঁরা বিরাগী হয়েই মারা গেলেন তাঁদের ধর্ম সাধিত হল অল্পই, কেননা যেহেতু কামনা-বাসনাকে অতিক্রম করে তাঁদের উর্দ্ধারূঢ় হতে হয়নি, তাই ধর্মের সাধনে তাঁরা পরীক্ষিত নন—তেষামল্পতরো ধর্মঃ কামভোগান্ অজানতাম্।

এই শ্লোকের সাধারণগম্য অর্থ করতে গিয়ে স্বয়ং মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশও মহা ফাঁপরে পড়েছেন এবং শ্লোকটির ভুল অর্থ করেছেন। তিনি লিখেছেন —"যাঁহারা তপোবনেই জন্মিয়া সেখানেই মরিয়া যান, তাঁহারা কামভোগ জানেন না বলিয়া তাঁহাদের ধর্ম অল্পতর হইলেও তাহাই শ্লাঘ্য।" এখানে এই শেষ কটা কথা তিনি কোথা থেকে পেলেন? মূল সংস্কৃতে তো এমন কথা নেই যে, "তাঁহাদের ধর্ম অল্পতর হইলেও তাহাই শ্লাঘ্য" বা প্রশংসনীয়। আসলে মহামহোপাধ্যায় ভাবতেই পারেননি যে, আরণ্যক মুনিবৃত্তি মানুষের ধর্মের কোনও খামতি হতে পারে। তিনি তাই ব্যাসের দার্শনিকতা বুঝতে না পেরে ভাবলেন বুঝি ব্যাস একখানা জব্বর ভুল করে বসে আছেন এবং সাধারণ মানুষ ব্যাসকে ভুল বুঝবে। অতএব তিনি সাধারণ মানুষ এবং ব্যাস দুজনকেই সংশোধন করার গুরু দায়িত্ব অনুভব করে মূল শ্লোকের বাড়তি অর্থ দিলেন—তাঁদের ধর্ম অল্পতর হলেও তাঁদের প্রশংসা করতে হবে।

বস্তুত ব্যাস যা লিখেছেন, তাই যে তিনি 'মিন' করেছেন, তা তাঁর পরবর্তী শ্লোক দেখলেই বোঝা যায়। তাঁর ভাবটা এই যে—যার টাকাপয়সা কিছু নেই, সেই হতদরিদ্র মানুষ যদি বৈরাগ্য এবং ত্যাগ দেখায় তার মানে কী? যে কোনও দিন স্ত্রীলোকের স্তন-জঘনের বন্ধুরতা চোখে দেখেনি, সে যদি বলে যে, আমি কামনা জয় করেছি, তার মানে কী? পরের শ্লোকে ব্যাস বলেছেন—যিনি ভোগ্যবস্তুর ভোগ পরিত্যাগ করে শরীরের দ্বারা তপশ্চরণ করেন—কেউ যেন না ভাবেন—তিনি কিছু পাননি। আমি সেই তপস্যার বলকেই বিশেষ আদর করি —তন্মে বহুমতং ফলম্।

আসলে এইখানেই ব্যাসের জয়কার ঘোষণা করতে হয়। সংসারী গৃহস্থ—কম হোক, বেশি হোক—কিছু-না-কিছু কাম্য সুখ, ভোগ্যবস্তু লাভ করেই। ধর্মাচরণ করতে হলে তাঁকে কামনা-বাসনা অতিক্রম করে মনকে বশীভূত করে শারীরিক তপস্যায় নিজেকে নিয়োজিত করতে হয়। ব্যাস মনে করেন—সংসারী গৃহস্থের এই আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাটা কম প্রশংসনীয় নয় এবং এই চেষ্টাটুকু হয়তো নির্বিঘ্ন সন্ন্যাসীর চেয়েও বেশি প্রশংসনীয়। ব্যাস বলেছেন—গার্হস্থের এই সাধনায় সে যেন না ভাবে যে, সে কিছু পায়নি—ন তেন কিঞ্চিন্ন প্রাপ্তম্—সে নিশ্চয়ই ধর্মলাভ করেছে।

এর পরেও ব্যাসের অনেক উপদেশ আছে এবং তা প্রায় বৈদান্তিক। ব্যাসপুত্র শুক পিতার উপদেশ শুনেও সংসার আশ্রম ত্যাগ করে মোক্ষের উপদেশ গ্রহণ করার জন্য মোক্ষারূঢ় গুরুর অন্বেষণে বেরিয়ে পড়েছিলেন। ব্যাস পুত্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন—আমি কে এবং কার? আমি যার, এমন লোক আমি দেখি না, আবার যে আমার, তেমন লোককেও আমি দেখি না—ন তং পশ্যামি যস্যাহং তং ন পশ্যামি যো মম। কিন্তু এই উপদেশ বুঝি তাঁর নিজের সম্বন্ধেই খাটে না। মহাভারতের সমস্ত ধর্মসংকটে যতবার তাঁকে উপস্থিত থাকতে দেখেছি, ততবারই তাঁকে বিরক্ত সন্ন্যাসীর মতো দেখিনি। সর্বত্র ব্যাস এসেছেন অসীম মমতা নিয়ে—যদি কিছু করা যায়, যদি ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করা যায়!

মহাভারতের কথারম্ভে ব্যাস জানিয়েছিলেন যে, তিনি মহাভারতের মধ্যে কুরুবংশের বিস্তার সম্বন্ধে আলোচনা করবেন। বলবেন—গান্ধারীর ধর্মশীলতার কথা, বিদুরের প্রজ্ঞার কথা এবং কুন্তীর ধৈর্যের কথা। ব্যাস আরও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, কৃষ্ণবাসুদেবের সর্বাতিশয়ী মাহাত্ম্য, পাণ্ডবদের সত্যবোধ এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের দুর্বৃত্ততা—এগুলিও তাঁর মহাকাব্যের পরিসরে আসবে। কিন্তু একবারও ব্যাস বললেন না যে, তিনি কোনওদিন ঋষি মুনির নির্বিঘ্নতা নিয়ে মহাভারতের অন্তরে উপস্থিত হবেন; তিনি আসবেন একান্ত মনুষ্যজনোচিত মমতা এবং বেদনাবোধ নিয়ে। কেউ হয়তো এ কথা তেমন জোর দিয়ে বলবেন না; কিন্তু মহাভারত পড়তে গিয়ে বার বার আমার মনে হয়েছে যে, ব্যাসের মধ্যে নির্বিঘ্ন ঋষিসত্তার চেয়ে মানুষের মমত্বময়ী সত্তাটাই অনেক বেশি বড়।

বাস্তবিকপক্ষে এই মমত্বের ভাগ যে ব্যাসের মধ্যে কতটা, তা সবচেয়ে ভাল বুঝতে পারলাম ভাগবত পুরাণ পড়তে গিয়ে। ভাগবত পুরাণের আরম্ভে রৌমহর্ষণি উগ্রশ্রবা সূত ব্যাসের মহিমাকীর্তন করতে গিয়ে শুকের মহিমা কীর্তন করে বলেছিলেন—সমস্ত প্রাণীর হৃদয়-সমান সেই দ্বৈপায়নপুত্র শুকদেবকে নমস্কার। পুত্র শুক সংসারবিরাগী হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে চাইলে পিতা ব্যাস বিরহব্যথায় কাতর হয়ে কেঁদে বলেছিলেন—পুত্র আমার। আমাকে ছেড়ে যেয়ো না—দ্বৈপায়নো বিরহকাতর আজুহাব। পুত্র শুক পিতার স্নেহানুবন্ধ ছিন্ন করার জন্য নিজে কোনও উত্তর দেননি। মোক্ষগন্ধী অরণ্যের ভিতর দিয়ে তিনি প্রস্থান করেছিলেন, আর সম্মুখস্থ বৃক্ষকুল বায়ুতাড়িত পল্লবাঙ্গুলি উত্তোলন করে উত্তর দিয়ে বলছিল—না, না, তোমার পুত্র এই স্নেহ-মমতার বন্ধনে ধরা পড়বেন না—তোমার পুত্র আছেন, তিনি আছেন, এইটুকুই। শুক ফিরে আসেননি। কিন্তু ব্যাস প্রব্রজিত অবস্থাতেও মায়ের ডাক শুনতে পেয়ে ফিরে এসেছিলেন।

আমি কেন, সকলেই বলবেন—এ কেমন ঋষি যিনি সংসার সন্ন্যাস এবং মুক্তির সমস্ত রহস্য জেনেও পুত্রের বিরহব্যথায় কাতর। আমি বলি—এই মমতা আর মর্মবেদনা ছিল বলেই শুকদেব শুধু শুকসদৃশ বক্তা, তিনি স্রষ্টা নন। অন্যদিকে বিশ্বসংসারের সকলের প্রতি প্রখর মমতাবোধ আছে বলেই সেই জাতিভেদ-দীর্ণ সমাজে বসেও তিনি একদিকে ঋষির মতো বলতে পারেন—এই পৃথিবীতে মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কিছু নেই—ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ—অন্যদিকে সেই মমতাবোধেই তিনি সংসারের সুখ-দুঃখে অংশগ্রহণ করেন। সংসারে এই সাক্ষাৎ অংশগ্রহণই তাঁর ভিতরে কবিজনোচিত বেদনাবোধ সৃষ্টি করে—এই বেদনাবোধ থেকেই মহাকাব্যের সৃষ্টি হয়। তিনি বোঝাতে চান—কী হবে তার সেই টাকাপয়সা, ধনসম্পত্তি দিয়ে, যে নাকি কাউকে একটু দিতেও পারে না আবার নিজেও ভোগ করতে পারে না। কী হবে সেই বিরাট শক্তি-ক্ষমতা দিয়ে—যে শক্তি অন্যায়ী শত্রুকে বাধা দিতে পারে না—ধনেন কিং যন্ন দদাতি নাশ্নুতে/ বলেন কিং যেন রিপুং ন বাধতে। অত-শত শাস্ত্রজ্ঞান দিয়ে কী হবে, যে শাস্ত্রজ্ঞান ধর্ম বা নীতি বোঝাতে পারে না। আর কীই বা হবে সেই দেহ দিয়ে—যে দেহ নিজের অধীন নয় অথবা যে দেহ ইন্দ্রিয় সংযত করতে পারে না।

বেশ বোঝা যায়—জীবনের জন্য যা যা প্রয়োজন—ধন-জন, বিদ্যা-বুদ্ধি, শক্তি-তেজ এবং এই শরীর—ব্যাস এগুলির সব কটিকেই বিশ্বাস করেন, কোনওটাকেই তিনি মায়াময় কাষ্ঠতুল্য ভাবেন না—কিন্তু এই সব কিছুই যেন জীবনের প্রয়োজনে ন্যায়ত পরিশীলিত হয়। জীবনের এই প্রয়োজনগুলি বুঝতে পারেন বলেই ব্যাস কবি হতে পেরেছেন, শুক তা পারেননি। সৃষ্টিকর্তা বিধাতাও ব্যাসকে বুঝি এইভাবে তৈরি করেছেন। তাঁর হাত দিয়ে মহাকাব্য সৃষ্টি করাবেন বলেই বুঝি তিনি নিজের বিভূতিময় সত্ত্ব দিয়ে নিজেরই অংশে তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে শুষ্ক-রুক্ষ মুক্ত মুনি হতে দেননি।

মহাভারতের মোক্ষধর্মপর্বে ব্যাসের একটা পূর্বজন্ম-কথা আছে। সেখানে বলা হয়েছে—স্বয়ং বিশ্বাধার নারায়ণের অংশে ব্যাসের জন্ম। মহাভারতের কথক-ছাত্র বৈশম্পায়নের জিজ্ঞাসা ছিল এ ব্যাপারে। তিনি সময় বুঝে প্রশ্নও করেছিলেন। মহাভারতের মৌল অংশ ভারতাখ্যান বলা শেষ হয়ে গেছে তখন। ব্যাস তখন বেশ ক্লান্ত। ব্যাসের চার শিষ্য সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, বৈশম্পায়ন এবং মুনিপুত্র শুক ক্লান্ত ঋষির শুশ্রূষা করছেন। সেই সময় সবাই মিলে ব্যাসকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা আপনার জন্ম নিয়ে দুরকম কথা শুনি কেন। সবাই জানে—জন্মের প্রমাণে ভগন্নারায়ণ থেকে আপনি ষষ্ঠ পুরুষ, মহর্ষি পরাশরের ঋষিসত্তা নিয়ে আপনি জন্মেছেন—পিতামহাদ্যং প্রবদন্তি ষষ্ঠং/ মহর্ষিমার্ষেয়-বিভূতিযুক্তম্—কিন্তু আবার অনেকেই বলছেন—ভগবন্নারায়ণের পুত্র আপনি, তাঁরই অংশে আপনার জন্ম—এই দুরকম কথা কেন?

শিষ্যদের প্রশ্ন শুনে ব্যাস মহাভারতের শেষাংশে এসে নিজের কথা বলছেন সলজ্জে। ব্যাস বললেন—সে হল পুরাকল্পের কথা। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার সপ্তম জন্ম হল যখন, তখন প্রভু নারায়ণ তাঁকে নিজের নাভিকমল থেকে উৎপন্ন করলেন। ব্রহ্মাকে তিনি প্রজাসৃষ্টির আদেশ দিলে তিনি দেবতা, দানব, মানব, যক্ষ-রাক্ষস সব সৃষ্টি করলেন। সেই সৃষ্টির মধ্যে যখন শুভ এবং অশুভ শক্তির পারস্পরিক হিংসা-দ্বেষ আরম্ভ হল, তখন প্রভু নারায়ণ মৎস্য-কূর্ম-নৃসিংহাদি নানা অবতার গ্রহণ করে অশুভের বিনাশ ঘটাবেন—সেটাও প্রভু নারায়ণের সিদ্ধান্ত। কিন্তু যা কিছুই এতদিন হল—তা সৃষ্টি এবং তার পালনের সঙ্গে যুক্ত এবং তা অনেকটাই রাজনৈতিক সামাজিক ব্যাপার। প্রভু নারায়ণের মনে হল—এ ছাড়াও একটা জগৎ আছে—তা হল সারস্বত জগৎ—সেখানে সাংখ্য, যোগ, পঞ্চরাত্র, বেদ-বেদান্ত, আরণ্যক—ইত্যাদি দর্শন এবং শাস্ত্রের নিষ্পত্তির জটিলতা আছে। রেষারেষি আছে সেখানেও, অতএব পৃথিবীর রাজনৈতিক এবং সামাজিক সুস্থিরতা সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-নিষ্ঠারও নিষ্পত্তি প্রয়োজন।

পরম ঈশ্বর এই প্রয়োজন মেটানোর ভার ব্রহ্মাকে দিলেন না এবং তিনি নিজেও সে ভার নিলেন না। জ্ঞানের তত্ত্ব এবং প্রয়োগ সুস্থির করার জন্য প্রভু নারায়ণ তখন—ওহে কে আছ এখানে—এই বলে একটি বাক্য উচ্চারণ করলেন। সেই বাণীরূপা সরস্বতী থেকেই তাঁর এক সারস্বত পুত্র জন্মাল—যার নাম অপান্তরতমা—অর্থাৎ যাঁর মধ্যে অজ্ঞানের অন্ধকার একটুও নেই। আদেশের প্রতীক্ষায় অবনতমস্তকে দাঁড়ানো সেই পুত্রকে নারায়ণ বললেন—জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ! তুমি জ্ঞানস্বরূপ বেদের ভাবনাগুলি ভাল শ্রবণ করে বেদকে বিভাগ করো তুমি। তাঁদের আদেশে নারায়ণের পুত্রপ্রতিম অপান্তরতমা সম্মিলিত বেদ এবং দর্শনগুলিকে বিভক্ত করলেন। পুত্রের সারস্বত কর্মে প্রভু নারায়ণ তুষ্ট হয়ে বললেন—ভবিষ্যতে যখন কুরুবংশের রাজারা জন্মাবেন তখন এক সময় তোমার থেকে উৎপন্ন কৌরব-বংশধরদের মধ্যেই বিবাদ সৃষ্টি হবে। সেই সময় আবারও তুমি বেদ বিভাগ করবে এবং ধর্মনিরূপক বিভিন্ন শাস্ত্র রচনা করবে। কৃষ্ণবর্ণযুক্ত কলিকালে জন্ম নিয়ে তোমার গায়ের রংও হবে কালো। তবে হ্যাঁ যতই তুমি বিরাগী তপস্বী হও তুমি কিন্তু পার্থিব মমত্বময় অনুরাগ-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে না—ভবিষ্যসি তপোযুক্তো ন তু রাগাদ্ বিমোক্ষ্যসে। অথচ তোমার যে পুত্র হবে—সেই শুকদেব কিন্তু মহাদেবের বরলাভ করে বিতরাগ সন্ন্যাসী হবেন।

নারায়ণের আশীর্বাদে তাঁরই অংশজ অপান্তরতমা পরজন্মে পরাশরের পুত্র ব্যাসদেব হয়ে জন্মালেন—তবু এ কথা আমার কাছে অবান্তর। তিনি নারায়ণের অংশ কিনা, অথবা সারস্বত বেদ-বিভাজন কর্ম করে নারায়ণের উক্তি তিনি সার্থক করেছিলেন কিনা, তাও আমার কাছে তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ শুধু একটি বাক্য—তুমি তপস্বী হবে বটে, তবে তোমার স্নেহ-মায়া-মমতার বন্ধন ঘুচে যাবে না—ন চ রাগাদ্ বিমোক্ষ্যসে। আপন পুত্রের প্রতি সেকালে এই নারায়ণীয় আশীর্বাদ অতি-আশ্চর্যজনক। জন্মান্তরে পুত্রকে দিয়ে বহু ধর্মসংকট সমাধা করিয়ে নেবেন এবং তাঁর মাধ্যমে মানুষকে জরামরণহীন মুক্তির পথ দেখাবেন—এই আশীর্বাদই তো নারায়ণের পক্ষে করণীয় এবং দেয় ছিল। অথচ তিনি সে আশীর্বাদ করেননি। আর ঠিক এইখানেই বুঝি প্রভু নারায়ণ ব্যাসের হৃদয়ের মধ্যে মহাকবির শক্তি-বীজ বপন করে দিয়েছিলেন—কেননা যার মধ্যে রাগ-অনুরাগ, শুভাশুভ, মায়া-মমতার খেলা নেই, সে কখনও বড় কবি হতে পারে না। সংসারবিচ্ছিন্ন, বীতরাগ, বীতশ্রদ্ধ ব্যক্তির মধ্যে সৃষ্টির বীজ থাকতে পারে না। সেই জন্যই প্রভু নারায়ণের ইচ্ছাকৃত বন্ধনের আশীর্বাদে ব্যাস হলেন স্রষ্টা, আর শুক হলেন বক্তা।

ব্যাসের জীবনে শুকের জন্মও তাঁর মানসিক পরিমণ্ডলটুকু বুঝিয়ে দেবে। একটি সুসন্তানের জন্য ব্যাস রীতিমতো তপস্যা করেছিলেন। শরশয্যায় শুয়ে ভীষ্ম-পিতামহ

যুধিষ্ঠিরকে তাঁর এই অন্য পিতামহের তপশ্চর্যার কথা শুনিয়েছেন। মেরুশৃঙ্গ পর্বতের কর্ণিকার বনে—সেই যেখানে মহাদেব আর পার্বতী প্রণয়রসে ভ্রাম্যমাণ ছিলেন—সেই বনেই যোগপ্রবিষ্ট হয়ে সুপুত্রের আশায় তপস্যা করছিলেন ব্যাস। তাঁর কামনা—পুত্রটি যেন তাঁর ধৈর্যে পঞ্চভূতের মতে স্থিতিশীল হয়। তপস্তুষ্ট মহাদেব শেষ পর্যন্ত বর দিলেন ব্যাসকে—যেমনটি তোমার ঈপ্সিত, ঠিক তেমনই পুত্র হবে তোমার।

ব্যাস তপস্যা থেকে বিরত হলেন বটে—কিন্তু পুত্রলাভের যে মাধ্যম, যাকে স্ত্রী বলি আমরা, সেই স্ত্রীই তো নেই ব্যাসের। মনুষ্যলোকে পুত্রলাভ করতে হলে মনুষ্যধর্মের মধ্য দিয়েই তা পেতে হবে। অবশ্য ব্যাস অত চিন্তা করেননি। তিনি নিশ্চিন্ত আছেন—দেবাদিদেব বর দিয়েছেন, পুত্র তিনি নিশ্চয়ই পাবেন। বরলাভের পর প্রতিদিনের অগ্নিহোত্র সম্পাদন করার জন্য ব্যাস অগ্নি উৎপাদনে মন দিলেন। দুটি কাষ্ঠখণ্ড, যাকে যাজ্ঞিকেরা বলেছেন অরণি—ব্যাস সেই অরণিমন্থন করতে আরম্ভ করলেন অগ্নি উৎপাদন করার জন্য। ঠিক এই সময় যদৃচ্ছাক্রমে সেখানে উপস্থিত হলেন স্বর্গসুন্দরী অপ্সরা ঘৃতাচী। ঘৃতাচী যে তাঁর সামনে খুব ঢঙ-ঢাঙ করে তাঁকে আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছিলেন তাও নয়; কিন্তু তবু অপ্সরাসুন্দরীর শরীর-সৌন্দর্যে তিনি মোহিত হলেন। আসলে শাস্ত্রকারেরা যেমন বলেন—শুকের মতো মহদাশয় মহামুনি জন্মাবেন, তার একটা অজুহাত তো চাই। সাময়িকভাবে কামী না হলে তো পুত্রলাভ করা যায় না। জীবনের ঋণ তো মেটাতে হবে। সেই জন্যই মনোহরণ ঘটল ব্যাসের—ঘৃতাচীর শরীর তাঁর মন হরণ করল—ভাবিত্বাচ্চৈব ভাবস্য ঘৃতাচ্যা বপুষা হৃতঃ।

সংরূঢ় কামবেগ সংযমের বলে নিরুদ্ধ করার জন্য ব্যাস অরণিমন্থনে অধিকতর মনোযোগ দিলেন। অগ্ন্যাধানের অগ্নি তাতে উৎপাদিত হল না বটে কিন্তু হৃদয়ের আগুন তার কর্ম করে দিল। ঘৃতাচীর শরীর-স্মরণে যে আগুন জন্মেছিল, তাতে তপ্ত ব্যাসের শরীর থেকে তেজবিন্দু নির্গত হয়ে পতিত হল সেই মথ্যমান যজ্ঞকাষ্ঠ অরণিদ্বয়ের ওপর। আর সেই অরণির ঘর্ষণ থেকেই জন্মালেন আগুনের মতো তেজস্বী শুকদেব।

শুকের জন্মের ঔপনিষদিক কোনও প্রতীক আছে নাকি কোনও? বৃহদারণ্যক উপনিষদের শেষে একবার বলা হয়েছিল—পুত্রাকাঙক্ষী ব্যক্তি যেন স্ত্রী-পুরুষের দেহদুটিকে অগ্নিমন্থনের দুটি অরণিকাষ্ঠ ভাবেন। আমার তো মনে হয়—সেই প্রতীক এখানে ব্যবহৃত হয়েছে—নইলে এই অরণিমন্থনের প্রক্রিয়া যেন সযৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যাত হয় না। অরণি-শরীর মন্থন করে যে অগ্নি উৎপাদন করার প্রয়াস করছিলেন ব্যাস, সেই অগ্নি থেকেই জন্মালেন অগ্নিপ্রতিম শুকদেব—অরণীং মমন্থ ব্রহ্মর্ষিস্তস্যাং জজ্ঞে শুকো নৃপঃ। জীবনসৃষ্টির জন্য যে অগ্নিটুকুর প্রয়োজন হয়, ব্যাস সেই জীবনের ধর্ম অতিক্রম করলেন না। এই অতিক্রম হয়তো তিনি চানওনি। প্রভু নারায়ণও তাঁকে এই আশীর্বাদই—করেছিলেন—ন চ রাগাদ্ বিমোক্ষ্যসে।

শুক জন্মালেন। জন্মমাত্রেই তিনি ব্রহ্মবিৎ। স্বয়ং মহাদেব তাঁর উপনয়ন-সংস্কার করেছেন। তাঁর তপস্যার জন্য আকাশ থেকে উড়ে পড়েছিল সন্ন্যাসীর দণ্ড এবং কৃষ্ণাজিন মৃগচর্ম। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর জন্য স্বর্গের কমণ্ডলু পাঠিয়েছিলেন। তাঁকে ঘিরে নির্ভয়ে উড়ে বেড়ায় হাঁস, সারস, কাঠঠোকরা আর চাষপক্ষীর সমাজ। ব্রহ্মচারী শুকদেবের প্রথম অধ্যাপক হলেন বৃহস্পতি। তাঁর কাছে পাঠ নেওয়া শেষ হলে মোক্ষকামী শুকদেব পিতার কাছে এসে বললেন—আপনি মোক্ষধর্মের সব তত্ত্ব জানেন, আপনি আমাকে সেই ধর্ম উপদেশ করুন—মোক্ষধর্মেষু কুশলো ভগবান্ প্রব্রবীতু মে।

এই মুহূর্তে ব্যাসের প্রতিক্রিয়াটুকু দেখবার মতো। সত্যিই তো তিনি মোক্ষধর্ম জানেন।

তত্ত্বত তিনি তার উপদেশও দিতে পারেন, কিন্তু যেহেতু তিনি স্বয়ং মুক্তিকামী নন, অথচ পুত্রের তীব্র মুমুক্ষুত্ব তিনি বুঝতে পারেন, তাই তিনি শুধু মোক্ষধর্মের প্রয়োগজ্ঞানহীন শিক্ষক হয়ে থাকতে চাইলেন না। পুত্রকে তিনি রাজর্ষি জনকের কাছে যেতে বললেন। জনক জীবন্মুক্ত রাজর্ষি, তিনি মুমুক্ষু ব্যক্তিকে সঠিক উপদেশ দিতে পারবেন। শুকদেব মিথিলায় রাজর্ষি জনকের কাছে যাবার উপক্রম করলে ব্যাস তাঁকে পুনরায় উপদেশ দেবার প্রয়োজন বোধ করলেন। তার কারণও আছে। আসলে রাজর্ষি জনক জীবন্মুক্ত মোক্ষারূঢ় ব্যক্তি হলেও সাধারণ মানুষ যাতে তাঁর দৃষ্টান্তে স্বধর্ম এবং স্বকর্ম তাগ না করে সেই জন্য বৈদিক যজ্ঞাদি তথা নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মগুলি করে যেতেন, মুক্ত ব্যক্তির পক্ষে এগুলি অপ্রয়োজনীয় হলেও করে যেতেন।

জনকের এইসব শ্রৌতকর্মে ব্যাস তাঁর ঋত্বিক হিসেবে কাজ করতেন। ফলে এইখানে ব্যাস তাঁর গুরুস্থানীয় এবং জনক ব্যাসের যজমান। ব্যাস জনকের গুরুস্থানীয় হলেও রাজর্ষি জনকের আধ্যাত্মিক সিদ্ধির কথা তিনি জানেন এবং এ বাবদে তিনি শিষ্যকেও সম্মান করেন। এখন শুক যেহেতু একভাবে জনকের গুরুপুত্র হবেন, তাই কোনওভাবে শুক যদি জনকের কাছে গুরুপুত্রের অধিকার ব্যক্ত করে কোনও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে ফেলেন, সেটাতে পিতা ব্যাসের মনে অনর্থক আশঙ্কা আছে। আশঙ্কা এই জন্য যে, শুকদেব স্বয়ং কিছু কম ব্যক্তিত্ব নন। মোক্ষধর্মের সিদ্ধিতে তিনি জন্মগতভাবে অধিকারী। এই অস্বাভাবিক ক্ষমতার জোরে যদি কোনও উচ্চতাবোধ জন্মে থাকে তাঁর মনে অথবা এমন যদি হয় যে, আপন তপঃসিদ্ধির প্রভাবে শুক যদি কোনও অলৌকিক ক্ষমতার আশ্রয় নিয়ে রাজর্ষি গুরু জনকের কাছে পৌঁছোন—তা হলে সেটা অভব্যতা হবে। ব্যাস মনে করেন—তুমি যত বড় উত্তম মানের শিষ্যই হও, গুরুর কাছে যেতে হবে বিনীত হয়ে।

ঠিকই এইখানেই ব্যাসের ধর্মবোধ। ব্যাস পুত্রকে বললেন—তোমার তপস্যার যত প্রভাবই থাকুক, তুমি সেইভাবে মোক্ষগুরু জনকের কাছে উপস্থিত হবে, যেভাবে একজন সাধারণ মানুষ পায়ে হেঁটে গুরুর কাছে উপস্থিত হয়। সরলভাবে তাঁর কাছে যাবে, রাজার বাড়ি বলে ভালমন্দ খাওয়া অথবা সুখে থাকার কথা ভেবো না। আর একটা কথা—মহারাজ জনক আমার যজমান, তিনি গুরুপুত্র বলে তোমাকে গুরুর মতোই সম্মান করবেন, কিন্তু তুমি যেন তাই বলে তাঁর কাছে ব্রাহ্মণ্য অথবা গুরুপুত্রের অহঙ্কার প্রকাশ কোরো না—অহঙ্কারো ন কর্তব্যো যাজ্যে তস্মিন্নরাধিপে। তিনি যা বলবেন তাই করবে।

অত্যন্ত উত্তম মানের অধিকারীকেও যে পার্থিব ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে—এই ধ্রুব সত্যটা তাঁর অতিপ্রাকৃত গুণী পুত্রকে ভুলতে দেননি ব্যাস। এটা যেহেতু ধর্ম অতএব এখানে তাঁর কোনও স্নেহান্ধতা নেই। অথচ তিনি শুকদেবের মতো নিঃস্পৃহ, উদাসীন, বন্ধনহীনও নন। শুকদেব জনকের কাছে মোক্ষধর্মের পরম তত্ত্ব শুনেও বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু এর পরে দেবর্ষি নারদের কাছে পুনরায় মোক্ষসাধনের সমাধান শুনে শুক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবেন বলে পিতার আদেশ চাইলেন। মোক্ষকামী পুত্রের কথা শুনে ব্যাস সন্তুষ্টও হলেন আবার কষ্টও পেলেন। বললেন—তুমি অন্তত আজকের দিনটা এখানে থাকো, বাছা! অন্তত আজকের দিনটা তোমার লাল্য মুখখানি দেখে চোখ জুড়োই—ভো ভোঃ পুত্র স্থীয়তাং তাবদদ্য/ যাবচ্চক্ষুঃ প্রীণয়ামি ত্বদর্থে।

পিতার কথায় বন্ধনমুক্ত শুকের কোনও বিক্রিয়া হল না। নিরপেক্ষ নিঃস্নেহ শুক মোক্ষকামনাতেই পিতার আশ্রম ছেড়ে ঊর্ধ্বমার্গে চললেন। পিতার জন্য যে তিনি কোনও নৈকট্য বোধ করেন না, তা নয়। তিনি বুঝলেন যে, তাঁর স্নেহশীল পিতা তাঁর পিছন পিছন আসছেন, স্নেহের বন্ধন তিনি এড়াতে পারছেন না। শুক দেবতাদের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বললেন—আমার পিতা যদি এইভাবেই আমাকে অনুসরণ করে এমন সস্নেহে আমার নাম

ধরে ডাকতে থাকেন, তবে আপনারা তাঁর কথার প্রত্যুত্তর দেবেন—পিতা যদ্যনুগচ্ছেন্মাং ক্রোশমানঃ শুকেতি বৈ। শুকের কথা শুনে বন, সমুদ্র, নদী, পর্বত—সব দিক থেকে ব্যাসের পুত্র-সম্ভাষণের প্রত্যুত্তর দিল—যেন শুকই কথা বলছেন—আমি আছি, পিতা! আমি আছি—পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরবো'ভিনেদুঃ। শুক কিন্তু থেমে নেই, তিনি চলেছেন চরৈবেতির মধুমন্ত্র ধারণ করে।

পিতা ব্যাস পুত্রের পিছন পিছন চলছেন। তিনি দেখলেন—তার পুত্র দিগম্বর নগ্ন যুবা মন্দাকিনীর নির্ঝর-শীকর উপেক্ষা করে এগিয়ে চলেছেন। মন্দাকিনীর নির্মল জলে তখন স্বর্গসুন্দরী অপ্সরারা নগ্ন বিবৃত হয়ে অলসে স্নান করছিল। কিন্তু পুরুষ শুককে দেখে তাঁদের কোনও ভাববিকার হল না। স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় তারা কাপড়চোপড়ও ঠিক করল না, একটু বিব্রতও হল না। এমন একটা ভাব—যেন কিছুই হয়নি—শূন্যাকারং নিরাকারাঃ শুকং দৃষ্ট্বা বিবাসসঃ। বায়ুর বেগে শুক হেঁটে চলেছেন পাহাড় থেকে পাহাড়ে, উঁচু থেকে আরও উঁচুতে। এক জায়গায় ব্যাস দেখলেন—পুত্রটি তাঁর একাকার হয়ে গেল পরম জ্যোতির সঙ্গে। ব্যাস সোৎকণ্ঠে ডাকতে লাগলেন—ওরে বাছা, বাছা আমার। কোনও প্রত্যুত্তর এল না।

এতক্ষণ ব্যাস চলছেন শুকের পিছন পিছন, যদিও তিনি অনেক দূরে ছিলেন। চলতে চলতে এবার তিনি সেই জায়গায় এসে পৌঁছোলেন, সেই মন্দাকিনীর তীরে যেখানে স্বর্গসুন্দরী অপ্সরারা জলতরঙ্গে আদুড় গা ভাসিয়ে স্নান করছিল। কুমার শুকদেবকে দিগম্বর অবস্থায় দেখেও যাঁরা নড়াচড়া করেননি, তাঁরাই কিন্তু বয়স্ক ব্যাসকে দেখে কেউ জলে লুকোলেন, কেউ লতাবৃক্ষের আড়াল খুঁজলেন, কেউ বা পরিধেয় বসন পরে নিলেন—জলে নিলিল্যিরে কাশ্চিৎ কাশ্চিদ্ গুল্মান্ প্রপেদিরে। মহাভারতের কথকঠাকুর ভারী সুন্দর একটি মন্তব্য করেছেন এখানে। বলেছেন—ব্যাস বুঝতে পারলেন—তাঁর পুত্র ব্রহ্মসমাধি লাভ করেছেন। কেননা পার্থিব বস্তুপিণ্ডে জড়বৎ বোধ সম্পন্ন হওয়ার ফলেই শুককে নগ্ন দেখেও স্বর্গসুন্দরীদের ভাববিকার হল না, অথচ বৃদ্ধপ্রায় ব্যাসকে দেখে তাঁরা লজ্জায় বিব্রত হলেন। পুত্রের মুক্তজ্ঞানের পরিচয় পেয়ে এবং আপন সীমাবদ্ধতার কথা অনুভব করে ব্যাস যুগপৎ আনন্দিতও হলেন, আবার লজ্জাও পেলেন—প্রীতো'ভূদ্ ব্রীড়িতশ্চ হ।

ভগবান শঙ্কর পুত্রশোকপীড়িত ব্যাসের সামনে এসে দাঁড়ালেন এবার। বললেন—মহর্ষি তুমিই তো আমার কাছে এমন একটি নিত্যশুদ্ধ, বুদ্ধ-মুক্ত পুত্র চেয়েছিলে, তা হলে এখন তার জন্য শোক করছ কেন। তবে হ্যাঁ, তোমার অবস্থা দেখে আমি এই অনুগ্রহ করছি যে, তোমার পুত্র পরম মুক্তিপদবী লাভ করলেও সর্বত্র তুমি তার প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে। মহাদেবের কৃপায় ব্যাস সর্বত্র পুত্রের প্রতিবিম্ব দেখতে পেলেন। পরম আনন্দিত হলেন তিনি —ছায়াং পশ্যন্ সমাবৃত্তঃ স মুনিঃ পরয়া মুদা।

পিতার আশ্রম থেকে শুকের প্রব্রজিত হবার যতটুকু কাহিনী এখানে বললাম, তারমধ্যে ব্যাসকে নিয়েই আমাদের বক্তব্য আছে। দেখুন, ব্রহ্মর্ষি শুকদেব কেমন নিঃস্পৃহভাবে চলে গেলেন পিতাকে ছেড়ে। কিন্তু পিতা ব্যাস মুক্ত মানুষের মতো তাঁকে ছেড়ে দিতে পারলেন না। লাস্যময়ী অপ্সরারা শুককে দেখে লজ্জা পেলেন না, অথচ ব্যাসকে দেখে লজ্জা পেলেন। আবার তাঁদের লজ্জা দেখে ব্যাসও যে আবার নিজের সম্বন্ধে লজ্জা পেলেন, এই ছোট্ট ছোট্ট লজ্জা এবং ছোট্ট ছোট্ট মায়ার মধ্যেই মহাভারতের কবির কবিত্বের রহস্য লুকিয়ে আছে। আবিল সংসারের মধ্যে তিনি প্রবেশ করেছেন, কিন্তু সীমা অতিক্রম করেননি কখনও। এর ফলে সব কিছুই দূর থেকে কবির দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব হয়েছে তাঁর পক্ষে। জননী সত্যবতীর আদেশে তিনি ক্ষত্রিয়কুলে পুত্রোৎপাদন করেছেন, আবার শুকও তাঁর পুত্র —দুই জায়গাতেই তাঁর পিতৃজনোচিত মায়া আছে, অথচ তিনি স্নেহান্ধ নন। এইখানেই ধর্মের

জগৎ। এমনটি না হয়ে যদি ব্রহ্মবাদী নির্গ্রন্থ ঋষি হতেন তিনি, তা হলে আর যাই হোক মহাভারত নামের মহাকাব্যখানি তাঁর পক্ষে রচনা করা সম্ভব হত না।

সংসার-সীমান্তে দাঁড়ানো ব্যাসের মায়ামমতা, সীমাবদ্ধতার কথা আরও পরিষ্কার করে বলেছে আমাদের ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। এখানে শুকের মায়ের নাম বীটিকা। এই পুরাণে দেখছি—ব্যাস তখনও বিবাহ করেননি বলে জননী সত্যবতী তাঁকে পিতৃঋণের দায়ে দায়ী করছেন। মায়ের তাড়নায় পিতৃঋণ থেকে মুক্তি পাবার জন্য ব্যাস শেষ পর্যন্ত জাবালীর মেয়ে বীটিকাকে বিয়ে করেন। বহুকাল তাঁর সঙ্গে তপশ্চরণ করে একদিন ব্যাস বুঝলেন—বীটিকার গর্ভে তাঁর সন্তান আসছে। কিন্তু সে পুত্র আর কিছুতেই জন্ম নেয় না। এগারো বছর পার হয়ে গেল, তখনও ব্যাসপত্নী বীটিকা গর্ভধারণের কষ্ট সহ্য করে যাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত বারো বছর বয়সি গর্ভস্থ সন্তানকে ব্যাস বললেন—পুত্র! তুমি কেন এমন করে তোমার মাকে কষ্ট দিচ্ছ? তুমি জন্মগ্রহণ করো। পেটের ভিতর থেকে শুক বললেন—আমি প্রসূত হতে চাই না। মায়াময়ী এই পৃথিবীতে জন্ম নিলেই মায়া আমাকে আক্রমণ করবে। আমি তাই গর্ভের মধ্যেই ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন আছি।

ব্যাস অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সঙ্গে বললেন—তুমি জন্মগ্রহণ করো, পুত্র! মায়া তোমাকে কিছুই করতে পারবে না। আমার কথা প্রমাণ মেনে তুমি বাইরে এসো। আমার প্রিয় পত্নীটিকে তুমি আর কষ্ট দিয়ো না। গর্ভস্থ শুক বললেন—আপনার কথা প্রমাণ মানলে এইটাই মানতে হয় যে, নিজ পত্নী এবং পুত্রের ওপর আপনার যথেষ্ট আসক্তি আছে, মায়া আছে। কাজেই আপনার কথা প্রমাণ বলে মানি কী করে? আপনার ওপর আমার সে ভরসা নেই। শুক আরও বললেন—মায়া যাঁর সৃষ্টি, সেই ঈশ্বর যদি এসে আমাকে ভরসা দেন, তবেই আমি গর্ভমুক্ত হয়ে জন্ম নিতে পারি। নিরুপায় ব্যাস শেষ পর্যন্ত দ্বারাবতীতে গিয়ে ঈশ্বর-স্বরূপ কৃষ্ণকে ধরে আনলেন এবং কৃষ্ণের বাক্য মেনে শুক জন্মালেন এই ধরাধামে।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শুকের এই জন্মকথায় মহাভারতের অনুধ্বনি নেই হয়তো, কিন্তু এই কাহিনীটুকু এখানে উদ্ধার করলাম শুধু এইটুকু বোঝানোর জন্য যে, ব্যাসের এই মায়াটুকু শুধু তাঁর পত্নী এবং পুত্রের জন্যই পুরো ব্যয়িত হয়নি, সমস্ত সংসার, সমস্ত মানুষের জন্য তাঁর এই মায়া আছে এবং এই মায়াটুকু তাঁর ঋষিত্ব এবং ব্রহ্মজ্ঞানকে অতিক্রম করে নতুন এক মাত্রা নিয়ে ধরা দিয়েছে আমাদের কাছে। এটাই আমাদের উপরি পাওনা। এই মায়াটুকু না থাকলে মহাভারতের মধ্যে পাঁচটি কালো মানুষের মাহাত্ম্য এমন করে ফুটে উঠত না; ফুটে উঠত না গান্ধারীর ধর্মের সম্ভাবনা—যে গান্ধারী অসহায় পুত্রের মুখের ওপর নির্মমভাবে বলতে পারেন—যেখানে ধর্ম, সেইখানেই জয় হবে পুত্র। ব্যাসের মমত্বটুকু না থাকলে প্রকাশ পেত না দাসীপুত্র বিদুরের প্রজ্ঞা। যে প্রজ্ঞা এতকাল এবং চিরটাকাল ব্রাহ্মণেরাই বিতরণ করেছেন, বিদ্যাবিনয়-সম্পন্ন হলে সেই প্রজ্ঞা যে দাসীপুত্রের মুখেও স্ফুরণ হতে পারে, সেটা ব্যাসের সর্বত্রগামী মমত্ব ছাড়া অসম্ভব ছিল।

আরও একটা কথা। প্রভু নারায়ণ ব্যাসকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন—কৃষ্ণযুগ অর্থাৎ কলিযুগ আসলে পরে তুমি আবার কৃষ্ণবর্ণ কালোবরণ হয়ে জন্মাবে। তখন তুমি ভারতাখ্যান রচনা করবে। আমাদের ধারণা—নিজে কৃষ্ণবর্ণ হয়ে জন্মেছিলেন বলেই সেই বেদাবশিষ্ট ব্রাহ্মণ্যের যুগেও কৃষ্ণবর্ণ মানুষগুলিকে তিনি অসীম মমতায় অঙ্কিত করেছেন। রসিক সুজনের মতে মহাভারতের পাঁচটি কালো মানুষ হলেন—ব্যাসজননী সত্যবতী, স্বয়ং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, বাসুদেব কৃষ্ণ—যিনি গোপীশতকেলিকার এবং মহাভারত-সূত্রধার একাধারে, চতুর্থ কৃষ্ণ হলেন অর্জুন এবং পঞ্চমী কৃষ্ণা দ্রৌপদী। ভেবে দেখবেন—এঁদের ছাড়া মহাভারত অন্ধকার।

আবার অন্যদিকে তাঁর ধর্ম-খ্যাপনের ক্ষেত্রগুলি তিনি এঁকেছেন অদ্ভুত বিপ্রতীপভাবে। ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্র-জ্যেষ্ঠ বলে কথা। অন্ধতার জন্য রাজ্য না পাওয়ায় তিনি যে মানসিক যন্ত্রণার শিকার হয়েছিলেন, সে যন্ত্রণা ব্যাস দেখিয়েছেন একজন নিরপেক্ষ মনস্তাত্ত্বিকের মতো। অন্ধতার জন্য ঐশ্বর্যহানি ধৃতরাষ্ট্রকে উন্মাদ করে তুলছিল এবং সেই উন্মত্ততা তাঁর পুত্র দুর্যোধনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে একটি রাজবংশের ধ্বংস ডেকে এনেছিল—কিন্তু সেই অন্ধ উন্মত্ততার বিপরীত দিকে ব্যাসকে যুধিষ্ঠির এবং বিদুরের চরিত্র সৃষ্টি করতে হয়েছে। লোকে ধার্মিক চরিত্রের সরল আখ্যান পাঠ করে তৃপ্তি পায় না, কিন্তু ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি যখন পাপ কুটিলতার চাপে পদে পদে বঞ্চিত লাঞ্ছিত হতে থাকে, মানুষ তখন সেই বঞ্চনা-লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে ধর্মনিষ্ঠের পক্ষপাতী হতে থাকে। মহামতি ব্যাস গান্ধার দেশ থেকে দ্যূতশৌণ্ড শিখণ্ডীকে ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় নিয়ে এসে যেভাবে পাণ্ডব ভাইদের দুর্ভাগ্য রচনা করেছেন, মহাভারতের পাঠক এর প্রতিশোধ নেবার জন্য উপায় খুঁজতে থাকে। অবধারিতভাবে যুদ্ধের সম্ভাবনা ঘনিয়ে আসে। কিন্তু সে যুদ্ধ শুধুই প্রতিশোধের ভাবনায় সংকীর্ণ হয়ে ওঠে না। যুধিষ্ঠিরের ত্যাগ-বঞ্চনা এবং পরিশেষে পাঁচটিমাত্র গ্রামের অধিকার থেকেও যখন তিনি বঞ্চিত হন, তখন পাণ্ডবদের যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ হয়ে ওঠে—যে যুদ্ধের সমস্ত পাপটুকু আত্মস্থ করেন স্বয়ং ভগবান রূপে চিহ্নিত সেই মানুষটি—মহাভারতের পরোক্ষ নায়ক কৃষ্ণ।

ন্যায় পক্ষ এবং অন্যায় পক্ষ—মহাভারতের বিশাল এই সংসারটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন ব্যাস—তিনি কোথাও সম্পূর্ণ জড়িয়ে পড়েন না। তিনি কোথাও পক্ষে থাকেন, কোথাও বা বিপক্ষে। কিন্তু সম্পূর্ণ জড়িয়ে পড়বার জন্যও তাঁর আরও দুটি ধর্মনিষ্ঠ প্রতিনিধি আছেন মহাভারতের সংসারের মধ্যে। একজন ভীষ্ম, অন্যজন বিদুর। প্রথম জন ব্যাসের সমসাময়িক, সম্পর্কে তিনি ভাই। সংসারে থেকেও তিনি সন্ন্যাসী। জীবনের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত তিনি নিষ্কামভাবে রাজধর্ম পালন করে গেলেন। চিরটাকাল তিনি ন্যায়-নীতি-ধর্মের পক্ষে দাঁড়িয়ে নিজের পুত্র-পৌত্র-প্রতিম ব্যক্তিদের দুবৃত্ততার বিরুদ্ধে আন্তরিক লড়াই করে গেলেন, কিন্তু যুদ্ধ করে প্রাণ দিলেন তাঁদেরই জন্য। অন্যদিকে বিদুর—তিনি মহাভারতের কবির আত্মজ পুত্র। ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি—ইত্যাদির দুরূহ অভিসন্ধিগুলি এমন নির্বিকারভাবে তিনি আত্মস্থ করেছিলেন যে কৌরব-সংসারের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থেকেও কোনও দিন তিনি লোভ, মোহ, ঈর্ষা, অসূয়ার বিকারে দীর্ণ হলেন না। সম্পূর্ণ মহাভারতের মধ্যে তিনি যে শুধু বিবেকের মতো মূর্তিমান হয়ে রইলেন, তাই নয়, ব্যাস তাঁকে আপন অন্তর এবং দেহ থেকে সৃষ্টি করেছেন ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের প্রতিনিধির মতো। যিনি নিজে ব্রাহ্মণের ঔরসে ধীবর-কন্যার সাঙ্কর্যে জন্মলাভ করেছিলেন, তিনি নিজের আর্য তেজ মিলিত করেছিলেন ভারতীয় জনতার প্রতিনিধি-স্বরূপিণী শূদ্রা-শক্তির সঙ্গে। বিদুর তাই একদিকে ধর্মস্বরূপ, অন্যদিকে রাজশক্তিকে তিনি চালিত করেন আম-জনতার ঔচিত্যবোধে।

মহাভারতে বিদুরের সর্বাতিশায়িনী প্রজ্ঞার কথা যেমন সিংহনাদ করে ঘোষণা করেছেন ব্যাস, তেমনই অসাধারণ দৃষ্টি ছিল তাঁর নারী চরিত্রগুলির ওপর। আজকাল যাঁরা অনেকেই মহাভারতের দ্রৌপদীকে আত্মকল্পে বঞ্চিত-নিপীড়িত মনে করে সমগ্র পুরুষ সমাজকে যুধিষ্ঠির-কল্প উদাসীন ভেবে যুক্তি চিৎকার প্রসারিত করেন, তাঁদের জানাই—চিৎকার করাটা অনেক সোজা এবং যুগোপযোগীও বটে। মহাভারত পড়াটা তার চেয়ে অনেক কঠিন এবং সেটা তার সামগ্রিকতায় বোঝা আরও অনেক অনেক কঠিন। অন্তত চিৎকার যাঁরা করেন তাঁরা মহাকাব্যের গভীর সামগ্রিকতা একটুও বোঝেন না—সেটা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি। যুধিষ্ঠিরের মতো মহাসত্ত্ব ধর্মবিক্রমী মানুষকে যাঁরা উদাসীন ধর্মধ্বজী বলে ভাবেন, তাঁরা মহাভারতের কবিকে কিছুই বোঝেন না এবং বুঝবেনও না। সবচেয়ে বড় কথা, কৌরবসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার জন্য যাঁরা যুধিষ্ঠিরকে পুরুষ সমাজের প্রতিনিধি ভেবে প্রস্ফুটিত নেত্রে চিৎকার করতে থাকেন, তাঁরা এটা বোঝেন না যে, ব্যাসই এই লাঞ্ছনার চিত্র

এঁকেছেন, কারণ মহাকাব্যের মধ্য দিয়ে সমাজকে প্রতিবিম্বিত করাই তাঁর কাজ।

ব্যাসও তো পুরুষ সমাজেরই প্রতিনিধি। মহাকাব্য লিখবার সময় তিনি তো নারীর এই অবমাননা চেপে যেতে পারতেন। তা হলে আর আজকের নারীবাদিনীরা পৌরুষেয়তার বিরুদ্ধে মহাভারতের রশদটুকু পেতেন কোথায়? নারীবাদিনীরা যেটা বুঝতে চান না, সেটা হল—মহাভারতের কালে নারীত্বের যে অবমাননা ঘটেছে—তার দোষ যতখানি যুধিষ্ঠিরের, তার থেকে অনেক বেশি তৎকালীন সমাজের। ব্যাস এই অবমাননা দেখানোর জন্য ধর্মমূর্তি যুধিষ্ঠিরকেও রেহাই দেননি। অন্যদিকে অন্যত্র এই দ্রৌপদী, এই কুন্তী অথবা গান্ধারী সত্যবতীর যে চরিত্রগুলি ব্যাস সমাজের রশদ দিয়ে পুষ্ট করেছেন, তাতে মহাভারতীয় রমণীদের যে ব্যক্তিত্ব এবং স্বাধীনতা প্রকাশিত হয়েছে, তা এককথায় মহাভারতীয় সমাজের উচ্চতা সূচনা করে—আজকে প্রগতিশালীরা সেসব না বুঝেই ব্যাস-যুধিষ্ঠিরকে গালমন্দ করেন।

যুধিষ্ঠির ভাল লোক না মন্দ লোক, তার বিচার যুধিষ্ঠিরের চরিত্রালোচনায় প্রকটিত হবে। কিন্তু আর্থ-সামাজিকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলেও এ কথা কি একবারও বলা যাবে যে, মহাভারতের কবির পক্ষপাত আছে দুর্যোধন-কর্ণের ওপর, অথবা তাঁর যোগসাজস আছে দুঃশাসন-শকুনির সঙ্গে। কিন্তু যে যুধিষ্ঠিরের ওপর কবির প্রত্যক্ষ পক্ষপাত আছে সেই যুধিষ্ঠিরও যখন পাশাখেলায় উন্মত্তের মতো আচরণ করলেন, তখন কবি বোঝাতে চাইলেন যে, নারীত্বের অবমাননায় যুধিষ্ঠিরের মতো ব্যক্তিও কখনও কখনও অসহায় হয়ে পড়েন। সমাজে যখন পশুশক্তির প্রাবল্য দেখা দেয়, তখন যুধিষ্ঠিরের ধীরতাও নষ্ট হয়ে যায়। এর জন্য যুধিষ্ঠির যতখানি দায়ী, তার চেয়ে অনেক বেশি দায়ী তাঁর অসহায়তা। ব্যাস-নির্দিষ্ট ধর্মের পরীক্ষা হয়ে যায় এখানেই। অবশ্য এত অল্প কথায় যুধিষ্ঠিরের ওপর বা মহাভারতের কবির ওপর অর্বাচীনের সমস্ত আক্ষেপগুলি মিটিয়ে দিতে পারব—এমন ভরসা করি না, তবে আজকাল উজানে চলে চমক সৃষ্টি করার প্রবণতা এত বেড়েছে তাতে এটা আমাকে বলতেই হবে যে, ব্যাসের মর্মসৃষ্ট চরিত্রগুলি যদি বুঝতেই হয়—বিশেষত ভীষ্ম, বিদুর এবং যুধিষ্ঠিরকে যদি বুঝতেই হয়, তবে তা বুঝতে হবে বৃহত্তর সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে এবং ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে, কেননা সেই ধর্মের জন্যই ব্যাস মুক্তি চাইলেন না, ব্রহ্মবাদী হতে চাইলেন না। বরঞ্চ বলা উচিত, সেই ধর্মের জন্যই ব্যাস মায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে ভারত-সংসারের মধ্যে প্রবেশ করে নিজের পুত্র-পৌত্রদের দৃষ্টান্তে ধর্মাধর্মের যৌক্তিকতা স্থাপন করলেন—মহাভারতের ইতিহাস রচনা করে।

আজকাল ধর্মের নতুন অর্থ বেরিয়েছে। নব নব পণ্ডিত এবং নব নব রাজনীতিকেরা নব-নবোন্মেষশালিতায় নব নব ধর্মের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। কিন্তু সেই সেকালের ব্যাস কতটা জীবনের ধর্মে বিশ্বাস করতেন, ধর্মের বোধেও তিনি কতটা বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ঋষি ছিলেন যে, মহাভারত রচনা করবার আগেই তিনি প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন—আমার এই মহাভারতকে শুধু যেন মুক্তিকামীর সাধন-গ্রন্থ মনে কোরো না—আমার মহাভারত তেমন লোকের কাছে যেমন অর্থশাস্ত্রও বটে, তেমনই বিশেষ জনের কাছে তা ধর্মশাস্ত্রও বটে। আমার মহাভারত কামশাস্ত্রও বটে, আবার তেমন দৃষ্টি দিয়ে বুঝলে আমার মহাভারত মোক্ষকামীর কাছে পরম মোক্ষশাস্ত্রও বটে। সত্যি বটে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের মিশেল দিয়ে কীভাবে মহাকাব্যের উপন্যাস রচনা করতে হয়, তা যে কালে, যে প্রাচীন সময়ে তিনি দেখিয়ে গেছেন, এ কালেও সেই মহাকাব্য অতিক্রম করার সাধ্য কারও নেই। অতএব জয় হোক সেই পরাশর ঋষির অন্তরজন্মা পুরুষের, জয় হোক সত্যবতীর হৃদয়ানন্দন ব্যাসের—জয়তি পরাশরসূনুঃ সত্যবতীহৃদয়-নন্দনো ব্যাসঃ।

ভীষ্ম

সংসারধর্মে তিতিবিরক্ত বীতশ্রদ্ধ একটি মানুষের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। তিনি বলছিলেন—আমি যদি ভীষ্মের মতো ইচ্ছামৃত্যু হতাম, তা হলে এখনই আমি মৃত্যুবরণ করতাম। যা দুঃখকষ্ট সইলাম এতদিন ধরে, যত আমার ভোগান্তি হল, তার জন্য কোনও সহানুভূতি তো পেলামই না, বরং উলটে নানা কটু কথা শুনি। কাজেই মরে যাওয়াটা যদি আমার হাতের মুঠোয় থাকত, তা হলে এখনই মরে যেতাম, মশাই!

বুঝলাম, ভদ্রলোকের সাংসারিক জ্বালাযন্ত্রণা প্রশ্নাতীত। সাময়িক কোনও উদ্দীপনা-উত্তেজনায় সে কষ্ট হয়তো আরও বেড়েছে। ভদ্রলোক সুইসাইড করতে চান না, কিন্তু ইচ্ছামৃত্যুর মতো নিশ্চিন্ত কোনও মসৃণ মরণ যদি তাঁর হাতে থাকত, তবে এইরকমই কোনও উত্তেজনার দিনে মরণকে শ্যাম-সমান বলে ডেকে নিতেন হয়তো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার বয়স কত, মশাই? ভদ্রলোক বললেন—এই ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশ। আমি বললাম—ইচ্ছামৃত্যু ব্যাপারটা বর না অভিশাপ, অনুগ্রহ না শাস্তি, সেটা বোঝা কিন্তু অত সহজ নয়। অথবা ইচ্ছামৃত্যু হাতের মুঠোয় থাকলে আপনি সত্যি হয়তো মরার কথা ভাবতেনও না, যেমন ভীষ্মও ভাবেননি এবং সেই অবস্থায় ইচ্ছামৃত্যু ব্যাপারটা কিন্তু সমাধানের থেকে সমস্যাই বেশি তৈরি করবে, যেমন ভীষ্মেরও করেছিল।

আমি আধুনিক কায়দায় একটু 'ডাটা' দিয়ে বললাম—আচ্ছা! কতকগুলি চূড়ান্ত সময়ের কথা স্মরণ করুন। পিতা শান্তনু যেদিন ভীষ্মের মতো উপযুক্ত পুত্র এবং উপযুক্ত উত্তরাধিকারী থাকা সত্ত্বেও সত্যবতীকে বিবাহ করতে চাইলেন এবং তাও চাইলেন ভীষ্মের মূল্যে, সেদিন নিশ্চয়ই ভীষ্মের মরতে ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তখনও তিনি ইচ্ছামৃত্যুর বর লাভ করেননি। কিন্তু ধরুন, যেদিন শান্তনুপুত্র চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্য মারা যাবার পর রাজমাতা সত্যবতী বিচিত্রবীর্যের বিধবা বউদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করার জন্য ভীষ্মকে অনুরোধ করলেন, সেদিন নিশ্চয়ই তাঁর মরতে ইচ্ছে হয়েছিল। আপন পিতার বিবাহ-কণ্ডূয়নের কারণে যাঁকে রাজ্য ত্যাগ করতে হল, সত্যবতীর পিতার শর্ত মেনে যেদিন তাঁকে যৌবনের সমস্ত সুখস্বপ্ন চুরমার করে দিতে হল, আজ তাঁকে বিবাহের অনুরোধ শুনতে হচ্ছে, পুত্রলাভের বায়না শুনতে হচ্ছে। তাও কার মুখে? যে সত্যবতীর জন্য তাঁকে এই ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল, সেই সত্যবতীই আজ স্বামী-পুত্র হারিয়ে নিরুপায় অবস্থায় বিখ্যাত ভরত-কুরুবংশের উত্তরাধিকার রক্ষার জন্য ভীষ্মকেই অনুরোধ করছেন। ভাগ্যের কী বিচিত্র পরিহাস! অথচ এই বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা হতে পারতেন ভীষ্মই। আমার জিজ্ঞাসা হয়, সত্যবতীর এই অনুরোধের সময় ভীষ্ম কি তাঁর ইচ্ছামৃত্যুর বরটুকু ব্যবহার করে চরম শোধ নিতে পারতেন না সত্যবতীর ওপর।

বলতে পারেন, এ সব মান-অভিমানের মাদকতা নিয়ে মৃত্যুবরণ করা যায় না। মৃত্যুর জন্য চাই সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা, অপমান যা একটি বড় মানুষকে পদে পদে দীর্ণক্লিষ্ট করে তোলে। আমার সম্মুখস্থিত ভদ্রলোকেরও তো সেই ক্লিষ্ট অবস্থা। কিন্তু ভদ্রলোককে আমি নিরাশ করতে বাধ্য হলাম। বললাম—দেখুন, ভীষ্ম পাণ্ডবদের রাজ্যের অধিকার দিতে বলেছিলেন ধৃতরাষ্ট্রকে। ধৃতরাষ্ট্র দেননি। তিনি ভরতবংশের সুচিরধৃত রাজ্যকে খণ্ডিত করে পাণ্ডবদের বাসস্থান দিয়েছিলেন খাণ্ডবপ্রস্থে। আমাদের জিজ্ঞাসা—ভীষ্মের মনের তখন কী অবস্থা হয়েছিল? মরতে ইচ্ছে হয়নি তো?

ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় পাশাখেলার যে আসর বসেছিল, কুলবধূ দ্রৌপদীর যে ঘোর অপমান হয়েছিল, তাতে পাণ্ডব-কৌরবের এক পিতামহ কী মানসিক অবস্থায় ছিলেন? তাঁর মরতে ইচ্ছে হয়নি তো?

যেদিন দুর্যোধনের অনন্ত প্রশ্রয় লাভ করে কর্ণ ভীষ্মকে বলেছিলেন—ইনি কুরুদের ঘরে খান, আর মঙ্গল চান পাণ্ডবদের—সেদিন মহামতি ভীষ্মের কেমন লেগেছিল? কর্ণের এই কথার প্রতিবাদও কেউ করেননি কুরুসভায়। ভীষ্মের কি মরতে ইচ্ছে করেনি সেদিন? দ্যুতক্রীড়ায় পরাজিত পাণ্ডবদের বনবাস হল যেদিন, সেদিন এই ভীষ্মের মানসিক যন্ত্রণা কোন চূড়ান্ত বিন্দুতে পৌঁছেছিল? তাঁর কি বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হয়েছিল?

বনবাস, অজ্ঞাতবাসের পর ভীষ্ম যে কতবার ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন পাণ্ডবদের প্রাপ্য রাজ্যাধিকার ফিরিয়ে দিতে, ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধন তাঁর কথা কানেও তোলেননি। কেমন লেগেছিল ভীষ্মের? তাঁর কি আরও বেঁচে থাকার ইচ্ছে ছিল? তারপর অন্তিম পর্যায়ে সেই ভয়ংকর যুদ্ধ আরম্ভ হল। সে যুদ্ধে ভাই ভাইকে মারছে, শিষ্য গুরুকে মারছে, পিতৃস্থানীয়রা পুত্রস্থানীয়দের মারছে, নাতি-ঠাকুরদা পরস্পরে একে অন্যের শরীরে অস্ত্রাঘাত করছে। যুদ্ধের এই ভয়ংকর পরিণতির কথা ভেবে কেমন লেগেছিল ভীষ্মের? তাঁর কি খুব বাঁচতে ইচ্ছে করেছিল?

মৃত্যুকামী ভদ্রলোককে বলেছিলাম—এইরকম আরও কিছু ঘটনা আমরা ভীষ্মের জীবন থেকে উল্লেখ করতে পারি। স্বাভাবিক এবং নির্দিষ্ট আয়ু নিয়ে তিনি যদি বাঁচতেন তবে অনেক আগেই তাঁর মৃত্যু হতে পারত। কিন্তু ইচ্ছামৃত্যু যার হাতের মুঠোয় থাকে, সে কিছুতেই নিজে মরতে চায় না। এক একটি ঘটনা দুর্ঘটনা ঘটে, ঘটে যায়, আর তখনই তার মনে হয়—এর পরের ঘটনাটি বুঝি আশাপ্রদ হলেও হতে পারে। এমন দুর্ঘটনা, এমন অন্যায় বোধহয় আর হবে না কোনও দিন। অন্যায় তবু ঘটেই চলে, দুর্ঘটনাও ঘটে চলে তারই পূর্বনির্দিষ্ট পথ ধরে। যন্ত্রণায় দীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধ তবু বেঁচে থাকেন সমস্ত শুভৈষণা নিয়ে। ভাবেন —আর নিশ্চয় এমনটি হবে না, সমাধান এবার আসবে।

বস্তুত সবচেয়ে খারাপ দুর্ঘটনা, যতক্ষণ পর্যন্ত না ইচ্ছামরণ ভীষ্মের মৃত্যু ঘটায়, ভীষ্ম ততক্ষণই মৃত্যুকে হাতের মুঠোয় নিয়ে বসেই থাকেন। স্বেচ্ছামৃত্যুর স্বাধীন উপায় কিছুতেই তাঁর পক্ষে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। নব নব আশা দুরাশার নব নব বন্ধন শ্রান্ত ক্লান্ত বৃদ্ধকে বাঁচতে সাহায্য করে এবং কী আশ্চর্য, যতক্ষণ না মৃত্যুর সেই বলাৎকার ঘনিয়ে আসে, ততক্ষণ ভীষ্ম বেঁচেই থাকেন। কাজেই ইচ্ছামৃত্যু হাতের মুঠোয় থাকলেও সেই ইচ্ছামৃত্যুকে কাজে লাগিয়ে যখন তখন মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া যেখানে ভীষ্মের মতো মহামতি পুরুষের পক্ষেই সম্ভব হয় না, সেখানে অন্য সাধারণ জনের কথা কী বলব? এবং ঠিক এই নিরিখেই ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু সত্যিই কোনও মধুর আশীর্বাদ কি না, তা আমাদের ভাবনার বিষয় হয়ে ওঠে।

অথচ এই আশীর্বাদ ভীষ্মকে দিয়েছিলেন তাঁর পিতা। পিতা শান্তনু। ভীষ্মের আত্মত্যাগে পরম প্রীত হয়ে, পিতার কারণে পুত্রের অসাধারণ ত্যাগ প্রতিজ্ঞায় মুগ্ধ হয়ে পিতা শান্তনু ভীষ্মকে স্বেচ্ছামৃত্যুর বর দিয়েছিলেন এবং সেই বরই তাঁর জীবনে এমন এক কাঁটা হয়ে রইল যে, জীবনের বিভিন্ন সময়ে—যখন তাঁর মরা উচিত ছিল, তখনও তিনি বেঁচে রইলেন ভরত-কুরুবংশের সাক্ষি-চৈতন্যের মতো, বিবেকের মতো। আপন পিতার কামনাবৃত্তি তুষ্ট করার জন্য পুত্রের এই বেঁচে থাকাটা যে কত কষ্টকর, তা মহারাজ শান্তনু কী করে বুঝবেন! অথচ যেদিন তিনি এই পুত্রের জীবনের জন্য এক রমণীর পায়ে ধরেছিলেন প্রায়, সেদিন তো এমন করে তিনি ভাবেননি যে, তাঁর পরম প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র অন্তহীন শুষ্ক কতকগুলি দায়িত্ব পালন করার জন্য একটি লম্বা জীবন নিয়ে বেঁচে থাকবেন শুধু। অথবা এর নামও জীবন, পৃথিবীর বৃদ্ধতম মানুষের জীবন-প্রতীক এক করুণ জীবন।

ভীষ্মের জীবনকথা আরম্ভ করতে গেলে আমাদের একটু আগে থেকে আরম্ভ করতে হবে। যে পিতার আশীর্বাদে তিনি ইচ্ছামৃত্যু, সেই পিতার কথাও ভীষ্মের প্রসঙ্গ ধরে সামান্য জানাতে হবে, এমনকী অতি সামান্য করে হলেও ভীষ্মের ঠাকুরদাদা মহারাজ প্রতীপের কথাও একটু জানাতে হবে। মহামতি ভীষ্মের জন্মসূত্র তাঁর ঠাকুরদাদা প্রতীপের সঙ্গে একভাবে আবদ্ধ বলেই আমাদের আরম্ভ করতে হচ্ছে একেবারে সেখান থেকেই। আমরা তাঁর রাজকীয় জীবনের একান্ত বিস্তারের মধ্যে প্রবেশ করব না, কিন্তু যে মুহূর্তে মহারাজ প্রতীপকে আমাদের প্রয়োজন, ঠিক সেই মুহূর্তে প্রতীপ হস্তিনাপুরীতে নেই। তিনি রাজধানীর বাইরে।

মহারাজ প্রতীপ, ভরত-কুরুর মতো বিখ্যাত রাজবংশের শেষ জাতক মহারাজ প্রতীপ হস্তিনাপুরের রাজা। তিনি হস্তিনাপুরী ছেড়ে গঙ্গাদ্বারে এসেছেন। ‘গঙ্গাদ্বার’ জায়গাটাকে পণ্ডিত সজ্জনেরা অনেকেই হরদ্বার বা হরিদ্বার বলেও চিহ্নিত করেন এবং কে না জানে এই জায়গাটির প্রাকৃতিক শোভা অতি মনোরম। হয়তো মহারাজ প্রতীপ হৃদয় বিনোদনের জন্য এখানে এসেছেন, হয়তো বা ধর্মকর্মের জন্য। মহাভারত বলেছে—মহারাজ প্রতীপ বেশ কয়েক বছর রয়ে গেলেন গঙ্গাদ্বারে। স্নানআহ্নিক সেরে তিনি গঙ্গার তীরে এসে বসেন, মন্ত্র জপ করেন, আর প্রবাহিণী গঙ্গার শোভা দর্শন করেন—নিষসাদ সমা বহ্বীর্গঙ্গাদ্বারগতো জপন্।

বেশ বোঝা যায়, নদী-নগরীর নির্জনতা মহারাজ প্রতীপের মনে ঐশ্বরিক অনুভব এনে দেয়। মনোহারিণী প্রকৃতি তাঁকে এতটাই আকুল করে তুলেছে যে, তিনি এই জায়গা ছেড়ে যেতে পারছেন না। হস্তিনাপুরের রাজকীয় ভোগবিলাস ছেড়ে জপধ্যানের মুগ্ধতায় তিনি প্রসন্ন দিবস কাটিয়ে চলেছেন গঙ্গাদ্বারে। আর ঠিক এইরকমই এক আকুল বৈরাগ্যমুখর দিনে হঠাৎই এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটল।

সেদিনও তিনি গঙ্গার তীরে বসে আছেন। সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে হরজটাভ্রষ্টা গঙ্গা, জটামুক্তির প্রথম আস্বাদনে আপ্লুতা। হঠাৎই এক অপূর্বদর্শনা রমণী মহারাজ প্রতীপের রূপে গুণে মুগ্ধ হয়ে শীতল তরল জলের মাঝখান থেকে উঠে এল। প্রবাহিণী গঙ্গা মনুষ্য-রমণীর রূপ ধারণ করে জল থেকে উঠে এলেন। তিনি নদী থেকে নায়িকা হলেন। যাঁর রূপ দেখলে পুরুষের হৃদয় টলে, শরীর উদ্বেলিত হয়, তিনি জল থেকে উঠে এলেন। নদী নায়িকা গঙ্গা—উত্তীর্য সলিলাত্তস্মাল্ লোভনীয়তমাকৃতিঃ।

সংস্কৃত সাহিত্যে অচেতনা নদীর মধ্যে সচেতনা রমণীর আবিষ্কার নতুন কোনও ঘটনা নয়। বিশেষত যে নদী উচ্ছল তরঙ্গভঙ্গে প্রবাহিণী, তাঁর মধ্যে উচ্ছলা রমণীর চলা হাসা এবং তার অপরূপ ভাববিভঙ্গের সাযুজ্য কল্পনা করে সংস্কৃত কবিরা অসাধারণ রসসৃষ্টি করেছেন। কালিদাসের লেখনীতে নদী-নায়িকারা সমুদ্র-নায়কের সঙ্গে মিলিত হবার সময় লজ্জার মাথা খেয়ে ‘স্বয়ং তরঙ্গাধরদান-দক্ষ’ সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। অন্যদিকে উপল-ব্যথিতগতি বেত্রবতী নদীর মধ্যে যখন জলের ঘূর্ণি তৈরি হয়, তখন সেই ঘূর্ণির মধ্যে রমণী-শরীরের অন্তর্গত নাভিমূল আবিষ্কার করেই ক্ষান্ত হননি কালিদাস, তিনি তাঁর সখাসম মেঘকে পরামর্শ দিয়েছেন—যাতে সে অলকাযাত্রার পথে ক্ষণেক দাঁড়িয়ে সেই প্রকটিত নাভিমূল একবারটি হলেও দেখে যায়। কাজেই কবিকল্পনার জগতে চঞ্চল নদী-দেহের সঙ্গে উচ্ছল রমণী-শরীরের কোনও তফাত নেই। আর আজ থেকে বিশ বছর আগেও যাঁরা গঙ্গাদ্বারে অথবা হরিদ্বারে আমাদের এই নদী নায়িকাকে দেখেছেন, তাঁরা বুঝবেন যে, এই নদীর ওপর রমণী-শরীরের আরোপণ কতটা যুক্তিযুক্ত।

যাই হোক, আমরা কিন্তু শুধু এই কবিকল্পের মাধ্যমেই মনুষ্যরূপিণী নদী-নায়িকার রূপ বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হব না। কারণ রমণীর রূপ তো স্পর্শমাত্র গভীর এক উষ্ণ অনুভূতি, কিন্তু তার হাবভাব এবং মানসিকতা দেখে আমাদের কিছু গম্ভীর বিচার করতে হবে। কেন না এই নদী-নায়িকার সঙ্গে মহামতি ভীষ্মের সম্বন্ধ ঘটবে ভবিষ্যতে।

আপাতত এই রমণী জল থেকে উঠেই আপন বিলোভন প্রক্রিয়ায় মহারাজ প্রতীপকে যে একেবারে মোহিত করে তুললেন, তা মোটেই নয়। তিনি এতটুকুও ভণিতা না করে মহারাজ প্রতীপের শালবৃক্ষসম দক্ষিণ ঊরুর ওপর বসে পড়লেন—দক্ষিণং শাল-সঙ্কাশম্ ঊরুং ভেজে শুভাননা।

মহারাজ প্রতীপের বয়স হয়েছে। যৌবনের উত্তেজনায় এক অজ্ঞাতকুলশীলা রমণীর আত্মনিবেদন মাত্রেই তিনি উৎসুক হয়ে ধরা দেবেন, এমন বয়স তাঁর নেই। অতএব নদী-নায়িকার উষ্ণ আলিঙ্গনে তিনি আকুলিত হলেন না। তিনি বিচলিত হলেন না, বরং একটু গম্ভীর হলেন। মুখে বললেন—কল্যাণী! কী করতে পারি তোমার জন্য? কী তোমার ইচ্ছে, খুলে বলো দেখি—করোমি কিন্নু কল্যাণি প্রিয়ং যত্তে'ভিকাঙ্ক্ষিতম্? প্রতীপের সম্বোধনটুকু খেয়াল করেছেন নিশ্চয়ই। সমান আবেগে আপ্লুত হলে প্রতীপ এই রমণীকে 'রম্ভোরু' কিংবা 'পীনস্তনী' বলে সম্বোধন করতেন। কিন্তু 'কল্যাণী'! কল্যাণী সম্বোধনে কাকে ডাকা যায়? মেয়েকে, পুত্রবধূকে, স্নেহাস্পদকে।

প্রতীপের কথা শুনে নদী-নায়িকা জাহ্নবী একটুও দ্বিধাগ্রস্ত হলেন না। তিনি বললেন—মহারাজ! তুমি কুরুবংশের শ্রেষ্ঠতম পুরুষ। আমি তোমাকে আমার ঈপ্সিততম নায়ক হিসেবে পেতে চাই। আর জান তো—কোনও রমণী যদি স্বেচ্ছায় মিলনেচ্ছা প্রকাশ করে, তবে তাকে প্রত্যাখ্যান করাটা মোটেই ভদ্রলোকের কাজ নয়—ত্যাগঃ কামবতীনাং হি স্ত্রীণাং সদ্ভির্বিগর্হিতঃ। রমণীর প্রগল্ভতায় মহারাজ প্রতীপ একটুও বিচলিত না হয়ে বললেন—তোমাকে ভাল লেগেছে বলেই আমি পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হব এবং এক অসবর্ণা রমণীকে বিবাহ করে বসব—এ হঠকারিতা আমার দ্বারা হবে না। হলেও সেটা যে অধর্ম হবে, কল্যাণী—ন চাসবর্ণাং কল্যাণি ধর্ম্যং তদ্ধি ব্রতং মম।

মাত্র দুটি শব্দ, মহারাজ প্রতীপের প্রত্যাখ্যানের মধ্যে মাত্র দুটি শব্দ—'পরস্ত্রী' এবং 'অসবর্ণা'—এই দুটি শব্দ শুনলেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, সমাগতা রমণী কোনও নদীও নন অথবা অলৌকিক ভাবসম্পন্না কোনও দেবীও নন। জাতিবর্ণের হিসেব করলে হয়তো এই রমণী মহারাজ প্রতীপের তুলনায় কিছু হীনই বটে। নইলে নিজের থেকে উচ্চতর বর্ণ হলে অসবর্ণার গ্লানি অনুভব করতেন না মহারাজ প্রতীপ। উচ্চতর বর্ণের অনুক্রমে এই রমণী ব্রাহ্মণী হয়ে থাকলে অথবা দেবী হয়ে থাকলে প্রতীপের ভাষার শব্দরাশি অন্যরকম হত। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের প্রতিলোম সংসৃষ্টি জগতে যত অন্যায়ই ঘটাক, কন্যা ব্রাহ্মণী এবং বর ক্ষত্রিয় হলে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ব্রাহ্মণীকে উপেক্ষা করা যে কত কঠিন, তা পুরাকালে দেবযানীর সঙ্গে মহারাজ যযাতির পূর্বরাগ এবং বিবাহের সময়েই দেখা গেছে।

কাজেই জল থেকে উঠে আসা এই সুন্দরী রমণীকে আমরা দেবীও বলব না, নদীও বলব না। জাতিকুলের মাত্রায় তিনি কিঞ্চিৎ হীনও বটেন, যে হীনতা হস্তিনাপুরের রাজার কাছে তেমন আদরণীয় নয়। তা ছাড়া তিনি যে এই 'পরস্ত্রী' কথাটা ব্যবহার করেছেন, তাতে বোঝা যায় যে, এই রমণী সাধারণী অর্থাৎ 'পর' বা অন্য পুরুষের দ্বারা তিনি পূর্বাহ্নেই উপগতা। এই 'পর' বা অন্য পুরুষটি যে কে, রাজাও তাঁর ঠিকানা জানেন না; তাঁর গোত্র-প্রবরও জানেন না এবং হয়তো রাজা সে সব পরিচয় জানতেও চান না। জানলে যদি নিজেই বিব্রত বোধ করেন! কাজেই এই অজ্ঞাতকুলশীলা রমণী যখন দ্বিধাদ্বন্দ্বহীনভাবে হঠাৎই তাঁর দক্ষিণ

ঊরুদেশ স্পর্শ করে বিবাহের প্রস্তাব করল, তখন মহারাজ প্রতীপ খানিকটা অপ্রতিভ বোধ করলেন। আর সেই জন্যই তাঁর বিমূঢ় মুখখানিতে যে শব্দরাশি উচ্চারিত হল, তার মধ্যে প্রত্যাখ্যানের কাঠিন্য যতখানি, তার থেকে বেশি হয়ে উঠল তাচ্ছিল্য—জাতিবর্ণ ঠিক নেই, কার না কার বউ-ঝি হবে—তাকে কি আমার বিয়ে করা মানায়—নাহং পরস্ত্রিয়ং কামাদ্ গচ্ছেয়ং বরবর্ণিনি।

প্রতীপের মুখে এমন তাচ্ছিল্যভরা কথা শুনে সপ্রতিভভাবে রমণী বললেন—কেন? আমি কি দেখতে এতই খারাপ! কোনও দুর্লক্ষণও তো নেই আমার শরীরে—উঁচু কপাল কী খড়ম-পা, চুল নেই অথবা পুরুষমানুষের মতো রোম আছে—এসব তো আমার কিছুই নেই। আর অসবর্ণা বলে কি আমি অগম্যা হলাম নাকি। কাজেই অমন করে তাচ্ছিল্য কোরো না, রাজা —নাশ্রেয়স্যাস্মি নাগম্যা ন বক্তব্যা চ কর্হিচিৎ। আমি রীতিমতন সুন্দরী এক দিব্যা রমণী। সবচেয়ে বড় কথা—সেই সুন্দরী রমণী তোমাকে ভালবেসে চাইছে, অতএব তুমিও তাকে ভালবেসে চাইবে, এ তো সোজা হিসেব—ভজন্তীং ভজ মাং রাজন্ দিব্যাং কন্যাং বরস্ত্রিয়ম্।

মহারাজ প্রতীপ মোটেই স্বচ্ছন্দ বোধ করলেন না। তাঁর এই পশ্চিমে ঢলে-পড়া বয়সে এক সুন্দরী রমণী এসে পা জড়িয়ে ধরে বসে রইল—এই আত্মনিবেদন ফিরিয়ে দেওয়া কঠিন। অন্যদিকে হস্তিনাপুরের পাটরানির মুখখানি মাথায় রেখে, নিজের প্রৌঢ় বয়সের কথা মাথায় রেখে প্রতীপ এবার রমণীকে একটু প্রশ্রয় দিয়েই গম্ভীরভাবে বললেন—শুধু ভাল লাগার জন্য যে কাজ তুমি করতে বলছ, সেই ভাল লাগার বয়স আমি পেরিয়ে এসেছি, কন্যে—মমাতিবৃত্তমেতত্তু যন্মাং চোদয়সি প্রিয়ম্। আমার এই বয়সে তোমাকে যদি এখন আমি বিয়ে করে বসি, সে বড় অধর্ম হবে।

প্রতীপ এবার একটু কৌশল করে বললেন—তার চেয়ে একটা ভাল কথা বলি শোনো। তুমি কিনা জল থেকে উঠে এসেই আমার ডান ঊরুদেশের ওপর বসে পড়লে। তা পুরুষের ডান ঊরুটি কাদের বসার আসন জান? আত্মজ পুত্র আর পুত্রবধূকে আদর করে বসাতে হয় ডান ঊরুতে—অপত্যানাং স্নুষাণাঞ্চ ভীরু বিদ্ধ্যেতদাসনম্। আর তুমি কিনা বোকার মতো আমার বাম ঊরুটি বাদ দিয়ে বসলে গিয়ে আমার দক্ষিণ ঊরুদেশে। যাক সে কথা, যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন আর কোনও উপায় নেই। তবে তুমি যদি আমার পুত্রবধূ হতে চাও, তা হলে সেই সম্মানটুকু অন্তত আমি তোমাকে দিতেই পারি। আমার দক্ষিণ ঊরুদেশে উপবেশন করে তুমি আমার পুত্রবধূর স্নেহ লাভ করেছ জেনো। অতএব আমার পুত্রের জন্য তোমাকে আমি বন্ধু হিসেবে বরণ করছি, কন্যে—স্নুষা মে ভব কল্যাণি পুত্রার্থং ত্বাং বৃণোম্যহম্।

নদী-নায়িকা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। বললেন—তবে তাই হোক মহারাজ! তাই হোক। তোমাকে দেখেই আমি মনে মনে প্রখ্যাত ভরতবংশের বধূ হবার কামনা করেছি—ত্বদ্‌ভক্ত্যা তু ভজিষ্যামি প্রখ্যাতং ভরতং কুলম্। পৃথিবীতে যত রাজা আছেন, তোমরা হলে তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শত বৎসর ধরে গান গাইলেও তোমাদের গুণের কথা শেষ হবে না। আশা করি, তুমি তোমার পুত্রের হয়ে যে কথা দিলে, সে কথা তোমার ছেলে ফেলবে না অথবা বৃথা তর্ক বিচার করে সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে না—তৎ সর্বমেব পুত্রস্তে ন মীমাংসেত কর্হিচিৎ। মহারাজ প্রতীপ ভরতবংশের বধূমর্যাদাপ্রার্থিনী নদী-নায়িকার কাছে পুত্রের জন্য বাগদত্ত হয়ে রইলেন।

এই ঘটনার পর মহাভারতের কবি অলৌকিক কল্পনা আশ্রয় করে পুত্রের জন্য প্রতীপের সস্ত্রীক তপস্যা বর্ণনা করেছেন। তপস্যার ফলে প্রতীপের পুত্রও জন্মাল। তাঁর নাম শান্তনু। তারপর শান্তনু বড় হয়ে যৌবনে পদার্পণ করলে প্রতীপ তাঁকে সেই অপরিচিতা রমণীর কথা বলে তাকে বিয়ে করার কথা বললেন। সত্যি কথা বলি, আমরা এইসব কল্প কাহিনীতে তেমন

করে বিশ্বাস নাও রাখতে পারি। বস্তুত এক যৌবনবতী রমণী যার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য অপেক্ষা করছে, তার জন্ম হবে, বয়স হবে, বিয়ে হবে—এসব পুরাকল্প আধুনিকের মন দ্বিধাগ্রস্ত করে। আপনারা তো জানেন যে, শুধু ভীষ্ম জন্মাবেন, এবং বহুদিন বেঁচে থাকবেন বলেই শান্তনুর জীবনে আরও অন্তত দুটি কাহিনীর 'কবিকল্প' ব্যবহার করতে হয়েছে। একটি মহাভিষ রাজার কাহিনী, অন্যটি অষ্টবসুর উপাখ্যান।

মহাভিষ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা ছিলেন এবং একসময়ে তিনি গিয়েছিলেন ভগবান ব্রহ্মার সঙ্গে দেখা করতে। সেই ব্রহ্মসভায় দেবতারাও এসেছিলেন। এসেছিলেন নদী-নায়িকা গঙ্গাও। কীসের থেকে কী হল, উতলা বাতাসে সুন্দরী গঙ্গার আবরণবস্ত্রখানি উড়ে গেল। অবস্থা দেখে দেবতারা সব লজ্জায় মাথা নিচু করলেন। কিন্তু মহাভিষ রাজা—কী করবেন, হাজার হলেও মানুষ তো—তিনি হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন অসংবৃতা গঙ্গার দিকে। ব্রহ্মা মহাভিষ রাজার এই নির্লজ্জ আচরণ দেখে পুনরায় মর্তলোকে জন্মানোর অভিশাপ দিলেন।

পিতামহের অভিশাপ শুনে মহাভিষ রাজা অনেক ভেবে ঠিক করলেন যে, তিনি কুরুবংশীয় রাজা প্রতীপের পুত্র হয়েই জন্মাবেন। নদী-নায়িকা গঙ্গা কিন্তু অভিশাপ শুনেও মহাভিষ রাজার কথা চিন্তা করতে করতেই স্বস্থানে ফিরে গেলেন।

আমরা কিন্তু এই অভিশপ্ত ঘটনার মধ্যেই মহারাজ শান্তনুর প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছি। বস্তুত, ব্রহ্মার ওই অভিশাপের কথা এবং পরবর্তীকালে অষ্টবসুরা নিজেদের অভিশাপ মুক্তির জন্য যেভাবে গঙ্গার কাছে তাঁদের মাতৃত্ব স্বীকার করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন—এই দুটি কাহিনীই আমাদের কাছে অলৌকিক মাত্রায় চিহ্নিত, আর ঠিক সেই জন্যই এই কাহিনী আমাদের কাছে তত আদরণীয় নয়। মহারাজ প্রতীপের সঙ্গে যখন তথাকথিত গঙ্গার দেখা হয়েছে, তখনও তাঁর পুত্র শান্তনুর জন্ম হয়নি, একথা আমাদের তেমন বিশ্বাস হতে চায় না। খুব বেশি হলে যতটুকু হতে পারে যে, শান্তনু তখনও রাজা হননি।

বরঞ্চ শান্তনুর ওপর তথাকথিত ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহাভিষের ছবিটি 'সুপার ইমপোজ' করলে দেখা যাবে—অসংবৃতবসনা যৌবনবতী গঙ্গার রূপে মুগ্ধ হয়ে শান্তনু তাঁর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন। কোনও স্বর্গলোকে বা ব্রহ্মলোকে নয়, এই মর্তলোকেই মর্তবাসিনী এক অজ্ঞাতকুলশীলা রমণীর রূপে মুগ্ধ হয়ে শান্তনু দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন নির্জন নদীতীরে। হয়তো রমণীর কুলশীলের কথা চিন্তা করে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর সঙ্গ কামনা করতে দ্বিধা করেছেন এবং কেন দ্বিধা করেছেন, সে কথায় পরে আসছি। তবে মহাভিষের রূপকল্পটি মনে রেখে যদি গঙ্গার অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করি, তা হলে বলাই যায় যে, আসলে মহাভিষরূপী শান্তনুর ধৈর্যচ্যুতি দেখে তাঁরই কথা চিন্তা করতে করতে গঙ্গা তাঁর নিজ আবাসে ফিরে গিয়েছিলেন সেদিন—তমেব মনসা ধ্যায়ন্ত্যপাবর্তৎ সরিদ্‌বরা।

নির্জন গঙ্গাতীরে ভরতবংশের এক প্রসিদ্ধ জাতককে ওইভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে নদী-নায়িকা গঙ্গা তখনকার মতো লজ্জা পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেইদিনই তাঁর সিদ্ধান্ত ঠিক হয়ে যায় যে, তিনি ভরতবংশের কুলবধূ হবেন। হয়তো সেই কারণেই—আমরা অন্তত তাই বিশ্বাস করি—হয়তো সেই কারণেই, তিনি যেদিন প্রথম শান্তনুপিতা প্রতীপকে দেখতে পেলেন, সেদিনই তাঁর দক্ষিণ পা-খানি জড়িয়ে ধরেছিলেন। এটা তাঁর বোকামি না, স্বেচ্ছাশ্রিত বুদ্ধি। শান্তনুকে প্রিয়তম হিসেবে পাবার জন্যই হয়তো এই কুটিল বিহ্বল ইচ্ছাকৃত আচরণ।

আমরা জানি, মহারাজ প্রতীপ এই অজ্ঞাতকুলশীলা রমণীকে পুত্রবধূর মর্যাদা দিয়েছেন। রমণী মহারাজ প্রতীপের কাছে সানুরোধে বলেছেন—তুমি তোমার পুত্রের হয়ে কথা দিয়েছ, তিনি যেন তোমার কথা না ঠেলেন—তৎসর্বমেব পুত্রস্তে ন মীমাংসেত কর্হিচিৎ। প্রতীপ এই

অজ্ঞাতকুলশীলা রমণীর কথা সস্নেহে মনে রেখেছেন এবং হস্তিনাপুরে ফিরে এসে পুত্রকে তিনি বলেও ছিলেন—কোনওদিন যদি গঙ্গাদ্বারবাসিনী এক সুন্দরী রমণী তোমার প্রণয়প্রার্থিণী হয়ে তোমাকে কামনা করে—ত্বমাব্রজেদ্ যদি রহঃ সা পুত্র বরবর্ণিনী—তবে যেন তুমি তাকে প্রত্যাখ্যান করো না। তাকে যেন তুমি জিজ্ঞাসা কোরো না—তুমি কে, কার মেয়ে ইত্যাদি। আমার আদেশে তুমি সেই অনুরক্তা রমণীর ইচ্ছাপূরণ করো। সে যা করতে চায়, তাতে তুমি বাধা দিয়ো না। মহারাজ প্রতীপ এই কথা বলে পুত্র শান্তনুকে নিজের রাজ্যে অভিষিক্ত করে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করলেন—স্বে চ রাজ্যে অভিষিচ্যৈনং বরং রাজা বিবেশ হ।

ঘটনাগুলি যখন এইভাবে বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে, তখনই বোঝা যায় ভারতবর্ষের প্রাণদায়িনী গঙ্গাকে আর্যসভ্যতার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য কী আকুল চেষ্টা করেছেন মহাভারতের কবি। তার জন্য ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহাভিষের কাহিনী, অষ্টবসুর কাহিনী সব জুড়ে দিতে হয়েছে এবং তা জুড়তে হয়েছে প্রধানত ভরতবংশের ধুরন্ধর মহামতি ভীষ্মের জননীকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য। বাস্তবে সেই অজ্ঞাতকুলশীলা রমণীর সামাজিক প্রতিষ্ঠা তত ছিল না বলেই হয়তো অত শত অভিশাপ কাহিনীর পরম্পরা, মহাভিষ এবং অষ্টবসুর রূপক আখ্যান।

হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনে মহারাজ শান্তনুর উত্তরাধিকার নিয়ে গণ্ডগোল ছিল। কারণ তিনি ছিলেন মহারাজ প্রতীপের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। শান্তনুর বড় দাদা দেবাপি রাজা না হয়ে মুনিবৃত্তি অবলম্বন করেন। তাঁর মেজদাদা বাহ্লীকও তাঁর মাতুলবংশের উত্তরাধিকারে রাজা হন অন্যত্র। অতএব শেষপর্যন্ত হস্তিনাপুরে রাজা হন শান্তনু। মহারাজ যযাতির বংশে কনিষ্ঠের রাজা হওয়াটা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। যোগ্যতম ব্যক্তি হিসেবেই যে তিনি সিংহাসনের অধিকার পেয়েছিলেন, সেকথা আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি।

জ্যেষ্ঠ দেবাপি বা মধ্যম বাহ্লীক রাজ্য না পাওয়ায় মহারাজ প্রতীপের অন্তরে কোনও দুঃখ হয়েছিল কি না, মহাভারতের কবি তা স্বকণ্ঠে উচ্চারণ করেননি; কিন্তু, অজ্ঞাতকুলশীলা সেই রমণীকে মহারাজ প্রতীপ যে কথা দিয়েছিলেন, তা সর্বক্ষণ জাগরূক ছিল শান্তনুর মনে। তাঁর মনে ছিল পিতাঠাকুরের অনুরোধ-আদেশ—পরমাসুন্দরী এক রমণী তোমার কাছে বিবাহের যাচনা নিয়ে আসবে। তুমি তার পরিচয় জিজ্ঞাসা কোরো না বা তার কোনও কাজে বাধাও দিয়ো না। আমার আদেশে তুমি সেই রমণীর ইচ্ছাপূরণ কোরো—মন্নিয়োগাদ্ ভজন্তীং তাং ভজেথা ইত্যুবাচ তম্।

আমাদের ধারণা—শান্তনু তখন সদ্যই রাজা হয়েছেন, এবং রাজা হয়েছেন বলে মনে পরম শান্তি আসায় তিনি কিছুদিন মৃগয়া করে দিন কাটাবার পরিকল্পনা করলেন। মৃগয়ার বিলাসটুকু শান্তনুর স্বভাবের মধ্যে ছিল এবং অন্তত এইবার মৃগয়ায় যাবার পিছনে তাঁর কিছু গোপন উদ্দেশ্যও থেকে থাকবে হয়তো। যাই হোক, মৃগয়া চলতে লাগল রাজার ইচ্ছামতো। তারপর একদিন স্বেচ্ছাবিহারী রাজা চললেন গঙ্গার তীর বেয়ে। একাকী, ধনুক বাণ হাতে। কোনও বনহরিণীর শরীর এবং হৃদয় সন্ধান করার লক্ষ্য রেখে। সত্যি কথা বলতে কী, লক্ষ্যবস্তু তাঁর আগে থেকেই জানা ছিল। অতএব জায়গামতো এসে পৌঁছোতে কোনও অসুবিধা হল না তাঁর।

একাকী যেতে যেতে, সেই অপূর্বদর্শন রমণীর দেখা মিলল। তাঁর রূপে গঙ্গার তীর আলো হয়ে গেছে। মনোহরণ শরীরে অলংকারের শোভা, পরিধানের বস্ত্র কিছু সূক্ষ্ম, গায়ের রং পদ্মকোষের মতো গৌরাভ। শান্তনুর শরীর রোমাঞ্চিত হল। ভাবলেন বুঝি—এমন এক রূপসীর প্রেমে ধরা দেবার জন্য পিতাঠাকুরের আদেশের কোনও প্রয়োজন ছিল না। মুগ্ধ হয়ে এমনভাবেই তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলেন শান্তনু যেন মনে হচ্ছিল—চোখ দিয়ে তিনি পান

করছিলেন রমণী-শরীরের প্রত্যঙ্গ রূপ-রস। অন্যদিকে সেই রমণীর মুগ্ধতাও কিছু কম চোখে পড়ল না। হস্তিনাপুরের রাজাকে দেখে অনুরাগে এতটাই তিনি উদ্বেল যে, বিলাসিনী রমণীর মতো তিনিও রাজার দিকে তাকিয়ে ছিলেন সপ্রণয় দৃষ্টিতে। বস্তুত, ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহাভিষের মুগ্ধতার ছবিটি এইখানেই শান্তনুর ওপর সুপার-ইমপোজ করতে হবে।

মহারাজ শান্তনু আর দেরি করলেন না। মৃগয়ার কারণে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়েছেন, অতএব মৃগ্যবস্তুর দর্শন-মুগ্ধতা কাটতেই তিনি বাক্য-সন্ধান করলেন—তুমি দেবী না মানবী? গন্ধর্বী না অপ্সরা? তুমি যে হও সে হও, তোমাকে আমার স্ত্রী হিসেবে বরণ করতে চাই আমি—যাচে ত্বং সুরগর্ভাভে ভার্যা মে ভব শোভনে। রমণী এককথায় রাজি হলেন, কিন্তু একটা শর্তও দিলেন সঙ্গে সঙ্গে। বললেন—আমি তোমার বশবর্তিনী স্ত্রী হতেই পারি, মহারাজ। কিন্তু একটা কথা—আমি যা কিছুই করব তুমি তাতে বাধা দেবে না, মহারাজ! কিংবা আমার কোনও কাজের জন্য আমাকে কটু কথাও বলবে না। আমাকে বাধা দিলে বা কটু কথা বললে আমি তখনই তোমাকে ছেড়ে চলে যাব, মহারাজ—বারিতা বিপ্রিয়ঞ্চোক্তা ত্যজেয়ং ত্বামসংশয়ম্। শান্তনু রমণীর শর্ত মেনে নিলেন বিনা দ্বিধায়।

সেকালের দিনের সামাজিক অবস্থার নিরিখে এই রমণীর মুখে যে শর্তের কথা শুনি, তাতে বোঝা যায়—তিনি চালিকার আসনে বসেছিলেন, আর হস্তিনাপুরের অধিরাজ শান্তনু এই মোহিনী জাদুকরির হাতে পুত্তলিকামাত্র। রমণী নিজের কোনও পরিচয় দিলেন না, শান্তনুও তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারেননি, তাঁর পিতাঠাকুরও রমণীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে বারণ করেছেন। এই যে পরিচয় না দেওয়া, না নেওয়া এবং পরিচয় জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বারণ—এই সবকিছু থেকে আমাদের ধারণা হয়—পরিচয় দেবার মতো কোনও পরিচয় এই রমণীর ছিল না।

নজর করার মতো আরও একটা জিনিস হল রমণীর ভাবভঙ্গি। নির্জন নদীতীরে অপূর্ব-দর্শনা রমণীকে দেখে শান্তনু মুগ্ধ হলেন, বা তাঁর দিকে একদৃষ্টে লোভীর মতো তাকিয়ে রইলেন—পুরুষমানুষের এই নির্লজ্জ ব্যবহার তবু সহ্য করা যায়; কিন্তু মহাভারতের কবি লিখেছেন—শান্তনুকে দেখে নদী-নায়িকা গঙ্গা তাঁর অন্তরস্থিত আবেগ ধারণ করে রাখতে পারেননি। একজন 'বিলাসিনী' রমণীর শরীর মন যেভাবে কামনায় উদ্বেলিত হয়, শান্তনুকে দেখে সেই ব্যবহারই করেছিলেন গঙ্গা। শান্তনুকে দেখে তাঁর তৃপ্তি হচ্ছিল না—নাতৃপ্যত বিলাসিনী।

হস্তিনাপুরের নায়ক আর এই অজ্ঞাতপরিচয় রমণীর মিলন-কৌতুকের পিছনে আরও একটি বড় ঘটনা হল—মহারাজ শান্তনু কিন্তু এই মুগ্ধা রমণীকে হস্তিনাপুরের রাজধানীতে নিয়ে আসেননি। বিবাহের যজ্ঞধূমে শান্তনুর নয়নযুগল যেমন অরুণিত হয়নি, তেমনই হস্তিনাপুরের কোনও মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনিতে রাজরানি বলে বধূ পরিচয় হয়নি নদী-নায়িকা জাহ্নবীর। মহাভারতের কবি এই রমণীর ওপর দেবনদীর মাহাত্ম্য আরোপ করে তাঁর নাম দিয়েছেন গঙ্গা। কিন্তু ওই যে নীতিশাস্ত্র বলে, নদীনাঞ্চ নখিনাঞ্চ ভারতস্য কুলস্য চ—নদী আর নখীর (নখযুক্ত জন্তুর) জন্মমূল খুঁজতে যেয়ো না, খুঁজতে যেয়ো না ভরতবংশের মূল পুরুষকে। তাতে ধন্দ বাড়বে, রহস্য রহস্যই থেকে যাবে।

মহাভারতের কবি অনেক সম্মানপুরঃসর নিবেদন করেছেন যে, স্বর্গের দেবী বা দেবনদী হওয়া সত্ত্বেও শুধু শান্তনুর সৌভাগ্যে তাঁর সঙ্গে কাম-ব্যবহার করতেন গঙ্গা। সে সৌভাগ্য এমনই যে, শান্তনু যাতে গঙ্গার সঙ্গে রমণসুখ অনুভব করেন, তার জন্য গঙ্গার সকাম প্রয়াস ছিল যথেষ্ট। কখনও রমণপূর্ব শৃঙ্গার, কখনও সম্ভোগ, কখনও নৃত্যগীত, হাস্যলাস্য—সম্ভোগ-স্নেহ-চাতুর্যে-হার্ব-লাস্যমনোহরৈঃ—যখন যেটি প্রয়োজন সেইরকম রমণ-নৈপুণ্য

দেখিয়ে শান্তনুকে তুষ্ট করতেন গঙ্গা।

আমরা যে ভীষ্মের জীবন আলোচনার পূর্বেই সাতকাহন করে তাঁর জননীর আচার ব্যবহার নিয়ে ভাবছি, তার কারণ একটাই। ভরতবংশের এক প্রসিদ্ধ জাতকের জন্মমূলে যে রহস্য, তা সামান্য করে হলেও ভেদ করা যায় কিনা। আচ্ছা, এই যে নদী-নায়িকার শৃঙ্গার-মাধুরীর সামান্য ইঙ্গিত দিলাম, তাতে এমন দোষারোপ করার কোনও কারণ নেই যে, সেটা খুব ছোটলোকের মতো ব্যবহার। যৌবনবতী এক রমণীর এতাদৃশ ব্যবহার একান্ত প্রত্যাশিত। আমাদের খটকা লাগে—এই মধুর শৃঙ্গার-বর্ণনার পরেই মহাভারতের কবি মন্তব্য করেন—গঙ্গা শান্তনুর সঙ্গে যে সম্ভোগ-ব্যবহার করে চলেছিলেন, তা নাকি পরিণীতা পত্নীর মতো—ভার্য্যেবোপস্থিতাভবৎ। তার মানে—পরিণীতা স্ত্রীর সম্ভোগ-সার ব্যবহারের নির্দোষ তাৎপর্যটুকু এখানে আছে, কিন্তু পরিণীতা স্ত্রীর গৌরবের তাৎপর্যটুকু এখানে নেই। ভাষাটা দেখুন—ঠিক বিবাহিতা স্ত্রী নয়, বিবাহিতা স্ত্রীর মতো—ভার্য্যা ইব।

সামান্য এই 'মতো' শব্দটির মধ্যেই নদী-নায়িকা গঙ্গার আসল পরিচয় নিহিত আছে বলে আমরা মনে করি। শান্তনু তাঁকে রাজবধূর মর্যাদায় হস্তিনাপুরে নিয়ে আসতে পারেননি অথবা আরও স্পষ্ট করে বলি—নিয়ে আসেননি। ভাবে বুঝি, যত দেবরূপিণীই হোন অথবা 'বিলাসিনী'—তাঁর দেবরূপিতার মধ্যে 'বিলাসিনী' রমণীর আঙ্গিকটাই বড়, দেবরূপিতা সেখানে উপাখ্যানমাত্র। উপাখ্যানের বহিরঙ্গে অষ্টবসুর ক্রমান্বয়ে গঙ্গাগর্ভে জন্মলাভের ঘটনাও উপন্যাসেরই অন্য এক আঙ্গিক, যে আঙ্গিকে গঙ্গাকে দেবনদীর মর্যাদা দিয়ে তাঁর গর্ভজাত সন্তান নাশের ঘটনাগুলি সকারণ করে তোলা যায়।

বাস্তবে সন্তান নাশ করে কারা? সেই 'বিলাসিনী' রমণীরাই, যাঁরা ভার্যার মতো ব্যবহার করেন, কিন্তু ভার্যা নন। সত্যি কথা বলতে কী, মহাত্মা ভীষ্মদেব যে অজ্ঞাতপরিচয় রমণীর গর্ভে জন্মাবেন, তাঁকে অসামান্য গৌরব প্রদান করার জন্যই গঙ্গা নাম্নী এক রমণীকে যেমন অষ্টবসুর জননী হতে হয়েছে, তেমনই অষ্টবসুর উপাখ্যানেরও জননী হতে হয়েছে। বাস্তবে এমন হতেও পারে যে, রূপমুগ্ধ মহারাজ শান্তনুর চালিকার আসনে বসে সেই 'বিলাসিনী' রমণী ক্রমান্বয়ে তাঁর সন্তানগুলিকে জলে ভাসিয়ে দিচ্ছিলেন নিজের অপবাদমুক্তির জন্য এবং হয়তো একসময় অপবাদ নিন্দাবাদের পরোয়া না করে মহারাজ শান্তনু তাঁর 'ভার্যার মতো' প্রিয়তমাকে স্বেচ্ছাচার করতে বাধা দিয়েছেন।

আমরা যেন বেশ বুঝতেই পারি যে, ভীষ্ম জন্মাবেন বলেই তাঁর মাতৃদেবী গঙ্গার মাহাত্ম্যে ভূষিত, আর ভীষ্ম জন্মাবেন বলেই অভিশপ্ত অষ্টবসুর মর্ত্যভূমিতে জন্মলাভের আয়োজন। আটটি সন্তানের সাতটিকে পর পর জলে ডুবিয়ে মারা হল বলে শান্তনুর ধৈর্য অতিক্রান্ত হল শেষপর্যন্ত। অষ্টবসুর তেজে সমৃদ্ধ হয়ে গঙ্গার অষ্টম গর্ভের যে পুত্রটি জন্মালেন, গঙ্গা তাঁকে দেখে হেসে উঠলেন—অথ তামষ্টমে জাতে পুত্রে প্রহসতীমিব। শান্তনু প্রমাদ গুণলেন—এও কি সেই ক্রূর হাসিটি যা তাঁকে অষ্টমবার পুত্রশোক দেবে। শান্তনু বাধা দিয়ে বললেন—আর নয়। আর আমার সন্তান বধ করা চলবে না। তুমি কে, কার মেয়ে, কেনই বা তুমি এমন করে আমার ছেলেদের মেরে ফেলছ।

উপাখ্যানের গৌরবমণ্ডিতা গঙ্গা এবার গম্ভীর হয়ে বললেন—আর তোমার পুত্রবধ করব না, কিন্তু তোমার সঙ্গে এতকালের মধুর সহবাসও আজ আমার শেষ হয়ে যাবে। তুমি কথা দিয়েছিলে—আমার কোনও কাজে তুমি বাধা দেবে না—জীর্ণো'স্তু মম বাসো'য়ং যথা স সময়ঃ কৃতঃ। গঙ্গা এবার নিজের পরিচয় দিলেন। দেবকার্য সিদ্ধ করার জন্যই যে তিনি মনুষ্যরূপিণী হয়েছেন, সে কথা জানিয়ে অষ্টবসুর প্রতি বশিষ্ঠের অভিশাপ, তাঁদের অনুরোধ এবং শেষপর্যন্ত তাঁদের মুক্ত করার জন্যই যে তিনি শান্তনুর স্ত্রীত্ব স্বীকার করেছেন—এইসব

বৃত্তান্ত শান্তনুকে জানালেন গঙ্গা।

আপন স্ত্রীর 'মতো' ব্যক্তিটির এমন মাহাত্ম্য শুনে মহারাজ শান্তনুর চক্ষুদুটি বিস্ময়ে বিস্ফারিত হল যতটুকু, কিন্তু সেই কাহিনীর চমৎকারে আধুনিক গবেষকের হৃদয় গলল না। তাঁরা গঙ্গার আচারআচরণ এবং সামাজিক স্থিতি লক্ষ করে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন—Other instances of Gandharva marriage, such as Ganga and Santanu…also present the free love union of some nymphs and dolphins, very probably women from some non-Aryan tribes.

গবেষকের কথা শুনে সুরসরিৎ গঙ্গাকে সোজাসুজি অনার্যজাতীয়া রমণী বলব কি না, সে সম্বন্ধে তর্কযুক্তি দেওয়া যেতেই পারে নানারকম। কিন্তু এটাও তো ঘটনা যে, শান্তনু তাঁকে হস্তিনাপুরের রাজধানীতে নিয়ে যেতে পারেননি। হস্তিনাপুরের রাজলক্ষ্মীকে রাজধানীতে রেখে বার বার তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছে গঙ্গাদ্বারের তীরভূমিতে গৃহলক্ষ্মীর খোঁজে। তিনি এখানে রমণীর সঙ্গলাভ করেছেন স্বামীর মতো, কিন্তু স্বামী ঠিক নন। আর কোন ধরনের রমণীর পক্ষেই বা এক প্রসিদ্ধ রাজপুরুষকে রাজধানীর বাইরে শুধুমাত্র সম্ভোগ-চাতুর্যে ব্যস্ত রাখা সম্ভব! এমনই সেই সন্তুষ্টির প্রক্রিয়া, যাতে ওই গঙ্গা ছাড়া আর কোনও ইতর বিষয়ে শান্তনুর পক্ষে মন দেওয়া সম্ভবই ছিল না—রাজানং রময়ামাস যথা রেমে তয়ৈব সঃ। এ ছাড়া মহারাজ শান্তনুর কোষ্ঠীতে স্ত্রীভাগ্যটাই বুঝি এইরকম। তাঁর জীবনে যে দুটি প্রেম এসেছে, তার একটি তো এইরকম; আর দ্বিতীয়টি জেলের ঘরে মানুষ হওয়া মেয়ে। কাজেই অনার্যজাতীয় রমণীর সঙ্গেই তাঁর ঠিকুজি-কুষ্ঠির স্ত্রীভাব জড়িত।

লক্ষণীয় বিষয় আছে আরও একটা। শান্তনুর অনুরোধে এবং উপরোধে যে পুত্রটিকে বাঁচিয়ে রাখলেন গঙ্গা, রাজা সেই পুত্রকে নিয়ে রাজধানীতে ফিরতে পারলেন না। হয়তো রাজার গৌরবহানি করতে না চেয়েই গঙ্গা তাঁকে নিজের সঙ্গে নিয়ে নিজের পছন্দমতো জায়গায় চলে গেলেন—আদায় চ কুমারং তং জগামাথ যথেপ্সিতম্। অলৌকিক উপাখ্যানের মাঝখানে ঠিকই একবার মহাভারতের কবির মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল—গঙ্গা নিজের পছন্দমতো জায়গায় চলে গেলেন—জগাম। অনুবাদক পণ্ডিতেরা গঙ্গার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করার জন্য সাধু অনুবাদে বললেন—বালকটিকে লইয়া সেইখানেই অন্তর্হিত হইলেন। কিন্তু ওই যে বলেছি—মুখ ফসকে সত্য কথাটিই বেরিয়েছে কবির মুখে। কবি বলেছেন—জগাম—চলে গেলেন। এই সংস্কৃত শব্দটির মধ্যে কোনও অলৌকিক অন্তর্ধান না লক্ষ করাই ভাল। তাতে যথার্থতা থাকে না।

চলে যাবার আগে গঙ্গা বলেছিলেন—তোমার যে ছেলেটিকে আজ আমি নিয়ে চললাম, সে বড় হলে তোমার কাছে আবার ফিরে আসবে—বিবৃদ্ধঃ পুনরেষ্যতি। গঙ্গা আরও বললেন—কখনও যদি এমন হয় যে, আমাকেও তুমি ডাকলে, তা হলে সেই ডাক শুনে আমিও সঙ্গে সঙ্গে তোমার কাছে উপস্থিত হব, মহারাজ—অহঞ্চ তে ভবিষ্যামি আহ্বানোপগতা নৃপ। গঙ্গার এই দুটি পরিষ্কার লৌকিক প্রতিজ্ঞার মধ্যে 'বালকটিকে লইয়া' অলৌকিক অন্তর্ধানের কথাও আসে না, তাঁর আবির্ভাবের কথাও আসে না। যে ছেলের মা স্বয়ং হস্তিনাপুরে প্রবেশ করতে পারেননি, তাঁর শিশুপুত্রকে নিয়ে রাজধানীতে প্রবেশ করলে যে মহারাজ শান্তনুর স্বস্তি বিঘ্নিত হবে, সে কথা এই নদী-নায়িকা বুঝতেন। আর 'বিবৃদ্ধঃ পুনরেষ্যতি'—এই কথাটির মানে সিদ্ধান্তবাগীশ যে কী করে—'আপনার পুত্র এই বালক অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়া পুনরায় স্বর্গে যাইবেন'—এইরকম করলেন, তা আমার সংস্কৃত জ্ঞানে কুলোয় না। কেন না 'পুনঃ' অর্থাৎ পুনরায় শব্দটাই এখানে ব্যর্থ হয়ে যায়, যদি না বলি—তোমার এই পুত্র বড় হয়ে পুনরায় তোমার কাছে ফিরে আসবে।

মহাভারতের তথাকথিত অনার্য রমণী বলে যাঁদের চিহ্নিত করা যায়, তাঁরা হলেন হিড়িম্বা, উলূপী ইত্যাদি। এঁরাও কিন্তু তাঁদের স্বামীদের ওই একই কথা বলেছেন—তোমরা ডাকলেই আমরা চলে আসব। গঙ্গার মুখেও সেই একই কথা—ডাকলেই আসব—আহ্বানোপগতা নৃপ। তা ছাড়া, হিড়িম্বা উলূপীদের পুত্রেরাও হস্তিনাপুরের রাজধানীতে আসেননি, তাঁরা মায়ের কাছেই ছিলেন। গঙ্গার মাহাত্ম্য এবং গৌরব যদি হিড়িম্বা, উলূপী এবং চিত্রাঙ্গদার থেকে বেশি না হয়, তা হলে অলৌকিক চমৎকারসৃষ্টির চেয়েও বাস্তবের যুক্তিগ্রাহ্যতা বেশি আসে। মহাভারতের কবির আশাও হয়তো তাই। হিড়িম্বা যেমন ভবিষ্যতে ঘটোৎকচ নামে পুত্র লাভ করে ভীমকে আপন প্রণয়বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেবেন, তেমনই গঙ্গাও পুত্রকে নিজের কাছে রেখে শান্তনুর প্রেমবন্ধন ছিন্ন করে দিলেন। প্রথমজাত গূঢ় পুত্রটিকে নিজের সঙ্গে না নিয়ে যেতে পেরে দুঃখিত মনে হস্তিনাপুরীতে ফিরে এলেন শান্তনু—শান্তনুশ্চাপি শোকার্তো জগাম স্বপুরং ততঃ।

তারপর বেশ কিছু সময় কেটে গেছে। শান্তনু এতাবৎ পর্যন্ত বিবাহও করেননি, অন্য কোনও রমণীর প্রতিও তিনি আর সাভিলাষে তাকাননি। হিড়িম্বা কিংবা উলূপী প্রভৃতির ক্ষেত্রে ভীম অর্জুনের সান্ত্বনা ছিল যে, এদের ছেড়ে আসার অচিরকালের মধ্যেই এঁরা নতুন আলোয় নবতরা রমণীর সন্ধান পেয়েছেন। কিন্তু মহারাজ শান্তনু বিরহী প্রেমিক। এখনও গঙ্গার মোহিনী মায়া তাঁর মন জুড়ে আছে, উপরন্তু মনে পড়ে সেই প্রথমজাত পুত্রটির কথা—তাঁরই আগ্রহাতিশয্যে যে পুত্রের প্রাণরক্ষা হয়েছে। রাজধানীতে বেশ কিছু কাল অতীত হয়ে যাবার পর শান্তনুর মন আবারও চঞ্চল হয়ে উঠল।

মহাভারতের কবি শান্তনুর চাঞ্চল্য উপশম করার জন্য তাঁকে মৃগয়ায় নিয়ে এসেছেন এবং তা অবশ্যই একাকী। এ কেমন মৃগয়া, যেখানে একটি মৃগের প্রতি শরসন্ধান করার পর সেই বাণবিদ্ধ মৃগের অনুসরণ-ক্রমে সেই গঙ্গার তীরভূমিতে বার বার এসে উপস্থিত হতে হয়! আমরা বেশ জানি—এই মৃগয়ার মধ্যে মৃগবধের তত্ত্ব কিছু নেই, যা আছে, তার সবটাই সেই হরিণ-আঁখি নদী-নায়িকার অন্বেষণ। বস্তুত, তাঁকেই তিনি প্রেমের বাণে বিদ্ধ করে রেখেছিলেন, হয়তো সেই বাণবিদ্ধা হরিণীর অন্বেষণেই বার বার এই মৃগয়া। 'মৃগ্' ধাতুর অর্থই যে খোঁজা, সে খোঁজা এখানে যতখানি না মৃগের জন্য, তার চেয়ে অনেক বেশি সেই মার্গীতব্যা রমণীর জন্য।

শান্তনু অবাক হয়ে দেখলেন—গঙ্গার জল বড় অল্প। কী ব্যাপার, এমন তো হবার কথা নয়। নদী-নায়িকা গঙ্গার জলপ্রবাহ শীর্ণ হল কী করে, এমনটি তো আগে দেখা যায়নি! গঙ্গা যেন আর আগের মতো বইছে না—স্যন্দতে কিং ত্বিয়ং নাদ্য সরিচ্ছ্রেষ্ঠা যথা পুরা। অন্তরে অদম্য কৌতূহল নিয়ে শান্তনু গঙ্গার তীর ধরে এগোতে লাগলেন। খানিক এগোতেই তিনি এক বালককে দেখতে পেলেন। বালকের শরীরে এখনও কৈশোরের গন্ধমাখা। কিন্তু কৈশোরগন্ধী বয়সেও বড় সুঠাম তার শরীর, মহাবলবান, মহাতেজস্বী। শান্তনু দেখলেন—বালক একটার পর একটা বাণ গেঁথে গঙ্গার স্রোতোরাশি রুদ্ধ করে দিয়েছে—কৃৎস্নাং গঙ্গাং সমাবৃত্য শরৈস্তীক্ষ্ণৈরবস্থিতম্।

একটি বালকের এই অতিমানুষ কর্ম দেখে শান্তনু একেবারে অবাক হয়ে গেলেন, কিন্তু কোনও মতেই সেই কৈশোরগন্ধী প্রায়-যুবক পুরুষটিকে তিনি চিনতে পারলেন না। কিন্তু বালক বুঝি তাঁকে চিনতে পারল। হয়তো মায়ের কাছে এই মানুষটির বর্ণনা সে বহুবার শুনেছে। কত শত কথা প্রসঙ্গে হস্তিনাপুরের রাজার চিত্রকল্প সে দেখতে পেয়েছে মায়ের কল্পনামাধুরীতে। অতএব শান্তনুকে দেখামাত্রই বালকের হৃদয় উদ্বেলিত হল। সে বেশিক্ষণ সেখানে দাঁড়াল না। শান্তনুকে দেখে অতিপ্রিয়জনের সান্নিধ্য মনে মনে অনুভব করেই বালক যেন কী ভেবে কোথায় উধাও হয়ে গেল।

শান্তনুর বোধহয় মনে পড়ল সেই শিশু পুত্রটির কথা, যাকে তিনি কোনও শৈশবকালে মায়ের অঞ্চলছায়ায় লুক্কায়িত দেখেছেন। কিন্তু এখন এই আশ্চর্য সময়সন্ধিতে কিছুতেই সেই শিশু-মুখখানি ভাল করে মনে পড়ল না শান্তনুর—নোপলেভে স্মৃতিং ধীমানভিজ্ঞাতুং তমাত্মজম্। ভাবলেন বুঝি—এই সমস্যার সমাধান করে দিতে পারেন সেই পুরাতনী প্রেয়সী, যিনি তাঁর ডাক শুনলেই সামনে উপস্থিত হবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। শান্তনু তাই গলা ছেড়ে ডাকতে আরম্ভ করলেন—গঙ্গা! গঙ্গে!

বালকটি যেমন করে ঘটনাস্থল থেকে অন্তর্হিত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ করি—সে তার মাকে ডেকে আনতেই গিয়েছিল। মায়ের মুখে যাঁর এত বর্ণনা শুনেছে, তাঁকে সামনে উপস্থিত করে দিয়ে জননীকে বিস্মিত করে দেবার প্রয়াস নিয়েছিল বালক। অতএব শান্তনুর ডাক শুনেই হোক অথবা পুত্রের বিস্ময়-মুকুলিত মুখখানি দেখেই হোক, গঙ্গা আপন পুত্রের হাতখানি ধরে উপস্থিত হলেন শান্তনুর সামনে।

এখনও সেই পুরাতনী নায়িকার রূপ কম নয়। সর্বাঙ্গে অলংকার, পরিধানে নির্মল শুভ্র বসন—অলঙ্কৃতামাভরণৈ-র্বিরজো’ম্বরসংবৃতাম্। অপূর্ব রূপরাশির মধ্যে এই নির্মল শুভ্রতা তাঁর মধ্যে এমনই এক গাম্ভীর্য এবং আভিজাত্য এনে দিয়েছে যে, শান্তনুর মনে হল—এই কি সেই রমণী, যিনি হাবেভাবে লাস্যে রঞ্জিত করতেন তাঁকে। শান্তনু যেন ভাল করে চিনতে পারলেন না রমণীকে। কতবার কত শত ঘন আলিঙ্গনের মধ্যে যাঁকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁকে যেন আজকে ঠিক চিনতে পারলেন না শান্তনু—দৃষ্টপূর্বামপি স তাং নাভ্যজানৎ স শান্তনুঃ।

শুধু এই একটিমাত্র পঙ্ক্তি থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে গঙ্গা কোনও অলৌকিক দেবী বা নদী নন। যদি হতেন, তা হলে তাঁকে চিনতে কোনও অসুবিধে হত না রাজার। অলৌকিক দেবীদের রূপযৌবন একইরকম থাকে। বেশ বুঝতে পারি, এই কয়েক বছরে এই রমণীর বয়স হয়েছে, তাঁর রূপে পরিবর্তন এসেছে, উচ্ছল উজ্জ্বল রূপরাশির মধ্যে নির্মল গাম্ভীর্য অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। মহারাজ শান্তনুকে অবাক করে দিয়ে গঙ্গা তাঁর ডান হাতে ধরা পুত্রটিকে দেখিয়ে বললেন—মহারাজ! এই তোমার সেই অষ্টম পুত্র; বহুকাল আগে আমারই গর্ভে তোমার এই পুত্রের জন্ম হয়েছিল—যং পুত্রমষ্টমং রাজন্ ত্বং পুরা ময্যমবিন্দথাঃ। আমি এতকাল ধরে এই পুত্রকে বড় করেছি, মানুষ করেছি। এবারে তুমি একে তোমার ঘরে নিয়ে যাও—গৃহাণেমং মহারাজ ময়া সংবর্ধিতং সুতম্।

প্রশ্ন উঠতে পারে—এতদিন মায়ের ঘরে থাকা একটি গূঢ় পুত্রকে মহারাজ রাজধানীতে নিয়ে যাবেন কী করে! শান্তনু হস্তিনাপুরের রাজা। একজন রাজপুত্রের যেসব সংস্কার প্রাপ্য সেগুলি যদি না হয়ে থাকে, তবে এই প্রায়-যুবক একটি পুত্রকে রাজধানীতে নিয়ে গিয়ে কীভাবে মন্ত্রী-পুরোহিতের কাছে জবাবদিহি করবেন শান্তনু? মহাভারতে যাঁরা শকুন্তলা-দুষ্যন্তের কাহিনী পড়েছেন, তাঁদের মনে পড়বে—মহাভারতের শকুন্তলাও যখন তাঁর অরণ্যজাত রাজপুত্রকে নিয়ে গিয়ে দুষ্যন্তের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন দুষ্যন্ত তাঁর রাজমন্ত্রী-পুরোহিতদের ভয়েই সেই গূঢ়জাত পুত্রের জন্ম স্বীকার করেননি। এখানেও সেই একই সমস্যা। কিন্তু মহারাজ শান্তনু আর দুষ্যন্ত এক নন। বিশেষত এই রমণীর সঙ্গে তাঁর সঙ্গতি ঘটেছে তাঁর পিতার সম্মতিক্রমেই। আর গঙ্গাও শকুন্তলা নন, আশ্রমবালিকার মতো নত-নম্রাও তিনি নন।

অতএব শান্তনুর দিক থেকে কোনও প্রশ্ন ওঠবার আগেই অসামান্য ব্যক্তিত্বময়ী গঙ্গা বললেন—আমি তোমার ছেলেকে উপযুক্তভাবেই মানুষ করেছি মহারাজ! সমস্ত বেদ এবং বেদাঙ্গ পড়বার জন্য আমি একে বশিষ্ঠমুনির কাছে পাঠিয়েছিলাম। তাঁর কাছ থেকে সাঙ্গ

বেদ শিখে এসেছে তোমার পুত্র—বেদানধিজগে সাঙ্গান্ বশিষ্ঠাদেষ বীর্যবান্। ক্ষত্রিয়ের শিক্ষণীয় যে অস্ত্রবিদ্যা, তাতে এই পুত্রের এতটাই অধিকার যে, দেবতা এবং অসুর কারও পক্ষে এর সঙ্গে এঁটে ওঠা সম্ভব হবে না। সুরাসুর-নমস্য জামদগ্ন্য পরশুরাম এই পুত্রের অস্ত্রগুরু। পরশুরাম যে অস্ত্রবিদ্যা জানেন তার সবটাই এই যুবকের আয়ত্ত। আর বাকি থাকে রাজনীতিশাস্ত্রের কথা। দেবতাদের রাজনীতি একরকম, অসুরদের আর একরকম। দেবতাদের রাজনীতিশাস্ত্রের প্রবক্তা হলেন বৃহস্পতি আর অসুরদের রাজনীতিশাস্ত্র লিখেছেন শুক্রাচার্য। কিন্তু তোমার এই পুত্র সুরাসুর দুই পক্ষেরই রাজনীতি জানে। আমি অপার চেষ্টায় তোমার এই পুত্রকে সমস্ত শাস্ত্রে পরম অভিজ্ঞ করে তুলেছি। আজকে তুমি যখন এসেছ, তখন আমার হাতে-গড়া এই পুত্রকে তুমি রাজধানীতে নিয়ে যাও—ময়া দত্তং নিজং পুত্রং বীরং বীর গৃহং নয়।

গঙ্গার মুখে পুত্রের যেসব শিক্ষাগুরুর নাম শুনেছেন শান্তনু, তাতে আর কোনও কথা চলে না। তিনি বিনা দ্বিধায় তাঁর পুরাতনী প্রেয়সীর হাত থেকে পুত্রকে গ্রহণ করলেন এবং ফিরে এলেন রাজধানীতে। রাজধানীর মন্ত্রী-অমাত্য-পুরোহিতেরা কেউ কোনও অস্বস্তিকর প্রশ্ন তাঁকে করল না। আমাদের ধারণা—মহারাজ প্রতীপের সম্মতিক্রমে বহু পূর্বে শান্তনু যে গঙ্গাবিহার সম্পন্ন করেছিলেন, তা রাজধানীর কারও অবিদিত ছিল না। রাজধানীর সকলেই জানতেন—রাজা কী করছেন অথবা কোথায় আছেন। হয়তো এই কারণেই রাজধানীর মন্ত্রী অমাত্যদের সামনে কোনও জবাবদিহি করতে হয়নি শান্তনুকে।

গঙ্গার তীরভূমি থেকে পুত্রকে রাজধানীতে নিয়ে এসে শান্তনু যথেষ্ট সপ্রতিভ হয়ে উঠলেন। তাঁর জ্ঞাতিগুষ্টি, মন্ত্রী-অমাত্যদের সঙ্গে শান্তনু নিজেই তাঁর পুত্রের পরিচয় করালেন। প্রখর বাস্তববোধে আরও একটি কাজ শান্তনু করলেন। পুত্রকে সটান যুবরাজের পদে বসিয়ে দিলেন। হয়তো তাঁর মনে কিছু চিন্তা ছিল। পুরু-ভরতবংশের লতাপাতায় জন্মানো কেউ যদি শান্তনুর ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তাই সেই অধম প্রয়াস মূলেই স্তব্ধ করে দিলেন শান্তনু। বিশেষ যুবরাজ-পদে অধিষ্ঠিত পুরুষটির আদেশ-অনুশাসনও যেহেতু মন্ত্রী-অমাত্যদের কাছে অনতিক্রমণীয় ছিল, অতএব এতকাল অপরিচিত আপন পুত্রকে রাজ্যশাসনের এই গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত করে শান্তনু তাঁকে প্রথমেই অলংঘনীয় করে তুললেন—গুণবন্তং মহাত্মানং যৌবরাজ্যে, ভ্যষেচয়ৎ।

শান্তনুর পুত্র যখন মায়ের বাড়িতে মানুষ হচ্ছিলেন, তখন তাঁর নাম ছিল দেবব্রত। হয়তো গঙ্গাই তাঁর এই নামকরণ করেছিলেন। কিন্তু পিতার সঙ্গে বালককাল থেকেই তাঁর কোনও সম্পর্ক না থাকায় লোকে এই গঙ্গাপুত্রকে মায়ের নামেই ডাকত। তারা বলত গাঙ্গেয়। গাঙ্গেয় দেবব্রত জন্মাবধি পিতৃপরিত্যক্ত এবং তিনি যে বেঁচে ছিলেন, অন্য পুত্রগুলির মতো গঙ্গা যে তাঁকে জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলেননি—এ শুধু তাঁর শুভাদৃষ্ট। তবে ইউরোপীয় পুরাতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, সৌরকুলের যাঁরা জাতক (Solar gods, Solar heroes), তাঁদের জন্ম এবং শৈশব লালনটুকু ঘটে অতি কষ্টে এবং যন্ত্রণায়। পিতা বা মাতার কাছে তাঁদের থাকা হয় না অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা জনক-জননীর দ্বারা পরিত্যক্ত। যেমন কৃষ্ণ অথবা যেমন কর্ণ। কৃষ্ণের সঙ্গে দেবব্রত গাঙ্গেয়র মিল হল—তাঁরা উভয়েই জননীর অষ্টম গর্ভের সন্তান এবং যেকোনও কারণেই হোক, তাঁদের পূর্বজন্মা সাতজন মারা গেছেন।

শিশু বয়সে সৌরকুলজাতকের এই যে কষ্টগুলি, এ নাকি ভবিষ্যতে তাঁদের উজ্জ্বল সম্ভাবনার প্রতিতুলনায় কল্পিত হয়। অর্থাৎ ভবিষ্যতে তাঁরা যে এক একজন বিশাল ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবেন, সেই প্রতিষ্ঠাকে প্রতিতুলনায় প্রোজ্জ্বল করার জন্যই প্রাথমিক জীবনে তাঁদের প্রতি সমাজের বঞ্চনা এবং অগৌরবের কথা উচ্চারিত হয়। তবে প্রাথমিক জীবনে নানা দুর্ভাগ্যের ঘটনা অন্যান্য সৌরকুলজন্মাদের জীবন যতখানি কণ্টকিত করেছে, সে তুলনায় দেবব্রত গাঙ্গেয়র ভাগ্য অনেক ভাল। পিতা তাঁকে রাজধানীতে নিয়ে না গেলেও তিনি জননীর পরিত্যক্ত নন এবং জননী তাঁকে আপন চেষ্টায় ভালই মানুষ করেছেন। সেকালের দিনের শ্রেষ্ঠ গুরুদের কাছে রেখে তিনি তাঁর পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন—এটাই শুধু নয়, দেবব্রত গাঙ্গেয় শেষপর্যন্ত পিতৃকুলের রাজ্যাধিকারে স্থাপিত হয়েছেন বিনা চেষ্টায়, বিনা বাধায়।

কিন্তু অন্যান্য সৌরকুলের জাতকদের প্রতিতুলনায় এ পর্যন্ত দেবব্রত গাঙ্গেয়র ভাগ্য কিছু ভাল হলেও এরপর তাঁর জীবনে যত কষ্ট আসবে, সে কষ্ট আবার তাঁর স্বগোত্রীয় সৌরকুলজন্মাদের ভাগ্যে জোটেনি। ভেবে দেখুন, গাঙ্গেয় দেবব্রত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবার পর তাঁর পিতৃরাজ্যের অমাত্য-মন্ত্রীদের সঙ্গে যথেষ্টই ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠল। দেবব্রত গাঙ্গেয় তাঁদের অনুরক্তি, আনুগত্য এবং সাহায্য সবই পেলেন একসঙ্গে। তা ছাড়া তিনি নিজে যেহেতু অস্ত্রবিদ্যায় অসামান্য নৈপুণ্য অর্জন করেছিলেন, তাই বহু রাজ্য জয় করে কুরু-ভরতবংশের শত্রুদের যেমন শান্তনুর বশে নিয়ে এসেছিলেন, তেমনই করদ রাজ্যগুলি থেকে বহু ধনরত্ন তিনি হস্তিনাপুরের রাজকোষে জমা করেছিলেন। এতদিন পরে হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে প্রবেশ করেও দেবব্রত গাঙ্গেয়র যে কোনও অসুবিধে হল না, তার কারণ তিনি নিজ গুণে এবং ব্যক্তিত্বে সমস্ত প্রজাদের আস্থা অর্জন করে নিয়েছিলেন খুব কম সময়ের মধ্যেই। ফলত রাজ্যের মন্ত্রী অমাত্যরাও তাঁর কোনও কাজে বাধা দেননি, কারণ তাঁরা একটি ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন এই ভেবে যে, শান্তনুর এই পুত্রটি বহিরাগত হলেও কুরুরাজ্যের হিতের জন্য সমস্ত দায়বদ্ধতার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন।

স্বাভাবিকভাবেই মহারাজ শান্তনুর দিক থেকেও পরম নিশ্চিন্ততার কারণ ঘটেছিল। আর নিশ্চিন্ততা থাকলেই রাজাদের যা হয়, তাঁদের মন আনচান করে ওঠে বিলাসের জন্য, ব্যসনের জন্য, ভ্রমণের জন্য। শান্তনু পাত্রমিত্র ছেড়ে যুবরাজ দেবব্রতকে রাজ্য পরিচালনার ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে মৃগয়া করতে বেরুলেন একাকী। এবারে গঙ্গার দিকে নয়, যমুনাপুলিনে। সেবারে গঙ্গার তীরচারিণী এক মৃগবধূ পূর্বেই তাঁর ভালবাসার শরে বিদ্ধ হয়েছেন, এবারে যমুনাপুলিনে কোনও মৃগবধূ তাঁর শরবিদ্ধ হওয়ার অপেক্ষায় আছেন তা না বুঝেই শান্তনু চললেন মৃগয়ায়। ‘ধনুকবাণ ধরি দখিন করে।’

এক রমণীর সাহচর্য লাভ করে মহারাজ শান্তনু উপযুক্ত পুত্র লাভ করেছেন বটে, কিন্তু এখনও হস্তিনাপুরের রাজবধূ তাঁর ঘরে আসেননি। তাঁর হৃদয়ে আছে অদ্ভুত এক শূন্যতা। হৃদয় পেয়েও বিনা কারণে হৃদয় হারাবার শূন্যতা। অনুক্ষণ তাঁর মনে হয়—কী যেন বলিবার ছিল বলা হয় নাই, কী যেন শুনিবার ছিল শুনা হয় নাই। শান্তনু শূন্য মনে মৃগয়ায় চললেন। অন্তরে এক প্রেমিকের মন তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল।

ধীর সমীরে যমুনাতীরে যেতে যেতে শান্তনুর নাকে এক মধুর গন্ধ ভেসে এল। এ এমন এক সুগন্ধ, যা কোনও স্বভাব-প্রেমিকের হৃদয়ে জন্মান্তরের ভাবস্থির স্মৃতি এনে দেয়, তাকে উতলা করে, অশান্ত করে। সেই মধুর সুগন্ধের উৎস খুঁজতে খুঁজতে শান্তনু যেখানে এসে পৌঁছেলেন, সেখানে এক রমণী দাঁড়িয়ে আছেন। লোকে তাঁকে সত্যবতী বলে ডাকে। কেউ বা বলে গন্ধবতী, পদ্মগন্ধা, যোজনগন্ধা। এই রমণী যেখানে দাঁড়িয়ে থাকেন, তার এক যোজন দূর থেকে নাকি তাঁর গায়ের সুগন্ধ ভেসে আসে। শান্তনু সেই সৌগন্ধে লুব্ধ হয়েই এত দূর এসেছেন এবং এখন যে অবস্থায় তিনি রমণীকে দেখতে পেলেন তাতে তাঁর লুব্ধতা চরম বিন্দুতে পৌঁছোল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে? কার মেয়ে? এখানেই বা তুমি কী করছ—কস্য ত্বমসি কা বাসি ভীরু কিঞ্চ চিকীর্ষসি?

শান্তনু যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেটা যমুনানদীর এক খেয়াঘাট। আজ তেমন লোকজনও নেই যারা খেয়া পার হয়ে যমুনার পরপারে যাবে। একেবারে হস্তিনাপুরের রাজা না হলেও বহু পুরুষমানুষকে গান গেয়ে তরী বেয়ে যমুনার ওপারে নিয়ে গেছেন এই রমণী। কাজেই পুরুষমানুষ দেখলেই তাঁর কোনও ভাববিকার ঘটে না। রমণী নিজেই জানেন যে, তিনি অসাধারণ রূপবতী। এই খেয়া পারাপারের সময়েই একদিন তাঁর ছোট্ট নৌকাটিতে পদধূলি দিয়েছিলেন মহামুনি পরাশর। তিনি মধ্যনদীতে এই রমণীর প্রণয়প্রার্থী হয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। মুনির অলৌকিক ক্ষমতায় সদ্যগর্ভ লাভ করে তৎক্ষণাৎ পুত্রলাভ করেছিলেন সত্যবতী, আর সেই থেকেই মুনির আশীর্বাদে তাঁর জন্মগন্ধ ধুয়ে গেছে। তিনি যোজনগন্ধা গন্ধবতী হয়েছেন।

বস্তুত, সত্যবতী কৈবর্তপল্লিতে দাসরাজার ঘরে মানুষ হয়েছেন। কিন্তু মুনিবর পরাশরের সংস্পর্শে এসে, অপিচ স্বয়ং মহাভারতের কবি দ্বীপজন্মা দ্বৈপায়ন ব্যাসকে গর্ভে ধারণ করে তিনি যে মাহাত্ম্য লাভ করেছেন, তাতেই হয়তো তাঁর সুনাম-সৌগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। হয়তো সেইজন্যই তাঁর নাম যোজনগন্ধা। নইলে এমনিতে তিনি কৃষ্ণবর্ণা এক রমণী, কৈবর্তপল্লির অন্ত্যজ সংস্কারে তাঁর জন্ম। কিন্তু যৌবনসন্ধিতেই মুনিবর পরাশরের সাহচর্যে এসে তাঁর জীবনে যেমন ব্রাহ্মণ্য সংস্কার এসেছে, তেমনই খেয়া পারাপারের কর্ম করতে করতে তাঁর ব্যক্তিত্বও দৃঢ়তর হয়েছে। শান্তনুর প্রশ্ন শুনে সত্যবতী বললেন—আমি দাসরাজার মেয়ে। তাঁরই নির্দেশে আমি এই যমুনানদীতে খেয়া পারাপার করি।

মহারাজ শান্তনু যেন এমন রূপময়ী এবং ব্যক্তিত্বময়ী রমণী জীবনে দেখেননি। অতএব দেখামাত্রই তাঁকে কামনা করলেন তিনি—সমীক্ষ্য রাজা দাসেয়ীং কাময়ামাস শান্তনুঃ। শান্তনু এতকাল স্ত্রীসঙ্গবর্জিত অবস্থায় দিন কাটিয়েছেন। গঙ্গার সঙ্গে তাঁর যৌবনসন্ধির প্রথম বৎসরগুলি ঘনিষ্ঠভাবেই কেটেছে বটে, কিন্তু একের পর এক সন্তান-বিপর্যয়ের পর গঙ্গার প্রতি তাঁর সেই মানসিকতা গড়ে ওঠেনি, যাতে পুরুষহৃদয়ের সরসতা টিকে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই সত্যবতীর রূপ এবং ব্যক্তিত্ব দেখে শান্তনু তাঁর হৃদয় যাচনা করলেন।

সত্যবতী কিন্তু রাজার সমস্ত আবেগ বুঝেও হস্তিনাপুরের মহারাজকে সোজাসুজি হৃদয় দিতে পারলেন না। স্মিতহাস্যে মধুর আবেশ জড়িয়ে তিনি বললেন—আমি আমার প্রভু নই, মহারাজ! অতএব আমি নিজেই নিজেকে আপনার হাতে তুলে দিতে পারি না। আপনার যদি

সত্যিই আমাকে পাবার ইচ্ছে থাকে, তবে আমার পিতাকে রাজি করান। শান্তনু ভাবলেন—এ আর এমন কী বড় কথা। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কৈবর্তপল্লিতে উপস্থিত হয়ে দাসরাজাকে বললেন—আমি হস্তিনাপুরের রাজা শান্তনু। তোমার কন্যাটিকে বিবাহ করতে চাই—স গত্বা পিতরং তস্যা বরয়ামাস শান্তনুঃ।

দাসরাজা তথাকথিত হীনজাতির মানুষ হলে কী হবে, তাঁর স্বভাবে কোনও হীনম্মন্যতা নেই এবং তাঁর বুদ্ধিটাও অত্যন্ত প্রখর। তিনি বুঝলেন—রাজা যখন তাঁর মেয়ের অঞ্চল ধরে এই কৈবর্তপল্লি পর্যন্ত উপস্থিত হতে পেরেছেন, তখন মেয়ের ভবিষ্যৎটি এখনই নিশ্চিত করে নেওয়া ভাল। বিশেষত শান্তনুর গঙ্গা-ঘটিত প্রণয়সম্বন্ধ এবং সেই সম্বন্ধে মহারাজ শান্তনুর পুত্রলাভের কথাও দাসরাজার অবিদিত ছিল না নিশ্চয়। আর ঠিক সেই কারণেই এতাবৎকাল স্ত্রীসঙ্গবর্জিত এক প্রায়-কামুক রাজাকে হাতের মুঠোয় পেয়ে দাসরাজা তাঁর চাল চাললেন। বললেন—মেয়ে তো আমাকে সৎপাত্রে দিতেই হবে, মহারাজ! সে আর এমন বেশি কথা কী—জাতমাত্রৈব মে দেয়া বরায় বরবর্ণিনী। তবে হ্যাঁ, বিয়ের ব্যাপারে আমার একটা শর্ত আছে, মহারাজ! সেই শর্তটি পূরণ করলেই আমার আর কোনও কথা নেই। শত খুঁজলেও আপনার মতো জামাই আমি কোথায় পাব—ন হি মে ত্বৎসমো কশ্চিদ্ বরো জাতু ভবিষ্যতি।

শান্তনু বুঝলেন—দাসরাজা খুব সহজ লোক নন। সুযোগসন্ধানী তো বটেই। তিনি তাই আগেই কথা দিলেন না। বললেন—আগে তোমার শর্তটা কী শুনি। তারপর না হয় প্রতিজ্ঞা করব। দাসরাজা বললেন—এমন বেশি কিছু নয়, মহারাজ! শুধু মনে রাখবেন—আমার এই মেয়ের গর্ভে আপনার ঔরসে যে পুত্রটি জন্মাবে তাঁকেই দিতে হবে হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসন। অপিচ আপনি বেঁচে থাকতেই সেই পুত্রকে আপনি যুবরাজপদে অভিষিক্ত করবেন, মহারাজ! যাতে অন্য কোনও ভাগীদার হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসন দাবি না করতে পারে—নান্যঃ কশ্চন পার্থিবঃ।

বেশ বোঝা যায় দাসরাজা সব জেনেশুনেই তাঁর শর্ত পেশ করেছেন। সত্যবতীর রূপে মুগ্ধ হয়ে শান্তনু এই কৈবর্তপল্লি পর্যন্ত এসেছেন বটে, তবে এই মুহূর্তে সমস্ত মুগ্ধতা ছাপিয়ে তাঁর মনের মধ্যে ভেসে উঠল একটি সদা-বিনীত পুত্রমুখ। গাঙ্গেয় দেবব্রত। হস্তিনাপুরে সে পিতা ছাড়া আর কাউকে জানে না। আপন জন বলতেও আর কেউই নেই তার। তা ছাড়া এই কিছুদিন আগেই তো তাঁকে যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন শান্তনু। রাজ্যবাসী প্রজারা তাঁকে যেমন ভালবাসে, তেমনই নিজের ব্যবহারে প্রজাদের মনও তিনি জয় করেছেন। সেই সদা-বিনীত একনিষ্ঠ পুত্রকে বঞ্চিত করে, তাঁর হাত থেকে যৌবরাজ্য ছিনিয়ে নিয়ে অন্য একট ভবিষ্যৎ-পুত্রকে যুবরাজপদে প্রতিষ্ঠা করা—যেকোনও ভদ্রলোক রাজার পক্ষে প্রায় অসম্ভব কাজ।

শান্তনু দাসরাজার শর্ত সোজাসুজি মেনে নিলেন না বটে, কিন্তু সত্যবতীর রূপ-ভাবনাও তাঁর মন থেকে গেল না। সাময়িকভাবে পুত্র দেবব্রতর জন্য তাঁর চক্ষুলজ্জা কাজ করল, বিশেষত মতলববাজ দাসরাজার সামনে, কিন্তু এতদিন স্ত্রীসঙ্গবর্জিত রাজা সত্যবতীর জন্য সমস্ত কামনা হৃদয়ে বহন করেই বাড়ি ফিরলেন—স চিন্তয়ন্নেব তু তাং...কামোপহতচেতনঃ।

হস্তিনাপুরের রাজার মন একেবারে উদাস বিবাগী হয়ে গেল। রাজকার্যে তাঁর মন বসে না, মন্ত্রী-অমাত্যদের সঙ্গে রাজ্যের প্রশাসন নিয়ে কোনও আলোচনায় বসেন না তিনি। সারাদিন আনমনে কী যেন তিনি ভাবেন আর ভাবেন। পিতার ব্যবহার দেখে গাঙ্গেয় দেবব্রত একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। তারপর একদিন ওই সত্যবতীর ধ্যানেই মগ্ন ছিলেন শান্তনু। আর ঠিক সেই সময়েই পুত্র দেবব্রত এসে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে। বললেন—সব দিকেই তো

আপনার রাজ্যের কুশল দেখতে পাচ্ছি, পিতা। সমস্ত সামন্ত রাজারা আপনার বশীভূত। রাজ্যের ভিতরেও কোনও অশান্তি নেই। তা হলে সব সময়ই আপনাকে এমন শোকগ্রস্ত উদাসী মানুষের মতো দেখতে লাগছে কেন। এত মৃগয়ার শখ আপনার, তা আপনি তো ঘোড়ায় চড়ে মৃগয়াতেও যান না, অন্য কোনও বিলাসেও আপনার মন নেই। আর শরীরটাই বা কী হয়েছে আপনার—বিবর্ণ, কৃশ, পাণ্ডুর—ন চাশ্বেন বিনির্যাসি বিবর্ণো হরিণঃ কৃশঃ। সবসময় ধ্যানী যোগীর মতো বসে আছেন। আপনি তো আমার সঙ্গেও ভাল করে কথা বলছেন না।

শান্তনু পুত্রের কথা শুনে অপ্রতিভ হলেন। সঙ্গে সঙ্গে কোনও জবাবও দিলেন না। যুবক দেবব্রতর ধৈর্যচ্যুতি ঘটছিল। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, রাজ্য রাজনীতি বা প্রশাসন নয়, অন্য কিছু, অন্য কিছু তাঁর পিতার হৃদয় অধিকার করেছে। তিনি তাই একটু অধৈর্য হয়েই বললেন—আপনার রোগটা ঠিক কী—তা কি জানতে পারি আমি। যদি জানান, তবে সে রোগ সারানোর ব্যবস্থাও নিশ্চয় করা যাবে—ব্যাধিমিচ্ছামি তে জ্ঞাতুং প্রতিকুর্য্যাং হি তত্র বৈ।

শান্তনু পুত্রের কথার জবাব দিলেন বটে, তবে সে জবাবের মধ্যে এমন এক হাহাকার ছিল, যা তাঁর পুত্রবাৎসল্য অতিক্রম করে তাঁর জীবনের অন্য এক সত্য পরোক্ষভাবে প্রকট করে ফেলে। শান্তনু বললেন—পুত্র! আমার যেমন অবস্থার কথা তুমি বলছ, তা অসত্য নয়। তবে কী না আমার ভাবনা হয় যে, এই বিশাল কুরুবংশে তুমিই আমার একমাত্র সন্তান। সেই তুমি যেমন করে নানা যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়ে যেভাবে পুরুষকার প্রদর্শন করছ, তাতে আমার ভয় হয়—ত্বঞ্চ শূরঃ সদামর্ষী শস্ত্রনিত্যশ্চ ভারত। মানুষের জীবন বড় চঞ্চল। কখন কী হয়, কিছুই ঠিক নেই। তাই বলছিলাম, তোমার যদি কোনও বিপদ ঘটে, তবে আমার বংশটাই লুপ্ত হয়ে যাবে।

শান্তনু যা বলতে চাইলেন, তা পরিষ্কার করে বলতে পারছেন না। তিনি এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন একমাত্র পুত্রের জীবন যাতে সুরক্ষিত থাকে তার জন্য তিনি বড়ই চিন্তিত, যেন পুত্র ছাড়া আর ভাবনার কোনও বিষয়ও নেই তাঁর। কিন্তু এই পুত্র-ভাবনার সঙ্গে তিনি তাঁর কামনার বিষয়টিও যে নিপুণভাবে মিশিয়ে দিচ্ছেন, তা তাঁর বক্তব্য থেকেই বেশ বোঝা যায়। শান্তনু বললেন—তুমি আমার একশো ছেলের বাড়া এক ছেলে। আমি আর সন্তানবৃদ্ধির জন্য নতুন করে আবার বিয়েটিয়ে করে গোলমাল বাধাতে চাই না—ন চাপ্যহং বৃথা ভূয়ো দারান্ কর্তুমিহোৎসহে।

এ যেন এক অতিরিক্ত মদ্য-মাংসপ্রিয় ব্যক্তি আমন্ত্রণকারী গৃহকর্তাকে বলছে—না, না, আবার এসব ব্যবস্থা করেছেন! শাক-সুক্তুনিতেই তো বেশ চলত। ঠিক এইরকম একটা ভালমানুষি প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই শান্তনু বললেন—পিতার কাছে একটিমাত্র পুত্রও যা, নিঃসন্তান হওয়াও তাই—অনপত্যৈকপুত্রত্বম্ ইত্যাহুর্ধর্মবাদিনঃ। যজ্ঞ বল, বেদ বল—এ সমস্ত কিছুই পুত্রপ্রাপ্তির সৌভাগ্য থেকে কম। যদি বল—আমি তো পুত্রহীন নই, তবে বলতে হবে—তা ঠিক। তোমাকে নিয়েই আমার অনপত্যতার দোষ খণ্ডন হয়ে গেছে। কিন্তু বাছা! তুমি তো যুদ্ধ ছাড়া থাকতেই পার না। অতএব সেই যুদ্ধে যদি কখনও কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যায়—নান্যত্র যুদ্ধাৎ তস্মাত্তে নিধনং বিদ্যতে ক্বচিৎ—তা হলে তো এই বিশাল বংশটাই নষ্ট হয়ে যাবে—কথঞ্চিৎ তব গাঙ্গেয় বিপত্তৌ নাস্তি নঃ কুলম্।

আকারে, ইঙ্গিতে, ভাষায় শান্তনু বোঝাতে চাইছেন তাঁর আর দু-একটি পুত্রলাভ বড়ই প্রয়োজনীয় এবং সে তাঁর নিজের জন্যও নয়, নেহাত এই বিখ্যাত কুলরক্ষার জন্যই তাঁর পুত্রলাভ প্রয়োজন। আর পুত্রলাভের জন্য তাঁর অন্যত্র বিবাহও প্রয়োজন, কিন্তু কুমার দেবব্রতর স্বার্থে তা যেন তিনি করতেও চান না।

গাঙ্গেয় দেবব্রত মুহূর্তের মধ্যে পিতার আশয় বুঝে নিয়েই হস্তিনাপুরের বৃদ্ধ মন্ত্রী-অমাত্যদের সঙ্গে দেখা করলেন। কারণ সেখানেই সমস্ত খবর সবিস্তারে পেয়ে যাবার কথা। মন্ত্রীরা মহারাজ শান্তনুর গতিবিধি, এমনকী কৈবর্তপল্লিতে দাসরাজার কন্যাপণের শর্তটিও জানিয়ে দিলেন। গাঙ্গেয় দেবব্রত পিতার রোগটি সম্পূর্ণ বুঝতে পারলেন এবার এবং সেই রোগশান্তির জন্য সেইদিনই তিনি কুরুসভার বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়দের নিয়ে কৈবর্তপল্লিতে উপস্থিত হলেন দাসরাজার বাড়িতে।

দাসরাজা যথোচিত সম্মান জানিয়ে কুমার দেবব্রতকে বসতে আসন দেবার আগেই কুমার দেবব্রত কোনও ভণিতা না করে পিতার বিবাহের জন্য তাঁর মেয়েকে যাচনা করলেন—অভিগম্য দাসরাজং কন্যাং বব্রে পিতুঃ স্বয়ম্। এমন ঘটনা পৃথিবীতে কখনও হয়নি, অথবা হওয়া উচিত নয়, আজ সেইরকম এক করুণ ঘটনার সাক্ষী হয়ে উঠলেন গাঙ্গেয় দেবব্রত। কুমার দেবব্রতর এখন যা বয়স, তাতে শান্তনুরই উচিত ছিল কোনও কন্যা-পিতার সঙ্গে যোগাযোগ করে পুত্রের জন্য কন্যা যাচনা করা। কিন্তু নিজেরই বিবাহযোগ্য বয়সে পিতার জন্য দাসরাজার কাছে কন্যা চাইতে এসেছেন কুমার দেবব্রত। এমন দুর্ভাগ্যও যে পুত্রের হয়, সেই পুত্রই একমাত্র জানে জগতে বাঁচা কত কষ্টকর।

দাসরাজা দেবব্রতকে বসতে দিয়েই বললেন—আপনি সত্যিকারের পুরুষ বটে। মহারাজ শান্তনুর আপনি প্রধান অবলম্বন। এই তিন ভুবনে অস্ত্রধারী আছেন যত, তাঁদের মধ্যেও আপনি শ্রেষ্ঠ। কাজেই আপনাকে আর কীই বা বলব! আপনি মহারাজ শান্তনুর জন্য আমার মেয়েকে চাইছেন, এ তো আমার সৌভাগ্য। এমন বৈবাহিক সম্বন্ধ স্বর্গের ইন্দ্রঠাকুর এলেও প্রত্যাখ্যান করবেন না, আমি তো কোন ছার। তবে জানবেন—আমার এই মেয়েটিও বড় সাধারণ নয়। সত্যবতী রাজার ঘরের মেয়ে, আমার ঘরে মানুষ হয়েছে এই যা। যে রাজা সত্যবতীর জন্ম দিয়েছেন, তিনিই আমাকে মহারাজ শান্তনুর কথা বলে গিয়েছেন। বলেছেন, এই শান্তনুই নাকি আমার মেয়ের স্বামী হবে।

দাসরাজা সত্যবতীর জন্মবৃত্তান্ত শুনিয়ে তাঁর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করলেন। সে বৃত্তান্ত অলৌকিক এবং এখানে তা শোনারও প্রয়োজন নেই আমাদের। আমাদের মতে সত্যবতী দাসরাজারই মেয়ে এবং তিনি শান্তনুর মুগ্ধতার সুযোগ নিয়ে নিজের মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে চাইছেন মাত্র। দাসরাজা বললেন—মহাত্মা অসিতঋষির নাম জানেন তো আপনি। তিনিও আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। আমি প্রত্যাখ্যান করেছি মহারাজ শান্তনুর কথা মনে রেখেই। কাজেই শান্তনুর সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে হোক, এতে একবিন্দু আপত্তি নেই আমার। শুধু মুশকিল হয়েছে একটাই এবং একজন মেয়ের বাবা হিসেবে সেটাই আমার একমাত্র চিন্তার বিষয়—কন্যাপিতৃত্বাৎ কিঞ্চিত্তু বক্ষ্যামি ত্বাং নরাধিপ।

দাসরাজা শান্তনুর সঙ্গে তাঁর কন্যার সম্বন্ধ পাকা করতে চান এবং সেইসঙ্গে তাঁর কন্যার ভবিষ্যৎটিও পাকা করতে চান। এ বিষয়ে একমাত্র বাধা হলেন কুমার দেবব্রত। অতএব সে বাধা দূর করার জন্য কুমার দেবব্রতকেই অবলম্বন করছেন দাসরাজা। তিনি বললেন—আমার মেয়ের ঘরের নাতিটি আপনার মতো একটি শত্রু লাভ করুক—এ আমি চাই না। আমি জানি—আপনার মতো মহাবীর যার শত্রু হয়ে দাঁড়াবেন, সে অসুর, গন্ধর্ব যেই হোক, তার রক্ষা নেই। আর সে যদি বেঁচেও থাকে তো সুখে তার জীবন কাটবে না—ন স জাতু সুখং জীবেৎ ত্বয়ি ক্রুদ্ধে পরন্তপ৷ অতএব আমার মেয়ের সঙ্গে আপনার পিতার বিবাহ সম্বন্ধে এইটুকুই যা অসুবিধে রয়েছে, আর কোনও বাধাই নেই—এতাবানত্র দোষো হি নান্যঃ কশ্চন পার্থিবঃ।

কুমার দেবব্রত তখন প্রায় পরিপূর্ণ যুবক। সে তাঁর ত্যাগের বয়স। তাঁর জন্য তাঁর পিতা

বিবাহ করতে পারছেন না—এ তিনি সইবেন কী করে। রাজ্য বা রাজসিংহাসন তাঁর কাছে এমন কোনও বড় জিনিস নয়। দাসরাজার ইঙ্গিত বুঝে সঙ্গে সঙ্গে তিনি কুরুরাজ্যের বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়দের সামনে বলতে আরম্ভ করলেন—আপনি সত্যি কথাটা আমাকে পরিষ্কার জানিয়ে ভাল করেছেন, দাসরাজ! সমবেত ক্ষত্রিয় পুরুষরা শুনুন—এমন প্রতিজ্ঞা কেউ কোনওদিন করেনি। যে মায়ের গর্ভ থেকে জন্মেছে সেও এমন প্রতিজ্ঞা করেনি আর যে এখনও জন্মায়নি সেও ভবিষ্যতে এমন প্রতিজ্ঞা করবে না—নৈব জাতো ন চাজাত ঈদৃশং বক্তুমুৎসহেৎ। আপনি যা বলেছেন, দাসরাজ, তাই হবে। আপনার মেয়ের গর্ভে যে পুত্র জন্মাবে সেই আমাদের সকলের রাজা হবে—যো'স্যাং জনিষ্যতে পুত্রঃ স নো রাজা ভবিষ্যতি।

দাসরাজা যথেষ্ট পাটোয়ারি বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। দেবব্রতর এই প্রতিজ্ঞায় তিনি যে একেবারে বিগলিত হয়ে গেলেন, তা মোটেই নয়। ওপর ওপর খুব মুখমিষ্টি ভাব দেখিয়ে তিনি বললেন—এমন প্রতিজ্ঞা আপনি ছাড়া আর কেই বা করতে পারবে? আজ থেকে শুধু মহারাজ শান্তনুর ওপরেই আপনার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল না, এই সত্যবতীর ওপরেও আপনার অধিকার জন্মাল। আপনি নিজেই এখন এই কন্যা দান করতে পারেন। তবে হ্যাঁ, আরও একটা কথা ছিল। আমরা কন্যাপক্ষের মানুষ তো, সেইজন্যই আগ বাড়িয়ে কথাটা বলতে হচ্ছে—কৌমারিকানাং শীলেন বক্ষ্যাম্যহমরিন্দম। আমি জানি—সমস্ত রাজাদের সামনে যে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা মিথ্যে হবার নয়। তবে একটাই কথা। কুমার! আপনি না হয় রাজা হলেন না। কিন্তু আপনারও তো বিয়ের বয়স হয়েছে। বিয়েও হয়তো হবে শিগগিরই। সেখানে আপনার যে ছেলে হবে, তারও তো একটা হক আসবে রাজ্য পাবার। কাজেই সন্দেহ কিন্তু একটা রয়েই গেল—তবাপত্যং ভবেৎ যত্তু তত্র মে সংশয়ো মহান্।

গাঙ্গেয় দেবব্রতর ভিতরটা পুড়ে গেল নিশ্চয়। তবু মুখে তিনি কোনও বিকার প্রকাশ করলেন না। বললেন—ঠিক আছে, দাসরাজ! আমার পিতার সুখের জন্য আবারও প্রতিজ্ঞা করছি আমি। আমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ছিলাম, সে রাজ্য তো আমি আগেই ত্যাগ করেছি। এখন যাতে আমার পুত্র হওয়ার কোনও সম্ভাবনা না থাকে, তার জন্যও আমি প্রতিজ্ঞা করছি—-অপত্যহেতোরপি চ করিষ্যে'দ্য বিনিশ্চয়ম্। আজ থেকে আমি ব্রহ্মচারীর ব্রত গ্রহণ করলাম, দাসরাজ! আশা করি আর কোনও সন্দেহ নেই তোমার—অদ্য প্রভৃতি মে দাস ব্রহ্মচর্যং ভবিষ্যতি।

নিজের অভীষ্ট স্বার্থ সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়েছে দেখে দাসরাজের শরীর রোমাঞ্চিত হল। তিনি বললেন—আর আমার কোনও বাধা নেই। সত্যবতীকে আমি শান্তনুর হাতে তুলে দিলাম।

মহাকাব্যের বিশাল পরিসরে যখন এমন অভাবনীয় বিরাট ঘটনা ঘটে, পুত্র হয়ে যখন পিতার সুখের জন্য আত্মবলিদানের কীর্তি স্থাপিত হয়, তখন আকাশ থেকে দেবতার আশীর্বাদ ঝরে পড়ে পুষ্পবৃষ্টি হয়ে, অপ্সরা গন্ধর্বরা এমন দৃষ্টান্তে নৃত্য করেন, কিন্নর-কিন্নরীরা তাঁর যশোগান করেন। দেবতারা আকাশবাণী করে বলেন—এমন ভীষণ প্রতিজ্ঞা যাঁর মুখে শোনা যায় তাঁর নাম হোক ভীষ্ম—অভ্যবর্ষত কুসুমৈ-ভীষ্মো'য়মিতিচাব্রুবন্। বস্তুত পিতার জন্য যে পুত্র এমনভাবে নিজেকে উৎসর্গ করে, মানুষের মুখেই যে উচ্চগ্রামের প্রশংসাধ্বনি উচ্চারিত হয়, সেই প্রশংসাই মহাকাব্যের পরিমণ্ডলে অপ্সরা গন্ধর্বের নৃত্যগীত আর দেবতার আশীর্বাদের প্রতিরূপে ধরা দেয়। বস্তুত, সেই প্রশংসাধ্বনিতেই গাঙ্গেয় দেবব্রতর নবতর নামকরণ—ভীষ্ম। আমরাও এখন থেকে তাঁকে এই নামেই ডাকব।

সমবেত রাজাদের সামনে দু-দুটি প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করে ভীষ্ম মহত্ত্বের বর্ম পরিধান করলেন। সেই মহত্ত্ব তাঁর মনুষ্য-হৃদয়কে কতটা ক্ষতবিক্ষত করেছিল, মহাভারতের কবি সে

খবর দেননি। কেননা ভীষ্ম পিতার বিবাহের জন্য কৈবর্তপল্লিতে এসেছেন, আর মহাভারতের কবি তাঁর মায়ের বিবাহ বর্ণনা করছেন। মহাভারতের কবি তাঁর আপন মর্যাদার আরেকটি মানুষকে কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন করার সঙ্গে নিজেও এক কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন। একজনের জনক, আর একজনের জননী।

সত্যবতীর কন্যা-অবস্থায় জন্মলাভ করে যিনি মহাভারতের কবি হয়েছেন, তিনি তাঁর ভ্রাতৃকল্প ভীষ্মের অন্তর্দাহ বোঝেন। তিনি বোঝেন—জনক-জননীর বিবাহ-সরসতা সম্পন্ন করা যত কঠিন, তা বর্ণনা করাও ততটাই কঠিন। বিশেষত তাঁর ভ্রাতৃপ্রতিম ভীষ্ম যাঁকে পিতার ঘরণী করে নিয়ে যাবার জন্য কৈবর্তপল্লিতে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁর অন্তর্দাহ বর্ণনা করতে গেলে তাঁর পূজনীয় জননীর সম্মান বাড়ে না। অতএব ভীষ্মের সম্বন্ধে আর একটি কথাও উচ্চারণ করলেন না মহাভারতের কবি। শুধু তাঁর ওপরে দেবতার পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করে, নবতর নামে তাঁকে চরম মহত্ত্ব দান করে তাঁকে উপস্থিত করেছেন আপন জননীর গৃহপ্রান্তে। পিতার মতো, বরকর্তার মতো তিনিই নববধূকে নিয়ে যাবেন কার্যত ছেলেমানুষ শান্তনুর কাছে।

শান্তনুর তখন যাই বয়স হোক, তিনি তখন যুবক নন নিশ্চয়ই। অন্তত প্রৌঢ় তো বটেই। আর গাঙ্গেয় ভীষ্মর তখন যা বয়স, তা কোনওমতেই সত্যবতীর চেয়ে খুব বেশি নয়। হয়তো তাঁরা প্রায় সমবয়সি৷ দাসরাজার অনুমতি নিয়ে একটি প্রায় সমবয়সি রমণীর কাছে এসে ভীষ্ম বললেন—রথে ওঠো, মা! আমাদের নিজের ঘরে যাব, চলো—অধিরোহ রথং মাতঃ গচ্ছাবঃ স্বগৃহানিতি।

এই যে এক মুহূর্তে একটি প্রায়-সমবয়সি রমণীকে মাতৃ সম্বোধন করেই—আমরা এখন নিজের ঘরে যাব—বলে নিজের সাজাত্যে গ্রহণ করলেন ভীষ্ম—এর মধ্যে মাতৃত্বের দূরত্ব রেখেও সমবয়সির বন্ধুত্বটুকুও ইঙ্গিত করলেন ভীষ্ম। ভবিষ্যতে আমরা দেখব—সত্যবতী এবং ভীষ্ম—দুজনে কেউ কাউকে কোনও দিন অতিক্রম করেননি। ভীষ্ম যে দাসরাজার চক্রান্তে রাজা হলেন না বা তিনি বিবাহ করলেন না—সে বিষয়েও মনস্বিনী সত্যবতীর সমব্যথা ছিল শান্তনুর চেয়ে অনেক বেশি।

ভীষ্ম যেদিন আপন রথে চড়িয়ে পিতার বধূকে পিতার ঘরে নিয়ে এসে তুললেন সেদিন তাঁর পিতার মুখখানি কেমন দেখতে হয়েছিল! যিনি একমাত্র পুত্র কুমার দেবব্রতর মৃত্যুভয়ে বড় চিন্তিত ভাব দেখিয়েছিলেন, তিনি সত্যবতীর মিলনরসে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁকে বর দিলেন—মৃত্যু তোমাকে কিছুই করতে পারবে না, পুত্র! যতদিন তুমি বাঁচতে চাও, ততদিন তোমার আয়ু। মরণ তোমার কাছে আসবে তোমার অনুমতি নিয়ে—ন তে মৃত্যুঃ প্রভবিতা যাবজ্জীবিতুমিচ্ছসি। আমাদের জিজ্ঞাসা হয়—যার মৃত্যুভয়ে এত চিন্তিত ছিলেন শান্তনু তাঁকে বিবাহের পূর্বেই এই আশীর্বাদ দিতে পারতেন। তবে তাতে আর কারও ক্ষতি হত না, ক্ষতি হত শুধু মহাভারতের কবির। তিনি তাঁর মায়ের সম্বন্ধে পাওয়া ভাইটিকে তা হলে মহাকাব্যিক মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন না। পিতার শুষ্ক আশীর্বাদে ভীষ্ম ইচ্ছামৃত্যু হননি, আপন উদার বৈরাগ্যের ফলেই তিনি ইচ্ছামৃত্যু।

লোকে আজকাল—বাপের বিয়ে দেখিয়ে দেব—বলে গালাগালি দেয়, কিন্তু ভীষ্ম আক্ষরিক অর্থে শান্তনুর বিবাহ দিলেন সত্যবতীর সঙ্গে—বিবাহং কারয়ামাস শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা। রূপবতী নববধূর সঙ্গে মিলিত হয়ে পিতা শান্তনু যেদিন আপন ভবনের দ্বার রুদ্ধ করলেন—তাং কন্যাং রূপসম্পন্নাং স্বগৃহে সন্ন্যবেশয়ৎ—সেদিন কেমন লেগেছিল ইচ্ছামৃত্যু ব্রহ্মচারী ভীষ্মের? জননীর সম্মানরক্ষার্থে মহাভারতের কবি সে কথা উচ্চারণ করেননি। শুধু পর পর দুটি বছর দীর্ঘ-দীর্ঘতর হয়ে চলে গেল। ভীষ্ম দেখলেন তাঁর দুটি ভাই হয়েছে—

চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্য।

মহারাজ শান্তনু যে তাঁর এই নবতর দুই শিশুপুত্রকে খুব মানুষ করার কাজে মেতে উঠলেন, তা মনে হয় না। ভীষ্মের শিক্ষাদীক্ষার জন্য মনস্বিনী গঙ্গা যে চেষ্টা করেছিলেন এবং সে, বৈচিত্র্য সম্বন্ধে মহাভারতের কবিকে যে দু-চার কথা খরচা করতে হয়েছে, তার এক বর্ণও এখানে নেই। বেশ বোঝা যায়, মহারাজ শান্তনু তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের এই ছেলেদুটিকে যথেষ্ট পরিমাণ প্রশ্রয় দিয়ে তাঁদের যথাসাধ্য অমানুষ তৈরি করেই স্বর্গারোহণ করেছিলেন। আর কী, শান্তনুর বড় ছেলে চিত্রাঙ্গদ বিনা বাধায় পিতার সিংহাসনে বসলেন।

একজন রাজপুত্রের যতটুকু নীতিশিক্ষা, বিনয়শিক্ষার প্রয়োজন থাকে, তা কিছুই না থাকায় চিত্রাঙ্গদ নিজের বলদর্পিতায় বেশ কিছু সামন্ত রাজাকে পর্যুদস্ত করলেন বটে, তবে তিনি নিজেকে ছাড়া আর কাউকে মানুষ বলে মনে করতেন না—মনুষ্যং ন হি মেনে স কঞ্চিৎ সদৃশম্ আত্মনঃ—কাউকে নিজের সমবুদ্ধিও ভাবতেন না। এই সামান্য কথাটি থেকেই বোঝা যায়—চিত্রাঙ্গদ রাজ্যশাসনের কোনও ক্ষেত্রে মহামতি ভীষ্মের পরামর্শ নিয়ে চলতেন না। ভীষ্মও তেমন মানুষ নন, যে তিনি আগ বাড়িয়ে কোনও উপদেশ দেবেন পুত্রপ্রতিম বৈমাত্রেয় ভাইকে। তিনি নিজের মর্যাদা রেখে সমস্ত ঘটনার ওপর দৃষ্টি রাখছিলেন। ইতিমধ্যে চিত্রাঙ্গদ এক গন্ধর্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা পড়লেন। ভীষ্ম তাঁর প্রেতকার্য সম্পন্ন করেই কিশোরবয়স্ক বিচিত্রবীর্যকে—বালম্ অপ্রাপ্তযৌবনম্—সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মহাভারতের কবি মন্তব্য করছেন যে, কুমার বিচিত্রবীর্য সব ব্যাপারে ভীষ্মের মত নিয়ে বাপ-ঠাকুরদার কাছ থেকে পাওয়া রাজ্যশাসন চালাতেন—ভীষ্মস্য বচনে স্থিতঃ। অন্বশাসন্-মহারাজ পিতৃপৈতামহং পদম্।

বেশ বোঝা যায়, কুমার বিচিত্রবীর্য তাঁর বড় দাদা চিত্রাঙ্গদের অহংকারী মানসিকতা থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন। অথবা যদি তাঁর সে শিক্ষা না থেকে থাকে তবে মনস্বিনী সত্যবতী তাঁকে সেই শিক্ষা দিয়েছিলেন যাতে বিচিত্রবীর্য তাঁর পিতৃকল্প বড় ভাই ভীষ্মকে মেনে চলেন। রাজ্যের আইনকানুন শৃঙ্খলা তথা পররাষ্ট্রনীতির বিষয়ে মহামতি ভীষ্মের মূল্যবান পরামর্শগুলি সর্বান্তঃকরণে মেনে নিতেন বিচিত্রবীর্য। আর এতটা তিনি মেনে নেওয়ার ফলে ভীষ্ম তাঁর সমস্ত শক্তি এবং হৃদয় দিয়ে বিচিত্রবীর্যকে সাহায্য করতে লাগলেন—

স ধর্মশাস্ত্রকুশলং ভীষ্মং শান্তনবং নৃপঃ।
পূজয়ামাস ধর্মেণ স চৈনং প্রত্যপালয়ৎ॥

লক্ষণীয়, এই রাজ্যপালনের বিষয়ে ভীষ্ম তাঁর আপন অভিজ্ঞতায় এবং শক্তিমত্তায় কুরু রাজ্যের একনায়ক হয়ে উঠতে পারতেন। কিন্তু সে সুযোগ থাকলেও ভীষ্ম সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেননি। রাজ্যশাসন এবং প্রজাপালনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি মনস্বিনী সত্যবতীর মত নিয়ে চলতেন—পালয়ামাস তদ্রাজ্যং সত্যবত্যাঃ মতে স্থিতঃ—এবং ভীষ্মের কর্তব্যকর্মগুলি এতটাই নিষ্কাম ছিল যে দিনে দিনে ভীষ্মের ওপর সত্যবতীর আস্থা বাড়ছিল।

বিচিত্রবীর্য যখন রীতিমতো সাবালক হয়ে যৌবনে পদার্পণ করলেন, তখন সম্পূর্ণ এক অভিভাবকের মতোই ভীষ্ম দায়িত্ব বোধ করলেন বিচিত্রবীর্যের বিয়ে দেবার। লোকপরম্পরায় ভীষ্মের কানে এল কাশীরাজের অপূর্ব সুন্দরী তিন কন্যার কথা—অম্বা, অম্বিকা এবং অম্বালিকা। ভীষ্ম আর কাল নষ্ট না করে মেয়ে তিনটিকে কুমার বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে বিয়ে দেবার কথা ভাবলেন। সত্যবতীর সঙ্গে তাঁর যথোচিত পরামর্শ হল এবং ঠিক হয়ে গেল—ভীষ্ম নিজে গিয়ে কাশীরাজের তিন মেয়েকে হস্তিনাপুরে নিয়ে আসবেন। এই ব্যাপারে সত্যবতীর কোনও দ্বিধা ছিল না, কারণ তিনি নিজেও ভীষ্মের রথে চড়েই তাঁর ভাবী স্বামীর ঘরে এসেছিলেন। আর এখন তো কোনও সংকোচই নেই, কারণ এক বৃদ্ধপ্রায় প্রৌঢ় মানুষ

তাঁর পুত্রকল্প কনিষ্ঠ ভাইয়ের জন্য বউদের রথে চড়িয়ে নিয়ে আসবে, তাতে অন্যায়টা কী? অন্তত সত্যবতী এ ব্যাপারে যথেষ্ট আধুনিকা ছিলেন।

আসলে কাশীরাজ্যে পৌঁছোতে ভীষ্মের একটু দেরিই হয়ে গিয়েছিল। তিনি যখন রাজসভায় পৌঁছেছেন, তখন বরণডালা হাতে করে কাশীরাজের তিন কন্যা রাজসভায় এসে গেছেন। সমবেত রাজারা তখন স্বয়ংবরা রাজকুমারীদের সামনে নিজেদের সপ্রতিভ এবং সুন্দর দেখানোর জন্য বসন ভূষণের শেষ ছাঁদটুকু দেখে নিচ্ছেন। স্বয়ংবরসভার ঘোষক সমবেত রাজাদের নাম গুণ পরিচয় বলতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। ভীষ্ম এইসময় এসে রাজসভায় আসন গ্রহণ করেছেন। ভারতবর্ষের কোনও রাজা তখন তাঁর নাম জানেন না বা তাঁকে চেনেন না, এমন হবার কথা নয়। কিন্তু তাঁকে যথেষ্ট জানলেও এবং চিনলেও তিনি কী উদ্দেশ্য নিয়ে স্বয়ংবরসভায় এসেছেন, সে কথা ঘোষকমহাশয়কে তিনি জানাবার সময় পাননি বলেই মনে হয়। কারণ সত্যবতীর সঙ্গে ভীষ্মের আলোচনা শেষ হবার পরে মহাভারতের কবি কাশীরাজের বিবাহসভার এতটুকু বর্ণনাও দেননি। পরের শ্লোকেই তিনি মন্তব্য করেছেন—ভীষ্ম গিয়ে দেখলেন—রাজারা সব এসে গেছেন—সর্বতঃ সমুপাগতান্—স্বয়ংবরা কন্যারাও এসে গেছেন—দদর্শ কন্যাস্তাশ্চৈব—রাজাদের পরিচয় ঘোষণাও আরম্ভ হয়ে গেছে। কাজেই তাঁর উদ্দেশ্য জানাবার কোনও সময় পাননি।

যাই হোক, ভীষ্মের পরিচয় দেবার সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরী রাজকুমারীরা তাঁর দিকে তাকালেন, একটু কাছেও বা এগিয়ে এলেন হয়তো। কিন্তু তাঁকে প্রায় বুড়োমানুষ দেখে অপিচ কোনও বিবাহযোগ্য যুবাপুরুষ তাঁর সঙ্গেও নেই দেখে রাজকন্যারা প্রায় দৌড়ে তাঁর কাছ থেকে সরে গেলেন—অপাক্রামন্ত তাঃ সর্বা বৃদ্ধ ইত্যেব চিন্তয়া। যুবতী রমণীর ত্রস্ত ভীতচকিত অবস্থা দেখলে অনেক পুরুষমানুষই যেমন নিজের চলনেবলনে অক্ষম পুরুষকার প্রকট করে বসেন, রাজকুমারীদের ভীতচকিত অবস্থা দেখে সমবেত রাজা এবং রাজপুত্রেরা তেমনই ভীষ্মকে কটু ভাষায় গালাগালি দিতে আরম্ভ করলেন।

এক রাজা বললেন—লোকে আবার এই লোকটাকে ধার্মিক বলে। ব্যাটা বুড়ো হয়ে গেছে, গায়ের চামড়া ঝুলে পড়েছে, চুলে এমন পাক ধরেছে, তবু কীরকম নির্লজ্জ দেখো। এ বিয়ের আসরে তোর আসার দরকারটা কি—কিং কারণমিহায়াতো নির্লজ্জো ভরতর্ষভ। অন্য আর একজনে বললেন—এ নাকি আবার আজীবন ব্রহ্মচারী। যত সব মিথ্যা কথা। আজকে যেভাবে এই স্বয়ংবরসভায় এসে পৌঁছেছে, তাতে লোকে কী বলবে? ব্রহ্মচারী?—মিথ্যাপ্রতিজ্ঞো লোকেষু কিং বদিষ্যতি ভারত?

কটু কথাই শুধু নয়, সমবেত রাজারা ভীষ্মকে তাচ্ছিল্য করে হাসাহাসি আরম্ভ করলেন—হসন্তি স্ম নৃপাধমাঃ। অনেকক্ষণ ধরে রাজাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য শুনতে শুনতে ভীষ্মের মনমেজাজ চড়তে আরম্ভ করল। সেকালের দিনের অস্ত্রধারী রাজারা পরশুরামের শিষ্য ভীষ্মকে চিনতেন না, তা নয়। ভীষ্মও তাঁদের কথার শান্ত জবাব দিতে পারতেন, এমনকী যে কারণে তাঁর কাশীতে আসা সেই বিচিত্রবীর্যের কথাটাও তিনি বলেই দিতে পারতেন। কিন্তু তার জন্য একটা সম্মানজনক পরিবেশ পরিস্থিতি এবং ভদ্র বাক্যবিনিময় তাঁর কাছে অপেক্ষিত ছিল। সমবেত রাজারা সেই মর্যাদা নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেননি। উপরন্তু তাঁর মতো ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞাত ব্রহ্মচর্য নিয়ে ঠাট্টামশকরা চলেছে। অতএব ভীষ্ম আর সহ্য করলেন না। ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা নিয়ে যখন তাঁকে উপহাস করেছেন রাজারা, তখন ক্ষত্রিয়ের বৃত্তিতেই ভীষ্ম তাঁদের কথার জবাব দেবেন।

অতএব এইসব রাজাদের কাছে তিনি বিচিত্রবীর্যের বিবাহপ্রস্তাব করে নিজের জবাবদিহি রচনা করলেন না। তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং যুদ্ধ করেই যখন এই রাজাদের জবাব

দিতে হবে, তখন কেন তিনি কাশীতে এসেছেন, তার কারণ জানানোরই কোনও প্রয়োজন বোধ করলেন না ভীষ্ম। একবার তিনি শুধু লোকপ্রচলিত বিবাহের নিয়মগুলি বললেন এবং তারপরেই তাঁর সদর্প ঘোষণা—ক্ষত্রিয় পুরুষেরা স্বয়ংবর সভাতে এসে বিপক্ষীয় রাজাদের পরাজিত করে কন্যা হরণ করে নিয়ে যাওয়াটাই বেশি পছন্দ করেন এবং সেই হৃত কন্যার সঙ্গে বিবাহটাই ক্ষত্রিয় পুরুষের সবচেয়ে প্রশস্ত বিবাহ। অতএব এই যে রাজারা সব! আমি আমার নিজের জোরে এই তিন কন্যাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছি—জিহীর্ষামি বলাদিতঃ। আপনাদের শক্তি অনুসারে জয় বা পরাজয়ের জন্য চেষ্টা করতে থাকুন। আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রইলাম—স্থিতো'হং পৃথিবীপালা যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ। ভীষ্ম কাশীরাজের তিন কন্যাকে রথে চড়িয়ে আরও একবার রাজাদের যুদ্ধের আমন্ত্রণ জানিয়ে রথ চালিয়ে দিলেন হস্তিনাপুরীর দিকে।

আমাকে অনেকে ব্যক্তিগতভাবে প্রশ্ন করেন—কী প্রয়োজন ছিল ভীষ্মের? কাশীরাজ্যে তাঁর যাবার কী প্রয়োজন ছিল? আর গেলেনই যখন, তখন গিয়ে কেন বললেন না—আমি নয়। আমি আমার বৈমাত্রেয় ভাই তরুণ বিচিত্রবীর্যের জন্য বধূ নিয়ে যেতে এসেছি। না, ভীষ্ম এসব বলেননি, বলার প্রয়োজনও বোধ করেননি। তিনি জানেন—ক্ষত্রিয় পুরুষেরা জোর করে কন্যা হরণ করেন। তিনিও তাই করছেন, তাতে দোষ কী, অত জবাবদিহিরই বা কী আছে। নিজের ক্ষমতায় এবং ক্ষাত্রশক্তিতে তিনি যা করছেন, তা প্রতিরোধ করার যদি কেউ থাকেন তো করে দেখুন—এই হল ভীষ্মের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া। দ্বিতীয় যে যুক্তিটা আছে—সে হল তাঁর অবচেতনের কথা। সে কথা মহাভারতের কবি স্বকণ্ঠে বলেননি বটে, তবে ভীষ্ম মহাকাব্যের অন্যতম বিরাট চরিত্র বলেই সে কথা আমাদের ভাবতে হবে।

এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক ঔপন্যাসিক লিখেছিলেন—প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই—সে তার বয়স যাই হোক—এক অভিমানী কিশোর থাকে। আমাদের যুক্তি বুঝতে হলে ভীষ্মের অন্তরশায়ী সেই অভিমানী কিশোরটিকে মনে রাখা চাই। আজ থেকে কত বছর আগে এই ভীষ্ম তাঁর পিতার বিয়ের জন্য কৈবর্তপল্লিতে গিয়ে প্রায় নিজের সমবয়সি একটি মা নিয়ে এসেছিলেন। আজ সেই পিতারই অন্য এক পুত্রের জন্য তিনি কাশীরাজ্যে এসেছেন ভাইয়ের বউ নিয়ে যেতে। আমরা কি এইসব মুহূর্তে একবারও এই প্রৌঢ়-বৃদ্ধ মানুষটির অন্তরশায়ী অভিমানী কিশোরকে দেখেছি। আমি বলি—দেখেছি, কিন্তু বুঝিনি। কাশীরাজ্যে এসে যে মানুষটি কোনও কথা না বলে কোনও জবাবদিহি না করে বরাসনে বসেছিলেন, সেই মানুষটিই হল সেই অভিমানী কিশোর।

আমরা এমন মানুষ অনেক দেখেছি—পুরুষ অথবা স্ত্রী যেই হোক—দেখেছি, তাঁরা কেউ এ জন্মে বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন না। অন্য মানুষের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, স্ত্রী-পুত্রলাভের পরিণতির সঙ্গে মনের পরিণতি ঘটে, পরিবর্তনও ঘটে। কিন্তু বিয়ের পিঁড়ি না-ছোঁয়া মানুষদের অনেকের মধ্যেই আমরা এই পরিবর্তন দেখি না, পরিণতি তো নয়ই। যে যৌবনকাল থেকে তাঁরা এই কৌমার্য বহন করে উত্তর প্রৌঢ়তায় পৌঁছোচ্ছেন, তাঁদের অনেকের মধ্যেই দেখি সেই কৌমার্যের মনটুকু থেকে যায়, কুমারবয়সের আমোদটুকু রয়ে যায়। ভীষ্মের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তিনি বিচিত্রবীর্যের জন্য মেয়ে আনতে গেছেন বটে, কিন্তু স্বয়ংবরসভার বরাসনে বসলে যে আমোদটুকু হয়, সেই আমোদমাত্রই তিনি উপলব্ধি করতে চেয়েছেন, তার বেশি কিছু নয়। তাঁর অসীম শক্তি আছে, নিপুণ অস্ত্রকৌশল তাঁর অধিগত, অতএব তরুণ রাজাদের মতো একই সঙ্গে সমাসনে বসলেই বা কে আমায় কী করতে পারে—এইরকম একটা বেপরোয়া ভাব নিয়েই ভীষ্ম একটু আমোদ পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রখর বাস্তব সে আমোদ তাঁকে পেতে দিল কই? কাশীরাজের তিন সুন্দরী কন্যা 'বৃদ্ধ' বলে তাঁর দিকে মুখ বেঁকিয়ে চলে গেলেন, আর তরুণ রাজারা বৃদ্ধের আমোদে দুয়ো দিলেন, ঠাট্টা করলেন। ভীষ্মের ক্রোধাগ্নি উদ্দীপিত হল—ক্ষত্রিয়াণাং বচঃ

শ্রুত্বা ভীষ্মশ্চুক্রোধ ভারত।

অভিমানী কিশোর-বুড়ো ভাবলেন—বুড়ো তো বুড়ো, তোরা স্বয়ংবরা হয়েছিস, আর আমিও ক্ষত্রিয় পুরুষ। তোদের তারুণ্যের শক্তি থাকে তো আটকা এই বুড়োকে, ডেকে আন তোদের তরুণ রাজাদের—তে যতধ্বং পরং শক্ত্যা বিজয়ায়েতরায় বা। ভীষ্মের হাঁকডাক শুনে স্বয়ংবরসভার বিবাহেচ্ছু রাজাদের ক্রোধ চরম বিন্দুতে পৌঁছোল। যে রমণীদের তাঁরা নিজেদের ভবিষ্যদ্‌ভোগ্যা ভেবে সরসতা লাভ করছিলেন, তাদের তুলে নিয়ে গেল এক বুড়ো! তাও এত কথা শুনিয়ে। রাজারা হাত কামড়ে ঠোঁট কামড়ে, মণিমুক্তোর ভূষণ খুলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। রণসাজে সেজে তূরীভেরি বাজিয়ে তাঁরা ছুটলেন ভীষ্মের পেছন পেছন। ভীষ্ম একা, রাজারা অনেক। ভয়ংকর যুদ্ধ আরম্ভ হল—একস্য চ বহূনাঞ্চ তুমুলং লোমহর্ষণম্।

ভীষ্ম পরশুরামের শিষ্য, সেই অল্প বয়সে, বাণবর্ষণের পরম্পরায় তিনি গঙ্গানদীর স্রোত বেঁধে ফেলেছিলেন। এই পরিণত বয়সে তাঁর বাণবর্ষণের ক্ষিপ্রতায় শত্রু রাজারাও অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ভীষ্মের দিকে। তাঁরা যুদ্ধে হারলেন, লজ্জায় অধোমুখ হয়ে ভীষ্মের প্রশংসা করতে করতেই ঘরের দিকে রওনা দিতে হল তাঁদের—শত্রবো'প্যভ্যপূজয়ন্। আপন ক্ষমতায় যুদ্ধ জিতে নিশ্চিন্ত মনে কল্পিত ভ্রাতৃবধূদের নিয়ে তিনি ফিরে চললেন হস্তিনাপুরের পথে—কন্যাভিঃ সহিতো প্রায়াদ্ ভারতো ভারতান্ প্রতি।

ভীষ্ম এখনও পর্যন্ত কন্যাদের বলেননি যে, তিনি তাঁদের পাণিপ্রার্থী নন। তিনি তাঁদের শুধু রথে বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন মাত্র। যাঁরা এই মুহূর্তে ভীষ্মের এই ইচ্ছাকৃত মৌনতায় ক্ষুব্ধ তাঁদের জানাই—ভীষ্মকে আমরা যতই এক বৃদ্ধ পিতামহের মানসিকতায় দেখি না কেন, অন্তরে তিনি যে এক ভীষণ রসিক মানুষ, অভিমানী তো বটেই। এই মেয়েরা তাঁকে বুড়ো বলে অপমান করেছে। অতএব তিনিও তাঁদের 'টেনশন' রেখেই দিয়েছেন। ভাব দেখাচ্ছেন —যেমন অপমান করেছিলি, এখন বোঝ এই বুড়োই তোদের গতি। যৌবনের প্রথম উন্মেষে যে মধুর সরসতায় তিনি ব্রহ্মচারী থাকার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেই সরসতাই তাঁকে এমন রসিকটি করে তুলেছে।

বলতে পারেন, নিরীহ যুবতীদের নিয়ে বৃদ্ধের এই রসিকতা মোটেই ভাল নয়, তা হলে বলব—তিনি তাঁর পিতার জন্য নির্দিষ্ট আপন বিমাতাকেও নিজের রথে চড়িয়েই নিয়ে এসেছিলেন পিতার সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য—রথমারোপ্য ভাবিনীম্। তফাত এইটুকুই যে, তাঁর বিমাতা জানতেন কার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবে। আর এই কন্যারা এখনও জানেন না যে, তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছেন কুমার বিচিত্রবীর্য। তাঁরা ভাবছেন—এই বুড়োই তাঁদের স্বামী হবেন। ভাবী ভাইবউদের সঙ্গে এই রসিকতার লোভটুকু যে বৃদ্ধ সামলাতে পারছেন না, তাঁকে দুষ্টু বলতে পারি, দুষ্টু-রসিক বলতে পারি, কিন্তু খল বলতে পারি না। আর যা বলতে পারি, তা বাঙাল ভাষায় দাঁড়ায়—রঙ্গিলা ভাসুর তুমি ক্যান্ দ্যাওর হইলা না।

অতএব সেই পিতার বিবাহের দিন থেকেই ভীষ্ম যেভাবে কৌরব পরিবারের সর্বময় স্বাত্মপ্রযুক্ত অভিভাবক নিযুক্ত হয়েছিলেন, সেই অভিভাবকত্বের জোরেই আজও তিনি ভ্রাতৃবধূদের রথে চড়িয়ে নিয়ে আসছেন। তাঁকে কেউ দোষের ভাগী করেন না। পিতা শান্তনুও তাঁকে কোনও কিছু বলেননি, সময়বয়সি জননী সত্যবতীও কিছু বলেননি এবং ভাই বিচিত্রবীর্যও তাঁকে কিছু বলবেন না। যিনি যৌবনের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে সমস্ত পরিবারের জন্য আত্মবলি দেন, তাঁর দোষ ধরার মতো আহাম্মক আমরা অন্তত নই। তাঁর ইতস্তত ব্যবহারগুলি তাঁর অনুকূলে দেখলে পরে ভীষ্মের ওপর কখনও রাগ হবে না, বরং মায়া হবে।

ভীষ্মের অসামান্য অস্ত্রনৈপুণ্যে যুগপৎ ভীত এবং মুগ্ধ হয়ে স্বয়ংবরসভায় পূর্বাগত রাজারা যখন বিপরীত দিকে ফিরে যাচ্ছেন, তখন সৌভদেশের রাজা শাল্ব একাকী ভীষ্মের পিছনে তাড়া করলেন। সৌভপতি শাল্ব অসামান্য বীর। ভবিষ্যতে স্বয়ং কৃষ্ণের হাতে তিনি পর্যদস্ত হবেন। কিন্তু এখন তাঁর যুবক বয়স। এখনকার ভারতবর্ষের পশ্চিম অঞ্চলের একাংশ, যেটাকে আমরা আলওয়ার বলি, সেই আলওয়ারই ছিল তখনকার সৌভদেশ। শাল্ব সে দেশের প্রবল পরাক্রান্ত রাজা।

যে তিন রমণীকে ভীষ্ম জোর করে রথে উঠিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা যিনি, সেই অম্বা শাল্বরাজার পূর্বপ্রণয়িনী ছিলেন। যেভাবেই হোক, কাশীরাজ্যেই অম্বার সঙ্গে শাল্বরাজার প্রথম দেখাশোনা এবং প্রণয় সংঘটিত হয়। স্বয়ং কাশীরাজেরও তাঁদের প্রণয়-পরিণতিতে আপত্তি ছিল না। ঠিক ছিল—কাশীরাজ্যের স্বয়ংবরসভায় অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে শাল্বরাজাও এসে বরাসনে বসবেন। আর অম্বা সেই স্বয়ংবরসভায় ঢুকে অন্যান্য রাজাদের দিকে দু-একবার লোকদেখানো দৃষ্টিপাত করেই শাল্বরাজার গলায় বরমাল্য ঝুলিয়ে দেবেন। পূর্বপ্রণয় এইভাবেই বিবাহে রূপান্তরিত হবে। এই ঠিক ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে কুরু-প্রৌঢ় ভীষ্ম এসে জুটলেন স্বয়ংবরসভায় আর প্রণয়ীযুগলের সমস্ত পরিকল্পনা বিপর্যস্ত হয়ে গেল।

স্বয়ংবরসভায় সমাগত রাজারা যখন ভীষ্মের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে রণে ভঙ্গ দিলেন, তখন শাল্বরাজ নিজের কারণেই আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হলেন। তিনি একা ভীষ্মের পেছনে ধাওয়া করলেন নিজের অমিত শক্তির ওপর নির্ভর করে।—ততস্তং পৃষ্ঠতো রাজন্ শাল্বরাজো মহারথঃ। তাঁর পূর্বপ্রণয়িনীকে অন্য একজন জোর করে রথে তুলেছে এবং সেও নিশ্চয়ই তাঁর প্রণয়িনীর পাণিপ্রার্থী—এইরকম একটা ধারণা করেই শাল্বরাজা ভীষ্মকে আঘাত হানলেন পিছন থেকে। মহাভারতের কবি উপমাটি দিয়েছেন চমৎকার। বলেছেন—একটি হস্তী হস্তিনীর পেছন পেছন যেতে থাকলে, তার থেকে বেশি শক্তিমান যূথপতি হস্তী যেমন পূর্বগামী হস্তীটির পিছনে দাঁত দিয়ে আঘাত করে, শাল্বও সেইভাবেই ভীষ্মকে আঘাত করলেন পিছন থেকে—বারণং জঘনে ভিন্দন্ দন্তাভ্যামপরো যথা।

শাল্বরাজ ভীষ্মকে কটুক্তি করে বললেন—স্ত্রীলোকের কামনা খুব পেয়ে বসেছে, ব্যাটা! থাম—স্ত্রীকামস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি। ভীষ্ম নিরুদ্বেগে পেছন দিকে মুখ ঘোরালেন। আকুঞ্চিত ললাটে জিজ্ঞাসার চিহ্ন অঙ্কিত হল—এটি আবার কে? একমুহূর্তে ভীষ্ম রথ ঘোরালেন শাল্বরাজের দিকে। মহাভারতের কবি আবারও উপমা দিলেন—একটি গাভীর জন্য দুটি মহাবৃষ যেমন গর্জন করতে করতে পরস্পরের অভিমুখী হয়, ভীষ্ম এবং শাল্ব সেইভাবেই পরস্পরের অভিমুখী হলেন—তৌ বৃষাবিব নর্দন্তৌ বলিনৌ বাসিতান্তরে। দুই মহাবীরের যুদ্ধকৌতুক দেখার জন্য পূর্বে বিজিত রাজারা যুদ্ধভূমির দুই ধারে দাঁড়িয়ে গেলেন।

ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হল। শাল্বরাজা যথেষ্ট বীরত্ব দেখালেন বটে কিন্তু সেদিন ভীষ্ম ছিলেন অপ্রতিরোধ্য। তিনি সারথিকে বললেন—আমার রথটা একেবারে ওর সামনে নিয়ে ফেলো তো। তারপর গরুড় যেমন সাপ ধরে তেমন করেই মারব এটাকে—যাবদেনং নিহন্মদ্য ভূজঙ্গমিব পক্ষিরাট্। বললেন বটে, কিন্তু বিবাহসভায় এসে এক বিবাহেচ্ছু রাজাকে তিনি মৃত্যুদণ্ড দিলেন না। শাল্বরাজার সারথি মারা পড়ল, তাঁর ঘোড়াগুলিও মারা পড়ল। আর এমনভাবেই শাল্বরাজাকে বাণে বাণে পর্যুদস্ত করলেন ভীষ্ম যাতে শাল্বরাজার জীবনটাই অবশিষ্ট রইল শুধু—জিত্বা বিসর্জয়ামাস জীবন্তং নৃপসত্তমম্। ক্ষুব্ধ, জর্জরিত, অপমানিত শাল্বরাজা নিজের দেশে ফিরে গেলেন। আর কুরুকুলপতি ভীষ্মও বিনা বাধায় রথ চালিয়ে দিলেন হস্তিনাপুরের দিকে। অনেক নদী বন পাহাড় পেরিয়ে কাশীরাজের তিন কন্যাকে নিয়ে ভীষ্ম পৌঁছোলেন হস্তিনায়। মহাভারতের কবি এতক্ষণ মধুর রসিক ভীষ্মের কীর্তিকলাপ বর্ণনা করে এইবার ছোট্ট মন্তব্য করলেন—শ্বশুর যেমন পুত্রবধূদের সঙ্গে ব্যবহার করেন, বড় ভাই

যেমন ব্যবহার করেন আপন কনিষ্ঠা ভগিনীদের সঙ্গে—স্নুষা ইব স ধর্মাত্মা ভগিনীরিব চানুজাঃ—অথবা পিতা যেমন ব্যবহার করেন তাঁর আত্মজা কন্যাগুলির সঙ্গে, ভীষ্ম সেই ব্যবহারেই কাশীরাজের তিন কন্যাকে কুরু দেশে নিয়ে এলেন। নিয়ে এলেন শুধু তাঁর বৈমাত্রেয় ছোট ভাইটি খুশি হবেন বলে—ভ্রাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।

কাশীরাজের তিন কন্যাকে নিয়ে ভীষ্ম এবার উপস্থিত হলেন জননী সত্যবতীর কাছে। সত্যবতীর চরণবন্দনা করে ভীষ্ম বললেন—তোমার ছেলের বিয়ের জন্য তিন তিনটি মেয়ে নিয়ে এসেছি, মা! ওঁদের স্বয়ংবর হচ্ছিল, ফলে নিজের বীরত্ব প্রকাশ করে অন্য রাজাদের পরাজিত করে আমি ওঁদের হরণ করে নিয়ে এসেছি। এমন কাজে ক্ষত্রিয়দের দোষ হয় না বলেই আমি এ কাজ করেছি এবং করেছি বিচিত্রবীর্যের জন্য—বিচিত্রবীর্যস্য কৃতে বীর্যশুল্কা হৃতা ময়া। ভীষ্মের চেষ্টা এবং ত্যাগে সত্যবতী একেবারে মুগ্ধ অভিভূত হয়ে গেলেন। কোনওদিনই এই বয়স্ক পুত্রটিকে তিনি অবহেলা করেননি। আজ বৈমাত্রেয় ভাইয়ের জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করে ভীষ্মের এগিয়ে যাওয়া দেখে সত্যবতী সত্যিকারের মুগ্ধ হলেন। সার্থক জননীর মতো ভীষ্মর মস্তকাঘ্রাণ করে তিনি বললেন—পুত্র! ভাগ্যবশে তোমার কোনও ক্ষতি হয়নি। এতগুলি রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করে জিতে এসেছ তুমি। তোমার যে কিছু হয়নি, এই আমার ভাগ্য—আহ সত্যবতী হৃষ্টা দিষ্ট্যা পুত্র জিতং ত্বয়া।

সবাই বলেন—কেন গেলেন ভীষ্ম? কেন এই বুড়ো বয়সে স্বয়ংবরসভায় গিয়ে এমন ‘সিন’ তৈরি করলেন তিনি? এঁরা যদি একবারও বুঝতেন—কুরুবংশের অঙ্কুরগুলি সযত্নে রক্ষা করার জন্য ভীষ্মের আকুলতা কতখানি। তিনি নিজে রাজা হবেন না, অথচ আপন পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্রটি বেঘোরে মারা গেছেন। এখন একমাত্র ভরসা ছোট ভাই বিচিত্রবীর্য। স্বয়ংবরসভায় গিয়ে যদি যুদ্ধবিগ্রহ লাগে এবং যে যুদ্ধবিগ্রহ তখনকার দিনে প্রায়ই হত, তো সেখানে একা এই কুলের প্রদীপিকাস্বরূপ বিচিত্রবীর্যের যদি কোনও প্রাণহানির আশঙ্কা থাকে, সেইজন্যই বিচিত্রবীর্যকে ভীষ্ম যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে ঠেলে দেননি। তিনি নিজে গেছেন, নিজের জীবন বিপন্ন করে। তবু অপমানও তাঁর কম সইতে হয়নি। কাজেই আজ যখন সত্যবতী তাঁর কর্মচেষ্টার সমাদর করলেন, তখনই ভীষ্ম সার্থক মনে করলেন নিজের জীবন। নিন্দুকরাও সঙ্গে সঙ্গে বুঝল কেন এই বুড়ো বয়সে এহেন রোমাঞ্চকর অভিযান।

কন্যাদের বিবাহ নিয়ে এবারে আসল কথাবার্তা আরম্ভ হল। বিবাহের দিনক্ষণ মাঙ্গলিক সব কিছু নিয়ে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা চলল। এত যে দিন গেল, তবু কিন্তু সেই কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যাটির মুখে কোনও কথা শোনা যায়নি, তাঁর পূর্ব প্রণয়ের কথাও না। বিজিত শাল্বরাজ যেদিন নতমুখে রাজধানীতে ফিরে গেলেন, সেদিনও অম্বা কিছু বলেননি এবং এখনও এই রাজধানীতে আসার পরেও—ভীষ্মের কথা ছেড়েই দিলাম, তিনি জননী সত্যবতীর কাছেও তো কিছু বলতে পারতেন। কিন্তু তিনি কিচ্ছুটি বললেন না।

তারপরে একদিন যখন বিচিত্রবীর্যের বিবাহ সংক্রান্ত আলোচনার জন্য ভীষ্ম ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বসে আছেন, ঠিক তখনই একসময় অম্বা এসে উপস্থিত হলেন সকলের সামনে। সামান্য হেসে তিনি ভীষ্মকে বললেন—ধর্মজ্ঞ, আমার একটু কথা আছে আপনার সঙ্গে। ভীষ্ম উৎকর্ণ হতেই অম্বা বললেন—অনেক আগেই, আমাদের ওই স্বয়ংবরসভা সংঘটিত হওয়ার অনেক আগেই আমি মনে মনে সৌভপতি শাল্বরাজকে বরণ করেছি—ময়া সৌভপতিঃ পূর্বং মনসাভিবৃতঃ পতিঃ। আর শাল্বরাজও আমার ইচ্ছে মেনে নিয়ে আমাকেই বিবাহ করবেন বলে ঠিক করেছিলেন। এমনকী এ বিবাহে আমার পিতা কাশীরাজেরও সম্মতি ছিল—এষ কামশ্চ মে পিতুঃ। সামান্য কটি কথা অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে বলে অম্বা বুঝিয়ে দিলেন যে, যদি সুস্থভাবে স্বয়ংবরসভার কাজ শেষ হত, তা হলে অম্বার হস্তস্থিত বরমাল্যখানি তখনই শাল্বরাজের কণ্ঠে শোভা পেত—ময়া বরয়িতব্যো’ভূছ্ছাল্ব-স্তস্মিন্ স্বয়ম্বরে।

অম্বা যতটুকু কথা বলেছেন, তাতে বোঝা যায়—তাঁর ইচ্ছাগুলি একেবারে বিলাসমাত্র ছিল না। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর জীবনের যতটুকু অনর্থ ঘটেছে, তা ভীষ্মের জন্যই ঘটেছে। নইলে এক নরনারীর ঈপ্সিত মিলনই এখানে একমাত্র ঘটনা নয়, সম্পূর্ণ একটি পরিবার অম্বার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করছিল। অম্বা বেশ বুদ্ধি করেই কথাগুলি পেড়েছেন এবং তা পেড়েছেন এক ব্রাহ্মণসভার সামনে। বাগদত্তা কন্যাকে সে যুগে অনেক ক্ষেত্রেই বিবাহিতা রমণীর সাযুজ্যে দেখা হত। কাজেই ভীষ্ম যদি অম্বার কথা নাও মেনে নেন, সে ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণরা এক রমণীর পূর্বপ্রণয় এবং বাগদানের সংকল্পকে মাথায় রেখে বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে যাতে তাঁর বিয়ে না হয়, সে বিষয়ে ভীষ্মকে সৎ পরামর্শ দেবেন। আর ব্রাহ্মণদের কথার ওপর ভীষ্মের ব্যক্তিগত মত এবং কর্তৃত্ব কোনওটাই তেমন করে খাটবে না।

যাই হোক, ভীষ্ম ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি, যুদ্ধ এবং রাজনীতি ছাড়াও জীবনের অন্যান্য বিচিত্র ক্ষেত্রেও তাঁর অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধি কিছু কম নয়। অতএব, যে রমণী একবার অন্য পুরুষের প্রেমে আবদ্ধ হয়েছিল তাকে জোর করে ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলে দুটি জীবনই যে বঞ্চিত হয়ে থাকবে, সে কথা ভীষ্ম সঙ্গে সঙ্গেই বুঝেছেন। অম্বা নিজেও ভীষ্মকে বলেছিলেন—আপনি আমাকে জোর করে এখানে নিয়ে এসেছেন বটে, কিন্তু জোর করে আপনার ভাইকে ভালবাসাবেন কী করে, কীভাবেই বা এই কুরুবাড়িতে ধরে রাখবেন আমাকে? সে কি আপনার ধর্মে সইবে, আপনি না কৌরব—বাসয়েথা গৃহে ভীষ্ম কৌরবঃ সন্ বিশেষতঃ? অম্বা বললেন—রাজধর্ম নয়, যুক্তিতর্কও নয়, আপনি আপনার বুদ্ধি এবং মন দিয়ে বিচার করে দেখুন যে, এখানে আপনি আমাকে ধরে রাখতে পারেন কি না—এতদ্‌বুদ্ধ্যা বিনিশ্চিত্য মনসা ভরতর্ষভ। অম্বা জানিয়ে দিলেন—শাল্বরাজ এখনও আমার জন্য অপেক্ষা করছেন—স মাং প্রতীক্ষতে ব্যক্তম্—অতএব আপনি আপনার ধর্ম এবং বিচারবুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে আমার প্রতি সুবিচার করুন।

সমবেত ব্রাহ্মণদের মধ্যে অম্বার এই পরিষ্কার বক্তব্য থেকে ভীষ্ম যেমন বিব্রত হয়ে পড়লেন, তাতে আরও ভাল করে বোঝা গেল যে, সে যুগের ভারতবর্ষে স্ত্রী-স্বাধীনতা এমন কিছু কম ছিল না। যারা বলেন—সে কালের ভারতবর্ষ মানেই স্ত্রীলোকের আতঙ্ক আর অত্যাচারের ইতিহাস, তাঁদের কাছে আমরা অম্বার উদাহরণ দিয়ে থাকি। রাজধানীর অন্দরমহল ছেড়ে এসে ব্রাহ্মণদের সামনে ভীষ্মের মতো বিশালবুদ্ধি মানুষকে অপ্রতিভ করে দিতে তাঁর এতটুকু অসুবিধে হয়নি। ভীষ্ম তাঁর কথা শুনে অসম্ভব বিব্রত হয়েছেন এবং ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আলোচনা করে—বিনিশ্চিত্য স ধর্মজ্ঞো ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ—যথাশীঘ্র তাঁকে শাল্বরাজার কাছে যাবার অনুমতি দিলেন। শুধু অনুমতি নয়, অম্বা যাতে নির্বিঘ্নে এবং সুরক্ষিতভাবে শাল্বরাজার দেশে ফিরে যেতে পারেন তার জন্য একজন ব্রাহ্মণ এবং একটি ধাত্রীরও ব্যবস্থা করে দিলেন ভীষ্ম।

যথাসময়ে অম্বা শাল্বপুরে পৌঁছোলেন। শাল্বরাজার সঙ্গে দেখা হলে অম্বা সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করলেন তাঁর কাছে। বললেন—আমি তোমার কাছেই এসেছি চিরকালের জন্য। তুমি আমাকে সাভিনন্দনে গ্রহণ করো, আমি চিরকাল তোমার ভাল চাই বলেই এইভাবে চলে এসেছি—অভিনন্দস্ব মাং রাজন্ সদাপ্রিয়হিতে রতাম্। অম্বা আরও বললেন—আমি সুচিরকাল তোমার কথাই ভেবে এসেছি আর তুমিও আমাকে তোমার স্ত্রী হিসেবেই চেয়েছিলে—ত্বং হি মে মনসা ধ্যাতস্ত্বয়া চাপ্যুপমন্ত্রিতা। অতএব আমাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেই তুমি তোমার ধর্ম পালন করো।

অম্বার কথা শুনে শাল্বরাজ মোটেই পুলকিত হলেন না। বাঁকা হাসি হেসে তিনি ভীষ্মের কথা তুললেন। বললেন—একজন পুরুষ যে রমণীকে স্ত্রী-কামনায় হরণ করে নিয়ে

গিয়েছিল, সে রমণী তো অন্যের। তাঁকে আমি স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করি কী করে—ত্বয়াণ্যপূর্বয়া নাহং ভার্যার্থী বরবর্ণিনী। ভদ্রে! তুমি ভীষ্মের কাছেই যাও। সে সমস্ত রাজাদের পরাজিত করে তোমাকে জোর করেই ধরে নিয়ে গিয়েছিল, স্পর্শও করেছিল তোমাকে—পরামৃষ্য মহাযুদ্ধে নির্জিত্য পৃথিবীপতীন্। শাল্বরাজের কথা শুনে অম্বা একেবারে নির্বাক হয়ে গেলেন। অম্বার হৃদয়ে শেষ আঘাত হেনে শাল্বরাজ কথা শেষ করে বললেন—আরও একটা কথা। ভীষ্ম যখন সমস্ত রাজাদের জয় করে তোমাকে নিয়ে গেলেন, তখন তো বেশ খুশি খুশিই দেখাচ্ছিল তোমাকে—ত্বং হি ভীষ্মেণ নির্জিত্য নীতা প্রীতিমতী তদা।

হায়! আজ কী শুনতে হচ্ছে অম্বাকে! তাঁর স্বপ্নের প্রেমিক, যাঁর ওপর সমস্ত বিশ্বাস নিয়ে তিনি এখানে চলে এসেছেন, যাঁর প্রতীক্ষার কথা জানিয়ে ভীষ্মের কাছ থেকে তিনি সসম্মানে মুক্ত হয়ে চলে এসেছেন, তিনি এখন বলছেন—ভীষ্ম তোমাকে নিয়ে যাবার সময় বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছিল তোমাকে। অম্বা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করেছেন বটে—মোটেই নয়, মোটেই আমাকে খুশি খুশি দেখাচ্ছিল না। ভীষ্ম আমাকে জোর করে তুলে নিয়ে গেলেন, আর তাতে আমি খুশি হব? তুমি এমন ভাবলে কী করে। বিশেষ করে একথা তুমি এমন করে বোলো না—মৈবং বদ মহীপাল...নাস্মি প্রীতিমতী নীতা। আমি রীতমতো কাঁদতে কাঁদতে ভীষ্মের রথে উঠেছিলাম এবং তিনি আমাকে নিয়েও গেছেন জোর করে, সমস্ত রাজাদের বাধা বিপর্যস্ত করে—বলান্নীতাস্মি রুদতী বিদ্রাব্য পৃথিবীপতীন্।

অম্বা খুব জোরেই প্রতিবাদ করেছিলেন বটে, কিন্তু এক সুন্দরী যুবতীর অযান্ত্রিক মনের কথা কে বলতে পারে! শাল্বরাজাও বা কেন একমুহূর্তের জন্য সেই রথারূঢ়া বিপন্না রমণীর মুখে প্রীতির আভাস দেখতে পেলেন? যে মুহূর্তে প্রৌঢ়-বৃদ্ধ ভীষ্ম শাল্বরাজাকেও অনায়াসে জয় করে তাঁকে শুধু প্রাণদান করে ছেড়ে দিলেন, তখন সেই মুহূর্তে এই যুবতী রমণীর অযান্ত্রিক মনের মধ্যে কোনও অবাক বিস্ময় জাগেনি তো? শাল্বরাজের মতো মহাবীরকে যে ব্যক্তি অমন করে পরাভূত করতে পারেন, তাঁর প্রতি সুন্দরী অম্বার কোনও বীরপূজার ভাব জাগ্রত হয়নি তো? হয়তো প্রকাশ্য চেতন মনে তেমন কিছু হয়নি, কিন্তু যুবতীর অবচেতন থেকে সে ভাব এক মুহূর্তের জন্যও যদি অম্বার মুখে ছায়া ফেলে থাকে, তবে সেই মুহূর্তটি হয়তো শাল্বরাজের চোখেই ধরা পড়ে থাকবে, অম্বা হয়তো তা জানেনও না।

যে মুহূর্তে শাল্বরাজাকে শুধু প্রাণে না মেরে ছেড়ে দিলেন ভীষ্ম, সেই মুহূর্তে কাশীরাজবালার মুগ্ধ বালিকাহৃদয় কি একবারের তরেও ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল? নইলে শাল্বকে তিনি অত ভালবাসেন, তো সেই ভালবাসার মানুষটির কথা রথের ওপর দাঁড়িয়েই ভীষ্মকে বললেন না কেন? কেন বললেন না—যাঁকে তুমি বাণে বাণে ধূলিশায়িত করেছ, ওই ধূলিশায়ী মানুষটিই আমার ভালবাসার মানুষ। অম্বা বলেননি। কেন বলেননি? আহত পরাজিত ব্যক্তিটিকে প্রেমিক বলতে লজ্জা হয়েছে কি অম্বার? যে লজ্জা ভেঙে তিনি ব্রাহ্মণদের সভায় এসে সোচ্চারে শাল্বের নাম উচ্চারণ করেছিলেন, ভালবাসার সেই দৃঢ় উচ্চারণ হস্তিনাপুরের গমনপথেই শব্দিত হতে পারত। কিন্তু তা হয়নি; কত নদী বন পাহাড় পেরিয়ে সেই প্রৌঢ়-বৃদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে তিনি এসেছেন। অথচ একবারের তরেও শাল্বরাজের নামও তিনি উচ্চারণ করলেন না।

আমরা বেশ জানি—ভীষ্মের পরবর্তী আচরণ থেকেই জানি—তিনি বাধা দিতেন না। অথচ, না রথে উঠবার সময়, না রথে যেতে যেতে, না তাঁর একান্ত প্রিয়তম শাল্বরাজ যুদ্ধে প্রতিহত হওয়ার সময়—একবারও তাঁর নাম উচ্চারণ করলেন না অম্বা। অন্তত সেই মুহূর্তে ভীষ্মের মুখের মধ্যে তিনি কী দেখেছিলেন? হয়তো সেই খণ্ড মুহূর্তটিই চিত্রার্পিত হয়ে আছে শাল্বরাজার হৃদয়ে—অম্বাকে খুশি খুশি দেখাচ্ছিল—নীতা প্রীতিমতী তদা। হয়তো এই চিত্রার্পিত মুহূর্তটি সত্য নয়, হয়তো বা কি সত্যই। রমণীর হৃদয় কে জানে?

অম্বা শাল্বরাজের আচরণে হতবাক হয়ে গেলেন। বললেন—-দেখো, আমার বয়স বেশি নয়, আমি নিজে কোনও অপরাধও করিনি, সবচেয়ে বড় কথা—আমি তোমাকে ভালবাসি, অতএব তুমি আমাকে ভালবাসবে—ভজস্ব মাং শাল্বপতে ভক্তাং বালামনাগসাম্। সবশেষে অম্বা ভাবলেন যে, একটু বুঝিয়ে বললে যদি শাল্বরাজের হৃদয় শান্ত হয়। অম্বা বুঝিয়ে বললেন—যুদ্ধে হারবেন না বলে ভীষ্মের সেদিন রোখ চেপে গিয়েছিল, এবং ঠিক সেই জন্যই তোমাকে সেদিন তিনি অমন করে হারিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমি আমার সমস্ত বৃত্তান্ত বিয়ের আগেই ভীষ্মকে জানিয়েছি। তাঁর অনুমতি নিয়েই আমি চিরদিনের মতো তোমার কাছে চলে এসেছি—অনুজ্ঞাতা চ তেনাস্মি তবৈব বশমাগতা। তা ছাড়া আসল কথাটা তো তুমি বুঝবে। ভীষ্ম তো মোটেই আমাকে চাইছেন না। তিনি নিজে কোনও বিয়েও করতে চান না যে, আমাকে চাইবেন—ন হি ভীষ্মো মহাবুদ্ধির্মামিচ্ছতি বিশাম্পতে। তিনি তাঁর ভাইয়ের বিয়ের জন্য কন্যা হরণ করেছেন। আমার অন্য দুই বোনের সঙ্গে তাঁর ভাইয়ের বিয়েও হয়ে গেছে। কাজেই আর অসুবিধে কীসের, অন্যায়টাই বা এখানে কোথায়?

সমস্ত বৃত্তান্ত সঠিক জানানো সত্ত্বেও শাল্বরাজের হৃদয় বিগলিত হল না। অম্বা মাথা ছুঁয়ে বুক ছুঁয়ে কত প্রতিজ্ঞা করলেন, কুমারী হৃদয়ের সমস্ত সত্তা জর্জরিত করে শাল্বরাজের অনুগ্রহ যাচনা করলেন কত; কিন্তু সব ব্যর্থ হল। মস্তকস্পর্শ হৃদয়স্পর্শের মতো সর্বাঙ্গীন প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হল, বিপর্যস্ত হল কুমারীর বিশ্বাস। মহাভারতে আছে—সাপ যেমন পুরনো খোলস ছেড়ে ফেলে, অম্বাকে সেইভাবেই ত্যাগ করলেন শাল্বরাজ—জীর্ণাং ত্বচমিবোরগঃ।

অম্বা এরপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন। কামনা প্রতিহত হলেই মানুষ ক্রুদ্ধ হয়—কামাৎ ক্রোধো'ভিজায়তে। অম্বা বললেন—তুমি আমাকে ত্যাগ করছ বলেই যে আমি খুব অস্থানে পতিত হব, এমনটি তুমি ভেবো না। এমন ভদ্র সজ্জন নিশ্চয়ই আছেন এই পৃথিবীতে, যিনি আমাকে আশ্রয় দেবেন। এতক্ষণ যাই বলুন শাল্বরাজ, এবার তিনিও সত্যি কথা বলেছেন। বলেছেন—আমার বিনীত অনুরোধ—তুমি ফিরে যাও এখান থেকে। যেহেতু ভীষ্ম তোমাকে একবার গ্রহণ করেছেন, অতএব আর আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিতে পারি না। কারণ আমি ভীষ্মকে ভয় করি—বিভেমি ভীষ্মাৎ সুশ্রোণি ত্বঞ্চ ভীষ্ম-পরিগ্রহঃ।

হয়তো শাল্বরাজের এই অতিসত্যকথন—ভীষ্ম তোমাকে গ্রহণ করেছেন, তুমি ভীষ্মের পরিগ্রহ—হয়তো এই কঠিন সত্যটি অম্বার সমস্ত বিড়ম্বনা তৈরি করেছে বলেই তাঁর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল ভীষ্মের ওপর।

যে অম্বার সঙ্গে ভীষ্মের কোনও সম্পর্ক তৈরি হল না, সেই তাঁকে নিয়ে ভীষ্মকে চিন্তা করতে হয়েছে তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। মহাভারতের নীতিধর্মের যুক্তিতে যদি ভীষ্মের চরিত্র বুঝতে হয়, তা হলে ভীষ্মকে মাহাত্ম্যমণ্ডিত করতে সময় লাগবে না। ভীষ্ম চরিত্রের যে কত মহৎ দিক আছে, কত যে বিশাল তার গভীরতা, তা একটি বড় গ্রন্থ লিখেও শেষ করা যাবে না। কিন্তু এখানে আমরা মানুষ ভীষ্মকে দেখতে চাইছি, গম্ভীর থির জলে একটি সামান্য উপলখণ্ডও যে কীভাবে ছোট্ট ছোট্ট ঢেউ তোলে, সেগুলি দেখে নিয়েই তবে ভীষ্মচরিত্রের গভীরতায় অবতরণ করব আমরা।

এই এক সামান্যা নারী, তিনি কাশীরাজবালা অম্বা। তাঁর অন্য দুই ভগিনীর চেয়ে কীসেই বা তাঁর বিশেষত্ব? অম্বিকা এবং অম্বালিকার যেমন রাজসম্বন্ধে বিবাহ হয়েছে, তাঁরও তাই হতে পারত। কিন্তু এক জায়গায় বিদায় নিয়ে আর এক জায়গায় তিনি যখন প্রত্যাখ্যাত হলেন, তখন থেকেই মহামতি ভীষ্মের সঙ্গে পরোক্ষভাবে, অতিপরোক্ষভাবে জড়িয়ে গেলেন। অনেকে এমন বলেন যে, শাল্বরাজার কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে তিনি আবারও ভীষ্মের কাছে যান এবং ভীষ্মের কাছেও তিনি প্রত্যাখ্যাত হন। কিন্তু এমন ঘটনা মহাভারতে নেই।

মহাভারতে যেমনটি আছে, তাতে শাল্বরাজার কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে যাবার সময় অম্বা অনেক কাঁদলেন। তাঁর এমন ধারণা হল যে, জগতে দ্বিতীয়া এমন কোনও রমণী নেই যে নাকি তাঁর মতো দুরবস্থায় পড়েছে—পৃথিব্যাং নাস্তি যুবতি-র্বিষমস্থতরা ময়া। তার মধ্যে শাল্বরাজের কথা যত গৌরব করে তিনি ভীষ্মের কাছে বলে এসেছেন, তাতে দ্বিতীয়বার হস্তিনায় গিয়ে ভীষ্মের সামনে দাঁড়াতে তাঁর আত্মসম্মানে বেধেছে। তিনি নিজেই বলেছেন—আমার আর ফিরে যাবার মুখ নেই সেখানে—ন চ শক্যং ময়া গন্তুং তত্র বারণসাহ্বয়ম্।

শ্যামও নেই কুলও নেই এমন অবস্থায় অম্বার মন দ্বিধা দ্বন্দ্বে দীর্ণ হয়ে উঠল। নানা অকারণ স্বগ্রথিত ভাবনার শৃঙ্খল—এটা যদি না হত, তা হলে ওটা হত না, ভীষ্মকে যদি শাল্বরাজার কথা না বলতাম, তা হলে ভীষ্ম আমাকে ছেড়ে দিতেন না—এইসব কল্পিত 'যদি'র শৃঙ্খল বানিয়ে অম্বা কাকে ঠিক দোষী সাব্যস্ত করবেন, তা ঠিক করে উঠতে পারলেন না—কিন্নু গর্হাম্যথাত্মানম্ অথ ভীষ্মং দুরাসদম্।

তবে এই সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাপিয়ে তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় হয়ে উঠল ভবিষ্যতের আশ্রয়ভাবনা, একটি যুবতী রমণীর নিরাপত্তার ভাবনা। নিজের বাপের বাড়িতেও তাঁর ফিরে যাবার ইচ্ছে নেই। পিতার ওপর তাঁর রাগও আছে যথেষ্ট। অম্বার ধারণা—কাশীরাজ যদি স্বয়ংবরের ব্যবস্থা না করে সোজাসুজি শাল্বরাজার সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিয়ে দিতেন, তা হলে আর এই অহেতুক ঝামেলা কিছু হত না। কিন্তু তাঁর পিতা রাজকীর্তি স্থাপনের জন্য স্বয়ংবরের ব্যবস্থা করলেন এবং সেখানে বেশ্যাদের মতো অতগুলি রাজার সামনে এসে দাঁড়াতে হল তাঁকে। সেখানেও আবার যাঁর শক্তি বেশি, সে তাঁকে হরণ করে নিয়ে গেল—যেনাহং বীর্যশুল্কেন পণ্যস্ত্রীব প্রচোদিতা।

অম্বা নিজেকেও কম দোষ দিলেন না। শাল্বরাজার কথা তিনি সময়মতো ভীষ্মকে বলেননি, তারজন্য নিজের মূর্খতাও তিনি নিজেই স্বীকার করে নিলেন। ভাবলেন—যেমন কর্ম করেছি তেমনই ফল পেয়েছি—তস্যাহং ফলনিবৃত্তির্যদাপন্নাস্মি মূঢ়বৎ। নিজের দোষ, পিতার দোষ এবং সমস্ত সংকটময় পরিস্থিতির দোষ—সবকিছু স্বীকার করে নিয়েও অম্বা কিন্তু একবারের তরেও উচ্চারণ করলেন না—মনের গভীরে আকস্মিকভাবে উদ্‌গত সেই বুদবুদোপম সুখের কথা। ভীষ্মের যুদ্ধকৌশলে, বীরত্বে, ব্যক্তিত্বে এবং মহত্ত্বে তাঁর যে মোহ তৈরি হয়েছিল অবচেতনায়—যা দূর থেকে শাল্বরাজ পর্যন্ত লক্ষ করেছেন, সেই সামান্য মোহটুকুর জন্যই যে তাঁর এই সর্বব্যাপ্ত ক্ষতি হয়ে গেল, সে কথা অম্বা একবারও স্বগতভাবে উচ্চারণ করলেন না। কিন্তু তিনি মুখে কিছু না বললেও মহাভারতের কবি তা বুঝিয়ে দিয়েছেন মনস্তাত্ত্বিকের মন্ত্রণা মিশিয়ে। এক মুহূর্তের জন্য হলেও তাঁর ওই সামান্য অথচ গভীর সুখটুকু বিপরীতভাবে প্রতিফলিত হল ভীষ্মের ওপর তাঁর ভয়ংকর ক্রোধের মধ্য দিয়ে।

ভীষ্ম তাঁর কোনও ক্ষতি করেননি, বরঞ্চ অম্বার অনুরোধে তাঁর প্রতি মহানুভবতা দেখিয়েও তাঁর ক্রোধ থেকে রেহাই পেলেন না ভীষ্ম। আপন পিতা, শাল্বরাজ এবং অবশ্যই নিজেকেও ছেড়ে দিয়ে সমস্ত অন্যায়ের জন্য অম্বা দায়ী করলেন ভীষ্মকে—অনয়স্যাস্য তু মুখং ভীষ্মঃ শান্তনবো মম। অম্বা আগে দুঃখ করে বলেছিলেন—'ভীষ্ম যদি আমায় ছেড়ে না দিতেন'—অর্থাৎ তাতে তাঁর এইটুকু সান্ত্বনা থাকত যে, ভীষ্ম ছাড়েননি বলেই তিনি শাল্বরাজের কাছে আসতে পারেননি। আরও একটা সান্ত্বনা থাকত—তিনি এমন নিরাশ্রয় হয়ে পড়তেন না, অন্তত স্ত্রীলোকের জীবনযাপন করার নিশ্চিন্ত নিরাপত্তাটুকু তাঁর থাকত। কিন্তু এখানে যে তিনি নিজেই সবচেয়ে বড় দোষী—কারণ তিনিই শাল্বরাজের কথা ভীষ্মকে জানিয়েছেন—সে বিচার তিনি করলেন না। শুধু ভীষ্মের মহানুভবতার কারণেই যেহেতু তাঁর জীবনের বিপর্যয় ঘটল, অতএব অম্বার মনে হল—প্রতিশোধ যদি কারও ওপর নিতে হয়, তো ভীষ্মের ওপরেই তা নিতে হবে, কেন না তাঁর সমস্ত দুঃখের জন্য তিনিই দায়ি—সা ভীষ্মে

প্রতিকর্তব্যং দুঃখহেতুঃ স মে মতঃ।

এখানে ভীষ্মের প্রতি অম্বার এই দুর্দম প্রতিশোধস্পৃহা থেকেই ভীষ্মের প্রতি তাঁর অবচেতন কামনার অনুমান করতে পারেন মনস্তত্ত্ববিদেরা। নইলে সবাইকে ছেড়ে মোটামুটি নির্দোষ এক ব্যক্তির প্রতি এই প্রতিশোধস্পৃহা তৈরি হবে কেন? অম্বা ঠিক করলেন—ভীষ্মকে শাস্তি দিতে হবে। হয় ভীষ্মের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী অথবা অধিকতর অস্ত্রকুশলী ব্যক্তির দ্বারা ভীষ্মকে মার খাওয়াতে হবে, নয়তো তপস্যা ইত্যাদির মাধ্যমে ভীষ্মকে নত করতে হবে। প্রথম উপায় একান্তই লৌকিক, অতএব সেটাই চেষ্টা করতে হবে প্রথম। প্রথম উপায় কাজে না লাগলে অলৌকিকতার আশ্রয় নিয়ে দেবতার তপস্যা করতে হবে। তবে সবার আগে অম্বার প্রয়োজন একটি নিরাপদ আশ্রয়।

শাল্ব-নগরীর সীমা পেরিয়ে আসতেই গভীর বনের প্রান্তে এক ঋষির আশ্রম চোখে পড়ল অম্বার। আরণ্যক ঋষি-মুনিরা তাঁকে সেদিনকার রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন আশ্রমেই। পরের দিন অম্বা নিজের জীবনের সমস্ত দুর্ঘটনার কথা ইনিয়েবিনিয়ে ঋষিদের বললেন। একেবারে স্বয়ংবরসভায় ভীষ্মের হরণক্রিয়া থেকে শাল্বরাজের প্রত্যাখ্যান পর্যন্ত। আপাতদৃষ্টিতে মহামতি ভীষ্মের ব্যবহারে খুব দোষ খুঁজে পাওয়া যাবে না বলেই সুচতুরা অম্বা শাল্বরাজের ওপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিয়ে বললেন—দেখুন, শাল্বরাজ আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, আমার মনে আনন্দ বলে কিছু নেই—প্রত্যাখ্যাতা নিরানন্দা শাল্বেন চ নিরাকৃতা। অম্বা আরও জানালেন যে, এই প্রত্যাখ্যাত জীবন বহন করে নিজের পিতৃগৃহেও তিনি ফিরতে চান না। বরঞ্চ মুনি-ঋষিদের মতো প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে অবশিষ্ট জীবন তিনি তপস্যায় কাটিয়ে দিতে চান—প্রব্রজ্যমহমিচ্ছামি তপস্তপ্স্যামি দুশ্চরম্।

অম্বার অবস্থা শুনে মুনি-ঋষিদের যথেষ্ট মায়া হল। তাঁরা কেউ শাল্বকে দুষলেন, কেউ বা ভীষ্মকে। কিন্তু সবার শেষে যখন আশ্রয়ের কথা উঠল, তখন ঋষিরা খুব বাস্তববাদী ভঙ্গিতে বললেন—তোমার এই বয়সে তপস্যা চলে না, মা! তা ছাড়া তোমার মতো একটি যুবতী মেয়ে আশ্রমে থাকলে আশ্রমে আগন্তুক রাজা মহারাজারা তোমার প্রতি আকৃষ্ট হবেন, কেউ বা তোমাকে বিয়েও করতে চাইবেন। নিস্তরঙ্গ আশ্রমের মধ্যে তখন সে এক নতুন সমস্যা হবে। কাজেই ওইসব প্রব্রজ্যা তপস্যার কথা তুমি ভেবো না—প্রার্থয়িষ্যন্তি রাজানঃ তস্মান্ মৈবং মনঃ কৃথাঃ। তারচেয়ে তুমি বরং মা, বাপের বাড়িতেই ফিরে যাও। স্বামীর ঘরে স্বস্তি না হলে বাপের বাড়িতেই মেয়েদের সবচেয়ে ভাল আশ্রয়—গতিঃ পতিঃ সমস্থায়া বিষমে চ পিতা গতিঃ।

অম্বা ঋষি-মুনিদের উপদেশ ধৈর্য ধরে শুনলেন বটে, কিন্তু বাস্তব অবস্থায় সমাজের কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে তাঁর প্রতি, সে বিষয়ে তাঁর বাস্তব জ্ঞান আছে। তিনি বোঝালেন যে, পূর্বে তিনি বাপের বাড়িতে যে মর্যাদা এবং আদর লাভ করে এসেছেন, এখন এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেই মর্যাদা এবং আদর তাঁর জুটবে না। অম্বা বললেন—আপনারা সুপরামর্শ দিয়েছেন, আপনাদের মঙ্গল বিধান করুন বিধাতা, কিন্তু বাপের বাড়ি আমি ফিরতে পারব না—নাহং গমিষ্যে ভদ্রং বস্তত্র যত্র পিতা মম। আমি তপস্যাই করব এবং আমার সুরক্ষার ভার আপনাদের।

আশ্রমের মুনি-ঋষি ব্রাহ্মণরা অম্বার কথায় খুবই বিচলিত বোধ করলেন, বিব্রত তো বটেই। ঠিক এই সময়ে আশ্রমে এক নতুন আগন্তুক এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর নাম হোত্রবাহন। হোত্রবাহন রাজর্ষি। তিনি রাজা বটে কিন্তু তপস্যা এবং বৈরাগ্যের শক্তিতে তিনি এক মহাপুরুষ। স্বয়ং পরশুরাম তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু। সবচেয়ে বড় কথা—অম্বার সঙ্গে তাঁর কিছু আত্মীয় সম্বন্ধও আছে। রাজর্ষি হোত্রবাহন অম্বার মাতামহ অর্থাৎ মায়ের বাবা, দাদু।

রাজর্ষি হোত্রবাহন রাজকর্ম করেন বটে কিন্তু তাঁর তপঃসিদ্ধির জন্য মুনি-ঋষিরাও তাঁকে প্রভূত সম্মান করেন। অম্বার মুখে তাঁর কষ্টকাহিনী শুনে হোত্রবাহনের খুবই মায়া হল এবং আত্মীয়তার গভীর সম্বন্ধ থাকায় তিনি অম্বাকে সমস্ত আশ্বাস দিয়ে বললেন— তোমাকে বাপের বাড়িও যেতে হবে না, অন্য কোথাও যেতে হবে না। তুমি আমার কাছেই থাকবে। শুধু তাই নয়, যে বিষয়ে তোমার কষ্ট আছে, সেই কষ্ট দূর করার ভারও আমার। আমি তোমার দাদু বলেই এ দায়িত্ব এখন আমার—দুঃখং ছিন্দাম্যহং তে বৈ মাতুস্তে জনকো হ্যহম্। হোত্রবাহন অম্বাকে সুপরামর্শ দিয়ে বললেন—তুমি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পরশুরামের কাছে গিয়ে তোমার দুঃখের কথা জানাও। মহাকালের আগুনের মতো তাঁর তেজ। তিনিই একমাত্র পারেন ভীষ্মকে যুদ্ধে হারাতে, এমনকী তাঁর কথা না শুনলে তাঁকে মেরে ফেলতেও তিনিই একমাত্র সক্ষম—হনিষ্যতি রণে ভীষ্মং ন করিষ্যতি চেদ্‌বচঃ। হোত্রবাহন নাতনিকে বোঝালেন যে, পরশুরাম তাঁর বন্ধু মানুষ এবং হোত্রবাহনকে তিনি ভালও বাসেন যথেষ্ট। অতএব ভীষ্মের ওপর প্রতিশোধ নেবার ব্যবস্থা একটা হবেই—মম রামঃ সখা বৎসে প্রীতিযুক্তঃ সুহৃচ্চ মে।

রাজর্ষি হোত্রবাহন অম্বার মাতামহ, অতএব তাঁর মাধ্যমে পরশুরামকে ধরে ভীষ্মের ওপর প্রতিশোধ তুলবেন অম্বা—এটা আমাদের কাছে খুব বড় খবর নয়। আমাদের কাছে এর চেয়েও বড় খবর হল—রাজর্ষি হোত্রবাহন সৃঞ্জয় বংশের রাজা।—স চ রাজা বয়োবৃদ্ধঃ সৃঞ্জয়ো হোত্রবাহনঃ। সৃঞ্জয় হলেন পাঞ্চাল দ্রুপদের পূর্বপুরুষ। তাঁর নামেই প্রসিদ্ধ পাঞ্চাল বংশের ধারা চলে আসছে। ভবিষ্যতে যিনি দ্রৌপদী, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং শিখণ্ডীর পিতা বলে পরিচিত হবেন, সেই পাঞ্চাল দ্রুপদও সৃঞ্জয়বংশীয়। ওদিকে অম্বার মা, যিনি কাশীরাজের স্ত্রী তিনিও সৃঞ্জয়বংশীয় হোত্রবাহনের মেয়ে।

ভীষ্মের বিপক্ষে সৃঞ্জয়-পাঞ্চালদের এই সম্পর্ক মিশে যাওয়াটা মহাভারতের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীকালে অম্বার মধ্যে শিখণ্ডীর রূপান্তর এবং এখন সৃঞ্জয় হোত্রবাহনের ভীষ্মবধের পরিকল্পনার মধ্যে বহু পরবর্তীকালের রাজনৈতিক তাৎপর্য নিহিত আছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্ম পাণ্ডব-পক্ষপাতী হওয়া সত্ত্বেও কেন পাণ্ডবপক্ষে যোগ না দিয়ে কৌরবপক্ষে থেকে গেলেন—এই রাজনৈতিক কূট সমাধানের জন্য যাঁরা ভীষ্মের মুখের কথাটাকেই বড় বলে মনে করেন, তাঁরা আর যাই বুঝুন, মহাভারতের রাজনৈতিক তাৎপর্য কিচ্ছু বোঝেন না। ভীষ্ম নাকি এমন ভাব প্রকাশ করেছিলেন যে, তিনি কুরুবাড়ির অন্ন খেয়েছেন, অতএব সেই অন্নঋণ পরিশোধ করার জন্যই তাঁকে কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধ করতে হবে। কারণ মানুষ অর্থ এবং অন্নের দাস।

ভীষ্মের এই যুক্তিটা একেবারেই মৌখিকতা, এর মধ্যে গভীর কোনও সত্য নেই। পরবর্তীকালে মহাভারতীয় যুদ্ধের পক্ষস্থিতি এবং তার রাজনৈতিক মেরুকরণ খেয়াল করে দেখুন—কাশীর রাজা পাণ্ডবপক্ষে থেকে যুদ্ধ করেছেন এবং পাঞ্চাল সৃঞ্জয়রাও যোগ দিয়েছিলেন পাণ্ডবপক্ষে। কাশীর রাজার মেয়েদের হরণ করতে গিয়ে ভীষ্ম যেভাবে অপমানিত হয়েছিলেন এবং সেই রাজকুমারীদের অন্যতম অম্বার সূত্র ধরে সৃঞ্জয় হোত্রবাহন পরশুরামকে দিয়ে যেভাবে মার খাওয়ানোর পরিকল্পনা করছেন, তাতে ভীষ্মের পক্ষে পাণ্ডবদের হয়ে যুদ্ধ করার রাজনৈতিক সমস্যা ছিল। কাশীর রাজা এবং পাঞ্চালরা যে পক্ষে আছেন, সে পক্ষে থেকে ভীষ্মের যুদ্ধ করা সম্ভব হয়নি এই কারণেই। সৃঞ্জয় হোত্রবাহন তাঁর নাতনির কষ্টে সমব্যথী হয়ে তাঁর বন্ধু পরশুরামকে দিয়ে ভীষ্মকে শাস্তি দিতে চাইছেন—এই সমস্ত পশ্চাৎ পরিকল্পনা আমরা ভীষ্মের মুখেই শুনতে পাচ্ছি মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে, অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ যখন প্রায় লাগে লাগে। বোঝা যায় এইসময় পর্যন্তও কাশীরাজ এবং সৃঞ্জয় পাঞ্চালদের সম্বন্ধে ভীষ্মের বিমুখতা অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বর্তমান। কীভাবে, কত সুপরিকল্পিতভাবে কাশী-পাঞ্চালের জোট ভীষ্মের পিছনে লেগেছিল, সেসব ঘটনা ভীষ্ম

নিজেই উদ্যোগপর্বে বর্ণনা করেছেন কুরুবাড়ির যোদ্ধা নেতাদের সামনে। ভীষ্মের বিরুদ্ধে কাশী এবং পাঞ্চালদের এই মিত্রতা আরম্ভ হয়েছিল সেই বিচিত্রবীর্যের বিবাহের সময় থেকে এবং সেটা প্রধানত তখনকার হস্তিনাপুরের সর্বময় কর্তা ভীষ্মের বিরুদ্ধে। ভীষ্ম পাণ্ডবদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের পক্ষে যোগ দেননি এই রাজনৈতিক বিরুদ্ধতার কারণেই।

সৃঞ্জয় হোত্রবাহনের আনুকূল্যে পরশুরামের সঙ্গে অম্বার দেখা হয় এবং তাঁর কাছে ভীষ্মকে চরম শাস্তি দেবার আর্জি পেশ করেন অম্বা। অম্বার শেষ সিদ্ধান্ত—আপনি আমার দুঃখ দূর করুন, ভগবন! মারুন ওই ভীষ্ম নামের মানুষটাকে—ভীষ্মং জহি মহাবাহো যৎকৃতে দুঃখমীদৃশম্। বন্ধু হোত্রবাহনের কথায় পরশুরাম ভীষ্মকে শাস্তি দেবার ব্যাপারে পূর্বে যথেষ্টই আশ্বাস দিয়েছিলেন অম্বাকে। কিন্তু এখন অম্বার মুখে এমন স্পষ্ট অনুরোধে তাঁর একটু দ্বিধাই হল। ভীষ্ম এককালে তাঁর পরম প্রিয় অস্ত্রশিষ্য ছিলেন। শিষ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করা বা তাঁকে বধ করা—কোনওটাই পরশুরামের পরম ইপ্সিত ছিল না। পরশুরাম একটু বুঝিয়েও বললেন অম্বাকে। বললেন—দেখো রাজকন্যে! আরও একবার ভেবে দেখো। তোমার ছোট বোনদের সম্বন্ধ মনে রাখলে ভীষ্ম তোমার গুরুজন বটে। কিন্তু আমি যদি তাঁকে অনুরোধ করি, তা হলে তোমার গুরুজন হওয়া সত্ত্বেও তিনি তোমার পাদুটো মাথায় বয়ে নিয়ে যাবেন—শিরসা বন্দনার্হো'পি গ্রহীষ্যতি গিরা মম।

পরশুরামের কথায় একটুও বিগলিত হলেন না অম্বা। রমণীর প্রতিহত প্রেম উপযুক্ত সুযোগে ধ্বংসের আকার ধারণ করেছে। অম্বা বললেন—আপনি যদি আমার তুষ্টির কথা একটুও ভাবেন, তা হলে মারতেই হবে ভীষ্মকে, মারতেই হবে—জহি ভীষ্মং রণে রাম মম চেদিচ্ছসি প্রিয়ম্। অম্বার কথার সঙ্গে রাজর্ষি হোত্রবাহনের নিঃশব্দ প্রভাব মিশ্রিত হল এবং পরশুরাম অম্বা এবং অন্যান্য মুনি ঋষিদের সঙ্গে নিয়ে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন ভীষ্মকে শাস্তি দেওয়ার জন্য। যদিও পরশুরামের মনে এই ছিল যে, কথা না শুনলে তিনি ভীষ্মকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন ঠিকই, কিন্তু তিনি তবুও দেখবেন, যাতে ভাল কথাতেই কাজ হয়ে যায়—তথৈব চ করিষ্যামি যথা সাম্নৈব লপ্স্যতে।

পরশুরাম কুরুক্ষেত্রে এসেই ভীষ্মের কাছে দূত পাঠালেন—আমি এসেছি—প্রাপ্তো'স্মি। খবর শুনে ভীষ্ম যথোচিত সম্মান পুরঃসর পাদ্যঅর্ঘ্য নিয়ে উপস্থিত হলেন পরশুরামের কাছে। ভীষ্ম প্রণাম করে দাঁড়াতেই পরশুরাম বললেন—ভীষ্ম! এ তোমার কেমন ব্যবহার? তুমি নিজে যখন বিয়েই করবে না তখন কেনই বা এই নিরপরাধ মেয়েটিকে তুলে এনেছিলে। আর তুলেই আনলে যখন তখন কেনই বা তাকে ত্যাগ করলে। মেয়েটির কোনও কলঙ্ক ছিল না, অথচ তুমি এর সর্বনাশ এবং ধর্মনাশ দুই-ই করেছ—বিভ্রংশিতা ত্বয়া হীয়ং ধর্মদাস্তে যশস্বিনী। তুমি একে স্পর্শ করেছিলে বলেই শাল্বরাজ একে প্রত্যাখ্যান করেছেন। সব কথার শেষে পরশুরাম বললেন—সে এখন যা হবার তা হয়ে গেছে। তুমি এই মুহূর্তে আমার আদেশ মেনে এই কন্যাকে গ্রহণ করো, যাতে এই রাজপুত্রী নারীজীবনের সমস্ত সম্ভাবনা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে—তস্মাদিমাং মন্নিয়োগাৎ প্রতিগৃহ্ণীষ্ব ভারত।

ভীষ্ম জানেন যে, কাশীরাজের কন্যাগুলিকে হরণ করার মধ্যে তাঁর কিছু হঠকারিতা বা সামান্য অপরিণতির স্পর্শ থাকতে পারে, কিন্তু অন্যায় কিছু নেই। ভীষ্ম তাই সশ্রদ্ধভাবে উত্তর দিলেন—আমি এই রমণীকে আর আমার ভাইয়ের হাতে তুলে দিতে পারি না। ইনি আমাকে শাল্বরাজের প্রতি তাঁর অনুরক্তির কথা জানিয়েছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁকে মুক্তি দিয়েছি। এখন সব জেনেশুনে কীভাবে এক পরানুরক্তা রমণীকে আমাদের ঘরে নিয়ে তুলতে পারি?

পরশুরাম যুদ্ধের ভয় দেখালেন, হত্যার ভয় দেখালেন, কিন্তু ভীষ্ম নিজের যুক্তি থেকে সরে এলেন না। অগ্ন্যুৎপাতের মতো দুই মহাবীরের উগ্র বাক্যবিনিময় চলল অনেকক্ষণ ধরে। শেষে যুদ্ধও আরম্ভ হল একুশবার ক্ষত্রিয়হন্তা পরশুরামের সঙ্গে ভীষ্মের। মহাভারতের কবি প্রায় আট অধ্যায় জুড়ে এই যুদ্ধের বর্ণনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন, যুদ্ধের পরিণতি মহাবীর পরশুরামের বিপক্ষে যাচ্ছিল, তিনি যুদ্ধে হেরে যাচ্ছিলেন। শুভার্থী মানুষেরা এই যুদ্ধ বন্ধ করার চেষ্টা আরম্ভ করতেই পরশুরাম সরে দাঁড়ালেন এবং ভীষ্মও সঙ্গে সঙ্গে আনত হয়ে গুরুর চরণবন্দনা করলেন।

পরশুরাম এত খুশি হলেন বলার নয়। আপন শিষ্যের গর্বে গর্বিত হয়ে তিনি বললেন—এই পৃথিবীতে তোমার মতো ক্ষত্রিয়বীর আর দ্বিতীয়টি নেই—ত্বৎসমো নাস্তি লোকে'স্মিন ক্ষত্রিয়ঃ পৃথিবীচরঃ। আমি পরম সন্তুষ্ট হয়েছি। ভীষ্মের প্রশংসা করেই পরশুরাম অম্বাকে নিজের করুণ অসহায়তার কথা জানালেন। বললেন—আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করেও আমি ভীষ্মের কতটুকু ক্ষতি করতে পেরেছি, লোকে তা দেখেছে। প্রত্যক্ষমেতল্‌-লোকানাম্‌—আমি ভীষ্মকে জয় করতে পারিনি। পরশুরাম নিজের অক্ষমতা সম্পূর্ণ প্রকট করে অম্বাকে শেষ পরামর্শ দিয়ে বললেন—আমার কথা যদি শোন, তবে তুমি ভীষ্মেরই শরণাপন্ন হও। তিনিই তোমার পরমা গতি—ভীষ্মমেব প্রপদ্যস্ব ন তে'ন্যা বিদ্যতে গতিঃ।

যাঁকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন অম্বা, পরশুরাম তাঁরই কাছে ফিরে যেতে বলছেন তাঁকে। এও কি তাঁর পক্ষে সম্ভব! পরশুরামের মতো মহাবীর যাঁর কাছে হেরে যাচ্ছেন, তাঁকে সবার সামনে প্রশংসা না করে উপায় নেই অম্বার। হয়তো সেই অবাক বিস্ময় আবারও তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল, যে আচ্ছন্নতাকে শাল্বরাজ নিজের সংজ্ঞায় বলেছিলেন—তোমাকে খুশি খুশি লাগছিল। কিন্তু সেই আচ্ছন্নতা কাটিয়ে অম্বা দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—ভীষ্ম দেব দানব সবার অপরাজেয় হতে পারেন, কিন্তু তাই বলে কোনওভাবেই আমি আর ভীষ্মের কাছে ফিরে যেতে পারি না। বরঞ্চ আমি সেই চেষ্টা করব যাতে আমি নিজেই ভীষ্মকে বধ করতে পারি। কিন্তু আমি কিছুতেই ভীষ্মের শরণাপন্ন হব না—ন চাহমেনং যাস্যামি পুনর্ভীষ্মং কথঞ্চন।

এইসমস্ত ঘটনার শেষে ভীষ্মের প্রতি অম্বার প্রকৃত হৃদয় কীভাবেই বা আমরা ব্যাখ্যা করব। শাল্বরাজকে তিনি বিবাহ করবেন বলে ঠিক করেছিলেন, তাঁর ওপরে অম্বার এতটুকু রাগ নেই। অথচ ভীষ্মের ওপর তাঁর এত রাগ কীসের? তিনি একান্ত সমাজ-সচল প্রক্রিয়াতে নিতান্ত ক্ষত্রিয়োচিতভাবে অম্বাকে হরণ করেছিলেন। অথচ অম্বা শাল্বরাজের প্রত্যাখ্যানে অপমানিত বোধ করলেন না। তাঁর যত অপমান হল ভীষ্ম তাঁকে স্বয়ংবরসভা থেকে তুলে এনেছেন বলে। আমাদের মতো মানুষেরা এখানে টিপ্পনী কেটে বলবেই যে, আসলে শাল্বরাজের থেকেও ভীষ্মের ব্যাপারে তাঁর মুগ্ধতা বেশি। আর সেই মুগ্ধতাই বিপ্রতীপভাবে এমন চরম প্রতিশোধস্পৃহায় রূপান্তরিত হয়েছে। ভীষ্মবধের প্রতিজ্ঞা নিয়ে অম্বা বনে চলে গেলেন।

এদিকে পরশুরামকে যুদ্ধে জয় করে ভীষ্ম ব্রাহ্মণদের স্তুতি-মাঙ্গলিক আর জয়কার শুনতে শুনতে হস্তিনায় প্রবেশ করলেন। ঘটনার সমস্ত বিবরণ তিনি জানালেন জননী সত্যবতীকে। হস্তিনাপুরে তখন মহারাজ বিচিত্রবীর্য রাজ্য শাসন করছেন। ভীষ্ম রইলেন তাঁর অভিভাবকের মতো। ভালই চলছিল সব। বিচিত্রবীর্যের রোমাঞ্চিত বৈবাহিক জীবন, হস্তিনাপুরের রাজ্য শাসন, ভীষ্মের অভিভাবকত্ব সবই ভালই চলছিল। কিন্তু সমস্ত ঘটনার মধ্যে একটিমাত্র ব্যথা—তাও সুখের মতো কোনও ব্যথা কি না কে জানে—একটিমাত্র ব্যথা মহামতি ভীষ্মকে বিচলিত করছিল। এক সুন্দরী রমণীর জীবন এবং যৌবন তাঁরই কারণে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। সে একবারও বলে না যে, ভীষ্মকে তার ভাল লেগেছে, ভীষ্মকে

ভালবেসে সে হস্তিনাপুরে থাকতেও চায় না। সে শুধু ভীষ্মকে মারতে চায়। রমণীর বিচিত্র এই মনস্তত্ত্ব ভীষ্ম কেমনভাবে গ্রহণ করেন, মহাভারতের কবি তা বলেননি। তবে ভীষ্মও বুঝি তাঁর হাতে মরতে চান। যেদিন থেকে ভীষ্মবধের প্রতিজ্ঞা নিয়ে অম্বা বনে তপস্যা করতে গেছেন, তদবধি ভীষ্ম কতগুলি বিশ্বস্ত গুপ্তচরকে লাগিয়ে রেখেছেন—সেই বনগতা রমণীর সমস্ত গতিবিধি লক্ষ করার জন্য। শেষজীবনে এসে ভীষ্ম নিজের মুখেই জানিয়েছেন—হ্যাঁ। সেইসমস্ত গুপ্তচরেরা অম্বার প্রতিদিনের কথা, কল্পনা এবং ব্যবহার আমার কাছে নিবেদন করত যথাযথভাবে—

পুরুষাশ্চাদিশং প্রাজ্ঞান্ কন্যাবৃত্তান্তকর্মনি॥
দিবসে দিবসে হ্যস্যা গতি-জল্পিত-চেষ্টিতম্।
প্রত্যাহরংশ্চ মে যুক্তাঃ স্থিতাঃ প্রিয়হিতে সদা॥

ভীষ্মের জীবনের ওপর দিয়ে এত বড় যে একটা ঝড় বয়ে চলে গেল, এরমধ্যে আপনারা মহারাজ বিচিত্রবীর্যকে একবারও লক্ষ করেছেন কি? অম্বাকে নিয়ে ভীষ্ম যে এত বিব্রত হলেন, পরশুরাম যে তাঁকে মারতে আসলেন, এই গোটা সময়ের মধ্যে হস্তিনাপুরের মহারাজ বিচিত্রবীর্য অথবা ভীষ্মের পুত্রোপম কনিষ্ঠ ভাই বিচিত্রবীর্যকে একবারও তাঁর পাশে এসে দাঁড়াতে দেখলেন কি? ভীষ্মের অপার স্নেহমমতা এবং আদর পেয়ে পেয়ে বিচিত্রবীর্যের পাওয়ার অভ্যাস এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, সংসার এবং রাজনীতির বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাঁরও যে কিছু করার আছে, কোথাও যে তাঁরও আগ বাড়িয়ে যাওয়া দরকার, সেটা তাঁর বোধের মধ্যেই ছিল না। পিতা শান্তনু মারা যাবার পর কুলজ্যেষ্ঠ চিত্রাঙ্গদও যখন স্বর্গবাসী হলেন তখন বিচিত্রবীর্যকে নিয়ে ভীষ্মের যে আতঙ্ক গেছে, সেটা আমরা বুঝি। ভীষ্ম তাঁকে আদর দিয়েছেন, প্রশ্রয় দিয়েছেন, সেটাও তো ভীষ্মের দিক থেকে কোনও অগৌরবের বিষয় বলে চিহ্নিত করা যায় না।

আজকের দিনেও পিতামাতারা যেমন সন্তানের গায়ে কোনও আঁচ লাগতে দেন না, সংসারের সাধারণ অসাধারণ সমস্ত বিষয়কর্মে নবযুবক পুত্রটিকেও যেমন আজকের পিতামাতারা বাঁচিয়ে চলেন, ভীষ্মও বিচিত্রবীর্যকে সেইভাবেই লালন করেছেন। নইলে, যে স্বয়ংবরসভায় একান্তভাবে বিচিত্রবীর্যেরই যাওয়া উচিত ছিল, সেখানে ভীষ্ম নিজে গিয়ে তাঁর নিজের বিপদ যেমন ঘটালেন, তেমনই বিচিত্রবীর্যেরও এক ধরনের বিপদ ঘটালেন বলে মনে করি। রাজপরিবারের সমস্ত সারভাগ একা পেতে পেতে বিচিত্রবীর্যের এমনই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে, দুটি ভোগ্যা রমণী লাভ করেই তিনি উপলব্ধি করলেন—যেন যথাসাধ্য কাম উপভোগ করার জন্যই তাঁর জন্ম এবং জীবন। তাঁর যে অন্য কোনও কাজ আছে, বয়োজ্যেষ্ঠ ভীষ্মের প্রতি তাঁরও যে কোনও কর্তব্য আছে, তা তিনি বুঝতেই পারলেন না। নইলে, অমন হাঁকডাক করে পরশুরাম ভীষ্মকে রণক্ষেত্রে আহ্বান করলেন, সেখানে হস্তিনাপুরের মহারাজকে আমরা নিশ্চিন্ত মনে কাম-সম্ভোগ করতে দেখছি। আসলে বিবাহের পরেই ভোগাধার দুটি রমণী পেয়ে তিনি এমনই মত্ত হয়ে উঠলেন—তয়োঃ পাণী গৃহীত্বাং তু কামাত্মা সমপদ্যত—যে, তাঁর পিতার সমান ভীষ্ম তাঁরই জন্য কোনও বিপদে পড়লেন, কোথায় যুদ্ধ করতে গেলেন, এসব কিছুই তাঁর বোধের মধ্যে এল না।

ফল যা হবার তাই হল। নিরঙ্কুশ স্ত্রী-সম্ভোগের কারণে বিচিত্রবীর্যের ক্ষয়রোগ হল। তিনি মারা গেলেন। বিচিত্রবীর্যের মারা যাবার আগে বিবাহিত জীবনের সাত সাতটি বছর যখন তিনি স্ত্রী-সম্ভোগে মত্ত ছিলেন, তখন হস্তিনাপুরের রাজ্যশাসনের সমস্ত তদারকি করা ছাড়াও ভীষ্মের জীবনে অম্বার ঝড় বয়ে গেছে। অম্বার আরণ্যক জীবনের সমস্ত খবরাখবর তিনি পেতেন বটে, তবে তাঁরই কারণে ভীষ্মের 'টেনশন' বাড়ছিল। একটি স্ত্রীলোক তাঁর স্ত্রী-জীবনের সমস্ত ব্যর্থতার জন্য ভীষ্মকে দায়ি করেছেন এবং তাঁকে মারবার জন্য তপস্যা

করছেন, এতে তাঁর ব্যাকুলতা বেড়েছে। উদ্যোগপর্বে গিয়ে ভীষ্ম নিজের মুখে জানাচ্ছেন—অম্বা তপস্যা করবার জন্য বনে গেলে আমি ভীষণ উদ্‌বিগ্ন, বিষণ্ণ এবং চৈতন্যহীনের মতো ব্যবহার করতাম—তদৈব ব্যথিতো দীনো গতচেতা ইবাভবম্। এই উদ্‌বেগের মধ্যে তাঁর নিজের মৃত্যুচেতনারও অধিক কোনও সুখের ব্যথা ছিল কি না, তা রসিক জনের অনুভববেদ্য।

আপাতদৃষ্টিতে ভীষ্ম এতই উদ্‌বিগ্ন ছিলেন যে, তিনি নিজের উদ্‌বেগের কারণ আরও দুটি বিশাল ব্যক্তিত্বকে জানিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন লোকশাস্ত্রবিদ্ নারদ, অন্যজন বিশালবুদ্ধি ব্যাস, জননী সত্যবতীর সম্পর্কে যিনি ভীষ্মের ভাই-ই বটে—ব্যাসে চৈব তথা কার্যং নারদে'পি নিবেদিতম্। দুই ঋষিই ভীষ্মের মনে কোনও শান্তির সুখস্পর্শ দিতে পারেননি। তাঁরা পুরুষকারের ওপর দৈবের বলবত্তা প্রমাণ করে ভীষ্মকে বলেছেন—আপনি স্থির থাকুন। বিচলিত হবেন না। এই সান্ত্বনায় ভীষ্মের মন কতটুকু শান্ত হয়েছিল জানি না, তবে তিনি অম্বার গতিবিধির ওপর নজর রাখা মোটেই বন্ধ করেননি।

ভীষ্ম তাঁর শেষজীবনে এসে আমাদের খবর দিয়েছেন যে, অম্বার নিদারুণ তপস্যা দেখে আরণ্যক মুনি-ঋষিরা একসময় তাঁকে তপস্যা বন্ধ করারও অনুরোধ করেছিলেন। অম্বা শোনেননি এবং রুদ্ধ অভিমানে তিনি বলেছেন—ভীষ্মকে বধ করলেই তবে আমার শান্তি। ভীষ্মের জন্যই আমি চিরকাল দুঃখিনী হয়ে রইলাম, তাঁর জন্যই আমার স্বামীসুখ জুটল না কপালে, তাঁর জন্যই আমার এ হেন অবস্থা, আমি যেন স্ত্রীও নই পুরুষও নই—পতিলোকাদ্ বিহীনা চ নৈব স্ত্রী ন পুমানিহ। স্বামীসুখ সংসারসুখ যে রমণীর কাছে অপ্রাপ্ত রয়ে গেল, সে যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের স্বাধিকারটুকু চাইবে, তাতে আশ্চর্য কী? অম্বাকে এক সময়ে আমরা বলতে শুনি—নারীজন্মে আমার ঘেন্না ধরে গেছে, আমি এখন পুরুষ হতে চাই।

আমি অম্বাচরিত্রের আলোচনার সময় অন্যত্র লিখেছি যে, অম্বার এই অদ্ভুত স্বীকারোক্তি থেকে বোঝা যায়—তিনি পরবর্তীকালে কোনও নপুংসক শিখণ্ডীতে রূপান্তরিত হননি। তিনি স্ত্রীই ছিলেন বটে, কিন্তু পুরুষের অস্ত্রবিদ্যা তিনি চরমভাবে শিক্ষা করেছিলেন। অম্বার উপাস্য দেব মহাদেব তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে তাঁকে মহারাজ দ্রুপদের ঘরে জন্মানোর আশীর্বাদ দেন, কিন্তু দ্রুপদের ঘরে তিনি কন্যা হয়েই জন্মেছিলেন। স্বয়ং ভীষ্ম নিজ মুখে জানিয়েছেন—আমি গুপ্তচরদের কাছে যা খবর পেয়েছি, তাতে দ্রুপদের ঘরের জাতকটিকে আমি মেয়ে বলেই জানতাম। দ্রুপদ কন্যা লাভ করে তাঁর মেয়েটিকে ছেলে বলে প্রচার করেছিলেন—ছাদয়ামাস তাং কন্যাং পুমানিতি চ সো'ব্রবীৎ। এরপরে অলৌকিক সব কথাকাহিনী আছে, যাতে এক যক্ষের সঙ্গে অম্বার লিঙ্গবিনিময় ঘটে। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে এই কল্পকাহিনী বাদ দিয়ে আমরা যদি সৃঞ্জয় হোত্রবাহনের পূর্বের আশ্বাসটুকু মনে রাখি, তা হলেই বোঝা যাবে যে, সৃঞ্জয় হোত্রবাহন পাঞ্চালদের ঘরের মানুষ বলেই তিনি হয়তো অম্বাকে এনে দিয়েছিলেন দ্রুপদরাজার ঘরে।

দ্রোণাচার্যের ওপর দ্রুপদের যে রাগ ছিল, সে রাগ ভীষ্মের ওপরেও খানিকটা পড়েছিল, কারণ ভীষ্মই দ্রোণাচার্যকে কুরুরাজ্যে গুরুর সম্মানে বরণ করেছিলেন। ফলে অম্বার তপস্যার অন্তে, হয়তো বা অস্ত্রশিক্ষার তপস্যান্তে সৃঞ্জয় হোত্রবাহন যখন সৃঞ্জয়দেরই শ্রেষ্ঠতম পুরুষ দ্রুপদের ঘরে অম্বাকে নিয়ে আসেন, তখন দ্রুপদ তাঁর কন্যা পরিচয় আচ্ছাদন করে নিজের পুত্র বলে তাঁর পরিচয় দিতে থাকেন। কারণ অম্বা এবং তিনি—দুজনেই ভীষ্মের সর্বনাশ চান। একই সঙ্গে দ্রুপদের ওপরে মহাদেবের বরও এখানে সার্থক হয়ে ওঠে। স্ত্রীরূপিণী অম্বার হঠাৎ এই শিখণ্ডীরূপে পরিণতির কথা ভীষ্ম ভালভাবেই জানতেন এবং চিরকালই তিনি শিখণ্ডীকে অম্বা বলেই জেনে এসেছেন—শিখণ্ডিনং মহারাজ পুত্রং স্ত্রীপূর্বিনং তথা।

যাই হোক, অম্বা যখন থেকে শিখণ্ডী নামে এক পুত্র পরিচয়ে দ্রুপদের ঘরে বাস করতে আরম্ভ করেছেন, তখন থেকে ভীষ্মের মনেও একটা শান্তভাব এসেছে। শিখণ্ডী দ্রুপদের অন্য পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে দ্রোণাচার্যের কাছেও একসময় অস্ত্রশিক্ষা করেছেন। কাজেই হস্তিনাপুরের রাজা বিচিত্রবীর্য মারা যাবার সাত-আট বছর আগে থেকে দ্রোণাচার্যের কুরুবাড়িতে অস্ত্রগুরু হয়ে আসা পর্যন্ত অম্বাকে নিয়ে মহামতি ভীষ্মের মানসিক অস্থিরতা চলে। কিন্তু এই সময়টুকুর মধ্যে খোদ হস্তিনাপুরেই এক বিরাট পরিবর্তন আসে এবং সেই পরিবর্তনের মধ্যেও ভীষ্মের ভূমিকা কিছু কম নয়। আপন অন্তরের মধ্যে আপন মৃত্যুরূপিণী অম্বাকে লালন করতে করতে হস্তিনাপুরের পারিবারিক রাজনীতিতে সুস্থিরতা আনবার জন্য ভীষ্মকে যে পরিমাণ ভাবনা ভাবতে হয়েছে, তা একমাত্র ভীষ্মের মতো বিশাল ব্যক্তিত্ব ছাড়া অন্য

হস্তিনাপুরে শান্তনুর দ্বিতীয় পুত্র মহারাজ বিচিত্রবীর্য যখন মারা গেলেন, তখন এক বিশাল পারিবারিক সংকট উপস্থিত হল। একটিমাত্র পুত্র থাকা, আর পুত্র না থাকা—এই দুটিকে একইরকম প্রমাণ করে যে শান্তনু লজ্জার মাথা খেয়ে বিয়ে করলেন তাঁর একটি পুত্রও বাঁচলেন না; শুধু বেঁচে রইলেন ভীষ্ম এবং সেটাও পিতা শান্তনুর ইচ্ছামৃত্যু বয়ে যতখানি, তার চেয়ে বেশি নিজের মানসিক জোরে। মহারাজ বিচিত্রবীর্যকে একটি কঠিন যুদ্ধেও বিপন্ন, এমনকী বিব্রতও যিনি হতে দিলেন না, সেই ভীষ্ম কিন্তু বিচিত্রবীর্যের মৃত্যু আটকাতে পারলেন না। হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসন খালি পড়ে রইল। বিচিত্রবীর্যের শ্রাদ্ধশান্তি ঠিক ঠিক হয়ে গেল, কিন্তু এরপর বিশাল কুরুবংশের পরম্পরা কীভাবে রক্ষা হবে—সেই কথা ভেবে মহামতি ভীষ্মের মন চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠল—ধর্মাত্মা স তু গাঙ্গেয়শ্চিন্তাশোকপরায়ণঃ।

মনস্বিনী সত্যবতীও যে প্রসিদ্ধ কুরু-ভরতবংশের এই সংকট তীব্রভাবে অনুভব করছিলেন না, তা নয়। শান্তনু ভীষ্মের প্রতি যে বঞ্চনা করেছেন, সে ব্যাপারে সত্যবতী ভীষ্মের প্রতি বেশি সহানুভূতিশীল ছিলেন। হয়তো সেই কারণেই বিচিত্রবীর্যের শ্রাদ্ধশান্তি হয়ে গেলে সত্যবতী ভীষ্মকে একান্তে ডেকে বললেন—মহারাজ শান্তনুর দুই পুত্রই যেহেতু মারা গেল অতএব তাঁর পিণ্ডদাতা হিসেবে একমাত্র তুমিই রইলে। তাঁর কীর্তি এবং সন্তান-পরম্পরা রক্ষার দায়ও এখন তোমার। এসব কথা ভেবেই তোমার কাছে আমার একটি প্রস্তাব আছে জেনো। আমি যা বলছি, তা সম্পূর্ণ ধর্মসম্মত এবং সংসার সমাজের নিয়মনীতির ধর্মতত্ত্ব যেহেতু সবই তোমার জানা—ব্যবস্থানঞ্চ তে ধর্মে কুলাচারঞ্চ লক্ষয়ে—অতএব একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমি তোমাকে নিয়োগ করতে চাই—কার্যে ত্বাং বিনিযোক্ষ্যামি তচ্ছ্রুত্বা কর্তুমর্হসি।

সত্যবতী বললেন—আমার পুত্র বিচিত্রবীর্য সম্পর্কে তোমার ছোট ভাই। তার প্রতি তোমার ভালবাসাও ছিল যথেষ্ট—মম পুত্রস্তব ভ্রাতা বীর্যবান্ সুপ্রিয়শ্চ তে। আমার সেই পুত্র অকালে স্বর্গবাসী হল এবং তাঁর দুই মহিষীর গর্ভে কোনও পুত্রকন্যাও জন্মায়নি। কাশীরাজের দুটি মেয়েরই বয়স অল্প এবং যথেষ্ট রূপযৌবনসম্পন্ন। আমি চাই, তুমি আমার আদেশ মান্য করে তোমার ভ্রাতৃবধূদের গর্ভে উপযুক্ত পুত্র উৎপাদন করো। সত্যবতীর কথা শুনে ভীষ্ম কিছু বিস্মিত হলেন না। কেননা, সমাজ সংসারের নীতিনিয়ম যাঁর জানা, তিনি জানেন যে, বিধবা ভ্রাতৃবধূদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করবার জন্য প্রথমে ঘরের দেবর ভাসুরদেরই নিয়োগ করেন গুরুজনেরা। এখানে গুরুজন হিসেবে সত্যবতীই সেই আদেশ দিয়ে বলেছেন—আমিই তোমাকে এই কুলসম্মত ধর্মকার্যে নিযুক্ত করছি—মন্নিয়োগান্মহাবাহো ধর্মং কর্তুমিহার্হসি।

সত্যবতীর আদেশে ভীষ্ম একটুও বিস্মিত হলেন না বটে, কিন্তু একমুহূর্তের মধ্যে তিনি নিজের যন্ত্রণা এবং তাঁর প্রতি বঞ্চনাটুকুও শুনিয়ে দিলেন সত্যবতীকে। বললেন—মা! তুমি এতক্ষণ যা বললে। তাকে তো ধর্ম বলতে হবে নিশ্চয়ই—অশংসয়ং পরো ধর্মস্ত্বয়া মাতুরুদাহৃতঃ—কেননা, অপুত্রক অবস্থায় পুত্র স্বর্গবাসী হলে কুলধর্মের নিয়মে এই বিচারই স্বাভাবিক। কিন্তু পুত্রলাভের ব্যাপারে আমার প্রতিজ্ঞাটুকু তো তোমার অজানা নয়। কেননা, তোমারই জন্য আমাকে সেই কঠিন প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করতে হয়েছিল। আমি বলেছিলাম—আমি আমৃত্যু ব্রহ্মচারী হয়ে থাকব, আমার পুত্রলাভের প্রয়োজন নেই—জানাসি চ যথা বৃত্তং শুল্কহেতোস্ত্বদন্তরে। তোমার বিবাহের জন্য তোমার পিতার এই শর্ত মানতে গিয়ে সেদিন যে প্রতিজ্ঞা আমি করেছিলাম, আজ কোনওভাবেই সেই সত্য থেকে আমি চ্যুত হতে পারি না—ন ত্বহং সত্যমুৎস্রষ্ঠুং ব্যবসেয়ং কথঞ্চন।

আমাদের ধারণার কথা বলি। সত্যবতী এতদিন ধরে ভীষ্মের সঙ্গে মিশেছেন। তিনি তাঁর স্বভাব জানতেন না এমন নয়। তিনি জানতেন যে, তাঁর এই অনুনয় ভীষ্ম প্রত্যাখ্যান করবেন এবং তাঁকে দুটো কথাও শোনাবেন। তিনি জানতেন এসব। কিন্তু জানলেও তিনি মনস্বিনী সত্যবতী, কুরুবাড়ির সমস্ত ব্যাপারে—সে রাজনীতিই হোক অথবা পারিবারিক সমস্যা—সর্বত্রই তাঁর সূক্ষ্ম বুদ্ধি প্রসারিত ছিল। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা জানা সত্ত্বেও যে তিনি ভীষ্মকে অনুনয় করছেন, তার কারণ একটাই—কুরুবংশের কুলবধূদের গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করার প্রস্তাব তিনি করবেন, সে প্রস্তাব যেন ভীষ্মের মুখ দিয়েই বেরোয়। পিতা শান্তনু বেঁচে থাকতেই মহামতি ভীষ্ম কুরুবাড়ির অভিভাবকের ভূমিকায় কাজ করেছেন। তিনি রাজসিংহাসনের দাবিদার হননি বটে, আপন বংশরক্ষার চেষ্টা করেননি বটে, কিন্তু তাঁর অভিভাবকত্বের 'ইগো'টুকু নিয়ে তাঁর পিতা থেকে আরম্ভ করে সত্যবতী এবং বিচিত্রবীর্য কেউই কোনও প্রশ্ন তোলেননি। আজও সত্যবতী যেটা করতে চাইছেন, তা শুধু ভীষ্মকে দিয়ে অনুমোদন করানো নয়, তাঁর মুখ থেকেই সেটা বার করতে চাইছেন। কারণ কুরুবাড়ির কীর্তি এবং সন্তান-পরম্পরা রক্ষার দায়িত্ব প্রধানত তাঁর। তিনিই এখন কুরুবংশের একমাত্র জীবিত ব্যক্তি। অন্তত যে কারণ দেখিয়ে ভীষ্মকে বঞ্চিত করে শান্তনু দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন, সেই কারণে সত্যবতীর নিজের ওপরে দায় আসে বলেই সত্যবতীর এই ভনিতা।

অতএব সত্যবতী বললেন—তোমার প্রতিজ্ঞা থেকে তুমি যে একটুও নড়বে না, সে আমি ভাল করেই জানি—জানামি তে স্থিতিং সত্যে। আর আমারই জন্য যে এই কঠিন প্রতিজ্ঞা তোমার, তাও আমি ভুলে যাইনি—জানামি চৈবং সত্যং তন্মদর্থে যচ্চ ভাবিতম্। কিন্তু এখন যে বাপু বিপদের সময়। এই প্রসিদ্ধ ভরতবংশের কুলতন্তু যাতে ছিন্ন হয়ে না যায়, কুলধর্ম রাজধর্ম যাতে উৎসন্ন না হয়, সমস্ত মন্ত্রী-অমাত্য প্রজাদের মুখে যাতে আবার হাসি ফোটে, সেরকম একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে, বাপু! জননী সত্যবতীর উদ্‌বেগ বুঝে ভীষ্ম এবার নিজেই প্রস্তাব দিলেন ত্যাগী ব্রতী এবং উপযুক্ত কোনও ব্রাহ্মণকে দিয়ে যাতে বিচিত্রবীর্যের দুই মহিষীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করানো যায়। তার জন্য ভীষ্ম কিছু টাকাপয়সা খরচা করতেও রাজি, অন্তত তাতে যদি গুণশালী কোনও ব্রাহ্মণকে দিয়ে বিচিত্রবীর্যের বংশ রক্ষা করা যায়—ব্রাহ্মণো গুণবান্ কশ্চিদ্ ধনেনোপনিমন্ত্র্যতাম্।

আবারও সুযোগ এল সত্যবতীর। ব্রাহ্মণ অথবা কোনও মুনি-ঋষিকেই যদি ডাকতে হয়, তবে তাঁর আপন কানীন পুত্র স্বয়ং পরাশর ব্যাস নন কেন। দ্বৈপায়ন ব্যাস সত্যবতীর কন্যাকালে জাত পুত্র। তিনি মহাজ্ঞানী ঋষি। সত্যবতী ব্যাসের জন্মকাহিনী শোনালেন ভীষ্মকে। ভীষ্ম ব্যাসকে চিনতেন না, এমন নয়। তখনই তিনি বিখ্যাত ব্রহ্মর্ষি। ভীষ্মের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়েই ব্যাসের অনেক আলাপ হয়েছে। সত্যবতী ভীষ্মকে শুধু জানালেন যে, ব্যাস তাঁকে কথা দিয়েছেন—জননী সত্যবতীর বিপদের দিনে তিনি নিশ্চয়ই তাঁর ডাকে সাড়া দেবেন। সত্যবতী বললেন—তুমি যদি অনুমতি কর ভীষ্ম, তবেই তাঁকে আমি ডাকতে পারি—তং স্মরিষ্যে মহাবাহো যদি ভীষ্ম ত্বমিচ্ছসি। তোমার অনুমতি পেলে আমার আশা—আমার সেই ছেলে বিচিত্রবীর্যের মহিষীদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করবে—তব হ্যনুমতে ভীষ্ম...পুত্রানুৎপাদয়িষ্যতি।

মহাভারত-না বোঝা কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা এই ঘটনার মধ্যে সত্যবতীর স্বার্থান্বেষিতা দেখতে পেয়েছেন। তাঁদের জানাই—নিয়োগ প্রথার কিছু নিয়মকানুন আছে, তাতে কুল সম্বন্ধে মৃত ব্যক্তির যথাসম্ভব কাছের মানুষই মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করার পক্ষে শ্রেয় বলে গণ্য হতেন। পিতার সম্বন্ধে ভীষ্ম যেমন বিচিত্রবীর্যের ভাই, তেমনই মায়ের সম্বন্ধে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসও বিচিত্রবীর্যের ভাই, ভীষ্ম এবং ব্যাস দুজনকেই বাদ দিলে নিয়োগ ঘটত বহিরাগত কোনও গুণবান ব্রাহ্মণকে দিয়ে। অতএব ভীষ্মের প্রত্যাখ্যানের পর বিচিত্রবীর্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে ব্যাসই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি নিয়োগের উপযুক্ত পাত্র হতে

পারেন! সত্যবতী সেই প্রস্তাব দিয়েই ভীষ্মের অনুমতি চেয়েছেন এ ব্যাপারে। ভীষ্মের না করবার কোনও হেতু ছিল না। মহর্ষি ব্যাসের নাম শোনামাত্রই ভীষ্মের মাথাটি সম্মানসূচকভাবে নত হল। দুই হাত জোড় করে ভীষ্ম সত্যবতীর প্রস্তাব মেনে নিলেন—মহর্ষেঃ কীর্তনে তস্য ভীষ্মঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ। বললেন—ধর্ম, অর্থ, কামের সমস্ত অভিসন্ধি যিনি সর্বতোভাবে জানেন, তিনিই তো সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ। তুমি যে কথা বলেছ তাতে আমাদের এই প্রসিদ্ধ বংশের হিত এবং ধর্ম দুইই হবে। তুমি যে প্রস্তাব দিয়েছ, তা শ্রেয় তো বটেই এবং তা আমার ভীষণ ভীষণ ভালও লাগছে—উক্তং ভবত্যা যচ্ছ্রেয়-স্তন্মহ্যং রোচতে ভৃশম্। সত্যবতীর প্রস্তাব ভীষ্ম মেনে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই—ততস্তস্মিন্ প্রতিজ্ঞাতে ভীষ্মেণ কুরুনন্দন—সত্যবতী তাঁর প্রিয় পুত্রকে স্মরণ করলেন আপন পুত্রবধূদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করার জন্য।

যথাসময়ে অম্বিকার গর্ভে জন্মালেন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র, অম্বিকার গর্ভে পাণ্ডু এবং এক দাসীর গর্ভে জন্মালেন বিদুর। কুরুবংশের এই তিন সন্তানকে নিয়ে আবারও ভীষ্মের তপস্যা আরম্ভ হল। যিনি নিজের পিতার সময় থেকে কুরুবংশের অভিভাবক নিযুক্ত হয়েছিলেন আবার সেই অভিভাবকত্ব আরম্ভ হল ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুরকে নিয়ে। তাঁদের অস্ত্রশিক্ষা দেওয়া, বেদ বেদাঙ্গ ইতিহাস পড়ানো, শ্রম-ব্যায়াম নীতিশাস্ত্র শেখানো—এ সব কিছুই ভীষ্ম নিজেই সম্পন্ন করলেন। জন্ম থেকে এই তিন বালকের মতিগতি এবং বিশিষ্টতা বুঝে ভীষ্ম যেভাবে বিশেষ বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন, তা এক পিতা শুধু পুত্রের জন্য করেন—জন্ম প্রভৃতি ভীষ্মেণ পুত্রবৎ প্রতিপালিতাঃ। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলে তাঁকে অস্ত্রশিক্ষা দেওয়া তেমন সম্ভব হল না বটে, কিন্তু প্রভূত পরিশ্রমব্যায়ামের মাধ্যমে ধৃতরাষ্ট্রকে অন্যতম শক্তিমান পুরুষে পরিণত করলেন ভীষ্ম।

এইভাবে ভীষ্মের শিক্ষায় রাজপুত্রেরা বড় হবার পর পাণ্ডু কুরুরাজ্যের সিংহাসনে বসলেন। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলে সেকালের চিরাচরিত আইনে তাঁকে সিংহাসনের অধিকার দেওয়া গেল না। অন্ধ, বধির কিংবা ক্লীব ব্যক্তি সেকালে সিংহাসনে বসে রাজকার্য চালাবার উপযুক্ত বলে গণ্য হতেন না। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের বুকে এই দুঃখ কাঁটার মতো বিঁধে রইল, কিন্তু তাতে তাঁর রাজসুখে কোনও বাধা ঘটল না। কারণ, মহারাজ পাণ্ডু যথোচিত মর্যাদায় ধৃতরাষ্ট্রের পালন পোষণ করতে লাগলেন।

রাজকার্য যখন ভালভাবে চলতে লাগল, তখন ভীষ্মের মনে কথঞ্চিৎ আত্মতৃপ্তি বিরাজ করতে লাগল। আর যখনই এই পুত্রকল্প রাজাদের দেখে ভীষ্মের আত্মতৃপ্তি আসে, সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মন এক অজানা আশঙ্কায় পীড়িত হতে থাকে। বার বার মনে হয়—কুরুবংশের এই অঙ্কুরগুলি ঠিক ঠিক বর্ধিত হয়ে ফুলে ফুলে শোভিত হবে তো! নাকি আবারও সেই বিপদ আসবে, যেমনটি এসেছিল চিত্রাঙ্গদ বিচিত্রবীর্য মারা যাবার পর।

এই আশঙ্কা থেকেই একদিন বিদুরকে ডেকে আনলেন ভীষ্ম। একান্ত আলোচনার জন্য। বিদুর বিচিত্রবীর্যের মহিষীদের গর্ভে জন্মাননি। স্বয়ং পরাশর ব্যাস তাঁকে সৃষ্টি করেছেন আপন আর্ষমাহাত্ম্যের গৌরবে। জন্ম থেকেই বিদুর পরম ধর্মজ্ঞ। বেদ বেদাঙ্গ ছাড়াও রাজনীতিশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র এবং আইন-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে বিদুরের শাস্ত্রগত তথা বাস্তব জ্ঞান অত্যন্ত প্রখর। ভীষ্ম সেই বিদুরকে ডেকে বললেন—দেখো বাছা! আমাদের এই প্রসিদ্ধ ভরতবংশ পৃথিবীর সমস্ত রাজবংশের মহিমা অতিক্রম করেছে। আমাদের অগ্রজন্মা সব রাজারা হস্তিনাপুরের রাজ্যকে সম্যকভাবে রক্ষা করে গেছেন। আমি চাই—এই মহান বংশ যাতে কোনওভাবেই লুপ্ত হয়ে না যায়। তুমি তো জান বিদুর—বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর আমাদের এই প্রসিদ্ধ বংশ প্রায় উৎসন্ন হয়ে যেতে বসেছিল। কিন্তু আমি, সত্যবতী এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস—তিনজনে মিলে—ময়া চ সত্যবত্যা চ কৃষ্ণেন চ মহাত্মনা—এই বংশের

কুলতন্তুগুলি পুনঃস্থাপন করেছি। এখন তোমায় আমায় মিলে সেই চেষ্টা করতে হবে যাতে এই বংশ ফুলে ফেঁপে সাগরের মতো বড় হয়ে ওঠে—তচ্চৈতদ্ বর্ধতে নিত্যং কুলং সাগরবদ্ যথা।

ভীষ্ম আবারও বিয়ের কথা বলছেন। ভ্রাতুষ্পুত্রদের বিয়ের কথা। সেই পিতা শান্তনুর সময় থেকে আরম্ভ হয়েছিল। শান্তনু বংশবৃদ্ধির অজুহাত দেখিয়ে নিজে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর জন্যই ভীষ্মের জীবনে প্রথম সমস্যা তৈরি হয় এবং সেই তাঁর আত্মত্যাগ শুরু। তারপর তাঁর পুত্র বিচিত্রবীর্যের বিবাহের জন্য কাশীরাজের স্বয়ংবরসভায় গিয়ে নিজের মরণসমস্যা তৈরি করলেন। এখন বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ সন্তানদের বংশবৃদ্ধির বিষয়েও আবারও তাঁর চিন্তা আরম্ভ হয়েছে। নিজে বিবাহ করতে পারেননি, সন্তানলাভ করতে পারেননি, তার জন্য তাঁর কোনও দুঃখ নেই। কিন্তু পিতার বংশকে ঠিক ঠিক বাঁচিয়ে রাখতে হবে, তাঁদের বংশবৃদ্ধি ঘটাতে হবে। এ কেমন এক অভিমান! যে পিতা ভীষ্মের মতো এক পুত্রকে পুত্রের মধ্যে গণ্য না করে তাঁকে বঞ্চিত করে বিবাহ করেছেন, ভাগ্যের কী নিষ্ঠুর পরিহাস—তাঁর দুটি পুত্রই বাঁচলেন না এবং তাঁরা পুত্র পর্যন্ত রেখে যেতে পারলেন না। এই পরিহাসই ভীষ্মকে কুরুবংশের মায়ায় জড়িয়েছে। সব সময় তাঁর আশঙ্কা—আবার কোনও দুর্ঘটনা না হয়। অন্তত কোনও দুর্ঘটনা ঘটার আগে কুলের উত্তরাধিকারীরা জন্ম নিক এই পৃথিবীতে।

ভীষ্ম এবার আর কোনও 'রিস্ক' নিলেন না। নানা তীর্থে রাজ্যে রাজ্যে ঘুরে বেড়ানো ব্রাহ্মণ সজ্জনেরা তাঁকে দুটি কন্যারত্নের কথা জানিয়ে গেছেন। একটি যাদবঘরের কন্যা বসুদেবের ভগিনী কুন্তী, দ্বিতীয়া হলেন গান্ধার দেশের রাজা সুবলের কন্যা গান্ধারী। শুধু এই বংশপরিচয়, আর এই দুই কন্যার রূপগুণের কথা শুনেই যে ভীষ্ম কন্যাদুটিকে ভরতবংশের কুলবধূ করে আনতে চান, তা নয়। ভীষ্ম চান যে, পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা সংখ্যায় এতই বেশি থাকুন, যাতে রাজবংশের উত্তরাধিকারী নির্ণয়ে কোনও সমস্যা তৈরি না হয়।

কুন্তী এবং গান্ধারী-র কথা বিদুরকে জানানোর পর বিদুর ভীষ্মকে বলেছেন—এই বংশের মাতা, পিতা এবং গুরু—সবই আপনি। আপনি আমাদের বংশের হিতের জন্য যেটা ভাল মনে করবেন, সেটাতেই আমাদের ভাল হবে—ভবান্ পিতা ভবান্ মাতা ভবান্নঃ পরমো গুরুঃ। সত্যি কথা বলতে কী, কুন্তী এবং গান্ধারীকে কুলবধূ হিসেবে ভাবনা করার সময় ভীষ্ম শুধু বলেছিলেন—এই কুলের সন্তান-পরম্পরা ঠিক রাখার জন্য এই দুজনকেই বরণ করে নিয়ে আসাটা ঠিক হবে বলে আমার মনে হয়। তবে এ বিষয়ে তোমার মতটাও জানতে চাই বিদুর—সন্তানার্থং কুলস্যাস্য যদ্বা বিদুর মন্যসে।

বিদুর একবারও জিজ্ঞাসা করেননি—কেন? কেন এই ভারতবর্ষের সমস্ত রাজকন্যাকে ছেড়ে এই দুটি কন্যাই আপনার পছন্দ হচ্ছে? বিদুর এই প্রশ্ন না করলেও তিনি জানতেন যে, বিশেষ কিছু ভেবেই ভীষ্ম এই দুজনকে কুলবধূর মর্যাদা দিতে চাইছেন। বস্তুত এই ভাবাটা ভীষ্ম আগেই ভেবে নিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণদের মুখে তিনি শুনেছিলেন যে, সুবলাত্মজা গান্ধারী মহাদেবের কাছে শত পুত্র লাভের বর পেয়েছেন। অন্যদিকে দুর্বাসার মন্ত্রবলে দৈব পুত্রলাভের সমস্ত অভিসন্ধিই যে যাদবী কুন্তীর করায়ত্ত—এ কথাও নিশ্চয়ই জানতেন ভীষ্ম। কেননা, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় শরশয্যায় শুয়ে মহাবীর কর্ণকে ভীষ্ম বলেছিলেন—আমি দেবর্ষি নারদের কাছে আগেই শুনেছি যে, তুমি অধিরথসূতপুত্র রাধাগর্ভজাত নও, সূর্যের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে যে তোমার জন্ম হয়েছে, তা আমি জানতাম—সূর্যজস্ত্বং মহাবাহো বিদিতো নারদান্ময়া।

এই খবর থেকে বোঝা যায় যে, পুত্রলাভের ব্যাপারে কুন্তীর দৈবী ক্ষমতা ভীষ্ম আগে থেকেই জানতেন। একই সঙ্গে আরও একটা সন্দেহ আমাদের মনে আসে। পাণ্ডুর বধূ

হিসেবেই তিনি কুন্তীর কথা ভাবলেন কেন? মিলনসময়ে ব্যাসের তেজে অম্বালিকার শরীর পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গিয়েছিল বলে তাঁর পুত্রটি পাণ্ডুবর্ণ হয়েই জন্মালেন। কিন্তু পাণ্ডুবর্ণতা তেমন কোনও রোগ নয়। আমাদের ধারণা—পাণ্ডু যে সন্তানলাভের ব্যাপারে অক্ষম ছিলেন, সে কথা ভীষ্ম জানতেন এবং জানতেন বলেই এমন একটি বধূর কথা তিনি ভেবেছেন, যাঁর অন্য কোনও উপায়ে সন্তান লাভের উপায় করায়ত্ত।

মহাভারতে কুন্তীর বিবাহ উপলক্ষে একটি স্বয়ংবরসভার আয়োজন আমরা দেখি বটে, কিন্তু সেখানে কুন্তী যে পাণ্ডুকেই স্বামী হিসেবে নির্বাচন করলেন, তার একটা বড় কারণ মনে হয় ভীষ্মের পূর্ব যোগাযোগ। ভীষ্ম হয়তো আগেই কুন্তীর কথা শুনেছিলেন নারদের মুখে এবং স্বয়ংবরের পূর্বেই হয়তো মহারাজ কুন্তিভোজের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করে থাকবেন। পাণ্ডু এবং কুন্তীর বিবাহও হয়ে যায় পূর্বকল্পিত উপায়ে। কুন্তীর ব্যাপারে আমাদের এই ভাবনা বা দ্বিধার কথা তেমন স্পষ্ট করে লেখেননি মহাভারতের কবি। কিন্তু শুধুমাত্র সংখ্যায় পুত্রসন্তান বেশি লাভ করতে পারেন—প্রধানত এই চিন্তাতেই যে ভীষ্ম গান্ধারীকে কুরুকুলের বন্ধু নির্বাচন করেছিলেন, সে কথা খুব স্পষ্টভাবেই লিখেছেন মহাভারতের কবি—ইতি শুশ্রাব তত্ত্বেন ভীষ্মঃ কুরুপিতামহঃ। গান্ধারী এবং কুন্তীর নির্বাচনের কথা মহাভারতের একই জায়গায় লিখিত আছে। অপিচ নারদের মুখে কর্ণের সংবাদ ভীষ্ম যেহেতু আগেই জানতেন, তাই আমাদের ধারণা—ব্যাস স্পষ্ট করে না বললেও কুন্তীর পূর্ব কথা বিশেষত দুর্বাসার মন্ত্রবলের কথাও ভালভাবেই জানতেন ভীষ্ম।

তথাকথিত যে স্বয়ংবরে পাণ্ডুকে বরণ করলেন কুন্তী, সৌভাগ্যের বিষয় পাণ্ডু নিজেই সেখানে গিয়েছিলেন। অন্যদিকে হস্তিনাপুর থেকে অন্য কোনও রাজপুরুষকে গান্ধার রাজ্যে পাঠিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের জন্য নির্বাচিত বধূটিকে নিয়ে আসা হল এবং শাস্ত্রমতে তাঁর বিবাহ হল হস্তিনাপুরেই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, সন্তানলাভের ক্ষেত্রে কুন্তীর দৈবী শক্তি এবং গান্ধারীর বরলাভের কথা জেনেও সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হলেন না ভীষ্ম। অন্তত সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজা পাণ্ডুর দ্বিতীয় একটি বিবাহ দেবার কথা ভাবলেন স্বয়ং ভীষ্ম। এমন হতেই পারে যে, সন্তানলাভের ব্যাপারে পাণ্ডুর অক্ষমতার কথা খুব স্পষ্টভাবে কখনওই ধারণা করা যেত না, অন্তত বিবাহের পূর্বে তা ধারণা করা তো উচিতও নয়। সেক্ষেত্রে কুন্তীর সঙ্গে বিবাহ দিয়ে পাণ্ডুর পুত্রলাভের পথ মসৃণ রেখেও ভীষ্ম যে দ্বিতীয়বার মাদ্রীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ স্থির করলেন, তা হয়তো পাণ্ডুর আপন পৌরুষে আস্থা ফেরানোর জন্য। পাণ্ডুর স্বল্পায়ু জীবন লক্ষ করলেও বোঝা যাবে পাণ্ডু কুন্তীর চেয়ে মাদ্রীকে বেশি ভালবাসতেন। পুত্রলাভের ক্ষমতা যে রমণীর আপন করায়ত্ত তাঁকে নিয়ে অলৌকিক গৌরব বোধ করা যেতে পারে নিশ্চয়ই, কিন্তু যেকোনও পুরুষেরই, তা সে যত অক্ষমই হোক, পুরুষকারে আঘাত লাগে।

পাণ্ডুর জন্য দ্বিতীয় বধূ নির্বাচনের সার্থকতা হয়তো সেইখানেই এবং মাদ্রীকে নির্বাচন করেছেন ভীষ্ম নিজে গিয়ে। এটা অনেকটাই সেই বিচিত্রবীর্যের সময়ের মতো। যদিও এখানে কোনও স্বয়ংবরের ব্যবস্থা ছিল না এবং ভীষ্ম গিয়ে সোজা মদ্রেশ্বরকে বলেছিলেন—আমি পাণ্ডুর সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্য এ রাজ্যের রাজকন্যাটিকে বধূ হিসেবে চাই—তামহং বরয়িষ্যামি পাণ্ডোরর্থে যশস্বিনীম্। মদ্ররাজ সানন্দে রাজি হয়েছেন এবং ভীষ্মও মাদ্রীকে নিয়ে হস্তিনাপুরে পৌঁছেছেন শ্বশুরের মতো। পাণ্ডুর বিবাহের পর ভীষ্ম বিদুরের বিয়েও দিয়েছেন এবং তা একেবারে জাত মিলিয়ে। বিদুর ব্যাসের ঔরসে শূদ্রা দাসীর গর্ভজাত সন্তান। এই ধরনের বর্ণসংকর জাতক তখনকার সমাজে 'পারসব' বলে পরিচিত ছিলেন। মহামতি ভীষ্ম বিদুরের সঙ্গে একটি 'পারসবী' কন্যারই বিবাহ দিয়েছেন, যাতে অভিভাবক হিসেবে তাঁকে কেউ কিছু বলতে না পারে।

বিচিত্রবীর্যের পুত্র বলে কথিত ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুরের বিয়ে দিয়ে ভীষ্ম বেশ সন্তুষ্ট

মনেই দিন কাটাচ্ছিলেন। রাজা হিসেবে পাণ্ডুও ছিলেন যথেষ্ট সার্থক। বিশেষত জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র এবং কনিষ্ঠ বিদুরের প্রতি পাণ্ডুর ব্যবহার এতই মধুর ছিল যে, অন্তত ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে তাঁকে কোনও দোষ দেওয়া সম্ভব হত না বলেই মনে হয়। কিন্তু এরই মধ্যে কী ঘটল কে জানে, অতৃপ্ত ধৃতরাষ্ট্রকে খানিকটা রাজ্যশাসনের সুযোগ দেবার জন্যই হোক অথবা নিজের পুত্রলাভের অক্ষমতা সবার কাছে ঢেকে রাখবার জন্যই হোক, পাণ্ডু তাঁর দুই স্ত্রীকে নিয়ে বনে চলে গেলেন। ভারপ্রাপ্ত রাজা হিসেবে পাণ্ডুর রাজ্যশাসন চালাতে লাগলেন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র।

ভারপ্রাপ্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য চালাতে চালাতে রাজত্বের স্বাদ পেলেন বোধহয়। যদিও এখনও পর্যন্ত তিনি হস্তিনাপুর থেকে নানা ভোগবিলাসের উপকরণ বনবাসী পাণ্ডুকে পাঠিয়ে যাচ্ছিলেন এবং পাণ্ডু তা গ্রহণও করছিলেন। কিন্তু কিন্দম মুনির অভিশাপের রূপকে পাণ্ডু যখন নিজের পুত্রলাভের অক্ষমতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হলেন, তখন তিনি ব্রাহ্মণ সজ্জনদের হস্তিনাপুরে পাঠিয়ে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, তিনি আর রাজ্যে ফিরে আসবেন না, তিনি এখন থেকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে বনে বনে, তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াবেন—গত্বা নাগপুরং বাচ্যং পাণ্ডুঃ প্রব্রজিতো বনম্। কথাটা শুনে ভারপ্রাপ্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্রকেও আমরা অত্যন্ত শোকক্লিষ্ট হতে দেখেছি, কিন্তু এই শোক তাঁর একান্ত আন্তর শোক কি না, সেটা মহাভারতের শব্দপ্রমাণ থেকে তেমন বোঝা যায় না।

যাই হোক, এসব খবরে কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মের কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে আমরা আন্দাজ করতে পারি। ঘরপোড়া গরু যেমন সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়, ভীষ্মেরও সেই অবস্থা হল নিশ্চয়ই। হস্তিনাপুরের রাজ্যশাসন এক অদ্ভুত অনিশ্চয়তার মধ্যে এসে পড়ল। দেশের রাজা প্রব্রাজক হয়ে গেলেন। অন্যদিকে ভারপ্রাপ্ত রাজা অন্ধ এবং পূর্বে তিনি রাজ্যলাভে উৎসুক ছিলেন। এরমধ্যে আবার নতুন বিপদ তৈরি হল। পাণ্ডু তখন শতশৃঙ্গ পর্বতের অধিবাসী এবং সেখান থেকেই খবর এসে পৌঁছোল পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠির জন্মগ্রহণ করেছেন। ধৃতরাষ্ট্রের তখনও পুত্র হয়নি। গান্ধারী আপন উদরে আঘাত করে এক মাংসপেশি প্রসব করলেন বটে, কিন্তু সে খবর পেয়ে স্বয়ং ব্যাস এসে পৌঁছোলেন হস্তিনাপুরে। ব্যাস যথানিয়মে সেই মাংসপেশি শতধা বিদীর্ণ করে একশোটি কলসি সাজিয়ে গান্ধারীর শত পুত্র জন্ম সুনিশ্চিত করলেন বটে, কিন্তু হিমালয়ের আশ্রমে ফিরে যাবার আগে তিনি মহামতি ভীষ্ম এবং বিদুরকে জানিয়ে গেলেন যে, জন্মসময়ের প্রমাণে মহারাজ পাণ্ডুর প্রথম পুত্র যুধিষ্ঠিরই কিন্তু জ্যেষ্ঠ —তদাখ্যাতন্তু ভীষ্মায় বিদুরায় চ ধীমতে।

কুরুকুলের সর্বজ্যেষ্ঠ অভিভাবকের কাছে কুরুবংশের প্রতিস্থাপক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কী ইঙ্গিত করে গেলেন, তা দুর্বোধ্য কিছু নয় এবং যথাসময়ে তা অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কানেও এল। তিনি নিজে রাজা হতে পারেননি এবং যুধিষ্ঠিরের জ্যেষ্ঠতার কারণে তাঁর পুত্রও যে রাজা হতে পারবেন না—এ বিষয়ে তাঁর বিষাদ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছিল। যুধিষ্ঠিরের জ্যেষ্ঠত্ব তিনি কোনওমতে গলাধঃকরণও করতে পারছেন না, আবার বমনও করতে পারছেন না। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধন যেদিন জন্মালেন, সেদিন ভীষ্ম বিদুরকে সভায় ডেকে আনলেন ধৃতরাষ্ট্র। নিজের বক্তব্য এবং ভীষ্ম বিদুরের প্রতি বক্তব্যের প্রমাণ রাখবার জন্য অন্যান্য কুরুবংশীয় তথা বন্ধুবান্ধবদেরও সভায় ডেকেছিলেন ধৃতরাষ্ট্র।

ধৃতরাষ্ট্র বলেছিলেন—মানলাম। এ কথা মানলাম যে, যুধিষ্ঠিরই রাজপুত্রদের মধ্যে বয়সে সবার বড় এবং সেইজন্য সে নিজের গুণেই রাজ্য পাবে। আমাদের কিছু বলার নেই এখানে। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের পর আমার পুত্র দুর্যোধন এই রাজ্যের রাজা হবে তো— অয়ত্বনন্তরস্তস্মাদ্‌অপি রাজা ভবিষ্যতি।

ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রশ্নের উত্তর ভীষ্ম দিতে পারেননি। পারেননি, কারণ তিনি এই নবোদ্গত কুলাঙ্কুরগুলির পিতামহ। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের এই কথার মধ্যে কী সর্বনাশা ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে, তা তিনি ভালই বুঝেছেন। দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের চেয়ে এক বছরের মাত্র ছোট। দুজনকেই দীর্ঘায়ু পুরুষ ধরে নিলে যুধিষ্ঠিরের পর কবে দুর্যোধন রাজা হবেন? এক যদি আগেই অকালে কুলজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের মৃত্যু না হয়। ধৃতরাষ্ট্র কি তাঁর মৃত্যু চান। ধৃতরাষ্ট্রের এই অদ্ভুত প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে হস্তিনাপুরে নানা দুর্নিমিত্ত দুর্লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। এই দুর্লক্ষণ যতখানি প্রাকৃতিক, অন্তত মহাভারতে তাই বর্ণিত আছে, এই দুর্লক্ষণ তার চেয়েও বেশি পারিবারিক এবং অবশ্যই রাজনৈতিক। ভীষ্ম বিদুরের মতো মানুষেরা এই দুর্লক্ষণটাই দেখতে পেয়েছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নে। কিন্তু ভীষ্ম কথা না বললেও বিদুর তাঁর ভয়ভাবনা জানিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন—আপনার এই পুত্রের জন্য শেষপর্যন্ত এই প্রসিদ্ধ ভরতবংশের বিনাশ ঘটবে—ব্যক্তং কুলান্তকরণো ভবিতৈষ সুতস্তব। আপনি এই পুত্র ত্যাগ করুন, মহারাজ।

দুর্যোধন সবেমাত্র জন্মেছেন, কিন্তু সেই পুত্রকে নিয়েই ধৃতরাষ্ট্র যে উচ্চচূড় স্বপ্ন দেখছেন, প্রাকৃতিক দুর্লক্ষণের তাৎপর্য এইখানেই। বিদুরের কথায় ধৃতরাষ্ট্র পুত্রত্যাগ করেননি। ক্রমান্বয়ে ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র রাজকীয় মর্যাদায় মানুষ হতে লাগলেন। বছর পনেরো এইভাবেই কেটে গেল এবং কুরুবংশের বিপদসূচক সেই দুর্লক্ষণ ঘনিয়ে এল শতশৃঙ্গ পর্বতে পাণ্ডুর দেহান্ত হবার পর। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর শতশৃঙ্গবাসী মুনি-ঋষিরা কুন্তী এবং তাঁর পাঁচ পুত্রকে নিয়ে হস্তিনাপুরে এলেন। সঙ্গে পাণ্ডু এবং মাদ্রীর মৃতদেহ।

সেদিন কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মের মনের অবস্থা কীরকম হয়েছিল, তার কোনও বর্ণনা নেই মহাভারতে। কিন্তু পৌর-জনপদেরা রাজসভার বাইরে ভেঙে পড়েছে। পাঁচ পুত্রের হাত ধরে অসহায় কুন্তী রাজসভায় দাঁড়িয়ে আছেন আর সমস্ত কুরুমুখ্যদের মধ্যে অন্যতম এক ব্যক্তি হিসেবে ভীষ্ম বসে আছেন রাজসভায় মুনি-ঋষিদের মুখে কুন্তীর পুত্র-পরিচয় শোনার জন্য। কেমন লেগেছিল ভীষ্মের? কুলবৃদ্ধ হিসেবে ভীষ্মই মুনি-ঋষিদের রাজসভায় আমন্ত্রণ জানালেন এবং তারপরেই শুনতে পেলেন সেই ভয়ংকর সংবাদ—পাণ্ডু এবং মাদ্রীর মৃত্যু হয়েছে। কুন্তী ও মাদ্রীর গর্ভে পঞ্চ দেবতার ঔরসজাত পাঁচ পুত্রই স্বর্গত মহারাজ পাণ্ডুর পুত্র। তাঁরাই মহারাজ পাণ্ডুর উত্তরাধিকারী।

রাজসভায় আসীন সমস্ত রাজন্যবর্গ এবং সুহৃদ্‌বর্গ এবং কুরুবংশীয়রা সকলেই পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্রদের স্বীকার করে নিলেন এবং ঠিক এই ঘটনার পরেই ভারপ্রাপ্ত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের মুখে প্রথম রাজশাসন বিজ্ঞাপিত হল—বিদুর! পাণ্ডু এবং মাদ্রীর শব-সৎকার এবং শ্রাদ্ধক্রিয়া রাজোচিতভাবে সম্পন্ন করো। ধৃতরাষ্ট্রের এই আদেশের পর আমরা কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মকেও বিদুরের সঙ্গে রাজাদেশ পালনে নিযুক্ত দেখছি—বিদুরস্তং তথেত্যুক্ত্বা ভীষ্মেণ সহ ভারত। পাণ্ডু এবং মাদ্রীর সৎকার এবং শ্রাদ্ধক্রিয়া সমস্ত সময়টা জুড়ে ভীষ্মকে মাঝে মাঝেই পাণ্ডব-বালক এবং বিদুরের সঙ্গে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখছি—ক্রোশন্তঃ পাণ্ডবাঃ সর্বে ভীষ্মো বিদুর এব চ।

পাণ্ডুর শ্রাদ্ধ হয়ে গেলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস জননী সত্যবতীকে কৌরবদের সংসার ছেড়ে বনবাসী হবার পরামর্শ দিয়ে বললেন—মা! তোমার দেখা সেই যৌবনবতী পৃথিবী এখন বৃদ্ধা। নানা অন্যায় অনীতিতে ভরে উঠবে এই সংসার। তোমার সুখের দিন শেষ হয়ে গেছে, মা! তুমি তপোবনে তপস্যা করবে চলো—অতিক্রান্তসুখাঃ কালাঃ পৃথিবী গতযৌবনা। পুত্রের কথা শুনে সত্যবতী ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডুর জননী অম্বিকা এবং অম্বালিকাকে নিয়ে বনগমনের জন্য প্রস্তুত হলেন। এই মুহূর্তে যাঁর কাছে সত্যবতী বিদায় চাইলেন, তিনি ভীষ্ম—ভীষ্মমামন্ত্র্য সুব্রতা। আপন বিবাহের দিন থেকে আজ পর্যন্ত যে ব্যক্তি তাঁর সুখদুঃখের সঙ্গী ছিলেন,

তাঁরই কাছেই শুধু বিদায় নেবার দায় রইল সত্যবতীর। সত্যবতী একবারও বুঝলেন না, হয়তো বা বুঝেও বুঝলেন না, যে—ভরতবংশ বৃদ্ধির যে অছিলায় ভীষ্মকে রাজ্য এবং সংসার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, আজও তিনি শুধু সেই দায়িত্ব নিয়েই কুরুবাড়ির সংসারে রয়ে গেলেন।

আগের মতো অভিভাবকত্ব আজ আর চলে না। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর বিবাহসময় পর্যন্ত ভীষ্ম যে মর্যাদায় ছিলেন, আজ আর তিনি সেই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত নেই। কালের নিয়মেই সেই মর্যাদা প্রতিষ্ঠা তাঁর টলে গেছে। যে পৃথিবী এককালে ভীষ্মের কাছেও যৌবনবতী ছিল, সে কিন্তু ভীষ্মের চোখেও তার যৌবন হারিয়েছে। তাঁরও কিন্তু সুখের দিন অতিক্রান্ত। কিন্তু তবু ভীষ্ম সত্যবতীর মতো চলে যেতে পারলেন না। পিতা শান্তনু ভরতবংশের মূল দৃঢ়প্রোথিত করার জন্য দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন বটে, কিন্তু রাজ্যশাসন সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে তিনি দেবব্রত ভীষ্মকে অতিক্রম করেননি। তাঁর পুত্র বিচিত্রবীর্যও অতিক্রম করেননি ভীষ্মকে। এমনকী সত্যবতীও তেমন পরামর্শ কখনও দেননি।

কিন্তু আজ যখন দ্বৈপায়ন ব্যাসের ইঙ্গিতে জননী সত্যবতী কুরুবাড়ির সংসার ছেড়ে চললেন, তখন তাঁরই প্রায় সমবয়সি অথবা বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও ভীষ্ম এই কুরুবাড়ি ছেড়ে যেতে পারলেন না কেন? সে কি শুধুই মায়া? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁর মতো মনস্বী ব্যক্তি শুধু মায়ায় জড়িয়ে পড়ে ভবিষ্যতের অপমান হজম করার জন্য কুরুবাড়িতে বসে রইলেন না। বরঞ্চ ব্যাস যে সত্যবতীকে বলেছিলেন—কুরুবংশীয় জাতকদের অন্যায়ে এই পৃথিবী এখন দুঃখাবাস হয়ে উঠবে—সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী মনে রেখে ভীষ্ম এখনও রয়ে গেলেন সেই অন্যায়ের প্রতিরোধের জন্য। যথাসম্ভব প্রতিরোধের জন্য। অন্যায় হবে, খারাপ দিন আসবে, সেই ভয়ে অন্য সকলে, এমনকী কুরুবংশের জননী সত্যবতীও পালিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু ভীষ্ম পালিয়ে যেতে পারেন না। যে বংশের হিতের জন্য তিনি রাজ্য এবং সংসারসুখ জলাঞ্জলি দিয়েছেন, তিনি তার শেষ দেখে যাবেন।

ভীষ্মের হাতে আছে ইচ্ছামৃত্যুর বর। কাজেই পলায়ন করে তিনি সেই মৃত্যু বরণ করবেন না। পিতা শান্তনুর বিবাহের সময়েও তিনি পালাননি, আজও তিনি পালাবেন না। সংসারের চরম বঞ্চনা যৌবনকালেই যাঁর গা-সওয়া হয়ে গেছে, তাঁকে এই বৃদ্ধ বয়সে আর কোন বঞ্চনা কোন অপমান আরও বেশি করে পীড়িত করবে! তিনি অন্তত এইটুকু দেখে যাবেন যে, তাঁকে বঞ্চিত করে পিতা শান্তনু অন্যতর যে ধারায় কুরুবংশের বৃদ্ধি কামনা করেছিলেন, সে ধারায় কেমন চলে কৌরববংশ? তিনি দেখে যাবেন। সব দেখে যাবেন। সে দেখার সাধ এবং সাহস সত্যবতীর নেই। তাই তিনি পালালেন। কিন্তু ভীষ্ম থাকলেন সেই পুরাতন সাক্ষী-চৈতন্যের মতো, পিতা শান্তনুর বীজবপন থেকে বৃক্ষ ধ্বংস পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করার জন্য। তিনি থাকলেন আরও একটি কারণে। ধ্বংসের অনিবার্য যে প্রক্রিয়া ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন থেকেই শুরু হয়েছিল সেই প্রক্রিয়ার মধ্যেই তিনি তাঁর প্রতিরোধ এবং সুপরামর্শ রেখে যাবেন, যাতে সেই ধ্বংস-প্রক্রিয়ার সমান্তরাল ভূমিতে তাঁরই মতো এক বঞ্চিত মানুষ, এক বঞ্চিত পরিবারের জয় উৎপন্ন হয়। ভীষ্ম তাই কুরুবাড়িতেই থেকে গেলেন।

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও একটা দৃশ্য হামেশাই চোখে পড়ত। বাড়িতে যেসব কচিকাঁচারা জন্ম নিত একটু বড় হলেই, তাদের শিক্ষাদীক্ষা এবং অভিভাবকত্বের ভার থাকত বৃদ্ধ ঠাকুরদাদাটির ওপর। উপার্জনকারী পিতা সংসারের অর্থনৈতিক চাহিদা মেটাতে ব্যস্ত থাকতেন বলে সংসারের মূল শাসনটা তাঁরই হাতে থাকত বটে, কিন্তু তাঁর সন্তানের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রাথমিক ভাবনাগুলি ভাবার জন্য ঠাকুরদাদাই ছিলেন আদর্শ ব্যক্তি। মহাভারতে ভীষ্মকেও আমরা প্রায় সেই ভূমিকাতেই দেখছি। রাজ্যশাসনের সাধারণ ক্ষেত্রগুলিতে তিনি প্রায়ই আর কথা বলেন না। কেননা রাজ্যভারপ্রাপ্ত ধৃতরাষ্ট্রই একভাবে রাজ্যশাসন জারি করেন, মন্ত্রী অমাত্যরা তা শোনেন এবং ভীষ্ম সেখানে সাধারণত নিজের অনুপ্রবেশ ঘটান না।

ইতিমধ্যে পাণ্ডব কৌরবদের ক্রীড়াকৌতুকের মাঝখানে দুর্যোধন যে ভীমকে বিষান্ন খাইয়ে মারবার চেষ্টা করেছিলেন, ভীষ্ম সে খবর পানইনি। এই ঘটনার পরে পরেই পাণ্ডব কৌরবদের শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে ভাবতে লাগলেন ভীষ্ম। খুব বড় সুযোগই এসে গেল। কুলগুরু কৃপাচার্যই শিক্ষার প্রাথমিক কাজগুলো চালাচ্ছিলেন বটে, কিন্তু ভীষ্ম চাইছিলেন—এমন কারও কাছে তাঁর নাতিদের অস্ত্রশিক্ষা হোক যিনি মহাস্ত্রবিদ। তিনি নিজে মহাবীর পরশুরামের শিষ্য, কিন্তু তাঁর পরে এমন কেউই এ বংশে জন্মাননি, যিনি অস্ত্রশিক্ষার গভীর প্রয়োজনবোধে মহান গুরুর কাছে গেছেন অথবা সেইরকম কোনও অস্ত্রশিক্ষা করেছেন।

সুযোগ এসে গেল, পরশুরামের কাছে দিব্যাস্ত্র লাভ করা দ্রোণাচার্য যখন পাঞ্চাল দ্রুপদের কাছে অপমানিত হয়ে হস্তিনাপুরে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। চেহারা এবং ক্ষমতার কথা শুনেই ভীষ্ম বুঝে গেছেন যে, তিনিই দ্রোণাচার্য। দ্রোণাচার্য ভীষ্মের কাছে তাঁর ব্যক্তিগত অপমানের কথা জানালেন। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ তাঁর সঙ্গে যে মিথ্যাচার করেছেন, তার করুণ বর্ণনা তিনি দিয়েছেন ভীষ্মের কাছে। এমনকী দ্রোণ যে প্রধানত পাঞ্চাল দ্রুপদের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই শিষ্যকামী হয়ে হস্তিনাপুরে এসেছেন, সে কথাও তিনি গোপন রাখলেন না ভীষ্মের কাছে। সব শুনেও কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণাচার্যকে বরণ করলেন পাণ্ডব কৌরবদের অস্ত্রগুরু হিসেবে। দ্রোণের করুণ বর্ণনা এবং কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা শুনে ভীষ্ম তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন—আপনি আপাতত ধনুকের ছিলাটি খুলে রেখে কুরুদের ঘরে বিশ্রাম করুন। খাওয়াদাওয়া করুন ভাল করে। সমস্ত কুরুদেশ আপনার পাশে আছে। প্রতিজ্ঞাপূরণের জন্য আপনি যেমনটি চান, তেমনটি হয়েই গেছে ভেবে নিন—যচ্চ তে প্রার্থিতং ব্রহ্মণ্ কৃতং তদিতি চিন্ত্যতাম্।

বিচিত্রবীর্যের সময় থেকে পাণ্ডুর রাজত্ব পর্যন্ত এত বড় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ভীষ্ম এর আগে নেননি। মনে রাখা দরকার পাঞ্চালরা বহুকাল আগে কুরুবংশ থেকেই বেরিয়ে গিয়েছিল। কুরুদের সঙ্গে তাঁদের শত্রুতাও চলছে বহুদিন ধরে। কখনও সে শত্রুতা যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমেও প্রকট হয়েছে, কখনও বা তা স্তিমিত থেকেছে রাজনৈতিক মারপ্যাঁচের মাধ্যমে। মনে রাখতে হবে—কুলগুরু কৃপাচার্যকে মহারাজ শান্তনু পাঞ্চাল থেকেই তুলে এনে পালন করেছিলেন হস্তিনায়। কুরুবংশীয় সম্বরণের সঙ্গে পাঞ্চালদের বিরাট যুদ্ধ হয়েছিল আগে, আবার পাঞ্চাল সোমকের সঙ্গে কৌরবদের যুদ্ধও ভীষ্মের সময়ে পূর্বের ইতিহাস। কিন্তু যখন যাই হোক, কৌরবদের সঙ্গে পাঞ্চালদের রাজনৈতিক সম্বন্ধটা সব সময়ই শত্রুতার সূত্রে বাঁধা। কুরুদের ভারপ্রাপ্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই ইতিহাস যত কমই জানুন, কিন্তু পাঞ্চালদের কোনও শত্রুকে তাঁর রাজ্যে আশ্রয় দিলে কৌরব হিসেবে যে সাধারণ সুখ তিনি পাবেন—এটা ভীষ্মের জানা ছিল। কাজেই ভীষ্ম যে কাউকে জিজ্ঞাসা না করেই হস্তিনাপুরে পাঞ্চালদের এক বিরাট শত্রুকে রাজবাড়িতে আশ্রয় দিলেন, তার কারণ বংশ বংশ ধরে কৌরবদের পাঞ্চাল-বিরোধিতা এতটাই স্বতঃসিদ্ধ।

ব্যক্তিগতভাবে মহামতি ভীষ্মের পাঞ্চাল-বিরোধিতার আরও একটি প্রকট কারণ অবশ্যই সেই অম্বা। আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই যে, অম্বার মাতামহ ছিলেন সৃঞ্জয় হোত্রবাহন। তিনি পাঞ্চাল। হোত্রবাহন অত্যন্ত ব্যক্তভাবে ভীষ্মের বিরোধিতা করেছিলেন এবং পরশুরামকে দিয়ে ভীষ্মকে তিনি মার খাওয়ানোরও চেষ্টা করেছিলেন। হোত্রবাহনই ছিলেন অম্বার প্রথম এবং শেষ আশ্রয়দাতা। এরমধ্যে যত সময় গেছে ততদিনে অস্ত্রতপস্যা সেরে অম্বার পাঞ্চালে চলে আসবারই কথা এবং আগেই বলেছি, বিশ্বস্ত চরদের মুখে ভীষ্ম অম্বার সমস্ত খবরই রাখতেন। এক রমণী যিনি তাঁর মৃত্যুর জন্য তপস্যা করছেন, তাঁকে যদি পাঞ্চালরা আশ্রয় দিয়ে থাকে, তবে সত্যিই তো ভীষ্ম দ্রোণাচার্যকে এইরকমই আশ্বাস দেবেন যে—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কুরুরা সবাই আপনার পাশে আছে—সর্বে চ কুরব-স্তব।

ভীষ্ম অত্যন্ত সমাদর করে দ্রোণাচার্যের জন্য উত্তম বাসস্থান এবং উত্তম ভোজনের ব্যবস্থা করলেন। সবচেয়ে বড় কথা পাণ্ডব কৌরবদের অস্ত্রগুরু হিসেবে ভীষ্ম নিয়োগ করলেন দ্রোণাচার্যকে। অস্ত্রশিক্ষা চলাকালীন অবস্থাতেই পাণ্ডব কৌরবদের জ্ঞাতিবিরোধ রেখাটি ভীষ্মের কাছে বেশ প্রকট হয়ে উঠল। আধিরথি কর্ণ দুর্যোধনের সঙ্গে জোট বেঁধেছেন, তিনি অর্জুনের প্রতি আক্রোশে তাঁকে মারতে চান,— এসব কথা তাঁর কানে আসছিল বটে, তবে পাণ্ডব কৌরবদের এই জ্ঞাতিশত্রুতা খুব ভালভাবে প্রকট হয়ে উঠল গুরু দ্রোণের পরীক্ষাগ্রহণের সময়। উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চে কৌরব পাণ্ডবের যেমন কথা কাটাকাটি হয়েছিল, কর্ণ যেভাবে অর্জুনকে হেনস্থা করা সত্ত্বেও দুর্যোধনের কাছ থেকে অঙ্গ রাজ্যের পুরস্কার পেলেন—এসব ঘটনা মহামতি ভীষ্মকে শঙ্কিত করেছিল নিশ্চয়।

অস্ত্রপরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে দ্রোণাচার্য গুরুদক্ষিণা চাইলেন এবং অর্জুন তাঁর পূর্বপ্রতিজ্ঞা মতো দ্রুপদরাজাকে দ্রোণাচার্যের কাছে ধরে আনলেন জীবিত। এ ঘটনায় ভীষ্ম কতটা প্রীত হয়েছিলেন, সে খবর মহাভারতের কবি দেননি। কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টিতে বিচার করলে, বিশেষত কুরু পাঞ্চালদের পূর্বশত্রুতা এবং ভীষ্মের ব্যক্তিগত কারণের কথা বিচার করলে দ্রুপদের অপমানে ভীষ্মের প্রীত হবারই কথা। ব্যক্তিগতভাবে ভীষ্ম হয়তো তত দ্রুপদবিরোধী ছিলেন না। কিন্তু পাঞ্চালরা কখনও ভীষ্মের বন্ধুস্থানীয় হতে পারেন না, এ কথা মহাভারতের রাজনীতিতে স্বতঃসিদ্ধ।

যাই হোক, দ্রুপদের মতো মহাবীর পাণ্ডব অর্জুনের হাতে পর্যদস্ত হওয়ায় অপিচ পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের মহান গুণরাশি সমস্ত পৌর-জনপদের সম্মত হওয়ায় প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্র আপাতত যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করতে বাধ্য হলেন। এতাবৎ পর্যন্ত হস্তিনাপুরের রাজনীতি যেভাবে চলছিল, তাতে কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মের ভাবনালোকে তেমন কোনও আঘাত পড়েনি। মৃতপিতৃক পাণ্ডবদের প্রতি তাঁর স্নেহ করুণার অন্ত ছিল না। বিশেষত তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন যখন পাঞ্চাল দ্রুপদকে যুদ্ধে জিতে গুরুদক্ষিণা দিলেন, তখন ভীষ্মের গভীর অন্তরে যে এক ধরনের তৃপ্তিই হয়েছিল সে কথা অনুমান করা যায়। অন্যদিকে সদা বিনয়ী যুধিষ্ঠির যেভাবে সকলের সম্মত আচরণ করে রাজ্য চালাচ্ছিলেন, তাতেও ভীষ্মের সন্তুষ্টির কারণ ছিল। তাঁর সন্তুষ্টির আরও বড় কারণ হল—পাণ্ডু রাজা ছিলেন এবং তিনি স্বর্গস্থ হবার পর তাঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠির যুবরাজ পদে আসীন। কুরু বংশের উত্তরাধিকার ঠিক পথেই চলেছে।

কিন্তু এই স্থিতাবস্থা এবং শান্তি বেশি দিন চলেনি। যুধিষ্ঠিরের জনপ্রিয়তা এবং ভীমার্জুনের অস্ত্রশিক্ষার প্রতিপত্তি শীঘ্রই ধৃতরাষ্ট্রের মন দূষিত করে তুলল এবং তিনি তাঁর স্বার্থান্বেষী পুত্র দুর্যোধন, শ্যালক শকুনি এবং কর্ণের পরামর্শে পাঁচ ভাই পাণ্ডব এবং তাঁদের জননী কুন্তীকে বারণাবতের জতুগৃহে পুড়িয়ে মারার পরিকল্পনা করলেন। মহামতি ভীষ্মের

ব্যক্তিগত গুপ্তচরেরা বয়োবৃদ্ধ ভীষ্মের কাছে আর বেশি কাজ পেত না হয়তো, অথবা হস্তিনাপুরের রাজশাসনে অল্পবয়স্কদের গুরুত্ব বাড়তে থাকায় ভীষ্ম নিজেকে খানিকটা গুটিয়ে নিয়েছিলেন বলেই হয়তো ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর এই গোষ্ঠীর কুমন্ত্রণাগুলি তিনি কিছুই জানতে পারলেন না। এমনকী বারণাবতে রওনা হবার সময় যুধিষ্ঠির যে ভীষ্মের পা জড়িয়ে ধরে অনেক কাঁদলেন, তাতেও ভীষ্ম খুব ধারণা করতে পারলেন না যে, পাণ্ডবদের বারণাবতে যাওয়াটা নিজের ইচ্ছায় ঘটেনি। ঘটেছে ধৃতরাষ্ট্রের ইচ্ছায়।

বস্তুত, এইসব সময় আমরা ধর্মাত্মা বিদুরকে অনেক বেশি কৌশলী এবং কর্মতৎপর দেখতে পাই। পাণ্ডুর মৃত্যু এবং জননী সত্যবতীর বনগমনের পর থেকে ভীষ্মকে কুরুবাড়ির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারগুলিতে একেবারেই মাথা গলাতে দেখি না। সমস্ত ক্ষেত্রেই তিনি আছেন, অথচ খানিকটা নির্লিপ্ত, নির্বিকারও বটে। পাণ্ডবরা বারণাবতে যাবার সময় তাঁকে যেমন বিচলিত দেখছি না, তেমনই বারণাবত থেকে যখন পাণ্ডবদের পুড়ে মরার মিথ্যা খবর সত্যের আকারেই পৌঁছোল, তখন কুচক্রী ধৃতরাষ্ট্রকেও আমরা খানিকটা বিহ্বল দেখছি, কিন্তু ভীষ্মকে তত নয়। কিন্তু তাই বলে ভীষ্ম যে কুরুবাড়ির সমস্ত ঘটনায় তাঁর দায় এড়িয়ে যাচ্ছেন অথবা লোকে তাঁকে কোনও গণনার মধ্যেই আনছে না, এমনও কিন্তু মনে হচ্ছে না।

বস্তুত পাণ্ডুর মৃত্যুর পর থেকেই ধৃতরাষ্ট্র যেভাবে তাঁর নিজের স্বার্থ এবং পুত্রগোষ্ঠীর উচ্চাশায় আতপ্ত হয়ে উঠেছিলেন, যেভাবে তাঁর হুকুম জারি হচ্ছিল, তাতে ভীষ্মের মতো বিশাল রাজনীতিজ্ঞ মানুষ একটু নির্বিকার ভাব দেখিয়ে নিজেকে সামান্য গুটিয়ে রেখেছিলেন মাত্র। কুরুবাড়ির অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে তিনি আপাতত মত প্রকাশ না করলেও সমস্ত ব্যাপারে তাঁর কৌতূহল মোটেই চলে যায়নি। লক্ষ করে দেখবেন, বারণাবতে জতুগৃহের অন্যায় নির্মাণকর্ম টের পেয়ে যাবার পর ভীম যখন সেই জতুগৃহ ত্যাগ করে যাবার কথা বলছেন, তখন যুধিষ্ঠির ওই কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মের প্রতিক্রিয়ার কথাই একমাত্র ভাবছেন, অন্য কারও নয়। যুধিষ্ঠির বলছেন—আমাদের পালিয়ে যাওয়া চলবে না। এখানেই আমরা থাকব, তবে সতর্কভাবে থাকব। তারপর দেখো, আমাদের জন্য তৈরি করা বাড়ি যদি আমরাই পুড়িয়ে দিই, তবে ভীষ্ম তাতে আমাদের ওপর যেমন রাগ করবেন না, তেমনই দুর্যোধনের ওপর অন্যান্য কৌরববংশীয়দেরও তিনি সেভাবে রাগিয়ে তুলতে পারবেন না। কিন্তু আমাদের জন্য তৈরি বাড়ি যদি পুরোচন পুড়িয়ে দেয় তা হলে দুর্যোধন যেহেতু পুরোচনকে এই কাজে নিযুক্ত করেছে, তাই দুর্যোধনের ওপরেই পিতামহ ভীষ্ম এবং অন্যান্য কুরুবংশীয়রা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবেন।

বেশ বোঝা যায়, ভীষ্মের রাগের মূল্য এখনও কিছু কমেনি। ধৃতরাষ্ট্র নন, ভীষ্ম যাঁর ওপরে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবেন, তাঁর প্রতিপক্ষের রাজনৈতিক সুবিধা হবে, সেটাই বোঝা যাচ্ছে যুধিষ্ঠিরের ভাবনায়। আরও একটা কথাও লক্ষ করার মতো। পাণ্ডবরা বিদুরের বুদ্ধিতে জতুগৃহে আগুন লাগিয়ে বেরিয়ে যাবার পর বারণাবতের মানুষজন যখন পাঁচ-ছটি ভস্মীভূত মৃতদেহ দেখল, তখন তারা পাণ্ডবদের মৃত্যু হয়েছে বলেই মনে করল। দুষ্টবুদ্ধি পুরোচন যে দুর্যোধনের বুদ্ধিতেই পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মেরেছে এবং ধৃতরাষ্ট্র যে তাঁকে কিছুই বাধা দেননি —এই কথা বলে পৌর-জানপদেরা ধৃতরাষ্ট্রকে খুব গালাগালি দিতে লাগল। লক্ষণীয়, এই গালাগালির প্রকোপ থেকে পিতামহ ভীষ্মও বাদ গেলেন না। গেলেন না এই জন্য যে, ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধন যদি অন্যায় অধর্ম করেন, তবে সেটাও যেন সাধারণ মানুষেরা তবু মানতে পারে, কিন্তু এই অন্যায় অধর্ম ভীষ্ম কেন হতে দিলেন, কেন তিনি তাতে বাধা দিলেন না— এটা তারা কিছুতেই বুঝতে পারছে না। তারা বলেই ফেলল—আমাদের মহারাজ শান্তনুর ছেলে ভীষ্মই বা কেমন মানুষ! তাঁরও তো কোনও ন্যায়নীতি ধর্মবোধ আছে বলে মনে হচ্ছে না—নূনং শান্তনবো’পীহ ন ধর্মমনুবর্ততে।

প্রজাসাধারণের এই আপশোস হতাশা থেকে বোঝা যায় যে, ভীষ্মকে তারা ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের সাধারণ মানে বিচার করে না। ভীষ্মের জন্য তাদের মনে আলাদা একটা জায়গা আছে এবং সে জায়গাটা এমনই যেখান থেকে কোনও অন্যায় করা যায় না, বরং অন্যায়ের প্রতিরোধ ঘটে সেখান থেকে। কুরুবাড়ির সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ভীষ্ম এখন তেমন মাথা না ঘামালেও সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভীষ্মের ভূমিকাটা কী, সেটা এখনও সাধারণের কাছে যথেষ্ট বড় প্রশ্ন। শুধু তাই নয়, কুরুবাড়ির চূড়ান্ত রাজশক্তি যে ঘটনার জন্য দায়ী, সেখানে চূড়ান্ত মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে ভীষ্ম যে তাঁর দায় এড়াতে পারেন না—সেটা এই সাধারণ জনের আক্ষেপ থেকেই সবচেয়ে ভাল বোঝা যায়।

ভীষ্ম আর নিশ্চুপে বসে থাকেননি। জতুগৃহের আগুন থেকে বেঁচে যাবার পর দ্রৌপদীর বিবাহসূত্রে পাণ্ডবরা যখন পাঞ্চাল দ্রুপদকে শ্বশুর হিসেবে পেলেন, রাজনৈতিকভাবে সেদিন থেকেই কুরুরাজ্যের খানিকটা পশ্চাদ্‌গতি ঘটে গেল। পাঞ্চালদের পরম শত্রু দ্রোণাচার্যকে আশ্রয় দিয়ে ভীষ্ম যে পরিকল্পনাগুলি মনে মনে লালিত করছিলেন, তা অনেকটাই বিপর্যস্ত হয়ে গেল অর্জুনের মতো মহাবীর দ্রুপদের জামাই হয়ে যাওয়ায়। ভীষ্মকে এই বাস্তব পরিস্থিতি গলাধঃকরণ করতে হল পাণ্ডবদের কারণেই। পাণ্ডবরা দ্রুপদকে সহায় হিসেবে পাওয়ায় ধৃতরাষ্ট্র নিজে ভীষণভাবে চিন্তিত হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র তথা শকুনি কর্ণদের বাস্তববোধ কম ছিল বলেই এই সময়ে তাঁরা পাণ্ডবদের আক্রমণ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন ধৃতরাষ্ট্রকে। প্রস্তাবটা ধৃতরাষ্ট্রের পছন্দসই হওয়া সত্ত্বেও ভীষ্ম বিদুর ইত্যাদি পরিণত রাজনীতিজ্ঞদের সঙ্গে কথা না বলে তিনি এই আক্রমণের মধ্যে যেতে চাননি।

ধৃতরাষ্ট্র কথাটা পাড়তে গিয়েছিলেন কেবল। বহুকাল পরে ভীষ্ম পূর্বের মতো তাঁর মুখ খুললেন। এতদিনে দুর্যোধন-ধৃতরাষ্ট্রের জতুগৃহ নির্মাণের হেতু তাঁর হৃদয়ঙ্গম হয়েছে। তাঁর কানে পৌঁছে গেছে কৌরবদের পূর্বকৃত পরিকল্পনা। অন্যদিকে পাণ্ডব পাঞ্চালদের এক সূত্রে অবস্থিতি ভীষ্মকে ভয়ংকর অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছিল। এই অদ্ভুত রাজনৈতিক মেরুকরণ, যার মধ্যে বিশালবুদ্ধি কৃষ্ণের আনুগত্যে যাদবদেরও অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, এই মেরুকরণের গুরুত্ব আর কেউ তেমনভাবে না বুঝলেও ভীষ্ম বিদুর তা বুঝেছিলেন। এমনকী অনিচ্ছায় হলেও ধৃতরাষ্ট্রও তা পরে বুঝেছিলেন।

পাণ্ডবদের বেঁচে ফিরে আসা এবং পাঞ্চালদের সঙ্গে তাঁদের একত্রিত হওয়ার পর দুর্যোধন-কর্ণের মনে প্রতিহিংসার আগুন দেখতে পেলেন ধৃতরাষ্ট্র। কিন্তু সে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করাটা যে রাজনৈতিকভাবে ভীষণ ভুল হবে সেটা তিনি বুঝতে পারছিলেন এবং বুঝতে পারছিলেন বলেই ভীষ্ম বিদুর দ্রোণকে তিনি ডেকে আনলেন আলোচনাসভায়। ভীষ্ম এবার তাই অনেক দিন পরে মুখ খুললেন।

ভীষ্ম বললেন—পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ করাটা আমার মোটেই ভাল লাগছে না—ন রোচতে বিগ্রহো মে পাণ্ডুপুত্রৈঃ কথঞ্চন। আর আমার দিকে তাকিয়ে দেখলে—ধৃতরাষ্ট্র! তুমিও আমার কাছে যেমন, পাণ্ডুও তাই। গান্ধারীর ছেলেরাও আমার কাছে যেমন, কুন্তীর ছেলেরাও তাই—গান্ধার্য্যাশ্চ যথা পুত্রাস্তথা কুন্তীসুতা মম। আমি যা বুঝি, তাতে পাণ্ডুর ছেলেদের রক্ষা করার দায় আমার যতটুকু আছে, তোমারও ঠিক ততটুকুই। পৃথক দুটি ব্যক্তির বংশধর হলেও পাণ্ডব কৌরবদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা যেহেতু একইরকম, তাই পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধটা আমার কাছে মোটেই রুচিকর নয়।

পাণ্ডব কৌরবের এক পিতামহ হিসেবে ভীষ্ম নিজের নিরপেক্ষ ভাবটুকু প্রতিষ্ঠিত করেই তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত জানালেন দুর্যোধনকে। সে সিদ্ধান্ত তাঁর কাছে রুচিকর না হলেও তা ছিল

ভীষণ রকমের বাস্তববোধপ্রসূত এবং তর্কের দিক থেকে তা ছিল অমোঘ। ভীষ্ম বললেন—আমার ইচ্ছে, তুমি পাণ্ডবদের কাছে ডেকে নিয়ে এই কুরুরাজ্যের অর্ধেক শাসন তাদের হাতে তুলে দাও—সন্ধায় বীরৈর্দীয়তামর্ধভূমিঃ। এটা বোঝা দরকার যে, দুর্যোধন! তুমি যেমন এই রাজ্যকে তোমার পৈতৃক উত্তরাধিকার বলে ভাবছ, তেমনই পাণ্ডবরাও তো ভাবছে যে, এই রাজ্যে তাদেরও উত্তরাধিকার আছে, বিশেষত তাদের পিতা এই রাজ্যের রাজা ছিল—মম পৈতৃকমিত্যেবং তে'পি পশ্যন্তি পাণ্ডবাঃ। তাই বলছিলাম পাণ্ডবরা যদি কোনওভাবেই তাদের রাজ্যাংশ না পায়, তা হলে এ রাজ্যটা তোমাদেরই—এটা ভাবারও কোনও কারণ নেই।

ভীষ্ম এবার তাঁর সাংবিধানিক যুক্তিগুলি দিলেন। তৎকালীন দিনের উত্তরাধিকার আইন যা প্রচলিত ছিল, সেইদিকে দৃষ্টি রেখে ভীষ্ম বললেন— আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে বলব—এ রাজ্য তুমি আইন অনুসারে পাওনি—অধর্মেণ চ রাজ্যং ত্বং প্রাপ্তবান্ ভরতর্ষভ। অর্থাৎ ভীষ্ম বলতে চাইলেন—পাণ্ডু রাজ্য ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং তাঁর রাজ্যের কার্যনির্বাহী রাজা ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। তৎকালীন দিনের উত্তরাধিকারের নিয়ম ধরলে পাণ্ডুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর পুত্র যুধিষ্ঠির রাজ্য পেয়ে গেছেন, যদিও বাস্তবে তা হয়নি। যুধিষ্ঠির রাজ্যও পাননি, রাজ্যের ভাগও পাননি। এখন এই পরিস্থিতিতে, যখন ভাই ভাই বিবাদ ঘটছে, সেখানে নিছক ভাল মনেই পাণ্ডবদের প্রাপ্য রাজ্যাংশ তাদের দিয়ে দেওয়া উচিত—মধুরেণৈব রাজ্যস্য তেষামর্ধং প্রদীয়তাম্।

ভীষ্ম এবার কিছু জ্ঞানের কথা বলে উপদেশ দিলেন দুর্যোধনকে। ক্ষত্রিয়ের কীর্তি রক্ষা করা, ধর্ম তথা ন্যায় অনুসারে নিজের রাজনৈতিক স্থিতি নির্ধারিত করা এবং সর্বশেষে নিজের হিত ভাবনা করা—এগুলি তাঁর উপদেশ ছিল দুর্যোধনের প্রতি। অবশ্য এই শাশ্বত উপদেশের সঙ্গে সাবধানবাণীও উচ্চারিত হয়েছিল—আমার কথা যদি ঠিক ঠিক না শোন তা হলে মোটেই এই কুরুকুলের কারও ভাল হবে না—অতো'ন্যথা চেৎ ক্রিয়তে ন হিতং নো ভবিষ্যতি।

অনেকদিন পর ভীষ্ম আজকে রাজসভায় তাঁর মত প্রকাশের সুযোগ পেয়েছেন। ভীষ্মের সুদূরপ্রসারিত দৃষ্টির অন্তরালে যে অন্যায়গুলি ধৃতরাষ্ট্র করেছেন, তারজন্য ধৃতরাষ্ট্রের অনুশোচনা খুব বেশি ছিল না, দুর্যোধনের তো নয়ই। কিন্তু যে পাণ্ডব ভাইদের ধৃতরাষ্ট্র মৃত ভেবেছিলেন, তারা আজ যেন বেঁচে উঠে আরও শক্তিমান হয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দুর্যোধন কর্ণরা যতই তাঁদের আক্রমণ করতে বলুন, এক সর্বগ্রাসী ভয় এখন পীড়িত করছে ধৃতরাষ্ট্রকে। এই ভয় অবশ্য যতখানি ভয়, তার চেয়ে বেশি লজ্জা। ভীষ্ম পিতামহের মতো মহামান্য ব্যক্তিত্বের কাছে তাঁর অন্যায় পরিকল্পনা প্রকট হয়ে পড়েছে। ধৃতরাষ্ট্র যদি ভারপ্রাপ্ত রাজা না হয়ে যদি শুধু আত্ম সম্পর্কে ভীষ্মের ভ্রাতুষ্পুত্র মাত্র হতেন, তা হলে ভীষ্মের দুর্বাক্য হত অন্যরকম। কিন্তু হাজার হলেও ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর স্থলাভিষিক্ত কার্যনির্বাহী রাজা। অতএব রাজাকে তিরস্কার করার ভঙ্গিটিও ভীষ্ম রপ্ত করেছেন রাজোচিতভাবে। সবচেয়ে বড় কথা—ভীষ্ম তাঁর কোনও কথা ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন না—বলছেন দুর্যোধনকে। কারণ, তিনি জানেন যে, ধৃতরাষ্ট্রের ব্যক্তিত্ব দুর্যোধনের দ্বারাই পরিচালিত।

ভীষ্ম বললেন—ভাগ্যিস তাদের মায়ের সঙ্গে পাণ্ডবরা এখনও বেঁচে আছে, আর এও অনেক ভাগ্য যে পুরোচন মারা গেছে। নইলে যেদিন থেকে শুনেছি যে, পাণ্ডবরা জতুগৃহের আগুনে পুড়ে মারা গেছে, সেদিন থেকে আমি লজ্জায় কারও মুখের দিকে তাকাতে পারছি না—তদা প্রভৃতি গান্ধারে ন শক্লোম্যভিবীক্ষিতুম্। সবচেয়ে বড় কথা কী জান? জতুগৃহে আগুন লাগানোর জন্য পুরোচনকে কাজে লাগানো হয়েছিল, তাতে না হয় বোঝা গেল—

পুরোচন লোকটা খুব খারাপ। কিন্তু ওই পর্যন্তই, লোকে এরপরে আর পুরোচনকে দুষবে না। দুষবে তোমাকে, দুর্যোধন! কারণ তুমিই পুরোচনকে এই কাজে নিযুক্ত করেছ—যথা ত্বাং পুরুষব্যাঘ্র লোকো দোষেণ গচ্ছতি। তাই বলছিলাম—তোমার গায়ে যে কালি লেগেছে, তা থেকে মুক্ত হবার একটাই উপায়—পাণ্ডবদের সঙ্গে তোমার মুখোমুখি দেখা হোক।

ভীষ্ম এবার একটু সাবধানও করে দিতে চাইলেন দুর্যোধনকে। বললেন—ভালয় ভালয় যদি তাদের প্রাপ্য রাজ্য না দাও, দুর্যোধন! তা হলে জেনে রেখো, বেঁচে থাকতে পাণ্ডবদের প্রাপ্য পৈতৃক অংশ স্বর্গের ইন্দ্র এসেও ছিনিয়ে নিতে পারবেন না—পিত্র্যোং'শঃ শক্যমাদাতুমপি বজ্রভৃতা স্বয়ম্। সোজা কথা সোজা ভাষায় বলি—যদি নিয়মনীতি অনুসারে চলতে চাও, যদি আমার পছন্দের কাজটি করতে চাও এবং যদি সবারই ভাল চাও, তো পাণ্ডবদের অর্ধেক রাজ্য দিয়ে সব কিছু মিটিয়ে নাও—ক্ষেমঞ্চ যদি কর্তব্যং তেষামর্ধং প্রদীয়তাম্।

ভীষ্ম যখন বললেন—যদি আমার পছন্দের কাজটি করতে চাও—যদি কার্য্যং প্রিয়ঞ্চ মে—তখনই বুঝিয়ে দিলেন কৌরবদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এখনও তিনি সমস্ত আত্মবিশ্বাস নিয়েই ফিরে আসতে পারেন। অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য ভীষ্মের মত সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করলেন। বৈবাহিক সূত্রে পাঞ্চাল দ্রুপদকে সহায় হিসেবে লাভ করার ফলে পাণ্ডবদের রাজনৈতিক সুবিধে যে অনেক বেশি হবে, সেই ইঙ্গিত দিয়ে দ্রোণ জানালেন যে, ভীষ্মের মতই তাঁর মত—বৃত্তমৌপয়িকং মন্যে ভীষ্মেণ সহ ভারত।

দ্রোণাচার্যের কথার প্রবল প্রতিক্রিয়া জানালেন দুর্যোধনের বন্ধু কর্ণ। কিন্তু প্রতিক্রিয়া জানানোর সময় তিনি দ্রোণ এবং ভীষ্ম দু'জনকেই যে ভাষায় গালাগালি দিলেন, ভীষ্মের কাছে তা ছিল অকল্পনীয়। অনেক অপমানকর কথার মধ্যে কর্ণ একবার ধৃতরাষ্ট্রকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন—টাকাপয়সা খরচা করে, আর অনেক সম্মান দিয়ে যাঁদের আপনি ঘিরে রেখেছেন, যাঁরা সমস্ত কাজেই আপনার যথেষ্ট অন্তরঙ্গ ভাব দেখান, তাঁরা মোটেই আপনার মঙ্গলের কথা বলেন না। এঁদের বুকের ভিতর বিষ, এঁরা বাইরে আপনার মঙ্গলের কথা বলেন—ব্রুয়ান্নিঃশ্রেয়সং নাম প্রচ্ছন্নেনান্তরাত্মনা। কর্ণের এই কথার প্রতিবাদ করার কোনও প্রবৃত্তি ভীষ্মের ছিল না। দ্রোণাচার্য সঙ্গে সঙ্গে কর্ণকে যথেষ্ট তিরস্কার করলেন বটে, তিরস্কার করলেন বিদুরও, কিন্তু ভীষ্ম একটি কথাও বললেন না। তিনি দেখাতে চাইলেন যে, তাঁর মতো অসাধারণ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি এই ধরনের অভদ্র কথার উত্তর দেবারও প্রয়োজন বোধ করেন না। তিনি এইসব ব্যক্তিত্বকে অবহেলা করেন।

কর্ণ যতই দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষ হয়ে ভীষ্মের প্রতি অকথ্য শব্দ উচ্চারণ করুন, কিন্তু এই মুহূর্তে ধৃতরাষ্ট্রের সাধ্য ছিল না—ভীষ্মকে অতিক্রম করে, দ্রোণ বিদুরকে উড়িয়ে দিয়ে কর্ণ দুর্যোধনের মত মেনে নেওয়া। ভীষ্মের মর্যাদা এবং নীরব প্রতিপত্তি এতটাই যে, ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে পাঞ্চালদেশে পাঠাতে বাধ্য হলেন। শুধু তাই নয়, পাণ্ডবরা তাঁদের জননী কুন্তী এবং নববিবাহিতা দ্রৌপদীকে নিয়ে যখন হস্তিনায় ফিরে এলেন, তখন কিছুদিন যাবার পর ধৃতরাষ্ট্র একদিন তাঁদের ডেকে পাঠালেন। এই সাদর আহ্বানে দ্বিতীয় অংশীদার ছিলেন ভীষ্ম; কেননা প্রধানত তাঁরই আদেশ উপদেশ মান্য করে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের রাজ্য ভাগ করে দেবার জন্য ডেকে পাঠালেন—আহূতা ধৃতরাষ্ট্রেণ রাজ্ঞা শান্তনবেন চ।

পাণ্ডব কৌরবদের রাজ্য আলাদা হল। যুধিষ্ঠির রাজ্য পেলেন খাণ্ডবপ্রস্থে। দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্ররা হস্তিনাতেই থেকে গেলেন। ভীষ্ম নিজেই যদিও এই ভাগাভাগির প্রস্তাব করেছিলেন, তবু পিতৃ-পিতামহের বংশে এই বিভাজন তাঁকে পীড়িত করল। পাণ্ডবরা অবশ্য খাণ্ডবপ্রস্থে থাকা সত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্র এবং ভীষ্মের অনুজ্ঞা মেনে চলছিলেন—শাসনাদ্ ধৃতরাষ্ট্রস্য

রাজ্ঞঃ শান্তনবস্য চ। মহাভারতের কবি এই কথাটা হয়তো তত আক্ষরিক অর্থে বলেননি। কিন্তু এই কথা বলে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, অন্যত্র থাকলেও কুরুবৃদ্ধ পিতামহের ওপর পাণ্ডবদের পূর্বের শ্রদ্ধাই বর্তমান ছিল। এমনকী ধৃতরাষ্ট্রকেও তাঁরা অমান্য করতেন না। ধৃতরাষ্ট্র যতটুকু রাজ্য পাণ্ডবদের দিয়েছিলেন, জায়গা হিসেবে তা মোটেই ভাল ছিল না। অর্জুন খাণ্ডববন দহন করে রাজ্যটিকে প্রজাসাধারণের বাসযোগ্য করে তুললেন। অন্যদিকে ময় দানবের শিল্পনৈপুণ্যে খাণ্ডবপ্রস্থ একেবারে ইন্দ্রপ্রস্থ হয়ে উঠল।

যুধিষ্ঠিরের রাজ্য সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হবার পথ নিল রাজসূয় যজ্ঞের মাধ্যমে। এই যজ্ঞ একজন রাজাকে সম্রাটে পরিণত করে। নারদ এসে রাজসূয় যজ্ঞ করার বুদ্ধি দিলেন যুধিষ্ঠিরকে। কিন্তু তারপর এই বিশাল ক্ষত্রিয়োচিত যজ্ঞ সমাধা করার প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠলেন কৃষ্ণ। যজ্ঞের সূচনা হল তখনকার দিনের সম্রাট বলে কথিত মগধরাজ জরাসন্ধকে বধ করে এবং সেটা পুরোপুরি কৃষ্ণের বুদ্ধিতে। রাজসূয়ের অন্যান্য কল্পের মধ্যে পাণ্ডবদের দিগ্‌বিজয় পর্ব শেষ হলে বিজিত তথা সামন্ত রাজারা রাজকর এবং উপহার নিয়ে উপস্থিত হলেন ইন্দ্রপ্রস্থে।

যুধিষ্ঠির আগে থেকেই মাদ্রেয় নকুলকে পাঠিয়ে ভীষ্ম এবং অন্যান্য কুরুবংশীয়দের ইন্দ্রপ্রস্থে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সকলে সময়মতো উপস্থিতও হলেন। এখনকার দিনে হামেশাই লক্ষ করি—আমাদের পিতাঠাকুর বা ঠাকুরদাদারা যে পুত্র বা যে নাতির বাড়িতে থাকেন, সেখানে নিজেকে একটু গুটিয়েই রাখেন। পুত্র অথবা নাতির সামনে থাকে সমৃদ্ধতরা যৌবনবতী পৃথিবী। সেখানে পিতাঠাকুর অথবা ঠাকুরদাদাটি রুটিনমাফিক বাস করেন তাঁর গতযৌবনা পৃথিবীর 'নস্টালজিয়া' নিয়ে। তাঁর যে পুত্র বা নাতি দূরে থাকে—দূরে থাকে বলেই তাদের শ্রদ্ধাভক্তি অটুট থাকে পিতা বা ঠাকুরদাদার প্রতি। দৈবাৎ যদি কোনও দিন এই ধরনের পিতা পিতামহেরা দূরগত পুত্র বা নাতির বাড়ি যান, তবে সেখানে তাঁদের ইচ্ছা অনিচ্ছা বা আধিপত্যের ভাবটুকু কেমন করে যেন ফিরে আসে।

পিতামহ ভীষ্মেরও তাই হল। হস্তিনার সংসার এবং রাজনীতিতে তাঁকে তেমন কেউ পোঁছেই না। সেই তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে এসে এদিক ওদিক সামান্য ঘুরেফিরে সব কিছু বুঝে ফেললেন এবং ব্যস্তসমস্ত যুধিষ্ঠিরকে বললেন—বাছা যুধিষ্ঠির! দেশবিদেশ থেকে রাজারা সব এসে পড়েছেন। এঁদের মধ্যে যিনি যেমন সম্মান পাবার উপযুক্ত তাঁকে তেমন সম্মান দেখাও, বাছা। রাজারা ছাড়াও এই রাজসূয় যজ্ঞের জন্য এক বছর ধরে যেসব যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ বাস করছেন এখানে, তাঁদেরও তো সম্মানদক্ষিণা দিতে হবে। আর একজন শ্রেষ্ঠ মানুষকেও তো ঠিক করতে হবে যিনি তোমার শ্রেষ্ঠ উপহার এবং রাজসূয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য পাবার যোগ্য—অথ চৈষাং বরিষ্ঠায় সমর্থায়োপনীয়তাম্।

যে মর্যাদা এবং স্নেহ নিয়ে ভীষ্মপিতামহ তাঁর নাতির কাছে আপন ভাবনা ব্যক্ত করেছেন, ঠিক সেই মর্যাদাতেই যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে বললেন—আচ্ছা, বলুন তো পিতামহ! কী করা যায় এ বিষয়ে? রাজসূয় অনুষ্ঠানের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহারটি কোন যোগ্যতম পুরুষ লাভ করবেন, সে বিষয়ে আপনি কী মনে করেন—কস্মৈ ভবান্ মন্যতে'র্ঘ্যমেকস্মৈ কুরুনন্দন। উপনীয়মানং যুক্তঞ্চ তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ভীষ্মপিতামহের মনে আগে থেকেই সেই নামটি ছিল। শুধু যুধিষ্ঠির না বললে কথাটা তিনি আগ বাড়িয়ে বলতে পারছিলেন না। ভীষ্ম বললেন—শক্তিমত্তা এবং পরাক্রমের দিক দিয়ে দেখতে গেলে তেজোবলপরাক্রমৈঃ—আমি বৃষ্ণিবংশীয় কৃষ্ণ ছাড়া আর কোনও শ্রেষ্ঠতর পুরুষের নাম করতে পারছি না, যিনি তোমার রাজসূয় যজ্ঞের অর্ঘ্য পাবার যোগ্য। অসীম গ্রহতারকা নক্ষত্রলোকের মধ্যে সূর্য যেমন ভাস্বর, পৃথিবীর সমস্ত রাজমণ্ডলের মধ্যে কৃষ্ণও তেমনই সকলকে তাপিত করছেন—মধ্যে তপন্নিবাভাতি জ্যোতিষামিব ভাস্করঃ।

ভীষ্ম যা বলেছেন, তা যুধিষ্ঠিরের মনোমতো কথা। ভীষ্মের কথা ফুরোবার সঙ্গে সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে পাণ্ডবকনিষ্ঠ সহদেব কৃষ্ণকে রাজসূয়ের অর্ঘ্য দান করলেন, কৃষ্ণ তা গ্রহণ করলেন শাস্ত্রের বিধিনিয়ম মেনেই। এই অর্ঘ্যদানের সঙ্গে সঙ্গেই বিতর্ক বিতণ্ডা শুরু হল। কেন অন্যান্য বিখ্যাত ক্ষত্রিয়বীর অথবা গুণবৃদ্ধ ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে কৃষ্ণকেই এই অর্ঘ্যোপহারের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করা হল—এই কূট প্রশ্ন উঠল পাণ্ডববিরোধী শিবির থেকে। জরাসন্ধ মারা যাবার ফলে তাঁর পক্ষের রাজারা যথেষ্টই ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং ক্ষুব্ধ রাজাদের মুখপাত্র ছিলেন শিশুপাল। তিনি বললেন—পাণ্ডবদের তেমন দোষ নেই এখানে, কারণ তারা একেবারেই ছেলেমানুষ। কিন্তু এই বুড়ো ভাম ভীষ্মটার কী হল? ওর তো খেয়াল বুদ্ধি কিছুই নেই, দূরের জিনিস ভাল করে বুঝতেও পারে না—অয়ঞ্চ স্মৃত্যতিক্রান্তো হ্যাপগেয়ো'ল্পদর্শনঃ।

যতখানি রূঢ় ভাষায় তিরস্কার করা যেতে পারে, সেই ভাষাতেই সকলের সামনে ভীষ্মকে তিরস্কার করলেন শিশুপাল। ভীষ্ম শুনলেন, সবই শুনলেন ধৈর্য ধরে। যুধিষ্ঠির খানিকটা বোঝানোর চেষ্টা করলেন শিশুপালকে। কিন্তু এই বোঝানোয় কোনও ফল হল না।

ভীষ্ম সেদিন অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় বসেছিলেন। একবার তিনি বললেন বটে যে, শিশুপালকে অনুনয়বিনয় করে বুঝিয়ে বলে কোনও লাভ নেই—নাস্মৈ দেয়ো হ্যনুনয়ো নায়মর্হতি সান্ত্বনম্—কিন্তু পরক্ষণেই এটাও তিনি বুঝলেন যে, কৃষ্ণকে রাজসূয়ের অর্ঘ্যদানের কারণটাও সর্বসমক্ষে বুঝিয়ে বলার দায় আছে তাঁর। কেননা, যুধিষ্ঠির তাঁরই প্রস্তাবমতো আজ্ঞা পালন করেছেন। কৃষ্ণের গুণাধিক্য বলবার সময় ভীষ্ম প্রধানত তাঁর বল-বিক্রমের ক্ষমতাটাই বেশি করে বললেন। এ কথাও বললেন যে, ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধগুলির একটিতেও কৃষ্ণ হারেননি। খুব সংক্ষেপে বলবার সময় ভীষ্ম বলেছিলেন—শুধু কৃষ্ণকেই বড় বলে মানবার দু'টিমাত্র কারণ আছে। এক হল—বেদ বেদাঙ্গ ইত্যাদি শাস্ত্রে কৃষ্ণের অধিকার এবং শাস্ত্রজ্ঞতা সবচেয়ে বেশি। দ্বিতীয় কারণ হল—শক্তিতে তাঁর চেয়ে বড় কেউ নেই—বেদবেদাঙ্গবিজ্ঞানং বলঞ্চাপ্যধিকং তথা।

আরও অনেক কথা বলেছিলেন ভীষ্ম। কিন্তু তারমধ্যেও ওই দুটি কথাই কিন্তু সবচেয়ে বড় যুক্তি—শাস্ত্রজ্ঞতা এবং শক্তিমত্তা। বস্তুত এই দুটিমাত্র শব্দ খুব স্থূলভাবে উচ্চারিত হলেও ওই দুটি কারণের মধ্যেই সমস্ত রাজনীতিশাস্ত্রের সারাংশ লুকিয়ে আছে। বেদ বেদাঙ্গের জ্ঞানটা খুব আক্ষরিকভাবে এখানে নেওয়া উচিত নয়। পরবর্তিকালের রাজনীতিশাস্ত্র ঘাঁটলে দেখা যাবে—আন্বীক্ষিকী বা তর্কযুক্তি বলে একটা কথা আছে। এই আন্বীক্ষিকীর মধ্যে বেদ বেদাঙ্গ ইত্যাদি সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞানের অন্তর্ভাব ঘটেছে। কেউ কেউ এমনও মনে করেন যে, বেদ বেদাঙ্গ জানলে বহু শাস্ত্রজ্ঞতার ফলে আপনিই তর্কযুক্তি এবং দার্শনিক বোধ তৈরি হয়—এয়ীবিশেষো হ্যান্বীক্ষিকীতি। কাজেই কৃষ্ণের বেদ বেদাঙ্গের জ্ঞান আছে—এ কথার মানে হল তর্কযুক্তি এবং দার্শনিক বোধের চরম পর্যায়ে পৌঁছেছেন কৃষ্ণ।

বস্তুত, ভীষ্ম যখন কৃষ্ণকে সবচেয়ে সম্মানের আসনটি দিয়েছেন, তখনই তাঁর বোধ হয়ে গেছে যে, বৃদ্ধ স্থবির নন, জ্ঞানবৃদ্ধ নন, তাঁর সময়ে যে ধরনের রাজনীতিজ্ঞ মানুষের প্রয়োজন, সেই মানুষটি এসে গেছেন। রাজনীতিতে যে কূটনীতির প্রয়োগ ঘটে, শুধুমাত্র সেই কূটনীতির প্রয়োগ ঘটিয়ে কৃষ্ণ তাঁর সমস্ত শত্রুকে বিনাশ করেছেন। ভীষ্মের কথামতো—একটি যুদ্ধেও যে কৃষ্ণ হারেননি, তার পিছনে তাঁর দৈহিক এবং সৈন্যশক্তির কারণ যত বেশি তার চেয়ে অনেক বেশি তাঁর বুদ্ধিমত্তা এবং চাতুর্য। শুধুমাত্র কূটনৈতিক চাতুর্যের জোরেই যে একটি মানুষ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতে পারেন, সেই বোধটুকু অন্যের না থাকলেও ভীষ্মের ছিল বলেই তিনি কৃষ্ণকে রাজসূয়ের শ্রেষ্ঠ উপহারটি দান করার প্রস্তাব

করেছিলেন। তিনি বুঝে গিয়েছিলেন যে, তাঁর যুগে ক্ষত্রিয়ের শক্তি যেভাবে এবং যে কারণে ব্যবহৃত হত, তা অত্যন্ত সরল এবং সাদাসিধে। কিন্তু তাঁর বৃদ্ধকালে রাজনৈতিক জটিলতা যখন তুঙ্গে উঠেছে, তখনও সেই পুরনো ধ্যানধারণা আঁকড়ে থেকে লাভ নেই কোনও। সমস্ত জীবন জুড়ে কৃষ্ণ তাঁর চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী রাজার প্রতিপক্ষতা করে জয়লাভ করেছেন এবং তা করেছেন রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার জোরেই। ভীষ্ম কৃষ্ণের এই সূক্ষ্ম বুদ্ধি অতিমাত্রায় লক্ষ করেছেন বলেই আগামী দিনের নায়ক হিসেবে একটি অল্পবয়স্ক যুবককে তাঁর মেনে নিতে বাধেনি এবং এইখানেই এটা ভীষ্মেরও বুদ্ধিমত্তা।

ভবিষ্যতে ভীষ্ম যখন শরশয্যায় শুয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করবেন, তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর কাছে আসবেন রাজনীতির উপদেশ শুনতে। সেখানে যে উপদেশ ভীষ্ম দেবেন, তার মূল কথা হল কোনও রাজার রাজনৈতিক সমৃদ্ধি, যাকে পারিভাষিক ভাষায় বলে 'অর্থ'। ধর্ম অর্থ ইত্যাদি পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের দ্বিতীয় বর্গ হল অর্থ। এই সমৃদ্ধির জন্য যে কোনও রাজাকে ন্যায় অন্যায়ের ঊর্ধ্বে উঠে আপন প্রজ্ঞার দ্বারা কালোচিত ন্যায় অন্যায়ের আশ্রয় নিতে হয়। স্বয়ং যুধিষ্ঠির তাঁর কথা শুনে চমকে উঠেছিলেন এবং বলেছিলেন—এতে তো নীতিধর্মের কোনও বালাই-ই রইল না—ধর্মবাদাঃ ক্ষয়ং গতাঃ—এমন রাজ্য আমি চাই না, পিতামহ! কিন্তু রাজনীতির অগাধ জ্ঞান নিজের মধ্যে যিনি ধারণ করেছিলেন, সেই পিতামহ কিন্তু বহু আগে থেকেই জানতেন যে বুদ্ধিবলের আধিক্যই একজনকে সর্বোত্তম রাজনীতিজ্ঞে পরিণত করে। ঠিক সেইজন্যই অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক এক যুবককে তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে চরম সম্মান দিতে তাঁর বাধেনি।

যাই হোক, ভীষ্মের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় চরম গণ্ডগোল শুরু হল। শিশুপালের অকথ্য গালমন্দ শুনে মধ্যম পাণ্ডব ভীম তাঁর দিকে তেড়ে গেলেন প্রায়। নিজেরাই রাজাদের নিমন্ত্রণ করে এনে নিজেরাই তাঁদের অপমান করাটা একেবারেই রুচিসম্মত নয় বুঝে যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকেই অনুরোধ করলেন কিছু একটা করতে—অত্র যৎ প্রতিপত্তব্যং তন্মে ব্রুহি পিতামহ। ভীষ্ম কোনওরকমে ভীমকে আটকালেন এবং যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—সিংহ যতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে কুকুর-বেড়ালরা ততক্ষণই সিংহের কাছাকাছি এসে ঘেউ ঘেউ করে। ঠিক যেমন এই শিশুপাল এবং তাঁর পক্ষের রাজারা করছেন—ভসন্তে তাত সংক্রুদ্ধাঃ শ্বানঃ সিংহস্য সন্নিধৌ। কিন্তু কৃষ্ণ যখন জেগে উঠবেন তখন এরা সব যমেরবাড়ি যাবে। আমি বাপু ভাল পথ নিয়েছি। যজ্ঞ বলে কথা, আমি আগে থেকেই ঠিক করে নিয়েছি কোনওরকম গণ্ডগোলের মধ্যে যাব না—শিবঃ পন্থাঃ সুনীতো'ত্র ময়া পূর্বতরং বৃতঃ।

ভীষ্মের মুখে কৃষ্ণের প্রশংসা শুনে শিশুপালের আর মুখের কোনও আগল থাকল না। তিনি তাঁকে কৃষ্ণের স্তুতিগায়ক বলেই থামলেন না। ভীষ্মের জন্যই যে পাণ্ডব কৌরবদের অবস্থাটা একেবারে বদ্ধকূপে পরিণত হয়েছে, এই নিন্দা করে শিশুপাল বললেন—যেমন একটা নৌকো যদি আর একটা নৌকোর সঙ্গে বাঁধা থাকে, একজন অন্ধ যদি পথ দেখার ভরসায় আর একটি অন্ধকে আশ্রয় করে, তা হলে যেমন অনর্থ ঘটে, ভীষ্মকে আশ্রয় করে সমগ্র কুরুকুলেরও সেইরকম অনর্থ ঘটেছে—তথাভূতা হি কৌরব্যা যেষাং ভীষ্ম ত্বমগ্রণীঃ। কৃষ্ণের প্রশংসা করার সময় কেন ভীষ্মের জিভ খসে পড়ল না এবং এই প্রশংসা করে ভীষ্ম যে কত বড় মূর্খতার কাজ করেছেন—এসব নিন্দাবাদ তো কিছুই বাদ গেল না এমনকী কৃষ্ণের নিন্দা ছেড়ে শিশুপাল একসময় ভীষ্মেরই মৌখিক শ্রাদ্ধ করে ছাড়লেন। এই প্রসঙ্গে কাশীরাজসুতা অম্বার কথাও এল। অম্বাকে হরণ এবং পরে প্রত্যাখ্যান করার মতো অন্যায় যে করে, সে যে কত বড় অধার্মিক মানুষ তা শিশুপাল খুব ভাল করে প্রমাণ করে ছাড়লেন।

অনবরত কটুভাষণ করেও ভীষ্মের ওপর শিশুপালের ক্রোধশান্তি হল না। তাঁর নিন্দাবাদের কথা শুনে তাঁর স্বপক্ষীয় রাজারা যেমন খুশি হলেন তেমনই তাঁরাও ভীষ্মকে গালি দেবার সুযোগ পেলেন। কেউ কেউ এমনও বললেন যে, বুড়োটাকে মেরে ফেলাই ভাল ছিল, ছাগল ভেড়ার মতো গলা কেটে ফেলা উচিত এই বুড়োটার—হন্যতাং দুর্মতির্ভীষ্ম পশুবৎ সাধ্বয়ং নৃপাঃ। শিশুপাল এবং তাঁর অনুগামী রাজাদের কথা শুনে ভীষ্ম অবশ্য যুদ্ধে উত্তেজিত হলেন না। তবে এতকাল ধরে এক মহান অস্ত্রবীরের যে মর্যাদায় তিনি পৌঁছেছেন, সেখানে দাঁড়িয়ে সামান্য একটু হুংকার না ছেড়েও তিনি পারলেন না। সমবেত শিশুপালপক্ষীয় রাজা এবং স্বয়ং শিশুপালকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন—দেখো বাপু! কথার পর কথা, তারপরে কথা। কথার কোনও শেষ নেই। তোমরা আমাকে পশুর মতোই গলা কাটো, আর আগুনেই না হয় পুড়িয়ে দাও, অত সহজ হবে না ব্যাপারটা। এই আমি তোমাদের মাথার ওপর আমার এই দুই পা রেখে দাঁড়ালাম, দেখি কার কত শক্তি—ক্রিয়তাং মূর্ধ্নি বো ন্যস্তং ময়েদং সকলং পদম্।

ভীষ্ম মাটিতে পা ঠুকলেন সাবজ্ঞায়। আসলে ভীষ্ম নিজে কোনও যুদ্ধ করতে চাইছিলেন না। যে কৃষ্ণের বুদ্ধিবলের এত প্রশংসা করেছেন তিনি, সেই কৃষ্ণই শিশুপালকে একটু শিক্ষা দিন সবার সামনে, এটাই তিনি চাইছিলেন। নিজের দিক থেকে দৃষ্টি সরানোর জন্য শিশুপালকে উদ্দেশ করে তিনি এও বললেন—কারও যদি মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করার ইচ্ছে হয়, সে ওই কৃষ্ণের সঙ্গে খানিকক্ষণ যুদ্ধ করুক না—যস্য বা ত্বরতে বুদ্ধির্মরণায় স মাধবম্। ভীষ্ম জানতেন যে, হঠকারী মানুষ এইটুকু প্ররোচনাতেই নিজের সর্বনাশ ঘটাবে। শিশুপাল কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন এবং কৃষ্ণের হাতে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে মগধরাজ জরাসন্ধের যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার শেষটুকুও উচ্ছিন্ন হয়ে গেল। উত্থান ঘটল নূতন রাজশক্তির, যেখানে প্রাধান্য লাভ করল উত্তর ভারতীয় মিত্রশক্তি, যার মধ্যে কৌরব পাণ্ডবরা আছেন, পাঞ্চাল দ্রুপদ আছেন, আর আছেন পশ্চিমভারতের প্রবাদপুরুষ কৃষ্ণ। যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় পাণ্ডবসহায় কৃষ্ণকে সর্বোচ্চ সম্মান দেবার প্রস্তাব করে ভীষ্ম যে পরোক্ষভাবে হস্তিনাপুরের আর এক হঠকারী রাজা দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকেও খানিকটা চাপের মধ্যে রাখলেন, সে কথা দুর্যোধন তেমন করে বুঝলেন না। কিন্তু কুরুসভায় বহিরাগত কর্ণ দুর্যোধনের বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে যেভাবে তাঁকে অপমান করেছিলেন, যুধিষ্ঠিরের সভায় ভীষ্ম তার শোধ তুললেন রাজনৈতিকভাবে। রাজনীতির ক্ষেত্রে আপন গৃহে হাত গুটিয়ে বসে থাকা বুড়ো ঠাকুরদাদার চালটা যে কতখানি, দুর্যোধন তা একটুও বুঝলেন না।

পাণ্ডবদের একখানি অনুর্বর খণ্ডরাজ্য দেওয়া সত্ত্বেও তাঁদের প্রবল উত্থান যখন রাজনৈতিকভাবে ঠেকানো গেল না, তখন দুর্যোধন ছলে-কৌশলে তাঁদের রাজ্য অধিকার করার পরিকল্পনা করলেন। ধৃতরাষ্ট্রকে রাজি করিয়ে পাণ্ডবদের পাশাখেলার জন্য ডেকে পাঠানো হল। দ্যূতসভার প্রস্তুতিপর্বে পিতামহ ভীষ্মের মুখে আমরা একটা কথাও শুনতে পাই না। অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—কেন তাঁর মৌনতা? তিনি তো স্বমত প্রকট করে একটা বাধা সৃষ্টি করতে পারতেন। হয়তো তাতে এই চক্রান্ত বন্ধ হত। এখানে আমাদের ধারণাটা বলি। লক্ষ করে দেখবেন, যখনই হস্তিনার সিংহাসনে রাজপ্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হয়েছে, তখনই ভীষ্ম সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। সত্যবতীর প্রথম পুত্র যখন সিংহাসনে বসেছিলেন এবং স্বেচ্ছাতন্ত্রে রাজত্ব চালাচ্ছিলেন ভীষ্ম তখন একটি কথাও বলেননি। অন্যদিকে কুমার বিচিত্রবীর্য রাজা হয়ে সমস্ত বিষয়ে ভীষ্মের পরামর্শ নিয়েছেন, ভীষ্মও তখন পরামর্শ দিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা, সেটা ছিল তাঁরই 'জেনারেশন'। নিজের বয়স যতই বেশি হোক তিনি সম্পর্কে বিচিত্রবীর্যের বড় ভাই। কিন্তু হস্তিনায় যখন নতুন 'জেনারেশনে'র রাজত্ব শুরু হয়েছে, সেখানে শুধু পুত্রকল্প ভ্রাতুষ্পুত্রদের বিয়ে দেওয়া ছাড়া তিনি আর কিছুর মধ্যেই যাননি। এখানে আরও একটা কথা হল—বিদুরের উপস্থিতি। বিদুর

অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি। রাজনৈতিক এবং পারিবারিক সমস্ত ব্যাপারে বিদুর যা ভাবেন, যা বলেন, তার সঙ্গে ভীষ্মের মতান্তর হয় না। ধৃতরাষ্ট্রকে সৎ পরামর্শ দেবার ব্যাপারে বিদুর যেখানে তাঁর মতই ব্যক্ত করছেন, সেখানে তিনি অনর্থক নাক গলিয়ে নিজের মর্যাদা নষ্ট করেন না। এখানে শেষ কথাটা হল—দুর্যোধন। হস্তিনাপুরের রাজনীতি এখন তাঁর পরের 'জেনারেশন' ছেড়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছে। বিশেষত দুর্যোধন আত্মাভিমানী। নিজের বন্ধুবান্ধব এবং কুচক্রী মামা ছাড়া আর কারও কথা তিনি শোনেন না। এইরকম একটা অস্থিরতার মধ্যে ভীষ্মের মতো মর্যাদাসম্পন্ন মানুষের যে কথা বলা চলে না, এটা যে কোনও অভিজ্ঞ বৃদ্ধই বুঝবেন।

কিন্তু সব ব্যাপারে কথা না বললেও কিছু কিছু ঘটনা ঘটে যায়, যেখানে কুলবৃদ্ধ ব্যক্তির চুপ করে থাকা চলে না। চুপ করে থাকলে সমাজ তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে। ঠিক সেই রকমই একটা জায়গা এল যখন পাণ্ডবরা শকুনির পাশার চালে সবই হারিয়ে বসলেন। এমনকী নিজের স্ত্রী দ্রৌপদীকে পর্যন্ত। দ্রৌপদীকে যখন উন্মুক্ত রাজসভার মধ্যে ধরে আনার আদেশ দিলেন দুর্যোধন, তখন কুলজ্যেষ্ঠ ভীষ্মও রাজসভায় বসে আছেন। দ্যূতক্রীড়ার যা ফল হল, তা তাঁর কাছে অত্যন্ত অরুচিকর হলেও তিনি নির্বিকারভাবে তা সয়ে যাচ্ছিলেন। সভায় আসবার আগে দ্রৌপদী অন্দরমহল থেকেই প্রশ্ন করে পাঠিয়েছিলেন যে, যুধিষ্ঠির আগে নিজেকে বাজিতে হেরে পরে দ্রৌপদীকে বাজি রেখেছিলেন, নাকি আগে দ্রৌপদীর বাজি হেরে পরে নিজেকে হেরেছেন।

এসব প্রশ্নের জবাব দেবার কোনও উপায় হয়নি। তার আগেই দুঃশাসন দ্রৌপদীকে সভায় টেনে এনেছেন এবং দুর্যোধন কর্ণ শকুনির উৎসাহে দুঃশাসনের চরম অসভ্যতা শুরু হয়। দ্রৌপদীর অসহায় অবস্থা দেখে এঁরা যতই আনন্দ পান, কুরুসভায় উপস্থিত বৃদ্ধ সজ্জনেরা যে লজ্জায় মরমে মরে যাচ্ছিলেন, সে মন্তব্য করতে ভোলেননি মহাভারতের কবি—তেষামভূদ্ দুঃখমতীব কৃষ্ণাং দৃষ্ট্বা সভায়াং পরিকৃষ্যমানাম্। অবশেষে কুলবৃদ্ধ পিতামহ আর সইতে পারলেন না। দ্রৌপদীর পূর্বপ্রশ্নের সূত্র ধরে তিনি খানিকটা পরিস্থিতি সামাল দিতে চাইলেন। ভীষ্ম বললেন—এখানে আইনের প্রশ্নটা এতখানিই জটিল যে, ভাল করে তার জবাবই দেওয়া যায় না—ন ধর্মসৌক্ষ্ম্যাৎ সুভগে বিবেক্তুং শক্লোমি তে প্রশ্নমিমং যথাবৎ। দেখো, শকুনি যুধিষ্ঠিরকে পণে জিতেছে বলেই যে তোমাকেও জিতেছে, তা কিন্তু ঠিক নয়। আবার তোমাকে জেতার পর যুধিষ্ঠির যে স্বীকার করেছেন—হ্যাঁ, আমি হেরেছি, সেখানেও তোমার বিপদ রয়ে গেছে। আবার দেখো, যুধিষ্ঠির নিজের ইচ্ছাতে তোমাকে পণ রাখেননি, শকুনি তোমাকে পণ রাখতে বলায় যুধিষ্ঠির পণ রেখেছেন। অন্যদিকে শকুনি যেমন পাশা খেলতে পারেন, যুধিষ্ঠির তেমন পারেন না, যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে শকুনি অন্যায়টি করিয়ে নিয়েছেন—কাজেই তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব মুশকিল—তস্মান্ন তে প্রশ্নমিমং ব্রবীমি।

ভীষ্মের মীমাংসা শুনে দ্রৌপদীর কোনও লাভ হল না। তিনি একটু রেগেও গেলেন। ভীষ্মের কথার খানিকটা প্রতিবাদও করলেন। কিন্তু ভীষ্ম যে কেন তেমন জোর দিয়ে তাঁর প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারলেন না, সেটা যেমন দ্রৌপদী বুঝতে পারলেন না, তেমনই দ্রৌপদীও যে ভীষ্মের অবস্থাটা কেন বুঝতে পারলেন না—এই দুটি না বোঝার পিছনেই কারণ ছিল সেই সময়ের কৌরবসভার অবস্থাটা। কৌরবরা যুধিষ্ঠিরের মতো অনভিজ্ঞ পাশাড়ুকে অন্যায়ভাবে হারালেও যুধিষ্ঠির সে হার স্বীকার করে নিয়েছেন। এই অবস্থায় তাঁদের জয়োন্মাদনা এমন তুঙ্গ অবস্থায় ছিল, যেখানে শকুনি দুর্যোধনদের অন্যায় কৌশলের কথা বেশি করে বললে ভীষ্মেরই অপমান চূড়ান্ত হত। একটু আগেই ভীষ্ম দেখেছেন বিদুরের চরম অপমান। যুধিষ্ঠিরের বোকামিতেই এই সুযোগ পেয়েছেন কৌরবরা। দ্রৌপদীকে পণে জিতে তাঁরা অতিমান্য কাকা বিদুরকেই পাঠাচ্ছিলেন দ্রৌপদীকে রাজসভায় ধরে নিয়ে আসার

জন্য। কাজেই ভীষ্ম বিদুরের মতো নিরঙ্কুশ প্রতিবাদের মধ্যে গেলেন না। তিনি দ্রৌপদীর আইনের প্রশ্নটি সবার সামনে রেখে—যুধিষ্ঠিরও ঠিক করেননি, শকুনিও ঠিক করেননি—এমনিধারা কথা বলে একটা সমঝোতায় আসতে চেয়েছিলেন।

ভীষ্ম দেখলেন—কিছুই হল না। দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র-আকর্ষণ-অসভ্যতার শেষ বিন্দুতে পৌছোলেন। যুধিষ্ঠিরের সত্যের বাঁধনে বাঁধা ভীম কিছুই করতে না পেরে দুঃশাসন দুর্যোধনকে বধ করার প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করলেন বার বার। দুঃশাসন তাতেও থামলেন না। দ্রৌপদী বুঝলেন তাঁর স্বামীরা নিরুপায়। দ্রৌপদী আবারও সেই আইনের প্রশ্ন তুলে ভীষ্মের মুখের দিকেই তাকালেন। দ্রৌপদী বললেন—আপনারা শুধু বলুন এরা আমাকে জয় করেছে, কি না। আমাকে এরা দাসী দাসী বলে ডাকছে, আপনারা শুধু বলুন—মহারাজ পাণ্ডুর কুলবধূ কখনও দাসী হতে পারে কি না। পিতামহ ভীষ্ম ভীষণ বিব্রত বোধ করলেন। আবারও বললেন—এ প্রশ্নের মীমাংসা করার সাধ্য আমাদের নেই, কল্যাণী! তবে হ্যাঁ, এটুকু বলতে পারি যে, এখানে যে ঘটনা ঘটল, তাতে এ বংশের সর্বনাশ কেউ রোধ করতে পারবে না—নূনমন্তঃ কুলস্যাস্য ভবিতা ন চিরাদিব।

আপন বংশের এক কুলবধূকে সেই বংশেরই অন্যতর পুরুষেরা রাজসভায় নিয়ে এসে কাপড় ধরে টানছে—এই অসম্ভব দৃশ্য পিতামহ ভীষ্মকে দেখতে হল। পাশাখেলার আইনে পাণ্ডবরা এবং তাঁদের প্রিয়তমা পত্নীটি যতই প্যাঁচে পড়ুন, কিন্তু যে-কোনও অবস্থাতেই কুলবধূর এই অপমান যে ভয়ংকর পরিণতি ডেকে আনবে—ভীষ্ম সে কথা বলতে দ্বিধা করলেন না। তিনি বললেন—'লোভ আর মোহ কুরুকুমারদের সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে—তথাহি কুরবঃ সর্বে লোভমোহপরায়ণাঃ—যার জন্য ভদ্রঘরে জন্মেও তোমার এই বিপদ উপস্থিত হয়েছে। তবে তুমি যেভাবে এ বিপদ সইছ এবং এখনও যে তুমি ধর্মের অনুশাসনেই চলতে চাইছ, এ শুধু তোমার পক্ষেই সম্ভব—যৎ কৃচ্ছ্রমপি সম্প্রাপ্তা ধর্মমেবান্ববেক্ষসে। তোমার অবস্থা দেখে আমাদের কোনও স্বস্তি নেই জেনো। এই যে দ্রোণ বসে আছেন, কৃপ বসে আছেন; এঁরা কি কেউ ধর্ম কম বোঝেন? কিন্তু এঁরা সবাই তোমার অবস্থা দেখে প্রাণহীন মানুষের মতো শূন্য শরীরে বসে আছেন—শূন্যৈঃ শরীরৈস্তিষ্ঠন্তি গতাসব ইবানতাঃ।

বস্তুত ভীষ্ম নিজেও দ্রৌপদীর এই অবস্থা দেখে প্রাণহীন শুষ্ক শরীরে বসে ছিলেন যেন। পিতামহ হিসেবে আজ যদি তিনি স্বমত প্রকট করে দ্রৌপদীকে বিপন্মুক্ত করার চেষ্টা করতেন, তা হলে সেই দিনই অন্য এক যুদ্ধ বেধে যেত। ভীষ্ম তাই সেদিকে যাননি। কৌরবকুমারেরা যা করেছেন, তা যে নিতান্ত অসভ্যতা, সেটা তিনি বলতে ছাড়েননি; কিন্তু অন্যদিকে দ্রৌপদী যে আইনের প্রশ্ন করেছেন, সেখানে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যেহেতু নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে গেছেন, তাই দ্রৌপদীর কথার সঠিক উত্তর দিলে যুধিষ্ঠির খুব সুখে থাকতেন না এবং তাতে কৌরবকুমারদের অসভ্যতা আরও বাড়ত। ভীষ্ম তাই প্রশ্নের মীমাংসায় না গিয়ে আইনের প্রশ্নটি যুধিষ্ঠিরের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ, নিজের যতই বিপদ হোক, যুধিষ্ঠির সত্য থেকে বিচ্যুত হবেন না—যুধিষ্ঠিরস্তু প্রশ্নে'স্মিন্ প্রমাণমিতি মে মতিঃ।

সেকালের দিনে পাশাখেলার কিছু নিয়মকানুন ছিল। রাজা বা রাজপুত্রেরা যখন বাজি রেখে পাশা খেলতেন, সেখানেও কিছু নিয়মের বন্ধন ছিল। যুধিষ্ঠির নিজে পাশা খেলতে ভালবাসতেন কিন্তু পাশা খেলার ফন্দিফিকির ভাল জানতেন না। খেলার ঝোঁকে তিনি এমনভাবেই প্রতিপক্ষের জালে বন্দি হয়ে পড়েছিলেন, যেখানে দ্রৌপদীর অপমানের ঘটনা অশালীন হলেও অস্বাভাবিক ছিল না। কৌরবরা দ্রৌপদীর সঙ্গে যে অসভ্য আচরণ করেছেন, সেটা তাঁদের রুচির বিকার, এ বিকার তাঁরা না ঘটালেও পারতেন। কিন্তু পাশার পণ যখন তাঁরা জিতেছেন, তখন ওই রুচিহীন বিকার ঘটালে পরেও আইনের চোখে—

যেটাকে একভাবে ধর্মও বলা যেতে পারে—সেই ধর্মের দৃষ্টিতে কৌরবদের খুব একটা দোষও দেওয়া যায় না। বস্তুত এখানে পণজয়ী পক্ষের আত্যন্তিক বিরোধিতা করলে শুধুমাত্র প্রতিপক্ষতার উত্তর দেবার জন্যই দুর্যোধন দুঃশাসনদের ব্যবহার তথা দ্রৌপদীর ওপরে তাঁদের অত্যাচার আরও ক্রূরতর হত। ভীষ্ম সেটা চাননি বলেই ইনিয়েবিনিয়ে দ্রৌপদীর প্রশ্ন নিজে এড়িয়ে গিয়ে যুধিষ্ঠিরের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন।

বলা বাহুল্য, যুধিষ্ঠির যেমন অন্য ধর্ম বোঝেন তেমনই পাশাখেলার ধর্মও তিনি বোঝেন। নিজের পরাজয়ের ব্যাপারে তাঁর সর্বাত্মক স্বীকৃতি ছিল। সে যাই হোক, কুরুসভায় কৌরবদের বিকার মাত্রাছাড়া হতেই ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর হস্তক্ষেপে সে বিকার স্তব্ধ হয়েছে। প্রথমবার পাশাখেলায় যুধিষ্ঠির যা হেরেছিলেন তা ধৃতরাষ্ট্রের করুণায় ফিরে পেলেন বটে, কিন্তু দুর্যোধনের প্ররোচনায় আবার দ্বিতীয়বার পাশাখেলা হল এবং যুধিষ্ঠির তাঁর রাজ্যপাট হারিয়ে সকলকে নিয়ে বনবাসে যেতে বাধ্য হলেন।

বনবাসে যাবার সময় যুধিষ্ঠিরকে আমরা একবারের তরে ভীষ্মের কাছে উপস্থিত দেখছি। যুধিষ্ঠির ভীষ্মের কাছে বিদায় চাইছেন। অনাড়ম্বর এই বিদায়, সাধারণ প্রথার মতো। যুধিষ্ঠিরের এই বনবাসে যাবার সময় থেকে একেবারে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস পর্যন্ত ভীষ্মকে আমরা প্রায় কোনও কথাই বলতে দেখি না। সংসারের জ্বালাযন্ত্রণায় তপ্ত হতে হতে এক সময় যেমন বৃদ্ধ গৃহকর্তাটি নির্বিকার হয়ে সংসারে বাস করতে থাকেন, ভীষ্মকেও আমরা সেইরকম দেখছি প্রায় তেরো বছর ধরে। পাণ্ডবদের বনবাস এবং অজ্ঞাতবাস ভীষ্মপিতামহকে নিশ্চয়ই সুখ দেয়নি, শান্তি তো নয়ই। কিন্তু এই তেরো বছর ধরে তিনি কোনও উপদেশ, আদেশ বা পরামর্শের মধ্যে যাননি।

কুরুবাড়িতে তিনি নির্বিকার হয়ে বসেছিলেন—মানে অবশ্য এই নয় যে, তাঁর মন শান্ত গভীর কোনও ব্রহ্মচৈতন্যে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। কৌরবসভায় দ্রৌপদীর যে অপমান তিনি দেখেছেন, বনবাসে যাবার সময় ভীমার্জুনকে তিনি যেভাবে ভয়ংকর প্রতিজ্ঞা নিতে দেখেছেন, তাতে ভরত-শান্তনুর বংশে অন্যতম প্রধান ধারাটি যে লুপ্ত হয়ে যাবে, এ সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ থাকবার কথা নয়। হয়তো সেই কারণেই বিষন্ন শান্ত বৃদ্ধ তাঁর জীবনের পূর্বকথাগুলি স্মরণ করে করে খানিকটা আত্মগ্লানিতে ভোগেন, আত্মসমালোচনাও যে বাদ পড়ে, তা নয়। পিতা শান্তনুর দ্বিতীয় বিবাহের কথা শুনে তিনি সাভিমানে সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন, স্বাত্মারোপিত লাঞ্ছনায় আপন পুত্রজন্মও পরিহার করেছিলেন। কিন্তু কী হল তাঁর আত্মত্যাগে? পিতা শান্তনু এবং ভাই বিচিত্রবীর্য কামনার বশীভূত ছিলেন এবং এখন তাঁরই ক্ষেত্রজাত বংশধারা লোভের বশীভূত। সাধে কি আর তিনি দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন—লোভ আর মোহে কুরুরা সব আচ্ছন্ন হয়ে গেছেন—তথাহি কুরবঃ সর্বে লোভমোহপরায়ণাঃ। অথচ তিনি সিংহাসনে বসলেন না। আবার সিংহাসনে না বসে তিনি যে উচিত পরামর্শ দিয়ে দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রদের বিকার রুদ্ধ করবেন, তারও কোনও উপায় নেই।

পরামর্শ দিলে কী হত, তার প্রমাণ এই একটু আগেই পাওয়া গেছে। দুঃশাসনের অসভ্যতার প্রতিবাদ করেছিলেন বিদুর। আর ভীম যখন দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণ দেখে অসহ্য ক্রোধে দুর্যোধন দুঃশাসনদের হাতের মুঠোয় পিষে ফেলার প্রতিজ্ঞা করছিলেন, তখন ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুরের মতো বৃদ্ধরা শুধু একবার বলেছিলেন—ক্ষমা করে দাও, বৎস! সত্যিই তো তুমি অনেক কিছু করতে পার—ক্ষম্যতামিদমিত্যেবং সর্বং সম্ভাব্যতে ত্বয়ি। বাস্, এই একটা কথা। কৌরবসভায় দ্রৌপদীর অকথ্য অত্যাচার দেখে তিন কুলবৃদ্ধ শুধু একটি বার সমস্বরে ভীমকে থামানোর চেষ্টা করেছিলেন। আর যায় কোথা? সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোধনের প্রশ্রয়প্রাপ্ত কর্ণ চিবিয়ে চিবিয়ে দ্রৌপদীকে বললেন—এই সভায় তিনটিমাত্র লোক আছেন যাঁরা নীতিধর্মের কোনও তোয়াক্কা করেন না। এঁদের প্রথম জন হলেন ভীষ্ম, দ্বিতীয় হলেন বিদুর,

আর তৃতীয় হলেন কৌরবদের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য—ভীষ্মঃ ক্ষত্তা কৌরবানাং গুরুশ্চ। যে রাজা এঁদের পালনপোষণ করেন, সেই রাজাকেই এঁরা সবচেয়ে খারাপ বলে গালাগালি দেন, এঁরা পালক স্বামীর মূলোচ্ছেদ করতে পারলে খুশি হন এবং এই পাপের জন্য এঁদের কোনও দুঃখবোধও নেই—যে স্বামিনং দুষ্টতমং বদন্তি বাঞ্ছন্তি বৃদ্ধিং ন চ বিক্ষিপন্তি।

বিবাদ থামাতে গিয়ে যে গালাগালি কর্ণের কাছে খেলেন ভীষ্ম, এই গালাগালিই তাঁর বাক্য রুদ্ধ করে দিয়েছে। কথাগুলি দুর্যোধন বললেও হত, নাতি-ঠাকুরদাদা মিলে তার একটা সমাধান করা যেত। কিন্তু এই ধরনের তিরস্কারগুলি সব সময়েই তাঁকে শুনতে হয়েছে দুর্যোধনের বন্ধু কর্ণের কাছ থেকে। তিনি বুঝতে পারেন—এই কথাগুলির মধ্যে দুর্যোধনের সায় আছে, কারণ দুর্যোধন কখনও কর্ণকে থামাননি বা প্রতিবাদ করেননি তাঁর কথার। কুরুবংশের সবচেয়ে বৃদ্ধ মানুষটি এইসব তিরস্কার শুনতে শুনতে একেবারে চুপ করে গেছেন। পরামর্শ, উপদেশ দেওয়া দূরে থাক, যে বৃদ্ধকে তাঁর নাতির মুখ থেকে পরান্নভোজনের খোঁটা শুনতে হয়, সেই বৃদ্ধ কি কখনও আগ বাড়িয়ে দুর্যোধন দুঃশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করতে যাবেন? তিনি শুধু দেখছেন, মহারাজ শান্তনুর সময় থেকে আজ পর্যন্ত—সব দেখার জন্য তিনি ইচ্ছামৃত্যুর বর নিয়ে বসে আছেন। তবু তাঁর মরণের সাধ জাগে না, কেননা বিচিত্রবীর্যের আর এক বংশধারায় তাঁর যে অন্য নাতিরা বনবাসে দিন কাটাচ্ছেন, তাঁরা এখনও তাঁর মুখ চেয়ে আছেন। কোনও দিন যদি সেইসব বশংবদ নাতিরা হস্তিনাপুরে ফিরে আসে আবার! ভীষ্ম তাঁদের জন্য দিন গুনছেন মনে মনে।

তেরোটা বচ্ছর জুড়ে ভীষ্মের মুখে ভাল মন্দ একটা কথা শুনলাম না। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সময় শেষ হয়ে আসছে। দুর্যোধন কর্ণরা হাজার চেষ্টা করেও পাণ্ডবদের হদিশ খুঁজে বার করতে পারলেন না। গুপ্তচরেরা সমস্ত জায়গা খুঁজে খুঁজে হাল ছেড়ে বলেছে—আমরা কিছুতেই তাঁদের গতিবিধি জানতে পারিনি। আমরা কি আবার খুঁজতে বেরুব—অন্বেষণং পাণ্ডবানাং ভূয়ঃ কিং করবামহে? গুপ্তচরদের কথা শুনে দুর্যোধন কর্ণদের সভা বসেছে আবার। প্রথামাফিক সেখানে ভীষ্ম দ্রোণরাও বসে আছেন। কর্ণ প্রস্তাব করলেন—আরও বুদ্ধিমান, আরও পাকা গুপ্তচরদের পাঠানো হোক পাণ্ডবদের খুঁজে বার করবার জন্য—অন্যে ধূর্ততরা দক্ষা নিভৃতাঃ সাধুকারিণঃ। হাট, মাঠ, বন, নদী চষে ফেলুক তারা। পাণ্ডবদের খুঁজে বার করতেই হবে। কর্ণের প্রত্যেকটি কথা সমর্থন করলেন দুর্যোধনের ভাই দুঃশাসন।

ভীষ্ম চুপ করেই বসেছিলেন। খুব ভাল করেই তিনি বুঝতে পারছিলেন—কত বড় হতাশা থেকে কর্ণ দুঃশাসনেরা দুর্যোধনকে আবারও এক বৃথা অন্বেষণে প্রবৃত্ত করছেন। একটু আগেই দুর্যোধন তাঁর অসহায়তা ব্যক্ত করেছেন ভাই বন্ধুদের কাছে। বলেছেন—আর সময় নেই। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের কাল বেশির ভাগ কেটে গেছে—অল্পাবশিষ্টং কালস্য গতং ভূয়িষ্ঠমন্ততঃ। এরপর তারা আসবে, মাতলা হাতির মতো হুড়মুড়িয়ে এসে পড়বে কৌরবদের ওপর। কৌরবদের বিপদের অন্ত থাকবে না—দুঃখা ভবেয়ুঃ সংরব্ধাঃ কৌরবান্ প্রতি তে ধ্রুবম্। ভীষ্মও জানেন—তারা আসবে। এত দুঃখের পর তাদেরও সুখের দিন আসবে। আর ঠিক সেই জন্যই এক সর্বগ্রাসী হতাশা ঘিরে ধরেছে দুর্যোধন দুঃশাসন কর্ণকে। সেই জন্যই আবারও অন্বেষণের শেষ চেষ্টা, যাতে পুনরায় তাদের বারো বছরের জন্য বনে পাঠানো যায়।

ভীষ্ম কৌরবদের এই আকুল চেষ্টার আর্তি শুনছিলেন এতক্ষণ ধরে। তখনও কিছুই বলেননি। কিন্তু কর্ণ-দুঃশাসনের কথা শেষ হবার পরেই অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য আর থাকতে না পেরে বলে উঠলেন—এত ভাবছ, বাছারা! এত গুপ্তচর লাগাচ্ছ, কিন্তু জেনো পাণ্ডবদের মতো মানুষের কখনও বিনাশ হয় না, তারা হেরেও যায় না চিরদিনের মতো—ন তাদৃশা

বিনশ্যন্তি নাপি যান্তি পরাভবম্। গুপ্তচররা দুর্যোধনকে বলেছিল—ওরা নিশ্চয়ই মরে গেছে, নইলে তাদের আমরা খুঁজে পাব না, তা হতে পারে না—সর্বথা বিপ্রণষ্টাস্তে। দ্রোণাচার্য সেই কথারই প্রতিবাদ করেছেন—ওরা মরতেই পারে না। ওরা সময়ের অপেক্ষা করছে মাত্র। তবে এও ঠিক, তোমরা তাদের খুঁজে পাবে না—দুর্জ্ঞেয়া খলু শূরাস্তে দুষ্প্রাপাস্তপসা বৃতাঃ।

কথাটা এতই ভাল লাগল ভীষ্মের যে, চুপ করে থাকবেন ভেবেও চুপ থাকতে পারলেন না। নইলে দ্রোণাচার্যের আগেই ভীষ্মের কথা বলার কথা। বলার ইচ্ছে থাকলে প্রথমেই বলতেন তিনি। কিন্তু দ্রোণাচার্য এতই জোর দিয়ে সত্যের জয়কার ঘোষণা করেছেন যে ভীষ্ম আর কথা না বলে পারলেন না। বিশেষত এখন পাণ্ডবদের আসবার সময় হয়ে গেছে, এখন না হলেও দুদিন পরেই এই বৃদ্ধের গুরুত্ব বাড়বে। অতএব ভীষ্ম চুপ করে থাকলেন না। ভীষ্ম বললেন—পাণ্ডবদের খুঁজে বার করা মোটেই সম্ভব হবে না। যুধিষ্ঠির ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি, রাজনীতিও তাঁর ভালই জানা আছে। ওইরকম একজন নীতিজ্ঞ ব্যক্তি যদি মনে করেন—আমি ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকব—তা হলে কারও পক্ষেই তাঁকে খুঁজে বার করা সম্ভব হবে না—ন তু নীতিঃ সুনীতস্য শক্যতে'ন্বেষিতুং পরৈঃ। আমি যা বলছি, তা আমার জ্ঞান বুদ্ধি এবং অনুমানের ওপর নির্ভর করেই বলছি, তোমাদের ওপর আমার কোনও বিদ্বেষ নেই—বুদ্ধ্যা প্রযুক্তং ন দ্রোহাৎ প্রবক্ষ্যামি নিবোধ তৎ। মনে রেখো, যুধিষ্ঠির যে ধরনের নীতি নিয়ে চলেন, কোনওভাবেই আমি তার নিন্দা করতে পারি না; কাজেই এই তেরো বচ্ছর ধরে যুধিষ্ঠির কোথায় কীভাবে অবস্থান করছেন—এ ব্যাপারে অন্য লোক যেমন ভাবছে, আমি তেমন ভাবছি না—তত্র নাহং তথা মন্যে যথায়মিতরো জনঃ।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের অনেক গুণ গাইলেন প্রসঙ্গত। যুধিষ্ঠির যে দেশে বাস করবেন, সে দেশের মঙ্গল এবং সমৃদ্ধি যে স্বতঃসিদ্ধ, সে কথাও ভীষ্ম সাতকাহন করে বললেন। গুপ্তচরেরা যে কোনওভাবেই যুধিষ্ঠিরের সন্ধান পাবে না, সে বিষয়ে নিজের পরম নিশ্চিন্ততা জ্ঞাপন করে ভীষ্ম আসলে বোঝাতে চাইলেন যে, এই ধরনের বৃথা অন্বেষণ বাদ দিয়ে নিজেদের হিত চিন্তা করাটাই কৌরবদের পক্ষে মঙ্গলকর হবে—এবমেব তু সঞ্চিন্ত্য যৎ কৃত্যং মন্যসে হিতম্। নিজেদের হিতভাবনাটা কীভাবে করতে হবে, সে ব্যাপারে কোনও স্পষ্ট পরামর্শ না দিলেও, তাঁর ইঙ্গিতটা বুঝতে দেরি হবার কথা নয় দুর্যোধন কর্ণদের। স্বাভাবিক কারণেই কথাটা তাঁদের ভাল লাগল না, কিন্তু এমন একটা সময় যখন পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সময় শেষ হয়ে আসছে, এই সময়ে এই কুলবৃদ্ধ পিতামহটিকে দুর্যোধন কর্ণরা চটাতেও তেমন সাহস করলেন না।

পাণ্ডবদের অন্বেষণ করার গুরুত্বটা অবশ্য এমনিই কমে গেল। গুপ্তচরেরা অনেক বৃথা সংবাদ দেবার সময় প্রসঙ্গক্রমে বলেছিল যে, মৎস্যরাজ বিরাটের সেনাপতি কীচক মারা গেছেন। কীচক দ্রৌপদীর প্রেম লাভ করার চেষ্টা করে কীভাবে ভীমের হাতে মারা পড়েছিলেন, সে অন্য প্রসঙ্গ। কিন্তু বিরাটের সেনাপতি কীচক এতটাই শক্তিশালী ছিলেন যে, তিনি মাঝে মাঝেই তাঁর আশপাশের রাজ্য আক্রমণ করে অন্যদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন। কীচক মারা যেতে দুর্যোধনের মিত্রশক্তির অন্তর্গত ত্রিগর্তদেশের রাজা সুশর্মা বিরাটরাজার রাজ্য আক্রমণ করে তাঁর গোধন হরণ করতে বললেন। ত্রিগর্তরাজ এমনও বললেন যে, পাণ্ডবদের খোঁজার কোনও মানেই হয় না। হয় তারা হারিয়ে গেছে, নয়তো মরে গেছে। আর যদি বেঁচেও থাকে, তবে তাদের অর্থ, শক্তি, পুরুষকার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। শুধু শুধু তাদের খুঁজে সময় নষ্ট করার কী দরকার—কিং বা নঃ পাণ্ডবৈঃ কার্য্যং হীনার্থবলপৌরুষৈঃ।

ত্রিগর্তরাজ সুশর্মার কথা সমর্থন করে কর্ণ বললেন—ঠিক কথাই বলেছে সুশর্মা। তুমি কৌরবসৈন্য আর ত্রিগর্তরাজের সৈন্য দুই ভাগ নিয়ে বিরাট রাজ্যে যুদ্ধ চালাবে। অবশ্য এ

ব্যাপারে শেষ কথা বলবেন আমাদের বৃদ্ধ পিতামহ মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্ম এবং অবশ্যই আচার্য দ্রোণ এবং কৃপ—প্রজ্ঞাবান্ কুরুবৃদ্ধো'য়ং সর্বেষাং নঃ পিতামহঃ। পরিস্থিতি পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্ণের ভাষা কত মধুর হয়ে উঠেছে, লক্ষ করুন। যুদ্ধবিগ্রহ লাগলে ভীষ্মপিতামহের মতো বিরাট যোদ্ধাকে যে কৌরবদের প্রয়োজন হবে, সে কথা কর্ণও এখন বুঝতে পারছেন।

দুর্যোধন বিরাটরাজ্য আক্রমণের নির্দেশ দিলেন এবং এইভাবে রাজার আদেশ নেমে এলে ভীষ্মও বিনা দ্বিধায় যুদ্ধ করতে যাবেন। এইরকমই নিয়ম। তা ছাড়া যুদ্ধ জিনিসটা এই কুরুবৃদ্ধের কাছে এখনও যথেষ্ট রুচিকর। বৃদ্ধ হলেও তিনি যুদ্ধ ভয় পান না। ঠিক হল, যুদ্ধ হবে দুটো 'সেকটরে'। প্রথমে ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা একদিক থেকে বিরাটরাজ্য আক্রমণ করে বিরাটের গোধন হরণ করবেন, আর কৌরবরা আক্রমণ করবেন, তার পরদিন।

হঠাৎ করে দুর্যোধন কর্ণদের কথায় বিগলিত হয়ে ভীষ্ম বিরাট রাজ্যে আক্রমণ করতে গেলেন কেন, এটা একটা রহস্য বটে। বস্তুত, বিরাট-সেনাপতি যেভাবে মারা গেছেন, তার মধ্যে পাণ্ডবদের ঠিকানা পাবার কোনও ইঙ্গিত ছিল কি না, সেটা মহাভারতের কবি একবারও স্পষ্টত উচ্চারণ করেননি। তবে মহাভারতের এই অংশটুকু উপজীব্য করে কালিদাসের পূর্ববর্তী নাট্যকার মহাকবি ভাস তাঁর 'পঞ্চরাত্র' নাটক রচনা করেন। সেখানে কিন্তু ওই ইঙ্গিতটা ছিল।

ভাসের পঞ্চরাত্র নাটকে দেখা যাচ্ছে—পাণ্ডবদের বনবাস এবং অজ্ঞাতবাস কালে দুর্যোধন অতিশয় ভদ্রলোক হয়ে উঠেছেন। মহাভারতেও অবশ্য অনুরূপ কথা আছে। পঞ্চরাত্র নাটকের প্রথমাংশে দুর্যোধন একটি যজ্ঞ শেষ করেছেন এবং তাতে ভীষ্ম দ্রোণ ইত্যাদি বৃদ্ধেরা দুর্যোধনের ওপর বেশ সন্তুষ্ট। যজ্ঞশেষে দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে দক্ষিণা দিতে চাইলেন। দ্রোণ অবশ্য সবিনয়ে এই প্রস্তাব এড়িয়ে গিয়ে কুলবৃদ্ধ ভীষ্মই এই দক্ষিণার উপযুক্ত পাত্র বলে দুর্যোধনকে উপদেশ দিলেন। ভীষ্ম কোনওভাবেই এই দক্ষিণা নিতে রাজি হলেন না। ভীষ্মের অনুরোধে দ্রোণ শেষপর্যন্ত দক্ষিণা গ্রহণ করতে রাজি হলেন এবং দুর্যোধনের কাছ থেকে সত্যরক্ষার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে দক্ষিণা হিসেবে পাণ্ডবদের জন্য অর্ধরাজ্য চেয়ে বসলেন।

দ্রোণাচার্যের এই প্রার্থনা সহজে মঞ্জুর হল না। মামা শকুনি দেখলেন—তাঁর পাশাখেলায় জেতা রাজ্য কত সহজে কৌরবদের হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। অথচ দুর্যোধন এমনভাবেই অঙ্গীকার করেছেন যে, প্রতিজ্ঞাত দক্ষিণা না দিলেও নয়। শকুনি তখন দ্রোণাচার্যকে একটা শর্ত দিয়ে বললেন—ঠিক আছে, যদি আপনি পাঁচ রাত্রির (পঞ্চরাত্র) মধ্যে পাণ্ডবদের খবর এনে দিতে পারেন, তবে ওই অর্ধরাজ্য প্রদানের কথাটা মানা যেতে পারে। পাণ্ডবদের কোনও খবরই যেখানে পাওয়া যাচ্ছে না, সেখানে এই শর্ত মেনে নেওয়া খুব কঠিন ছিল, বিশেষত বয়স্ক দ্রোণাচার্যের পক্ষে।

নাটকের ঠিক এই মুহূর্তে একটা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ এল কৌরবসভায়। দূত এসে খবর দিল—বিরাট-সেনাপতি কীচক এক অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে মারা গেছেন এবং তাঁকে মেরে দলা পাকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই খবর শোনামাত্র অন্যদের যা প্রতিক্রিয়া হবার হল, কিন্তু দ্রোণাচার্য সঙ্গে সঙ্গে ভীষ্মের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বললেন—পাঁচ রাত্রির মধ্যে পাণ্ডবদের খুঁজে বার করার শর্ত তিনি মেনে নিচ্ছেন। আসলে কীচকের মৃত্যুর রকমসকম শুনেই ভীষ্ম দ্রোণরা বুঝতে পেরেছেন যে, এটি ভীমের কাজ। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা পাণ্ডবদের আবাসস্থল সম্বন্ধে প্রায় নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

পঞ্চরাত্র নাটকে এর পরেই ভীষ্মের সেনাপতিত্বে বিরাটরাজ্য আক্রমণ করেছে কৌরববাহিনী। মহাভারতেও এই আক্রমণ ঘটেছে, তবে ভাসের পঞ্চরাত্র নাটকের

পটভূমিকার নিরিখে আমাদের সন্দেহ হয় যে, মহামতি ভীষ্ম বিরাটরাজ্যে পাণ্ডবদের উপস্থিতি একইভাবে অনুমান করেননি তো? যাই হোক, মহাভারতে বিরাটরাজ্য আক্রমণ করে ভীম এবং অন্যান্য পাণ্ডবদের হাতে পর্যুদস্ত হলেন ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা। পরের দিন কৌরবরা বিরাটরাজ্য আক্রমণ করে প্রথমেই বিরাটের গোশালা থেকে অন্তত ষাট হাজার গোরু তাড়িয়ে নিয়ে এলেন একদিকে। গয়লারা ঘটনা জানাল কুমার উত্তরকে। বিরাট-পুত্র প্রথমে অনেক হম্বিতম্বি করে বৃহন্নলাবেশী অর্জুনকে সারথি করে যুদ্ধে এলেন এবং সাগরোপম কৌরববাহিনী দেখে যুদ্ধে পরাঙ্‌মুখ হলেন। অর্জুন তখন উত্তরকে সারথি করে নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন।

দূর থেকে অর্জুনকে বিদ্যুৎবেগে একা আসতে দেখে প্রথম তাঁকে অর্জুন বলে সন্দেহ করলেন দ্রোণাচার্য। তিনি এতদিন পর প্রিয় শিষ্যকে যুদ্ধক্ষেত্রে আসতে দেখে বেশ একটু প্রশংসাই করে ফেলেছিলেন। দুর্যোধন অবশ্য এই প্রশংসায় কান না দিয়ে প্রথমেই প্রশ্ন তুললেন যে, পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের কাল শেষ হয়নি, অতএব অর্জুনকে যখন দেখা গেছে তখন আবার পূর্বপ্রতিজ্ঞামতো পাণ্ডবদের বনে যেতে হবে। এরপর অবশ্য তিনি দ্রোণের অর্জুন-প্রশংসা সম্বন্ধে মন্তব্য করে দু-চার কথা শুনিয়ে দিলেন তাঁকে। তাঁর সঙ্গে গলা মেলালেন কর্ণ। তাঁর আত্মশ্লাঘাও বাদ গেল না। এবার ঝগড়া জমে উঠল। কৃপাচার্য এবং অশ্বত্থামা দুজনেই কর্ণকে একহাত নিলেন। ওদিকে অর্জুনকে ধেয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে। কৌরবদের সৈন্যবাহিনী তখনও ঠিকঠাক মতো সাজানো হয়নি।

ঠিক এই অবস্থায় মহামতি ভীষ্মের প্রতিক্রিয়াটি অদ্ভুত এবং অসাধারণ। অর্জুনই হোন, আর যেই হোন, যিনি একা যুদ্ধ করতে আসছেন তিনি সাধারণ যোদ্ধা নন বলেই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বন্ধ করা উচিত বলে ভীষ্ম রায় দিলেন। তিনি কর্ণকে একবার প্রশংসা করলেন এবং অন্যদিকে দ্রোণাচার্যকে বললেন—আপনাকে যুদ্ধে উত্তপ্ত করার জন্যই কর্ণ এইসব কথা আপনাকে বলেছে—কর্ণো যদভ্যবোচত্তে তেজঃসংজননায় তৎ। ভীষ্ম সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে, অর্জুন যখন যুদ্ধ করার জন্য আসছে, তখন তাঁকে সামনে দেখতে পেয়েও নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে মরার কোনও মানে নেই—নায়ং কালো বিরোধস্য কৌন্তেয়ে সমুপস্থিতে। ভীষ্ম সকলকে সন্তুষ্ট করে, বিশেষত দ্রোণ, কৃপ এবং অশ্বত্থামাকে এমনভাবে বোঝালেন যেন তিনিই সকলের কাছে কর্ণ দুর্যোধনের কারণে ক্ষমাপ্রার্থী।

উন্মুক্ত যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে কুরুবংশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিটির এই বিনীত ব্যবহারে দ্রোণ কৃপরা যে সন্তুষ্ট হলেন, এটা বড় কথা নয়। লক্ষণীয় ভীষ্মের এই মীমাংসায় দুর্যোধন নিজের ভুল বুঝে ক্ষমা চাইলেন দ্রোণাচার্যের কাছে। অন্যদিকে দ্রোণও দুর্যোধনকে ক্ষমা করলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কিছু গুরুতর প্রশ্ন তিনি ভীষ্মের কাছে পেশ করলেন। দ্রোণের প্রথম প্রস্তাব হল—দুর্যোধনকে কোনওভাবেই অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে না দেওয়া। তেরো বচ্ছর আগে যেসব ঘটনা ঘটে গেছে, তার প্রতিশোধ তোলার জন্য দুর্যোধনকে মেরে ফেলাটা অর্জুনের পক্ষে আজ কিছুই অসম্ভব নয়। কাজেই যেভাবে হোক দুর্যোধনকে সরিয়ে রেখে নিজেরা যুদ্ধ করে তাঁকে রক্ষা করতে হবে।

দ্রোণের দ্বিতীয় প্রস্তাব হল—অর্জুনকে দেখামাত্রই দুর্যোধন যে অজ্ঞাতবাসের কাল গুনে আবার তাঁদের বারো বচ্ছরের জন্য বনে পাঠাতে চাইছেন, সেই হিসাবটা ভেঙে দেওয়া। দ্রোণ বললেন—অজ্ঞাতবাসের সময় সমাপ্ত না হলে অর্জুন এভাবে নিজেকে প্রকাশ করতেন না। কাজেই দুর্যোধন যেসব কথা ভেবে আনন্দ পাচ্ছেন, আপনি সেই ভুলটা ভেঙে দিন, ভীষ্ম—উক্তং দুর্যোধনেনাপি পুরস্তাদ্ বাক্যমীদৃশম্।

অন্তত এই শ্লোকটি বিচার করলে বোঝা যায় যে, পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সমাপ্তিকাল নিয়ে আগেই এই দুই বৃদ্ধ কিছু হিসেবনিকেশ করে রেখেছেন। এই নিরিখে পঞ্চরাত্র নাটকে ভাসের উদ্ভাবনী প্রতিভাটাও সার্থকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। আমরা অবশ্য এই ঘটনার মধ্যে আরও গভীরতর এক তথ্য আবিষ্কার করি। এই তেরো বচ্ছর ধরে কুলবৃদ্ধ ভীষ্ম একেবারে চুপ করে গুটিয়ে রেখেছিলেন নিজেকে। কিন্তু আজ অর্জুনকে দেখার পর থেকেই তাঁর অসীম গুরুত্ব বেড়ে গেছে। নইলে প্রথমত তাঁকে অনুসরণ করে দুর্যোধন দ্রোণের কাছে ক্ষমা চাইতেন না। দ্বিতীয়ত, দ্রোণ তাঁর ক্ষমা প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে অবহেলায় বলতে পারছেন—দুর্যোধন পাণ্ডবদের বনবাসের কাল সম্বন্ধে যা বললেন, তার সম্বন্ধে আপনার সঠিক বক্তব্যটা জানিয়ে দিন তো—তদনুস্মৃত্য গাঙ্গেয় যথাবদ্ বক্তুমর্হসি।

গাঙ্গেয় ভীষ্ম এখন বলতে পারছেন, নির্দ্বিধায় নিজের বক্তব্য জানাচ্ছেন তিনি। ভীষ্ম এবার দিনক্ষণের কলাকাষ্ঠা হিসেব করে সৌর মাস এবং চান্দ্র মাসের তিথি-মান বিচার করে দেখালেন সবিস্তারে। ভীষ্ম বোঝালেন—আমাদের দেশে সূর্যের আহ্নিক গতি অনুসারে তিথি গণনা হয় না। হয় চন্দ্রের গতি অনুসারে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে এই তেরো বচ্ছরে পাঁচ পাঁচটি চান্দ্র মাস বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেই হিসেবেই পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের কালও সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। অর্জুন সেটা জানে এবং জেনেবুঝেই সে এমন প্রকটভাবে যুদ্ধ করতে এসেছে—এবমেতদ্ ধ্রুবং জ্ঞাত্বা ততো বীভৎসুরাগতঃ।

এমন একটা সুযোগ পেয়ে ভীষ্ম পাণ্ডবদের গুণকীর্তন করতেও পিছুপা হলেন না। তিনি বুঝেছেন—এখনই অর্জুনের সঙ্গে সর্বশক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধ করতে হবে এবং যুদ্ধের জন্যই তাঁর ওপরে নির্ভর করতে হবে দুর্যোধনকে। অতএব এই মুহূর্তে পাণ্ডবদের সম্বন্ধে দুটো কথা তিনি বলবেনই। ভীষ্ম বললেন—পাণ্ডবরা সকলেই মহান পুরুষ এবং ধর্মার্থ বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতাও কিছু কম নয়। বিশেষত যে পাণ্ডবদের প্রধান পুরুষ হলেন যুধিষ্ঠির, তিনি এমন অন্যায় কখনও করবেন না যাতে সময় ফুরোবার আগেই তিনি এসে রাজ্য চাইবেন। এমন ভাবারও কোনও কারণ নেই যে, তারা সব ভীষণ লোভী। যদি লোভ থাকত, তা হলে বারো-তেরো বছরের এই কষ্টকর বনবাস তারা মেনে নিত না। যে সময় তাঁদের ওপর অন্যায় করা হয়েছিল, সেই সময়েই নিজেদের ক্ষমতা দেখিয়ে যা করার তারা করতে পারত। কিন্তু শুধুমাত্র ধর্মের নিয়মে আবদ্ধ থাকায় তারা তাদের ক্ষত্রিয়ের ব্রত থেকে বিচ্যুত হয়নি—ধর্মপাশনিবদ্ধাস্তে ন চেলুঃ ক্ষত্রিয়ব্রতাৎ।

ভীষ্ম পাণ্ডবদের গুণগান করেই ছাড়লেন না। দুর্যোধনকে সাবধান করে দিয়ে বললেন—এখন সময় এসেছে এবং পাণ্ডবরা এখন তাদের প্রাপ্য রাজ্য ফিরিয়ে নেবেই। কাজেই আমি বলছিলাম কী, যুদ্ধ করে কখনও সম্পূর্ণ সিদ্ধি আসে না। যুদ্ধে একজন বাঁচবে, একজন মরবে, একজনের জয় হবে, অপরজনের পরাজয়—সংপ্রবৃত্তে তু সংগ্রামে ভাবাভাবৌ জয়াজয়ৌ। অতএব যুদ্ধই করবে, নাকি যেটা ধর্ম সেটাই করবে, সেটা তাড়াতাড়ি এখনই বুঝে দেখো। কেননা অর্জুন প্রায় এসে গেছে—ক্রিয়তামাশু রাজেন্দ্র সংপ্রাপ্তশ্চ ধনঞ্জয়ঃ।

ভীষ্মের মুখে অনেকক্ষণ পাণ্ডবদের গুণপনা শুনেও দুর্যোধনের মনের ভাব কিছু পরিবর্তিত হল না। বিশেষত এখন অজ্ঞাতবাসের সমাপ্তিকাল পূর্ণ হয়েছে শুনে তাঁর হতাশা আরও বেড়েছে। যুদ্ধের জন্য ভীষ্মকে তাঁর নিতান্তই প্রয়োজন। অতএব তাঁকে একটুও না চটিয়ে দুর্যোধন বললেন—আমি কিছুতেই পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দিতে পারব না—নাহং রাজ্যং প্রদাস্যামি পাণ্ডবানাং পিতামহ। বরঞ্চ যুদ্ধের ব্যাপারে যা যা আপনার করণীয় আছে, আপনি তাই করুন তাড়াতাড়ি।

ভীষ্ম আর একটুও দেরি করেননি। তাঁর যা পরামর্শ দেবার তিনি দিয়েছেন। কিন্তু দুর্যোধন

যখন শুনবেন না এবং হস্তিনাপুরের রাজাধিকারী হিসেবে তিনি যখন যুদ্ধের ভাবনাই ভাবছেন, অতএব হস্তিনাপুরের বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী হিসেবে তিনি এক মুহূর্তে যুদ্ধের ‘স্ট্র্যাটিজি’ গ্রহণ করেছেন। দুর্যোধনের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হলে আজকে যে দুর্যোধন পরাজিত হবেনই সে বিষয়ে ভীষ্মের কোনও সন্দেহ ছিল না। অতএব কৌরববাহিনীর এক চতুর্থাংশ সৈন্য সঙ্গে নিয়ে দুর্যোধনকে তিনি হস্তিনার দিকে চলে যেতে বললেন। কিন্তু অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার আগে ভীষ্ম সেনা সাজালেন খুব বুদ্ধি করে। ভীষ্ম বললেন—দ্রোণাচার্য থাকুন সমস্ত সৈন্যের মাঝখানে, ডাইনে কৃপাচার্য, বাঁয়ে অশ্বত্থামা। একেবারে সামনে থাকুন মহাবীর কর্ণ এবং আমি পিছন থেকে সবাইকে রক্ষা করার চেষ্টা করব।

একটু আগে অর্জুনকে কত বিচিত্র রকমে পর্যুদস্ত করবেন কর্ণ, সে ব্যাপারে গলা ফুলিয়ে অনেক কথা বলেছিলেন। ভীষ্ম কর্ণের সমরস্পৃহা মেটানোর ভাবনা ভাবলেন তাঁকে সবার সামনে এগিয়ে দিয়ে। যুদ্ধের দৃষ্টিতে দেখলে পরে যুদ্ধের জন্য টগবগ করা লোকটিকেই সামনে দেওয়া ভাল। এতে সম্মুখস্থ ব্যক্তি তার আপ্রাণ চেষ্টাটি করবে এবং অন্যদিকে সে বিফল হলে সেটা নিয়ে কথা শোনানোর সুযোগও থাকবে যথেষ্ট। বিশেষত কর্ণের মতো অহংকারী ব্যক্তিকে এইভাবেই শিক্ষা দিতে হয়, যেমনটি ভীষ্ম দিলেন। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হলে কর্ণ বেশিক্ষণ দাঁড়াতেই পারেননি। তাঁকে পালাতে হয়েছিল। অবশ্য বনবাসের পর এই প্রথম-যুদ্ধে অর্জুনের সঙ্গে কেউই তেমন দাঁড়াতে পারেননি। ভীষ্মের সঙ্গেও অর্জুনের এক প্রস্থ সম্মুখ যুদ্ধ হয়েছিল। সেখানে এই বৃদ্ধ বয়সেও ভীষ্মের যে যুদ্ধোন্মাদনা দেখা গেল, তা তাঁর অল্পবয়স্ক নাতিদের চাইতে কোনও অংশে কম নয়।

ভীষ্মের সঙ্গে অর্জুনের শেষ যুদ্ধদৃশ্যটি অতীব মনোরম। অর্জুন বেশ দু-দশখানি বাণে পিতামহকে কাবু করে ফেলেছিল, কিন্তু যতটা কাতরতা এই বৃদ্ধ বাহ্যত দেখাচ্ছিলেন, ততটা কাতর তিনি হননি। অর্জুনের বাণে আহত হয়ে তিনি অনেকক্ষণ রথের মধ্যদণ্ডটি ধরে নিশ্চুপে পড়ে রইলেন—গৃহীত্বা রথকূবরম্। কিন্তু মহাভারতের কবি মন্তব্য করতে বাধ্য হলেন যে, ভীষ্ম এমনভাবেই অনেকক্ষণ পড়ে রইলেন যাতে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি খুব কাতর হয়ে পড়েছেন—গাঙ্গেয়ো যুদ্ধদুর্ধর্ষ-স্তস্থৌ দীর্ঘমিবাতুরঃ। মহাকবির এই শব্দব্যঞ্জনা থেকে বোঝা যায়—এতদিন পর এই প্রিয়তম নাতিটিকে দেখতে পেয়ে এই বৃদ্ধ ঠাকুরদাদাটির কোনও ইচ্ছাই আর ছিল না যুদ্ধ করার। রথের সারথিটিকে ঠাকুরদাদা আগে বলে রেখেছিলেন যে, তাঁকে সংজ্ঞাহীনের মতো পড়ে থাকতে দেখলেই সে যেন তাঁর রথ সরিয়ে নিয়ে যায়। যুদ্ধের আগে এই বৃদ্ধ ঠাকুরদাদার পূর্ব পরিকল্পনাগুলি এই মুহূর্তে আমাদের হৃদয় মথিত করে। হস্তিনাপুরের রাজনীতিরুক্ষ মরু-রাজধানীতে বসেও দূরাগত বনবাসী নাতিদের জন্য তাঁর স্নেহধারা কতটা উৎসারিত হচ্ছিল, এই ঘটনা তার প্রমাণ।

লক্ষ করে দেখুন, অর্জুন যখন আপন অস্ত্রকৌশলে কৌরবপক্ষের সমস্ত প্রধান পুরুষকে মূর্ছিত করে ফেলেছেন, তখন তিনি বিরাটকন্যা উত্তরার খেলার সুবিধের জন্য উত্তরকে পাঠালেন প্রত্যেক মহারথীর মাথার পাগড়ি খুলে আনার জন্য। যুদ্ধরত ক্ষত্রিয় পুরুষের মাথার পাগড়ি খুলে নেবার মতো অপমান আর হয় না। কিন্তু উষ্ণীষ খোলার জন্য কুমার উত্তরকে নির্দেশ দেবার সময় অর্জুন দ্রোণ কৃপ, কর্ণ দুর্যোধন সবাইকে চিনিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু ভীষ্মের কথা বলে তিনি কুমার উত্তরকে বললেন—আমার ওই বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা ভীষ্মের দিকে কিন্তু যেয়ো না, বাপু। ওঁর সংজ্ঞা মোটেই লুপ্ত হয়নি এবং আমার মূর্চ্ছাস্ত্র বিফল করে দেবার অস্ত্রসন্ধিও ওই বুড়োর জানা আছে—ভীষ্মস্য সংজ্ঞান্তু তথৈব মন্যে/জানাতি সো'স্ত্রপ্রতিঘাতমেষ। কাজেই আমার ওই অমূর্ছিত ঠাকুরদাদাটিকে বাঁয়ে রেখে তুমি আমাদের রথটি বার করে নিয়ে যাবে।

কুমার উত্তর নির্দিষ্ট কয়জনের মাথার উষ্ণীষ খুলে নিয়ে অর্জুনকে নিয়ে যেই রথ চালালেন, অমনই ভীষ্ম পিছন থেকে আক্রমণ হানলেন অর্জুনকে। কোথায় তাঁর মূর্ছা, কোথায় কী? অবশ্য এই আক্রমণও ছিল লোকদেখানো, অর্থাৎ আমি পারতাম, কিন্তু করলাম না। অর্জুন তাঁর এই ঠাকুরদাদাটির স্নেহ-অভিব্যক্তি ভালই বোঝেন। তিনি ভীষ্মকে কিছুই করলেন না; বাণাঘাতে শুধু তাঁর সারথি এবং ঘোড়াগুলিকে খানিকটা কাবু করে দিয়ে অর্জুন রণক্ষেত্র ছেড়ে চলে গেলেন এবং ভীষ্মও তাঁকে যেতে দিলেন—ততো'র্জুনো ভীষ্মমপাস্য যুদ্ধে/ বিদ্ধ্বাস্য যন্তারমধিজ্যধন্বা। ততক্ষণে দুর্যোধনের মূর্ছার ঘোর কেটেছে। সংজ্ঞা লাভ করেই তিনি পিতামহ ভীষ্মের বিমূঢ় অবস্থা এবং অর্জুনকে রথ ছুটিয়ে চলে যেতে দেখেই মন্তব্য করলেন—আরে! ধরুন ব্যাটাকে, ধরুন পিতামহ! একে আপনি এইভাবে ছেড়ে দিলেন? এমন করে ধরুন, যাতে আর পালিয়ে যেতে না পারে—অয়ং কথংস্বিদ্ ভবতা বিমুক্তস্তথা প্রমথ্নীহি যথা ন মুচ্যেৎ।

ভীষ্ম ভাবলেন—কী বিপরীত স্বভাবের মানুষই না এই দুর্যোধন! এই কিছুক্ষণ আগে যে অর্জুনের হাতে সমস্ত রথী মহারথীদের নিয়ে যুদ্ধে মূর্চ্ছিত হয়ে বসেছিলেন দুর্যোধন, সেই তিনি যেন ঘুম থেকে উঠেই বললেন—কী হল? এটা হয়নি কেন, ওটা হয়নি কেন ইত্যাদি। ভীষ্ম আর সহ্য করতে পারলেন না। বললেন—একটু আগে এইসব কথা তোমার কোথায় ছিল, দুর্যোধন? অর্জুনের সম্মোহন-বাণে তোমার ধনুক বাণ খসে পড়েছিল হাত থেকে। তখন তোমার এই বুদ্ধি, এত বড় বড় শক্তিমত্তার কথা কোথায় ছিল—ক্ব তে গত বুদ্ধিভূৎ ক্ব বীর্যম্? আমি তো বরং অর্জুনকে ভাল বলব যে, ওইরকম বেকায়দায় পেয়েও সে তোমাকে মারেনি। নেহাত এই ধরনের পাপ কাজ সে কখনও করতে পারে না বলেই এবং রাজ্যের লোভে নিজের ধর্মটাকে সে ছাড়তে পারে না বলেই আজকে এখনও তোমরা প্রাণ নিয়ে বেঁচে আছ—তস্মান্ন সর্বে নিহতা রণে’স্মিন্। আমি এখনও তোমাকে সাবধান করে বলছি—তুমি এখনই তাড়াতাড়ি হস্তিনায় ফিরে যাও—ক্ষিপ্রং কুরূন্ যাহি কুরুপ্রবীর। বিরাটরাজার গোরু নিয়ে ফিরে যাক অর্জুন। তোমার নিজের মোহে যেন কোনও সর্বনাশ না হয়ে যায়—মা তে’দ্য কার্যং নিপতেচ্ছ মোহাৎ। তুমি বাড়ি ফিরে যাও।

দুর্যোধন পিতামহ ভীষ্মের কথা শুনে চলতে বাধ্য হলেন এবং অনেক ক্রুদ্ধ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি বাড়ি ফিরলেন। ওদিকে বিরাটগৃহে পাণ্ডবদের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধের উদ্যোগ শুরু হয়ে গেল। বিরাটের রাজসভায় যাদব পাঞ্চালদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন পাণ্ডবরা। আলোচনার শেষ সিদ্ধান্ত হল—পাণ্ডবরা তাঁদের হৃত রাজ্য ফেরত চান কিন্তু এই বাবদে যুদ্ধ তাঁদের কাম্য নয়, শান্তিই তাঁদের কাম্য। অনেক আলোচনার পর দ্রুপদরাজার পুরোহিতকে পাঠানো হল কৌরবসভায় পাণ্ডবদের বক্তব্য নিবেদন করার জন্য। তিনি ভীষ্ম দ্রোণ এবং কর্ণ দুর্যোধনদের সামনে পাণ্ডবদের বনবাস-কষ্টের কথা যেমন বর্ণনা করলেন, তেমনই ভীমার্জুনের শক্তিমত্তার কথা, তাঁদের অজেয়ত্ব, কৃষ্ণের বুদ্ধিমত্তা—এ সবই তিনি প্রকাশ করলেন বেশ কড়া ভাষায়।

এক রাজসভার মন্ত্রীমণ্ডলীতে বসে ছিলেন ভীষ্ম। সেখানে এক ব্রাহ্মণ পুরোহিতের মুখে পাণ্ডবদের হয়ে এই কঠিন যুদ্ধাহ্বান ভাল করে সহ্য করতে পারলেন না ভীষ্ম। পাণ্ডবরা যেখানে যুদ্ধ চান না, সেখানে শান্তির মর্মকথাটাই বড় হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দ্রুপদরাজার পুরোহিত সেই মর্মটা খুব হৃদয় দিয়ে বোঝেননি। ফলে তাঁর মুখে পাণ্ডবদের পেরিয়ে আসা কষ্টকর বনবাস এবং অধুনা তাঁদের শক্তির আড়ম্বরটাই বড় হয়ে উঠল। ভীষ্ম এটা ঠিক আশা করেননি আর করেননি বলেই প্রথম প্রতিক্রিয়াটা তিনিই ব্যক্ত করলেন। ভীষ্ম বললেন—এটা খুবই আনন্দের ব্যাপার যে, পাণ্ডবরা সবাই ভাল আছেন। বনবাসের কাল সমাপ্তির পর তাঁরা যে যাদব পাঞ্চালদের সহায়তা লাভ করেছেন, এটা নিশ্চয়ই ভাগ্যের কথা। আর এটাও খুব বড় কথা যে, পাণ্ডবরা তাঁদের এই বনবাস-যন্ত্রণার পরেও কারও সঙ্গে সংঘর্ষ চান না। তাঁরা সন্ধি চান। মহাশয়! আপনি সব কথা ঠিকই বলেছেন, কিন্তু বলেছেন বড় তীক্ষ্ণভাবে। হয়তো এই তীক্ষ্ণতা আপনার বরণশ্রেষ্ঠতার কারণে, ব্রাহ্মণ্যের কারণে—অতিতীক্ষ্ণং তু তে বাক্যং ব্রাহ্মণ্যাদিতি মে মতিঃ।

ব্রাহ্মণকে কথাগুলি শুনিয়ে দেবার পরেই প্রজ্ঞাবৃদ্ধ ভীষ্ম তাঁর ভাষা নরম করলেন। বস্তুত, কৌরবসভার মন্ত্রী অমাত্য এবং রাজন্যবর্গের সামনে পাঞ্চালরাজার পুরোহিত এসে পাণ্ডবদের হয়ে যতই বলুন, সে-পুরোহিত পাঞ্চালদের প্রতিনিধি। আর পাঞ্চালদের সঙ্গে কুরুবংশীয়দের চিরন্তন শত্রুতা। ভীষ্মের মৃত্যুকামী অম্বা-শিখণ্ডী পাঞ্চালরাজের পুত্র বলে পরিচিত। সেই পাঞ্চাল-পুরোহিত এসে তাঁর প্রিয়জন ভীমার্জুনের শক্তিমত্তার কথা যতই শোনান, তবুও তিনি পাঞ্চাল। ভীষ্মের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া সেইজন্যই। কিন্তু তীব্র প্রতিক্রিয়ায় যদি তাঁর কৌরব নাতিরা ভেবে বসেন যে, তিনি তাঁদের দলের লোক, তাই সঙ্গে

সঙ্গেই তিনি নিজেকে শুধরে নিয়ে বলেছেন—আপনি যে অর্জুনের শৌর্যবীর্যের কথা বলছেন, তা আমি সর্বাংশে মানি। যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের অস্ত্রশক্তি সহ্য করবার মতো মানুষ এই পৃথিবীতে নেই—কো হি পাণ্ডুসুতং যুদ্ধে বিষহেত ধনঞ্জয়ম্—আমি জানি, স্বয়ং দেবরাজ এলেও তিনি যুদ্ধে এঁটে উঠতে পারবেন না অর্জুনের সঙ্গে, সেখানে অন্য সাধারণ ধনুর্ধরদের কথা আর কী বলব—কিমুতান্যে ধনুর্ভৃতঃ।

ভীষ্মের মুখে অর্জুনের এই প্রশংসা কৌরবসভার যুবকগোষ্ঠী মোটেই ভালভাবে নিতে পারলেন না। মনে রাখা দরকার, এই এত বছর ধরে ভীষ্ম তেমন করে কোনও কথাই বলেননি। কৌরবসভার অতিবৃদ্ধ মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তিনি যখন দেখেছেন—ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধন তাঁর কথা মেনে চলেন না, তখন তিনি চুপ করে থাকাটাই সবচেয়ে ভাল মনে করেছেন। কিন্তু পুরু-ভরতের রাজবংশে আজ সেই সংকট আবার ঘনিয়ে উঠেছে যখন দুই জ্ঞাতিবংশ প্রায় যুদ্ধের সম্মুখীন। এখন যদি এক পক্ষকে অন্তত থামিয়ে দেওয়া না যায় তবে অন্য পক্ষের অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী। প্রসিদ্ধ ভরতবংশের এই সংকটে ভীষ্ম নিজেই নিজেকে প্রয়োজন মনে করছেন। আজ এই গুরুত্বপূর্ণ সভায় যখন পাণ্ডবদের দূত এসে পৌঁছেছেন, তখন তিনি প্রথম কথা বলার প্রয়োজন অনুভব করেছেন।

কিন্তু বটবৃক্ষের মতো এই প্রাচীন বৃদ্ধের মানসিকতা কে বোঝে এই কৌরবসভায়! শুধু মহারাজ শান্তনুর বংশধারাটি হস্তিনার সিংহাসনে ধরে রাখবার জন্য এতদিন ভীষ্ম যে কষ্ট করেছেন, যত আত্মবলি দিয়েছেন, যত অপমান সহ্য করেছেন, তা অন্য কে বুঝবে! দ্রুপদের পুরোহিতের সঙ্গে গলা মিলিয়ে অর্জুনের প্রশংসা করে ভীষ্ম কৌরবসভার প্রধান পুরুষদের এই ইঙ্গিতই দিয়েছিলেন যে, সন্ধিকামী পাণ্ডবদের রাজ্যাংশ ফিরিয়ে দেওয়াই ভাল, নইলে মহাবীর অর্জুনের হাতে রক্ষা থাকবে না। কিন্তু প্রাচীন বৃদ্ধ যতই ভাবুন তাঁর পরামর্শের প্রয়োজন আছে, তাঁর হাঁটুর বয়সি যুবাপুরুষেরা তাঁকে আমল দিলেন না। ভীষ্মের মুখে অর্জুনের প্রশংসা শুনে কর্ণ আর থাকতে পারলেন না। তিনি বললেন—বিরাট আর দ্রুপদের শক্তির ওপর নির্ভর করে পাণ্ডবরা আজকে যে যুদ্ধের ভয় দেখাচ্ছে, দুর্যোধন তার ধারও ধারেন না। ভয় দেখালে দুর্যোধন এক পা জমিও ছেড়ে দেবেন না। তবে হ্যাঁ, আগের কথামতো পাণ্ডবরা আবার বারো বচ্ছরের জন্য বনে যাক, তারপর যদি ফিরে আসে, নিশ্চয়ই তখন তাদের কথাটা ভাবা যাবে। কিন্তু তারা যদি বোকামি করে যুদ্ধের ভয় দেখায় তবে এই কুরুবীরদের মুখোমুখি হতে হবে এবং আমার কথাটাও তখন মনে পড়বে।

কর্ণের এই ধরনের উচ্চগ্রাম প্রতিবাদ ভীষ্ম আগেও শুনেছেন। কিন্তু সেসব সময় তাঁকে অবহেলা করেই উত্তর দেননি। বিরাটরাজার গোধন হরণের সময়ে একই পরিস্থিতি হয়েছিল। সেখানে দ্রোণ কৃপরা কর্ণকে খুব করে গালাগালি দিয়েছিলেন। ভীষ্ম তখন এই কর্ণকে খানিকটা বাঁচিয়েই দিয়েছেন। কিন্তু আর নয়। এখন যুদ্ধের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে, এখন আর তিনি কর্ণকে বাড়তে দেবেন না। সমবেত রাজন্যমণ্ডলীর সামনে আজকে কর্ণ যে কথা বলছেন, প্রজ্ঞাবৃদ্ধ ভীষ্ম তাঁকে বাস্তব বুঝিয়ে দেবেন। ভীষ্ম বললেন—এত বড় বড় কথা বলে লাভ নেই, কর্ণ! তুমি কত ক্ষমতা দেখিয়েছ সেইটা একটু ভাবো—কিন্নু রাধেয় বাচা তে কর্ম তৎ স্মর্তুমর্হসি। বিরাটরাজার গোরু চুরি করতে গিয়ে অর্জুনের সঙ্গে কৌরব বীরদের এত বড় যে একটা যুদ্ধ হল, সেখানে ছ-ছটা মহাবীরকে অর্জুন কীভাবে জিতেছে, তা সবাই দেখেছে। সেখানে তুমিও ছিলে, তবে হ্যাঁ, বার বার তোমাকে বাঁচিয়ে তুলতে হচ্ছিল এই যা। তোমার ক্ষমতা তখনই বেশ দেখা গেছে—বহুশো জীয়মানস্য কর্ম দৃষ্টং তদৈব তে। ভীষ্ম এবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বললেন—আমরা যদি এই ব্রাহ্মণের কথা না শুনে পাণ্ডবদের প্রাপ্য রাজ্য ফিরিয়ে না দিই, তাহলে জেনো, কর্ণ! অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে আমাদের মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ধুলো খেতে হবে, ধুলো—এবং যুধি হতাস্তেন ভক্ষয়িষ্যামো পাংশুকান্।

ভীষ্মকে বেশি বলতে হল না। নিজের ভবিষ্যৎ বুঝে ধৃতরাষ্ট্র কর্ণকে তিরস্কার করলেন রীতিমতো এবং ভীষ্মকে জানালেন যে, তিনি তাঁর আপ্তসহায় সঞ্জয়কে পাঠাবেন পাণ্ডবদের কাছে। ভীষ্মকেও তিনি সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করলেন অনেক, আর মান তো দিলেন যথেষ্টই—অনুমান্য প্রসাদ্য চ। কারণটা খুব পরিষ্কার। ভীষ্মকে তাঁর নিজের পক্ষে প্রয়োজন হবে। দুর্যোধন যে কোনওভাবেই পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন না, এ তিনি জানতেন এবং এ বিষয়ে তাঁর নিজেরও যথেষ্ট সমর্থন ছিল। কাজেই যুদ্ধ যদি লাগে তবে কৌরবপক্ষের এক অসামান্য বীরকে তিনি এখন ক্রোধান্বিত করবেন না। ভীষ্ম যে এই মুহূর্তে কত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছেন সেটা আরও বোঝা যাবে যুধিষ্ঠিরের কথা থেকেই। ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে পাণ্ডবদের কাছে পাঠালে যুধিষ্ঠির ভীষ্মের কুশল জিজ্ঞাসা করে বলেছিলেন—আমাদের ঠাকুরদাদা ভীষ্ম বুড়ো হয়ে গেছেন বটে, তবে তিনি মহাপ্রাজ্ঞ এবং সমস্ত ধর্মের আধার। তিনি ভাল আছেন কি না সেটা তো জানবই, কিন্তু আমাদের প্রতি তাঁর আগের মতোই স্নেহ আছে তো, নাকি অন্যরকম—যথা পূর্বং বৃত্তিরস্ত্যস্য কচ্চিৎ?

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে যত শান্তির কথা বলেই যুধিষ্ঠিরের কাছে পাঠিয়ে থাকুন, রাজ্য ফিরিয়ে দেবার ইচ্ছে যে তাঁর একটুও ছিল না সেটা যুধিষ্ঠিরের মতো ভাল মানুষও বুঝে গিয়েছিলেন। কাজেই সঞ্জয়কেও রাজ্য ফিরিয়ে দেবার শর্তসাপেক্ষ শান্তির কথা শুনেই ফিরে আসতে হল হস্তিনায়। রাজ্য ফিরিয়ে না দিলে যে যুদ্ধই হবে সে কথা যুধিষ্ঠিরের মুখেও বার বার শোনা গেল। সঞ্জয় ফিরে এসে পাঁচ ভাই পাণ্ডবদের কঠিন বক্তব্য যথাযথভাবে পেশ করলেন কুরুপ্রধানদের বিশেষ সভায়। আবারও প্রথম বক্তব্য নিবেদন করলেন ভীষ্মই। ভীষ্ম একটু আবেগগ্রস্তই হয়ে পড়েছিলেন সেদিন। কৃষ্ণ এবং অর্জুনের অলৌকিক মাহাত্ম্য খ্যাপন করেও তিনি ক্ষান্ত হলেন না। দুর্যোধনকে রীতিমতো ভয় দেখিয়ে ভীষ্ম বললেন—যেদিন কৃষ্ণ এবং অর্জুনকে একরথে যুদ্ধের জন্য আসতে দেখবে, সেদিন আমার কথা মনে রেখো, দুর্যোধন। মুশকিল হয়েছে, তুমি শুধু তিনজনের মতেই চল—তারমধ্যে প্রথমটা হল এই সারথির পো কর্ণ, দ্বিতীয় হল শকুনি আর তৃতীয় দুঃশাসন। কিন্তু তুমি এই তিনজনের মতে চললেও রাজা হিসেবে অন্য সবার কাছে তোমার শাসন সবার আগে মান্য। কারণ কুরুরা তোমার মতেই চলবে—তবৈব হি মতং সর্বে কুরবঃ পর্য্যুপাসতে।

ভীষ্মের এই ভাল কথাটুকু দুর্যোধন মনে রাখলেন কি না জানি না, কিন্তু ভীষ্মের মুখে ‘কৃষ্ণ অর্জুনের প্রশংসা শুনে কর্ণ একেবারে জ্বলে উঠলেন। বললেন—আমি এমন কোনও অন্যায় করিনি, যার জন্য এমন করে আমাকে অপমান করতে পারেন আপনি। আমি তো ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের ভাল ছাড়া আর কিছু ভাবিনি। ধৃতরাষ্ট্র যা করেন, তাই আমার কাছে ভাল। তাঁর ছেলে দুর্যোধন যা করেন, তাও আমার কাছে সমান ভাল। কারণ তিনি রাজা, তাঁর কথাই আমাকে শুনতে হবে—তথা দুর্যোধনস্যাপি স হি রাজ্যে সমাহিতঃ।

কর্ণের এই যুক্তির মধ্যে দুর্যোধনের জন্য অসাধারণ আন্তরিকতা থাকতে পারে, কিন্তু সে যুক্তির পরিসর বড় সীমিত। কর্ণ একটি পরিবারের সুখ-সুবিধার কথা শুধু ভাবছেন, কর্ণ তাঁর বন্ধুর নিরঙ্কুশ প্রীতির কথা ভাবছেন, কিন্তু ভীষ্ম যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং তাঁর রাজনীতি এবং সমাজনীতির বোধ যতখানি ব্যাপক, তাতে তিনি শুধু একটি পরিবারের বা একজনের ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি নিয়ে ভাবেন না। ভবিষ্যতে তিনি শরশয্যায় শুয়ে যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্মের উপদেশ দেবেন। তখন তিনি বার বার বলবেন—দেখো বাপু! রাজার ব্যক্তিগত সুখসমৃদ্ধি মোটেই বড় কথা নয়। রাজধর্মের মর্মকথা হল মানুষের সার্বিক কল্যাণ, যাকে একবার বলা হয়েছে ‘লোকরক্ষণিকা শক্তি’ আরেকবার বলা হয়েছে ‘রাজনীতি জগদ্ধাত্রী’। অতএব রাজনীতির ক্ষেত্রে এমন নিয়ম অনুসরণ করতে হবে, যা সকলের মঙ্গল করে। এই মঙ্গলের জন্য সবচেয়ে বেশি যেটা প্রয়োজন, সেটা হল যুদ্ধ হতে না দেওয়া। সেটা যদি ভাল কথায় না হয়, তা হলে অন্যতর পক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেও যদি এক পক্ষ যুদ্ধ থামায় তবে

সেই চেষ্টাই করবেন ভীষ্ম। সেই কারণেই তিনি অর্জুনের অস্ত্রনৈপুণ্য এবং কৃষ্ণের বুদ্ধিমত্তার কথা বলে সমগ্র কৌরবপক্ষকে মানসিকভাবে হীনবল করতে চেয়েছেন।

ভীষ্ম এবার কর্ণকে সোজাসুজি আমল না দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—চিরটা কাল এই কর্ণ বলে এল—সমস্ত পাণ্ডবদের আমি একা মারব—হন্তাহং পাণ্ডবানিতি। কিন্তু আমি সোজা কথা বলছি। যুদ্ধ লাগলে এই কর্ণ পাণ্ডবদের সামনে দাঁড়াতেই পারবে না। তুমি জেনে রেখো ধৃতরাষ্ট্র! কুরুদের যত অন্যায়-অমঙ্গল সব এই সারথির ব্যাটার কাজ—তদস্য কর্ম জানীহি সুতপুত্রস্য দুর্মতেঃ। আর এমনই কপাল যে, তোমার ছেলে দুর্যোধন সব সময়ই কর্ণের কথায় নাচে এবং পাণ্ডবদের প্রতি অন্যায়গুলোও সে করেছে এরই কথায়। পাণ্ডবদের একেক জন বিশেষ বিশেষ সময়ে যে ক্ষমতা দেখিয়েছে, তার একটাও কি এই কর্ণ দেখাতে পেরেছে। বিরাটরাজার সঙ্গে যুদ্ধ হল, কী করতে পারল ও—কিমনেন তদা কৃতম্। অর্জুন সবাইকে পরাজিত করে ক্ষত্রিয়ের মাথার পাগড়ি পর্যন্ত খুলে নিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করো তো, তখন কি কর্ণ এ দেশে ছিল না—প্রমথ্য চাচ্ছিনদ্ বাসঃ কিময়ং প্রোষিতস্তদা। পাণ্ডবদের বনবাসের সময় তাদের দুঃখ দিতে গেল এই দুর্যোধন-কর্ণরা। গন্ধর্বদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ লাগল, তোমার ছেলেকে ধরে নিয়ে গেল গন্ধর্বরা। তখন এই সারথির পো কোথায় লুকিয়ে ছিল? সে তো পালিয়ে বেঁচেছিল, অথচ এখন সে কেমন জ্ঞান দিচ্ছে, কেমন ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছে, দেখ—ক্ব তদা সুতপুত্রো'ভূদ্ য ইদানীং বৃষায়তে।

ভীষ্ম নানা উদাহরণ দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝিয়ে দিলেন যে, কর্ণের কথাগুলি বাগাড়ম্বরমাত্র, পাণ্ডবদের মারবার কথাটা কর্ণের মুখে নেহাতই মিথ্যা অহংকার। ভীষ্মের কথা সম্পূর্ণ সমর্থন করলেন দ্রোণাচার্য। যে পক্ষে অর্জুনের মতো মহাবীর আছেন, সেই কঠিন পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধবিলাস যে ঠিক হবে না, সে বিষয়ে একেবারে পরিষ্কার মতামত ব্যক্ত করলেন দ্রোণাচার্য। অন্য কোনও সময় হলে ধৃতরাষ্ট্র হয়তো দু-বার ভাবতেন, হয়তো ভীষ্মের কথা আরও একটু গভীরভাবে ভাবতেন তিনি, কিন্তু এ এমন এক সময়, যখন দুর্যোধনের স্বার্থ সম্পূর্ণ সিদ্ধ হওয়ার সময় এসেছে, পাণ্ডবদের প্রতিরোধ করার মতো শক্তি এবং বলও তাঁর করতলগত—অন্তত ধৃতরাষ্ট্র তাই ভাবছেন। অতএব যুদ্ধ নয় কেন? গণতন্ত্রে যে দল সরকার গঠন করে, সেই শাসক দল যেমন বাড়তি কিছু সুবিধা পায়, তেমনই তেরো বচ্ছর পাণ্ডবদের অনুপস্থিতিতে রাজ্য শাসন করে ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনেরা ভাবছেন—হৃতবল ঐশ্বর্যহীন পাণ্ডবরা কিছুতেই রাজনৈতিকভাবে এবং সামরিক শক্তিতে তাঁদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবেন না।

কিন্তু ঠিক এই পরিস্থিতিতেই ভীষ্মের পরামর্শ ছিল গুরুতর। তিনি শুধু কৃষ্ণ এবং অর্জুনের কথা উল্লেখ করে বুদ্ধি এবং বলের সমীকরণের কথা বলেছেন। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের স্বার্থ স্মরণ করে ভীষ্মকে একটুও আমল না দিয়ে পাণ্ডবদের কাছ থেকে ফিরে আসা সঞ্জয়কেও অন্যান্য প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলেন। কুরুসভার আলোচনাচক্রে যোগ দিতে আসা অন্যান্য কুরুপ্রধান তথা রাজন্যবর্গেরা যখন দেখলেন যে, ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের কথার কোনও মূল্যই দিলেন না—ভীষ্মদ্রোণৌ যদা রাজা ন সম্যগনুভাষতে—তখন তাঁরা নিজেদের জীবনের আশা ছেড়ে দিলেন। দুর্যোধনের কারণে যুদ্ধ করতেই হবে তাঁদের, কিন্তু মহাবীর অর্জুনের মুখোমুখি হওয়াটা যে তাঁদের জীবনের ওপর দিয়ে যাবে এটা তাঁরা তখনই বুঝে ফেললেন—তদৈব কুরবঃ সর্বে নিরাশা জীবিতে'ভবন্।

ভীষ্ম-দ্রোণকে একটুও আমল না দিয়ে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের কথা শুনতে লাগলেন বটে, কিন্তু সঞ্জয়ও তাঁকে আশ্বস্ত করতে পারলেন না। তিনি যেভাবে পাণ্ডবদের রাজনৈতিক স্থিতি ব্যাখ্যা করলেন, তাতে ধৃতরাষ্ট্রের মনে ভয়ের সঞ্চার হল। তিনি যুদ্ধে বিরত হতে চাইলেন। কিন্তু যুদ্ধের উন্মাদনা এমনই এক বিকৃত বস্তু যে, বিরাম চাইলেই তা থেকে বিরত হওয়া যায় না। দুর্যোধন তাঁকে নিজপক্ষের শক্তি সামর্থ্য বুঝিয়ে আবারও জাগিয়ে তুললেন। সবচেয়ে

আশ্চর্যের কথা হল—যে ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধবিরতির উপদেশ দিচ্ছিলেন, দুর্যোধন তাঁরই কথা বলে ধৃতরাষ্ট্রকে উত্তেজিত করলেন। দুর্যোধন বললেন—আমরা প্রত্যেকে একাই আমাদের শত্রু-নিধনে সমর্থ। একবার এসেই দেখুক না যুদ্ধভূমিতে। বাণ মেরে পাণ্ডবদের সমস্ত দর্প চূর্ণ করে দেব এক নিমেষে—আগচ্ছন্তু বিনেষ্যামো দর্পমেষাং শিতৈঃ শরৈঃ। দুর্যোধন এবার ভীষ্মের উল্লেখ করে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—আপনি এই ভীষ্মের দিকেই তাকিয়ে দেখুন না। সেকালে পিতা শান্তনু মারা যাবার পর তিনি একা সমস্ত রাজাকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিলেন— পুরৈকেন হি ভীষ্মেণ বিজিতাঃ সর্বপার্থিবাঃ। সমস্ত রাজমণ্ডল তখন দেবব্রত ভীষ্মের ভয়ে তাঁকেই মেনে চলতেন সবসময়। সেই ভীষ্ম যখন শত্রুজয় করার জন্য যুদ্ধে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন, তখন আপনার আর ভাবনা কী, মহারাজ—স ভীষ্মঃ সুসমর্থো'য়মস্মাভিঃ সহিতো রণে।

কী দুর্ভাগ্য ভীষ্মের। যাঁদের সঙ্গে তিনি যুদ্ধ না করার উপদেশ দিচ্ছেন, তাঁদেরই সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য অন্যতম এক হাতিয়ার খাড়া করা হচ্ছে তাঁকেই। তবু এই মুহূর্তে তাঁর প্রতিবাদ করার উপায় নেই। কারণ যে হস্তিনাপুরে পুরু ভরত কুরু থেকে আরম্ভ করে তাঁর পিতা শান্তনু পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন, যে হস্তিনাপুরের বৃত্তি এবং অন্নপান লাভ করে তিনি জীবনধারণ করছেন, সেই হস্তিনাপুরের রাজা যদি এক প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, তবে তাঁকে যুদ্ধ করতে হবে রাজকর্মচারীর মতো। তাঁর অনিচ্ছা থাকলেও তাঁকে যুদ্ধ করতে হবে। তা ছাড়া এই যুদ্ধের পার্শ্ব-কারণ থাকবে আরও। একটু আগেই সঞ্জয় এসে পাণ্ডবদের মিত্রশক্তি মেরুকরণ শুনিয়েছেন। সেখানে কাশীর রাজা আছেন, পাঞ্চালরা আছেন এবং আছেন শাল্ব দেশের আধুনিক রাজারা—শাল্বেয়াঃ শূরসেনাশ্চ পাঞ্চালাশ্চ সকেকয়াঃ। এঁদের ব্যক্তিগত বিপক্ষতা এখন রাজনৈতিক শত্রুতার রূপ নিয়েছে। এঁরা যে পক্ষে থাকবেন, ভীষ্ম তাঁদের সপক্ষে থাকবেন না। দুর্যোধন এখন সেই সুযোগ নিচ্ছেন এবং তা নিচ্ছেন এতটাই যে, তার জন্য তিনি পাণ্ডবদের বিপক্ষে দাঁড় করাবেন ভীষ্মকে। কী করবেন ভীষ্ম! তিনি এমনটি তাঁর দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি যে, রাজনৈতিক কারণে তাঁকে শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রিয় নাতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। দুর্যোধন রীতিমতো নির্ভর করছেন ভীষ্মের ওপর এবং ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি বলেও দিলেন—পিতা শান্তনুর বরে ভীষ্ম ইচ্ছামৃত্যু। তাঁকে মারবার মতো মানুষ এখনও জন্মায়নি—ন হন্তা বিদ্যতে চাপি রাজন্ ভীষ্মস্য কশ্চন। কাজেই আপনি নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন, পিতা!

দুর্যোধন অনেক বোঝালেও স্বপক্ষের জয়-পরাজয় নিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের দ্বিধা ছিল যথেষ্ট। বার বার তিনি সঞ্জয়ের কাছ থেকে বিপক্ষ শক্তির ক্ষমতা-অক্ষমতার হিসেব জেনে নিচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি হতাশও হচ্ছিলেন এবং যথারীতি দুর্যোধনকে তাঁর স্বার্থান্বেষিতার জন্য দোষ দিচ্ছিলেন। আবার পরক্ষণেই দুর্যোধন তাঁকে কুরুপ্রধানদের শক্তি-স্থিতির বিষয়ে নিশ্চিন্ত করলে ধৃতরাষ্ট্র মৌন সম্মতিতে কৌরবপক্ষের ভবিষ্যৎ জয় সম্ভাবিত করেছেন মনে মনে।

এদিকে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। দ্রুপদের পুরোহিত যে প্রস্তাব নিয়ে কুরুসভায় এসেছিলেন অথবা মহামতি সঞ্জয় যে ভাবনা নিয়ে এসেছিলেন তা ব্যর্থ হয়ে গেল প্রধানত দুর্যোধনের সাহংকার আত্মতুষ্টিতে। এমনকী শান্তির যে বার্তা নিয়ে কৃষ্ণ এসেছিলেন হস্তিনাপুরে তাও প্রায় ব্যর্থ হতে চলল দুর্যোধনের প্রত্যক্ষ প্রত্যাখ্যানে। ধৃতরাষ্ট্র বেশ বিচলিতই হয়ে পড়েছিলেন। বিশেষত কৃষ্ণের কোমল-কবোষ্ণ এবং শেষপর্যন্ত অবশ্যই উষ্ণ বাক্যপরম্পরায় কৌরসভা যখন বেশ উত্তাল হয়ে উঠল, তখন ধৃতরাষ্ট্রও পুত্রকে শাসন করার চেষ্টা করেছিলেন যথেষ্ট। দুর্যোধন তাঁর প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। কৃষ্ণকে আবারও বক্তৃতা দিতে হল। তবে তারমধ্যে এবার শান্তি-ঘোষণার সঙ্গে পাণ্ডব পক্ষের শক্তি-গরিমাও প্রকটভাবে প্রকাশিত হল। শেষ চেষ্টা হিসেবে ভীষ্ম আবারও কথা বলতে বাধ্য

হলেন।

অবশ্য ভীষ্মের এই কথার মধ্যে নতুনত্ব কিছু ছিল না। হয়তো পিতৃবংশের দুই ঘনিষ্ঠ ধারার মধ্যে এই বিরোধ তাঁকে ক্লান্ত করে তুলেছিল। অতএব কোনও সালংকার নীতিঘন ভাষণ নয়, ভীষ্ম খুব সহজভাবে দুর্যোধনকে কৃষ্ণের বক্তব্য মেনে নিতে বলেছেন। ভারতবর্ষের তদানীন্তন রাজনীতিতে কৃষ্ণ যে এক ভয়ংকর রকমের 'ফ্যাক্টর' সেটা ভীষ্ম অনেক আগেই বুঝেছিলেন। সেই কৃষ্ণ আজকে নিজে যখন দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের প্রাপ্য ফিরিয়ে দিতে বলছেন, সেটা যে যুদ্ধপূর্ব রাজনীতির শেষ অধ্যায়, এটা বুঝেই ভীষ্ম দুর্যোধনকে কৃষ্ণের কথা সর্বাংশে মেনে নিতে বলেছেন। শুধু তাই নয়, এক সময় তিনি বেশ ক্রুদ্ধ হয়েই ঘোষণা করেছেন যে,—দেখো বাপু! কৃষ্ণের কথা না শুনে তুমি তোমার পিতার জীবিত অবস্থাতেই এই দীপ্তিমতী রাজলক্ষ্মীর করুণা থেকে বঞ্চিত হবে। তোমার অমাত্য-বন্ধু এবং পরিজনেরা তাঁদের জীবনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন তোমারই কারণে। আমি বার বার তোমায় বলেছি, দুর্যোধন! তুমি কৃষ্ণের কথা অতিক্রম করে নিজের বাবা-মাকে শোকসাগরে ডুবিয়ে দিয়ো না—মাতরং পিতরঞ্চৈব মা মজ্জীঃ শোকসাগরে।

দুর্যোধন রাগে ফুঁসছিলেন—অমর্ষবশমাপন্নম্। যে ভীষণ রেগে আছে, তাকে শান্তির কথা শোনালে তার আরও রাগ হয়। অথচ পরিস্থিতি এমন যে, দুর্যোধনকে না থামালেই নয়। কাজেই ভীষ্মের কথা সমর্থন করে অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য আরও স্পষ্ট ভাষায় দুর্যোধনকে বোঝালেন যে—বাছা! যাদের কথায় তুমি আজকে যুদ্ধের জন্য নাচছ, তাদের দ্বারা কাজের কাজ কিচ্ছু হবে না—নৈতে কৃত্যায় কর্হিচিৎ। কৃষ্ণ এবং ভীষ্ম তোমাকে যে অনুরোধ করছেন, তা যদি না শোন, তবে ভবিষ্যতে আপশোস করে মরতে হবে তোমাকে—যদি নাদাস্যসে তাত পশ্চাত্তপ্স্যসি ভারত।

এই উত্তাল কৌরবসভায় সর্বশেষ ভাষণ দিলেন বিদুর এবং শেষপর্যন্ত ধৃতরাষ্ট্রও খুব আন্তরিকভাবেই দুর্যোধনকে শান্তির প্রস্তাব মেনে নিতে বললেন। ভীষ্ম দেখলেন, এই সুযোগ, ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও দুর্যোধনকে আবার বোঝাতে বসলেন। ভীষ্ম বললেন—যতক্ষণ কৃষ্ণ এবং অর্জুনকে একসঙ্গে একরথে দেখা যাচ্ছে না, যতক্ষণ অর্জুনের গাণ্ডীব যুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছে না, ততক্ষণ পর্যন্তই তোমার এই শত্রুতা বন্ধ করো, দুর্যোধন! যতক্ষণে না যুধিষ্ঠির তোমার সৈন্যবাহিনীর দিকে ক্রুদ্ধ চক্ষুতে তাকাচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার শত্রুতা বন্ধ থাকুক, দুর্যোধন— তাবচ্ছাম্যতু বৈশসম্। যতক্ষণ না ভীম তাঁর বীরঘাতিনী গদা দিয়ে তোমার মদমত্ত হস্তিগুলির মাথায় বাড়ি মারেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার শত্রুতা বন্ধ থাকুক, দুর্যোধন—তাবচ্ছামতু বৈশসম্। একই কথা ধ্রুবপদে বেঁধে নিয়ে ভীষ্ম অনেকবার অনেকভাবে দুর্যোধনকে ভয় দেখালেন। তারপর একমুহূর্তে পদ-পদার্থ পরিবর্তন করে মনের ভাব সরসতায় সিক্ত করে ভীষ্ম বললেন—তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর অভিবাদনরত যুধিষ্ঠিরকে তুমি হাতে ধরে নিয়ে এসো এই রাজপ্রাসাদে—পাণিভ্যাং প্রতিগৃহ্ণাতু ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ। এতকাল যত বিবাদ-বিরোধ ঘটেছে, সব শান্ত হোক, তুমি যুধিষ্ঠিরের কাঁধে বন্ধুত্বের হাতখানি রাখো। এতদিনের কষ্টশ্রান্ত শরীর নিয়ে যুধিষ্ঠির বসে থাকুন, তুমি তোমার নিজের হাতে তাঁর পৃষ্ঠদেশ মুছে দিয়ে সব ক্লান্তি দূর করে দাও যুধিষ্ঠিরের—উপবিষ্টস্য পৃষ্ঠং তে পাণিনা পরিমার্জতু। মহাবীর ভীমকে আলিঙ্গন দিয়ে বুকে টেনে নাও একবার। অর্জুন এবং নকুল-সহদেবের মস্তক আঘ্রাণ করে সস্নেহে একবার তাঁদের সঙ্গে কথা বল—মূর্ধ্নি তান্ সমুপাঘ্রায় প্রেম্নাভিবদ পার্থিব। রাজধানীর সমস্ত রাজন্যবর্গের সামনে এই ঘোষণা করে দাও যে, সবাই একসঙ্গে ভাই ভাই মিলেই সমস্ত ভোগ লাভ করো এবং শান্তিতে থাকো—পৃথিবী ভ্রাতৃভাবেন ভুজ্যতাং বিজ্বরো ভব।

ভীষ্মের এই মর্মস্পর্শী বক্তৃতার কোনও ফল হল না। কৃষ্ণের শান্তিপ্রস্তাব সম্পূর্ণ

প্রত্যাখ্যান করে দুর্যোধন বললেন—ভুল করেই হোক অথবা ভয়েই হোক, আমার বালক বয়সে পাণ্ডবদের যে রাজ্যাংশ দেওয়া হয়েছিল, এখন আজ আর তা ফেরত দেব না, অন্তত আমি বেঁচে থাকতে তা ফেরত দেব না—ন স লভ্যঃ পুনর্জাতু ময়ি জীবতি কেশব। দুর্যোধনের মুখে এই চরম কথা শুনে কৃষ্ণ অবশ্যই তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। অর্থাৎ যুদ্ধ হবে যখন, যুদ্ধ হোক। তবুও যুদ্ধ হলে যে কিছুতেই শান্তি হবে না দুর্যোধনের, সেটাও কৃষ্ণ বার বার বলে চললেন। দুর্যোধনের ভাই দুঃশাসন এতক্ষণ চুপ করেই ছিলেন, কিন্তু তাঁর দাদা খুব অপমানিত হয়েছেন ভেবে একটু ব্যঙ্গ করে বললেন—আজকে যদি তুমি সন্ধি না কর দাদা, তা হলে এই ভীষ্ম দ্রোণ আর তোমার শান্তিকামী বাবামশাই আমাদের সবাইকে বেঁধে পাণ্ডবদের হাতে তুলে দেবেন—পাণ্ডবেভ্যঃ প্রদাস্যন্তি ভীষ্মো দ্রোণঃ পিতা চ তে।

ভাইয়ের কথা শুনে রাগে ফুঁসতে লাগলেন দুর্যোধন। তিনি আর সভায় বসে থাকতে পারলেন না। সভা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেলেন। তাঁর পিছন পিছন গেলেন তাঁর ভাইয়েরা এবং কর্ণ। সভায় উপস্থিত কুরুপ্রধানদের উপেক্ষা করে এইভাবে বেরিয়ে যাওয়ার এমন উদাহরণ বুঝি কৌরবদের ইতিহাসে আর একটাও নেই। সভায় উপস্থিত মান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে মতান্তর হতেই পারে, কিন্তু শুধুমাত্র নিজের অহংকার প্রকট করে কাউকে কিছু সম্ভাষণ না করে এইভাবে চলে যাওয়ার মতো এমন অশিষ্টতা কৌরববংশে কেউ বোধহয় করেননি। অন্তত পিতা শান্তনুর সময় থেকে যতই রাজনৈতিক সংকট এসে থাকুক, এতটা বয়সেও ভীষ্ম কখনও এমন অশিষ্টতা দেখেননি। অন্যখানে অন্য পরিস্থিতিতে যেমনটিই ঘটুক, সভার একটা মর্যাদা আছে। কুরুবৃদ্ধ এবং অন্য প্রধান পুরুষদের সামনে কুরুসভাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে দুর্যোধন যখন চলে গেলেন—অশিষ্টবদ্‌ অমর্যাদো মানী মান্যাবমানিতা—ভীষ্ম তখন কিছুতেই আর সহ্য করতে পারলেন না। এতকাল তিনি রাজনীতি করেছেন, পিতা শান্তনুর সময় থেকে পাণ্ডুর সিংহাসনে বসা পর্যন্ত কুরুরাজ্য চলত প্রায় তারই নির্দেশমতো। অথচ আজ এটা কেমন হল! রাজনীতির মধ্যে এমন অশিষ্ট আচরণ তো তিনি কখনও দেখেননি।

দুর্যোধনকে ওইভাবে চলে যেতে দেখে ভীষ্ম বলে উঠলেন—ন্যায়নীতি, ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির কথা একটুও চিন্তা না করে যারা এইভাবে যুদ্ধ যুদ্ধ করে নাচে, বিপদে পড়লে নিন্দুকরা তাদের দেখে হাসবে—হসন্তি ব্যসনে তস্য দুর্হৃদো ন চিরাদিব। রাজনীতিতে ‘উপায়’ মেনে চলতে হয়। কিন্তু রাজপুত্র হয়েও ধৃতরাষ্ট্রের এই অসভ্য ছেলেটা রাজনীতির পাঠ কিছুই জানে না—দুরাত্মা রাজপুত্রো’য়ং ধার্তরাষ্ট্রো ’নুপায়কৃৎ।

ভবিষ্যতে শরশয্যায় শুয়ে ভীষ্ম রাজনীতির পাঠ শেখাবেন যুধিষ্ঠিরকে। সেখানে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড ইত্যাদি চার উপায়ের কথা বলা হবে। ভীষ্ম জানেন—মধুর কথা বলে সাম-নীতিতে যেসব রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হয়, সেই নীতিতে অন্তত পাণ্ডবদের সমস্যা আর মিটবে না, কারণ এতকাল অনেক মধুর ব্যবহার করেও তার কোনও ফল পাননি পাণ্ডবরা। সমস্যা সমাধানের জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে দিয়ে খাণ্ডবপ্রস্থে পাণ্ডবদের যতটুকু ভূমি দান করা হয়েছিল, সেই দান-নীতির প্রস্তাবনা করেছিলেন ভীষ্ম নিজে। কিন্তু দুর্যোধন কপট পাশা খেলে সে নীতির ব্যর্থতা এনে দিয়েছেন। ভেদ-নীতি পাণ্ডবদের প্রয়োগ করতে হয়নি। সাধারণ ভেদ-নীতিতে মন্ত্রীর সঙ্গে রাজার, রাজার সঙ্গে প্রজার, প্রজাদের সঙ্গে অমাত্যের ভেদ সৃষ্টি করে সফল হয় শত্রুপক্ষ। কিন্তু সেই ভেদ-নীতি পাণ্ডবদের গ্রহণ করতেই হয়নি। তাঁদের সততা, সহিষ্ণুতা এবং শম-দমের গুণে আপনিই কুরুবৃদ্ধরা তাঁদের পক্ষপাতী হয়ে রয়েছেন। অতএব পাণ্ডবদের দিক থেকে এখন দণ্ড-নীতির সময় এসেছে।

পণ্ডিতজনেরা বলেছেন—যদি সাম দান ভেদ—এই তিন উপায়ে কাজ না হয়, তবে দণ্ড প্রয়োগ করবে। কিন্তু সেই চতুর্থ উপায় হল চরম। অতএব সেই চরম উপায় অবলম্বন করার

আগে যে শেষ ভাবনা ভাবতে এসেছিলেন কৃষ্ণ, সেখানে অন্যভাবে ভাবা উচিত ছিল দুর্যোধনের। রাজা হবার আগে রাজপুত্রদের শিখতে হয় যে, কীভাবে চতুরুপায় প্রয়োগ করতে হবে কার্যকালে। পাণ্ডবরা তা সঠিকভাবেই প্রয়োগ করছেন। কিন্তু দুর্যোধন উপায়জ্ঞ নন বলেই সেটা ধরতে পারছেন না। কৃষ্ণ এবং অন্যান্য কুরুবৃদ্ধদের কথায় রাগ করে দুর্যোধন যেভাবে সভা ত্যাগ করলেন, তাতে কুরুবৃদ্ধরা আপনিই দুর্যোধনের প্রতি বিরাগগ্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং এটাই সহিষ্ণু পাণ্ডবদের ভেদ-প্রয়োগের উদাহরণ। উন্মুক্ত সভার মধ্যে ভীষ্ম যখনই দুর্যোধনকে নিন্দা করলেন, তখনই বুঝতে হবে দুর্যোধন যতই বলুন—ভীষ্ম দ্রোণকে যুদ্ধে পাণ্ডবরা কেউ পরাজিত করতে পারবে না—দুর্যোধনের এই যুদ্ধ-গর্বের মধ্যে ফাঁকি রয়ে গেল। ভীষ্ম-দ্রোণরা রাজার অনুশাসনে কৌরবপক্ষ অবলম্বন করবেন ঠিকই, কিন্তু আন্তরিকভাবে আত্যন্তিক ক্রোধ নিয়ে তাঁরা সতত বিনীত পাণ্ডবদের সঙ্গে লড়াই করতে পারবেন না।

ভীষ্মের মতে দুর্যোধন 'উপায়জ্ঞ' নন বলেই সভা ত্যাগ করেছেন। কিন্তু ভীষ্মের এই প্রকট ক্রোধকে আপন ভেদনীতির মাধ্যম করে তুললেন 'উপায়জ্ঞ' কৃষ্ণ। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ভীষ্মকে বললেন—সমস্ত কুরুবৃদ্ধদের যেভাবে অপমান করল দুর্যোধন, তা অকল্পনীয়—সর্বেষাং কুরুবৃদ্ধানাং মহান্ অয়ম্ অতিক্রমঃ। ভীষ্ম দ্রোণদের ক্রোধ দেখে প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে ডেকে এনেছেন রাজসভায়, যাতে জননী হিসেবে তিনি অন্তত পুত্রকে শান্ত করতে পারেন। আশ্চর্য ব্যাপার, স্বয়ং গান্ধারী পর্যন্ত এখানে সেই উপায়-প্রয়োগের উৎকর্ষের কথা বলেছেন। বলেছেন—যেখানে সাম দান আর ভেদনীতিতে কাজ হয়ে যায় সেখানে দুর্যোধন যে যুদ্ধরূপ দণ্ডের কথা ভাবছে, সেটা একেবারেই ঠিক নয়—দণ্ডং কস্তত্র পাতয়েৎ।

গান্ধারী পুত্রকে পূর্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন—পাণ্ডবদের সঙ্গে তোমার প্রত্যক্ষ বিবাদ যাতে না বাধে সেইজন্যই ভীষ্ম এবং তোমার পিতা পাণ্ডবদের খানিকটা রাজ্য ছেড়ে দিয়েছিলেন—ভীষ্মেণ হি মহাপ্রাজ্ঞ... ভেদাদ্ ভীতৈররিন্দম। কিন্তু আজকে সেই রাজ্যদানের সুফল তুমি হেলায় নষ্ট করেছ। গান্ধারী এবার ভীষ্ম দ্রোণের মনের কথাটাও পরিষ্কার করে দিয়ে বললেন—তুমি যে ভাবছ বাছা, ভীষ্ম অথবা দ্রোণ তোমার হয়ে খুব যুদ্ধ করবেন—যচ্চ ত্বং মনসে মূঢ় ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপাদয়ঃ—আমার কিন্তু তা মনে হয় না। পাণ্ডব এবং তোমাদের প্রতি তাঁদের সমান ভাব, সমান সম্বন্ধ। কিন্তু ন্যায় নীতি আর ধর্মের প্রশ্নটাই এখানে বড় হয়ে দাঁড়াবে। ফলে রাজার আশ্রিত বলে তোমাদের জন্য তাঁরা জীবন দিয়ে দেবেন ঠিকই, কিন্তু তবু তাঁরা নীতি ধর্ম জলাঞ্জলি দিয়ে যুধিষ্ঠিরের মুখের দিকে তাকাতে পারবেন না। অতএব ভীষ্ম দ্রোণরা কোনওভাবেই সর্বশক্তি দিয়ে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবেন না—যোৎস্যন্তে সর্বশক্ত্যেতি নৈতদদ্যোপপদ্যতে।

হস্তিনাপুরের সিংহাসনে শুধুমাত্র পিতৃবংশের ধারা রক্ষা করা এবং তাঁদের বিবাদবিসংবাদ বন্ধ করার জন্য ভীষ্ম যে ব্যক্তিগতভাবে কতটা উদ্‌বিগ্ন ছিলেন, তা শুধু এই গান্ধারীর আবেদন শুনে বোঝা যাবে না। মহাভারতের কবিও ভীষ্মের এই আন্তরিকতা বোঝানোর জন্য একটি ভিন্ন কাব্যরীতি গ্রহণ করেছেন। কুরুসভায় কৃষ্ণের দৌত্যকালে ভীষ্ম যে বক্তব্য পেশ করেছিলেন, তার বেশ খানিকটা সেখানে অনুক্ত রেখেছেন মহাভারতের কবি। কিন্তু এরপর কৃষ্ণ যখন বিরাটনগরে পাণ্ডবদের কাছে প্রত্যাবর্তন করে শান্তিসভার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, তখন কিন্তু ভীষ্মের বক্তব্যে আরও কিছু নতুন কথা যুক্ত হয়েছে এবং সেই কথার মধ্যেই পাণ্ডব কৌরবের বিসংবাদ মেটানোর জন্য তাঁর আন্তরিকতাটুকু বোঝা যাবে।

কৃষ্ণ কুরুসভার ক্রিয়াকর্ম নিবেদন করে পাণ্ডবদের বলেছিলেন—আমি যখন কুরুসভায় শান্তির প্রস্তাব করেছিলাম, তখন দুর্যোধন হাঃ হাঃ করে হেসে উঠেছিল—-জহাস

ধৃতরাষ্ট্রজঃ। মহামতি ভীষ্ম কিন্তু এই হাসি সহ্য করতে পারেননি। তিনি বলেছিলেন—দুর্যোধন! শুধু এই বংশের হিতের জন্য তোমাকে দুটো কথা বলি শোনো—কুলার্থে যদ্ ব্রবীমি তে। আমার কথা শুনে তারপর তোমার যেটা ভাল মনে হয় কোরো। ভীষ্ম বলেছিলেন—দেখো বাছা! আমার বাবা ছিলেন মহারাজ শান্তনু। দুনিয়ার সমস্ত লোক তাঁকে মান্য করত। আমি তাঁর একমাত্র ছেলে ছিলাম—তস্যাহমেক এবাসং পুত্রঃ পুত্রবতাম্বরঃ—আমাকে নিয়ে তাঁর গর্বও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু যাই হোক, যে কোনও কারণেই হোক, তাঁর মনে হয়েছিল যে, আরও একটি পুত্র তাঁর প্রয়োজন। পণ্ডিতজনেরা বলেন—এক পুত্র থাকাও যা, পুত্র না থাকাও তাই। আমি আমার পিতার এই ভাবনাটুকু তাঁরই অনুকূলে বুঝেছিলাম। তিনি চেয়েছিলেন যাতে এই সুপ্রসিদ্ধ ভরতবংশ লুপ্ত না হয়ে যায় এবং যাতে এই বংশের যশ ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে—ন চোচ্ছেদং কুলং যায়াদ্ বিস্তীর্যেচ্চ কথং যশঃ। আমি তাঁর সদিচ্ছা বুঝেছিলাম বলেই জননী সত্যবতীকে নিজে রথে করে নিয়ে এসেছিলাম হস্তিনাপুরে। মনে রেখো—আমার পিতা সেদিন দ্বিতীয় সন্তান কামনা করেছিলেন বলে আমি সেই কঠিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, আমি কোনওদিন রাজা হব না এবং চিরকাল আমি ব্রহ্মচারী থাকব—অরাজা চোর্ধ্বরেতাশ্চ যথা সুবিদিতং তব। তোমরা জানো—আমি সেই প্রতিজ্ঞা এখনও পালন করে চলেছি—প্রতিজ্ঞাম্ অনুপালয়ন্।

ভীষ্ম বলতে চাইলেন—এই বৃদ্ধ বয়সে নিশ্চয়ই আর তাঁর বিবাহের বাসনা নেই, কিন্তু যা তিনি পারতেন, সেই রাজা হওয়ার ইচ্ছাও তো কখনও তিনি করেননি। কেন করেননি? সেই পিতা শান্তনুর বংশের প্রতি মমতায়। বিবাদ বাধানোর সুযোগ কিছু কম ছিল না। প্রজাসাধারণ এবং হস্তিনার অমাত্যবর্গ এতটাই তাঁর বশবর্তী ছিলেন যে, তাঁর কনিষ্ঠ ভাই বিচিত্রবীর্য রাজা হবার পরেও যদি তিনি ভাইয়ের সঙ্গে রাজ্য নিয়ে বিসংবাদ বাধাতেন, তা হলে তাঁরা সকলে ভীষ্মের পক্ষেই থাকতেন। এই মুহূর্তে এক গোপন খবর দিয়েছেন ভীষ্ম। বলেছেন—আমি যখন পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত, তখন পরশুরাম যদি কিছু করেন সেই ভয়ে হস্তিনার নাগরিক প্রজারা বিচিত্রবীর্যকে দূরে এক জায়গায় রেখে এসেছিলেন—স হি রামভয়াদেভি-র্নাগরৈ-র্বিপ্রবাসিতঃ।

ভীষ্ম দুঃখ করে বলেছেন—ওই দূরে থাকাটাই বিচিত্রবীর্যের কাল হল। সে অতিরিক্ত স্ত্রী ব্যসনী হবার ফলে যক্ষ্মা ধরিয়ে ফেলল এবং শেষপর্যন্ত মারা গেল। সেই সময় অরাজক হস্তিনাতে রাজা হবার জন্য প্রজারা আমার কাছে কান্নাকাটি করেছে। তারা বলেছে—বাঁচান আপনার প্রজাদের—তাঃ পরিত্রাতুম্ অর্হসি। আপনি বেঁচে থাকতে এই রাষ্ট্র যেন নষ্ট না হয়। সকলের মঙ্গলের জন্যই আপনি আমাদের রাজা হোন—রাজা ভব ভবায় নঃ। সেই কালেও আমি যে সমস্ত প্রজাদের ক্রন্দন, আবেদন, নিবেদন এবং সমর্থন উপেক্ষা করেছি—নৈবাক্ষুভ্যত মে মনঃ—তা শুধু আমার পূর্বপ্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য। আমার মাতা সত্যবতী, অমাত্য পুরোহিত এঁরাও সকলে একযোগে হস্তিনার প্রজাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন রাজা হবার জন্য। আমি তাঁদের সবার সামনে হাত জোড় করে আমার পিতার সম্মানের কথা নিবেদন করেছিলাম। বলেছিলাম—আমার পিতার বংশধারার মধ্যে যাতে কোনও বিবাদ-বিসংবাদ না হয় তার জন্যই আমি রাজা হইনি এবং তার জন্যই আমি এখনও অবিবাহিত রয়েছি।

পুরাতন কথা পুনরাবৃত্তি করে ভীষ্ম বার বার বোঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি শুধু জ্ঞাতিবিরোধের ভয়েই তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করে চলেছেন। তিনি নিজে রাজা না হয়ে বিচিত্রবীর্যের দুই পত্নীর গর্ভে কুরুবংশের ধারা রক্ষা করেছেন ব্যাসের আনুকূল্যে। ভীষ্ম দুর্যোধনকে বলেছেন—সেই বংশ রক্ষা হল। ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডু জন্মালেন। অন্ধ বলে ধৃতরাষ্ট্র রাজা হতে পারেননি, রাজা হলেন পাণ্ডু। তোমরা সকলে তাঁদের ছেলেপিলে, তাঁদেরই উত্তরাধিকার বহন করছ তোমরা। কিন্তু যে বংশের সুরক্ষার জন্য আমি এতখানি

করতে পেরেছি, সেই বংশের উত্তরাধিকারী হয়ে তোমরা এইভাবে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি করে ম'রো না। তোমরা পাণ্ডবদের প্রাপ্য অর্ধ রাজ্য দিয়ে দাও—মা তাত কলহং কার্ষী রাজ্যস্যার্ধং প্রদীয়তাম্। ভীষ্ম একটা কথা বেশ জোর দিয়ে বললেন। বললেন—আমিই এই বংশের সবচেয়ে যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলাম এবং আমি বেঁচে থাকতে অন্য কোনও পুরুষ এই হস্তিনার শাসন চালাতে পারত না—ময়ি জীবতি রাজ্যং কঃ সম্প্রশাসেৎ পুমানিহ। কিন্তু জ্ঞাতিবিরোধ থেকে সকলকে বাঁচানোর জন্য আমি যে চেষ্টা করেছিলাম, সেটা বৃথা হতে দিয়ো না, দুর্যোধন! আমার কথা অমান্য কোরো না, আমি সবার ভাল চাই, আমি শান্তি চাই—মাবমংস্থা বচো মহ্যং শমমিচ্ছামি বঃ সদা।

বিরাটরাজ্যে পাণ্ডবদের সভায় বসে যুদ্ধ থামানোর জন্য মহামতি ভীষ্মের আন্তরিকতা ব্যাখ্যা করেছিলেন কৃষ্ণ। কিন্তু আমরা জানি—এই আন্তরিকতায় দুর্যোধনের কিছু হয়নি। তিনি যুদ্ধ করবেন বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, অতএব তাঁর ইচ্ছাতেই যুদ্ধের উদ্যোগ শুরু হল। যুদ্ধ যখন আরম্ভ হবেই, তখন এই ভীষ্মকে আমরা এক অন্য মূর্তিতে দেখি। দূর্যোধনকে তিনি বলেছিলেন—আমি তোমাদের এবং পাণ্ডবদের কখনও কোনও পৃথক পক্ষপাতে বিচার করি না—ন বিশেষো'স্তি মে পুত্র ত্বয়ি তেষু চ পার্থিব। ভীষ্মের এই কথাটা যে কত সত্যি, তা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধপূর্ব সময়ে অদ্ভুতভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। একটু আগেই ভীষ্মের মুখে যেসব বক্তব্য শুনেছি, তাতে এমন হতেই পারত যে—দুর্যোধন যেহেতু ভীষ্মের কোনও কথাই শোনেননি, অতএব তিনিও তাঁকে কোনওভাবে এই যুদ্ধে সাহায্য করবেন না। কিন্তু না, ভীষ্ম এই মানসিকতার মানুষ নন। যে মুহূর্তে তিনি পিতার কাছে প্রতিজ্ঞা করে রাজত্ব ছেড়েছেন, সেই মুহূর্ত থেকেই তিনি কুরুবংশের সবচেয়ে বিশ্বস্ত রাজকর্মচারীতে পরিণত। তিনি পরামর্শ দিয়েছেন, অনুরোধ করেছেন, ভর্ৎসনা করেছেন, কিন্তু কোনও দিন হস্তিনার সিংহাসনে বসা রাজার অবমাননা করেননি। বিশেষত যুদ্ধ যখন লাগবে বলেই স্থির হল, তখন পৌত্র দুর্যোধনের সঙ্গে তাঁর স্নেহ-ব্যবহার লক্ষ করার মতো।

দুর্যোধন তাঁর সমস্ত অনুগামী রাজা মহারাজাদের নিয়ে যুদ্ধের ঠিক আগে ভীষ্মের কাছে এসে হাত জোড় করে বললেন—যুদ্ধে যদি ঠিকঠাক সেনাপতি না থাকে, তবে পিঁপড়ের সারির মতো সমস্ত সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হয়ে যায়! দুই পক্ষে দু'জন সেনাপতি থাকলেও তাঁদের দু'জনের বুদ্ধিও সমান হয় না, বিক্রমও সমান হয় না—ন হি জাতু দ্বয়োর্বুদ্ধিঃ সমা ভবতি ভারত। আমি মনে করি—পর্বতের মধ্যে যেমন সুমেরু, পক্ষীদের মধ্যে যেমন গরুড়, দেবতাদের মধ্যে যেমন কার্তিক, আমাদের মধ্যে আপনিও তেমনই। অসুরগুরু শুক্রাচার্যের কূটনৈতিক বুদ্ধি যেমন প্রখর, আপনার বুদ্ধিও তেমনই। সবচেয়ে বড় কথা, আপনি সবসময় আমার ভাল চান—ভবানুশনসা তুল্যো হিতৈষী চ সদা মম। যে কেউ কোনওভাবে আপনাকে যুদ্ধেও হারাতে পারবে না। সবদিক থেকে বিচার করে বলি—আপনিই আমাদের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি হবেন—স নঃ সেনাপতি'র্ভব।

ভীষ্ম বলতে পারতেন—অনেক হিতের কথা বলেছি তোমায়, আর তোমার হিত ভাবার দরকার নেই আমার। কিন্তু না, ভীষ্ম জানেন—এখন যুদ্ধ লাগবে। দুর্যোধনের একগুঁয়েমিতেই যুদ্ধ লাগবে। কিন্তু এইসময়ে হস্তিনার সিংহাসনে আসীন এই যুবককে তাঁর প্রাপ্য সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। তিনি কুরুবংশের প্রবীণতম বিশ্বস্ততম কর্মচারী। কুরুবংশের এক অধস্তন রাজা বিপন্ন হয়ে তাঁকে সেনাপতি নির্বাচিত করতে চাইছে। সে বলেছে—কার্তিক যেমন দেবতাদের সেনাপতি হয়ে আগে আগে যান, তেমনই আপনি চলবেন সবার আগে, আর আমরা সমস্ত কৌরববাহিনী নিয়ে আপনার পিছন পিছন যাব, ঠিক যেমন ষাঁড় চলতে থাকলে বাছুরগুলো তার পিছন পিছন চলে, তেমনই আমরা আপনার নাতিরা চলব আপনার পিছন পিছন—বয়ং ত্বামনুযাস্যামঃ সৌরভেয়া ইবর্ষভম্।

কোনও দিন কোনওভাবে দুর্যোধন বোধহয় এইভাবে ভীষ্মকে অনুমোদন করতে চাননি। অথচ আজকে যুদ্ধোদ্যোগের মুহূর্তে দুর্যোধনের এই অনুগমন-স্পৃহা দেখে অবাকও হন না ভীষ্ম। তিনি জানেন—তাঁকে যুদ্ধ করতে হবে এবং পাণ্ডবদের বিরুদ্ধেই করতে হবে। তা ছাড়া দুর্যোধন যে এইভাবে আত্মসমর্পণ করছেন, তাতে এই বৃদ্ধ ঠাকুরদাদাটির একটু কৌতুকবোধ অবশ্যই হয়। রাজবংশের প্রতি মর্যাদা এবং কৌতুক, এই দুয়ে মিলে ভীষ্মের প্রতিক্রিয়া যেভাবে হল, তাতে আপাতত দুর্যোধনের খুশি হবার কারণ ঘটল।

দুর্যোধনকে প্রত্যাখ্যান করলেন না ভীষ্ম। বললেন—যেমনটি তুমি চাও, দুর্যোধন! তবে আগেই বলেছি—স্নেহ-সম্পর্কে আমার কাছে তোমাদের যেমন মর্যাদা, পাণ্ডবদেরও তেমনই —যথৈব হি ভবন্তো মে তথৈব মম পাণ্ডবাঃ। আমি আগে এও বলেছি যে, যদি যুদ্ধ লাগে তবে যে কোনও যুদ্ধেই আমি তোমার হয়েই যুদ্ধ করব—সংযোদ্ধব্যং তবার্থায় যথা মে সময়ঃ কৃতঃ। দেখো, এ কথা সর্বাংশে সত্যি যে, আমি যদি যুদ্ধ করি, তবে আমার সমান যোদ্ধা এই তিন ভুবনে নেই। তবে এর একমাত্র ব্যতিক্রম মহাবীর অর্জুন। শুধু অস্ত্রচালনার নৈপুণ্যই নয়, তপস্যার দ্বারা সে লাভ করেছে অলৌকিক দিব্য অস্ত্র। সত্যি কথা বলতে কী, আমি এবং অর্জুন এক মুহূর্তেই এই পৃথিবীকে মনুষ্যহীন করে দিতে পারি। দেবতা, অসুর, রাক্ষস —কেউ এঁটে উঠতে পারবে না আমাদের সঙ্গে। অতএব আমার সঙ্গে অর্জুন ছাড়া আর কেউই সমান ক্ষমতায় যুদ্ধ করতে পারবে না—ঋতে তস্মান্নরব্যাঘ্রাৎ কুন্তীপুত্রাদ্ ধনঞ্জয়াৎ।

অর্জুনের যুদ্ধনৈপুণ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পিতামহ ভীষ্ম তাঁর সীমাবদ্ধতার কথাটি জানাচ্ছেন অর্জুনেরই দৃষ্টান্ত দিয়ে। ভীষ্ম বললেন—আমার সঙ্গে অর্জুন কখনও সোজাসুজি যুদ্ধ করবে না। তার লজ্জা আছে, ঠাকুরদাদা বলেই সে লজ্জিত এবং সংকুচিত বোধ করবে —ন তু মাং বিবৃতো যুদ্ধে জাতু যুধ্যেত পাণ্ডবঃ। আর ঠিক এই লজ্জা সংকোচ এবং স্নেহ থাকার জন্য ভীষ্ম নিজেও তাঁর নাতিদের গায়ে হাত দিতে পারবেন না। অর্জুনের ঠাকুরদাদা তো একটিই, কিন্তু পাণ্ডুর ঘরে ভীষ্মের নাতি যে পাঁচজন। অতএব ভীষ্মের বক্তব্য—আমি কোনওভাবেই পাণ্ডবদের মারতে পারব না—ন ত্বেবোৎসাদনীয়া মে পাণ্ডোঃ পুত্রা জনাধিপ।

বিরাট একটি যুদ্ধ শুধু তার সেনানায়কদের দিয়ে হয় না। শত শত পদাতিক, অশ্বারোহী, গজারোহী আর মহারথীরা এক যুদ্ধকে পদে পদে বিপন্ন করে তোলে। ভীষ্ম দুর্যোধনকে কথা দিলেন—আমি পাণ্ডবপক্ষের অন্যান্য যোদ্ধাদের নিধন করার ভার নিলাম। পাণ্ডবরা কেউ যদি আমাকে আগেই না মেরে ফেলে—নচেত্তে মাং হনিষ্যন্তি পূর্বমেব সমাগমে—তবে এই অঙ্গীকার আমি করছি যে, পাণ্ডবপক্ষের অন্য যোদ্ধাদের আমি ছাড়ব না।

বুড়ো ঠাকুরদাদা তাঁর ঘরের নাতিটির কাছে সোচ্ছ্বাসে যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তারমধ্যে আন্তরিকতার অভাব ছিল না বটে, তবে পাণ্ডব-কৌরবের এক পিতামহ হিসেবে তিনি যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তার মধ্যেই তাঁর স্নেহটুকু ভাগাভাগি করা ছিল। পাঁচ পাণ্ডবভাইয়ের কোনও ক্ষতি তিনি করবেন না এবং তিনি শুধু পাণ্ডবদের সৈন্য শাতন করবেন—এমন একটা ঘোষণায় দুর্যোধন যদি ভেবে থাকেন যে—ঠিক আছে, আপনি সৈন্য শাতনই করুন, পাণ্ডবদের মারবে সেই, যার কোনও মায়া নেই পাণ্ডবদের ওপর। তিনি মহাবীর কর্ণ। ভীষ্ম যে এ কথা তেমন করে বোঝেননি, তা নয়, তবে কথাটা দুর্যোধন যেভাবে বুঝলেন সেইভাবে তাঁকে বুঝতে না দিয়ে তাঁর নিজের প্রতি কর্ণের চিরকালীন প্রতিকূলতা এবং প্রতিরোধগুলিকে অজুহাত হিসেবে খাড়া করলেন ভীষ্ম। তিনি বললেন—দেখো বাপু! আমাকে সেনাপতি করলে একটা শর্ত তোমায় মেনে নিতে হবে—সেনাপতিস্ত্বহং রাজন্ সময়েনাপরেণ তে। আমি বলি—কর্ণই আগে সেনাপতি হয়ে যুদ্ধ করুন অথবা আমি যদি আগে সেনাপতি হই তবে কর্ণ যুদ্ধ করুন তার পরে—কর্ণো বা যুধ্যতাং পূর্বম্ অহং বা পৃথিবীপতে। চিরটা কাল এই কর্ণ আমার সঙ্গে স্পর্ধা করে এসেছে, চিরটা কাল আমার সঙ্গে

শত্রুতা করেছে। কাজেই সে যখন যুদ্ধ করবে, আমি তখন যুদ্ধ করব না—স্পর্ধতে হি সদাত্যর্থং সূতপুত্র ময়া রণে।

যুদ্ধ কিংবা অস্ত্রচালনার ক্ষেত্রে কর্ণের কিছু অহংমানিতা ছিল। অতএব ভীষ্মের কথা শোনামাত্রই উষ্ণমস্তিষ্ক কর্ণ দুর্যোধনকে বললেন—এই ভীষ্ম বেঁচে থাকতে আমি একটুও যুদ্ধ করব না—নাহং জীবতি গাঙ্গেয়ে রাজন্ যোৎস্যে কথঞ্চন। ভীষ্ম মারা যাবার পর আমি এই যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করব এবং অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব। ভীষ্ম আগে বলেছিলেন—পৃথিবীতে অর্জুন ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই যে আমার সঙ্গে যুদ্ধে এঁটে উঠবে। কর্ণ ভীষ্মের কথার প্রতিবাদ করে বোঝাতে চাইলেন—যে অর্জুনকে ভীষ্ম তাঁর সমকক্ষ ভাবেন, তিনি তাঁর সঙ্গেই যুদ্ধ করার জন্য মুখিয়ে আছেন—হতে ভীষ্মে তু যোৎস্যামি সহ গাণ্ডীবধন্বনা।

এই দুইজনের বিবাদে সবচেয়ে ক্ষতি হয়ে গেল দুর্যোধনের। ভীষ্ম পাণ্ডবদের গায়ে অস্ত্র নিক্ষেপ করবেন না, কিন্তু সৈন্যধ্বংস করবেন। এখানে কর্ণ যুদ্ধ করলে পাণ্ডবদের নানা বিপদ হতে পারত। অন্যদিকে কর্ণ যখন পাণ্ডবদের সঙ্গে ভবিষ্যতে যুদ্ধ করবেন, তখন পাণ্ডবরা ছাড়াও তাঁদের অনুগত যুদ্ধবীরেরা কৌরবদের অস্থির করে তুলবেন। তাঁদের সামাল দেবার জন্য ভীষ্মের মতো এক মহাবীর তখন বাদ পড়ে যাবেন দুর্যোধনের সৈন্যনায়কদের তলিকা থেকে। অতএব ভীষ্মকে সেনাপতি নির্বাচিত করে দুর্যোধন যে সুবিধে পাবেন ভেবেছিলেন সে সুবিধে তিনি পেলেন না। অন্যদিকে ভীষ্মের সেনাপতিত্বকালে কর্ণ যুদ্ধ করবেন না স্থির করায় কৌরব-পাণ্ডবের এক পিতামহ হিসেবে ভীষ্ম অন্তত এই ভেবে শান্তি পেয়ে থাকবেন যে, তাঁর সেনাপতিত্বকালে তাঁরই বিপক্ষে যুদ্ধরত নাতিদের গুরুতর কোনও ক্ষতি হবে না।

দুর্যোধন ভীষ্মকে সেনাপতিপদে বরণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই সে খবর পৌঁছে গেল যুধিষ্ঠিরের কাছে। কীভাবে কোন ধরনের স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করলে ভীষ্মের আক্রমণ প্রতিরোধ করা যাবে, তাও ঠিক হয়ে গেল সম্মিলিত মন্ত্রণায়। কুরুক্ষেত্রের মহাপ্রাঙ্গণে পাণ্ডব-কৌরবের যুদ্ধ-শিবির তৈরি হল। ইতিমধ্যে দুর্যোধন পাণ্ডবদের কাছে শকুনির ছেলে উলূককে পাঠিয়ে দিলেন শুধু গালাগালি দেবার জন্য। এর ফল ভাল হল না। পাণ্ডবদের সঙ্গে কৃষ্ণ, দ্রুপদ, শিখণ্ডী সকলেই উপস্থিত ছিলেন। পাণ্ডবেরা উত্তেজিত হয়ে বড় কঠিন কথা শোনালেন উলূককে এবং শিখণ্ডী—যাঁর নাম এতদিন প্রায় শোনাই যায়নি, এতদিন ধরে যিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছেন ভীষ্মকে বধ করার জন্য—সেই শিখণ্ডী কিন্তু একেবারে সোজাসুজি ভীষ্মবধের কথা শুনিয়ে দিলেন উলূককে। তিনি বলেই দিলেন—শুধু ভীষ্মবধের জন্যই আমাকে নির্মাণ করেছেন বিধাতা। আমি সবার সামনে ওই ভীষ্মকে মেরে ফেলব—সো'হং ভীষ্মং হনিষ্যামি মিষতাং সর্বধন্বিনাম্।

আমরা জানি একা শিখণ্ডীর এমন কোনও ক্ষমতা ছিল না, যাতে তিনি ভীষ্মকে যুদ্ধভূমিতে শয়ন করাতে পারেন। কিন্তু আসল কথাটা হল শকুনির ছেলে উলূক দুর্যোধনের কথা শুনে পাণ্ডবদের এতটাই কুবাক্য বলেছেন যে, অর্জুন পর্যন্ত বেশ ভাল করে শুনিয়ে দিয়েছেন যে, পরের দিন থেকেই দুর্যোধনের প্রথম সেনাপতি ভীষ্ম আর নিরাপদ নন। তিনি দুর্যোধনকে উদ্দেশ করে বলেছেন,—আমি তোমার সামনেই কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মকে হত্যা করব—তস্মাদহং তে প্রথমং সমূহে/হন্তা সমক্ষং কুরুবৃদ্ধমেব।

অর্জুনের এই প্রতিজ্ঞাবাক্য কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মের কানেও গেল। দুর্যোধন তাঁর পিতামহের সামনে একটু বিচলিত ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞাসাও করেছিলেন নিশ্চয়—এবার কী হবে, পিতামহ! পিতামহ ভীষ্ম এতটুকু বিচলিত হননি। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন তাঁর অত্যন্ত প্রিয় নাতি। নাতির মুখে আপন-বধ প্রতিজ্ঞা শুনে একটুও উত্তেজিত হলেন না ভীষ্ম। বরঞ্চ অর্জুনের

প্রতি অপার প্রশ্রয়ে অর্জুনের কথাটা সম্পূর্ণই এড়িয়ে গেলেন দুর্যোধনের সামনে। অন্যদিকে দুর্যোধনও যাতে একেবারে বিচলিত না হয়ে পড়েন, সেদিকেও তাঁর যথেষ্ট নজর আছে। তিনি বললেন—দেখো বাপু! দেবসেনাপতি কার্তিককে নমস্কার করে যুদ্ধ আরম্ভ করেই আমি তোমার সেনাপতির পদ গ্রহণ করব। কোনও সন্দেহ নেই যে, সেনা-পরিচালনা, ব্যূহ-নির্মাণ অথবা সৈন্যদের দিয়ে সঠিক কাজটি করিয়ে নেবার ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট। আর যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধ এবং প্রতিপক্ষের অস্ত্র নিবারণ করার ক্ষেত্রেও আমার জ্ঞান দেবগুরু বৃহস্পতির মতো। কাজেই আমি যে তোমার জন্য প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করব তাতে সন্দেহ নেই কোনও, তুমি ভয় পেয়ো না—সো'হং যোৎস্যামি তত্ত্বেন ব্যেতু তে মানসো জ্বরঃ।

দুর্যোধন সোচ্ছ্বাসে জানালেন—আমি ভয় পাইনি, পিতামহ! আমার সেনাপতি যেখানে আপনি, সেখানে দেবতা অসুর কাউকেই ভয় পাই না আমি—কিং পুনস্ত্বয়ি দুর্ধর্ষে সৈনাপত্যে ব্যবস্থিতে। দুর্যোধন আরও ভাবলেন—পিতামহ অভিজ্ঞ লোক। যেসব রাজা এবং যেসব সেনানায়ক তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করতে এসেছেন, তাঁদের বলাবল ভীষ্ম জানেন, আবার প্রতিপক্ষে পাণ্ডবদের সঙ্গে যাঁরা যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন তাঁদেরও সঠিক শক্তি এবং ক্ষমতা কতখানি, তাও ভীষ্ম জানেন। দুর্যোধন ভীষ্মকে একটু উসকে দিয়ে স্বপক্ষ এবং পরপক্ষের শক্তিমত্তা যাচাই করতে চাইলেন এবং সেটা একটু আংকিকভাবে। এত অল্প পরিসরে সেই আংকিক গতি তেমন করে বোঝানো যাবে না, তবে এটা বুঝলেই হবে যে, যিনি যুদ্ধে প্রচুর পরিমাণ শত্রু ধ্বংস করতে পারেন এবং নিজে বহু সৈন্য পরিচালনা করতে পারেন তাঁদের পারিভাষিক ভাবে বলে 'রথ'। যাঁরা যুদ্ধে আরও দক্ষ, তাঁদের পারিভাষিক নাম 'অতিরথ'। দুর্যোধনের পক্ষে যেসব যুদ্ধবীর রথ এবং অতিরথের পর্যায়ে পড়েন, দুর্যোধন তাঁদেরই চিহ্নিত করতে চাইলেন ভীষ্মের অভিজ্ঞতায়।

দুর্যোধনের আগ্রহ দেখে ভীষ্ম দেশ-বিদেশে সমস্ত রাজার শক্তি নির্ধারণ করার চেষ্টা করলেন। সেখানে যাদব কৃতবর্মা থেকে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা থেকে অলম্বুষ, দুর্যোধনের ছেলে থেকে দুঃশাসনের ছেলে—সবারই বলাবল নির্ণয় করলেন ভীষ্ম। কৌরব-পাণ্ডবের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য এবং কৃপাচার্য, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা—এইসব বড় বড় যুদ্ধবীরের প্রসঙ্গে আবারও কর্ণের ক্ষমতার কথা এসে গেল এবং ভীষ্ম খুব রুক্ষভাবেই বললেন যে, পরশুরামের অভিশাপের নিরিখে শেষ যুদ্ধকালে যেহেতু কর্ণের বিপর্যয় হবার কথা, অপিচ কর্ণের কবচকুণ্ডলও এখন যেহেতু আর তাঁর শরীরে নেই, অতএব কর্ণকে 'রথ'ও বলা যায় না, 'অতিরথ'ও বলা যায় না। খুব বেশি হলে তাঁকে 'অর্ধরথ' বলা যায়। আমার ধারণা, অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ লাগলে কর্ণ কোনও মতেই বেঁচে ফিরবে না—করণানাং বিয়োগাচ্চ তেন মে'র্ধরথো মতঃ।

ভীষ্মের কথায় কর্ণ ক্রোধে অধীর হলেন। পিতামহ ভীষ্মকে তিনি আর ছেড়ে দিলেন না। যা মুখে আসে তাই বলতে গিয়ে কর্ণ এমন কথাও বললেন যে—আমি শুধু দুর্যোধনের কারণে আপনাকে এতদিন ক্ষমা করে চলেছি—মর্ষয়ামি চ তৎ সর্বং দুর্যোধনকৃতেন বৈ। আপনি এমনভাবে কথা বলছেন যেন আমি এক কাপুরুষের অধম। সত্যি বলতে কী, আমার মতে আপনিই হলেন 'অর্ধরথ'—ভবানর্ধরথো মহ্যং মতো বৈ নাত্র সংশয়ঃ। আমাদের রাজা দুর্যোধন আপনার চরিত্র একটুও বোঝেন না। আপনি কখনওই কুরুদের ভাল চান না। নইলে, এখন এই যুদ্ধের সময় এইভাবে কেউ একজন যুদ্ধবীরের মনোবল ভেঙে দেয়, নাকি এইভাবে নিজেদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে? আমি দুর্যোধনকে বলছি—ছাড়ুন এই পাপী লোকটাকে। কাকে 'রথ' বলে আর কাকে 'অতিরথ' বলে—সেসব বোধ কোথায়? আর কোথায় এই বোকা ভীষ্ম—রথানাং ক্ক চ বিজ্ঞানং ক্ক চ ভীষ্মো'ল্পচেতনঃ? ব্যাটা বুড়ো ভাম, যমে ওর পাকাচুল ধরে টানছে। শুনেছি বুড়োমানুষের কথা সশ্রদ্ধে শোনা উচিত, কিন্তু অতি-বুড়োর কথা কখনও নয়। বেশি বুড়ো হলে তার বুদ্ধিটা আবারও বাচ্চাদের মতো হয়ে

যায়—পুনর্বালা হি তে মতাঃ।

কর্ণ লাগাম ছেড়ে গালাগালি দিলেন ভীষ্মকে। এমন কথাও বললেন যে, এই বুড়োটা চিরকাল নিজে নিজেই লম্বা লম্বা কথা বলে এবং অন্য কাউকে শক্তিমান মনে করে না। আমি বলে রাখছি, দুর্যোধন! তুমি একে সেনাপতি করেছ। আমরা যদি ভাল যুদ্ধ করি তবে তার গৌরব আমরা পাব না, পাবে এই বুড়ো। কাজেই ভীষ্ম বেঁচে থাকতে আমি যুদ্ধ করব না। এই বুড়ো মরলে পাণ্ডবদের একাই আমি সামাল দেব—অহমাবারয়িষ্যামি পাণ্ডবানাম্ অনীকিনীম্।

জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে ভীষ্মের একটু রাগই হল। কোনও দিন তিনি নিজের কথা নিজ মুখে বড় করে বলেননি। আজকে এই মুহূর্তে দুর্যোধনের বন্ধু যখন তাঁর যুদ্ধশক্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলছে, তখন কিছু কথা না শুনিয়ে পারলেন না ভীষ্ম। বিশেষত এতদিন পরে যে বিরাট যুদ্ধে তাঁর ডাক পড়েছে, তা যে ভালবাসার কারণে নয় এবং তা যে শুধুই তাঁকে ব্যবহার করার জন্য তা তিনি জানেন। অতএব আজ একটু না বললেই নয়। ভীষ্ম কর্ণকে 'অর্ধরথ' আখ্যা দেবার আগে কতগুলি বড় যুদ্ধের উল্লেখ করেছিলেন যেগুলির একটাতেও কর্ণ অর্জুনের সামনে দাঁড়াতে পারেননি। অনেক ক্ষেত্রে তিনি পলায়নও করেছেন। ভীষ্ম তাই নিজের জীবনের বিশাল যুদ্ধগুলি স্মরণ করিয়ে দিলেন। বিশেষ বিচিত্রবীর্যের বিয়ের সময় সমস্ত রাজাদের সঙ্গে তার যে যুদ্ধ হয়েছিল, পরশুরামের সঙ্গে তাঁর যে যুদ্ধ হয়েছিল, সেগুলো একটি একটি করে স্মরণ করিয়ে দিলেন ভীষ্ম।

কর্ণ তাঁকে স্থবিরত্বের কারণে নিন্দাবাদ করেছেন, অপিচ দুর্যোধনের জন্যই তিনি ভীষ্মকে ক্ষমা করছেন—এ কথাও বলেছেন। ভীষ্ম সে কথারও জবাব দিতে ছাড়লেন না। বললেন—যে সময় এখন এসেছে তাতে নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা উচিত নয় বলেই এখনও তুই বেঁচে আছিস, ব্যাটা সারথির পো—মিথ্যো ভেদো ন মে কার্য্যস্তেন জীবসি সুতজ। আমি এই বুড়ো বয়সে তোর মতো একটা বাচ্চা ছেলেকে মেরে নিজের বিক্রম প্রকাশ করব না। আর তোর এত যুদ্ধ করার ইচ্ছে এবং তোর বেঁচে থাকার ইচ্ছে—কোনওটাই যাতে নষ্ট না হয়, সেই জন্যই তোকে মেরে ফেলছি না—যুদ্ধশ্রমহং ছিন্দ্যাং জীবিতাশাঞ্চ সূতজ। তুই আছিস বলেই কুরুদের আজকে এই বিপদ এসেছে। তোর এত ইচ্ছে, তো পুরুষ হওয়ার চেষ্টা কর যথাসাধ্য আর অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে তোর কী হাল হয় সেও আমি দেখব—যুধ্যস্ব সমরে পার্থং যেন বিস্পর্ধসে সহ।

দুর্যোধন দেখলেন—দুই মহাবীরের ঝগড়ায় তাঁর আসল কাজটাই পণ্ড হতে চলেছে। তিনি অনেক অনুনয়বিনয় করে ভীষ্মকে থামালেন এবং 'রথ অতিরথে'র সংখ্যায় পাণ্ডবদের শক্তিটাও কীরকম, তা জানাতে বললেন ভীষ্মকে। ভীষ্ম আবারও প্রসঙ্গে চলে এলেন বটে, কিন্তু কৌরবপক্ষের যুদ্ধবীরদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে যত নিপুণ বিশ্লেষণ তিনি করেছিলেন, তেমন বিশ্লেষণ আর করতে পারলেন না। একটু যেন অন্যমনস্কও হয়ে গেছেন তিনি। কর্ণের কথার জবাব দিতে গিয়ে বিচিত্রবীর্যের বিবাহসময়ের সমস্ত ঘটনা আবারও কীরকম আনুপূর্বিকভাবে মনে পড়ে গেল। পাণ্ডবদের বলাবল নির্ধারণ করার সময় আবারও এল সেই কথা। অম্বা-শিখণ্ডিনীর কথা। ভীষ্ম বললেন—অর্জুন কৃষ্ণ অথবা যে কেউ আসুক যুদ্ধে আমি তাঁদের সবাইকে আটকাব, কিন্তু শিখণ্ডীকে নয়—পাঞ্চাল্যন্তু মহাবাহো নাহং হন্যাং শিখণ্ডিনম্।

প্রশ্ন উঠতে পারে—যুদ্ধক্ষেত্রে যে যুদ্ধ করবে, তাকেই বাণমুখে প্রতিরোধ করতে হবে। কিন্তু শিখণ্ডীর বেলায় এই বেনিয়ম কেন, সে তো যুদ্ধ করছে। ভীষ্ম বললেন—শিখণ্ডী যদি আমাকে মারবার জন্য তির ছোঁড়ে, তবে আমি বাণ-মুখেও তার অঙ্গস্পর্শ করব না। তোমরা

তো জান আমি আমার পিতার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, কোনও দিন বিবাহ করব না। চিরকাল ব্রহ্মচর্য পালন করব এবং আমি রাজাও হব না। আমি আমার ভাই চিত্রাঙ্গদকে সিংহাসনে বসিয়েছি। বিচিত্রবীর্যকে শিশু অবস্থায় যুবরাজের পদে বসিয়েছি। কিন্তু কোনওভাবেই প্রতিজ্ঞাচ্যুত হইনি। কাজেই শিখণ্ডীর গায়েও আমি অস্ত্রমোক্ষণ করব না। শিখণ্ডী আগে স্ত্রীলোক ছিল এখন পুরুষ হয়েছে—কন্যা ভূত্বা পুমান্ জাতঃ। স্ত্রীলোক অথবা যে আগে স্ত্রী ছিল, তাকে আমি কোনওভাবেই মারব না—নৈব হন্যাং স্ত্রিয়ং জাতু ন স্ত্রীপূর্বং কদাচন।

অনুক্রমে ভীষ্মের জীবন আলোচনা করার সময় আমরা পূর্বেই অম্বা-শিখণ্ডিনীর কথা উল্লেখ করেছি। এখানকার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা বার বার এও জানাতে চেয়েছি যে, অম্বা স্ত্রী ছিলেন এবং কোনও অলৌকিক উপায়ে তিনি ক্লীবত্ব লাভ করেছেন অথবা পুরুষ হয়েছেন—এমনটি হতে পারে না। মহাভারতে এই অলৌকিকত্বের প্রসঙ্গ আছে বটে কিন্তু বাস্তবে মহাভারতেরই নানা প্রসঙ্গ থেকে আমাদের মনে হয়েছে যে, অম্বা পূর্বেও যেমন স্ত্রী ছিলেন এখনও তিনি তেমনই স্ত্রী-ই আছেন। শুধু পুরুষের অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করার মধ্যেই তাঁর পুরুষত্ব। লক্ষণীয়, আমরা ভীষ্মের মুখেই জানতে পেরেছি, যে শিখণ্ডী দ্রুপদরাজার মেয়ে হয়েই জন্মান এবং দ্রুপদ তাঁকে পুরুষপুত্র বলে বাইরে প্রচার করেন। এমনকী দ্রুপদ তাঁর মেয়েটির লিঙ্গপরিচয় লুক্কায়িত রেখে তাঁর বিয়েও দেন।

এসব কথা থেকে আমাদের স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়েছে যে, অম্বা দ্রুপদরাজার মেয়ে হয়ে জন্মেছিলেন—এটা আখ্যানমাত্র। অম্বার মাতামহ রাজর্ষি হোত্রবাহন এমন একটি জায়গায় অম্বার বাসস্থান ঠিক করেছিলেন যেখানে অম্বা তাঁর প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করতে পারবেন। মহারাজ দ্রুপদ নিজের কারণেই ভীষ্মের প্রতিপক্ষতা করেছেন এবং সেই প্রতিপক্ষতায় অম্বার স্বার্থ একাত্ম হয়েছে। অম্বার স্বার্থ ভীষ্মকে হত্যা করা এবং সেই কারণেই তিনি পুরুষ হয়েছেন। কিন্তু এইভাবে যেহেতু ক্লীবত্ব বা পুরুষত্ব, কোনওভাবেই বাস্তবে হয় না, তাই আমাদের ধারণা হয় যে, অম্বর জন্মগত স্ত্রীত্ব এবং তাঁর পুরুষোচিত বেশবাস, পুরুষোচিত অস্ত্রশিক্ষা—এই দুই বিপরীত সত্তার মিশ্রচারিতাই তাঁকে অন্যের কাছে ক্লীব করে তুলেছে।

ভীষ্ম নিজ মুখেই অনেকবার শিখণ্ডীকে—আগে ইনি স্ত্রী ছিলেন পরে পুরুষ হয়েছেন—কন্যা ভূত্বা পুমান জাতঃ—এইরকমভাবে বর্ণনা করেছেন। আমরা যেমন অনেক সময় পুরুষের স্বভাবগ্রস্ত মহিলাকে মহিলা-পুরুষ বলেই চিহ্নিত করি, তেমনই ভীষ্মও শিখণ্ডীকে চিহ্নিত করেছেন 'স্ত্রীপুমান্ দ্রুপদাত্মজঃ' বলে। কখনও বা ভীষ্ম তাঁকে দ্রুপদের এই পুত্রটি আগে স্ত্রী ছিলেন—পুত্রং স্ত্রীপূর্বিনং তথা—এইরকম বললেও, অনেক জায়গাতেই তিনি শিখণ্ডী শব্দটাকে স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহার করে বলেছেন—অম্বা শিখণ্ডিনী—শিখণ্ডিনী তদা কন্যা ব্রীড়িতেব তপস্বিনী। এই কথায় বুঝি আগেও অম্বা স্ত্রী ছিলেন, এখনও তাই আছেন। শুধু ভীষ্মবধের প্রতিজ্ঞায় তাঁর বেশে, ব্যবহারে এবং শিক্ষায় পুরুষের স্বভাব আক্রান্ত হয়েছে বলেই ভীষ্ম শিখণ্ডীর স্ত্রী-স্বরূপটি ভুলে যাননি। সেই জন্যই সব কথার শেষে ভীষ্ম মন্তব্য করেছেন—স্ত্রীলোক, আগে যিনি স্ত্রীলোক ছিলেন, যার মেয়েদের নামে নাম এবং যে স্বরূপত স্ত্রীলোক—স্ত্রিয়াং স্ত্রীপূর্বকে চৈব স্ত্রীনামি স্ত্রীস্বরূপিনি—এদের গায়ে আমি কখনও বাণাঘাত করব না—এ আমার ব্রহ্মচর্যের ব্রত।

আমরা ভীষ্মের প্রসঙ্গে শিখণ্ডীর স্ত্রী-পুংভাব নিয়ে সামান্য গবেষণা করে নিলাম বটে, তবে ভীষ্মের বক্তব্যটুকু মোটেই এইরকম ছিল না। শিখণ্ডীর দিকে একটি বাণও নিক্ষেপ করব না—এই প্রতিজ্ঞার মধ্যে কোনও আক্ষেপ অথবা হৃদয় ভাঙার মতো কোনও ব্যাপার আছে কি না সেটা ভাল করে বুঝে নেবার আগেই দুর্যোধন ভীষ্মকে প্রায় আকরিক প্রশ্ন

করেছিলেন—কেন তিনি শিখণ্ডীকে মারবেন না। ঠিক এই প্রসঙ্গে ভীষ্মের হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত হল অম্বার সমস্ত জীবনকাহিনী। সেই বিচিত্রবীর্যের বিবাহ-সময়ে কাশীরাজকন্যা অম্বার হরণ থেকে তাঁর অনুরাগ, ক্রোধ, তপস্যা এবং শেষ পর্যন্ত দ্রুপদ রাজার ঘরে তাঁর শিখণ্ডী পুরুষের পরিণতি—এই সমস্ত কাহিনী দুর্যোধনের কাছে বললেন ভীষ্ম। আগে কোনও দিন কারও কাছে বলেননি, আজ বললেন। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে তিনি আজ যে বিরাট যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছেন সে যুদ্ধে প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়ে আছেন অম্বা-শিখণ্ডিনী। সেই অম্বা, যিনি ভীষ্মের কাছে অন্য এক পুরুষের সম্বন্ধে প্রথম অনুরাগ জানিয়েছিলেন, সেই অম্বা, যিনি শাল্বরাজার কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে আবারও ভীষ্মের কাছে ফিরে এসেছিলেন।

ভীষ্ম সেদিন যাঁকে পুনঃপ্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সেই প্রত্যাখ্যানের দিনটি আজও মনে পড়ে ভীষ্মের। একটি রমণীর জীবনযৌবন, আশা স্বপ্ন সব ব্যর্থ হয়ে গেল। ব্যর্থ হয়ে গেল রমণীর গার্হস্থ্য সুখ এবং তা ব্যর্থ হল তাঁর কারণে। অথচ ভীষ্মের কী অসহায় অবস্থা! পর পুরুষের পূর্বানুরাগিনী এক রমণীকে তিনি তাঁর ছোট ভাই বিচিত্রবীর্যের জন্যও গ্রহণ করতে পারেননি, আবার পিতার কাছে এমনই এক কঠিন প্রতিজ্ঞায় তিনি প্রতিষ্ঠিত যে, সে প্রতিজ্ঞা ভেঙে দিয়ে নিজেও তিনি অম্বাকে গ্রহণ করতে পারেননি। গুরু পরশুরাম অম্বাকে বার বার ভীষ্মের কাছেই ফিরে যেতে বলেছিলেন; বলেছিলেন ভীষ্মকে তিনিই রাজি করাবেন অম্বাকে গ্রহণ করার জন্য। কিন্তু এক প্রত্যাখ্যাত রমণীর হৃদয় আপন বীরত্ব-গরিমায় আরও সগৌরবে লাভ করেও তাঁকে তিনি প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়েছেন। কী অদ্ভুত এই বিপন্নতা। লাঞ্ছিতা রমণীটি তাঁর পূর্বপ্রণয়ী শাল্বরাজার ওপর রাগ করেননি, বিচিত্রবীর্যের ওপর রাগ করেননি, শুধু রাগ করেছেন ভীষ্মের ওপর।

আজ সেই দিন এসেছে—ভীষ্ম বুঝতে পারছেন, তাঁর শেষ দিন এগিয়ে এসেছে। অম্বা-শিখণ্ডিনী তাঁর অপমানের প্রতিশোধ তুলবেন ভীষ্মের ওপর আর ভীষ্ম আগে থেকেই সবাইকে বলে রাখছেন—আমি শিখণ্ডীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করব না। তিনি ভাব দেখাচ্ছেন যেন কত তার ঘৃণা, কত উপেক্ষা এই রমণীর প্রতি। কিন্তু আমরা জানি ভীষ্ম যে মর্যাদার মানুষ তাতে তিনি এই রমণীকে শুধু এক সহজ সুযোগ দেবেন তাঁর আপন অপমানের চরম প্রতিশোধ নেবার। এই আত্মসংহারের মধ্যে আত্মবলি অথবা আত্মোৎসর্গের এক আনন্দ আছে, ভীষ্ম আজ সেই আনন্দ পাচ্ছেন। হয়তো সেই আনন্দেই অম্বা-শিখণ্ডিনীর সম্পূর্ণ কাহিনী এক তৃতীয় ব্যক্তির কাছে বিবৃত করে ভীষ্ম তাঁর মানসিক ভার লাঘব করছেন।

যুদ্ধ আরম্ভ হবার ঠিক আগের দিন দুর্যোধন আবারও এলেন ভীষ্মের কাছে। কৌরবপক্ষের কোন যুদ্ধনায়ক কতদিনে পাণ্ডবদের বিশাল সৈন্যবাহিনী শেষ করতে পারবেন —এই নিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন ভীষ্মের কাছে। সব দিক ভেবে ভীষ্ম বললেন—অন্তত এক মাস সময় তাঁর লাগবে পাণ্ডবসৈন্যের অন্ত ঘটাতে—হন্যাং মাসেন ভারত। দ্রোণ বললেন—তাঁরও ওই এক মাসই লাগবে। এইভাবে কৃপ, অশ্বত্থামা ইত্যাদির ক্রমে যখন কর্ণের বক্তব্য শোনা গেল, তখন তিনি বললেন—আমার মাত্র পাঁচদিন সময় লাগবে, তার বেশি নয়। কর্ণের কথা শুনে ভীষ্ম হা হা করে হেসে উঠলেন—জহাস সস্বনং হাসম্। তবু এই সময় কথা কাটাকাটি বেশি হল না। কারণ, কর্ণ ভীষ্মের সেনাপতিত্বকালে যুদ্ধই করবেন না।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার দিন দুই পক্ষের সেনানায়কেরা পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হলেন। যুদ্ধবীরদের মহাশঙ্খ বেজে উঠল চারদিকে। ঠিক এই সময়ে বড় অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল। পাণ্ডবপক্ষের কর্তাঠাকুর যুধিষ্ঠির মহারাজ যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নিজের বুকে-আঁটা বর্মটি খুলে ফেললেন। তারপর রথ থেকে নেমে পায়ে হেঁটে কৌরবপক্ষের সেনানায়কদের দিকে এগোতে লাগলেন। হঠাৎ অস্ত্রবিহীন অবস্থায় এইভাবে যুধিষ্ঠিরকে শত্রুসৈন্যের দিকে

এগোতে দেখে অর্জুনও তাড়াতাড়ি রথ থেকে নেমে পিছনে ছুটলেন। তাঁর সঙ্গে ছুটলেন ভীম, নকুল, সহদেব এবং কৃষ্ণ। কৌরবপক্ষের সাধারণ সৈনিকেরা সু-উচ্চে হেসে উঠল। সোচ্চারে বলল—মহারাজ যুধিষ্ঠির ভয় পেয়েছেন, তাই ভাইদের নিয়ে ভীষ্মের কাছে যাচ্ছেন আত্মসমর্পণ করতে—ব্যক্তং ভীত ইবাভ্যেতি রাজা'সৌ ভীষ্মমন্তিকম্। যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে নানা কটূক্তি বর্ষণ করার পর কৌরব সৈন্যবাহিনী হঠাৎ চুপ করে গেল। তাদের শোনা দরকার—যুদ্ধিষ্ঠির কী বলেন ভীষ্মকে, আর ভীষ্মই বা সেসব প্রশ্নের কী প্রত্যুত্তর দেন—কিংনু বক্ষ্যতি রাজাসৌ কিং ভীষ্মঃ প্রতিবক্ষ্যতি।

দেখা গেল—যুধিষ্ঠির এসে পিতামহ ভীষ্মের পা জড়িয়ে ধরলেন। মুখে বললেন—আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে আমাদের। অনুমতি দিন, পিতামহ! আশীর্বাদ করুন আমাদের—অনুজানীহি মাং তাত আশিষশ্চ প্রযোজয়। যুধিষ্ঠিরের এই মর্যাদাবোধ একমাত্র ভীষ্মের পক্ষেই বোঝা সম্ভব। শত্রুপক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা এক পরম মহান ব্যক্তির এই বিনয় ব্যবহারে অত্যন্ত খুশি হলেন ভীষ্ম। পিতামহের সস্নেহ উদার আশীর্বাদে যুধিষ্ঠিরের মস্তক আঘ্রাণ করে ভীষ্ম বললেন—তুমি জয় লাভ করো, পুত্র! তোমার সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হোক—প্রীতো'হং পুত্র যুধ্যস্ব জয়মাপ্নুহি পাণ্ডব। আজকে আমার কাছে তুমি যা চাইবে তাই পাবে। এই যুদ্ধে তোমার পরাজয়ের কোনও সম্ভাবনা নেই।

আজকের দিনে যেখানে হিংসা আর প্রতিহিংসায় সমস্ত মানুষ জর্জরিত, এক দলের মহিমান্বিত নেতা যেখানে অন্য দলের নেতার মর্যাদা বোঝেন না, সেইখানে যুদ্ধিষ্ঠির এবং ভীষ্মের এই পারস্পরিক ব্যবহার আমাদের শুধু মুগ্ধ করে! প্রত্যেক বড় মানুষেরই একটা 'ইগো' থাকে, থাকে স্বারোপিত মর্যাদাবোধ, কিন্তু সেই 'ইগো', সেই মর্যাদাবোধ অতিক্রম করে যিনি অন্যের মর্যাদা রক্ষা করতে পারেন, তিনি যেমন যুধিষ্ঠিরের পর্যায়ে উন্নীত হন, তেমনই বিনীত যুধিষ্ঠিরকে যিনি নিজের থেকেও বেশি মর্যাদায় আলিঙ্গন করতে পারেন, তিনি ভীষ্মের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেন। ভীষ্ম এতটাই বড় যিনি শত্রুপক্ষের নেতাকে বলতে পারেন, যিনি যুদ্ধের প্রাঙমুহূর্তে এই বিনয়-ব্যবহার করতে পারেন, তাঁর কোনও পরাজয় হতে পারে না—এবং গতে মহারাজ ন তবাস্তি পরাজয়ঃ।

ভীষ্মের মনে সামান্য একটু পাপবোধ আছেই। পাণ্ডবরা এতদিন কৌরবদের কাছে বঞ্চিত লাঞ্ছিত হয়েছেন, তাঁরা রাজ্য পেয়েও দুর্যোধনের ছলনায় রাজ্য হারিয়েছেন, সমবেত রাজমণ্ডলীর সামনে উন্মুক্ত রাজসভায় পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীকে অপমান সইতে হয়েছে, সইতে হয়েছে বনবাসের কষ্ট। এইসব কারণে পিতামহ ভীষ্মের সমব্যথা কম ছিল না এবং তাঁর সমস্ত পক্ষপাতও নির্দিষ্ট ছিল পাণ্ডবদের জন্যই। কিন্তু তবু শুধু পাণ্ডবদের নীতি-সমর্থক বলেই তিনি পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিতে পারেননি। পারেননি যে, তার সবচেয়ে বড় কারণ হল তাঁর ধর্ম। সেই পিতা শান্তনুর আমল থেকে তিনি পিতৃপরম্পরায় আগত রাজ্যের কর্ণধার ছিলেন। হস্তিনার সিংহাসনে-বসা মূল রাজবংশের এক মৌল মন্ত্রী হিসেবে তিনি এতকাল এই রাজ্যের সেবা করে এসেছেন এবং কৌরবদের বৃত্তিও তিনি গ্রহণ করেছেন এতকাল। এই বৃত্তিভোগে তাঁর কোনও গ্লানি হয়নি, কারণ হস্তিনার রাজবংশের সুষ্ঠু প্রতিষ্ঠা এবং সুরক্ষার জন্যই তিনি নিবেদিতপ্রাণ।

তবু এই দুর্মন্ত্রণাগ্রস্ত দুর্যোধন-ধৃতরাষ্ট্রকে ছেড়ে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দেওয়া যেত। সব ছেড়ে দিয়ে যাঁকে তিনি ধর্মের প্রতিমূর্তি হিসেবেই শুধু গ্রহণ করতে পারতেন, সেই যুধিষ্ঠিরের পক্ষে তিনি যোগ দিতে পারছেন না, নিতান্ত ব্যক্তিগত কারণে। কাশীরাজ যে পক্ষে আছেন, তাঁর কন্যা অম্বা-শিখণ্ডী যে পক্ষে যুদ্ধে করছেন শুধু ভীষ্মবধের আকাঙ্ক্ষায়, সে পক্ষে তিনি যোগ দেবেন কী করে? কিন্তু এ কথা তো পরিষ্কার করে বলা যায় না যুধিষ্ঠিরকে। অতএব আরও গভীর অর্থবহ কারণের কথা ভীষ্মকে বলতে হল, যা এতই

চিরন্তন, এতই তা আপাতত যুক্তিপূর্ণ যে, শুধু যুধিষ্ঠির কেন, চিরকাল সকলে সর্বান্তঃকরণে তাঁর যুক্তি মেনে নেবেন। ভীষ্ম বলললেন—বাছা! মানুষ অর্থের দাস, কিন্তু অর্থ কারও দাস নয়—অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ। আমি কৌরবদের কাছে অর্থের দায়ে আবদ্ধ। কৌরবদের বৃত্তিতে আমার ভরণপোষণ আর ঠিক সেই জন্যই অনন্যোপায় ক্লীবের মতো আমাকে এই কথা বলতে হচ্ছে যে, যুদ্ধ আমাকে করতেই হবে। অতএব যুদ্ধ না করার অনুরোধ ছাড়া আর যা কিছু অনুরোধ তুমি করতে পার, আমি রাখব—ভৃতো'স্ম্যর্থেন কৌরব্য যুদ্ধাদন্যৎ কিমিচ্ছসি।

হায়! আজকের দিনের গণতন্ত্রের পূজারীরা রাজতন্ত্রের ধারক বাহকদের এই সামান্য দায়টুকুও যদি বুঝতেন! জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থে যাঁদের ভরণপোষণ এবং সত্তা, তাঁরা যদি শুধু এইটুকু বুঝতেন যে, হস্তিনার অর্থানুকূল্যে জীবনধারণ করার কারণেই ভীষ্ম তাঁর নিজের জীবন জলাঞ্জলি দিলেন, তা হলে গণতন্ত্রের আজ এই সংকট দেখা দিত না। যেহেতু হস্তিনার লবণকর ভীষ্মের ধমনীতে আজও বয়ে চলেছে অতএব সেই লবণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না ভীষ্ম। তিনি যুদ্ধ করবেন। যুধিষ্ঠির এতটুকু রাগ করেননি। তিনি তাঁর মর্মকথা বোঝেন বলেই সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন—আপনি শুধু আমার হিতের কথা বলুন, পিতামহ। আমি সেই বর চাই। নইলে আপনি কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধ করবেন, এ তো স্বাভাবিক—যুধ্যস্ব কৌরবস্যার্থে মমৈষ সততং বরঃ।

ভীষ্ম বলেছেন—তবু তুমি কিছু চাও। আমি যদিও অন্যের জন্য যুদ্ধ করছি, তবু বলো, কীভাবে আমি তোমায় সাহায্য করতে পারি? যুধিষ্ঠির বললেন—এই যুদ্ধে কীভাবে আপনাকে জয় করব, পিতামহ। যুদ্ধে তো আপনি অজেয়। আমার ভাল চাইলে আপনি সেই উপদেশই করুন, যাতে আপনাকে আমরা জয় করতে পারি—কথং জয়েয়ং সংগ্রামে ভবন্তমপরাজিতম্।

যুধিষ্ঠিরের কথার মধ্যে ভদ্রতা ছিল। তিনি সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করতে পারেননি—কীভাবে আপনাকে হত্যা করব। কিন্তু যুধিষ্ঠির যেহেতু কিছুই ভেঙে বলেননি, ভীষ্মও তাঁর উত্তর ভেঙে বললেন না। বরঞ্চ ঘুরিয়ে বললেন—তা যা বলেছ। আমি যুদ্ধ করলে সাক্ষাৎ ইন্দ্রও যুদ্ধ করে আমাকে হারাতে পারবেন না—বিজয়েত পুমান্ কশ্চিৎ সাক্ষাদপি শতক্রতুঃ। যুধিষ্টির এবার সব লজ্জা ভেঙে বললেন—সেই জন্যই ত জিজ্ঞাসা করছি, পিতামহ। আপনি আপনার বধের উপায় বলে দিন—বধোপায়ং ব্রবীহিত্বম্ আত্মনো সমরে পরৈঃ।

ভীষ্ম বলে দিতে পারতেন; তখনই তাঁর বধের উপায় বলে দিতে পারতেন যুধিষ্ঠিরকে। কিন্তু বলেননি। বলেননি এই কারণে যে, দুর্যোধনকে তিনি কথা দিয়েছেন পাণ্ডবদের না হোক, কিন্তু পাণ্ডবদের হাজার হাজার সৈন্য তিনি বধ করে দুর্যোধনের ভাবনার ভার লাঘব করবেন। তা ছাড়া কৌরবদের হয়ে যুদ্ধ করে যিনি তাঁর ভরণপোষণের ঋণ শোধ করতে চান, তাঁর কি একবেলার মধ্যে যুদ্ধে ধরাশায়ী হলে চলবে! কিন্তু দুর্যোধনের হয়ে যুদ্ধ করবেন বলেই যুধিষ্ঠিরের জয় চান না, তা নয়। এমনকী যে পাণ্ডবদের জন্য তিনি কিছু করতে পারেননি, তাঁদের কারও হাতে মৃত্যুবরণ করতেও তাঁর অনীহা নেই কোনও। কিন্তু তবু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে রাজপ্রদত্ত সেনাপতির কার্যভার একটুও পালন না করে, একটুও যুদ্ধ না করে তিনি মৃত্যু চান না। তাঁর এখনই মরতে ইচ্ছে নেই, অতএব যুধিষ্ঠিরকে তিনি বলেই দিলেন—তুমি আরও একবার এখানে এসো বাবা! এখনও আমার মৃত্যুকাল সমাগত হয়নি—ন তাবৎ মৃত্যুকালো'পি পুনরাগমনং কুরু। যুধিষ্ঠির এবার অন্যান্য আচার্যদের প্রণাম জানিয়ে চলে এলেন স্বস্থানে।

যুদ্ধ আরম্ভ। হল সে যুদ্ধের বর্ণনা দিয়ে কোনও লাভ নেই। একমাত্র মহাকাব্যের মহান

শব্দরাশিই পারে এই যুদ্ধের সর্বাঙ্গীন বর্ণনা দিতে। আমরা যদি কোনওভাবে কোনও অর্বাচীন প্রক্রিয়ায় এই যুদ্ধের বর্ণনা করতে চাই, তা হলে সেই বর্ণনা আমাদের অনুবাদ-মাধ্যমে আমাদের কাছেই এমন জোলো শোনাবে যে, মহাভারতের কবি লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠবেন। অতএব আমরা সেই যুদ্ধ-বর্ণনায় যাচ্ছি না। তবে একেবারে প্রথম যুদ্ধারম্ভে যেটা বড় প্রকট হয়ে উঠল, সেটা হল—এই যুদ্ধে পিতার সমান ব্যক্তি পুত্রপ্রতিমকে অস্ত্রাঘাত করতে ছাড়ছেন না, পুত্রের সমানরাও ছাড়ছেন না পিতৃপ্রতিমকে। মাতুল ভাগনেকে প্রহার করছে, ভাগনে মাতুলকে, ভাই ভাইকে, সখা সখাকে, আত্মীয় আত্মীয়কে। পিতামহ ভীষ্ম আপন ইতিকর্তব্যতায় যুদ্ধ করতে করতে শুধু এই দৃশ্য দেখতে দেখতে বিনা বাণাঘাতেই আহত হতে থাকলেন। এর থেকে বড় প্রহার তিনি জীবনে লাভ করেননি।

ভীষ্মের যুদ্ধকালে পাণ্ডবদের অতি ঘনিষ্ঠ কোনও রক্ত-সম্বন্ধীয় মৃত্যু ঘটেনি। ভীষ্মও সেটা চাননি। কিন্তু বৃদ্ধ ভীষ্ম আপন প্রতিজ্ঞামতো পাণ্ডবসেনার এতটাই ক্ষতি করে ফেলছিলেন যে, পাণ্ডবরা নিতান্তই উদ্‌বিগ্নভাবে দিন কাটাচ্ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্মের প্রতিস্পর্ধী হলে নাতির বয়সি পাণ্ডবরাও কম প্রহার লাভ করছিলেন না। ভীষ্মের প্রথম কয়দিনের সেনাপতিত্বকালে সবচেয়ে বড় ঘটনা হল—ঈশ্বর বলে কথিত সেই মানুষটির অস্ত্রধারণ। কৃষ্ণ অর্জুনের সারথি হবেন বলে কথা দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন—এই যুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণ করব না।

কিন্তু ভাবনা একরকম থাকে, বাস্তব আরেকরকম। সেদিনকার যুদ্ধে ভীষ্মের সংহারমূর্তি এমন ভয়ানক আকার ধারণ করল যে, সেদিন আর কারও রক্ষা থাকবে বলে মনে হল না। এমন নিদারুণ যুদ্ধ দেখে চিরস্থির স্থিতধীরতার উপদেশক কৃষ্ণের পর্যন্ত খেয়াল থাকল না। তিনি হঠাৎই সিদ্ধান্ত নিলেন—আজকেই সুদর্শন চক্র হাতে নিয়ে এই ভীষ্ম এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের হত্যা করে আমি আমার বন্ধু অর্জুনের প্রীতিসাধন করব—প্রীতিং করিষ্যামি ধনঞ্জয়স্য। যেমন ভাব তেমন কাজ। স্মরণমাত্রেই সুদর্শনচক্র হাতে নিয়ে কৃষ্ণ নেমে পড়লেন অর্জুনের কপিধ্বজ রথ থেকে। পরম আক্রোশে ছুটতে লাগলেন ভীষ্মের রথের দিকে। এই অসামান্য পুরুষোত্তম যখন রথ থেকে নেমে অবতীর্ণ হলেন ভূমিতে, তখন মহাভারতের কবির যুদ্ধবর্ণী শব্দের মধ্যে মৃদুল অলংকারের স্পর্শ লাগল। কৃষ্ণ ছুটছেন, তাঁর স্কন্ধস্খলিত পীতবসন খানিকটা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে, যেন কালো মেঘের সঙ্গে আটকে রইল খানিকটা বিদ্যুতের প্রভা—ব্যালম্বিপীতান্তপটশ্চকাশে ঘনো যথা খে'চিরভাপিনদ্ধঃ।

সত্যি কথা বলি—এই মুহূর্তে মহাভারতের কবির এই সব বিদগ্ধ ভনীতির মধ্যে প্রত্যেক বর্ণই এমন চমৎকার যে তা এই নৃসিংহপ্রসাদের গদ্য-গ্রন্থায় একটুও মানাবে না। এই মুহূর্তে আমি মহাভারতের পাঠক হতেই শুধু ভালবাসি; ভালবাসি সহৃদয়ের হৃদয় নিয়ে এইসব বিশাল গম্ভীর শব্দরাশি হৃদয়ে অবধারণ করতে। আপনারা ভীষ্মের কথাই ধরুন না। এই পরিস্থিতিতে তাঁর কী অবস্থা হয়েছে। এত যে অস্ত্র হানাহানি, এত যে সৈন্যবাহিনীর কুচকাওয়াজ, কিন্তু মহাভারতের কবি যেন এক বিশাল যুদ্ধ-চিত্রপটের একধারে নতুন এক ছবি আঁকছেন। এ যেন চলমান চিত্রপ্রদর্শনীর মধ্যে ছোট্ট একটি 'ইনসেট'। কী করে বর্ণনা করব এই রচনা! এখানে যুদ্ধক্ষেত্রের বিশাল বীররসের মধ্যে হৃদয়নন্দন ভক্তিরসের মধুরতা সৃষ্টি হয়েছে। যিনি নিজে জীবনে প্রতিজ্ঞাচ্যুত হননি, তিনি তাঁর চাইতে অধিক শক্তিধর এক পুরুষোত্তমের প্রতিজ্ঞা ভেঙে দিচ্ছেন। এখানে একজন ক্রোধের ছলে অনুগ্রহ করছেন, অন্যজন অসামান্য বীরত্ব দেখাতে গিয়ে আত্মনিবেদন করছেন। এমন অদ্ভুত এবং বিপরীত রস-সমন্বয় কোন ভাষায় বোঝাব!

সুদর্শন হাতে কৃষ্ণকে ওইভাবে ছুটে আসতে দেখেই ভীষ্ম তাঁর গাণ্ডীবতুল্য ধনুকটির ছিলা টেনে ধরে বললেন—এসো গো এসো, প্রভু আমার, দেবতার দেবতা আমার! আমার

প্রণাম গ্রহণ করো। এই মুহূর্তে সবার সামনে তুমি তোমার জোরে আমাকে নামিয়ে ফেলে দাও এই রথ থেকে—প্রসহ্য মাং পাতয় লোকনাথ/রথোত্তমাৎ সর্বশরণ্য সংখ্যে। আজকে যদি আমি মরিও, তবু সেই আমার ভাল। পাঁচজনে অন্তত বলবে—এই ভীষ্মকে মারবার জন্য লোকনাথ কৃষ্ণ অস্ত্রধারণ করে ছুটেছিলেন। তুমি এসো, প্রভু আমার—এহ্যেহি দেবেশ জগন্নিবাস।

মহাভারতের বিশাল 'প্যানোরমার' মধ্যে ভক্তি এবং আত্মনিবেদনের এই আপ্লুতি পাঠককে ক্ষণেকের জন্য বিচলিত করবে হয়তো, কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ আপ্লুত করতে পারবে না। কারণ, মহাভারতের পরবর্তী যুদ্ধখণ্ড সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মন অধিকার করবে। কিন্তু পাঠক যদি এই মুহূর্তে শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে অভিনিবিষ্ট হন, তা হলে দেখবেন পুরুষোত্তম কৃষ্ণ সুদর্শনচক্র হাতে রথ থেকে নামামাত্রই ভীষ্ম তাঁর ধনুকবাণ ত্যাগ করে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে পড়েছেন রথের ওপর। তারপর আরম্ভ হল সেই অপূর্ব স্তবরাজ। ভীষ্মের সেই স্তবে আত্মনিবেদন আর শরণাগতির মহিমা এমনই উন্নতউজ্জ্বল যে, কারও যদি হরিস্মরণে সরস থাকে মন, তবে সেই স্তব তার হৃদয়ে অদ্ভুত এক আচ্ছন্নতা তৈরি করবে, আপ্লুতি তৈরি করবে। পুরুষোত্তম কৃষ্ণের মনুষ্যরূপ, ভীষ্মের আকুতি এবং অনুগত শরণাগতের জন্য পরম ঈশ্বরের আপন প্রতিজ্ঞাভঙ্গের কথা এখানে এমনই আন্তরিক স্পর্শে বর্ণিত হয়েছে যে অনুরাগী সজ্জনের হৃদয় একেবারে উদ্বেলিত হয়ে উঠবে। আমরা ভাগবত পুরাণের এই বর্ণনায় যাচ্ছি না, অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইচ্ছা করলে এই স্তবসুধা আস্বাদন করবেন।

মহাভারতে স্খলিত-উত্তরীয় কৃষ্ণের সচক্র অভিযান দেখে অর্জুনও ত্বরিতগতিতে নামলেন রথ থেকে। কোনও রকমে আপন প্রলম্বিত বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন কৃষ্ণকে। তবু কৃষ্ণের সরোষ গতিবেগ স্তব্ধ হল না। ভীষ্মের রথ তখনও একটু দূরে। অর্জুন কৃষ্ণকে ওইভাবে ধরে ফেলার পরেও আরও দশ পা এগিয়ে তাঁকে সম্পূর্ণ আটকে দিতে পারলেন—বলান্নিজগ্রাহ হরিং কিরীটী/পদে'থ রাজন্ দশমে কথঞ্চিৎ। অর্জুন বললেন—কী করছ তুমি, কৃষ্ণ! তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ—এই যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে না। এখন এমন কর্ম করলে যাতে লোকে হাসবে। আমি আমার ছেলে, আমার ভাইদের নামে শপথ করে বলছি—এই কৌরব নায়কদের আমিই অন্ত ঘটাব। তুমি আমাকে শুধু সাহায্য করো। অর্জুনের কথা শুনে কৃষ্ণ আত্মস্থ হয়ে আবারও রথে উঠলেন। আবারও ভয়ংকর যুদ্ধ আরম্ভ হল।

ক্রমাগত আটদিন ভয়ংকর যুদ্ধ হবার পর কৌরব পাণ্ডব উভয় পক্ষেরই ভালরকম ক্ষয়ক্ষতি হল। তবে পাণ্ডবদের ক্ষয় অনেকটাই সৈন্যসামন্তের ওপর দিয়ে গেল, কিন্তু কৌরবপক্ষে দুর্যোধনের বেশ কয়েকটি ভাই মারা গেলেন। এবার দুর্যোধনের সহনশক্তি কমে এল। ভীমের হাতে কয়েকটি ভাইয়ের মৃত্যু হতে দেখে তাঁর ক্রোধ হল, যদিও তিনি একবারও ভাবলেন না যে, অর্জুনের পুত্র ইরাবানও এই যুদ্ধে মারা গেছেন। তবে আমাদের ধারণা, ভাইদের মৃত্যুতে দুর্যোধনের যত কষ্ট হয়েছে, তারচেয়ে অনেক বেশি ক্রোধ হয়েছে নিজের অপমানে। ভীমের পুত্র ঘটোৎকচের মায়াযুদ্ধে তিনি একেবারে বোকা বনে গিয়েছিলেন এবং ক্রোধের কথা হল—ভীম সেই যুদ্ধটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছেন। আর কি সহ্য হয়! দুর্যোধন ভীষ্মের কাছে এসে অনুযোগের সুরে বলেও ছিলেন—এটা কেমন হল, পিতামহ! আমার এগারো অক্ষৌহিণী সেনা আপনার হাতে দিয়েছি। সেখানে ভীমের মতো একটি লোক শুধুমাত্র ঘটোৎকচের ক্ষমতায় আমাদের হারিয়ে দিয়ে গেল! রাগে আমার গা পুড়ে যাচ্ছে, পিতামহ! শুকনো গাছে আগুন ধরলে যেমন হয়, তেমনিই গা পুড়ে যাচ্ছে আমার—তন্মে দহতি গাত্রাণি শুষ্কং বৃক্ষমিবানলঃ।

ভীষ্ম খুব বেশি আমল দেননি এসব কথার। যুদ্ধক্ষেত্রে এসব তো আছেই। কেউ কখনও এগিয়ে যাবে, কখনও বা পিছোবে, কোনও দিন জিতবে, কোনও দিন বা হারবে। দুর্যোধনের

অবস্থা দেখে ভীষ্ম অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকে বলেছিলেন—দেখো বাপু! তুমি নিজেকে সব সময় বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করবে। আর ঘটোৎকচ, ভীম এদের সঙ্গে তোমার যুদ্ধ করার দরকারটা কী? তুমি সব সময় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। রাজার সঙ্গেই না রাজার যুদ্ধ করা মানায়—রাজধর্মং পুরস্কৃত্য রাজা রাজানমর্চ্ছতি। আর ভীম অর্জুন—এদের সব আমরা দেখছি! আমি, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা—এঁরা আছেন কী করতে?

ভীষ্ম দুর্যোধনকে বুঝিয়েছিলেন বটে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তবতা মনের ভাবনা অনুসারে চলে না। পরের দিনের যুদ্ধেই দুর্যোধনের কয়েক ভাই ভীমের হাতে মারা পড়লেন এবং ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ দুর্যোধন গজর গজর করতে থাকলেন কর্ণের কাছে। দুর্যোধন বললেন—ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপরা মোটেই পাণ্ডবদের আটকে রাখতে পারছেন না এবং কেন তাঁরা পারছেন না, তার কারণও আমি বুঝতে পারছি না—ন পার্থান্ প্রতিবাধন্তে ন জানে তস্য কারণম্। পাণ্ডবরা আমার সৈন্যধ্বংস করে যাচ্ছে, আর আমিও অপমানিত হচ্ছি পদে পদে। ভীষ্ম দ্রোণ—এঁদের নিয়ে আমি বড় সংশয়ে আছি, কেমন করে যে যুদ্ধ করব তাও ঠিক জানি না।

কর্ণ তাঁর স্বাভাবিক অহমিকায় ভীষ্মকে তাচ্ছিল্য করে বললেন—এত কিছু চিন্তা কোরো না, ভাই, দুর্যোধন! এই যুদ্ধ থেকে ভীষ্ম অবসর নিন, তখন দেখো। একবার এই বুড়ো অস্ত্রশস্ত্র হাত থেকে নামিয়ে রাখুক—নিবৃত্তে যুধি গাঙ্গেয়ে ন্যস্তশস্ত্রে চ ভারত—তখন দেখো আমি একাই এই সমস্ত পাণ্ডব পাঞ্চালদের সামাল দেব। দুর্যোধন কারণ বুঝতে পারছিলেন না, কর্ণ তাই কারণ দেখিয়ে বললেন—তুমি কি জান না যে, পাণ্ডবদের ব্যাপারে ভীষ্মের দুর্বলতা আছে—পাণ্ডবেষু দয়াং নিত্যং স হি ভীষ্মঃ করোতি বৈ। তা ছাড়া তুমি কি বোঝ না —ওই বুড়ো ভীষ্ম কখনও পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে? বুড়োর অহংকার আছে ষোলো আনা, আর যুদ্ধ করতেও বেশ ভালবাসে, কিন্তু ওই অহংকার আর ভালবাসা দিয়ে কি আর সমবেত পঞ্চ পাণ্ডবকে জয় করা যায়—স কথং পাণ্ডবান্ যুদ্ধে জেষ্যতি তাত সঙ্গতান্। তারচেয়ে আমি বলি কী, তুমি ভীষ্মের কাছে গিয়ে তাকে মান্যি-মর্যাদা দিয়ে তাঁর অস্ত্রশস্ত্রগুলি শুধু নামিয়ে রাখতে বলো। তারপর আমার হাতে পড়লে, বুঝে নাও পাণ্ডবরা মরেই গেছে—নিহতান্ পশ্য পাণ্ডবান্।

কর্ণের কথা শুনে দুর্যোধন চললেন ভীষ্মের কাছে। বেশ একটু সেজেগুজেই চললেন। গায়ে চন্দন-কুঙ্কুম মেখে, মাথায় পাগড়ি পরে। ভাবটা এই, ভীষ্মের সামনে উপস্থিত হবার পর ভীষ্মের ব্যক্তিত্ব যেভাবেই কাজ করুক, যেভাবে, যেমনটি তিনি কর্ণের পরামর্শমতো বলবেন ভেবেছিলেন, তেমনটিই তিনি বলবেন। সেই জন্যেই সেজেগুজে 'কনফিডেনটলি' চললেন। তাঁর সঙ্গে ভাইরাও চলল অনুগামীর মতো। ভীষ্মকে যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া সত্ত্বেও দুর্যোধন কিন্তু নিজের ক্ষোভ একটুও চেপে রাখতে পারলেন না। প্রথমে তিনি বললেন—আপনার ভরসাতেই তো যুদ্ধ করছি, পিতামহ! কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, আপনার আশ্রয়ে থেকে যুদ্ধ করলে দেবতা অসুরদেরও আমরা জয় করতে পারি, সেখানে এই পাণ্ডবরা কোন ছার। তবে আপনি এবার আমাদের দিকে একটু তাকান, পাণ্ডবদের মারুন একে একে—জহি পাণ্ডুসুতান্ বীরান্। বাকি সৈন্যবাহিনী ধ্বংসের ভার আমাদের।

দুর্যোধন এবার নির্লজ্জভাবে কর্ণের কথাটা তুলে বললেন—আর যদি এমন হয় যে, পাণ্ডবদের ওপর মায়ায় আপনি তাঁদের ছোঁবেন না, অথবা যদি এমন হয় যে, আমার ওপর বিদ্বেষ থাকার জন্যই হোক কিংবা আমার কপাল মন্দ বলেই হোক, আপনি যদি পাণ্ডবদের বার বারই ছেড়ে দেন—মন্দভাগ্যতয়া বাপি দ্বেষ্যভাবান্মম প্রভো—তা হলে আপনি আজ্ঞা করুন, কর্ণ যুদ্ধ করবে। সে পাণ্ডবদের মেরে ছাড়বে।

দুর্যোধনের মুখে এমন অপমানজনক কথা শুনে ভীষ্ম একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। প্রথমে তো কথাই বলতে পারলেন না। তার যেমন দুঃখ হল, তেমনই ক্রোধ। খানিকক্ষণ তিনি চুপ করে বসেই রইলেন। নিশ্বাস পড়তে লাগল ঘন ঘন। চোখদুটি রক্তবর্ণ হয়ে উঠল ক্রোধে। তবু ভীষ্ম দুর্যোধনের মতো চক্ষুলজ্জাহীনভাবে তাঁকে প্রত্যুত্তর দিতে পারলেন না। শান্তভাবে তিনি বললেন—কেন দুর্যোধন! কেন তুমি এইভাবে কঠিন কর্কশ কথা বলে পীড়ন করছ আমাকে? সমস্ত ঘটনাপ্রবাহ যেখানে যুদ্ধে পরিণত হয়েছে, সেখানে আমি যথাশক্তি চেষ্টা করছি তোমার প্রিয় সাধন করার জন্য। তোমারই প্রিয় কামনায় এই ভীষণ যুদ্ধে নিজের প্রাণ বলি দেবার জন্য তৈরি হয়েছি—জুহ্বানং সমরে প্রাণাংস্তব বৈ প্রিয়কাম্যয়া। তবুও তুমি যেমন চাইছ, অর্থাৎ পাণ্ডবদের আমি কেন মারতে পারছি না, তার কারণ ছড়িয়ে আছে বহু জায়গায়।

ভীষ্ম একের পর এক উদাহরণ দিয়ে চললেন—কীভাবে কখন অর্জুন তাঁর একক ক্ষমতায় সমস্ত কৌরববীরদের পর্যুদস্ত করে পাণ্ডবদের বিজয় এনে দিয়েছেন। যে কর্ণের জন্য দুর্যোধনের এত গর্ব, সেই কর্ণ কীভাবে অর্জুনের হাতে পরাজিত হয়েছেন একাধিকবার সে উদাহরণও দিতে ভুললেন না ভীষ্ম। ভীষ্ম বললেন—পাণ্ডবরা যখন খাণ্ডবপ্রস্থের বনভূমি দগ্ধ করে ইন্দ্রপ্রস্থ তৈরি করেছিল, তখন অর্জুন যেভাবে ইন্দ্রকেও পরাজিত করেছিল, সেখানেই পর্যাপ্ত নিদর্শন আছে—কেন আমি পাণ্ডবদের মারতে পারছি না। পাণ্ডবদের বনবাসের সময় গন্ধর্বরা যখন তোমাকে হরণ করেছিল, এবং তোমার ভাইবন্ধুরা, এমনকী কর্ণও পালিয়ে বেঁচেছিল, তখন যে তোমাকে গন্ধর্বদের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছিল, সেখানেই পর্যাপ্ত নিদর্শন আছে—কেন আমি পাণ্ডবদের মারতে পারছি না। আবার পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সময় যখন আমরা সবাই মিলে বিরাটরাজার গোধন হরণ করতে গিয়েছিলাম, তখন যে আমাদের যুদ্ধ-মূর্ছিত করে, আমার, তোমার, কর্ণের, দ্রোণের—সবার, সমস্ত কুরুমুখ্যদের মাথার উষ্ণীষ খুলে নিয়ে গিয়েছিল, সেখানেই পর্যাপ্ত নিদর্শন আছে, কেন আমি পাণ্ডবদের মারতে পারছি না—বাসাংসি স সমাদত্ত পর্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্।

অর্জুনের অলৌকিক অস্ত্রক্ষমতার পরিচয় দিয়ে দুর্যোধনকে একটু তিরস্কার করেই ভীষ্ম বললেন—অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করে জিতবে এমন লোক কোথায়? তারমধ্যে এমন একজন তাকে সাহায্য করছেন, তিনি এই জগৎসংসারেরও রক্ষক—তস্য গোপ্তা জগদ্‌গোপ্তা

শঙ্খচক্রগদাধর! অতএব সেই অর্জুনকে জিতে নেওয়া—তুমি যে কী বলছ, না বলছ—তা তুমি নিজেই ভাল করে জানো না—ন জানীষে বাচ্যাবাচ্যং সুযোধন।

দুর্যোধন যেভাবে পরোক্ষে কর্ণের সেনাপতিত্বের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন ভীষ্মের কাছে, তাতে যত অপমান এই বৃদ্ধের হয়েছিল, সেই তুলনায় এতক্ষণ যথেষ্টই কোমলভাবে তিনি দুর্যোধনকে তাঁর প্রতিবক্তব্য শুনিয়েছেন। কিন্তু এই কথার পৃষ্ঠে কথার ওপরেও তাঁর কিছু ভাবনা আছে। এতকাল ধরে তিনি এই কুরুবংশের ওঠানামা দেখেছেন। এই বংশের প্রতিটি ব্যক্তিকে তিনি বড় কাছ থেকে চেনেন। জ্ঞাতিশত্রুতা এবং অহংকার দুর্যোধনকে বড় স্ফীত করে তুলেছে। ভীষ্ম এই আস্ফোট আর সহ্য করতে পারছেন না। তিনি বললেন—দেখো দুর্যোধন! মানুষের মরণকাল উপস্থিত হলে সে তার সামনের সবুজ গাছপালাগুলিকেও সোনার বরণ দেখে—মুমূর্ষু-র্হি নরঃ সর্বান্ বৃক্ষান্ পশ্যতি কাঞ্চনান্—তোমারও হয়েছে সেইরকম। সব কিছুই তুমি বিপরীত দেখছ। ভাবটা এই—এতটাই বিপরীত যে, সর্বজিৎ অর্জুনকেও কর্ণ মেরে ফেলবে বলে তুমি ভাবছ। ভীষ্ম বললেন—দেখো, এই যুদ্ধ বাধিয়ে নিয়েছ তুমি। তা হলে পাণ্ডব পাঞ্চালদের তুমি একাই শেষ করে দাও না। দেখি তুমি কেমন পুরু—যুধ্যস্ব তানদ্য রণে পশ্যামঃ পুরুষো ভব।

এতসব তিরস্কারের পরেও কিন্তু ভীষ্ম নিজের দায়িত্ব অস্বীকার করলেন না। তাঁকে সেনাপতি করা হয়েছে এবং সেই পদের দায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি সচেতন। দুর্যোধনকে তিনি বলেই দিলেন—আজকে তুমি ভাল করে ঘুমোও, কালকে আমি এমন যুদ্ধ করব যে, বহুকাল লোকে সে কথা মনে রাখবে—সুখং স্বপিহি গান্ধারে শ্বো'স্মি কর্তা মহারণম্। দুর্যোধন একথায় অনেকটাই নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি গেলেন এবং পরের দিন সমাগত রথী মহারথীদের বলে দিলেন যাতে তাঁরা ভীষ্মকে রক্ষা করে চলে। কারণ ভীষ্ম শিখণ্ডীর প্রতি অস্ত্রনিক্ষেপ করবেন না। পাণ্ডবরা শিখণ্ডীর সাহায্যে ভীষ্মকে পর্যুদস্ত করতেও পারেন।

পরের দিনের যুদ্ধ ভয়ংকরভাবে আরম্ভ হল বটে, কিন্তু কৌরবপক্ষের তাতে যে খুব সুবিধে হল, তা নয়। পরের দিন অর্জুনপুত্র অভিমন্যু এমন যুদ্ধ আরম্ভ করলেন যে, সারাক্ষণ তাঁকে নিয়েই কৌরবপক্ষকে ব্যস্ত থাকতে হল। কিন্তু দিন যখন শেষ হয়ে আসছে ভীষ্ম সেই সময় ভয়ংকর মরণরূপ ধারণ করলেন। পাণ্ডবদের সৈন্যসামন্ত ক্ষয় করে এমন তোলপাড় অবস্থা করলেন তিনি যে, অর্জুন অন্যত্র যুদ্ধে ব্যস্ত থাকলেও ভীষ্মকে আটকানোর জন্য তড়িঘড়ি ছুটে আসতে বাধ্য হলেন। অর্জুন প্রথমে দু-একবার তাঁর ধনুকটনুক কেটে দিলেন বটে এবং তার জন্য প্রতিপক্ষী ভীষ্মের প্রশংসা সম্ভ্রমও লাভ করলেন যথেষ্ট, কিন্তু অবশেষে ভীষ্মকে তিনি আর রোধ করতে পারছিলেন না।

প্রিয়সখার অবস্থা দেখে আবারও পার্থসারথি কৃষ্ণের ছটফটানি আরম্ভ হল। সৈন্যসামন্তের নাকাল অবস্থা এবং ভীষ্মের সংহারমূর্তি দেখে বাসুদেব কৃষ্ণ আবারও হঠাৎ নেমে পড়লেন রথ থেকে। ভূতাবিষ্টের মতো—কী করছেন, সেদিকে যেন তাঁর খেয়ালই নেই। সিংহের মতো গর্জন করতে করতে খালি হাতে তিনি আবারও ছুটে চললেন ভীষ্মের দিকে। বেশিরভাগ মানুষই জানেন যে, ভীষ্মের যুদ্ধকালে তার ভয়ংকর যুদ্ধোন্মাদ স্তব্ধ করবার জন্য বাসুদেব কৃষ্ণ একবারই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে যুদ্ধ করতে নেমেছিলেন। কিন্তু আসলে দেখছি—এ ঘটনা দুবার ঘটেছে। পা দাপিয়ে পৃথিবী কাঁপিয়ে ক্ষোভে ক্রোধে রক্তচক্ষু কৃষ্ণ ছুটলেন ভীষ্মের দিকে—অভিদুদ্রাব ভীষ্মং স ভুজপ্রহরণো বলী। সৈন্যসামন্ত সাধারণেরা কৃষ্ণের অতিলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। অতএব কৃষ্ণ খালিহাতে ভীষ্মের দিকে ছুটে গেলেও তারা আগে থেকেই চেঁচাতে থাকল—মরলেন এবার, মরলেন ভীষ্ম—হতো ভীষ্মো হতো ভীষ্মস্তত্র তত্র বচো মহৎ।

কৃষ্ণকে থামানোর কৌশল ভীষ্মই সবচেয়ে ভাল জানেন। তা আগেই দেখা গেছে। কৃষ্ণের সম্বন্ধে ভীষ্মের ধারণাও ভগবত্তার চেতনায় আচ্ছন্ন। সেই যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে —যখন প্রায় কেউই কৃষ্ণকে বলে এবং বুদ্ধিতে সকলের অধিক বলে মেনে নেননি, সেদিনও এই বৃদ্ধ প্রায়-যুবক এক কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় ভূষিত করেছিলেন। আজও সেই একই মর্যাদা। কৃষ্ণ তাঁর দিকে সক্রোধে দৌড়োতে থাকেন, আর তিনি অক্লেশে নিরুপদ্রব চিত্তে অস্ত্রত্যাগ করে অক্রোধে যাচনা করেন—এই ভয়ংকর যুদ্ধে আজকে আমাকে শেষ করে দাও প্রভু। তুমি মারো আমাকে—মামদ্য সাত্বতশ্রেষ্ঠ পাতয়স্ব মহাহবে।

পিতার কাছে যিনি ইচ্ছামৃত্যুর বর লাভ করেছিলেন, এতকাল সংসারের বিচিত্র গতি দেখে বহুবার মরতে ইচ্ছা করেও আরও দেখার লোভে যিনি মরণেচ্ছা সংবরণ করেছেন, তিনি এইভাবে মরতে চান। ঈশ্বরকল্প কৃষ্ণের হাতে তিনি নিজেকে সঁপে দিতে চান। বার বার বলেন—কৃষ্ণ! মারো আমাকে। আমি তোমার ভৃত্যমাত্র। তুমি যদি মার, তবেই আমার লাভ, তবেই মঙ্গল—প্রহরস্ব যথেষ্টং বৈ দাসো'স্মি তব চানঘ। ভীষ্মের এই অদ্ভুত আচরণ আর ওদিকে কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখে অর্জুন আবারও ছুটে চললেন কৃষ্ণের পেছন পেছন। কোনও রকমে জাপটে ধরে অনুনয় করে অর্জুন থামালেন কৃষ্ণকে। বার বার মনে করিয়ে দিলেন—তুমি না প্রতিজ্ঞা করেছিলে, যুদ্ধ করবে না। অথচ একই কাজ করে চলেছ। লোকে যে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে উপহাস করবে—মিথ্যাবাদীতি লোকত্বাং কথয়িষ্যন্তি মাধব।

কৃষ্ণ থামলেন। অর্জুন তাঁকে কথা দিলেন—ভীষ্মের অন্তিম ব্যবস্থা তিনিই করবেন। অর্জুনের কথা শুনে কৃষ্ণ নিজের গতি রুদ্ধ করলেন বটে, কিন্তু পুরোপুরি গেল না তাঁর ক্রোধ। কৃষ্ণ ফিরে এসে রথে উঠতেই ভীষ্ম আবারও শরবর্ষণ আরম্ভ করলেন আগের মতোই। কৃষ্ণকে ফেরাবার জন্যই হয়তো অর্জুন বলেছিলেন—আজই। আজই আমি পিতামহকে মরণের পথে নিয়ে যাব—কিন্তু সেদিন ভীষ্ম দুর্যোধনকে কথা দেবার ফলে এমন যুদ্ধই করেছিলেন যে, পাণ্ডবরা তেমন যুদ্ধ কোনও দিন দেখেননি। পাঁকের মধ্যে পা ডুবে গেলে গোরুর যে অবস্থা হয়, তেমনই আঁকুপাকু অবস্থা হয়ে গিয়েছিল পাণ্ডবপক্ষের সমস্ত সৈন্যদের। ভীষ্মের শরবর্ষণে বিপর্যস্ত হয়ে কেউ সেদিন এমন কাউকে ত্রাতা হিসেবে পায়নি যিনি সৈন্যদের বাঁচাতে পারেন।

বাঁচালেন সূর্যদেব। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। কে কার সঙ্গে যুদ্ধ করছে, তা যখন আর কিছুই দেখা যায় না, তখন দুপক্ষই সেদিনকার যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন—ততো'বহারং সৈন্যানাং কৃত্বা তত্র মহারথাঃ। পাণ্ডবরা ক্ষতবিক্ষত শরীরে নিজেদের শিবিরে প্রবেশ করলেন এবং তাঁদের মনে শান্তি বলে কিছু রইল না। ভীষ্মের প্রলয়ংকর মূর্তির কথা স্মরণ করে তাঁরা রীতিমতো আতঙ্কিত হলেন। যুদ্ধবেশ ছেড়ে সারা শরীরে ভেষজ ঔষধের প্রলেপ লাগানোর পর পাণ্ডবরা যখন একটু ঝরঝরে বোধ করছেন, তখন রাত্রি হয়ে গেছে—ততো রাত্রিঃ সমভবৎ সর্বভূতপ্রমোহিনী। সেই রাতের অন্ধকারেই পাণ্ডবভাইরা কৃষ্ণকে নিয়ে 'মিটিং'এ বসলেন।

যুধিষ্ঠির ভীষ্মের ব্যাপারে গভীর আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। বস্তুত নবম দিনের যুদ্ধে পাণ্ডবসৈন্যদের এত ক্ষতি হয়ে গেছে যে, তাতে যুধিষ্ঠির শুধু উদ্‌বিগ্নই বোধ করছেন না, তিনি অত্যন্ত শোকগ্রস্তও হয়ে পড়েছেন সাধারণ সৈন্যের করুণ অবস্থা দেখে। কৃষ্ণকে তিনি বলেই ফেললেন—ভীষ্ম আমাদের এমন মার মারছেন যে, আমার আর যুদ্ধ করার ইচ্ছে নেই একটুও—ন যুদ্ধং রোচয়ে কৃষ্ণ হন্তি ভীষ্মে হি নঃ সদা। এত লোকের মৃত্যু দেখে যুধিষ্ঠির বৈরাগ্য বোধ করছেন অন্তরে। বার বার তাঁর মনে হচ্ছে যে, শুধুমাত্র রাজ্যলাভের কারণে এই পরিমাণ লোকক্ষয় সহ্য করার চেয়ে বনে বাস করাও অনেক ভাল। জীবনের

যতটুকু অবশেষ আছে—যুধিষ্ঠিরের ধারণা, ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে গেলে এত সাধের জীবনটাও আর থাকবে না—অতএব জীবনের যতটুকু অবশেষ আছে, সেই সময়টুকু ধর্মকর্ম করেই কাটানো ভাল বলে তিনি মনে করেন—জীবিতস্যাদ্য শেষেণ চরিষ্যে ধর্মমুত্তমম্।

কৃষ্ণ অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে যুধিষ্ঠিরের কথা শুনলেন। তিনি প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। যুধিষ্ঠিরের মনের অবস্থা তিনি বুঝতে পারছেন। আবার এটাও বুঝতে পারছেন যে, যুধিষ্ঠির যেভাবে মনোবল হারিয়ে বসে আছেন, তাতে সমস্ত যুদ্ধ-প্রক্রিয়াটাই ভেঙে পড়বে। কৃষ্ণ তাই প্রথমে তাঁকে উৎসাহ জোগানোর জন্য বললেন—আপনার এতগুলো পরাক্রান্ত ভাই থাকতে কীসের এত চিন্তা? তা ছাড়া আমি তো আছি। আপনি আমাকে আদেশ করুন, আমি যুদ্ধ করব ভীষ্মের সঙ্গে। আপনি আদেশ করলে আমি করতে পারব না হেন কাজ নেই। ভীষ্মকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মারব, ওঁদের কৌরবরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে মৃত্যু দেখবে—হনিষ্যামি রণে ভীষ্মমাহূয় পুরুষর্ষভম্। কৃষ্ণ অভয় দিয়ে বললেন—আরে দাদা! পাণ্ডবদের শত্রু যিনি, তিনি আমারও শত্রু। আপনার অর্জুন আমার সখা, সম্বন্ধী এবং শিষ্য। অর্জুনের জন্য শরীর থেকে মাংস কেটে দিতেও আমার আপত্তি নেই—মাংসানুৎকৃত্য দাস্যামি ফাল্গুনার্থে মহীপতে।

কৃষ্ণ নিজের কথা এতটা ঢাক পিটিয়ে বললেন, যাতে যুধিষ্ঠিরের মনোবল ফিরে আসে। তিনি জানতেন তাঁর কথায় অর্জুন উজ্জীবিত হবেনই এবং সত্যি তিনি যুধিষ্ঠিরের মতো ভেঙে পড়বার লোক নন। কৃষ্ণ নিজের কথা এত বলেও কিন্তু তাঁর বিকল্প হিসেবে অর্জুনের কথাটা জানিয়ে দিতে ভোলেননি। তিনি বলেছেন—ভীষ্মকে মারবার ভার তো অর্জুনের ওপরেই আছে—অথবা ফাল্গুনস্যৈব ভারো পরিমিতো রণে—আর সে ইচ্ছে করলে ভীষ্মকে মারতে পারবে না, এটা আমি বিশ্বাসই করি না—কিমু ভীষ্মং নরাধিপ।

কৃষ্ণ যে নিজে বার বার যুদ্ধ করতে চাইছেন নিজের প্রতিজ্ঞা যুদ্ধ না-করার শর্ত ভেঙে—এমনকী নিজের প্রতিজ্ঞা ভেঙে তিনি যে রথ থেকে দু-দুবার নেমেও পড়েছিলেন যুদ্ধের জন্য, তার পেছনে একটা রহস্য আছে। কৃষ্ণ বেশ বুঝতে পারছিলেন যে, অর্জুন ইচ্ছাকৃতভাবে ওই ভীষ্মবধের কষ্টকর্ম থেকে নিজেকে যত কাল সম্ভব দূরে রাখতে চাইছেন। মনে রাখতে হবে, সর্বসমেত আঠেরো দিনের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শুধু ভীষ্মের পতন ঘটতেই লেগেছিল দশ দিন এবং সেটা অবশ্যই তিনি অর্জুনের পিতামহ বলেও বটে, আবার তাঁকে দিয়েই কুরুসেনাপতির নিধন শুরু করতে হয়েছিল বটে। লক্ষ করে দেখুন, কৃষ্ণ বার বার যুধিষ্ঠিরকে বলছেন—দেখুন, যদি অর্জুন ভীষ্মকে মারতে ইচ্ছা না করে—যদি নেচ্ছতি ফাল্গুনঃ—তবে আমিই মারব তাঁকে। আবার বলছেন—আপনি আমাকেই ভীষ্মবধে নিয়োগ করুন, দাদা। যদিও অর্জুন সেই যুদ্ধের উদ্যোগকালে সর্বলোকের সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে সেই মারবে ভীষ্মকে—প্রতিজ্ঞাতমুপপ্লব্যে যত্তৎ পার্থেন পূর্বতঃ। কিন্তু এখনও যখন ঘটনাটা ঘটে ওঠেনি, তখন, সে অনুমতি করলে আমিও কাজটা করে দিতে পারি—অনুজ্ঞাতস্তু পার্থেন ময়া কার্যং ন সংশয়ঃ।

এই যে বার বার কৃষ্ণ বলছেন—অর্জুন চাইলে—অথবা সেই প্রতিজ্ঞা করেছিল—অথবা সে অনুমতি করলে—এই কথাগুলি থেকে বোঝা যায় যে, অর্জুন সঠিকভাবে ভীষ্মবধের উদ্যোগ নেননি এবং তা ইচ্ছাকৃতভাবেই। সেকালের দিনে একটি যুদ্ধরথের সারথি শুধু ঘোড়াকে ঘাস খাওয়াতেন না, অথবা ঘোড়া চালিয়ে নিয়ে যাবার কৌশলমাত্র শিখলেই তিনি রথ চালাতে পারতেন, তাও নয়। সারথিকে প্রায় রথীর সমান যুদ্ধবিদ্যা জানতে হত। বিশেষত কৃষ্ণের মতো চতুর সারথি, যিনি নাকি পাণ্ডবদের সমস্ত কর্মোদ্যোগে ব্যক্তিগতভাবে জড়িত, তিনি অর্জুনের সমস্ত ক্রিয়াকর্ম উদ্যোগ দেখে বুঝতে পারছেন যে, ভীষ্মবধের ক্ষেত্রে তাঁর অনীহা, অচেষ্টা, অবহেলা সবই আছে। এটা বোঝাতেই তিনি দু-দুবার

প্রতিজ্ঞা ভেঙে যুদ্ধ করতে নেমেছিলেন এবং দু-দুবারই অর্জুনের কাছ থেকে কথা আদায় করেছিলেন যে, অর্জুনই ভীষ্মকে মারবেন। আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনেও তিনি বার বার নিজে যুদ্ধ করতে চেয়েছেন পরোক্ষে অর্জুনকে প্রোৎসাহিত করার জন্য এবং শেষ সিদ্ধান্ত করার সময় তিনি পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, ভীষ্মবধের ব্যাপারে অর্জুনের ইচ্ছাকৃত অনুদ্যোগ আছে। তিনি বলেছেন—আজকে যদি স্বয়ং দেবতারা তাঁদের সমকক্ষ জ্ঞাতিভাই দৈত্য দানবদের সঙ্গে নিয়েও অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসেন, তবুও তাঁরা অর্জুনের কাছে হার মানবেন, সেখানে ভীষ্ম কোন ছার। তবে হ্যাঁ, যুদ্ধক্ষেত্রে অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে কোনও অসুবিধেই তাঁর হবে না, যদি তিনি ঠিক ঠিক উদ্যোগটি নেন—অশক্যমাপ কুর্যাদ্ধি রণে পার্থঃ সমুদ্যতঃ।

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের কথায় যথেষ্ট উৎসাহিত হলেন এবং যথেষ্ট লজ্জিত হয়ে বললেন—না না, আমাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমরা তোমাকে সত্যচ্যুত হতে দিতে চাই না—ন ত্বামনৃতং কর্তুমুৎসহে স্বার্থগৌরবাৎ। তুমি যুদ্ধ না করেই আমাদের শুধু সাহায্য করে যাও। যুধিষ্ঠির এবার ভীষ্মবধের উপায় নিরূপণের জন্য বললেন—ভীষ্ম নিজেই আমাকে এক সময় বলেছিলেন যে, তিনি আমাদের হয়ে যুদ্ধ করবেন না বটে, তবে আমাদের উপযুক্ত পরামর্শ দিতে তিনি সংকুচিত হবেন না। যুধিষ্ঠির প্রস্তাব করলেন—অতএব তাঁর কাছে গিয়েই তাঁর মৃত্যুর উপায় জিজ্ঞাসা করতে হবে আমাদের—তস্মাদ্দেবব্রতং ভূয়ো বধোপায়ার্থমাত্মনঃ।

যুধিষ্ঠির ভয়ানক লজ্জিত এবং আরও সংকুচিত বোধ করছেন এই কথা ভেবে যে, সময়কালে ক্ষত্রিয় পুরুষকে কত নির্মম এবং নির্দয় হয়ে উঠতে হয়। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলেছেন—ধিক! শত ধিক এই ক্ষত্রিয়ের বৃত্তিকে, যেখানে বাবার বাবা, আমাদের বুড়ো ঠাকুরদাদাকে আমরা মারার কথা ভাবছি—তঞ্চেৎ পিতামহং বৃদ্ধং হন্তুমিচ্ছামি মাধব। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের প্রস্তাব মেনে নিলেন এবং ভীষ্মের কাছে গিয়েই তাঁর বধের উপায় জানাটাই যে শ্রেয়, সে সম্বন্ধেও একমত হলেন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে। সত্যি কথা বলতে কী, পাণ্ডবরা বিশেষত অর্জুন এবং কৃষ্ণ কি জানতেন না যে, শিখণ্ডীকে সামনে রেখে যুদ্ধ করলে ভীষ্ম আর অস্ত্রধারণ করবেন না? জানতেন। যথেষ্টই জানতেন। কিন্তু এটা হল মর্যাদার পন্থা। বটবৃক্ষের মতো এই বৃদ্ধ পিতামহ, যিনি বাল্যকাল থেকে স্নেহে মায়ায় পাণ্ডবকুমারদের বড় করে তুলেছেন এবং তাঁদের পিতার অভাব বুঝতে দেননি—বালাঃ পিত্রাবিহীনাশ্চ তেন সংবর্ধিতা বয়ম্—তাঁকে মারতে চাইতে হলে তাঁর কাছেই যদি তাঁর মরণোপায় জিজ্ঞাসা করা যায়, তবে তাঁকে খানিকটা মর্যাদা দেওয়া হয় অন্তত। অন্তত সেই বৃদ্ধের সুচিরকালসঞ্চিত অহংবোধ খানিকটা তৃপ্ত হয় তাতে। তিনি ভাবতে পারেন—আরে! বুড়ো হলে কী হবে। অর্জুনের মতো মহাপরাক্রমী বীরকেও আমার কাছে আসতে হয়েছে আমারই মৃত্যুর উপায় জানবার জন্য। ওরা পারেনি, আমার সঙ্গে ওরা পারেনি।

দেখবেন, বাস্তবে যখন যুধিষ্ঠির ভাইদের সঙ্গে নিয়ে ভীষ্মের কাছে এসেছিলেন, তখন বৃদ্ধের মুখে আমরা এই অহংবোধের পরিতৃপ্তিই দেখেছি। যুধিষ্ঠির যখন মুক্তশস্ত্র অবস্থায় কৌরবশিবিরে এসে ভীষ্মের সঙ্গে দেখা করে বলেছিলেন—আপনিই আপনার মৃত্যুর উপায় বলে দিন, পিতামহ! নইলে স্বর্গ থেকে যদি দেবরাজ ইন্দ্রও নেমে আসেন ভূঁয়ে, তবু তিনি আপনাকে হারাতে পারবেন না—তখন বৃদ্ধ পিতামহ পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বলেছিলেন—কথাটা এক অর্থে তুমি ঠিকই বলেছ, যুধিষ্ঠির! আমার হাতে অস্ত্র থাকতে দেবতা, অসুর কারও সাধ্য নেই আমাকে যুদ্ধে হারায়—নাহং শক্যো রণে জেতুং সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ। তবে হ্যাঁ, আমি যদি হাত থেকে অস্ত্র নামিয়ে রাখি, তবে তোমাদের যেসব বীর মহাবীর আছেন, তাঁরা আমাকে মারতে পারেন বটে—ন্যস্তশস্ত্রং তু মাং রাজন্নেতে হন্যুর্মহারথাঃ।

কোনও ক্ষত্রিয় বীরকে লজ্জা দেবার পক্ষে এর থেকে তাচ্ছিল্যের ভাষা আর হয় না।

তিনি অস্ত্র নামিয়ে রাখবেন আর অন্যেরা তাঁকে মারবে—অর্থাৎ আমি যুদ্ধ করছি না, তাই তোরা পারলি, নইলে অসম্ভব ছিল আমাকে জেতা—এইটা বললেন ভীষ্ম। কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, অর্জুন—এই কথাগুলি শ্রদ্ধা সহকারে হজম করবেন বলেই এই কথাগুলি শোনার জন্য এসেছেন। নইলে অর্জুনের বীরত্ব যেভাবে শত্রুদের মুখে, বিশেষত ভীষ্ম-দ্রোণের মুখেই প্রকাশিত হয়েছিল বারংবার, তাতে এটা ভাবার কোনও কারণ নেই যে, অর্জুন ভীষ্মকে যুদ্ধে জয় করতে পারতেন না। তা ছাড়া শিখণ্ডীকে সামনে রেখে যুদ্ধ করলে ভীষ্ম তাকে অস্ত্রাঘাত করবেন না—এ কথা পাণ্ডবদের যথেষ্টই জানা ছিল। শিখণ্ডী যে ভীষ্মবধের জন্যই চিহ্নিত—এ কথা পাঞ্চাল দ্রুপদ পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে জানতেন, সেখানে পাণ্ডবরা সেটা জানতেন না, তা হতেই পারে না।

আসলে এ এক ভিন্নতর মর্যাদাবোধ এবং মূল্যবোধ যাতে অর্জুনের মতো মহাবীরও যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের পাশে দাঁড়িয়ে ভীষ্মের মরণপূর্ব শেষ সাহংকার বীরবাক্য শুনবেন। ভীষ্ম বলবেন—স্ত্রীলোক অথবা স্ত্রী-নামধারী কোনও মানুষের ওপর অস্ত্রাঘাত করতে রুচি হয় না আমার। যেসব মানুষের একটা মাত্র ছেলে অথবা যার বংশে বাতি দিতে কেউ নেই, তেমন মানুষের ওপর অস্ত্র হানতে রুচি হয় না আমার। এইরকম অনেক বিকল্পের মধ্যে তিনি শিখণ্ডীরও ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু সেই ইঙ্গিত যদি না বোঝেন পাণ্ডবরা, তাই স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন—তোমরা তো জান—দ্রুপদের পুত্র বলে পরিচিত ওই শিখণ্ডী—সে যোদ্ধা বটে, যুদ্ধের উৎসাহও তার কম নেই। কিন্তু সে যেহেতু আগে স্ত্রী-ই ছিল এবং এখন তার পুংস্ত্ব যতই বিখ্যাত হোক, তাকে সামনে রেখে যুদ্ধ করুক অর্জুন, শরে শরে আমাকে ছিন্নভিন্ন করে দিক। আমি অস্ত্র তুলব না। এই একমাত্র পথ যাতে তোমাদের জয় হতে পারে, যুধিষ্ঠির! নইলে—ভেঙে যাবার মুখেও কুরুবৃদ্ধ পিতামহের শেষ সাহংকার ঘোষণা শোনা গেল—নইলে এ দুনিয়ায় এমন মানুষ নেই যে আমি খেপে উঠলে রুখতে পারে আমাকে—ন তং পশ্যামি লোকেষু যো মাং হন্যাৎ সমুদ্যতম্।

দুনিয়ার ওই বিশাল অক্ষম বীররাশির তালিকা থেকে ভীষ্ম কিন্তু সচেতনভাবে কৃষ্ণ এবং অর্জুনকে বাদ দিয়েছেন। অর্থাৎ এই দুজনের একজন ছাড়া অন্য কারও ক্ষমতা হবে না তাঁকে পরাস্ত করতে—ঋতে কৃষ্ণান্মহাভাগাৎ পাণ্ডবাদ্ বা ধনঞ্জয়াৎ। আমি আগেই বলেছিলাম—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মহামতি ভীষ্মকে ভূমিশয্যায় শয়ান করাতে যে এত দেরি হল তার কারণ অর্জুনের অনীহা। তিনি ভাবতেই পারছিলেন না যে, কুরুবৃদ্ধ পিতামহকে তিনি মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবেন। কৃষ্ণ দু-দুবার রথ থেকে নেমে গেলে তিনি কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞার মর্যাদা রক্ষার জন্য নিজে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তিনি ভীষ্মকে মারবেন, কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা কাজে পরিণত করতে বিলম্ব হচ্ছিল। তিনি ভাবতে পারছিলেন না, ভীষ্মকে তিনি মারবেন।

ভীষ্ম নিজের বধোপায় বলে দেবার পর পাণ্ডবরা যখন সন্তুষ্ট মনে ফিরে আসছেন নিজের শিবিরে, তখন অর্জুন কৃষ্ণকে একান্তে ডেকে সখেদে বলেছেন—কী করে আমার এই ঠাকুরদাদাটির সঙ্গে এমন প্রাণঘাতী যুদ্ধ করি, বলো—পিতামহেন সংগ্রামে কথং যোৎস্যামি মাধব। অর্জুনের মনে পড়ল ছেলেবেলার কথা। পিতার মৃত্যুর পর মায়ের হাত ধরে পাঁচ ভাই পাণ্ডব হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে এসেছিলেন। সেই সেদিন থেকে শত প্রতিকূলতার মধ্যে যিনি অপার স্নেহে পাণ্ডব ভাইদের লালন করেছেন, তিনি এই ভীষ্ম। অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন—ছোটবেলায় খেলা করতে করতে ধুলোমাখা গায়ে এই মহাপুরুষটির কোলে উঠে পড়তাম আমি। তাঁর সারা গা, কাপড়চোপড় সব ধুলোয় ভরে যেত—পাংশুরুষিতগাত্রেণ মহাত্মা পরুষীকৃতঃ। এই পিতামহের কোলে উঠে আমি কতবার যে তাকে বাবা বাবা বলে ডেকেছি। ঈষৎ লজ্জিত হয়ে বার বার আমার ভুল শুধরে দিয়ে আমার বুড়ো ঠাকুরদাদা বলতেন—আমি তোর বাবা নইরে, আমি তোর বাবারও বাবা—নাহং তাতস্তব পিতুস্তাতো'স্মি তব ভারত। অর্জুন সখেদে বললেন—আমার সেই স্নেহশীল

ঠাকুরদাদাকে আমি কেমন করে মারব, কৃষ্ণ? তার থেকে আমার সৈন্যরা মারা যায় যাক, আমার জয় হোক, মৃত্যু হোক, যা হয় হোক আমি আমার দেবতা-সমান পিতামহের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারব না—নাহং যোৎস্যে মহাত্মনা।

হৃদয়ের সেই চিরকালীন দুর্বলতা যার জন্য অর্জুন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বেই বিকল হয়ে পড়েছিলেন। এই দুর্বলতার কারণেই তাঁকে আঠেরো অধ্যায় গীতা শুনতে হয়েছিল কৃষ্ণের কাছে। আমাদের মতে এই দুর্বলতা অতি স্বাভাবিক এবং মানবিক। কিন্তু সেকালের ক্ষত্রিয়ধর্ম এবং ন্যায়নীতির যে আদর্শ ছিল, তাতে এই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠাটাই ছিল ধর্ম। কৃষ্ণ বুঝলেন যে, অর্জুনের মতো মহাবীর যদি এইভাবে ভেঙে পড়েন তো যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধজয় অসম্ভব। তিনি তাই একটুও প্রশ্রয় দিলেন না অর্জুনের আবেগঘন ভাবালুতায়। কৃষ্ণ বললেন—এটা যুদ্ধক্ষেত্র, অর্জুন। এখানে প্রত্যাঘাতই তোমার ধর্ম। তুমি না প্রতিজ্ঞা করেছ সকলের সামনে, তা হলে এখন উলটো কথা বলছ কেন—প্রতিজ্ঞায় বধং জিষ্ণো...কথং নৈনং হনিষ্যসি।

কৃষ্ণ অর্জুনকে প্রত্যুদাহরণ দিয়ে বললেন—একথা মানি যে, ভীষ্ম তোমার গুরুস্থানীয়, তিনি বৃদ্ধ এবং তিনি সর্বগুণসমন্বিত মহাপুরুষ বটে। কিন্তু তিনিও তো তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করছেন আততায়ীর মতো। তবে তাঁকে মারবে না কেন—আততায়িনম্ আয়ান্তং হন্যাদ্ ঘাতকমাত্মনঃ। তুমি এই যুদ্ধদুর্মদ ভীষ্মকে প্রথম সুযোগেই রথ থেকে নামিয়ে ভূলুণ্ঠিত করে ছাড়বে—পাতয়ৈনং রথাৎ পার্থ ক্ষত্রিয়ং যুদ্ধদুর্মদম্।

কৃষ্ণের কথা শুনে অর্জুন বুঝলেন যে, যুদ্ধ তাঁকে করতেই হবে এবং ভীষ্মেরও পতন ঘটাতে হবে একসময়। অর্জুন বললেন—তা হলে শিখণ্ডীই আমাদের শেষ অস্ত্র হোক। আগামী কাল শিখণ্ডীকে সামনে রেখে আমরা যুদ্ধ আরম্ভ করব। আর পিতামহ তো বললেনই যে শিখণ্ডীকে তিনি অস্ত্রাঘাত করবেন না, অতএব এই উপায়েই তাঁকে বধ করতে হবে—গাঙ্গেয়ং পাতয়িষ্যামি উপায়েনেতি মে মতিঃ।

আসলে শিখণ্ডী হলেন অর্জুনের যুদ্ধ-সাধন। ভীষ্ম বলেছেন—তিনি শিখণ্ডীর গায়ে অস্ত্রাঘাত করবেন না। আবার শিখণ্ডী তাঁর পূর্ব অপমানের প্রতিশোধ নিতে সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন। ভীষ্মকে মারবার জন্যই তিনি পুরুষের বিদ্যা শিক্ষা করে যুদ্ধবেশে হাজির হয়েছেন কুরুক্ষেত্রের রণভূমিতে। কিন্তু তিনি অর্জুনের কত বড় উপকার করলেন অথবা উপকার করলেন ভীষ্মেরও—তা তিনি নিজেও জানেন না। লক্ষ করে দেখবেন, ভীষ্ম এবং দ্রোণ—এই দুজনের ওপরেই অর্জুনের গুরুবৎ মান্যতা ছিল এবং মান্যতার চেয়েও দুর্বলতা ছিল আরও অনেক বেশি। ঠিক সেই জন্যেই কৌরবপক্ষের এই দুই প্রধানকে যুদ্ধ থেকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যেতে পাণ্ডবদের, বিশেষত অর্জুনের সবচেয়ে বেশি সময় লেগেছে—আঠেরো দিনের মধ্যে পনেরো দিন।

অন্যদিকে ভীষ্ম-দ্রোণেরও অর্জুনের অস্ত্রশিক্ষা সম্বন্ধে যে গৌরব ছিল, সেই গৌরবের চেয়েও এই মহাবীরের ওপর তাঁদের ছিল অপার দুর্বলতা। যার জন্য এঁরাও কোনওদিন দুর্যোধনকে সন্তুষ্ট করতে পারলেন না। যে উদ্দেশ্য নিয়ে দুর্যোধন এঁদের সেনাপতি করেছেন, সেই গুরুভার পদে পদে লঙ্ঘিত হয়েছে অর্জুনের প্রতি তাঁদের মান্যতা এবং স্নেহে। এই মান্যতা, দুর্বলতা এবং স্নেহের মাঝখানে কার্যসাধনের উপায় হিসেবে কাজ করেছেন একত্র এক দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডী, অন্যত্র আর-এক দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন। ভীষ্মের সঙ্গে অর্জুনের শেষ যুদ্ধে শিখণ্ডী হলেন সেই সাধন, যেখানে অর্জুন প্রত্যক্ষভাবে পিতামহের গায়ে অস্ত্রাঘাত করছেন না, অথবা ভীষ্ম করছেন না অর্জুনের গায়ে। পৌত্র এবং পিতামহের মধ্যে যে পারস্পরিক মমতার বিশ্বাস, যা এই ভয়ংকর যুদ্ধে পিষ্ট এবং ধ্বস্ত হতে পারত, শিখণ্ডী

সেই বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করলেন ভবিষ্যতের জন্য, আগামী পৃথিবীর পৌত্র-পিতামহের জন্য।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দশম দিনের সূর্য আকাশে উদয় হবার সঙ্গে সঙ্গেই মৃদঙ্গ, ভেরী আর দুন্দুভি বেজে উঠল। আজকে পাণ্ডবসেনাদের সামনে দেখা গেল যুদ্ধবেশী শিখণ্ডীকে। এতদিন ধরে তিনি যুদ্ধ করেছেন কিন্তু আজকে যে প্রাধান্য তিনি লাভ করেছেন, সেই প্রাধান্য এতদিন তাঁর ছিল না। আজকে সেনা সাজানো হয়েছে তাঁরই ইচ্ছামতো, তিনি নিজেই ব্যূহ নির্মাণ করেছেন এবং সকল সেনার অগ্রভাগে তিনি চলেছেন নায়কের মতো—শিখণ্ডী সর্বসৈন্যানাং অগ্র আসীদ্ বিশাম্পতে।

অবশেষে সেই দিন এল, যেদিন শিখণ্ডীর সঙ্গে সোজাসুজি চক্ষু-বিনিময় হল ভীষ্মের। ভীষ্ম একবার তাঁর দিকে চোখ তুলেই নামিয়ে নিয়েছিলেন চোখ। তাঁর রাগও হল, হাসিও পেল—পুনর্নালোক ক্রুদ্ধঃ প্রহসন্নিদমব্রবীৎ। শিখণ্ডী ততক্ষণে তাঁর পূর্বোপচিত ক্রোধে ভীষ্মের বুকে তিনটি শর নিক্ষেপ করে ফেলেছেন। ভীষ্ম বললেন—তুমি আমার ওপর অস্ত্র প্রহার কর আর নাই কর, আমি কোনওভাবেই তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব না। কারণ বিধাতা তোমাকে যেমন স্ত্রী তৈরি করেছিলেন, আমার কাছে তুমি সেই স্ত্রী শিখণ্ডিনীই আছ—যৈব হি ত্বং কৃতা ধাত্রা সৈব হি ত্বং শিখণ্ডিনী।

ভীষ্ম এত সোজাসুজি কোনও দিন অম্বা-শিখণ্ডিনীর সঙ্গে কথা বলেননি। আজ বলছেন। তিনি বুঝেছেন, তাঁর শেষের দিন উপস্থিত। আর এই রমণীটি কত দিন অপেক্ষা করে আছে শুধু তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য, যে প্রতিহিংসার অন্তরে হয়তো আছে এমন এক অন্তর যা প্রকাশও করা যায় না, সহ্যও করা যায় না। ভীষ্মের কথা শুনে শিখণ্ডীর ক্রোধ আরও বেড়ে গেল। যাকে মারবার জন্য রমণীর রমণীয় লজ্জাভয় অতিক্রম করে তিনি পুরুষ সেজেছেন, তাঁকে এখনও সেই স্ত্রী সম্বোধন—সৈব হি ত্বং শিখণ্ডিনী! শিখণ্ডী সক্রোধে উত্তর দিলেন বটে, তবু তারই মধ্যে সম্ভাষণে, ভাষায়, সম্বোধনে প্রকট হয়ে উঠল এক রমণীর অন্তর। অম্বা-শিখণ্ডিনী বললেন—মহাবাহু! তুমি যে সমস্ত ক্ষত্রিয়ের কাছে কত ভয়ংকর, তা আমি জানি। স্বয়ং পরশুরামের সঙ্গে তোমার যে ভয়ংকর যুদ্ধ হয়েছিল, সে আমি শুনেওছি, দেখেওছি; সর্বত্র তোমার বীরত্বের প্রভাব যে কীরকম ছড়িয়ে পড়েছে, তাও আমার অজানা নয়—দৃষ্টশ্চ তে প্রভাবো'য়ং স ময়া বহুশঃ শ্রুতঃ। তবু এই সমস্ত কিছু জেনেও আজকে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব আমি।

শিখণ্ডী ভীষ্মকে এবার সম্বোধন করলেন 'পুরুষোত্তম' বলে। বললেন, শ্রেষ্ঠ পুরুষ আমার! তুমি যুদ্ধ কর আর নাই কর, আজকে তুমি আমার হাত থেকে বাঁচবে না। আমার সেই সত্য প্রতিজ্ঞা থেকে আজকে আমি চ্যুত হব না, তোমাকে আমি মারবই। বরঞ্চ মরার আগে এই জগৎটাকে আরও একবার ভাল করে দেখে নাও—সুদৃষ্টঃ ক্রিয়তাং ভীষ্মঃ লোকো'য়ং সমিতিঞ্জয়।

শিখণ্ডী-ভীষ্মের সংলাপ শেষ হওয়ামাত্রই অর্জুন বুঝলেন আর দেরি নয়। শিখণ্ডীকে ভীষ্মের প্রতি বাণ-মোক্ষণ করার আদেশ দিলেন অর্জুন, আর নিজে চললেন, ঠিক তাঁর পিছন পিছন। শিখণ্ডীর সঙ্গে একাধিকবার যুদ্ধ হয়েছে ভীষ্মের। প্রত্যেকবারই যোদ্ধাদের রথ-স্থিতিটা একইরকম। সামনে শিখণ্ডী, পিছনে অর্জুন, প্রতিপক্ষে ভীষ্ম। শিখণ্ডী ভীষ্মের বুকে বাণ-মোক্ষণ করেন, একইসঙ্গে পিছন থেকে অর্জুনও। আর অসহায় ভীষ্ম সামনাসামনি অস্ত্রত্যাগ না করে, কোনাকুনিভাবে পাণ্ডবদের সৈন্য শাতন করেন। এই বিচিত্র যুদ্ধচিত্র চলল অনেকক্ষণ। অর্জুন অনেকবার পিতামহ ভীষ্মের ধনুকটিকে ছেদন করলেন বলে, বার বার তাঁকে নতুন ধনুক তুলে নিয়ে যুদ্ধ করতে হচ্ছিল। ভীষ্মের একটু রাগও হল। তিনি এবার

ধনুক ছেড়ে একটি মহাশক্তি নিক্ষেপ করলেন অর্জুনকে লক্ষ্য করে। অর্জুন কিন্তু আপন অস্ত্রকৌশলে সেই বীরঘাতিনী শক্তিটিকে লক্ষ্যে পৌঁছোবার আগেই কেটে ফেলতে সমর্থ হলেন।

এইবার ভীষ্মের ভাবনা হল। আজকে ন'দিন ধরে তাঁর সঙ্গে পাণ্ডবদের যুদ্ধ হচ্ছে। আজ যুদ্ধের দশম দিন। একবারের তরেও নিজেকে তিনি কোনও অংশে কম ভাবেননি। আর যুদ্ধ জিনিসটাও তাঁর বেশ পছন্দের বস্তু। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে একটি সামান্য ঘটনাকে উপলক্ষ করে তাঁর যেন মনে হল, আর নয়। কোনও দিন তাঁর অস্ত্র তো এইভাবে বিফল হয়নি। আজ কেন এমন হচ্ছে? ভীষ্ম ভাবলেন—এই কৃষ্ণ যদি পাণ্ডবদের রক্ষক না হতেন, তা হলে একটিমাত্র ধনুক দিয়েই তিনি সমস্ত পাণ্ডবদের বিনাশ করতে পারতেন।

কৃষ্ণ মানুষটির ব্যাপারে চিরকাল ভীষ্মের এক দুর্বলতা আছে। যখন কেউ তাঁকে মানতে পারেননি, সেই সময়েই কৃষ্ণকে তিনি চিনেছেন অলৌকিক দৃষ্টিতে। সে দৃষ্টির মধ্যে হয়তো ঈশ্বরভাব ছিল, যে কারণে অতি অল্প বয়সেই তাকে নতুন দিনের নায়ক হিসেবে মেনে নিতে তাঁর বাধেনি। সেই কোন কালে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে এই মানুষটিকে তিনি শ্রেষ্ঠ মানুষের মর্যাদায়, ভগবত্তার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আজকে যখন বহুতর রথী মহারথীরা চারদিক থেকে তাঁকে ঘিরে ফেলেছে, অর্জুনের পুঞ্জ পুঞ্জ বাণ তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করছে, তখন এই একটি কথা তাঁর মনে হল—কৃষ্ণ। বৈষ্ণব দার্শনিকেরা এখানে ভীষ্মের পরম ভক্তি-মাহাত্ম্য স্থাপন করবেন, কিন্তু আমাদের বিচারে দেখতে পাই—একটি মানুষ যিনি এতদিন ধরে তার প্রিয় জগৎ দেখে দেখে আনন্দ লাভ করেছেন, সেই আনন্দের যেমন পূর্তিবোধ আছে, তেমনই এই জগতের দুঃখকষ্ট গ্লানি যত আছে তারও একটা সহ্যসীমা আছে। এই দুয়ে মিলেই মানুষের মনে বৈরাগ্য তৈরি করে, তৈরি করে নির্বিণ্ণতা।

ভীষ্ম অনেক দেখেছেন এই পৃথিবীতে। পিতা শান্তনুর সময় থেকে এখন পর্যন্ত। এর মধ্যে সুখ বা আনন্দ যত তাঁর ছিল, তারচেয়ে অনেক বেশি ছিল প্রাণধারণের গ্লানি আর কর্তব্যের নিরন্তর তাড়না। পিতা শান্তনু তার ভোগসুখ লাভ করেছেন, জননী সত্যবতী স্বামীসুখ, রাজ্যসুখ লাভ করে, যে তীব্র তাড়না নিয়ে বেঁচেছিলেন, তা হল নিজের পুত্রেরা যাতে হস্তিনার সিংহাসন লাভ করে। সিংহাসন তাঁরা লাভ করেছিলেন ঠিকই কিন্তু অকালে মারা গিয়ে তাঁরা সত্যবতীর যন্ত্রণা বাড়ালেন। যন্ত্রণা অতিরিক্ত বাড়ার আগেই ব্যাসের পরামর্শে তিনি বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেছিলেন। এই অবস্থায় ভীষ্ম কুরুবাড়িতে টিকেছিলেন শুধু কর্তব্যের তাড়নায়। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু মানুষ হবার পরেও তাঁর খুব বেশি দুঃখ ছিল না। কিন্তু পাণ্ডু মারা যাবার পর থেকেই হস্তিনায় যে পরিস্থিতি তৈরি হল, তাতে এই কুরুবৃদ্ধ পিতামহের অস্বস্তি এবং মনের কষ্ট শুধু বাড়তেই থাকল।

মাঝখানে বেশ খানিকটা নির্বিণ্ণ হয়েই কুরুবাড়ির সংসারে বাস করছিলেন তিনি। কিন্তু ভয়ংকর জ্ঞাতিযুদ্ধ, কুলক্ষয়—যা তাঁর সবচেয়ে অপ্রিয় বস্তু ছিল, সেই অপ্রিয় ঘটনার মধ্যে তাঁকে সম্পূর্ণ জড়িয়ে পড়তে হল পরিস্থিতির চাপে। পিতার আশীর্বাদে ভীষ্ম ইচ্ছামৃত্যু, কাজেই অন্যের অবধ্য—স্বচ্ছন্দমরণং দত্তমবধ্যত্বং রণে তথা। কিন্তু দিন দিন প্রতিদিন জীবনযন্ত্রণার চাপে ভীষ্ম এখন শ্রান্ত, ক্লান্ত, বিষণ্ণ, নির্বিণ্ণ। তিনি এখন ভূমিতে শয়ন করতে চান, বিশ্রাম চান। কৌরবদের বৃত্তি-ঋণ মেটানোর জন্য তথা দুর্যোধনের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যতটুকু তাঁর করণীয় ছিল, তা করা হয়ে গেছে। তিনি পাণ্ডবদের কোনওভাবেই বধ করবেন না, অন্যদিকে তপস্বিনী অম্বা-শিখণ্ডিনীর যৌবনের ঋণও তাকে চুকোতে হবে—অবধ্যত্বাচ্চ পাণ্ডূনাং স্ত্রীভাবাচ্চ শিখণ্ডিনঃ। ভীষ্ম তাঁর শেষ বাসরের শয্যাগ্রহণ করতে চান শিখণ্ডীর পুষ্পবাণ সমস্ত অঙ্গে অঙ্গে ধারণ করে—তস্মান্মৃত্যুম্ অহং মন্যে প্রাপ্তকালমিবাত্মনঃ।

‘পুষ্পবাণ’ শব্দটি যতই দ্ব্যর্থকভাবে প্রয়োগ করে থাকি না কেন, এ বাবদে কী অদ্ভুত মহাভারতের কবির সংযম! ভীষ্ম যেহেতু সারা জীবনে তাঁর ব্রহ্মচর্যের ব্রত থেকে চ্যুত হননি, অতএব একবারের তরেও তিনি সোচ্চারে বলবেন না যে, অম্বা-শিখণ্ডিনী গভীর অন্তরে ভালবাসতেন ভীষ্মকে অথবা ভীষ্ম অম্বা-শিখণ্ডিনীকে। তাঁদের আপাত ক্রোধ, পারস্পরিক দর্শনানীহা, ঘৃণা—সবই তিনি খুব ভাল করে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেই আপাত বর্ণনার অন্তর থেকে বেরিয়ে আসে অদ্ভুত এক অনুভূতি, যার সঙ্গে শত বসন্ত অতীত করা বৃদ্ধের দীর্ঘশ্বাস জড়ানো আছে।

মহাভারতের কবির কৌশল কত! শিখণ্ডীকে অগ্রবর্তী করে অর্জুন ভীষ্মের সঙ্গে শেষ যুদ্ধ করবার জন্য এগোচ্ছিলেন। পাণ্ডবদের অনেক সৈন্য শাতন করে, চারপাশের অনেক রথীর আঘাত সহ্য করে ভীষ্ম এখন প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন নিজেকে। এই অবস্থায় শিখণ্ডী অনেকগুলি শর-প্রহার করলেন ভীষ্মকে। মহাভারতের কবি মন্তব্য করলেন—ভূমিকম্পের সময় পর্বত যেমন বিচলিত হয় না, তেমনই শিখণ্ডীর বাণে ভীষ্মও বিচলিত হলেন না একটুও —নাকম্পত মহারাজ ক্ষিতিকম্পে যথাচলঃ।

আপাতত শুনলে মনে হবে যেন বহু যুদ্ধের নায়ক ভীষ্ম শিখণ্ডীর বাণে একটুও কাতর হলেন না এবং তা যেন ভীষ্মের বীরত্ব এবং সমর-সহিষ্ণুতার ফল। কিন্তু এই আপাত বহির্ভাবটুকুই বোধ হয় সব নয়। লক্ষ করে দেখুন, শিখণ্ডীর পরেই তাঁর পিছন থেকে ভীষ্মের ওপরে বাণবর্ষণ করলেন অর্জুন। ভীষ্ম আপন অস্ত্রকৌশলে যথাসম্ভব আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করতে লাগলেন বটে কিন্তু ততক্ষণে শিখণ্ডীর বাণ এসে পড়ছে ভীষ্মের ওপর। মহাভারতের কবি আবারও মন্তব্য করে বললেন—শিখণ্ডীর স্বর্ণমুখ শিলায়-শান-দেওয়া বাণগুলিতে অবশ্য ভীষ্মের তেমন কোনও কষ্ট হচ্ছিল না—ন চক্রুস্তে রুজং তস্য রুক্মপুঙ্খাঃ শিলাশিতাঃ।

কোন মহারথী যোদ্ধা এমন করেন? শত্রুর বুকে বেঁধানোর জন্য আপনার লৌহমুখ বাণগুলিকে সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখেন? শিখণ্ডী রেখেছেন আর ভীষ্মের তাতে ব্যথা লাগছে না। বলতে পারেন—শিখণ্ডী তেমন শক্তিশালী যোদ্ধা নন, সেইজন্যই তাঁর বাণাঘাতে তেমন জর্জরিত নন ভীষ্ম। কিন্তু কেমন করে এ কথা বলি? এই কিছুক্ষণ আগে পাণ্ডবদের যোদ্ধা নায়কদের মধ্যে যাঁরা ‘রথ-অতিরথ’ আছেন, তাদের চিহ্নিত করার সময়ে ভীষ্ম নিজের মুখে শিখণ্ডীকে ‘মহারথ’ যোদ্ধা বলে স্বীকার করেছেন। আর এখন তাঁর বাণাঘাতে কোনও ব্যথা লাগছে না ভীষ্মের। এও কি বিশ্বাস্য কথা?

শিখণ্ডীকে অগ্ররথে স্থাপন করে অর্জুনের অস্ত্রবর্ষণ চলতে লাগল। দুর্যোধনের ভাই দুঃশাসন ভীষ্মের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন অসহায় বালকের মতো, প্রায় দর্শকের ভূমিকায়। ভীষ্ম অর্জুনের প্রশংসা করে বললেন—অর্জুন যেমন যুদ্ধ করছেন, তাতে স্বর্গের ইন্দ্রও যদি বজ্র হাতে নেমে আসেন ভুঁয়ে, তবু তাঁর এমন সাধ্য নেই যে, অর্জুনকে আটকে রাখতে পারবেন। ঠিক এই সময়ে যখন শিখণ্ডীও বাণমুক্ত করছেন এবং অর্জুনও বাণ-মোক্ষণ করছেন—ঠিক এই সময়ে যুগপৎ দুই বীরের বাণাঘাতে বিদীর্ণ হতে হতেও ভীষ্ম হাসিমুখে পাশে দাঁড়ানো দুঃশাসনকে বুঝিয়ে বললেন—এই যে পর পর ছুটে আসা বাণগুলো, যার আঘাত বজ্র এবং বিদ্যুতের সমান—এই বাণগুলো সব অর্জুনের। শিখণ্ডীর নয়, কোনও মতেই—নেমে বাণাঃ শিখণ্ডিনঃ। এই যে বাণগুলো সব আমার লোহার বর্ম ভেদ করে একেবারে মর্মে এসে লাগছে, এই বাণগুলো সব অর্জুনের। শিখণ্ডীর নয়, কোনও মতেই—নেমে বাণাঃ শিখণ্ডিনঃ।

অন্তত ছ’টি শ্লোকে ভীষ্ম একই কথা বলে গেলেন—এই বাণগুলি অর্জুনের। শিখণ্ডীর নয় কোনও মতেই। সন্দেহ থাকতে পারে না যে, বারংবার একই ধরনের কথা বলে অর্জুনের

অস্ত্রভেদ-ক্ষমতার প্রশংসা করছেন ভীষ্ম। কিন্তু উলটো দিকে এই পৌনঃপুনিক প্রশংসায় এই কথাই কি প্রমাণ হয় না যে—এমন কঠিন বাণ অন্তত শিখণ্ডী মারতে পারেন না ভীষ্মের বুকে। কারণ যাই হোক। হতেই পারে এ তাঁর অক্ষমতা এবং সে অক্ষমতা যদি স্ত্রীজনোচিত হয়, তবে সে অক্ষমতাকে স্ত্রীজনোচিত মায়ামমতা বলতেই বা দোষ কী। মনটা যদি সামান্য উদার হয় এবং তাঁরা যদি অতীতে অম্বা-শিখণ্ডিনী অন্তঃপাতী হৃদয়টুকু সমান হৃদয় দিয়ে বুঝে থাকেন, তবে বুঝবেন—এই বাণমোক্ষণের মধ্যেই মহাভারতের কবির এক কোমল ইঙ্গিত আছে। শিখণ্ডীর সোনামুখী বাণে ভীষ্মের কোনও কষ্টই হয় না এবং অর্জুনের মতো মর্মঘাতী কঠিন বাণ তিনি মুক্তও করতে পারেন না—এই কথাগুলির মধ্যে শিখণ্ডীর অদক্ষতার প্রমাণ যতটুকুই থাকুক, তারমধ্যে অম্বা-শিখণ্ডিনীর স্ত্রী-হৃদয়ও ততটাই আছে।

লক্ষ করে দেখবেন—এরপরেই অর্জুনের কঠিন বাণে শরবিদ্ধ কুরুবৃদ্ধ পিতামহ আপন অভ্যস্ত যুদ্ধরথ থেকে লুটিয়ে পড়বেন ভূমিতে। তারপরেই পাণ্ডবপক্ষে জনে জনে সিংহনাদ শোনা যাবে, কৌরবপক্ষে শোনা যাবে বিষণ্ণ ক্রন্দনধ্বনি। কিন্তু এই বিরাট যুদ্ধক্ষেত্রে কোথাও এরপর শিখণ্ডীর নাম শুনতে পাবেন না আপনারা। তাঁর সুখ হল, না দুঃখ হল, তাঁর ক্রোধশান্তি হল, নাকি বৈরাগ্য হল কোনও খবরই আর মহাভারতের কবির কাছে পাব না। কিন্তু বাস্তবে কী ঘটা উচিত ছিল? যে অম্বা ভীষ্মের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য নিজের স্ত্রীভাব ত্যাগ করে পুরুষের বিদ্যা-বেশ অভ্যাস করেছিলেন, ভীষ্মের শরশয্যা গ্রহণে তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া হবে না? আমরা জানি, প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই হয়েছে, কিন্তু মহাভারতের কবির মুখে তা একবারও উচ্চারিত হবে না। হবে না, তার কারণ এই যে, মহাকবি কুরুবংশীয় মহাবীরদের বীরত্বগাথা গাইতে বসেছেন। শরশয্যায় শুয়ে যে মহাবীরের নীচ-লম্বিত মস্তকটি স্বস্থানে স্থাপন করার জন্য মস্তকের নীচে আরও একটি শরস্থাপনের প্রয়োজন হয়, সেই মহাবীরের শেষ অবস্থা বর্ণনা করার জন্য মহাকাব্যের কবি অন্তত অম্বা-শিখণ্ডিনীর উপরুদ্ধ ক্রন্দনধ্বনি শোনাবেন না। অতএব শিখণ্ডিনী কী অবস্থায় রইলেন, তা অব্যক্ত থাকল আমাদের কাছে। কুরুবৃদ্ধ পিতামহ দশ দিন অসাধারণ যুদ্ধ করে শরশয্যায় শুয়ে পড়লেন, কিন্তু প্রাণত্যাগ করলেন না।

কতকাল আগে অম্বা-শিখণ্ডিনীর উপরোধে পড়ে ক্ষত্রিয়ান্তক পরশুরামও যাঁকে পরাভূত করতে পারেননি, তিনি মারা গেলেন শিখণ্ডীর হাতেই, ভাগ্যের কী বিচিত্র পরিহাস! আপাতদৃষ্টিতে এরমধ্যে আশ্চর্য কিছু নেই। একজন অস্ত্রপ্রহার করছেন না, অন্যজন করছেন। এমন অবস্থায় একসময় যে শরবিদ্ধ ব্যক্তির পতন ঘটবে, এ তো সম্পূর্ণই নিশ্চিত। আসলে শিখণ্ডী হলেন মহাভারতের কবির এক অসামান্য সৃষ্টি। কত দিক দিয়ে যে তিনি মহাকবির স্বার্থ রক্ষা করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। অর্জুন আর ভীষ্মের মধ্যে যে স্নেহ-গৌরবের সম্বন্ধ ছিল, যুদ্ধের সময়ে শিখণ্ডী যেমন সেই সম্বন্ধের আবরণ-স্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন, সেইরকমই শিখণ্ডী হলেন ভীষ্মের জীবনে প্রকৃতির প্রতিশোধ-স্বরূপ।

জননী সত্যবতীর কারণে এবং হয়তো বা পিতার ওপর অভিমানে ভীষ্ম যে কঠিন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তা শুধু তাকেই ধ্বংস করেনি, প্রসিদ্ধ ভরতবংশের প্রধান শাখাটিকেই তা ধ্বংস করে দিয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কী, সত্যরক্ষা যত বড় ধর্মই হোক, সেই সত্যরক্ষা যদি শুষ্ক-স্বাধীন এক নিয়মতন্ত্রে পরিণত হয় এবং তা যদি জগতের কল্যাণসাধন না করে, তবে তা বর্জনীয়ই হয়ে ওঠে। সেকথা মহাভারতের কবি বহু উদাহরণ প্রত্যুদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন অন্যত্র। বিশেষত মহাভারতে যিনি সত্যধর্মের প্রতীক বলে চিহ্নিত, সেই যুধিষ্ঠিরের জীবনের নানা সমস্যায় এই সত্য বার বার উচ্চারিত হয়েছে, উচ্চারিত হয়েছে মহামতি কৃষ্ণের শতাধিক পরামর্শে। দেখা গেছে, উত্তম কার্যের অনুরোধে, বৃহত্তর স্বার্থে এবং মানবকল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত সত্যের সামান্য চ্যুতিও মহান ধর্ম বলে গণ্য হয়েছে। আমরা যুধিষ্ঠিরের মতো ব্যক্তিকেও কুত্রাপি বৃহত্তর স্বার্থে সামান্য নমনীয় দেখেছি, কিন্তু

ভীষ্মকে দেখিনি।

সত্যিই তো, সত্যবতীর বিবাহ এবং তাঁর স্বার্থরক্ষার জন্য দাসরাজা যে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন ভীষ্মকে দিয়ে, তার কোনও তাৎপর্যই রইল না যখন সত্যবতীর গর্ভজাত শান্তনুর দুটি পুত্রই মারা গেলেন। সত্যবতী নিজেও একথা বুঝেছিলেন বলেই ভীষ্মকে বারবার বিবাহের জন্য অনুরোধ করেন। এবং সিংহাসনে বসার জন্যও। ভীষ্ম শোনেননি এবং সেই না-শোনাটা প্রায় গোঁয়ার্তুমির পর্যায়ে চলে গেছে। ঠিক এইরকম একটা পরিস্থিতিতে মহাভারতের কবি কাশীরাজকন্যা অম্বাকে ভীষ্মের জীবনে নিয়ে এসেছিলেন প্রায় নিয়তির মতো। এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল শাল্বরাজার অম্বা-প্রত্যাখ্যানে, যাতে তিনি বিবাহ করতে বাধ্য হন জ্যেষ্ঠা কাশীরাজনন্দিনীকে। ভীষ্ম শোনেননি। অম্বার অনুরোধ অনুনয়ও শোনেননি, গুরু পরশুরামের উপরোধ অস্ত্রাঘাতেও অবিচল থেকেছেন। এর ফল কী হল? বিবাহ না করে, সিংহাসনে না বসে ভীষ্ম যে অনমনীয়তার সৃষ্টি করলেন, তার ফলে প্রসিদ্ধ ভরতবংশে অযোগ্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠা ঘটল। ঘটল ছলনা বঞ্চনা এবং শুধুমাত্র সত্যরক্ষার অভিমানে ভীষ্ম রাজার মতো ব্যক্তিত্বে সেসব ছলনা বঞ্চনা রোধও করলেন না, তিনি বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী হয়ে শুধু বেঁচে রইলেন প্রসিদ্ধ এক রাজবংশের ধ্বংস দেখবার জন্য।

সত্যরক্ষার প্রতি ভীষ্মের এই অবুঝ অনমনীয়তার বিপ্রতীপ ভূমিতে অম্বা-শিখণ্ডিনী দাঁড়িয়ে আছেন ভীষ্মের প্রকৃতির প্রতিশোধ নেবার জন্য। অম্বাকে যেদিন ভীষ্ম প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সেদিন তিনি সুসময়ে স্বয়মাগতা স্বাভাবিক প্রকৃতিকেই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সে পলে পলে প্রতিশোধ নেবার জন্য তৈরি হয়েছে, পলে পলে সে নিজেকেও তৈরি করেছে চরম প্রতিশোধ নেবার জন্য। বাহ্যত ভীষ্ম যতই ঘৃণা প্রদর্শন করুন, যতই অরুচি প্রদর্শন করুন স্ত্রীশরীরে অস্ত্রাঘাত করব না বলে—জীবনে একটা সময় আসে, যখন প্রকৃতি নিজেই অস্ত্র তুলে নেয় হাতে। অম্বা-শিখণ্ডিনীর রূপ ধরে সে যখন অস্ত্রবর্ষণ করতে থাকে, ভীষ্মকে তখন চোখ ঘুরিয়ে তেরছা চোখে অন্যদিকে অস্ত্রবর্ষণ করতে হয়। নিজের অপরাধেই সে দিকে আর প্রতি-অস্ত্রের আঘাত করা যায় না। উন্মুক্ত রেখে দিতে হয় নিজের বুকখানি, যেখানে প্রকৃতির শরবর্ষণ চলে অবিরাম, স্বেচ্ছায়, অবিরোধে মেনে নিতে হয় প্রকৃতির শেষ প্রতিশোধ, পরিণাম। অম্বা-শিখণ্ডিনী আসলে ভীষ্মের অনমনীয়তার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ প্রকৃতি। ভীষ্মও সারাজীবন তাঁর ভয়ে ভয়ে থাকেন আর সে বাড়তে থাকে আপন অস্ত্রে সজ্জিতা হয়ে। অবশেষে এই পরিণাম। শত শত অস্ত্রে বিদ্ধ হয়ে, সংসারের শত জ্বালায় দীর্ণ হয়ে তিনি শরশয্যায় লুণ্ঠিত হয়েও বেঁচে থাকেন বংশের সম্পূর্ণ ধ্বংস দেখবার জন্য। তার সত্যরক্ষার প্রতিজ্ঞায় খুশি হয়ে পিতা যে তাঁকে ইচ্ছামৃত্যুর বর দিয়েছেন। তিনি মরতে পারেন না, সম্পূর্ণ না দেখে তাঁর মরবারও উপায় নেই। একে প্রকৃতির পরিহাস ছাড়া কী বলব?

লক্ষ করে দেখুন, সম্পূর্ণ কুরুবংশ ধ্বংস হয়ে যাবার পর হস্তিনাপুরের সিংহাসনে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যপ্রতিষ্ঠা হল। কিন্তু রাজা হলে কী হবে, রাজনীতির তিনি কিছুই জানেন না। কৃষ্ণ তাঁকে বললেন—রাজনীতি শিখতে হবে ভীষ্মের কাছ থেকে।

ভীষ্মের শরশয্যাগ্রহণের মানে হল—কুরুবংশের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাপুঞ্জের ভূমিশয্যাগ্রহণ। এতদিন যে মহীরুহ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে হস্তিনার ভূমিখণ্ডের ওপর ছায়া ফেলে দাঁড়িয়েছিল, সেই মহীরুহের পতন ঘটল ভীষ্মের পতনে। মহাভারতের কবি প্রতীকীভাবে লিখেছেন—সমস্ত আকাশ ভরে গেল অন্ধকারে, সহস্ররশ্মি সূর্য একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে পড়লেন—খং তমঃসংবৃতং হ্যাসীদ্ আসীদ্ ভানুর্গতপ্রভঃ। কৌরবপক্ষের সমস্ত সৈন্যবাহিনী সেনাপতির পতনে নিস্তেজ হয়ে পড়ল। ভীষ্মের পতনে পাণ্ডবপক্ষে দু-চারবার তূর্যধ্বনি-শঙ্খনাদ হল বটে, অতিসরল ভীমসেন দু-একবার জয়ানন্দে নেচেও নিলেন বটে—

আক্রীড়মানং কৌন্তেয়ম্—কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে পাণ্ডব-কৌরব—দুই যুদ্ধবাহিনীর মধ্যেই অদ্ভুত নিঃস্তব্ধতা নেমে এল, নেমে এল শোকাচ্ছন্ন পরিবেশ।

দুর্যোধন-কর্ণ একান্তে দীর্ঘনিশ্বাস মুক্ত করছিলেন। দুঃশাসন ঘোড়া থেকে নেমে ছুটে চললেন দ্রোণাচার্যকে খবর দিতে। তিনি দূরে যুদ্ধ করছিলেন, সেখানকার সৈন্যরা জানেও না যে, সেনাপতির পতন ঘটেছে। দুঃশাসনের মুখে এই নিষ্ঠুর খবর শুনে দ্রোণ প্রায় অজ্ঞানের মতো হয়ে গেলেন। তার এতকালের বন্ধু, তাঁর নিয়োগকর্তা, তাঁর এতকালের বৃত্তিদাতা। রাগ হলেই কৌরবদের তিনি বলতেন—আমি তোদের খাই না, পরি না। আমি ভীষ্মের দেওয়া বৃত্তিতে জীবিকা নির্বাহ করি। সেই ভীষ্মের পতন ঘটেছে। দ্রোণাচার্য শোকে আকুল হলেন। সংজ্ঞালাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে সেনাদের ফিরে যেতে বললেন শিবিরে।

দুই পক্ষের সৈন্যই একসময় প্রকৃত ঘটনা বুঝতে পারল এবং সেই ভয়ংকর স্তব্ধ শোকাচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে পাণ্ডব-কৌরব সকলেই বুকে-আঁটা ভারি যুদ্ধবর্মটি নামিয়ে রেখেই একত্রে ঘিরে ধরলেন ভীষ্মকে। শরশয্যায় শুয়েও কোনওমতে হাত জোড় করে ভীষ্ম অভিবাদন জানালেন কুরুদের এবং পাণ্ডবদের। বললেন—তোমরা সকলে এসেছ। বড় ভাল লাগছে তোমাদের দেখে—তুষ্যামি দর্শনাচ্চাহং...স্বাগতং বো মহারথাঃ। ভীষ্মের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। শিখণ্ডী আর অর্জুনের শত শত বাণ তাঁর শরীরে। শরের শয্যায় শুয়ে থাকা ভীষ্মের পা থেকে পৃষ্ঠ অবধি শরবিদ্ধ, শুধু মাথাটি বাদ গেছে। মাথায় শিরস্ত্রাণ থাকার জন্যই হোক, অথবা উষ্ণীষের কারণে, অথবা শিখণ্ডী-অর্জুন তাঁর মস্তকে কোনও আঘাত করেননি বলেই হোক, সারা শরীরের ইতস্তত বিদ্ধ শররাশি মোটামুটি সমভাবেই তাঁর শরশয্যা রচনা করেছিল, কিন্তু মাথায় কোনও শর না থাকায় মাথাটি লম্বমান অবস্থায় ঝুলছিল। দেহের সঙ্গে মস্তকের এই বিষমতায় বড় কষ্ট হচ্ছিল বৃদ্ধের।

পাণ্ডব-কৌরব সমস্ত পৌত্রদের একত্রে দেখে বৃদ্ধ পিতামহ বললেন—আমার মাথাটা কেমন ঝুলছে, অন্তত একটা বালিশের ব্যবস্থা কর ভাই—শিরো মে লম্বতে'ত্যর্থম্ উপাধানং প্রদীয়তাম্। কথা শুনে—সকলে ছুটল। মরণকালে বৃদ্ধের যন্ত্রণা মোচন করতে সূক্ষ্ম কোমল তুলোর বালিশ নিয়ে হাজির হলেন অনেকেই। বালিশ দেখে সামান্য উপহাসের ভঙ্গিতেই জবাব দিলেন ভীষ্ম। এই অবস্থাতেও তাঁর আত্মসচেতনতা কম নেই। বললেন—আমি বীরের শয্যায় শুয়ে আছি মহান ক্ষত্রিয়ের মতো। এমন শয্যায় কী মৃদু-কোমল তুলোর বালিশ মানায় —নৈতানি বীরশয্যাসু যুক্তরূপাণি পার্থিবাঃ। ভীষ্ম অর্জুনকে দেখে তাঁকে কাছে ডেকে বললেন—দেখো তো বাছা, কেমন ঝুলছে আমার মাথাটা। তুমি একটা উপযুক্ত ব্যবস্থা করো। বীরোচিত শরশয্যায় শুয়ে আছেন ভীষ্ম। একটি বাণও তাঁর পৃষ্ঠদেশ দিয়ে প্রবেশ করেনি। সমস্ত বাণই প্রবেশ করেছে শরীরের সম্মুখভাগ দিয়ে এবং তার বহুলতা এতই যে, তাঁর শরীর এখনও ভূমি স্পর্শ করেনি। তিনি এই বীরশয্যার উপযুক্ত উপাধান চান। সমান-হৃদয় বীর হিসেবে অর্জুন বুঝেছেন—কেমন বালিশ দিতে হবে পিতামহের মাথায়।

অর্জুন কেঁদে আকুল হচ্ছেন। শিখণ্ডীর বাণ নয়, অর্জুনের কঠিন শরবর্ষণেই আজ পিতামহের এই দশা। শিখণ্ডীর কারণে পিতামহ তাঁকে প্রায় প্রত্যাখ্যানই করেননি। অতএব বিশাল ঔদার্যময় মহাবীরের এই পতনে তিনি কেঁদে আকুল হচ্ছেন—নেত্রাভ্যাম অশ্রুপূর্ণাভ্যাম্ ইদং বচনমব্রবীৎ। অর্জুন যে শিখণ্ডীর পিছন থেকে যুদ্ধ করেই পিতামহকে জিতেছেন, এই নীচতাটুকু স্বীকার করে নিয়েই তিনি ভীষ্মের গৌরব অতিশয়িত করে বললেন — আপনি আজ্ঞা করুন, কুরুশ্রেষ্ঠ! সমস্ত অস্ত্রধারী বীরদের মধ্যে আপনার মতো আর কে আছে—আজ্ঞাপয় কুরুশ্রেষ্ঠ সর্বশস্ত্রভৃতং বরঃ—আমি আপনার ভৃত্য, আজ্ঞা করুন আমাকে কী প্রয়োজন? পিতামহ আবারও তাঁর লম্বমান মস্তকটি দেখিয়ে বললেন—আমার এই

বীরশয্যার উপযুক্ত একটি উপাধান দাও আমাকে।

অর্জুন গাণ্ডীবে অস্ত্রযোজনা করে ভীষ্মের মাথার তলায় তিনটি বাণ মেরে তাঁর মাথাটি শরীরের সমানুপাতে শুইয়ে দিলেন। ত্রিভিস্তীক্ষ্ণৈ-র্মহাবেগৈরন্বগৃহ্নাচ্ছিরঃ শরৈঃ। ভীষ্ম ভারী খুশি হলেন। অন্যদের বোঝাতে চাইলেন—মহাবীরের অভিপ্রায় মহাবীরই শুধু বোঝে। ভীষ্ম বললেন—এই ভাল হয়েছে। এই শরশয্যায় শুয়ে এখন আমি নিশ্চিন্তে সূর্যের উপাসনা করব। আরও বললেন—আমার চিরকালীন বাসস্থানের সামনে একটি পরিখা নির্মাণ করে দাও। সেইখানে এমন শরশয্যায় শুয়ে আমি সূর্যের দক্ষিণায়নের অপেক্ষা করব, সূর্যের তপস্যা করব—উপাসিষ্যে বিবস্বন্তমেবং শরশতাচিতঃ।

ভীষ্মকে শরকণ্টক থেকে মুক্ত করে তাঁর ক্ষতস্থানে ওষধির প্রলেপ বুলিয়ে দেবার জন্য বৈদ্যরা এসেছিলেন। তাঁরা প্রত্যাখ্যাত হলেন। ভীষ্ম দুর্যোধনকে আদেশ দিলেন—বৈদ্যদের আগমন-দক্ষিণা দিয়ে সসম্মানে বিদায় করো। আমার যে অবস্থা হয়েছে, তাতে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম অনুযায়ী এই শরাঘাতের দহনযন্ত্রণা সহ্য করাটাই আমার ধর্ম—এভিরেব শরৈশ্চাহং দগ্ধব্যো'স্মি নরাধিপাঃ—আমি দগ্ধ হতেই চাই। কৌরব-পাণ্ডব এবং সমবেত অন্যন্য রাজারা ভীষ্মের এই ব্যবহারে একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। ক্ষত্রিয়ের বীরোচিত ধর্ম এবং তার পালনীয়তা সম্বন্ধে এঁদের জ্ঞান কম নেই। কিন্তু বাস্তবেও কেউ যে এমন কঠিনভাবে ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন করতে পারেন তা ভীষ্মকে না দেখলে তাঁরা বুঝতেন না। সেই কবে সিংহাসনে বসবেন না, বিবাহ করবেন না—ইত্যাদি বলে ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা-রক্ষার ধর্মে উত্তরিত হয়েছিলেন, আজ এই শেষের বেলাতেও সেই ধর্ম একইভাবে আচরিত। শরশয্যায় শুয়ে ভীষ্ম যত আত্মতৃপ্তি লাভ করেছেন, তা বুঝি সিংহাসনে বসলে হত না। শর-ক্ষতের এই দহন তাঁকে রাজধর্মের চরম সিদ্ধি দান করেছে, তিনি সম্মুখসমরে ভূলুণ্ঠিত হয়েছেন। তিনি দহন সহ্য করতে থাকবেন। পাণ্ডব-কৌরবরা শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মের সুরক্ষা বিধান করে একে একে শিবিরে ফিরে গেলেন। নক্ষত্রখচিত রাত্রিতে উন্মুক্ত আকাশের নীচে শরবিদ্ধ একটি শরীরের সঙ্গে একটি বিশাল হৃদয়ও পড়ে রইল শরবিদ্ধ জীবনের শত শত দহন রোমন্থন করার জন্য।

পরের দিন সকাল হতেই হস্তিনায় সমাগত ক্ষত্রিয়েরা সব আবারও এলেন ভীষ্মকে দেখবার জন্য। রাজবাড়ির মেয়েরা চন্দনের গুঁড়ো ছিটিয়ে, খই ছিটিয়ে ক্ষত্রিয়বীরের সংবর্ধনা জানালেন ভীষ্মকে—কন্যাশ্চন্দনচূর্ণৈশ্চ লাজৈর্মাল্যৈশ্চ সর্বশঃ। পৌর-জানপদ আবালবৃদ্ধবনিতা খবর পেয়ে দেখতে এলেন ক্ষত্রিয়বীরের আদর্শ বিশ্রাম কেমন হয়। কিছু কৌতূহলী প্রেক্ষকও দাঁড়িয়ে গেল সদ্যখনিত পরিখার চার ধারে—তারা শুধুই সালস্যে দেখে, কিছুই করে না—স্ত্রিয়ো বৃদ্ধাস্তথা বালং প্রেক্ষাকাশ্চ পৃথগ্‌জনাঃ।

ভীষ্মের পতনে সেদিনকার যুদ্ধ আরম্ভ হতে দেরি হল। পাণ্ডব-কৌরবরা সকলে অস্ত্রবর্মহীন অবস্থায় পিতামহকে দেখতে এলেন সকালবেলায়। চরম প্রতিপক্ষ হলেও এখন তাঁরা একে অপরের সঙ্গে কথা বলছেন, সমবয়সিরা একত্রে আগের মতো প্রীতিযুক্ত সম্ভাষণ করছেন পরস্পরকে—অন্যোন্যং প্রতিমন্তস্তে যথাপূর্বং যথাবয়ঃ। মহান মৃত্যু পারস্পরিক বিসংবাদ ভুলিয়ে কাছে এনে দেয় শত্রুকেও। ভীষ্মকে দেখে বোঝা যাচ্ছে, তিনি অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করছেন। দশ দিনের যুদ্ধের পরিশ্রম, তার ওপরে এই শর-দহন, তৃষ্ণায় তাঁর কণ্ঠতালু শুষ্কপ্রায়। তিনি জল খেতে চাইলেন।

রাজারা একসঙ্গে পৃথক পৃথক আধারে ভরে নিয়ে এলেন শীতল সুগন্ধী জল। ভীষ্ম বললেন—এই জল কি আমার জন্য? মানুষের যা ভোগ্য, তাই কি আর আমার যোগ্য হতে পারে? এই শরশয্যায় শয়নের পর থেকেই আমি এই মর্ত মানুষের রীতিনীতির বাইরে চলে

গেছি—অপক্রান্তো মনুষ্যেভ্যঃ শরশয্যাং গতো হ্যহম্। সত্যিই তো, ভীষ্ম এমন শরবিদ্ধ হস্তপদে, মনোহর উদকুম্ভের জল পান করবেন কী করে? রাজারা আবার জলের সঙ্গে খাবারদাবারও এনেছিলেন—ভক্ষ্যান্ উচ্চাবচান্ রাজন্ বারিকুম্ভাংশ্চ শীতলান্।

আবারও অর্জুনের ডাক পড়ল। পিতামহের তৃষ্ণাকুল কণ্ঠস্বর শুনে অর্জুন আবারও বাণ জুড়লেন গাণ্ডীবে। বারুণ অস্ত্রে বিদ্ধ হল পৃথিবী, বেরিয়ে এল অমর্ত্য জলধারা—শীতল, অমৃতকল্প, গন্ধবতী পৃথিবীর দিব্যগন্ধভরা নির্মল জলধারা—শীতস্যামৃতকল্পস্য দিব্যগন্ধরসস্য চ। সেই জলধারা ছড়িয়ে পড়ল ভীষ্মের দহনদিগ্ধ শরীরে, সিঞ্চিত করল তাঁর মুখমণ্ডল, আপূর্ণ করল শুষ্ক শ্রান্ত তৃষ্ণালু কণ্ঠ। ধরণীতে শয়ান ভীষ্ম ধরণীর উপাদানে তৃপ্ত হলেন। কোনও কৃত্রিম বস্তু, যা রাজভোগ্য, তা আর কখনওই ভীষ্মের তুষ্টিদায়ক হয়ে উঠছে না। বসুন্ধরার কোলে শত শরের আধারে যাঁর শয়ন রচিত হয়েছে, তাঁর মস্তক ধারণ করার জন্য যেমন শরাকীর্ণ উপাধান চাই, তেমনই তাঁর তৃষ্ণার মুক্তি ঘটানোর জন্য প্রকৃতির উপাদান চাই।

কিন্তু বীরের এই অভিপ্রায় বোঝবার জন্য বার বার যাঁর ডাক পড়ছে, তিনি অর্জুন, যিনি পিতামহের প্রায় অগম্য ইঙ্গিতগুলি বুঝতে পারছেন এবং কাজগুলিও করছেন তাঁরই অভীষ্ট অনুযায়ী। কেন বার বার অর্জুনকেই ডাকছেন পিতামহ? এই শেষ শরশয্যায় শুয়েও কিছু যেন বোঝাতে চাইছেন তিনি। যা বোঝাতে চাইছেন, তা যে একেবারে বোঝা গেলও না, তাও নয়। পৃথিবী বিদ্ধ করে অর্জুন যখন শীতল জলধারা আকর্ষণ করে আনলেন পিতামহের তৃষ্ণাকুল মুখে, তখন এই অমানুষিক কর্মে কৌরবপক্ষের বীরেরা সব কেঁপে উঠেছিলেন। মহাভারতের কবি লিখেছেন—প্রচণ্ড শীত লাগলে গোরুর গায়ে যেমন কাঁটা দিয়ে ওঠে, অর্জুনের কাণ্ড দেখে সমস্ত কৌরবরা তেমনই কেঁপে উঠেছিলেন—সম্প্রাবেপন্ত কুরবঃ গাবঃ শীতার্দিতা ইব। শৈত্যতাড়িত গাভীর প্রায় গা-ঝাড়া দিয়ে কেঁপে ওঠা যাঁরা লক্ষ করেছেন, তাঁরা যেমন ওই কাঁপুনির শরীরময় এক অস্বস্থ পরিণাম উপলব্ধি করবেন, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে এটাও যেন বুঝবেন যে—এই নির্বোধ নিরীহ পশু বোধ হয় তার এই কাঁপুনির কারণটা কিছুতেই বোঝে না। শৈত্য অপনোদনের জন্য সে ডাক ছেড়ে মালিককে জানান দেয় না এবং সে নিজেও কিছু করতে পারে না আপন কষ্ট লাঘব করার স্বার্থে। সে শুধুই নিরীহ চোখে এদিক ওদিক জ্বল্ জ্বল্ করে তাকায়, আর কেঁপেই যায়, কেঁপেই যায়। হয়তো গোরু বলেই।

কৌরবদের অবস্থাও প্রায় একইরকম। অর্জুনের অমানুষিক অস্ত্র-কর্ম দেখে তাঁদের গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, কিন্তু তাঁদের এই বোধ নেই যে, যুদ্ধে তাঁদের কী পরিণাম ঘটবে। অথবা শুধু অর্জুনের কারণেই যে তাঁদের দুর্গতি ঘনীভূত হচ্ছে—ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মকেও আজ শরশয্যায় শয়ান হতে হল—এই গভীর বোধটা তাঁদের কাজ করছে না। অথচ প্রয়োজনীয় মুহূর্তে অর্জুনের একান্ত অস্ত্রনিপুণতা দেখে সাশ্চর্যে কেঁপে উঠছেন। অথচ নিরীহ নির্বোধ গাভীর মতো কেউ তাঁরা ডাক ছেড়ে জানান দিচ্ছেন না যে, তাঁদের সমস্ত দুর্গতির কারণ ঘটাবেন অর্জুন, অথবা তাঁরা নিজেও কোনও চেষ্টা করছেন না দুষ্ট যুদ্ধ নিবারণ করার জন্য।

ভীষ্ম বার বার আপন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইঙ্গিতাকারের মাধ্যমে অর্জুনকে কৌরবদের সামনে এক অপ্রকাশিত মহিমায়, অদৃষ্টপূর্ব গরিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন। আরও পরিষ্কার করে বলা যায়, শৈত্যতাড়িত নির্বোধ গাভীর মধ্যে যে স্পষ্ট বোধটুকু থাকে না, ভীষ্ম সেই বোধটুকুই নিবিষ্ট করতে চাইছেন কৌরবদের মনে। বসুন্ধরার অন্তর ফুঁড়ে যখন সেই অমৃতনিঃস্যন্দী শীতল জল ভীষ্মের তৃষ্ণাতাড়িত মুখে এসে পড়ল, তখন এই অত্যাশ্চর্য কর্ম প্রত্যক্ষ করে উপস্থিত সকলে অর্জুনের জয়কার ঘোষণা করে শঙ্খধ্বনি করে উঠল। দেখুন, লৌকিকভাবে দেখতে গেলে শরশয্যায় শয়ান পিতামহের লম্বমান মস্তকের তলায় শরের

উপাধান রচনা করাটা অসম্ভব কোনও কর্ম না হলেও মাটির গর্ভ থেকে শীতল পানীয় আহরণ করাটা নিতান্তই অলৌকিক কাজ। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই যেটা তাৎপর্যময়, সেটা হল অর্জুন ইঙ্গিতজ্ঞ, মর্মজ্ঞ। যুদ্ধক্ষেত্রেও অর্জুন তাঁর প্রতিপক্ষের ইঙ্গিত, আকার এবং চেষ্টা বুঝেই বাণক্ষেপণ করতে পারেন। এই ক্ষমতাটাই অলৌকিক প্রতিভার প্রমাণ। পর পর দুটি অভাবনীয় কর্মের মাধ্যমে ভীষ্ম তাঁর প্রিয়তম পৌত্রের এই ভাবতা এবং ইঙ্গিতজ্ঞতার পরিচয় সবার সামনে প্রকটিত করতে চাইছেন, বস্তুত ওই কর্মগুলির অলৌকিক স্থূলতাটুকু ভীষ্মের কাছে বা মহাভারতের কবির কাছেও এক উপলক্ষমাত্র।

শীতল জলধারায় তৃষ্ণা নিবারণ করেই ভীষ্ম তাঁর চারধারে উপস্থিত সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে অর্জুনকে প্রশংসা করে বললেন—তোমার পক্ষে এসব কাজ করাটা কিছুই আশ্চর্য নয়—নৈতচ্চিত্রং মহাবাহো ত্বয়ি কৌরবনন্দন। অনেককাল আগেই দেবর্ষি নারদ আমাকে বলে গেছেন যে, তুমি সাধারণ মানুষ নও। তুমি ঋষি। আরও বলে গেছেন—দেবরাজ ইন্দ্রও যে কর্ম করতে পারবেন না, বাসুদেব কৃষ্ণের সহায়তায় তুমি সেই কর্ম করবে।

অর্জুনের প্রশংসায় শুধু এই অলৌকিক স্পর্শ লাগিয়েই ভীষ্ম ক্ষান্ত হলেন না, এমনকী সমস্ত ধনুর্ধর পুরুষের মধ্যে অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করেও ভীষ্ম বিরত হলেন না, কারণ অর্জুনের অমানুষিক কর্ম অথবা তাঁর অপার শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করাটা তাঁর উদ্দেশ্যই নয়। তাঁর উদ্দেশ্য, দুর্যোধন এবং তাঁর স্বপক্ষীয় রাজাদের যুদ্ধ থেকে বিরত করা। সেই উদ্দেশেই ভীষ্ম অর্জুনের প্রশংসা শেষ করেই আসল কথাটা বলতে আরম্ভ করলেন। ভীষ্ম বললেন—আমি অনেক বলেছি, দুর্যোধন শোনেনি—ন বৈ তং ধার্তরাষ্ট্রেণ বাক্যম্। আর শুধু আমি কেন, পাণ্ডবদের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে নেবার কথা অনেকেই বলেছেন। বিদুর বলেছেন, দ্রোণ বলেছেন, পরশুরাম বলেছেন, কৃষ্ণ বলেছেন এবং সঞ্জয়ও বলেছেন। দুর্যোধন কারও কথা শোনেনি। তার বুদ্ধি বিপরীত, সমস্ত শাসন সে লঙ্ঘন করেছে। অতএব অচেতন পুরুষের মতো একদিন তাকে ভীমের হাতে নাকাল হয়ে মরতে হবে—স শেষ্যতে বৈ নিহতশ্চিরায়/ শাস্ত্রাতিগো ভীমবলাভিভূতঃ।

শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের মুখ দিয়ে শত্রুপক্ষের এক প্রধানতম শত্রু ভীমের এত প্রশংসাও দুর্যোধনের সহ্য হল না, কিন্তু মৃত্যুন্মুখ বৃদ্ধ পিতামহের প্রতি সাধারণ সৌজন্যবশতই তিনি বড় বিষণ্ণ হলেন মনে মনে—দুর্যোধনো দীনমনা বভূব।

কিন্তু এবার ভীষ্ম পরোক্ষে কথা বলা ছেড়ে দিয়ে সোজাসুজি দুর্যোধনকে আক্রমণ করে বললেন—দেখলে তো দুর্যোধন—অর্জুন কীভাবে অমৃতগন্ধী জলের ধারা এনে ফেলল আমার মুখে। এ কাজ কি অন্য কেউ পারবে? বিচিত্র অস্ত্রের এইসব অদ্ভুত প্রয়োগ—এ জানে শুধু অর্জুন। আর জানেন কৃষ্ণ। আমি পরিষ্কার বলছি, বাছা! তুমি অর্জুনকে কোনও দিন যুদ্ধে জিততে পারবে না। যে এমন অলৌকিক অস্ত্রের সন্ধি জানে, আমি চাই সেই অর্জুনের সঙ্গে তোমার সন্ধি হোক অবিলম্বে—সন্ধির্ভবতু মা চিরম্।

ভীষ্মের কথায় ধ্রুবপদ বাঁধা হয়ে গেল—অবিলম্বে সন্ধি হোক—সন্ধির্ভবতু মা চিরম্। একবার তিনি কৃষ্ণের কথা বলেন, যুধিষ্ঠিরের কথা বলেন, ভীমের কথা বলেন, আর প্রত্যেকবার শেষে বলেন—অবিলম্বে সন্ধি হোক। ভীষ্মের ধারণা—এখনও কৃষ্ণ পাণ্ডবদের অধীনতা মেনে, তাঁদের মতে মত দিয়েই চলছেন। কিন্তু তিনি যদি একবার স্বাধীনভাবে নিজের মতে চলেন, তার আগেই যেন সন্ধিটা হয়ে যায়—যাবৎ কৃষ্ণো মহাবাহুঃ স্বাধীনঃ কুরুসত্তমঃ। যুধিষ্ঠিরের মতো শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তির ক্রোধপ্রজ্জ্বলিত নয়ন ভীষ্মকে উদ্‌বিগ্ন করে। মহাবলী ভীমসেনের প্রতিজ্ঞাগুলি তাঁকে আশঙ্কিত করে। অতএব এখনও কৌরবদের যে কটি ভাই বেঁচে আছে এবং যত সৈন্য এখনও জীবিত আছে, তাদের সবাইকে বাঁচিয়ে রাখার

জন্য বৃদ্ধ পিতামহ দুর্যোধনকে পরামর্শ দেন—আমি মরতে চলেছি, অতএব আমার এই মৃত্যুই এ যুদ্ধের শেষ মৃত্যু বলে চিহ্নিত হোক। তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করে শান্ত হও—যুদ্ধং মদন্তমেবাস্তু তাত সংশাম্য পাণ্ডবৈঃ। তুমি ক্রোধ ত্যাগ করো। এই বুড়ো ভীষ্ম মারা যাচ্ছে, তাতে কোনও দুঃখ নেই আমার। কিন্তু অবশিষ্ট আর সব যোদ্ধারা ভালভাবে বেঁচে থাকুন। পাণ্ডবদের সঙ্গে তোমার মিটমাট হয়ে যাক—ভীষ্মস্যান্তাদস্তু বঃ সৌহৃদঞ্চ/জীবন্তু শেষাঃ সাধু রাজন্ প্রসীদ।

বারংবার ভীষ্মের মুখ দিয়ে এই একই কথা বেরিয়েছে—আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এই ভীষণ যুদ্ধ শেষ হোক। মহাসত্ত্ব বিশালহৃদয় মানুষের মুখ দিয়েই বস্তুত এমন উদার আহ্বান শোনা যাবে। ভীষ্মের স্মরণ হয়ে থাকবে যে, একদিন এই প্রসিদ্ধ ভরতবংশ প্রায় লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছিল। জননী সত্যবতীর কথায় তিনি কীভাবে এই ভরতবংশের প্রথমোদগত অঙ্কুরগুলিকে লালন করেছিলেন এবং তাও দু-তিনটি 'জেনারেশন' ধরে, কী অপার পরিশ্রমে, কত অনাকুল ধৈর্য নিয়ে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে-বসা রাজাদের তিনি সেবা করে গেছেন, সেকথা তাঁর মতো করে কেই বা বুঝবে! তিনি নিজে রাজা হননি, হতে চাননি, কিন্তু তাই বলে চিত্রাঙ্গদ-বিচিত্রবীর্যের মতো অনুপযুক্ত রাজারা যখন সিংহাসনে বসেছেন; তখন তিনি তাদের লঙ্ঘনও করেননি অথচ তাঁদের অনুপযুক্ততা ঢেকে দিয়েছেন নিজের দায়বদ্ধতায়, নিজের পরিশ্রমে। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুকেও মানুষ করেছেন তিনি। কিন্তু পাণ্ডুর মৃত্যুর পর যখন হস্তিনাপুরের রাজনীতি জ্ঞাতিবিরোধের পঙ্কে নিমজ্জিত হল, তখনও তিনিই প্রধানত বংশের মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন—রাজ্য ভাগ করে পাণ্ডবদের পৃথক অধিকার স্থাপন করার প্রস্তাব করে।

দুর্যোধনের হিংসায়, ক্ষুধায়, স্বার্থৈষণায় শেষ পর্যন্ত তাঁর সমস্ত সম্ভাবনা যখন তাৎপর্য হারিয়ে ফেলেছে, তখন তিনি বুঝে গেছেন যে, প্রসিদ্ধ ভরতবংশের একাংশ একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে। এই বিশাল বিলুপ্তি তিনি এখনও চান না। চান না বলেই তিনি আপন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষ চেষ্টা করে যাচ্ছেন যাতে ভরতবংশের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধৃত হয়। তা ছাড়া এই সর্বনাশা যুদ্ধ, যেখানে ভারতবর্ষের সমস্ত রাজারা সাধারণ এক জ্ঞাতিবিরোধের কারণে এবং শক্তিমত্ত রাজার প্রতি আনুগত্যবশতই আপাতত দ্বিধা বিভক্ত, ভীষ্ম জানেন—তাঁরা বিনা কারণে শুধুমাত্র এই ভীষণ যুদ্ধের বলি হবেন। অতএব ইচ্ছামৃত্যুর বর লাভ করা সত্ত্বেও আজকে যে এই কুরুবৃদ্ধ পিতামহ মৃত্যুবরণ করতে চাইছেন, তার একমাত্র কারণ তিনি চান যে, এই অবসানের মধ্য দিয়ে পাণ্ডব-কৌরব আবারও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করুন এবং যুদ্ধ বন্ধ হোক।

নিজের প্রগাঢ় অভিজ্ঞতায় ভীষ্ম জানেন যে, দুর্যোধনের মতো অহংকারী ব্যক্তির পক্ষে যুধিষ্ঠিরের আনুগত্য স্বীকার করা সম্ভব হবে না। কিন্তু রাজনীতির ভাষায় যাকে 'স্টেটাস কুয়ো' বলে, তিনি সেই পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনতে বলছেন দুর্যোধনকে। বড় আন্তরিকভাবে তিনি বললেন—পাণ্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্থ, তাদেরই ফিরিয়ে দাও, বাছা! যুধিষ্ঠির চলে যাক সেখানে—রাজস্যার্ধং দীয়তাং পাণ্ডবানাম্/ইন্দ্রপ্রস্থং ধর্মরাজো' ভিযাতু। একমাত্র এই ব্যবস্থা হলেই লোকে আর তোমার ওপর আত্মীয়-বিরোধিতার কলঙ্ক লেপন করতে পারবে না। ভীষ্ম এবার যুদ্ধের সামগ্রিক নাশকতার ভাবনা মাথায় রেখে বলছেন—আমার এই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শান্তি হোক আমাদের প্রজাদের, রাজারা প্রতিমন্ত হয়ে ফিরে যান আপন আপন রাজ্যে। পিতা ফিরে পাক তার পুত্রকে, মামা ফিরে পাক আদরের ভাগনেকে, ভাই ফিরে পাক ভাইকে—পিতা পুত্রং মাতুলো ভাগিনেয়ং/ভ্রাতা চৈব ভ্রাতরং প্রৈতু রাজন্।

দুর্যোধনকে ভীষ্ম খুব ভালভাবেই চেনেন। তিনি জানেন—তাঁর এই আন্তরিক ভাবনা—প্রজাদের জন্য, করদ রাজাদের জন্য, এমনকী যুদ্ধের কারণে ব্যাকুল হয়ে থাকা প্রত্যেকটি

পরিবারের পিতামাতা, ভাইবন্ধুর জন্য তাঁর এই সামগ্রিক ভাবনা দুর্যোধন হয়তো বুঝবেন না। হয়তো কেন, যিনি এতদিন কিছু বোঝেননি, তিনি এখনও বুঝবেন না। অতএব এতদিন চিরকুমারের ব্রত পালন করার শক্তি, এতদিন রাজা না হয়েও রাজবংশের প্রতি দায়বদ্ধতার ভক্তি এবং এতদিনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার তৃপ্তি নিয়ে ভীষ্ম দুর্যোধনের প্রতি শেষ সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন প্রায় বাক্‌সিদ্ধের মতো। বললেন—এত কথার পরেও নির্বুদ্ধিতাবশত যদি তুমি আমার কথা না শোন, যদি তোমার সেই মোহ এখনও থেকে থাকে যে—তুমি এই যুদ্ধ জিতবে বলে ভাবছ, তা হলে সত্য কথাটা শুনে রাখো—আমার মৃত্যু দিয়েই যে যুদ্ধ শেষ হতে পারত, সেই যুদ্ধ শেষ হবে তোমাদের সবাইকে শেষ করে—তন্স্যস্যন্তে এতদন্তাঃ স্থ সর্বে/সত্যামেতাং ভারতীমীরয়ামি।

ভীষ্মের মুখে 'শেষ সত্য কথা'—এখানে 'কথা' শব্দটার সংস্কৃত দিয়েছেন মহাভারতের কবি—ভারতী। ভারতী মানে কথা, শব্দ, সরস্বতী। কিন্তু সে যাই হোক, ভারতবর্ষ, ভরতবংশ এবং সেই প্রাচীন রাজা ভরত দৌষ্যন্তির সঙ্গে একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় 'ভারতী' বলতে এখানে শুধু কথামাত্র বোঝায় না। তাঁর কথার মধ্য দিয়ে ভীষ্ম প্রসিদ্ধ ভরতবংশের বিশাল এক ভাবনাকে বোঝাতে চাইছেন, বোঝাতে চাইছেন চিরন্তন ভারতবর্ষের প্রিয়তম ভাবনাকে। বোঝাতে চাইছেন—যুদ্ধ নয়, শান্তি; ধ্বংস নয়, ধারণ; বিভেদ নয়, অন্তত একত্র শান্তিপূর্ণ সহবাসেও ভারতবর্ষের মর্মরক্ষা হতে পারে। মহাভারতের কবির কী নিপুণ শব্দপ্রয়োগ! ভীষ্মের 'ভারতী' শোনানো হচ্ছে কাকে? না,—রাজ্ঞাং মধ্যে ভারতং শ্রাবয়িত্বা। ভরতবংশের অধস্তন শেষ 'ভারত'কে ভীষ্ম তাঁর 'ভারতী' শোনাচ্ছেন। সমস্ত শব্দব্যঞ্জনায় 'ভারত', 'ভারতী' এমনই এক মর্মবাণী প্রকাশ করে, যার অন্তর্গত তাৎপর্য বহু অতীতাগত এবং বহু দূরগামী। ভীষ্ম তাঁর শেষ বাক্য উচ্চারণ করে নিজের কঠিন শরশয়নের যন্ত্রণা মানসিক শক্তিতে নিরুদ্ধ করে, মনকে দেহের ঊর্ধ্বে স্থাপন করলেন পরমেশ্বরের ভাবনায়—যোজ্যাত্মানং বেদনাং সংনিয়ম্য।

ভীষ্ম আর একটি কথাও বললেন না। একে একে উপস্থিত রাজারা পাণ্ডবরা, কৌরবরা সকলেই নিজের নিজের শিবিরের দিকে চললেন। ভীষ্মের পরামর্শ যতই হিতকর হোক, মৃত্যুপথের পথিক যেমন পথ্য খেতে চায় না, ওষুধ খেতে চায় না, ভীষ্মের পরামর্শও তেমনই রুচিকর হল না দুর্যোধনের কাছে—নারোচয়ত পুত্রস্তে মুমূর্ষরিব ভেষজম্।

সমস্ত লোক চলে গেলে ভীষ্মের শরশয়নের স্থানটুকু নিস্তব্ধ হয়ে উঠল। দু-চারজন রক্ষী পুরুষ যারা কুরুরাজার নির্দেশে ভীষ্মকে পাহারা দিচ্ছিল, তারাই শুধু জেগে রইল রাতের অন্ধকারে। পাণ্ডব-কৌরবপক্ষের সমস্ত রাজারা যখন চলে গেছেন, তখন সেই নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে একাকী ভীষ্মের কাছে এসে দাঁড়ালেন কর্ণ। ভীষ্মের পতন-কাহিনী শুনে তাঁর একটু ভয়ও হয়েছে, এবং বিশেষত হয়েছে অস্বস্তি। কারণ ভীষ্মের সম্পূর্ণ সেনাপতিত্বকালে কর্ণ যুদ্ধ করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। কর্ণের অভিমান ছিল—ভীষ্ম তাঁকে সকলের সামনে বড় খাটো করেন, অর্জুনের প্রতিতুলনায় তাঁর বীরত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। কর্ণ তাই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—ভীষ্মের সেনাপতিত্বকালে তিনি অস্ত্র তুলবেন না হাতে। ভীষ্মের মৃত্যু হোক, তবে তিনি যুদ্ধ করতে নামবেন কৌরবদের হয়ে।

কিন্তু আজ যখন ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করে মৃত্যুর দিন গুণছেন, তখন কর্ণ অনুতপ্ত হচ্ছেন মনে মনে। পাণ্ডবদের প্রতি সখা দুর্যোধনের অন্যায় আচরণগুলি তিনি অন্তর্গত চিত্তে অনুধাবন করতে পারেন না, এমন বুদ্ধিহীন মানুষ তিনি নন। অন্যদিকে নিজের প্রতি দুর্যোধনের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব এবং দুর্বলতাকেও তিনি কোনওভাবেই ছোট করে দেখতে পারেন না। পিতামাতার পরিত্যক্ত জীবনে দুর্যোধনের আন্তরিক সহায়তাই তাঁকে মানুষের মর্যাদা দিয়েছে। সেই মর্যাদার প্রতি বাইরের আঘাত এসেছে বার বার, সে আঘাত এসেছে ভীষ্মের

কাছ থেকেও। তাতে তাঁর অনেক অভিমান পুঞ্জীভূত হয়েছে বটে। কিন্তু আজ যখন পিতামহ ভীষ্মের মতো মহাবীরও ভূমিলুণ্ঠিত হয়েছেন, তখন কর্ণ অবশ্য বুঝতে পারছেন যে, পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয় করা এত সহজ হবে না। এখন তিনি বুঝতে পারছেন যে, কৌরবকুলের বৃদ্ধ পিতামহের সঙ্গে এতকাল ধরে তিনি যে রূঢ় ব্যবহার করেছেন, সকলের মধ্যে এই বৃদ্ধকে তিনি যেভাবে অপমান করেছেন, তা সর্বাংশে ঠিক হয়নি। তাই ভীষ্মের শরশয্যার পাশে আজকে যত রাজারা দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁদের সবার সামনে বিশেষত কৌরব-পাণ্ডবদের সামনে দাঁড়িয়ে এই বৃদ্ধের কাছে অনুতাপ প্রকাশ করতে তাঁর লজ্জা করেছে। অতএব সকলে চলে যেতেই তিনি তাড়াতাড়ি ভীষ্মের সামনে এসে করজোড়ে দাঁড়িয়েছেন সলজ্জে, সানুতাপে—ঈষদাগতসন্ত্রাসসস্ত্বরয়োপজগাম হ।

কর্ণ দেখতে পেলেন—এক মহাবীর ক্ষত্রিয়োচিত বীরশয্যায় শয়ন করে আছেন, ঠিক যেমন দেবসেনাপতি কার্তিক তাঁর জন্মশয্যায় শুয়েছিলেন শরবনে। দেহের সমস্ত যন্ত্রণা তিনি সহ্য করছেন চোখ বুজে মানসিক দৃঢ়তায়। ভীষ্মের অবস্থা দেখে কর্ণের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এল। চোখে ভরে এল জল। তিনি ভীষ্মের পা জড়িয়ে ধরলেন নিদারুণ অপরাধবোধে—অভ্যেত্য পাদয়োরস্য নিপপাত মহাদ্যুতিঃ। বললেন—আমি রাধেয় কর্ণ। আমি যুদ্ধ করিনি বটে, কিন্তু সদাসর্বদা যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার চোখের সামনে থেকেছি। আমি নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও চিরটা কাল আপনার বিদ্বেষের পাত্র হয়েই রইলাম। কোনও সময় আমি আপনার সমর্থন বা প্রশংসা লাভ করিনি—দ্বেষ্যো'ত্যন্তমনাগাঃ সন্...নিত্যমক্ষিগতস্তব।

গলার স্বর শুনে, কথার ভঙ্গি শুনে পিতামহ ভীষ্ম বুঝলেন যে, কর্ণ এসেছেন। অনেক কষ্টে তিনি চোখ খুললেন। রাতের অন্ধকার আরও ঘনীভূত হয়েছে। দূরে, বহুদূরে পাণ্ডব-কৌরবদের সেনাশিবির থেকে মশালের আলো জ্বলতে দেখা যায়। ভীষ্ম চোখ খুলে দেখলেন—এক কর্ণ ছাড়া আর কেউই কাছাকাছি নেই। শুধু দুর্যোধনের নিযুক্ত রক্ষী পুরুষেরা রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে। ভীষ্ম ইশারায় তাদের একেবারে নজরের বাইরে, অন্যত্র সরে যেতে বললেন। পাহারাদারেরা কর্ণের কথা শুনেছে, কিন্তু ভীষ্মের আকার ইঙ্গিত এবং ইচ্ছা কিছুই বুঝতে পারল না। বস্তুত কর্ণ এবং ভীষ্মের পারস্পরিক বিরুদ্ধ সম্পর্কের কথা অনেকের মতো তারাও জানত। সেই দৃষ্টিতে কর্ণের ব্যবহারেই তারা আশ্চর্য হয়েছে, সেখানে ভীষ্ম আর তাদের আশ্চর্য এবং কৌতূহলী হয়ে ওঠার সুযোগ দেননি।

রক্ষী পুরুষেরা যখন বহুদূরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, তখন ভীষ্ম কোনও দিন যা করতে পারেননি, কোনও দিন যা বলতে পারেননি, ভীষ্ম তাই করলেন, তাই বললেন। আপন শরবদ্ধ হস্তদুটির একটি অন্তত প্রসারিত করে কর্ণের অবনত কণ্ঠখানি জড়িয়ে ধরলেন ভীষ্ম, ঠিক যেমন পিতা গাঢ় স্নেহে জড়িয়ে ধরেন পুত্রকে—পিতেব পুত্রং গাঙ্গেয়ঃ পরিরভ্যৈকপাণিনা। কত অপমান, কত কটু কথা তিনি বলেছেন এই ছেলেটিকে। আজ সেই সমস্ত অপমানের ওপর স্নেহের প্রলেপ মাখিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ পিতামহ স্নিগ্ধ চক্ষুতে কর্ণের দিকে তাকিয়ে বললেন—বাছা! তুমি যে সবসময় আমার সঙ্গে আড়াই-আড়াই করে টক্কর দিয়ে চল, তার জন্যই যে আমি তোমার বিরুদ্ধাচরণ করি, তা কিন্তু নয়—ন বিপ্রিয়ং মমৈবেহ যৎ স্পর্ধেথা ময়া সহ। এমনকী সেসব কথা মনে রেখে আজ যদি তুমি আমার কাছে না আসতে, তা হলে কি কোনও ভাবেই ভাল হত তোমার?

কর্ণ ভীষ্মের কাছে নিজের সর্বজনপরিচিত পরিচয় দিয়ে সাভিমানে বলেছিলেন—আমি রাধেয় কর্ণ এসেছি। ভীষ্ম সেই অভিমানের ওপর প্রলেপ দিয়ে বলেছেন—তুমি যে রাধার ছেলে নও, কুন্তীরই ছেলে, সে-কথা আমার জানতে বাকি নেই এবং আমি এও জানি যে, অধিরথ সূত তোমার পিতা নন। আমি দেবর্ষি নারদের কাছে শুনেছি তুমি ভগবান সূর্যের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জন্মেছ—কৌন্তেয়স্ত্বং ন রাধেয়ো ন তবাধিরথঃ পিতা। শুধু নারদই নন,

আমার ঋষি-ভ্রাতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের কাছেও আমি এই কথা শুনেছি। তা ছাড়া তোমার অস্ত্রক্ষমতা এবং সাহস দেখেও তোমার জন্ম সম্বন্ধে আমার কোনও সন্দেহ নেই—তেজসা চ ন সংশয়ঃ।

ভীষ্ম এসব কথা বললে অবধারিত প্রশ্ন আসে যে, কর্ণের জন্মরহস্য সব জানা সত্ত্বেও কেন এই বৃদ্ধ এত কটু কথা তাঁকে বলে এসেছেন এতদিন। ভীষ্ম জবাব দিচ্ছেন—দেখো! তুমি যে বললে—চিরটা কাল আমি তোমাকে বিদ্বেষ করে এসেছি, কথাটা একেবারেই সত্য নয়। বস্তুত তোমার ওপর আমার কোনও বিদ্বেষই নেই—ন চ দ্বেষো'স্তি মে তাত ত্বয়ি সত্যং ব্রবীমি তে। তবু যে এতকাল ধরে তোমাকে হাজারো নিষ্ঠুর কথা বলেছি, তা শুধুমাত্রই খানিকটা দমিয়ে রাখার জন্য। কারণ আমার বিশ্বাস—তুমি যে এতকাল ধরে পাণ্ডবদের ওপর তোমার রাগ দেখিয়ে আসছ, এই রাগ তুমি বিনা কারণেই দেখিয়েছ—অকস্মাৎ পাণ্ডবান্ হি ত্বং দ্বিষসীতি মতির্মম। আমি বেশ বুঝি—পাণ্ডবদের ওপর তোমার এই বিদ্বেষ তৈরি করেছেন দুর্যোধন। তাঁর নিজস্ব পাণ্ডব-বিদ্বেষে তিনি তোমাকে ব্যবহার করেছেন—যেনাসি বহুশো রাজ্ঞা চোদিতঃ কুরুনন্দনঃ। ব্যবহৃত হবার সময় তুমি যে কিছুই বোঝনি, তা নয়। তুমি বুঝেছ এবং সেটাই তোমার পক্ষে অধর্ম হয়েছে।

মৃত্যুশয্যায় শুয়ে ভীষ্ম বড় স্পষ্ট ভাষায় কথা বলছেন। কৌরব-পাণ্ডবের এক পিতামহ হিসেবে এই জ্ঞাতিযুদ্ধ তাঁর মনঃপূত ছিল না। তিনি এটাও বেশ ভালভাবে জানেন যে, দুর্যোধন যতটা বাড় বেড়েছেন, তা অনেকটাই কর্ণের জন্য। পুনশ্চ এই যুদ্ধ লাগার আগে তিনি যে পাঁচখানি গ্রামও পাণ্ডবদের ছেড়ে না দিয়ে যুদ্ধের পথ বেছে নিলেন, তা ওই কর্ণের ভরসায়। কর্ণ তাঁর এই বুদ্ধিতে ইন্ধন জুগিয়েছেন। ভীষ্ম কর্ণকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন যে, কর্ণের প্রতি তাঁর কোনও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নেই, কারণ কর্ণ কাজ করেছেন দুর্যোধনের জন্য এবং তা অনেকটাই যান্ত্রিকতায়। কিন্তু যান্ত্রিকভাবে করলেও সেই অন্যায়গুলি তিনি বুঝেসুঝেই করেছেন—ভীষ্মের আপত্তি সেইখানেই। তিনি বলেছেন—কর্ণ! তোমার এই বিপরীত বুদ্ধির কারণও তুমি নিজে নও। সমাজের সংস্কার না মেনেই তোমার জন্ম হয়েছিল বলেই তোমার এই বিপরীত বুদ্ধি—জাতো'সি ধর্মলোপেন যতস্তে বুদ্ধিরীদৃশী। তারওপরে তুমি যাকে বন্ধুভাবে আশ্রয় করে আছ, সে নিজে নীচ এবং পরশ্রীকাতর বলে, তোমার বুদ্ধিটা আরও বিপরীত হয়ে গেছে। তুমিও পরশ্রীকাতর হয়ে উঠেছ এবং তুমি গুণী মানুষের মধ্যেও গুণ দেখতে পাও না—নীচাশ্রয়ান্ মৎসরেণ দ্বেষিণী গুণিনামপি।

আধুনিকেরা অনেকে বলেন—সেকালের সমাজ ছিল স্থূল। 'সোস্যাল সাইকোলজি' কিংবা মনস্তত্ত্বের কোনও বৈজ্ঞানিক বোধ সেকালে ছিল না। আমরা বলব—অন্তত ভীষ্ম এখানে যেভাবে কর্ণের মনস্তত্ত্ব বিচার করেছেন, তা ভেবে দেখলে অবাক হতে হয়। লক্ষণীয়, জীবনের এই অন্তিম মুহূর্তে যখন তিনি খুব স্পষ্টভাবেই সত্য উচ্চারণ করছেন, সেই অবস্থাতেও তিনি কর্ণকে একটুও ব্যক্তিগতভাবে দোষী করছেন না। বরঞ্চ তিনি বেশ সহৃদয়ভাবে বোঝেন যে, একটি শিশুপুত্র যদি পিতার পরিচয় লাভ না করে, অপিচ জননীও যদি আপন স্বার্থবোধে তাকে পরিত্যাগ করেন, তবে সেই পুরুষের জীবনে নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব, বিকার এবং আন্দোলন তৈরি হয়। বিশেষত তার যদি বুদ্ধি থাকে এবং শক্তিও থাকে তবে জগতের সমস্ত সমাজসম্মত গুণী ব্যক্তির ওপর তার এক অহেতুক আক্রোশ তৈরি হয়। যেকোনও ভাবেই হোক, ওই সামাজিক গুণী ব্যক্তিদের সাহংকারে অতিক্রম করার একটা নেশা তাকে পেয়ে বসে।

কর্ণেরও তাই হয়েছে। ভীষ্ম তাঁকে বলেছেন—তোমকে যে সব সময় বিপরীত বুদ্ধিগুলি পেয়ে বসে, তার কারণ, তোমার জন্ম হয়েছে ধর্মের অতিক্রমের মধ্য দিয়ে—জাতো'সি ধর্মলোপেন যতস্তে বুদ্ধিরীদৃশী। ধর্ম বলতে এখানে ফুল-বেলপাতা-নৈবেদ্যের ধর্ম বোঝায় না। বোঝায় সামাজিক আইন, সামাজিক নিয়ম, সামাজিক শৃঙ্খলা। আমরা জানি—নিয়োগপ্রথার মাধ্যমেও যদি কর্ণের জন্ম হত, অথবা কুন্তী যদি পাণ্ডুর কাছে কর্ণের কথা বলতেন এবং পাণ্ডু যদি কর্ণের পিতৃত্ব স্বীকার করে নিতেন, তা হলেও কোনও অসুবিধে ছিল

না। কারণ, নিয়োগপ্রথা, সে-যুগের সমাজ-সচল প্রথা এবং পাঁচ ভাই পাণ্ডবেরাও প্রত্যেকেই নিয়োগজাত সন্তান। কিন্তু কর্ণ জন্মেছেন সমাজের সকল প্রথা ভেঙে—কুন্তীর অদম্য কৌতূহলে, সূর্যের আসঙ্গলিপ্সায়। নিয়োগপ্রথার কোনও নিয়মই এখানে খাটে না। ফলে সামাজিক শৃঙ্খলা অতিক্রমের মধ্যে দিয়েই যেহেতু কর্ণের জন্ম, অতএব সামাজিক অস্বীকৃতি থেকে যে বিকারগুলির সৃষ্টি হয়, কর্ণেরও তাই হয়েছে।

ভীষ্ম ঠিক এই কথাটাই বলছেন। তিনি কর্ণকে দায়ী করছেন না, কারণ, তাঁর আপন জন্মের জন্য কর্ণ দায়ী নন। কিন্তু কর্ণের জন্মের সময়ে সামাজিক নিয়মের বিলুপ্তি ঘটেছিল বলেই সেই অন্যায় কর্ণকে আক্রান্ত করেছে বিপরীতভাবে। জন্মের শোধ নেবার জন্যই যেন তিনি ভীষণ অহংকারী এবং গুণী মানুষের মধ্যেও তিনি গুণ দেখতে পান না। ভীষ্ম বুঝেছেন যে, এমন এক বিপরীতবুদ্ধি মানুষও যদি কোনও মহাশয় ব্যক্তির আশ্রিত হতেন, কোনও শুদ্ধহৃদয় ব্যক্তির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা থাকত, তা হলেও কর্ণ বেঁচে যেতেন হয়তো। কিন্তু দৈবক্রমে তাও হয়নি। ভীষ্ম বলেছেন—একে তোমার জন্ম হয়েছে ধর্মলুপ্তির মাধ্যমে, তার ওপরে তুমি এমনই এক নীচ ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছ যে, তার পরশ্রীকাতরতা, তার মাৎসর্য সব তোমার মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে। এর ফলেই তুমি গুণী মানুষের গুণ বোঝো না, তাঁকে বিদ্বেষ করার মধ্যেই তুমি সার্থকতা খুঁজে পাও—নীচাশ্রয়ান্মাৎসরেণ দ্বেষিণী গুণিনামপি।

ভীষ্ম বোঝাতে চাইলেন—আমি যে চিরটা কাল তোমাকে কঠিন রুক্ষ ভাষায় তিরস্কার করেছি তা শুধু এই কারণে যে, তুমি একজন বুদ্ধিমান পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও দুর্যোধনের মতো নীচ এবং পরশ্রীকাতর ব্যক্তির কথায় তুমি চালিত হয়েছ—তেনাসি বহুশো রুক্ষং শ্রাবিতঃ কুরুসংসদি। ভীষ্ম এতকাল ধরে অর্জুনের তুলনায় কর্ণকে সবার সামনে খাটো করে এসেছেন, আজকে সেই তুলনা বাদ দিয়ে তিনি সরাসরি কর্ণের প্রশংসা করতে আরম্ভ করলেন। আবারও বোঝাতে চাইলেন কর্ণের ওপর তাঁর কোনও ব্যক্তিগত ক্রোধ নেই, যত রুক্ষ কথাই তিনি বলে থাকুন না কেন, তা শুধুই চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁকে বলতে হয়েছে। এমনিতে তিনি কর্ণের গুণগ্রাহী।

ভীষ্ম বললেন—সত্যি কথা বলতে কী, যুদ্ধে যে তুমি কত শক্তি প্রকাশ করতে পার এবং সে শক্তি যে তোমার শত্রুদের কাছে কত দুঃসহ, তা আমি বেশ ভাল করেই জানি—জানামি সমরে বীর্যং শত্রুভিদুঃসহং তব। তা ছাড়া বেদ এবং ব্রাহ্মণ্য সম্বন্ধে তোমার স্পষ্ট ধারণা আছে, দানধর্মের নীতিতেও তোমার চিরন্তনী নিষ্ঠার কথা আমি জানি। আর বীরত্বের তো কথাই নেই। তোমার মতো দেবোপম পুরুষ এই পৃথিবীতে দ্বিতীয় কেউ নেই—একথা জানা সত্ত্বেও যে তোমাকে কঠোর বাক্যে তিরস্কার করেছি, তা শুধুই এই প্রসিদ্ধ ভরতবংশ যাতে ভেঙে না যায় সেই স্বার্থে—কুলভেদভয়াচ্চাহং সদা পুরুষমুক্তবান্।

কুলভেদ, কৌরব-পাণ্ডবের মধ্যে জ্ঞাতিভেদ—বৃদ্ধ পিতামহের কাছে এ যে কত বড় ভয়ের, কত দুঃখের, তা শুধু তিনিই জানেন। এই শরশয্যার শত দহনের মধ্যে শুয়ে থেকেও এখনও তিনি ভাবেন—তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই শেষ হোক সর্বান্তক শত্রুতা। কর্ণকে একান্তে পেয়ে বার বার তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, একজন বীর হিসেবে এবং মানুষ হিসেবে তিনি কর্ণকে অর্জুন কিংবা কৃষ্ণের থেকে কম শ্রদ্ধা করেন না। সেই কর্ণের মতো মানুষও যেখানে দুর্যোধনের প্ররোচনায় পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রুতায় মত্ত এবং জ্ঞাতিভেদ যেখানে যুদ্ধে পরিণত হয়েছে, তখন ভীষ্ম শেষ সিদ্ধান্ত করে বলেন—পুরুষকার এবং শক্তি দিয়ে অনেক কিছু লাভ করা সম্ভব বটে, কিন্তু সেই পুরুষকারের সাহায্যে দৈব অতিক্রম করা যায় না—দৈবং পুরুষকারেণ ন শক্যমতিবর্তিতুম্।

কথাটা দুদিকেই খাটে—ভীষ্মের নিজের জীবনেও, কর্ণের জীবনেও। কর্ণই চিরকাল বলতেন—কোন ঘরে, কোন বংশে মানুষ জন্মাবে সেটা দৈবাবত্ত বটে, কিন্তু আমার আয়ত্তে আছে পুরুষকার—দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মমায়ত্তং তু পৌরুষম্। কর্ণ এই পুরুষকারের দ্বারা জগদ্‌জয়ী হবেন বলে ভেবেছিলেন। কিন্তু আজ এই ভয়ংকর যুদ্ধে প্রথম সেনাপতির পতনের পরে সেই আত্মবলে নিশ্চয় আঘাত লেগেছে। ভীষ্ম সেটা আরও পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন নিজের জীবনের উদাহরণে। বোঝাতে চাইলেন—তিনিও একটা মহৎ উদ্দেশের পিছনে কম পুরুষকার অপচয় করেননি। প্রসিদ্ধ ভরত বংশের ধারা অক্ষুন্ন রাখার জন্য রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করেছেন, আজীবন ব্রহ্মচর্যে স্থিত থেকেছেন এবং একের পর এক রাজপুত্রদের—সেই কুমার চিত্রাঙ্গদ-বিচিত্রবীর্য থেকে আরম্ভ করে ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডু, দুর্যোধন-যুধিষ্ঠির পর্যন্ত সকলকেই মানুষ করবার চেষ্টা করেছেন একটাই আদর্শ নিয়ে—হস্তিনাপুরের রাজার সিংহাসন যেন সামান্য ব্যক্তিস্বার্থে কলুষিত না হয়। কিন্তু এখন তাই হতে চলেছে। স্বার্থচালিত দুর্যোধনের প্ররোচনায় এখন যুদ্ধ বেধেছে এবং কর্ণের মতো মহাবীরও সেই স্বার্থেরই যান্ত্রিকতায় চালিত। এর পরে দৈব ছাড়া আর কাকে চরমভাবে দায়ী করতে পারেন ভীষ্ম।

কোনও দিক থেকেই কোনও আশা নেই—এটা বেশ ভাল করেই বুঝে গেছেন ভীষ্ম। দুর্যোধনকে যুদ্ধ বন্ধ করার মিনতি জানিয়েছেন তিনি। এখন শেষ চেষ্টা হিসেবে কর্ণের হৃদয়ের কাছেও তিনি মিনতি করে বলছেন—বাছা! পাণ্ডবরা তোমার মায়ের পেটের ভাই—সোদর্য্যাঃ পাণ্ডবা বীরা ভ্রাতরস্তে'রিসূদন। তাদের সঙ্গে তোমার মিলন হোক, এই আমি চাই। আমার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হোক এই সর্বনাশা যুদ্ধ। সমস্ত রাজারা আজ মুক্ত হোন এই যুদ্ধের বিপদ থেকে—পৃথিব্যাং সর্বরাজানো ভবন্ত্বদ্য নিরাময়াঃ।

কর্ণ বহুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে এই বৃদ্ধ পিতামহের আদর্শ, আকৃতি এবং সম্ভাবনার কথা শুনলেন। কিন্তু এতদিন ধরে যে বিশ্বস্ততায় তিনি বন্ধু দুর্যোধনকে সেবা করেছেন, আজ হঠাৎই সেখান থেকে সরে আসা তাঁর পক্ষেও অসম্ভব ছিল। প্রায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত ভীষ্মের অনুরোধ তাঁকে লঙ্ঘন করতে হচ্ছে—এজন্য তিনি লজ্জিতও বোধ করছেন যথেষ্ট। তিনি বললেন—আপনি যা বলছেন, সব আমি বুঝি। আমি যে কুন্তীরই ছেলে এবং তিনি আমাকে পরিত্যাগ করার পর পিতা অধিরথ যে আমাকে পালন করেছেন, তাও আমি জানি। কিন্তু পিতামহ! এতকাল ধরে আমি দুর্যোধনের ঐশ্বর্য ভোগ করে যাচ্ছি, তাঁর অকৃত্রিম বন্ধুত্ব আজ আমি ঠেলে দিই কী করে—ভুক্ত্বা দুর্যোধনৈশ্বর্য্যং ন মিথ্যা কর্তুমুৎসহে। বাসুদেব কৃষ্ণ যেমন পাণ্ডবদের জন্য সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করেছেন, আমিও তেমনই গৃহ বিত্ত দারা সমস্ত কিছুর পরিবর্তে দুর্যোধনের স্বার্থরক্ষায় আত্মবলিদান করেছি।

শেষ পর্যন্ত কর্ণও ভীষ্মের মতোই সিদ্ধান্ত করলেন—যা ঘটবার তা ঘটবে, কেউ তা রোধ করতে পারবে না। সত্যিই পুরুষকার দিয়ে দৈবকে রোধ করা যায় না। চারদিকে এই পৃথিবীর বিপদাশঙ্কা ঘনিয়ে আসছে, সেই ভীষণ ক্ষয়ের লক্ষণ আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি। আপনি এই বিপদ বহু আগেই বুঝতে পেরেছিলেন এবং কুরুসভায় তার সংকেতও দিয়েছেন বহুবার—ভবদ্ভিরুপলব্ধানি কথিতানি চ সংসদি। কর্ণ বললেন—আমি বেশ জানি—অর্জুন-কৃষ্ণদের যুদ্ধে জয় করা অসম্ভব। কিন্তু তবুও আমাকে যুদ্ধ করতেই হবে। এতদিনের সযত্নলালিত এই শত্রুতা আমি হঠাৎই বাদ দিয়ে বসি কেমন করে—ন শক্যমবস্রষ্টুং বৈরমেতৎ সুদারুণম্। অর্জুনের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করতেই হবে এবং আপনি তাতে অনুমতি দিন, পিতামহ। আপনি অনুমতি দিলেই তবে আমি নির্দ্বিধায় এই যুদ্ধ করতে পারি—অনুজ্ঞাতস্ত্বয়া বীর যুধ্যেয়মিতি মে মতিঃ।

কর্ণ এবার মৃত্যুপথযাত্রী ভীষ্মের কাছে ক্ষমা চেয়ে বললেন—আমি চপলতাবশত অথবা

কখনও হঠাৎই বিনা কারণে যেসব কটু কথা আপনাকে বলেছি, তার জন্য আমাকে ক্ষমা করুন, পিতামহ—যন্ময়েহ কৃতং কিঞ্চিৎ তন্মে ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি। ভীষ্ম বুঝতে পারলেন কর্ণ যুদ্ধ ত্যাগ করবেন না। ভীষ্ম এতে দুঃখ পেলেন না খুব। কারণ সত্যিই তো এই প্রারব্ধ যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আশা কর্ণের পক্ষে খুব কঠিন। ভীষ্ম ভাল করেই বোঝেন যে, একজন ক্ষত্রিয় বীরের কতগুলি নীতিনিয়ম আছে, কতগুলি দায়বদ্ধতা আছে এবং সে দায়বদ্ধতা নিজের কাছেই সবচেয়ে বেশি। কর্ণ নিজেও ভীষ্মকে বলেছিলেন—অর্জুনের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করতেই হবে। আধি-ব্যাধির দ্বারা জীর্ণ হয়ে ক্ষত্রিয়ের দেহ বিনষ্ট না হয়, আমি সেই জন্যই দুর্যোধনকে আশ্রয় করে এতকাল পাণ্ডবদের ক্রোধ বাড়িয়ে তুলেছি—মা চৈতদ্ ব্যাধিমরণং ক্ষত্রং স্যাদিতি কৌরব। কাজেই এইরকম যাঁর মানসিক গঠন সেই কর্ণ হঠাৎ দুর্যোধনকে ত্যাগ করে স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে মিটমাট করে নেবেন—এতটা ভীষ্ম চাইলেও, তা যে হবার নয়, সেটাও তিনি বেশ ভালভাবেই জানেন।

ভীষ্ম তাই বললেন—একান্তই যদি তুমি এই ভয়ংকর শত্রুতা ত্যাগ না করতে পার, তবে যুদ্ধ করো। আমি অনুমতি দিচ্ছি। তবে হ্যাঁ, যুদ্ধ কর ক্ষত্রিয়ের স্বধর্মপালনের নীতিতে। কারও ওপরে রাগ করে বিকট উৎসাহে যুদ্ধ করো না। ভীষ্ম কর্ণকে উপদেশ দিচ্ছেন প্রায় ভগবদগীতার নিষ্কাম ভাবনায়। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম যুদ্ধ করা, অতএব যুদ্ধ কর। কিন্তু সেখানে যেন কোনও অহংকার না থাকে। না থাকে স্বার্থোন্মাদী স্ব-সুখ-পরায়ণ যুদ্ধবীরের মৎসর ভাবনা। ভীষ্ম নিজেও এই যুদ্ধই করেছেন। শুধু যুদ্ধের জন্যই যুদ্ধ করেছেন তিনি। উৎকট উৎসাহে ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম অতিক্রম করার মধ্যে ভীষ্ম ক্ষত্রিয়ের সার্থকতা দেখতে পান না। নিরহংকার নিষ্কাম শক্তি-প্রদর্শনের মধ্যে বীরের সদ্‌গতি এবং স্বর্গ দেখতে পান ভীষ্ম। গীতার কৃষ্ণের মতো করেই তিনি বলেন—যুধ্যস্ব নিরহঙ্কারো বলবীর্যব্যপাশ্রয়ঃ—ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার চাইতে ক্ষত্রিয়ের বৃহত্তর শ্রেয়-কর্ম কিছু নেই। ভীষ্ম কর্ণকে সেই যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়ে নিজের অন্তরতম কষ্টবোধ প্রকট করলেন কর্ণের সামনে। বললেন—কৌরব-পাণ্ডব—এই দুই পক্ষের মধ্যে শান্তিস্থাপন করার জন্য আমি সারা জীবন চেষ্টা করেছি—প্রশমে হি কৃতো যত্নঃ সুমহান্ সুচিরং ময়া—কিন্তু পারলাম না, কর্ণ! আমি কিছুই করতে পারলাম না।

ভীষ্মের এই আকুল আর্তি বোঝবার মতো সহৃদয়তা কর্ণের ছিল না, তা নয়। কিন্তু সমকালীন পরিস্থিতি, দুর্যোধনের কাছে তাঁর বন্ধুত্বের দায়, বিশ্বস্ততা রাখবার দায় এবং নিজের সারা জীবনের যন্ত্রণা—সব কিছু মিলে তাঁর হৃদয়টি এমনই বিপন্ন ছিল যে, ভীষ্মের কথা সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করেও তিনি যুদ্ধের জন্য ভীষ্মের কাছে অনুমতি চাইলেন এবং ভীষ্মও সে অনুমতি দিলেন।

কর্ণকেও যখন ভীষ্ম থামাতে পারলেন না, তখনই তিনি বুঝে গেলেন যে, তাঁর মৃত্যু ঘটলেও এই ভয়ংকর কুলক্ষয়ী যুদ্ধ চলতে থাকবে এবং কোনও উপায়েই দুর্যোধনকে বিরত করা যাবে না। অতএব কর্ণ চলে গেলে তিনি আগেরই মতো বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করলেন। অর্জুনের ছোঁড়া শরকন্টকের ওপর শুয়েও সমস্ত শরীরটাকে যেন তাঁর মন বুদ্ধি থেকে পৃথক করে নিতে পারলেন তিনি। শরীরের মতো শরীর বেদনা পেতে থাকল, কিন্তু নিজের মন বুদ্ধি তিনি নিযুক্ত করলেন ঈশ্বরের ভাবনায়—যোজ্যাত্মানং বেদনাং সংনিয়ম্য।

ভীষ্ম মৃতবৎ শরশয্যা গ্রহণ করলেন, কিন্তু প্রাণত্যাগ করলেন না। এই কষ্টকর মরণাপেক্ষার পিছনে তাঁর ইচ্ছামৃত্যুর ক্ষমতা প্রদর্শন করাটাই যে খুব বড় ছিল, তা মোটেই নয়। আসলে ভীষ্ম যখন বুঝলেন যে, তিনি কোনওভাবেই দুর্যোধনকে বোঝাতে পারবেন না, তখনই তিনি মনে করেছেন যে, এই যুদ্ধের পরিণতি তিনি দেখে যাবেন। একদিন জননী সত্যবতী এবং দ্বৈপায়ন ব্যাসের শুভৈষণায় যে কুরুকুলকে তিনি অঙ্কুর থেকে বিবর্ধিত

করেছেন, সেই কুলের শেষ পরিণতি কী হয়—তা দেখে যাবার কৌতূহল এই শরশয্যায় শুয়েও তিনি রোধ করতে পারেননি।

ভীষ্ম বুঝেছেন ন্যায় নীতি এবং ধর্মের যে সংজ্ঞায় এই প্রসিদ্ধ কুরুবংশ আধারিত ছিল, তা থেকে কবে থেকেই তো ভ্রষ্ট হয়েছেন কুরুবংশের অধস্তন পুরুষেরা। তাঁর পিতা শান্তনু যেদিন স্বকামসিদ্ধির জন্য এক অতি উপযুক্ত পুত্রকে বঞ্চিত করে বিবাহসুখ অনুভব করেছিলেন, সেদিন থেকেই নিশ্চয় তাঁর অভিমান ছিল যে, তাঁকে বাদ দিয়ে তাঁর পিতৃবংশের প্রতিষ্ঠা কেমন হয়—দেখে যাবেন তিনি। কিন্তু এই অভিমান নিয়ে তিনি থাকতে পারেননি। শান্তনু সত্যবতীর জ্যেষ্ঠ পুত্র চিত্রাঙ্গদের সাহংকার মৃত্যু হবার সঙ্গে সঙ্গেই সত্যবতীর সনির্বন্ধ অনুরোধে তাঁকে বিচিত্রবীর্যের সব দায়িত্ব নিতে হয়েছে। আবার তিনিও মারা গেলে ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডুর দায়িত্বও নিতে হয়েছে তাঁকেই। কুরুবংশীয় পুরুষদের নিজে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করে দেবার পর তাঁদের কোনও কাজে তিনি চরম কোনও বাধা দেননি, তাঁর পরামর্শ চাইলে তিনি তা সবসময়ই দিয়েছেন নিজের সাধ্য এবং বুদ্ধিমতো। কিন্তু সবসময় নিজের ইচ্ছাকে অতিক্রম করেও তিনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির আজ্ঞা পালন করেছেন বিশ্বস্ত রাজকর্মচারীর মতো। কিন্তু তবু মনে তাঁর সদাজাগ্রত বাসনা থেকে গেছে—রাজপদাধিকারী ব্যক্তির শেষ পরিণতি দেখবার।

ভীষ্ম পালিয়ে যাননি। কুরুবংশের প্রতি চিরন্তনী সেই মায়াই তাঁকে পালিয়ে যেতে দেয়নি। কুরুক্ষেত্রের শেষ পরিণতি তিনি দেখেছেন এবং বেঁচে থেকেছেন ততদিন পর্যন্ত, যতদিন না যুধিষ্ঠিরের ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হয়। শরশয্যায় কন্টকিত হয়েও এই অপেক্ষার তাঁর কী প্রয়োজন ছিল? প্রয়োজন ছিল। মনে রাখা দরকার, তাঁর পিতা শান্তনু যখন বেঁচে ছিলেন, তখনও তিনিই রাজ্য চালিয়েছিলেন যৌবরাজ্যের অধিকারে। তারপর পিতার মৃত্যু হলে চিত্রাঙ্গদের রাজত্বকালটুকু বাদ দিয়ে বিচিত্রবীর্যের রাজ্যও তিনিই চালিয়েছেন বকলমে। প্রেমে আর কামে যে ব্যক্তির যক্ষ্মা ধরে গেল, তিনি বেঁচে থাকতেও ভীষ্মের যেমন ব্যস্ততা গেছে, তাঁর মৃত্যুর পরেও বহুদিন তাঁর সেই ব্যস্ততাই গেছে, যতদিন না পাণ্ডু মানুষ হন।

পাণ্ডু রাজপাটে আসীন হবার পর ওই কিছুদিন মাত্র তাঁকে কথঞ্চিৎ নির্লিপ্ত দেখা গেছে। পাণ্ডুর সময় থেকেই তিনি কুরুবংশের বৃত্তিভোগী মন্ত্রীতে পরিণত হন। কিন্তু বৃত্তিভোগীর নিশ্চিন্ততা তাঁর কপালে জোটেনি। ধৃতরাষ্ট্র যেদিন থেকে স্বঘোষিত রাজা হয়ে গেছেন, সেদিন থেকেই তাঁর রাজকার্য এবং রাজনীতির অভিজ্ঞতা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাননি। সেই শান্তনুর সময় থেকে পাণ্ডুর সময়কাল পর্যন্ত তিনি রাজ্যপাট সামলেছেন বটে, কিন্তু সে রাজকর্মচারী ভৃত্যের মতো। কিন্তু তাঁর রাজনীতিশাস্ত্রের জ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিষয়ে যে বিশাল অভিজ্ঞতা আছে, তা তিনি কোনও দিনই স্বাধীনভাবে কাজে লাগাতে পারেননি। অথচ তাঁর এই অভিজ্ঞতাপুঞ্জের উত্তরাধিকার তিনি দিয়ে যেতে চান। বলে যেতে চান, তিনি কীভাবে রাজত্ব চালাতে চেয়েছিলেন, আর কীভাবে তা চলল। ঠিক এই জন্যই শরশয্যায় শুয়েও তিনি ইচ্ছা করে বেঁচে রইলেন যুধিষ্ঠিরের ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠার অপেক্ষায়।

বলতে পারেন—ভীষ্মের শরশয্যায় শোয়ার কথাটা এবং ইচ্ছামৃত্যুর কথাটা একেবারেই বুজরুকি। সত্যিই তো, লৌকিকভাবে এ কথাটা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয় যে, একটা মানুষ শরশয্যায় শয়ন করেও ইচ্ছামৃত্যুর ক্ষমতায় বেঁচে আছে! কথাটা বিশ্বাস নাই করলেন। কিন্তু মহাভারতের কবি, যিনি এক চিরকালীন মহাকাব্য লিখতে বসেছেন, তাঁর হৃদয়ের জল্পনাটুকু বোঝবার চেষ্টা করুন। বরঞ্চ লৌকিক দৃষ্টিতেই বুঝে নিন না কেন যে, বৃদ্ধ পিতামহ অর্জুনের শরাঘাতে আহত হয়েছিলেন যথেষ্ট, কিন্তু সে আঘাত তাঁকে সেনাপতিত্ব থেকে বিচ্যুত করলেও, তা বৃদ্ধের মরণ ডেকে আনেনি সঙ্গে সঙ্গে। এতে তো কবির যুক্তিটাই প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্জুনও তো বৃদ্ধ পিতামহকে মেরে ফেলতে চাননি। এই মানুষটির

ওপর তাঁর এতটাই শ্রদ্ধা এবং মমতা ছিল যে, তিনি তাঁকে বাণাঘাত করতেই কুণ্ঠিত ছিলেন। ফলত তাঁর বাণের আঘাত সেইটুকুমাত্র ছিল যা বৃদ্ধ পিতামহকে যুদ্ধ থেকে বিরত করে। অতএব তিনি আহত হয়েছেন কিন্তু মরেননি। অর্জুনের শরকন্টক তাঁকে আমৃত্যু কষ্ট দিয়েছে বলেই হয়তো শরশয্যার অভিসন্ধি তৈরি করেছেন বর্ণনানিপুণ মহাকাব্যের কবি।

ভীষ্মের পতনের পর আরও যে আট দিন ভয়ংকর যুদ্ধ হল, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্যোধনের মতো মহারথীরা যে যুদ্ধে আত্মাহুতি দিলেন, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গন জুড়ে বিধবা স্ত্রী আর পুত্রহারা মায়েদের করুণ ক্রন্দন অনুরণিত হল—এই সমস্ত পর্ব জুড়ে মহামতি ভীষ্মকে একবারও চোখের সামনে আনলেন না মহাভারতের কবি। অতিপ্রসিদ্ধ কুরুমুখ্যদের শ্রদ্ধশান্তিও হয়ে গেল। সময় এল যুধিষ্ঠিরের রাজা হবার। আত্মীয়স্বজনের বিয়োগব্যথায় ক্লিষ্টদিগ্ধ যুধিষ্ঠির সিংহাসনে বসতে চাইলেন না। তাঁকে বোঝানোর পালা চলল কতদিন ধরে। পাঁচ ভাই বোঝালেন, দ্রৌপদী বোঝালেন, কৃষ্ণ বোঝালেন, অবশেষে বোঝালেন বিশালবুদ্ধি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। যুধিষ্ঠিরের মন শেষপর্যন্ত শান্ত হল। কিন্তু মন শান্ত হলেও রাজা হবার ব্যাপারে তাঁর সংশয় আছে। প্রশ্ন আছে।

একবার তো তিনি রাজ্য পেয়েছিলেন ইন্দ্রপ্রস্থে, কিন্তু সে রাজ্য তো তিনি ধরে রাখতে পারেননি। যুধিষ্ঠিরের তাই সংশয় আছে। তিনি ভাবেন—তাঁর মনটা ত্যাগবৈরাগ্য মুনিবৃত্তি বোঝে ভাল। কিন্তু রাজা হতে গেলে যে সমস্ত গুণ লাগে, রাজোচিত কূটনীতি, ষাড়্‌গুণ্যের যে বোধ লাগে, তা বুঝি তাঁর নেই। তাঁর সদাজাগ্রত ধর্মবোধ, ন্যায়নীতিবোধের সঙ্গে রাজনীতির চাতুর্য যেন কিছুতেই মিলতে চায় না। ব্যাসকে তিনি সে কথা বলেও ফেললেন। বললেন—দেখুন, মানুষের ধর্মবোধ এবং ধর্মচর্যার সঙ্গে রাজনীতির কূটকচালিটা একেবারেই বিরুদ্ধ—ধর্মচর্য্যা চ রাজ্যঞ্চ নিত্যমেব বিরুধ্যতে। এবারে নিজের দুর্বলতার কথাটা ব্যাসের সামনে বলেই ফেললেন যুধিষ্ঠির। বললেন—মুনিবর! আপনি আমাকে রাজনীতি, রাজধর্মের তত্ত্বগুলি বিস্তারিত জানান। আমি সব শুনতে চাই। শুনতে চাই—রাজার করণীয় কর্তব্যগুলি, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ইত্যাদি চতুর্বর্ণের সামাজিক স্থিতি, শুনতে চাই আপদকালের কর্তব্য এবং সব শেষে জানতে চাই—ধর্মকে অতিক্রম না করেও কীভাবেই আরও রাজ্যজয় সম্ভব—ধর্মমালক্ষ্য পন্থানং বিজয়েয়ং কথং মহীম্।

যুধিষ্ঠির যখন এই প্রশ্ন করছেন, তখন ব্যাসের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন নারদ—যে নারদ রাজনীতিশাস্ত্রের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন সেকালে এবং লৌকিক সমস্ত বিষয়েই তাঁর জ্ঞান ছিল অসামান্য। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন শুনে ব্যাস একবার নারদের দিকে তাকিয়েও ছিলেন, যেন তিনি নারদকেই যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন সমাধান করতে বলবেন—নারদং সমভিপ্রেক্ষ্য সর্বজ্ঞানাং পুরাতনম্। কিন্তু না, নারদকে তিনি বলতে বললেন না, এবং নিজেও তিনি বললেন না কিছু। চরম পরামর্শ দিয়ে ব্যাস বললেন—রাজধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি—যা যা তুমি শিখতে চাও বললে, তা সবকিছু ভালভাবে জানতে হলে তোমাকে যেতে হবে কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মের কাছে—উপৈহি ভীষ্মং মহাবাহো বৃদ্ধং কুরুপিতামহম্।

শুধু এই সৎপরামর্শটুকু দিয়েই ব্যাস চুপ করে গেলেন না। তিনি বললেন—সুরনদী গঙ্গার গর্ভে যাঁর জন্ম, দেবতাদের যিনি সামনে থেকে দেখেছেন, দেবতাদের জন্য তৈরি বৃহস্পতিপ্রণীত রাজনীতিশাস্ত্র এবং অসুরদের জন্য তৈরি শুক্রাচার্যপ্রণীত রাজনীতিশাস্ত্র—দুটোই যিনি ভালভাবে জানেন—উশনা বেদ যচ্ছাস্ত্রং যচ্চ দেবগুরু-র্দ্বিজঃ—যিনি পরশুরামের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখেছেন এবং যিনি অধ্যাত্মতত্ত্ব, আত্মতত্ত্বও খুব ভালভাবে জানেন, তুমি সেই বৃদ্ধ পিতামহের কাছে যাও। তিনিই তোমার সমস্ত প্রশ্নরহস্য সমাধান করে দেবেন—স তে বক্ষ্যতি ধর্মজ্ঞঃ সূক্ষ্মধর্মার্থতত্ত্ববিৎ।

এখানে ভাল একটা প্রশ্ন ওঠে। প্রশ্ন ওঠে—আত্মতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব, রাজনীতিশাস্ত্র—এগুলো কি ব্যাস নিজে কম জানেন। ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় বহুবার তাঁকে উপস্থিত হতে দেখেছি এবং দেখেছি সার্থক রাজনৈতিক পরামর্শদাতার ভূমিকায়। তা তিনি কি রাজনীতি রাজধর্মের উপদেশ নিজে দিতে পারতেন না যুধিষ্ঠিরকে? তা ছাড়া নারদও তো ছিলেন। মহাভারতের মধ্যেই তাঁকে রাজনীতিশাস্ত্রের বিশাল বোদ্ধা হিসেবে কীর্তন করা হয়েছে। যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে প্রথমবার রাজপদবি লাভের পর নারদ এসেছিলেন তাঁর সভায়। সেখানে নারদের যেসব গুণবর্ণনা আছে, তাতে তাঁকে রাজনীতিশাস্ত্রের এক পরম বোদ্ধা বলে মনে করা যেতে পারে। রাজনীতিশাস্ত্রের অন্যতম মহান প্রবক্তা হিসেবে নারদের যে নিজস্বতা ছিল তা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকেও প্রমাণ করা যায়। কিন্তু সেই নারদের দিকে একবার তাকিয়েও তাঁকে ব্যাস অনুমতি করেননি যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দেবার জন্য। তিনি ভীষ্মের কাছে যেতে বললেন যুধিষ্ঠিরকে। এর একটা রহস্য আছে।

মনে রাখতে হবে—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস যখন পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে জন্মাচ্ছেন, ভীষ্মও প্রায় ঠিক সেই সময়েই জন্মাচ্ছেন শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে। ভীষ্ম পিতার সূত্রে আর ব্যাস মাতার সূত্রে পরস্পরের ভাই। ব্যাস পরাশরের তেজোজাত, তাঁর প্রধান সংস্কার ব্রাহ্মণের। ভীষ্ম শান্তনুর ঔরসজাত, তাঁর প্রধান সংস্কার ক্ষত্রিয়ের। রাজধর্মের বিষয়ে ব্রাহ্মণ হিসেবে ব্যাস এবং নারদের যে জ্ঞান আছে, তা প্রধানত তাত্ত্বিক জ্ঞান, রাজনীতি বা বিশেষত পররাষ্ট্র বিষয়ে যে ষাড্‌গুণ্যের প্রয়োগ ঘটত সেকালে, সেই প্রায়োগিক রাজনীতির সঙ্গে ব্যাস বা নারদের পরিচিতি ছিল কম। বহু বহু রাজার মন্ত্রণাসভায় তাঁরা মন্ত্রণা দিতেন বটে, কিন্তু রাজনীতির তাত্ত্বিক মন্ত্রণা এবং তার প্রয়োগে আকাশপাতাল তফাত আছে।

এবারে ভীষ্মের দিকে তাকিয়ে দেখুন। সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্রগুরু পরশুরামের কাছ থেকে তিনি অস্ত্রবিদ্যার পাঠ লাভ করেছিলেন, অন্যদিকে রাজনীতির বিষয়ে তিনি যে তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ করেছেন, তা দুভাবে। দেবতাদের শাসন চালানোর জন্য বৃহস্পতি-কথিত বার্হস্পত্য রাজনীতি তিনি শিখেছেন তাঁদেরই কাছ থেকে যাঁরা বৃহস্পতি সম্প্রদায়ের রাজনীতি জানেন। শিখেছেন বেশ যত্ন করে, টাকাপয়সা দিয়ে এবং গুরুদের তুষ্ট করে—বৃহস্পতিপুরোগাংস্তু দেবর্ষীনসকৃৎ প্রভুঃ। তোষয়িত্বোপচারেণ রাজনীতিমধীতবান্॥ কিন্তু রাজনীতির এই এক পিঠ জেনেই তিনি ক্ষান্ত হননি। দেবতাদের রাজনীতির বিরুদ্ধ কোটিতে রয়েছে অসুর রাক্ষসদের রাজনীতি। ভীষ্ম সেটাও যত্ন করে শিখেছেন এবং তা শিখেছেন অসুরগুরু শুক্রাচার্যের সম্প্রদায়ের গুণী আচার্যদের কাছ থেকে। এই পরস্পর বিরোধী রাজনীতির তত্ত্ব সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করে ভীষ্ম যে নিজেও রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রসম্বন্ধী বিভিন্ন বিষয়ে একেবারে নিজস্ব তত্ত্ব সৃষ্টি করেছিলেন, তার প্রমাণ আছে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। কৌটিল্য কৌণপদন্ত নামে যে পূর্বাচার্যের মত উল্লেখ করেছেন মাঝে মাঝে, তিনি আসলে ভীষ্ম। রাজনীতিশাস্ত্রের পরম্পরায় ভীষ্মের এই নামই প্রসিদ্ধ।

তা হলে যেটা দাঁড়াল সেটা হল—রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তাত্ত্বিকতার বিচারে ভীষ্মের জ্ঞান পরস্পরবিরোধী শুক্র-বৃহস্পতিমতের সমন্বয়ী এবং সেখানেও তাঁর নিজস্বতা আছে। ব্যাস এবং নারদ এখানে তাঁর সমকক্ষ নন। এরসঙ্গে বাড়তি যেটা ভীষ্মের মধ্যে আছে সেটা হল রাজনীতির প্রায়োগিক জ্ঞান, যা ব্যাস এবং নারদের একটুও নেই। ব্যাস নারদ কোনওদিন রাজ্যপাট চালাননি, অতএব রাজ্যশাসনের বাস্তব সমস্যাগুলি শুধুমাত্র তাত্ত্বিকের বুদ্ধিগোচর হয় না বলেই ব্যাস নারদের চেয়ে ভীষ্মের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। অন্যদিকে ভীষ্মের আরও একটা বিশেষত্ব আছে। ভীষ্ম রাজ্য চালিয়েছেন রাজা না হয়ে। তিনি যদি রাজা হতেন, তা হলে তাঁর স্বামীত্বের প্রভাবে সাধারণের সুখ দুঃখ তাঁর নজরে পড়ত না। কিন্তু তাঁকে রাজ্য চালাতে হয়েছে চিরকালই এক বিশ্বস্ত রাজকর্মচারীর মতো—সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে, যথাবিধি,

যথান্যায়ে এবং তাও শুধু প্রসিদ্ধ ভরত-কুরুবংশের মান মর্যাদা মাথায় রেখে, সেই মর্যাদার স্থায়িত্বের তাগিদে।

আর কোন কাল থেকে তিনি রাজ্যপাট সামলাচ্ছেন! সেই পিতা শান্তনু যখন বেঁচে আছেন, তখন থেকে। শান্তনুর রাজ্যে তিনি প্রথমে যুবরাজ ছিলেন এবং সেই যৌবরাজ্যের কালেই রাজকার্যের সমস্ত ভারই তাঁর হাতে ন্যস্ত ছিল। রাজা নন বলেই রাজার চরম ক্ষমতা তিনি ভোগ করছেন না, অথচ তিনি রাজ্যশাসন চালাচ্ছেন। ঠিক এই অবস্থায় ন্যায়নীতির ভাবনাটাই বড় হয়ে ওঠে বলে স্বেচ্ছাচারের কোনও অবসর থাকে না। পিতার বিবাহের পর এবং তাঁর সন্তানলাভের পর রাজ্যচালনার সেই নিষ্কাম কৌশল আরও এক নতুন মাত্রা লাভ করল। কোনও দিন বিবাহ করবেন না এবং কোনও দিন রাজা হতে চাইবেন না—এই প্রতিজ্ঞার পাশাপাশি তাঁকে রাজ্যশাসন চালিয়ে যেতে হচ্ছিল। কুমার বিচিত্রবীর্য যখন রাজাসনে বসেও বিবাহোত্তর জীবনে কামনার আধিক্যে ধর্মের শাসন ভুলে রইলেন, তখনও ভীষ্মকেই হস্তিনাপুরের শাসনভার গ্রহণ করতে হয়েছে এবং সেই রাজ্য তিনি চালিয়ে গেছেন ন্যস্তকর্ম রাজভৃত্যের মতো।

'ন্যাস', 'ন্যস্ত', 'নিক্ষেপ', 'নিক্ষিপ্ত'—এই শব্দগুলির একটা অদ্ভুত তাৎপর্য আছে সংস্কৃতে। একটা জিনিস একজনের কাছে রাখতে দেওয়া হল বিশ্বাস করে—বিশ্বাসটা এই যে, সে বস্তুটিকে সুরক্ষিত রাখবে, কিন্তু নিজের ভোগে লাগাবে না এবং প্রয়োজনমতো সে জিনিসটা প্রত্যর্পণও করবে। সম্পূর্ণ এই প্রক্রিয়াটাকে বলে ন্যাস অথবা নিক্ষেপ। তা শান্তনুর মৃত্যুর পর ভরত-কুরুবংশের পরম্পরাগত রাষ্ট্রশাসনের ভার ভীষ্মের ওপরেই ন্যস্ত হয়েছিল। তিনি রাজ্যখণ্ড সুরক্ষিত করেছেন, বিবর্ধিত করেছেন, কিন্তু ভোগ করেননি। আবার যখনই প্রয়োজন পড়েছে একবার চিত্রাঙ্গদের হাতে, একবার বীচিত্রবীর্যের হাতে, আবার তাঁরাও মারা গেলে শেষবারের মতো পাণ্ডুর হাতে কুরুরাষ্ট্রের শাসনভার তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। এর ফলে কী হয়েছে—কুরুরাষ্ট্র তিনি কখনওই রাজার অধিকারে ভোগ করেননি, একটা বিশাল সময় ধরে তিনি সে রাষ্ট্র সুরক্ষিত রেখেছেন এবং পালন করেছেন।

এই যে ভোগ না করে পালন করা—এই নির্লিপ্তির মধ্যে থেকে রাজনীতির তত্ত্ব এবং প্রয়োগ ব্যাপারটা সবচেয়ে ভাল বোঝা যায়। ভীষ্মের মতো করে সেটা আর কেউ বোঝেননি। ব্যাসও না, নারদও না এবং ঠিক সেই কারণেই রাজধর্মের উপদেশ দেবার জন্য ভীষ্মের চেয়ে উপযুক্ত মানুষ মহাভারতের কবি খুঁজে পাননি। ভীষ্মকে তিনি দেখেছেন অত্যন্ত কাছে থেকে। সত্যবতীর স্মরণমন্ত্রে যেদিন তিনি পাণ্ডু-ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম দান করার জন্য হস্তিনাপুরে এসেছিলেন, সেদিনই তিনি বুঝে গিয়েছিলেন তাঁর ঔরসজাত সন্তানদের লালনপালন তথা মানুষ করার জন্য তাঁর প্রতিনিধিস্থানীয় অপরাংশ রয়ে গেছেন হস্তিনাপুরে। এই আত্মসম্বন্ধ শুধু নয়, রাজনীতির ক্ষেত্রে ভীষ্মের সম্পূর্ণতা তিনি উপলব্ধি করেছেন পদে পদে। পাণ্ডুর রাজা হবার পর থেকে ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনের স্বার্থভাবনার প্রতিবাদী স্থানে ভীষ্মকে ব্যাস যেভাবে নির্লিপ্ত পরামর্শদাতার ভূমিকায় দেখেছেন, তাতে রাজনীতির তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রে ভীষ্মের পরম মাহাত্ম্য তিনি উপলব্ধি করেছেন বলেই যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন—যিনি কথা বললে ব্রহ্মর্ষি ঋষিরা পর্যন্ত মন দিয়ে শোনেন, ধর্মতত্ত্ব এবং রাজনীতি অর্থনীতি যিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে জানেন, তুমি তাঁর কাছে যাও, বৎস। এখনও তিনি প্রাণত্যাগ করেননি, তোমাকে উপদেশ করার পরেই তিনি প্রাণত্যাগ করবেন—তমভ্যেহি পুরা প্রাণান্ স বিমুঞ্চতি ধর্মবিৎ।

ব্যাসের কথা শুনে যুধিষ্ঠির বিমনা হয়েছিলেন। লজ্জায় নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলেছিলেন—কোন মুখে তাঁর সঙ্গে আমি কথা কইতে যাব। এক সরল মানুষকে আমরা ছল করে মেরেছি। এর পরে কী করে তাঁর কাছে এটাওটা জিজ্ঞাসা করব—উপসম্প্রষ্টুমর্হামি

তমহং কেন হেতুনা? যুধিষ্ঠিরের এই দুর্ভাবনায় কোনও উত্তর দেননি ব্যাস। কিন্তু এখানে উত্তর দিয়েছেন কৃষ্ণ। প্রায় ধমক দিয়ে তিনি বলেছেন—এখন শোক করার সময় নয়, মহারাজ! বরঞ্চ মহর্ষি ব্যাস যা বলেছেন, তাই আপনি নির্দ্বিধায় পালন করুন—যদাহ ভগবান ব্যাসস্তৎ কুরুষ্ব নৃপোত্তম। কথাটা বলেই কৃষ্ণ তাঁকে আগে হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনে বসতে বলেছেন। বলেছেন—ব্রাহ্মণরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। অপেক্ষা করছেন রাজন্যবর্গ, অপেক্ষা করছেন পৌর-জনপদবাসীরা। আপনি আগে রাজা হয়ে সিংহাসনে বসুন।

কৃষ্ণ মনে করিয়ে দিলেন যে, ব্যাস তাঁকে আগে সিংহাসনে বসতে বলেছেন, তার পরে ভীষ্মের কাছে যেতে বলেছেন রাজধর্মের উপদেশ গ্রহণ করার জন্য। কিন্তু রাজা হবার পর রাজকর্মের প্রাথমিক সমস্যাগুলি সামলাতে যুধিষ্ঠিরের বেশ কয়েকদিন চলে গেল। পাঁচ পাণ্ডব ভাই কে কোন প্রাসাদে থাকবেন তা নিয়েও কয়েকদিন গেল। যুধিষ্ঠির এবারে একটু অবসর পেয়েছেন কিন্তু ভীষ্মের কাছে যাবার কথাটা আর তিনি বলছেন না। হয়তো লজ্জায়, হয়তো আত্মধিক্কারে সেখানে যাবার কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না তিনি।

এইরকম অবসরপ্রাপ্ত একটি দিনে যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর সঙ্গে দেখা করে কৃষ্ণের ঘরে এলেন। সেখানে কুশল প্রশ্নের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রশংসায় যুধিষ্ঠির প্রায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। এই প্রশংসায় কৃষ্ণের দিক থেকে একটা সলজ্জ আত্মতৃপ্তির উদ্ভাসই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু একেবারেই আনমনা হয়ে আছেন, যুধিষ্ঠিরের কথা যে তাঁর কানে যাচ্ছে, তাও মনে হল না। তিনি কোনও উত্তরও দিচ্ছেন না—নোবাচ ভগবান্ কিঞ্চিদ্ ধ্যানমেবান্বপদ্যত—কেবলই কী যেন চিন্তা করছেন বলে মনে হল। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসাই করে ফেললেন। বললেন—কী? অদ্ভুত কিছু ভাবছ নাকি বসে বসে? এই পৃথিবীতে কি কেউ বড় অসুখে আছে যে, এত কিছু চিন্তা করছ তুমি—কিমিদং পরমাশ্চর্য্যং ধ্যায়স্যমিতবিক্রম? কেমন যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে আছ, বাক্য মন সব যেন বুদ্ধিতে সন্নিবিষ্ট করে কেমন যেন নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের মতো জ্বলছ—যথা দীপো নিবাতস্থো নিরিঙ্গো জ্বলতে পুরঃ। যুধিষ্ঠির জানতে চাইলেন কী এমন ঘটে গেল হঠাৎ, যাতে এত চিন্তান্বিত দেখাচ্ছে কৃষ্ণকে।

কোনও সন্দেহ নেই, অন্তত এই জায়গায় মহাভারতের কবির লেখনীতে কিছু অলৌকিকতা এসেছে। কৃষ্ণ বলেছেন—শরশয্যায় শয়ান ভীষ্ম ব্যগ্র হয়ে আমারই কথা ভাবছেন, আমি তাই মনে মনে তাঁর কাছেই চলে গেছি—মাং ধ্যাতি পুরুষব্যাঘ্রস্ততো মে তদ্‌গতং মনঃ। কৃষ্ণ একের পর এক ভীষ্মের গুণের কথা বলেছেন, তাঁর শৌর্যবীর্যের ঘটনাগুলি এক এক করে উল্লেখ করেছেন এবং সবশেষে ধ্রুবপদের মতো একই বাক্য উচ্চারণ করে বলেছেন—আমি মনে মনে তাঁর কাছে চলে গেছি—তমস্মি মনসা গতঃ। কৃষ্ণ এবার মহর্ষি ব্যাসের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যুধিষ্ঠিরকে। বলেছেন—তিনি হচ্ছেন সমস্ত বিদ্যার আধার, তিনি ক্রান্তদর্শী—ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান তিনি জানেন। আজকে দৈববশে ভীষ্মের শেষ কাল উপস্থিত। অন্ধকার রাত্রিতে চাঁদ না উঠলে রাত্রির যে অবস্থা হয়, ভীষ্ম না থাকলে এই পৃথিবীও তেমনই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে—ভবিষ্যতি মহী পার্থ নষ্টচন্দ্রেব শর্বরী। সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত বিদ্যা এই পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন—ভীষ্মের কাছে তোমার যাওয়া দরকার। তাঁর কাছে গিয়ে তোমার যেসব জিজ্ঞাসা আছে সেসব নিয়ে প্রশ্ন করো। তিনি বেদ বেদাঙ্গ জানেন, তর্কযুক্তি দর্শন জানেন, অর্থনীতি জানেন, রাজনীতি জানেন এবং জানেন এই সমাজকে, যে সমাজ দাঁড়িয়ে আছে চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের ওপর ভিত্তি করে। তুমি আজ সিংহাসনে বসেছ, অতএব এই নিখিল রাজধর্ম তাঁর কাছ থেকে জেনে নাও—রাজধর্মাংশ্চ নিখিলং পৃচ্ছৈনং পৃথিবীপতে। আজকে ভীষ্মের মতো সূর্যগ্রহটি যদি অস্ত যান, তা হলে সমস্ত জ্ঞানও অস্ত

যাবে।

একবার চন্দ্র এবং একবার সূর্যের সঙ্গে তুলনা করে কৃষ্ণ ভীষ্মকে স্বপ্রকাশ আলোর স্বরূপে প্রতিষ্ঠা করলেন। কৃষ্ণের মুখে ভীষ্মের কথা শুনে যুধিষ্ঠির চোখের জল রাখতে পারলেন না। হয়তো সেই দৃশ্যটি তাঁর চোখের সামনে ভেসে এল যেভাবে প্রায় নিরুদ্যোগী সৈনিকের মতো অস্ত্রত্যক্ত অবস্থায় শিখণ্ডী-অর্জুনের বাণে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন—ভীষ্ম যে কত বড় মানুষ, কত যে তাঁর প্রভাব, তা আমি জানি। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বার বার তাঁর কথা সশ্রদ্ধে উল্লেখ করেন। তা ছাড়া তুমি এমন করে বলছ, আমি কি না গিয়ে পারি? আমরা তোমাকে সামনে রেখে সবাই যাব সেই ভীষ্মের কাছে—ত্বামগ্রতঃ পুরস্কৃত্য ভীষ্মং যাস্যামহে বয়ম্। যেন কৃষ্ণকে সামনে রাখলেই ভীষ্মকে অস্ত্রাঘাতে পাতিত করার লজ্জা থেকে মুক্তি পাবেন যুধিষ্ঠির!

কৃষ্ণ সাত্যকিকে ঘোড়া যুততে বললেন রথে। মহাভারতে এরপরে এক অধ্যায় জুড়ে ভীষ্মের মুখে কৃষ্ণের স্তুতি এবং ধ্যানবর্ণনা আছে। সে বর্ণনায় কৃষ্ণ সম্পূর্ণ ভগবত্তায় প্রতিষ্ঠিত। এটাকে যাঁরা প্রক্ষেপ ভাবেন ভাবুন, কিন্তু কৃষ্ণকে পুরুষোত্তমের মর্যাদা প্রথম দিয়েছিলেন ভীষ্মই—সেই যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে প্রথম পূজার অর্ঘ্যটি কৃষ্ণকে নিবেদন করে। কাজেই ভীষ্মের মুখে এই কৃষ্ণস্তুতি আমাদের কাছে বেমানান লাগে না, কেননা কৃষ্ণের মধ্যে সেই অলোকসামান্য প্রতিভা এবং বুদ্ধি ছিল এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই ধুরন্ধর ব্যক্তিত্বকে ভীষ্মই প্রথম চিনিয়ে দিয়েছিলেন; অতএব এক্ষেত্রে ভীষ্মের মানুষ চেনবার ক্ষমতাটাও বুঝে নিতে হবে। মহাভারতে ভীষ্মের এই স্তবরাশি 'ভীষ্মস্তবরাজ' নামে চিহ্নিত হয়েছে এবং তারমধ্যে কৃষ্ণ একাত্ম হয়ে গেছেন নারায়ণ-বিষ্ণুর সঙ্গে, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা—ভীষ্মের মুখে কৃষ্ণ পরিচিত হয়েছেন এক অনন্তকর্মা মহাশক্তিমান সর্বব্যাপ্ত পুরুষ হিসেবে, যে পুরুষের প্রণামমন্ত্রটি এখনও চলে আসছে সমস্ত ভারতবাসীর শত শত মুখে—এবং সেটা ভীষ্মই উচ্চারণ করেছিলেন—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

যুধিষ্ঠির এবং তাঁর আর চার ভাইকে নিয়ে কৃষ্ণ যখন ভীষ্মের কাছে চললেন, তখন যেতে যেতে আবারও সেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রেই এসে উপস্থিত হতে হল। এখানে সেখানে মৃতের অস্থিকঙ্কাল এখনও ছড়িয়ে আছে। ছড়িয়ে আছে হাতি ঘোড়ার বড় বড় হাড়গোড়, মানুষের মাথার খুলি ইতস্তত। মহাভারতের কবি উপমা দিয়েছেন—যেন মদমত্ত যমরাজ খুব করে মদ্যপান করে এখানে ওখানে ছড়িয়ে রেখে গেছেন মৃত্যুরস পান করার পানপাত্রগুলি এবং সঙ্গে খাবারের উচ্ছিষ্ট মাংসের হাড়—আপানভূমিং কালস্য তথা ভুক্তোজ্ঝিতামিব। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধভূমি পেরিয়ে পাণ্ডবরা কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে ভীষ্মের কাছে পৌঁছোলেন ওঘবতী নদীর তীরে। যুদ্ধস্থল থেকে তাঁকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আগেই। আমরা আগেই বলেছি যে, ভীষ্মের ইচ্ছামতো তাঁর শয়নভূমির চারদিকে পরিখা খনন করে দেওয়া হয়েছিল এবং এখন দেখছি ভীষ্ম যেখানে শরশয়নে শুয়ে আছেন, সে জায়গাটা ওঘবতী নদীর তীরে—দেশে পরমধর্মিষ্ঠে নদীমোঘবতীমনু।

ওঘবতী নদীকে এখন চিনতে পারবেন না। পণ্ডিতজনেরা এই নদীটিকে সরস্বতী নদীর নামান্তর বলে গবেষণা করেছেন এবং মহাভারতের শল্যপর্বে সে প্রমাণ আছেও। সরস্বতীর জল রাজস্থানের মরুভূমিতে হারিয়ে গেছে। শিবালিক পর্বতমালার বহির্ভাগ শিরমুর অঞ্চল থেকে এই নদী বেরিয়েছে বলে বরফগলা জলে এই নদীর প্রবাহ চলে না। চলে বৃষ্টির জলে। ফলে এই আছে এই নেই করতে করতে নদীটাই গেছে হারিয়ে। কিন্তু ঋগ্‌বেদের যুগে

সরস্বতীর প্রবাহ বর্তমান ছিল এবং তা নাকি সমুদ্রেও পড়েছিল। হয়তো বা মহাভারতের যুগেও সরস্বতীর প্রবাহ লুপ্ত হয়নি। অন্যেরা বলেন সরস্বতীর শাখানদী ওঘবতী, এমনকী ওঘবতীকে সরস্বতীই বলা চলে। সে যাই হোক, শাখাই হোক, আর পুরোপুরি নদীই হোক, ঘটনা হল, পুণ্যতমা নদীর মধ্যে সরস্বতী অথবা ওঘবতী হল পুণ্যতমা। হয়তো বা ভীষ্মের ইচ্ছামতেই আর্যদের বহুকীর্তিত এই পুণ্যনদীর তীরে তাঁর শেষশয্যা রচিত হয়েছিল।

ভীষ্ম যেখানে শুয়ে ছিলেন, সেখানে আজ আর কোনও নির্জনতা নেই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মুনিঋষিরা ভীষ্মের পাশে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এমনকী ব্যাস যে ব্যাস, যিনি যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে বসবার আগে ভীষ্মের কাছে যাবার উপদেশ দিয়েছিলেন, তিনিও আর বেশি দেরি করেননি। যুধিষ্ঠিরের অভিষেককালেও তাঁকে আমরা দেখতে পাইনি। তিনি ভীষ্মের শরশয্যার পাশে এসে উপস্থিত হয়েছেন অনেক আগেই। তিনি ভীষ্মের ভাই। হস্তিনাপুরে তিনটি পুত্রের জন্মই তিনি দিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন, কেননা ভীষ্মের মতো সংসারে থাকা সন্ন্যাসী নিষ্কামভাবে তাঁর পুত্রগুলিকে লালন পালন করবেন শুধু ইতিকর্তব্যের তাড়নায়। এমন করে যিনি কর্মযোগ পালন করতে পারেন, তাঁর শেষসময়েই তো ব্যাসের মতো ক্রান্তদর্শী পুরুষ পাশে এসে বসেন শিক্ষার তাড়নায়। পাশে এসে বসেন পুরুষোত্তম কৃষ্ণ একান্ত শুশ্রূষুর ভূমিকায়। উন্মুখ হন যুধিষ্ঠির ধর্মরাজ রাজনীতি শিক্ষার জন্য।

ব্যাসের সঙ্গে আরও যেসব মুনি-ঋষিরা সঙ্গত হয়েছিলেন ওঘবতীর তীরে, তাঁদের অনেকের মধ্যে ছিলেন নারদ, জৈমিনি, পৈল, দেবল, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, হারীত, অত্রি, শুক্র, বৃহস্পতি, গৌতম, লোমশ, মার্কণ্ডেয়, কপিল এবং আরও শত শত মুনি-ঋষি। জিজ্ঞাসা হবে —এই যে সব নাম শুনছি, এঁরা কি অমর নাকি। সব যুগেই কি এঁরা বেঁচে থাকেন? এর উত্তর খুব সোজা। পূর্বোক্ত এবং আমার অনুক্ত নামগুলির মধ্যে অনেক নামই আছে, যেসব ঋষির নাম শুধু বলার জন্যই বলা হয়েছে, কেননা তাতে ভীষ্মের গৌরব বাড়ে। আর মহাকাব্যের বিশাল পটভূমির কথা মনে রাখলে এটাই স্বাভাবিক যে, যেখানে বিশজন এসেছেন, সেখানে একশোজনের বর্ণনা করতে হবে। কিন্তু এই সমস্ত অস্বাভাবিকতা এবং সংখ্যাভ্রান্তি চলে যাবে, যদি বোঝেন যে, এইসব মহান ঋষির নাম শ্রবণমাত্রেই তাঁদের ব্যক্তিগত উপস্থিতি কল্পনীয় নয়। মনে রাখা দরকার—এইসব ঋষিরা অনেকেই বিশিষ্ট বিদ্যাসম্প্রদায়ের প্রবর্তক। কেউ ধর্মে, কেউ দর্শনে, কেউ সমাজ এবং রাষ্ট্রের আইনসংক্রান্ত ব্যাপারে, কেউ বা রাজনীতিশাস্ত্রে—এই সব মুনিঋষিরা এক-একজন দিকপাল। জীবন, সমাজ এবং রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য এঁরা সব বিশিষ্ট গ্রন্থ রচনা করেই ক্ষান্ত হননি, নিজেদের ভাবনা সজীব রাখবার জন্য তাঁরা বিশিষ্ট সম্প্রদায়ও প্রবর্তন করেছিলেন। কাজেই যেসব ঋষি-মুনিরা ভীষ্মের শেষশয্যার পাশে উপস্থিত হয়েছেন বলে শব্দত উচ্চারিত হয়েছেন, আসলে তাঁরা সকলেই ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত ছিলেন না। উপস্থিত ছিলেন তাঁদের বিশিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত এবং পরম্পরাগত শিষ্য-প্রশিষ্যরা এবং তাঁদের উপস্থিতিই কীর্তিত হয়েছে তাঁদের সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতা গুরুর নামে। অর্থাৎ জৈমিনি, কপিল, বৃহস্পতি—এঁরা কেউই নামমাত্র নন, এঁরা প্রত্যেকে এক-একটা 'ইনস্টিটিউশন'।

দূর থেকে ভীষ্মকে দেখেই কৃষ্ণ, সাত্যকি এবং পাণ্ডবরা সবাই নিজেদের বাহন থেকে নামলেন। নিজেদের চঞ্চল মন যথাসম্ভব স্থির সংযত করলেন স্থিতধী মুনিদের দেখে— অবস্কন্দ্যাথ বাহেভ্যঃ সংযম সচলং মনঃ। ব্যাস ইত্যাদি মুনি-ঋষিদের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে তাঁরা সকলে ভীষ্মকে ঘিরে বসলেন চারধারে। কৃষ্ণ ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন— আপনার শরীরে যত কষ্ট তাতে সমস্ত জ্ঞান এবং বিদ্যা এখনও আপনার হৃদয়ে সম্পূর্ণ প্রতিভাত হয় তো? আপনার বুদ্ধির কোনও বৈকল্য ঘটেনি তো—কচ্চিজ্ জ্ঞানানি সর্বানি প্রসন্নানি যথা পুরা। শরসন্তপ্ত হলেও ভীষ্মের জ্ঞানবুদ্ধি যে আগের মতোই উজ্জ্বল আছে,

সেটা কৃষ্ণ জানতেনই। কারণ বাহ্য শরীরের কষ্ট কখনও স্থিতধী ব্যক্তির আত্মতেজ নাশ করে না। কৃষ্ণ কিন্তু তবুও প্রচুর সমব্যথা প্রদর্শন করে বললেন—এই শরাঘাতের ফলে নিশ্চয়ই বড় কষ্ট হচ্ছে আপনার শরীরে। আর শরীরের কষ্ট এমনই এক বাস্তব যা মনের কষ্টের চেয়ে বেগ দেয় বেশি—মানসাদপি দুঃখাদ্ধি শরীরং বলবত্তরম্।

সাধারণ এই কথাগুলি বলার পরেই ভীষ্মের সমস্ত জীবনের শৌর্য, বীর্য, ধৈর্য তথা তাঁর অধিগত বিদ্যার প্রশংসা করে কৃষ্ণ বললেন—পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির আপনার সামনে উপস্থিত হয়েছেন শুশ্রূষু হয়ে। যুদ্ধের ফলাফলে তাঁর মন শোকাচ্ছন্ন। আপনি উপযুক্ত উপদেশের মাধ্যমে তাঁর শোক অপনোদন করুন। পণ্ডিতেরা যাকে একত্রে চতুর্বিদ্যা বলেন, সেই ত্রয়ী (তিনটি বেদের জ্ঞান), আন্বীক্ষিকী, (যুক্তি, তর্ক, দর্শন), বার্তা (অর্থনীতি) এবং দণ্ডনীতি (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) সবই আপনার জানা আছে। জানা আছে সামাজিক নিয়মনীতি অর্থাৎ চতুর্বর্ণের ধর্মাধর্ম। সাংখ্যযোগের মতো দর্শন যেমন আপনার জানা আছে, তেমনই জানা আছে এই সম্পূর্ণ দেশের ভৌগোলিক, কৌলিক এবং জাতিগত ব্যবহার—দেশ-জাতি-কুলানাঞ্চ জানীষে ধর্মলক্ষণম্। সবচেয়ে বড় কথা, যে-সমস্ত বিষয়েই মানুষের সংশয় সন্দেহ দেখা দেয়, সেখানেই আপনার কথাই হল সংশয়চ্ছেদী প্রমাণ। অতএব এই শোকাচ্ছন্ন জ্যেষ্ঠ-পাণ্ডবের সমস্ত দুঃখ-মোহ আপনিই একমাত্র দূর করে দিতে পারেন।

ভীষ্মকে অনেকটাই মানসিকভাবে প্রস্তুত করে কৃষ্ণ সেদিন পাণ্ডব ভাইদের নিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন। পরের দিন আবারও সবাই এসে ভীষ্মের শেষশয্যার পাশে উপস্থিত হলেন বটে, কিন্তু যুধিষ্ঠির কিছুতেই ভীষ্মকে প্রশ্ন করতে সাহস পেলেন না। তিনি শুধুই কৃষ্ণকে ঠ্যালাঠেলি করতে আরম্ভ করলেন প্রশ্ন করবার জন্য। কৃষ্ণ আবারও সেই পুরনো কথা তুলে একটু অলৌকিকতার সাহায্যে বলতে আরম্ভ করলেন—ভীষ্ম! আপনি আপনার জ্ঞানরাশি উজাড় করে দিয়ে আজ থেকে যত উপদেশ করবেন, সব এই পৃথিবীতে থাকবে বেদপ্রবাদের মতো—সেইজন্যই অলৌকিকভাবে আমি আপনার শারীরিক কষ্ট দূর করে দিয়েছি। দিয়েছি সেই দিব্যদৃষ্টি। আপনি সবিস্তারে আপনার সমস্ত বক্তব্য বলুন।

ঈশ্বরপ্রসাদাৎ ভীষ্ম এখন দেহেমনে বেশ প্রফুল্ল বোধ করছেন। তবে একটু অসহজও বোধ করছেন—বার বার কৃষ্ণই তাঁকে বলতে বলছেন বলে। ভীষ্ম জানেন—কৃষ্ণের জ্ঞানের অভাব নেই। রাজনীতি, ধর্মনীতি এবং প্রখর বাস্তববোধ তাঁর এতই বেশি যে, তিনি অতি অল্পবয়সেই বিশাল ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। ভীষ্ম বলেওছেন সে কথা। বলেছেন—তোমার সামনে আমি রাজনীতি ধর্মনীতি কী বলব, কৃষ্ণ। আমি যা বলব, সবই তোমার জানা আছে—কিং চাহমভিধাস্যামি বাক্যং তে তব সন্নিধৌ। ঠিক এই কারণেই কৃষ্ণের প্রশ্ন করাটা কিছুতেই পছন্দ করছিলেন না ভীষ্ম। তিনি এবার বলেই ফেললেন—তুমি যাঁর কথা বার বার বলছ, সেই পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করুন আমাকে।

মহাপণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করার জন্যও একটা এলেম দরকার হয়। আজকাল সভাসমিতি, বিদ্বৎসভা, সেমিনার, কনফারেন্সে বক্তার বক্তব্যের পরে একটা ‘কোয়েশ্চেন-আওয়ার’ থাকে। সেসব জায়গায় দেখেছি—পণ্ডিত বিদ্বান তাঁদের সুচিন্তিত বক্তব্য পেশ করার পর শ্রোতাদের পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে এমন বোকা বোকা প্রশ্ন করা হয়, যে বক্তার মাহাত্ম্যই যেন তাতে নষ্ট হয়ে যায়। এইসব শ্রোতাদের মধ্যেও অনেক পণ্ডিত সজ্জন, বিদ্বান বুদ্ধিমান থাকেন। কিন্তু অনেক সময়েই তাঁরা—শুধু প্রশ্ন করে নিজেকে পরম আলোকিত বোধ করেন বলেই নাকি—এমন সব প্রশ্ন করেন, যাতে বক্তার অস্বস্তি অনেক সময় চরমে পৌঁছোয়। এঁরা বোঝেন না যে, তাঁদের প্রশ্ন কতটা অপ্রাসঙ্গিক, কতটা খাপছাড়া এবং কতটা তাঁদের নিজেদেরই ফাঁকি ধরিয়ে দেয়। তবুও এঁরা প্রশ্ন করেন। বস্তুত কারা প্রশ্ন করবেন এবং কী প্রশ্ন করবেন—সেটা ঠিক করে দেবার জন্যও একজন অধিকারী-বোধ-সম্পন্ন ‘মডারেটর’

থাকা দরকার।

ভীষ্ম সেই অধিকারের কথাটাই তুলেছেন এখানে। তিনি বলেছেন—যার মধ্যে ধৈর্য, সংযম, ব্রহ্মচর্য, ক্ষমা, ধর্ম সবই একত্র প্রতিষ্ঠিত, যার মানসিক তেজ অন্যকে প্রদীপ্ত করে, সেই যুধিষ্ঠির আমাকে প্রশ্ন করছে না কেন? যে স্বেচ্ছাচারের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে কোনও কাজ করে না, ভয়ে বা স্বার্থে কারও কাছে মাথা নোয়ায় না, সেই যুধিষ্ঠির আমাকে সোজাসুজি প্রশ্ন করুক—স মাং পৃচ্ছতু পাণ্ডবঃ। ভীষ্ম আরও বললেন—যিনি চিরকাল সত্যে প্রতিষ্ঠিত, যিনি চিরকাল ক্ষমার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত, যিনি চিরকাল জ্ঞানের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত, সেই পাণ্ডব যুধিষ্ঠির আমাকে প্রশ্ন করুক—স মাং পৃচ্ছতু পাণ্ডবঃ।

ভীষ্ম এইভাবে বার বার যুধিষ্ঠিরের শত গুণের উল্লেখ করে বার বারই ওই এক কথা বললেন—যুধিষ্ঠির আমাকে প্রশ্ন করুক। ঠিক এই মুহূর্তে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের হয়ে বললেন—যুধিষ্ঠির আপনার সামনে আসতেই পারছেন না লজ্জায়—লজ্জয়া পরয়োপেতো ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ। এমন একটা জ্ঞাতিক্ষয়ী যুদ্ধের নিমিত্ত হওয়ার ফলে আপনি তাঁকে যদি নিন্দা তিরস্কার করেন, সেই ভয়ে তিনি আপনার সামনে আসতেই পারছেন না। তাঁর প্রতিপক্ষে যত পূজ্য এবং মাননীয় ব্যক্তি ছিলেন, তাঁদেরও শরাঘাতে দমিত করতে হয়েছে বলে লজ্জায় যুধিষ্ঠির আপনার সামনে আসতে পারছেন না।

ভীষ্ম প্রতিক্রিয়া জানালেন সঙ্গে সঙ্গে। বললেন—এটা আবার কেমন কথা হল! ব্রাহ্মণের ধর্ম জানি—দান, অধ্যয়ন আর তপস্যা, তেমনই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম হল যুদ্ধে জীবনপাত করা। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম অন্যায় রোধ করা। পিতাই হোক, আর পিতামহ, ভাই-ই হোক অথবা আত্মীয়, এমনকী গুরুও যদি হন—কিন্তু কেউ যদি এঁরা অন্যায়পক্ষে থেকে মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেন, যুদ্ধে তাঁকে হত্যা করাটাই ধর্ম। যাঁরা লোভের বশবর্তী হয়ে, সদাচার ত্যাগ করে ধর্মের সেতু লঙঘন করেন, তাঁরা গুরুস্থানীয় হলেও ক্ষত্রিয় ব্যক্তি তাঁদের মেরেই ধর্মলাভ করবেন—নিহন্তি যস্তং সমরে ক্ষত্রিয়য়া বৈ স ধর্মবিৎ।

এতক্ষণ ভীষ্ম যেভাবে বললেন, তাতে বোঝা যায় যে, দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করার মধ্যে যে কিছু অন্যায় ছিল, সে বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। কিন্তু সেই সচেতনতা সত্ত্বেও তিনি ভরতবংশের সিংহাসনের প্রতি অবিশ্বস্ত হতে চাননি। বরঞ্চ যুদ্ধে প্রাণ দিয়ে সেই বিশ্বস্ততার মূল্য চুকিয়েছেন। পাণ্ডবদের হাতে যুদ্ধে অবদমিত হওয়ায় তাই কোনও দুঃখ নেই তাঁর, কোনও রাগও নেই যুধিষ্ঠির বা অর্জুনের ওপর। ভীষ্ম খুশি মনে যুধিষ্ঠিরকে বললেন—তুমি প্রশ্ন করো নিঃসংকোচে, একটুও ভয় পেয়ো না—মাং পৃচ্ছ তাত বিশ্রব্ধং মা ভৈস্ত্বং কুরুসত্তম।

যুধিষ্ঠির প্রশ্ন আরম্ভ করলেন। ভীষ্মও উত্তর দিতে আরম্ভ করলেন একে একে। আমি এই প্রশ্নোত্তরপর্বের মধ্যে যাচ্ছি না। কেননা মহাভারতের শান্তিপর্বের এই অংশে ভীষ্মের সমসাময়িক এবং তাঁর অপেক্ষাকৃত প্রাচীন রাজনীতির বিষয় এমন কিছু নেই, যা ভীষ্ম জানাননি। তৎকালীন দিনের সামাজিক গঠন থেকে আরম্ভ করে সেকালের বর্ণধর্ম, আশ্রম ধর্ম, রাজার ইতিকর্তব্য, বিভিন্ন প্রকারের রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাষ্ট্রসংরক্ষণ, অমাত্য, কোশ, সৈন্যবল, পররাষ্ট্রনীতি এবং সবার ওপরে জনকল্যাণের কথা এমন সূক্ষ্মতা এবং নিপুণতার সঙ্গে ভীষ্ম পরিবেশন করেছেন যে তা নিয়ে পৃথক এবং বিশদ আলোচনার প্রয়োজন। যদি সংক্ষিপ্তভাবেও সে প্রসঙ্গ এখানে আলোচনা করি, তা হলে ভীষ্মের ওপরেও সুবিচার করা হবে না, রাজনীতির সেই বিশাল ভাবনার ব্যাপারও সেখানে তুচ্ছীকৃত এবং লঘুতাপ্রাপ্ত হবে।

রাজনীতি এবং সমাজনীতির সমস্ত রহস্য তত্ত্বগতভাবে যুধিষ্ঠিরের কাছে বিবৃত করার পর ভীষ্ম বুঝেছেন যে, রাজনীতির তত্ত্ব এক বস্তু এবং প্রয়োগ অন্যতর এক বিজ্ঞান এবং এই

প্রায়োগিক বিজ্ঞান যুধিষ্ঠিরের মতো ধর্মরাজ মানুষটির পক্ষে অবধারণ করা সহজ নয়, হয়তো বা সম্ভবও নয়। পরিশেষে তাই তিনি বললেন—দেখো! আর বুঝি আমার সময় নেই। শরাঘাতে কষ্টক্লিষ্ট এই দেহের মুক্তি ঘটবে অচিরেই, আমার দিন শেষ হয়ে আসছে—দেহন্যাসো নাতিচিরান্মতো মে/ ন চাতি তূর্ণং সবিতাদ্য যাতি। আমি তোমাকে ব্রাহ্মণ-শূদ্র নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের করণীয় কর্তব্যের কথা বলেছি। আর যা কিছু জানবার, তা তুমি এই কৃষ্ণের কাছ থেকে শিখবে—শেষং কৃষ্ণাদুপশিক্ষস্ব পার্থ।

সেই যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের আগে থেকে কৃষ্ণের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ দেখে আসছেন ভীষ্ম। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বে এবং যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থাতেও কৃষ্ণের রাজনৈতিক কৌশল দেখে তিনি বুঝেছেন যে, রাজনীতির প্রায়োগিক ক্ষেত্রে কৃষ্ণের চেয়ে বেশি কুশলী আর দ্বিতীয় কেউ নেই। এই সত্যটা উপলব্ধি করেই এই মরণকালে তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন কৃষ্ণের প্রকৃত তত্ত্ব আমি জানি, তাঁর শক্তিও আমার অজানা নয়। সত্যি কথা বলতে কী, কৃষ্ণকে সাধারণ কোনও মাপকাঠি দিয়ে মাপাই যায় না, মাপাই যায় না তাঁর বুদ্ধিকে। অতএব যখনই কর্তব্য বিষয়ে তোমার দ্বিধা বা সংশয় উপস্থিত হবে, তখনই কৃষ্ণ তোমাকে পথনির্দেশ করবেন—অমেয়াত্মা কেশবঃ কৌরবেন্দ্র/ সো'য়ং ধর্মং বক্ষ্যতি সংশয়েষু।

এতক্ষণ, এতদিন ধরে এই বিশাল কথোপকথন অথবা 'গ্রেট ডায়ালগ' শেষ হবার পর ভীষ্ম যখন আর কথা বললেন না, তখন সেই ওঘবতী নদীর তীরে এক ভয়ংকর স্তব্ধতা নেমে এল। সমস্ত রাজা-রাজড়ারা, যাঁরা ভীষ্ম-যুধিষ্ঠিরের আলোচনা শুনতে এসেছিলেন, তাঁরা নিশ্চুপ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত রাজা এবং ঋষিদের সমাবেশটাকে যেন পটে আঁকা ছবির মতো দেখতে মনে হল। এই নিস্তব্ধতার অবসরেই দ্বৈপায়ন ব্যাস বললেন—আমার মনে হয়—এতক্ষণ আপনার কথা শুনে যুধিষ্ঠির অনেকটাই প্রকৃতিস্থ হয়েছেন। হস্তিনাপুরের সিংহাসনে বসে রাজ্যপাটের নতুন ভার বুঝে নেওয়াটাও তাঁর পক্ষে এখন ভীষণ জরুরি। অতএব এখন আপনি অনুমতি করুন—ভাইদের নিয়ে, কৃষ্ণকে নিয়ে তিনি এখন রাজ্যে ফিরে যান।

ভীষ্ম সুমধুর আশ্বাসে যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে গিয়ে প্রজাপালনের বিষয়ে তৎপর হতে বললেন। তাঁর সমস্ত রাজনীতি-উপদেশের শেষ তাৎপর্যও তো তাই—রঞ্জয়স্ব প্রজাঃ সর্বাঃ প্রকৃতীঃ পরিসান্ত্বয়। আর এই প্রজাপালন এবং সপ্তাঙ্গ রাজ্যের সুষ্ঠু পরিচালনার ক্ষেত্রে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন—ভরত কুরুবংশের মূল পুরুষ যযাতির কথা, যিনি প্রথম হস্তিনাপুরকে ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রভূমিতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভীষ্ম নিজে রাজা হননি, কিন্তু হননি বলেই হয়তো নেতিবাচক দিক থেকে হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসন সম্বন্ধে অন্য সতর্কতা, অন্য এক দুর্ভাবনা তাঁর হৃদয়ে কাজ করত। মহারাজ যযাতি তাঁর অন্যতমা প্রিয়তমা শর্মিষ্ঠার গর্ভজাত সন্তান পুরুর মাধ্যমে যে বংশটিকে মূল বংশ বলে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই যযাতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে দিলেন ভীষ্ম।

সকলকে মৌখিকভাবে বিদায় জানানোর পর ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বললেন—আমার দিন শেষ হয়ে আসছে। সূর্য যখন আবারও উত্তরায়ণে ফিরে আসবেন, সেই সময়ে আমার মৃত্যুকালে আরও একবার তুমি এসো এইখানে—আগন্তব্যঞ্চ ভবতা সময়ে মম পার্থিব। যুধিষ্ঠির সবিনয়ে স্বীকার করলেন ভীষ্মের এই অনুরোধ এবং রাজ্যে ফিরে গিয়ে রাজ্যশাসনের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করেই ঠিক পঞ্চাশ দিন পর তিনি সেই ওঘবতী নদীর তীরে ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিলেন। দক্ষিণায়ণের গতিপথ শেষ করে সূর্য তখন উত্তরায়ণে ফিরে এসেছেন। যুধিষ্ঠির ভীষ্মের শেষ সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় আয়োজন সঙ্গে নিয়ে যেতে

চাইলেন। কী নিষ্কাম উদাসীন এই মৃত্যু। একজন ধ্রুবমৃত্যুর দিনক্ষণের জন্য নিস্পৃহভাবে অপেক্ষা করছেন, আর একজন তাঁকে তরী থেকে তীরে পৌঁছে দেবার জন্য, নতুন আলোয় নতুন সিন্ধুপারে পৌঁছে দেবার জন্য সাংস্কারিক আয়োজন নিয়ে চলেছেন। মৃত্যুর উত্তরকালে শবদেহে ঘৃত মাখিয়ে দেবার জন্য ঘি, গলায় পরিয়ে দেবার মালা, নানাবিধ গন্ধ, নতুন ক্ষৌমবসন, অগুরুচন্দন আর তখনকার দিনের সবচেয়ে দামি 'এসেন্স' 'কালীয়ক' সুরভির একখানি ভাণ্ড নিয়ে যুধিষ্ঠির চললেন ওঘবতীর তীরে।

তখনকার দিনের অদ্ভুত একটি নিয়মের পরিচয় পাই এখানে। মৃতের শেষ সংস্কারের জন্য যেমন মালাচন্দন, বসন নিয়ে যাওয়া হত, তেমনই বয়ে নিয়ে যেতে হত আগুন। সেকালের দিনে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বাড়িতে প্রতিদিন অগ্নিহোত্র করাটা রীতিসম্মত ছিল এবং বিবাহও হত যজ্ঞের আগুন সাক্ষী করে। মানুষ যখন মারা যেত, তখন ঘরের মধ্যে জিইয়ে রাখা এই সব আগুন নিয়ে গিয়েই মৃত ব্যক্তির শেষ সংস্কার করা হত। এখানে আমরা যুধিষ্ঠিরকে দেখছি—তিনি ভীষ্মের শেষসংস্কারের জন্য অনেক সাজসরঞ্জাম নিয়ে চলেছেন বটে, কিন্তু সবার আগে চলেছে কতগুলি পৃথকসঞ্চিত আগুন, যা হয়তো কোনও বিশেষ আধারে স্থাপন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হস্তিনাপুর থেকে। যুধিষ্ঠির তার ভাইবন্ধু, আত্মীয়পরিবার, ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী এবং কুন্তী সকলকে নিয়ে ভীষ্মের শেষসংস্কারক সেই অগ্নিপাত্রগুলির অনুসরণ করে চলেছেন—স্তূয়মানো মহাতেজা ভীষ্মস্যাগ্নীননুব্রজন্।

মহাভারতের এই শ্লোকটি দেখে টীকাকার নীলকণ্ঠ ভীষণ বিপদে পড়েছেন। যেহেতু সাধারণত মৃত ব্যক্তির শবসংস্কারের জন্য বৈবাহিক অগ্নিই নিয়ে যাওয়া হত, অতএব নীলকণ্ঠের মতো পণ্ডিত টীকাকারও অতি সহজেই লিখে ফেললেন—'ভীষ্মের অগ্নি কথাটা থেকে বোঝা যায় যে, তা হলে তাঁরও পত্নী ছিল। পাণিনির ব্যাকরণসূত্র অনুযায়ী যজ্ঞাগ্নিসংযোগেই স্ত্রীকে পত্নী নামে ডাকা যায়—পত্যুর্ন যজ্ঞসংযোগে। অর্থাৎ পতি শব্দের মধ্যে 'ন' আগম হয়ে পত্নীশব্দ নিষ্পন্ন হবে। এই ধারণা থেকে নীলকণ্ঠ সপাটে লিখে ফেললেন—তা হলে তাঁরও পত্নী ছিল—ভীষ্মস্যাগ্নীনিতি, তেন তস্যাপি পত্নী আসীৎ। কথাটা লিখেই নীলকণ্ঠ বুঝেছেন যে, এখানে একটু সন্দেহ জিইয়ে রাখা উচিত। অতএব বিকল্প দিয়ে বললেন—অবশ্য এটা শেষসংস্কারের অগ্নিও হতে পারে—যদ্বা সংস্কারকানগ্নীন্।

আমরা বলি—বিকল্পের কথা যাই বলুন, তাতে নীলকণ্ঠের ভুল বোঝাটা কিছু কমেনি। তাঁর দুটি কথাই ভুল এবং পণ্ডিত টীকাকারের দায়িত্ব এখানে তিনি পালন করেননি। প্রথম কথাটা তো রীতিমতো অন্যায়। তাঁর গোপনেও কোনও পত্নী ছিল না এবং থাকলে কুমার দেবব্রত ভীষ্মে পরিণত হতেন না। সাধারণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মরণের সময় বৈবাহিক বয়ে নিয়ে যাওয়া হত বলেই, এখানেও তাই হচ্ছে, এটা ভাবা ভুল। আবার সাধারণ অন্তিম সংস্কারের অগ্নি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এটা ভাবাও এখানে ভুল। নীলকণ্ঠের টীকা দেখে অবাক হয়ে আমার প্রশ্নটা করেছিলাম মহামতি অনন্তলাল ঠাকুরমশায়কে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে মহাভারতের মৌষল পর্বে মনোনিবেশ করতে বললেন।

সেখানে দেখা যাচ্ছে—কৃষ্ণপিতা বসুদেব দেহ রেখেছেন এবং তাঁর শবযাত্রায় প্রথমে যাঁরা চলেছেন তাঁরা হলেন বসুদেবের যজ্ঞকারী যাজক ব্রাহ্মণেরা। বসুদেব কোনও সময় অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন, যাজকরা সেই আশ্বমেধিক ছত্রখানি এবং সেই যজ্ঞের অনির্বাণ অগ্নি বসুদেবের শবদেহের সামনে নিয়ে চলেছেন—তস্যাশ্বমেধিকং ছত্রং দীপ্যমানাশ্চ পাবকাঃ। এখানেও 'পাবক' শব্দে বহুবচন আছে। তার মানে আশ্বমেধিক যজ্ঞাগ্নির সঙ্গে হয়তো বিবাহিত বসুদেবের বৈবাহিক অগ্নিও আছে। আবার মহারাজ পাণ্ডুর অন্তিম সংস্কারের সময়েও লক্ষ করে দেখবেন যে, সেখানেও পাণ্ডুকৃত অশ্বমেধ যজ্ঞের অগ্নি আহরণ করে নিয়ে এসেছেন মুনিবর কাশ্যপ—অশ্বমেধাগ্নিমাহৃতা যথান্যায়ং সমন্ততঃ। ভীষ্মের ক্ষেত্রেও

যেটা বুঝতে হবে, সেটা হল—বৈবাহিক অগ্নি নয়, তিনি তাঁর জীবৎকালে যেসব বিরাট যজ্ঞ করেছিলেন, সেইসব যজ্ঞাগ্নিই এবং তারমধ্যে হয়তো অশ্বমেধ যজ্ঞের অগ্নিও আছে—সেই অগ্নিগুলিই যুধিষ্ঠির নিয়ে চলেছেন যাজকদের পিছন পিছন—অনুব্রজন্।

হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে চিরসঞ্চিত এই অগ্নি যে ভীষ্মের 'সেন্টিমেন্টে'র সঙ্গে জড়িত ছিল, সেটা আমরা যুধিষ্ঠিরের বক্তব্য থেকে বুঝতে পারি। যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্রে এলেন, কাছেই ওঘবতী নদীর তীরে শরশয়ানে শুয়ে আছেন ভীষ্ম। যুধিষ্ঠির এসেই বললেন—আমি এসেছি, পিতামহ। আপনি যে সময়ে আসতে বলেছিলেন সেই সময়েই এসেছি এবং সঙ্গে নিয়ে এসেছি আপনার উপাস্য যজ্ঞাগ্নি—প্রাপ্তো'স্মি সময়ে রাজন্ অগ্নীন্ আদায় তে বিভো—আমার সঙ্গে আছেন হস্তিনাপুরের আচার্য, ব্রাহ্মণ এবং ঋত্বিকেরা।

ভীষ্ম খুশি হলেন। দেখলেন—হস্তিনাপুরের সকলেই এসে উপস্থিত হয়েছেন তাঁর প্রয়াণকালে। এসেছেন ব্রাহ্মণ ঋষি রাজন্যবর্গ। এসেছেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এবং বাসুদেব কৃষ্ণ। যুধিষ্ঠিরের দুই হাত নিজের হাতে নিয়ে ভীষ্ম বললেন—আজ আটান্ন দিন ধরে আমি এই ক্ষুরধার শরশয়নে শুয়ে আছি—অষ্টপঞ্চাশতং রাত্রঃ শয়নস্যাদ্য মে গতাঃ। এখন মাঘ মাস, আমার শেষসময় উপস্থিত, বৎস!

যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলেই ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রের দিকে তাকালেন। নিশ্চয় মনে পড়ল জননী সত্যবতীর কথা। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেই কুরুবংশের এই জাতকটির জন্ম-সন্দর্ভে ভীষ্মকে যোগ দিতে হয়েছিল। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে তিনিই হয়তো এই ছেলেটির পিতা হতেন। কিন্তু পিতা না হলেও পিতার যত্নেই তিনি ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুকে মানুষ করেছিলেন। তারপর কী থেকে কী হয়ে গেল! পাণ্ডুর জীবনযন্ত্রণা তাঁকে দেখতে হয়েছে এবং তাঁর মৃত্যুর পর ধৃতরাষ্ট্রের লুব্ধ রাজ্য পরিচালনার সময়ে তাঁকে মন্ত্রিত্বও করতে হয়েছে। শত উপদেশেও তিনি পুত্রকল্প ধৃতরাষ্ট্রকে সুপথে আনতে পারেননি এবং হস্তিনাপুরের নীতিহীন অর্বাচীন দুর্যোধনের লোভলালসাই তাঁকে শেষপর্যন্ত মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়েছে, যদিও এই মৃত্যুযন্ত্রণা তিনি জীবতকালেই বহুদিন ধরে সহ্য করেছেন। কিন্তু সেই যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁর আশা বলবতী ছিল যে, একদিন হয়তো তিনি তাঁর পুত্রকল্প ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝাতে পারবেন। জ্ঞাতিযুদ্ধের লজ্জা থেকে বাঁচাতে পারবেন ভরতবংশকে।

ভীষ্ম পারেননি। অতএব এখন এই মৃত্যুকালেও ধৃতরাষ্ট্রের দিকে তাকিয়ে তিনি তাঁর সত্যবাক্য উচ্চারণ করে বললেন—রাজা! করণীয় কার্য এবং ধর্ম সম্বন্ধে তুমি যথেষ্টই জানো এবং তোমার আচার্যস্থানীয় ব্রাহ্মণেরাও ধর্মাধর্মের উপদেশে যথেষ্ট অভিজ্ঞ। বেদশাস্ত্র তোমার সম্পূর্ণ অধিগত বলেই তোমাকে বলছি—এই দুঃখময় পরিণতির জন্য তুমি কষ্ট পেয়ো না। ভীষ্ম সারা জীবন ধরে যা বলেছেন ধৃতরাষ্ট্রকে আবারও সেই একই কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন ধৃতরাষ্ট্রকে এবং সেই স্মরণটুকুই এখন ধৃতরাষ্ট্রের ওপর নিয়তির মতো নেমে এসেছে। ভীষ্ম বললেন—পাণ্ডুর যারা ছেলে তারা ধর্মত তোমারও ছেলে। তাদের তুমি পালন করো। আর এই যে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, ইনি গুরুজনের সম্মান জানেন এবং ইনি তোমার আদেশের অনুবর্তী হয়ে থাকবেন চিরকাল—ধর্মরাজো হি শুদ্ধাত্মা নিদেশে স্থাস্যতে তব। সত্য কথাটা বলেই যুধিষ্ঠিরের ধীরনম্র স্বভাবের বিপরীতে দুর্যোধনের অসভ্যতার প্রশ্নটাও বলতে ছাড়লেন না ভীষ্ম, কারণ তারই কারণে এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—তোমার পুত্রেরা যেমন ক্রোধ, লোভ আর ঈর্ষায় জর্জরিত ছিল, অতএব সেই মৎসর পুত্রদের কথা স্মরণে এনে আর দুঃখ পাবার কোনও মানে হয় না।

ভীষ্ম এবার কৃষ্ণের দিকে তাকালেন। তাঁকেই তিনি সর্বজ্ঞানের আধার, পরম তত্ত্ব বলে মনে করেন। অতএব চিরভক্তের মতো স্তুতি-নতির নম্রতায় কৃষ্ণের জয়গান করলেন ভীষ্ম।

পরিশেষে বললেন—আমায় এবার অনুমতি দাও—অণুজানীহি মাং কৃষ্ণ—আমার সময় হয়েছে। আর এই পাণ্ডবদের তুমি রক্ষা কোরো। তারা তোমাকে ছাড়া আর কাউকে জানে না। ভীষ্ম আবার পুরাতন প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বললেন—দুষ্টবুদ্ধি দুর্যোধনকে আমি বার বার সাবধান করেছি। বলেছি—দেখো বাছা! যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই ধর্ম, আর যেখানে ধর্ম সেইখানেই জয়। বার বার তাকে বলেছি—কৃষ্ণ যাদের উপদেষ্টা সেই পাণ্ডবদের জয় করা অত সহজ নয়। অতএব তাদের সঙ্গে সন্ধি করার এই প্রকৃষ্ট সময়। কিন্তু মূর্খ দুর্যোধন আমার কথা কানে নেয়নি। সে এই সমস্ত পৃথিবীকে ধ্বংস করে নিজেও মরল—ঘাতয়িত্বেহ পৃথিবীং ততঃ স নিধনং গতঃ। যা হবার তা হয়ে গেছে, কৃষ্ণ! তুমি এবার অনুমতি করো যাতে এই শরীর ত্যাগ করে আমি পরমাগতি লাভ করতে পারি।

কৃষ্ণ গদগদবাক্যে ভীষ্মকে দেহত্যাগের জন্য অনুমতি দিলেন। অনুমোদন করলেন ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডবরা সকলে। ভীষ্ম এবার যোগবলে মনবুদ্ধিকে স্থির করলেন মূলাধারে। যোগসাধনার পরম্পরায় একে একে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত ইত্যাদি স্থানে নিজেকে স্থাপন করে ভীষ্ম আজ্ঞাচক্রে প্রতিষ্ঠা করলেন নিজের বুদ্ধি মন অহংকার—ধারয়ামাস চাত্মানং ধারণাসু যথাক্রমম্। লক্ষণীয় বিষয় হল, আধুনিক বৈদ্যশাস্ত্র অনুসারেও সম্পূর্ণ দেহ একই সময়ে প্রাণহীন হয় না, এক একটি অঙ্গ নির্জীব হতে হতে শেষে বুদ্ধিবৃত্তি লুপ্ত হয়। এখানে আশ্চর্য দেখা গেল— ভীষ্মের যে যে অঙ্গ শরবর্ষায় বিদ্ধ হয়ে ছিল, ক্রমে ক্রমে প্রাণমুক্ত হবার সঙ্গে সেই সেই অঙ্গ থেকে বাণগুলি খসে খসে পড়ে যেতে লাগল।

এই অদ্ভুত ঘটনা দেখে উপস্থিত মুনি-ঋষিরা, কৃষ্ণ এবং পাণ্ডবেরা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এদিকে শেষ মুহূর্তে যখন ভীষ্মের দেহের সমস্ত বিচরণস্থান থেকে সন্নিরুদ্ধ জীবাত্মা তাঁর ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে আকাশে উঠে গেল তখন দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করলেন আকাশ থেকে। ভীষ্মের প্রাণ উল্কার আলোর মতো আকাশে উঠে মিলিয়ে গেল—মহোল্কেব চ ভীষ্মস্য মূর্ধদেশাজ্জনাধিপ। ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম স্বেচ্ছায় আপন মরণ সম্পূর্ণ করলেন।

পূর্বভাবিত উপায়েই ভীষ্মের অন্তিমসংস্কারের কাজ আরম্ভ হল। চন্দনকাঠের চিতা সাজিয়ে তাতে কালীয়ক এবং কালাগুরুর গুরু গন্ধ ঢেলে দেওয়া হল। যুধিষ্ঠির এবং বিদুর পট্টবস্ত্র এবং ফুলের মালায় আচ্ছাদিত করলেন ভীষ্মের মরদেহ। যুযুৎসু ভীষ্মের মাথায় মেলে ধরলেন সেই আশ্বমেধিক ছত্র। ভীম অর্জুন দোলাতে লাগলেন শুভ্র চামর। নকুল সহদেব ধরে রইলেন রাজকীয় উষ্ণীষ। এদিকে যুধিষ্ঠির এবং ধৃতরাষ্ট্র—দুই বংশের দুই প্রধান পুরুষ দাঁড়িয়ে রইলেন ভীষ্মের পদতলে। যাজকের হোমযজ্ঞ আর সামগায়ীদের সামগানের মধ্যেই ভীষ্মের চিতায় আগুন দিলেন পুত্রপ্রতিম ধৃতরাষ্ট্র এবং অবশ্যই ক্রমান্বয়ে অন্যেরাও।

দাহ-সংস্কার শেষ হলে সকলেই ভীষ্মের তর্পণ করবার জন্য উপস্থিত হলেন ভাগীরথীর তীরে, তর্পণ শেষ হলে অলৌকিকভাবে সকলের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন জননী জাহ্নবী—ভীষ্মের গর্ভধারিণী মাতা। পুত্রশোকে তিনি যতখানি পীড়িত এবং অনুতপ্ত, তার চেয়েও তিনি যেন অপমানিত বোধ করছেন এবং এই অপমানের কারণও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে অবশ্য সেই পুরাতন কথাটি আসবেই। লৌকিক দৃষ্টিতে দেখলে এখানে গঙ্গার আবির্ভাবের কথাটা একেবারেই গল্প মনে হতে পারে। আবার লৌকিক দৃষ্টিতে আমরা যেভাবে গঙ্গার একটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছিলাম, তাতে এক লৌকিক রমণীর পক্ষে এতকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার কথা নয়। কারণ ভীষ্ম নিজেই যথেষ্ট বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন।

ভীষ্মের তর্পণকালে জননী জাহ্নবীর এই আবির্ভাব আসলে মহাকাব্যের কবির জবাবদিহি। মনে রাখতে হবে, ভীষ্ম মানুষ হয়েছিলেন জননীর কাছেই। তাঁর বিদ্যাশিক্ষা, অস্ত্রশিক্ষা এবং অন্যান্য শিক্ষার ক্ষেত্রেও সমস্ত প্রযত্ন গ্রহণ করেছিলেন তাঁর জননী। বিশেষত আর্যগোষ্ঠীর

রাজকীয় বিদ্যা-পরিমণ্ডলের বাইরে থেকেও যিনি তাঁর ছেলেকে পরশুরামের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করতে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর দৃষ্টিতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শিখণ্ডীর হাতে ভীষ্মের অস্বাভাবিক পতন একটা প্রশ্ন জাগরিত করে বই কী। মহাকাব্যের কবি তাই জননী জাহ্নবীর অলৌকিক আবির্ভাব ঘটিয়ে সহৃদয় পাঠক-শ্রোতার প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। নদীরূপিণী গঙ্গা তাঁর পুত্রের জীবনের এক একটি মহিমান্বিত বিক্রমের ঘটনা উল্লেখ করেছেন, আর বার বার ক্ষোভ সহকারে বলেছেন—আর এই পরাক্রান্ত মানুষটাকে নাকি শিখণ্ডী হত্যা করেছে—স হতো'দ্য শিখণ্ডিনা। বার বার তিনি বলতে চাইলেন—প্রিয় পুত্রের মৃত্যুতে তিনি তেমন বিচলিত নন—কেননা অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু তো ঘটবেই—কিন্তু তাঁর এমন প্রবল পরাক্রান্ত পুত্র শেষ পর্যন্ত এক রমণীর হাতে মারা গেল—এতে যেন বীরপ্রসূ জননীর অপমান ঘটেছে।

জাহ্নবীর আর্তি শুনে বাসুদেব কৃষ্ণ তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন—তুমি আশ্বস্ত হও জননী। তোমার পুত্র তো সাধারণ মানুষ নন, অষ্টবসুর এক বসু, ঈপ্সিত মরণের পর তিনি পুনরায় বসুলোকে প্রয়াণ করেছেন। আর তুমি যে বার বার বলছ—শিখণ্ডী হত্যা করেছে তোমার পুত্রকে, সে কথাটা ঠিক নয়। তোমার পুত্র ক্ষত্রিয়ের ধর্ম অনুযায়ী রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে করতে অস্ত্রদিগ্ধ হয়েছেন ধনঞ্জয় অর্জুনের হাতে। নইলে সামনাসামনি যুদ্ধে তোমার পুত্রকে জয় করতে পারেন, এমন বীরপুরুষ দুনিয়ায় নেই। দেবরাজ ইন্দ্রও হার মানবেন তাঁর কাছে—ন শক্তঃ সংযুগে হন্তং সাক্ষাদপি শতক্রতুঃ। অতএব তুমি দুঃখ করো না। শিখণ্ডীর মতো এক ক্লীবপ্রকৃতি মানুষের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়নি। তিনি বীরের মতো যুদ্ধ করে পুনরায় বসুত্ব লাভ করেছেন।

কৃষ্ণের কথায় নদীরূপা জাহ্নবী আশ্বস্ত হলেন বটে কিন্তু আমরা জানি যে, বীরোচিত যুদ্ধ করতে গিয়েই এক রমণীকে যুদ্ধক্ষেত্রে আগুয়ান হতে দেখেই ভীষ্ম তাঁর অস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন। অর্জুনের সঙ্গে বীরের যুদ্ধ করার অবসরে যে অবহেলিত বাণগুলি তাঁকে বিদ্ধ করছিল, ভীষ্ম সেগুলি আত্মস্থ করেছেন বীরের মর্যাদায়, অথবা কোনও গভীর অনুতাপে ইচ্ছাকৃতভাবে। কাশীরাজের স্বয়ংবরসভার আয়োজন পণ্ড করে যে জ্যেষ্ঠা রমণীকে তিনি বিচিত্রবীর্যের কারণে রথে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁকে পরিশেষে প্রত্যাখ্যান করে ব্রহ্মচারিত্বের প্রতিজ্ঞায় অটল ছিলেন ভীষ্ম। কিন্তু সেই স্বেচ্ছাকৃত প্রত্যাখ্যান তাঁর হৃদয়ে কোনও আবেশ তৈরি করেছিল কি না, তা মহাকাব্যের কবি সোচ্চারে একবারও বলেননি। কিন্তু ভীষ্মের নিজের এবং সেই প্রত্যাখ্যাতা অম্বা-শিখণ্ডিনীর পারস্পরিক ক্রোধ যেভাবে মহাকাব্যের অন্তর জুড়ে আছে, তাতে ক্রান্তমনোদর্শী সহৃদয়মাত্রেই এই সংশয়ে আকৃষ্ট হবেন যে, এই দুই পুরুষ রমণীর মধ্যে নেতিবাচক কোনও সরসতা ছিল। কিন্তু সে যাই থাকুক, মহাভারতের কবি যা স্বকণ্ঠে বলেননি, আমরাও তা সোচ্চারে বলব না।

ভীষ্মের দাহ-তপর্ণ শেষ হয়ে গেলে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরেরা সব হস্তিনাপুরে ফিরলেন। এরপর যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন এবং তাঁর রাজ্যও নিরুপদ্রবে চলতে আরম্ভ করল। কিন্তু কুরুরাজ্যের সমৃদ্ধি, আড়ম্বর এবং মান্যতা আর কখনও সেই পর্য্যায়ে পৌঁছোল না, যা ভীষ্মের জীবদ্দশায় ছিল। আর কী সেইসব ক্ষত্রিয়বীরের চমৎকার! পিতার বিবাহের জন্য এক পিতৃভক্ত যুবকের আমৃত্যু ব্রহ্মচারী থাকার প্রতিজ্ঞা, সিংহাসন ত্যাগের প্রতিজ্ঞা, অথচ সেই সিংহাসনে-বসা প্রত্যেকটি নাবালক পুত্রকে শিক্ষায় দীক্ষায় বড় করে তুলে ভরতবংশের উপযুক্ত রাজা করে তোলা—এই সমস্ত কিছুর মধ্যে যে ক্ষত্রিয়োচিত আড়ম্বর আছে, ভীষ্মের মৃত্যুর পর সেই মহান বৈচিত্র্য আর ভরতবংশের ইতিহাস উত্তাল করে তোলেনি তেমন করে।

আসলে মহামতি ভীষ্ম নিজেই এক ইতিহাস। মহাভারতে প্রথম যখন ভীষ্মের পরিচয় দিচ্ছেন মহাভারতের কথকঠাকুর বৈশম্পায়ন, তখন তিনি বলেছেন—আমি সেই কুমার দেবব্রতর কাহিনী বলব, যিনি গুণে তাঁর পিতা শান্তনুকে সর্বাংশে অতিক্রম করেছেন। আমি

সেই প্রকৃষ্ট ভরতবংশীয় রাজার কথা বলব, যাঁর জীবনের ইতিহাসই আসলে মহাভারত—যস্যেতিহাসসা দ্যুতিমান্ মহাভারতমুচ্যতে। দেখুন, আমি চমৎকার শব্দটা ব্যবহার করেছিলাম, আর কথকঠাকুর বলেছেন 'দ্যুতিমান্' অর্থাৎ উজ্জ্বল। ইতিহাস উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কখন? যখন ইতিহাসের মধ্যে বিচিত্র ঘটনার বাহুল্য এবং বৈচিত্র্য থাকে। সেই বৈচিত্র্য ভীষ্মেরই সৃষ্টি। আশ্চর্য হতে হয়—সারা মহাভারত জুড়ে তাঁকে সম্মানসূচকভাবে 'নৃপতি' বলা হয়েছে, 'রাজা' বলা হয়েছে। অথচ কোনওদিন তিনি সিংহাসনে বসেননি এবং সে লোভও তাঁর ছিল না।

অন্যদিকে তাঁর বিশাল ব্যাপ্তির দিকে তাকিয়ে দেখুন। সেই পিতা শান্তনুর সময় থেকে তিনি রাজ্য চালাচ্ছেন। শান্তনুর পর চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্য। তাঁদের পর ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু এবং তাঁদেরও পরে দুর্যোধন এবং পরিশেষে যুধিষ্ঠিরকে তিনি সিংহাসনে বসে যেতে দেখলেন। পরপর চারটি 'জেনারেশন'কে ভরতবংশের মর্যাদা বহন করে নিয়ে যেতে দেখলেন যিনি, পরপর চারটি জেনারেশনের ভালমন্দ, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সুখদুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে রইলেন যিনি, তিনিই তো এক ব্যাপ্ত ইতিহাস, মহাভারতের দ্যুতিমান ইতিহাস।

ভরতবংশের ইতিহাস যিনি লিখেছেন সেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস শান্তনুর অন্যতমা স্ত্রী সত্যবতীর গর্ভজাত। আর স্বয়ং যিনি মহাভারতের ইতিহাস তিনি শান্তনুরই অন্যা স্ত্রী জাহ্নবীর গর্ভজাত। একজন সংসারের বাইরে রইলেন মুনিবৃত্তি গ্রহণ করে, আর অন্যজন সংসারে রইলেন সন্ন্যাসীর মতো। সন্ন্যাসী ব্যাস ভরতবংশীয় রাজমহিষীর গর্ভে পুত্রসন্তান উৎপাদন করে ভরতবংশের ধারা অক্ষত রাখলেন গৃহস্থের মতো কর্তব্য পালন করে। আর অন্যজন হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে থেকে নিষ্কামভাবে সেই ভরতবংশের অঙ্কুরগুলিকে পালন করে বিবর্ধিত করলেন সন্ন্যাসীর মতো রাজ্যভোগে নির্লিপ্ত থেকে। মোহ যদি তাঁর কিছু থেকে থাকে, তো তা ছিল ভরতবংশের মর্যাদার প্রতি। কামনা যদি কিছু থেকে থাকে ভীষ্মের, তো তা ছিল পাণ্ডব কৌরবের নির্বিরোধ সহবাসের প্রতি ক্রোধ যদি তিনি কখনও করে থাকেন, তো তা করেছেন অন্যায় অসত্যকে প্রতিরোধ করার জন্য। আর জীবনের চেয়েও যে বস্তুর মূল্য তাঁর কাছে বেশি ছিল, তা হল ধর্ম। যে ধর্ম মানুষকে ধারণ করে, যে ধর্ম রাজা-প্রজার পারস্পরিক বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করে, যে ধর্ম একটি বৃহৎ পরিবারকে ত্যাগের মূল্যে একত্র সহবাসে সাহায্য করে এবং যে ধর্ম মানুষকে নিষ্কাম কর্তব্যপালনে অনুরক্ত করে, সেই ধর্মই ভীষ্মের ধর্ম। সেইজন্যই সারা জীবন কুরু-ভরতবংশের বিশ্বস্ত রাজকর্মচারীর ইতিকর্তব্য পালন করা সত্ত্বেও তিনিই প্রকৃত রাজা এবং তিনিই মহাভারতের ইতিহাস।

আমাদের একটাই দুঃখ আছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধশেষে ভীষ্মের রাজনৈতিক উপদেশ শুনে খানিকটা সুস্থ হয়ে যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরের রাজা হলেন বটে, কিন্তু আমাদের প্রশ্ন জাগে—সমস্ত শান্তিপর্ব এবং অনুশাসন পর্ব জুড়ে যুধিষ্ঠির এত যে উপদেশ পেলেন, স্বয়ং যুধিষ্ঠির—যিনি মনেপ্রাণে মোক্ষধর্মী ব্রাহ্মণের মতে প্রায়শই—প্রশ্ন জাগে—সেই যুধিষ্ঠির কি এই বিশাল রাজনীতি-উপদেশের উপযুক্ত আধার ছিলেন? উলটো দিকে ভেবে দেখুন—ভীষ্ম নিজে যদি প্রকৃত রাজা হতেন, তা হলে ভরত-কুরুবংশের ইতিহাস হয়তো অন্যরকম হত এবং হয়তো ভরত-কুরুর মতো প্রসিদ্ধ নামের প্রতিস্থাপন ঘটে যেত ভীষ্মের নামে। মহাভারতের রাজবংশকে সকলে যে সম্মানে ভরতবংশ, কুরুবংশ অথবা কৌরববংশ বলে গৌরব দান করেন, ঠিক সেই গৌরবে কেউ একবারও বলেন না যে, মহাভারত যুধিষ্ঠির কিংবা অর্জুনের বংশকথা। কিন্তু ভীষ্ম যদি রাজা হতেন, তা হলে পুরু ভরত কুরুদের গৌরব ম্লান হয়ে যেত নিশ্চয় এবং নিঃসন্দেহে পুরাতন ব্যাসের লেখনীতে এই মহাকাব্য মোটেই ভরতের গৌরবে শুধুই মহাভারত হয়ে উঠত না। সেই মহাকাব্যের নাম হয়তো নতুন মাত্রা পেত ভীষ্মের নামেই—যার ইঙ্গিত না দিয়ে থাকতে পারেননি মহাভারতের কবি। তাঁকে বলতে হয়েছে—এই ভীষ্মের ইতিহাসই মূলত মহাভারত নামে কথিত—যস্যেতিহাসো

দ্যুতিমান্ মহাভারতমুচ্যতে।

দ্রোণাচার্য

এখনকার দিনের ভগ্নদীর্ণ সংসারগুলির মধ্যে এমন মানুষ যে দেখতে পাবেন, তা মনে হয় না। কিন্তু আমার জীবনের সীমিত পরিসরেও এমন মানুষ আমি নিজের চোখে দেখেছি। তিনি যে আমাদের শোণিত সম্বন্ধে কোনও আত্মীয় গুরুজন নন, অথবা জ্ঞাতি সম্বন্ধেও তিনি যে আমাদের কোনও স্বজন ছিলেন না, সে কথা জেনেছি অনেক পরে। কিন্তু আত্মীয়, গুরুজন বা স্বজন না হলেও তাঁরা পরিজন বটে। কোথা থেকে যে তাঁরা এসেছিলেন, তা জানি না। বাড়িতে দোল কিংবা দুর্গোৎসব ছিল হয়তো। সেই অনাত্মীয় মানুষটিকে উপস্থিত হতে দেখলাম, কিন্তু উৎসব মিটে গেলে তিনি আর ফিরে গেলেন না। তিনি আমাদের হয়ে গেলেন। সে এমনই এক হয়ে ওঠা যে, তাঁর কথার মূল্য দিতে হত, তাঁর ইচ্ছে অনিচ্ছেরও মূল্য দিতে হত। সংসারের আত্মীয় গুরুজনের চেয়ে তাঁর মূল্য কিছু কম ছিল না।

এইরকম পরিজনকে আমরা কখনও সংসারের গুরুত্বপূর্ণ সমাধান করতে দেখেছি, কখনও রাত জেগে বৃদ্ধ বা রোগীর সেবা করতে দেখেছি, কখনও বা গিন্নিমার অসুস্থতায় হেঁসেলে ঢুকতে দেখেছি, আবার কখনও বা বাড়ির কচিকাঁচাদের নিয়ে পাঠশালা বসাতেও দেখেছি। একান্নবর্তী পরিবারের অখণ্ড একাত্মতার মধ্যে এঁরা যদি কেউ কখনও বাইরে যেতেন তা হলে তাঁর শূন্যতা আমাদের পীড়িত করত। আবার এমনও কখনও হয়েছে যে, আমাদের বাড়িতে থেকেই তাঁর বিবাহাদি সম্পন্ন হল, তারপরে আস্তে আস্তে নববধূর সংক্রমণে কোথা থেকে যেন কী হত—সংসারের বহ্বারম্ভিক লঘুক্রিয়ায়—একদিন দেখতাম —দুটি ফুলকাটা টিনের বাক্স হাতে নিয়ে তাঁরা গোরুর গাড়িতে উঠতেন। বাড়ির মা মাসিরা কেঁদে লুটোতেন, বাড়ির কর্তা তাঁদের সামনে আসতে না পেরে আপন রক্তচাপ প্রশমনের জন্য বেশি করে হুঁকোয় টান দিতেন, আর বাড়ির ছেলেপিলেরা গভীর চোখে শুধু তাকিয়ে থাকত—ঘটনার আকস্মিকতা কিছুই বুঝতে না পেরে। আমাদের পরবর্তী জীবনে এই মানুষগুলি বার বার ফিরে এসেছেন বিভিন্ন ঘটনায়, স্মরণে, মননে। আমরা তাঁদের ভুলিনি, ভুলতে পারি না। তাঁরা এখনও আমাদের পরম আত্মীয়ের চেয়েও বড়, অনেক রক্ত সম্বন্ধীর চেয়েও বেশি মূল্যবান আমাদের কাছে।

মহামতি দ্রোণাচার্যের সঙ্গে আমার স্মরণিকার শেষাংশ মিলবে না। আমাদের সেই অনাত্মীয় পরিজনেরা কখনও যে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, তার কারণ হয়তো ব্যক্তিগত জীবনে আত্মলাভের চেষ্টা, কখনও বা নিজেকে ঠিক মতো খুঁজে পাওয়ার জন্য, কিন্তু দ্রোণাচার্য কুরুবাড়ি ছেড়ে আর যেতে পারেননি। অন্যত্র চলে গেলে তাঁর স্বার্থলাভ বা আত্মপ্রতিষ্ঠা আরও বেশি হত কি না, তা বলা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত কুরুবাড়িতে থেকে তাঁদেরই জন্য মৃত্যু বরণ করার মধ্যে যে তাঁর চরম স্বার্থহীনতা ধরা পড়ে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আবার অন্যদিকে তিনি যে কুরুবাড়িতে সপুত্র-পরিবারে সারা জীবন কাটিয়ে গেলেন সেটাও যে একেবারে চরম স্বার্থহীন কোনও ভাবনা, তাও কিন্তু নয়। বস্তুত তখনকার দিনের সামাজিক নিরিখে দেখতে গেলে দ্রোণাচার্যের মধ্যে স্বার্থান্বেষিতার প্রমাণ যথেষ্টই মিলবে, যদিও সেই স্বার্থান্বেষিতা একেবারেই অকারণ নয়, হয়তো বা অত্যন্ত স্বাভাবিকও বটে। নিজের জীবনযন্ত্রণার প্রশমন খুঁজতে এসে কুরুবাড়ির ভাল মন্দ এবং সমস্ত সুখ দুঃখের সঙ্গে তিনি এমনভাবেই জড়িয়ে গেলেন যে, একান্ত নিশ্চিন্ত কোনও সুখভোগ, যা তিনি শুধু নিজের পুত্র-পরিবারের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারতেন, তা আর কোনও দিনই তাঁর প্রাপ্য হল না, মরণ পর্যন্তও না। তিনি একেবারেই কুরুবাড়ির হয়ে গেলেন, তাঁদের ভাল মন্দে সদা সংবেদনশীল এবং উত্থানপতনে সতত বিকার্যমন।

দ্রোণাচার্যের সামগ্রিক চরিত্র বুঝতে গেলে অবশ্য শুধু তাঁর কুরুবাড়ির আবাসকাল অথবা তাঁর হস্তিনাপুরে আগমনের সময় থেকে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত সময় ধরলেই চলবে না,

তাঁকে ধরতে হবে তাঁর জন্মের সময় থেকে একেবারে মৃত্যুর পরের সময় পর্যন্ত। কেননা দ্রোণাচার্য এমনই এক মানুষ যিনি মৃত্যুর পরেও আরেকভাবে বেঁচে থাকেন এবং সেই বেঁচে থাকার মধ্যে অন্যতর এক ধ্বংস আছে, তা সময়মতো বলব। অবশ্য একই সঙ্গে এ কথাও জানিয়ে রাখা ভাল যে, শুধু এইজন্যই দ্রোণাচার্যের চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ নয়। দ্রোণাচার্যের চরিত্র অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ আরও একটি সজীব কারণে। আধুনিক জগতে যেসব জীবনযন্ত্রণার কথা আমরা শুনি, সেইসব যন্ত্রণা দ্রোণাচার্যের জীবনে এত বেশি মাত্রায় ঘটেছে যে, তার ফলে তাঁর জীবনটাই হয়ে উঠেছে ভয়ংকর রকমের আধুনিক। অবশ্য সে আধুনিকতা বুঝতে গেলেও আবার তাঁর সমকালীন সমাজে ফিরে যেতে হবে এবং বুঝতে হবে সেই সমাজটাকেও।

সেকালের দিনে যে জায়গাটাকে পঞ্চাল বলে চিহ্নিত করা হত, ভৌগোলিক দৃষ্টিতে সেটা তখনকার উত্তরপ্রদেশের বেরিলি, বদায়ুন, ফরাক্কাবাদ—এই সবটা মিলে। এমনকী এর সঙ্গে রোহিলখণ্ড এবং মধ্যপ্রদেশের দোয়াব অঞ্চলটি জুড়ে নিলে তবেই সম্পূর্ণ পঞ্চাল রাজ্যটিকে পাওয়া যাবে। দ্রোণাচার্যের কথা বলতে গিয়ে আমরা যে পঞ্চাল রাজ্যের ভূগোল-ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি, তার কারণ একটাই—দ্রোণাচার্যের জন্ম হয়েছে পঞ্চালে, তাঁর বাল্য এবং কৈশোর কেটেছে পঞ্চালে। সবচেয়ে বড় কথা—পঞ্চাল দেশের রাজার ওপর রাগ করে উদগ্র প্রতিশোধস্পৃহায় তিনি পঞ্চাল-দেশ ত্যাগ করে হস্তিনাপুরে চলে গিয়েছিলেন। ফলত দ্রোণাচার্যের প্রসঙ্গে পঞ্চাল-রাজ্যের কথা আসবে অবধারিতভাবে।

পঞ্চাল-দেশের পুব দিকে গোমতী নদী বয়ে চলেছে কুলকুল করে। আর এই দেশের দক্ষিণে আছে গুহা-খাদ সমন্বিত বিখ্যাত চম্বল। পশ্চিমে বেশ খানিকটা অংশ মথুরা-শূরসেন অঞ্চল। আর একেবারে উত্তরপশ্চিমে আছে সুপ্রসিদ্ধ কুরু দেশ, যদিও সেখানে যেতে গেলে সুবিশাল এক অরণ্যভূমি পেরিয়ে যেতে হবে এবং পেরোতে হবে গঙ্গানদী। খেয়াল করে দেখবেন—জতুগৃহদাহের পর পাণ্ডবরা কুরু রাজ্যের অন্তর্গত বারণাবত থেকে গঙ্গা পেরিয়ে, হিড়িম্বরাক্ষসের বন, বকরাক্ষসের বন—ইত্যাদি অরণ্যানী পার হয়ে তবেই পৌঁছেছিলেন পঞ্চাল-রাজ্যের দ্রৌপদী-স্বয়ংবরে। থাক এসব কথা, শুধু মনে রাখুন—কুরু রাজ্যের সঙ্গে পঞ্চাল রাজ্যের ভৌগোলিক পার্থক্য তৈরি করেছিল মাঝখানে বয়ে যাওয়া গঙ্গানদী।

এই বিভেদ অবশ্য শুধু নদী দিয়েই তৈরি হয়নি, এই বিভেদ তৈরি করেছে কাল। মহাকাল, যা মানুষে মানুষে বিচিত্র বিভিন্নতার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বস্তুত পঞ্চাল দেশের শাসক রাজারা হস্তিনাপুরের শাসক রাজাদের অনাত্মীয় পরজন নন কেউ। হস্তিনাপুরের বিখ্যাত রাজা মহারাজ কুরুর বেশ কয়েক পুরুষ আগে জন্মেছিলেন অজমীঢ়। অজমীদের তিন স্ত্রী। নীলিনী, কেশিনী আর ধূমিনী। অজমীঢ়ের প্রথমা স্ত্রী নীলিনীর বংশধারায় চার পুরুষ পরেই পাঁচটি গুণবান পুত্রের জন্ম হয়। এঁরা পাঁচজনেই পঞ্চ বা পাঁচটি রাজ্যের রক্ষণ এবং জয়ে সমর্থ (অলং) ছিলেন বলেই, তাঁদের নাম হল পাঞ্চাল—অলং সংরক্ষণে তেষাং পাঞ্চালা ইতি বিশ্রুতাঃ। এঁরা সত্যি সত্যিই যে রাজ্যজয়ে 'অলং' অর্থাৎ সমর্থ ছিলেন, তা বোঝা যায় অন্য একটি দৃষ্টান্তে। অজমীঢ়ের অন্যতরা স্ত্রী ধূমিনীর গর্ভে জন্মেছিলেন ঋক্ষ এবং ঋক্ষের বংশধারাই হস্তিনাপুর শাসন করছিলেন। ঋক্ষের কয়েক পুরুষ পরেই সম্বরণ ও সম্বরণের ছেলের নামই কুরু, যাঁর নামে বিখ্যাত কুরুবংশ। কিন্তু ওই নীলিনীর ধারায় যে বিখ্যাত পাঁচ পুত্র তাঁরা কিন্তু অন্যত্র রাজ্য জয় করে তবেই রাজা হয়েছিলেন।

লক্ষণীয় বিষয় হল, হস্তিনাপুরে জন্ম লাভ করা সত্ত্বেও যাঁদের রাজ্য ছেড়ে ভিন্ন রাজ্যের দখল নিতে হল তাঁদের সঙ্গে আত্মীয় সম্বন্ধে হস্তিনাপুরের রাজাদের সম্পর্ক রইল বটে, কিন্তু রাজনৈতিক সমৃদ্ধি এমনই এক বস্তু যে, অতি নিকট সম্পর্কের মধ্যেও তা কটুতার সৃষ্টি করে। তা ছাড়া বংশ বংশ ধরে ঘটনা ঘটে চলে আরও। যেমন ধরুন, ওই যে হস্তিনাপুরের পাঁচ বীর পুত্র—যাঁদের নাম হল মুদ্‌গল, সৃঞ্জয়, বৃহদ্‌বসু, যবীনার এবং কাম্পিল্য—এঁদের মধ্যে সবচেয়ে নামী রাজা হলেন সৃঞ্জয়। বৃহদ্‌বসু বা যবীনার শুধু নামেই আছেন। পরবর্তীকালে তাঁদের বংশধারা কোন খাতে বয়ে চলেছিল, কেউ জানে না। কাম্পিল্যকে তবু খানিকটা সম্মান দিতে হবে, কেননা তাঁর নামে একটি পৃথক প্রদেশই পঞ্চাল রাজ্যের মধ্যে চিহ্নিত হয়েছিল এবং সেই দেশনামটি স্মরণ করতে হয়েছে বহুদিন।

অন্যদিকে মুদ্‌গল নামের প্রথমনামা পাঞ্চাল যিনি, তিনি তাঁর অন্য চার ভাইদের সঙ্গে

এসে পঞ্চাল রাজ্যের একাংশ দখল করেছিলেন বটে; কিন্তু তাঁর বংশধরেরা সকলেই ব্রাহ্মণের বৃত্তি গ্রহণ করেন। মহাভারতের ইতিহাসে মুদ্‌গলের ছেলে নাতিরা সব মৌদ্‌গল্য বা মৌদ্‌গল্যায়ন ব্রাহ্মণ নামেই সুপরিচিত। মুদ্‌গল আমাদের কাছে আরও গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, এই মুদ্‌গলের বংশধারাতেই জন্মগ্রহণ করেন কৌরব পাণ্ডবের প্রথম শিক্ষাগুরু কৃপাচার্য। কীভাবে কার ঔরসে কার গর্ভে কৃপাচার্য জন্মালেন, সেটা তেমন বড় কথা নয়। আমাদের কাছে বড় কথাটা হল—কৃপাচার্যও তা হলে পাঞ্চাল। তাঁর বাপঠাকুরদারা তো অবশ্যই পঞ্চালের অধিবাসী ছিলেন, কিন্তু তাঁদের অনেকেই মুনিবৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন।

কৃপাচার্যের দু-তিন পুরুষ আগে তাঁর পূর্ব পিতামহদের একজন—যাঁর নাম দিবোদাস অথবা সুদাস—তিনি অবশ্য ব্রাহ্মণত্ব গ্রহণ না করে রাজ্যই শাসন করেছিলেন। কিন্তু মুদ্‌গলের বংশধারায় বেশিরভাগই ছিলেন ব্রাহ্মণ—পুরাণ মহাভারত যাঁদের বিশেষণ দিয়েছেন ‘ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়’ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-বামুন—জন্মে ক্ষত্রিয় হলেও কর্মে বামুন। যে বংশে এই ধরনের একতর জন্ম এবং অন্যতর কর্মের সংশ্লেষ ঘটে, সে বংশে বৃত্তি-জীবিকার ক্ষেত্রটি তত কঠিন নিগড়ে বাঁধা থাকে না। যারজন্য ক্ষত্রিয় থেকে বামুন হয়ে যাওয়া পিতার বংশে জন্মে পুনরায় ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি গ্রহণ করতে কৃপাচার্যের বাধেনি। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই ক্ষত্রিয়-বৃত্তি ব্রাহ্মণের প্রথম পরিচয় হল—তিনি পঞ্চালদেশের মানুষ এবং যে কোনও কারণেই হোক তিনি কুরু রাজ্যের আশ্রিত।

পঞ্চাল দেশের অধিগ্রহণকারী পাঁচ বীরপুরুষের মধ্যে সবচেয়ে নামী দামি রাজা হলেন সৃঞ্জয়। বস্তুত তাঁর বংশের রাজারাই পরবর্তীকালে পাঁচ বীরপুরুষের অধিগৃহীত সমগ্র পঞ্চালই শাসন করতে থাকেন। সৃঞ্জয় এত বড় রাজা ছিলেন যাতে গোটা পাঞ্চাল গোষ্ঠীকেই তাঁর নামে অভিহিত করা হয়, ঠিক যেমন মহারাজ কুরুর নামে কুরুবংশ। মুদ্‌গল সৃঞ্জয়রা যখন প্রথম হস্তিনাপুর থেকে অবিরোধে বেরিয়ে যান, তখনও হয়তো কুরু রাজ্যের ভাইদের সঙ্গে তাঁদের সুসম্পর্ক ছিল। কিন্তু কালক্রমে প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে যাবার সঙ্গে পাঞ্চালদের সঙ্গে কুরু রাজ্যের সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে এবং মাঝে মাঝে যুদ্ধবিগ্রহও লাগতে আরম্ভ করে। সময়কালে সেই যুদ্ধবিগ্রহ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, কুরু রাজ্য কখনও পাঞ্চালদের দখলে চলে গেছে, আবার কখনও বা পাঞ্চালরাও বিধ্বস্ত হয়েছেন কুরু রাজ্যের শাসকগোষ্ঠীর হাতে। স্বয়ং মহারাজ কুরুর বাবা সম্বরণ একসময়ে পাঞ্চাল দিবোদাসের (ইনি কিন্তু কৃপাচার্যের পূর্বপুরুষ) আক্রমণের ফলে পৈতৃক রাজ্য হারিয়ে বনেজঙ্গলে, গিরিগুহায় ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হন।

এইরকম আক্রমণ আস্ফালন পঞ্চাল আর কুরু দেশের মধ্যে মাঝে মাঝেই চলত এবং রাজ্যটা একেবারে পাশাপাশি হওয়ার ফলে দুই রাজ্যের মধ্যে একটা পারস্পরিক আক্রোশ তৈরি হয়েছিল বহু পুরুষ ধরে এবং এ আক্রোশ রাজনীতির একান্ত দৃষ্টিতে একেবারেই স্বাভাবিক, কেননা কৌটিল্যের মতো মহাবুদ্ধি তাত্ত্বিক সেই কোন কালে বলে দিয়েছেন একটি রাজ্যের অব্যবহিত পরের রাজ্যটি একেবারে সাধারণ নিয়মেই কখনও মিত্র রাষ্ট্র হয় না। মহামতি দ্রোণাচার্যের প্রসঙ্গে কুরুপাঞ্চালদের এই পারস্পরিক শত্রুতার পূর্বকাহিনী এইজন্য শোনালাম যে, দ্রোণাচার্যের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর জীবনচক্র এই দুই দেশের শত্রুতার পথ ধরেই আবর্তিত হবে।

দ্রোণাচার্যের জন্মের মধ্যে কোনও মহিমা নেই, কোনও গৌরবও নেই। সেকালের কোনও ব্রাহ্মণগৃহে বা ক্ষত্রিয়গৃহে একটি পুত্রসন্তান জন্মালে পরে যে আনন্দের কলধ্বনি শোনা যেত সে ধ্বনি ওঠেনি কোথাও; দ্রোণের জন্মলগ্নে কোনও শঙ্খরব বা রমণীকুলের জয়কারে উচ্চকিত হয়ে ওঠেনি কোনও গৃহকোণ। দ্রোণাচার্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন পিতামাতার ক্ষণিকের উৎসুকতায়, বাধাবন্ধহীন শারীরিক চপলতার অন্যতম গতিসূত্র ধরে। আপনারা এখন যে জায়গাটাকে হরিদ্বার বলেন, সে জায়গাটাকে মহাভারতের কালে গঙ্গাদ্বার বলতেন অনেকেই। এই গঙ্গাদ্বারের কাছেই ছিল মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম। আশ্রমে যজ্ঞ চলছিল। মহর্ষি নিজেও সংযম নিয়মে নিজেকে রুদ্ধ করে ব্রতচারণ করছিলেন। শুধু যজ্ঞক্রিয়ার জন্যই অবশ্য এই যম-নিয়ম নয়, নিজের স্বভাবেই তিনি সংযতেন্দ্রিয়, সমস্ত বাহ্য সুখ থেকে নিজেকে তিনি সংবৃত করে রেখেছেন—ভরদ্বাজঃ ইতি খ্যাতঃ সততং সংশিতব্রতঃ। আজকে অবশ্য এতক্ষণ তিনি আশ্রমের হবির্ধান-মণ্ডপে যজ্ঞক্রিয়ায় ব্যাপৃত ছিলেন। যজ্ঞক্রিয়ার পরিশ্রম কম নয়। খানিকটা কাজ এগিয়ে রেখে তিনি একাই বেরিয়ে এসেছিলেন গঙ্গাদ্বারের শীতল স্রোতে স্নান করার জন্য। আর তখনই এই বিপত্তি ঘটল।

সারাজীবন কঠোর নিয়ম-ব্রতের মধ্যে দিয়ে যিনি চলেন, প্রকৃতি তার ওপরে এমন করেই বুঝি প্রতিশোধ নেয়। মহর্ষি আগে এসেছিলেন নদীতে স্নান করতে—পূর্বমেবাগমন্নদীম্। তখন কেউ সেখানে ছিল না। কিন্তু স্নান করে উঠে তিনি যা দেখলেন, তাতে তাঁর পক্ষে আর নিজেকে ধারণ করা সম্ভব হল না। স্বর্গসুন্দরী ঘৃতাচী, যিনি অপ্সরা সুন্দরীদের মধ্যে অন্যতম প্রধান—ভরদ্বাজ তাঁকে দেখতে পেলেন উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে, গঙ্গার তীরে উতলা হাওয়ার মধ্যে। সমস্ত শরীরের মধ্যে তাঁর সৌন্দর্যের দীপ্তি ফুটে উঠছে, তার সঙ্গে রয়েছে রমণীয় হাবভাবলাস্য—রূপযৌবনসম্পন্নাং মদদৃপ্তাং মদালসাম্। শুধু এমন হলেও হত। এমন সুন্দরী রমণী ভরদ্বাজ পূর্বে কখনও দেখেননি, তা তো নয়। কিন্তু ঘৃতাচী ভরদ্বাজকে দেখে এমন সরস আপ্লুত ভাব প্রকাশ করতে লাগলেন, যাতে মুনির সংযম বিঘ্নিত হয়। তাও যদি শুধু এইটুকুই হত, তবু কথা ছিল। ঘৃতাচী মুনিকে দেখেই তাঁর পরিধানের সুসূক্ষ্ম স্বর্গীয় বসনখানি পরিবর্তন আরম্ভ করেছিলেন—বসনং পর্যবর্তত। ঠিক সেই সময়েই উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে কোথা থেকে উতলা হাওয়া এসে এক দ্বিধাদ্বন্দ্বসমাযুক্ত অসম্পূর্ণ চিত্রকে সম্পূর্ণ করে দিল। ভরদ্বাজ ঘৃতাচীকে দেখতে পেলেন নগ্না প্রকৃতির মতোই। ইন্দ্রিয়ের এতাবদ্-রুদ্ধ সংযম মুহূর্তে স্খলিত হল, ভরদ্বাজ কামনা করলেন ঘৃতাচীকে মানসিক শরীরে—ব্যাপকৃষ্টাম্বরাং দৃষ্টা তাং ঋষিশ্চকমে তদা।

ঘৃতাচীর সঙ্গে মহর্ষি ভরদ্বাজের কোনও শারীরিক মিলন হয়নি বলেই বোঝাতে চেয়েছেন মহাভারতের কবি। কিন্তু মানস-শরীরে যে চাঞ্চল্য এসেছিল, তাতেই শরীরের তেজ নির্গত হল মহর্ষি ভরদ্বাজের। মহর্ষি সে তেজ মৃত্তিকায় বিলীন হতে দিলেন না, তিনি তা ধারণ করলেন একটি আধারে—যাকে কবি বলেছেন দ্রোণ। সংস্কৃতে দ্রোণ বলতে বোঝায় চাল মাপার কৌটোর মতো কোনও আধার। কিন্তু এই শ্লোকের অব্যবহিত পরেই দ্রোণ শব্দটি ব্যবহার না করে কবি বলেছেন কলশ। টীকাকার নীলকণ্ঠ শব্দদুটি এক জায়গায় করে বলেছেন—দ্রোণ-কলশ মানে হল যজ্ঞীয় পাত্র। এমন হতেই পারে মহর্ষি ভরদ্বাজ হবির্ধান মণ্ডপ ছেড়ে স্নান করতে এসেছিলেন গঙ্গাদ্বারে। সেখানে নদীস্রোতের যা খরতর রূপ, তাতে সেকালের দিনে একটি যজ্ঞকলশ বয়ে নিয়ে এসে তাই দিয়ে জল তুলে স্নান করাটাই কম ভয়ের ছিল। কিন্তু স্নান করার সেই দ্রোণকলশ কাজে লাগল মহর্ষির শরীরতেজ ধারণের জন্য। দ্রোণের মধ্যে জন্মেছিলেন বলেই ভরদ্বাজের এই পুত্রের নাম হল দ্রোণ—ততঃ সমভবদ্ দ্রোণঃ কলশে তস্য ধীমতঃ।

দেখুন, মহামতি দ্রোণাচার্য ভবিষ্যতে যে মর্যাদা ভোগ করবেন, সেইজন্যই হয়তো ঘৃতাচী

উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাঁকে স্পষ্টত অপ্সরা রমণীর গর্ভশায়ী করেননি মহাভারতের কবি। কিন্তু 'কলশ' শব্দটি স্ত্রীলোকের অধমাঙ্গের পরিবর্ত হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া অসম্ভব নয়। এবং এই পুত্র জন্মের কারণ যেহেতু অপ্সরা ঘৃতাচী, অতএব তাঁর গর্ভকলশেই যে দ্রোণাচার্যের জন্ম হয়েছিল লৌকিক দৃষ্টিতে সেটা বিশ্বাস করাটাই স্বাভাবিক হবে। তাতে মহর্ষি ভরদ্বাজের মাহাত্ম্য কিছু কমে না এবং দ্রোণাচার্যের জন্মদাত্রী হিসেবে ঘৃতাচীকে একেবারে হেঁটে ফেলার অস্বাভাবিকতাও কিছু থাকে না। তবে অপ্সরা সুন্দরীরা স্বর্গবেশ্যা বলে সকলেই চিহ্নিত, অতএব পুত্রের জন্ম দেবার পর তাদের ওপর দয়া মায়া, তাদের মানুষ করার দায়িত্ব এসব বোধহয় স্বর্গবেশ্যাদের কাছে আশা করা যায় না। এমন নির্দয় উদাহরণ আমরা মহাভারতের মধ্যেই বহু দেখেছি।

অতএব এটা বোঝা যায় শৈশব থেকেই জননীর পরিত্যক্ত ছিলেন শিশু দ্রোণ। যদি পরিত্যক্ত শব্দটা নাও ব্যবহার করি, তবু বলতে হবে—জননীর স্নেহযত্নহীন অবস্থায় দ্রোণের শিশুকাল কেটেছে পিতার আশ্রমে। অনন্ত-ব্যাপ্ত যজ্ঞক্রিয়ার কোনও অবসরে পিতার ক্রোড়ে তাঁর স্থান হত কি না—কখনও বা হতও নিশ্চয়ই—তবু সে কথা একেবারেই জানাননি মহাভারতের কবি। তবে হ্যাঁ, সেকালের দিনের একটি তপঃসিদ্ধ মুনির আশ্রমে একটি বালকের দিন যেভাবে কাটতে পারে, সেইভাবেই দিন কেটেছিল দ্রোণের। কোনও আশ্রম-বাড়িতে একটি বালকের শৈশব কাটতে থাকলে তার শিশুমনে কী প্রতিক্রিয়া হয়, সে সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সামান্য হলেও কিছু আছে। অন্যের দৃষ্টিতে এমন বাল্যজীবন যতই কষ্টকর মনে হোক, খুব যে খারাপ লাগে তা নয়। এমনকী বৈচিত্র্যও যে খুব কম, তাও নয়। বিভিন্ন প্রকার সাধু মহান্তের আগমন, বিচিত্র চরিত্র মানুষের সমাগম, পুজোআর্চা, ভোগরাগ, মহোৎসব ইত্যাদির মাধ্যমে কোনও দিনই একরকম কাটে না। তারমধ্যে সাধন সম্পন্ন সাধুসজ্জনদের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার কথাও কিছু কম আকর্ষণীয় নয়। তবে এই সমস্ত কিছুর মধ্যেই আশ্রম-বাড়িতে কিছু নিত্য করণীয় পুজার্চনা, ব্রতনিয়ম থাকেই এবং একটি বালক ছোট বয়স থেকেই সেগুলিতে অধিকার পেলে, সে মনে মনে একটু গৌরবান্বিতও বোধ করে। একটি আশ্রমের আচার্য হিসেবে মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁর শিশুপুত্রকে আর কিছু দিতে না পারলেও তাঁর আশ্রমে প্রচলিত বৈদিক ব্রাহ্মণ্যের উত্তরাধিকারটুকু অবশ্যই দিতে পেরেছিলেন।

অতএব ক্ষণিকের চাপল্যে দ্রোণের জন্ম হলেও মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁকে যে সান্নিধ্য দিয়েছিলেন, তাতে ব্রাহ্মণোচিত অধ্যয়ন দ্রোণের ওপর ভারী হয়ে চেপে বসছিল এবং দ্রোণকে বেদবেদাঙ্গও বেশ ভালভাবেই পড়তে হচ্ছিল—অধ্যগীষ্ট স বেদাংশ্চ বেদাঙ্গানি চ সর্বশঃ। কিন্তু বহুতর অধ্যয়ন সম্পন্ন করা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণের স্বধর্ম—অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, যজনযাজন অথবা দানপ্রতিগ্রহ—এগুলি দ্রোণের ভাল লাগছিল না। হয়তো তখন তাঁর কিশোর বয়স কেটেছে কেবল। যৌবনসন্ধির পূর্বকালে অন্য কোনও চমৎকার তাঁর মন অধিকার করেছিল নিশ্চয়ই। যজনযাজন আর দক্ষিণার ওপর নির্ভর করে জীবন চালানোর মধ্যে ব্রাহ্মণের যে ত্যাগ ভোগের গৌরব ছিল, সে গৌরব দ্রোণ তেমন করে আত্মসাৎ করতে পারেননি। হয়তো এর পিছনেও জননীর অনুপস্থিতি একটা বড় কারণ হয়ে থাকতে পারে। কারণ, সেকালের দিনে পিতাঠাকুররা যে বৃত্তি গ্রহণ করতেন, গৃহমধ্যস্থিত জননীরা সেই বৃত্তিজীবিকায় সেভাবে অংশ নিতে না পারলেও স্বামীর বৃত্তির গৌরব বোধ করতেন আপন মনে এবং সে বৃত্তির গৌরব শিশুকাল থেকেই পুত্রদের মনে অনুস্ত করতেন অদ্ভুত মহিমায় এবং আন্তরিকতার সঙ্গে।

দ্রোণের কাছে জননীর এই অন্তরাল নিবেদন একেবারেই অস্পষ্ট ছিল। কিন্তু বেদ ব্রাহ্মণ্যের দিকে দ্রোণের যে শেষপর্যন্ত কোনও রুচি হল না, তার কারণ বোধহয় দ্রোণ-পিতা ভরদ্বাজের স্বকীয় বৃত্তিবৈচিত্র্য। সেকালের দিনে বেশ কিছু মুনিঋষির সন্ধান আমরা পাব,

যাঁরা ব্রাহ্মণের যাগযজ্ঞ নিয়ে ব্যাপৃত থাকলেও ক্ষত্রিয়ের ধনুর্বাণচালনা অভ্যাস করতেন অবসর সময়ে। রামায়ণের মধ্যে কত মুনিঋষির নাম পাবেন, যাঁদের কাছ থেকে মহাভাগ রামচন্দ্র বিচিত্র অস্ত্ররাজি লাভ করেছেন রাক্ষসবধের জন্য। সেইসব ঋষিনামের মধ্যে আমাদের আলোচ্য ভরদ্বাজের নামও পাবেন। হয়তো সেই ভরদ্বাজ আর এই ভরদ্বাজ এক নয়। কেননা, শিষ্যপ্রশিষ্য ক্রমে ঋষিদের বংশ পরম্পরা তৈরি হত সেকালে এবং মূল ঋষির নামেই তৈরি হয়ে যেত এক একটি ইনস্টিটিউশন বা সম্প্রদায়। ভরদ্বাজরাও সেইরকম। যদিও ভরদ্বাজদের মূল আচার্যকে অবশ্যই ভরদ্বাজ বলা হত।

তবে হ্যাঁ, মহাকাব্যের অন্য ঋষিমুনিদের তুলনায় ভরদ্বাজদের একটু আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল বলেই মনে হয়। চাকুরিজীবী লোক যদি ছবি আঁকে ভাল বা গান ভাল করে, তবে যেমন একসময় তার জীবিকার মুখ্যতা অঙ্কন বা গানের প্রতিভায় ঢাকা পড়ে যায়, মহর্ষি ভরদ্বাজেরও তাই হয়েছিল। তাঁর অস্ত্রশিক্ষার চমৎকার এতটাই বেশি ছিল যে কিছু কিছু শিক্ষার্থী ভরদ্বাজের কাছে অস্ত্রশিক্ষা লাভ করার জন্যই আসত। একবার ভেবে দেখুন, দ্রোণের শিশুমনে এর কী প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকতে পারে। দৈনন্দিন বেদ পাঠ অধ্যয়ন এবং যাগযজ্ঞের প্রক্রিয়ার মধ্যে যে একঘেয়েমি আছে, অবসরকালীন অস্ত্রচালনার নৈপুণ্য এবং বিচিত্রতা সেই একঘেয়েমি ধুয়ে মুছে দেয়। হয়তো মহর্ষি ভরদ্বাজের কাছে তাঁর এই অস্ত্রচালনার গৌণী বৃত্তি অবসরকালীন মধুরতায় ধরা দিত, চাকুরিজীবী ব্যক্তির কাছে যেমন অবসরকালীন ছবি আঁকার মুক্তি অথবা গীতবাদ্যের হৃদয়হরণ আবেদন। কিন্তু একবার ভাবুন তো, দ্রোণের শিশুমনে এর কী প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকতে পারে। মুখ্য বৃত্তির দৈনন্দিন চিরাচরণ যখন পদে পদে একটি পুরুষকে খণ্ডিত করে, খণ্ডিত করে এবং খণ্ডিত করে, গৌণী বৃত্তির সরসতা তখন একটু একটু অধিকার করে বালকের মন, তাকে আপ্লুত করে, মুগ্ধ করে। দ্রোণেরও ঠিক তাই হয়েছিল।

আপনারা যাঁরা মহর্ষি ভরদ্বাজের অস্ত্রচালনার বুদ্ধিকে ‘সাইড-বিজনেসে’র বুদ্ধি বলে ভাবছেন, তাঁরা নিজের মুখ্য জীবিকাও ঠিক মতো পালন করেন বলে মনে করি না। কিন্তু নিজের স্বধর্ম পালন করেও যাঁরা সন্ধ্যার অবসরে তানপুরা নিয়ে বসেন, অথবা বসেন রং তুলি আর প্যালেট নিয়ে, তাঁরা বুঝবেন—প্রধান বৃত্তি ক্ষুধার অন্ন যোগায় বটে, কিন্তু সন্ধ্যার সেই অবকাশ বিনোদন শুধু বিনোদনমাত্র নয়, ওইটিই তাঁদের প্রাণের আরাম, আত্মার আনন্দ। দৈনন্দিনতার গ্লানি-ক্ষুব্ধ অন্তরে ওই আপাত গৌণ ব্যবহারটুকু যে কেমন করে জ্বলতে থাকে, কেমন করে যে সকলের অজান্তেই তা ভীষণ রকমের মুখ্য হয়ে ওঠে, তা বুঝবেন শুধু তাঁরাই, যাঁরা মনের তাগিদে ওই মুক্তিটুকু খোঁজেন। খেয়াল করে দেখবেন— এই জাতীয় পিতামাতার সন্তান যদি কোনওভাবে কোনও শিল্প চেতনার দ্বারা আকৃষ্ট হন, তবে সেই পিতামাতারা আপন পুত্রকন্যার মধ্যে নিজেদের নতুন করে আবিষ্কার করেন এবং যে কোনও মূল্যে তাঁরা সেই পুত্রকন্যাদের প্রতিভা আবিষ্কারে ব্যস্ত হন।

না হলে মহর্ষি ভরদ্বাজের ক্ষেত্রেই বা এমন হবে কেন! তিনি ‘সংশিতব্রত’ ঋষি, সারা জীবন যজ্ঞকর্ম, যজনযাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় তাঁর দিন কেটেছে। প্রিয় পুত্র দ্রোণকেও তিনি বেদ বেদাঙ্গের সম্পূর্ণ শিক্ষা দিয়েছেন আপন ঋষি বংশের ধারা অনুযায়ী। কিন্তু এই বেদ বেদাঙ্গের শিক্ষার কথা এক লাইনে বলেই মহাভারতের কবি বললেন—অগ্নিবেশ্য নামে ভরদ্বাজের এক অতি প্রিয় শিষ্য ছিলেন। সকলে তাঁকে অগ্নির পুত্র বলেই মনে করতেন— অগ্নেস্তু জাতঃ স মুনিস্তুতো ভরতসত্তম। সেই অগ্নিসম্ভব অগ্নিবেশ্যকে ভরদ্বাজ অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছিলেন একসময় এবং তাঁর অস্ত্রচালনার প্রতিভায় মহর্ষি এতটাই প্রীত হয়েছিলেন যে, অস্ত্রশিক্ষার চরম আগ্নেয় অস্ত্রের শিক্ষাটি একমাত্র অগ্নিবেশ্যকেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ভরদ্বাজ। হয়তো উপহার হিসেবে নিজ গৃহে রক্ষিত একটি আগ্নেয় অস্ত্রও তাঁকে। দিয়েছিলেন মহর্ষি—প্রত্যপাদয়দ্ আগ্নেয়ম্ অস্ত্রমস্ত্রবিদাং বরঃ।

ভরদ্বাজ যখন অগ্নিবেশ্যের গুরু হিসেবে উপস্থিত, তখন মহাভারতের কবি তাঁর বিশেষণ দিচ্ছেন অস্ত্রবিদাং—বরঃ, অর্থাৎ অস্ত্রবিদ ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ, অথচ এই একটু আগেই ঘৃতাচী অপ্সরার সঙ্গে মিলনপূর্ব সময়ে কবি তাঁর বিশেষণ দিয়েছেন—'মহান্ ভগবান্ ঋষিঃ।' ঠিক এইখানেই ওই জীবিকা আর আত্মানন্দের কথাটি আসে। অথচ ভরদ্বাজ অন্যতম প্রধান অস্ত্রবিদ হলেও তিনি ব্রাহ্মণের বৃত্তি ত্যাগ করেননি। ত্যাগ করেননি হবির্ধান মণ্ডপের করণীয় কর্তব্যগুলি। কিন্তু আনন্দের অনুশীলনীটুকু যেহেতু শিল্পীর মনে অনুক্ষণ জ্বলতে থাকে, তাই যে মুহূর্তে তিনি দ্রোণের মধ্যে অস্ত্রশিক্ষার মুগ্ধতা লক্ষ করেছেন, সেই মুহূর্তেই তিনি তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছেন প্রিয় শিষ্য অগ্নিবেশ্যের কাছে।

ভরদ্বাজ নিজে পুত্রকে অস্ত্রশিক্ষা দেননি, কারণ তাতে কথা উঠত। কথা উঠত—ঋষি ব্রাহ্মণ হয়ে পিতা তাঁর পুত্রকে নিজেই স্বধর্ম ত্যাগ করতে শেখাচ্ছেন, ব্রাহ্মণের বৃত্তি ত্যাগ করতে শেখাচ্ছেন। অতএব তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্য অগ্নিবেশের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখতে পাঠিয়েছেন। এর পিছনে অবশ্য অন্য উদ্দেশ্যও থেকে থাকবে। পিতা পুত্রকে নিজেই শিক্ষা দিলে অনেক সময় অসুবিধেও হয়। স্নেহবৃত্তি প্রবল থাকার ফলে যেসব জায়গায় ক্রোধ প্রকাশ করা উচিত, সেসব জায়গায় তিনি মুখর নাও হতে পারেন তত, কখনও বা অতি স্নেহের দরুন ছাত্রের করণীয় পরিশ্রমসাধ্য অনুশীলন কর্ম তিনি বাদ দিয়েও দিতে পারেন। কিন্তু অন্যের কাছে পাঠালে, বিশেষত 'প্রোফেশনাল' লোকের কাছে বিদ্যা শিখতে পাঠালে কাজটি সুসম্পন্নও হয়। কারণ ছিল আরও। আগ্নেয় অস্ত্রের যে শিক্ষা তিনি অগ্নিবেশ্যকে শিখিয়েছিলেন, তা যেহেতু অন্য কাউকে তিনি শেখাননি, অতএব পিতা হিসেবে ভরদ্বাজ চেয়েছিলেন। যে, তাঁর প্রিয় পুত্রের শিক্ষা সম্পূর্ণ হোক সেকালের চরম বিদ্যা আগ্নেয়াস্ত্রের অনুশীলনেই এবং তা হোক অগ্নিবেশ্যের কাছ থেকেই। এতে করে বিদ্যাও যেমন অধিগত হবে, অন্যদিকে দ্রোণের বুদ্ধি ক্ষমতা থাকলে অগ্নিবেশ্যকে দেওয়া ভরদ্বাজের সেই আগ্নেয়াস্ত্রের উপহার আবারও ফিরে আসবে দ্রোণের কাছেই—শিষ্য পরম্পরাক্রমে আবারও পুত্র পরম্পরায়।

যাই হীক, বালক দ্রোণ বেদ বেদাঙ্গের পাঠ শেষ করে অস্ত্রশিক্ষার জন্য উপস্থিত হলেন অগ্নিবেশের শিক্ষাশ্রমে। সেকালের গুরুগৃহে শিক্ষার্থী বালকের আবাস খুব সুখকর হত না। আরমপ্রদ তো নয়ই। গুরুর সংসারসাধন এবং ধর্মক্রিয়া এই দুয়েতেই বিদ্যার্থীর আন্তরিক ভূমিকা ছিল। ফলে শারীরিক পরিশ্রম হত যথেষ্টই। গুরুকুলে স্থায়ী হওয়ার প্রথম শর্ত ছিল ব্রহ্মচর্য অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয় দমন করে সমস্ত বাহ্যসুখ দমন করে মনকে অন্তর্মুখী করে তোলা। এর সঙ্গে ছিল বিনয়শিক্ষা। বিনয় শব্দটাকে আভিধানিক বুদ্ধিতে বিনয় বা 'মডেস্টি' ভাবার কোনও কারণ নেই। পণ্ডিত শাস্ত্রকারেরা বলেছেন—শিষ্য যা শিখতে চায় সে সম্বন্ধে শোনবার ইচ্ছে, গুরুর কাছ থেকে বিদ্যা সম্বন্ধে আনুপূর্বিক শোনা, সেগুলি গ্রহণ করা, বুদ্ধিতে ধারণ করা, তার সম্বন্ধে মানসিক তর্ক, ভ্রান্তির নিরাস এবং পরিশেষে তত্ত্বের প্রতি অভিনিবেশ—এই এতগুলি ধাপের মধ্যে দিয়ে বিনয়শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় এবং এই শিক্ষার বলে বাহ্য এবং অন্তরিন্দ্রিয়ও সংযত হয়।

ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণ পরবর্তীকালে নিজের মুখে জানিয়েছেন যে, অস্ত্রশিক্ষার জন্য তিনি যখন মহর্ষি অগ্নিবেশের আশ্রমে থেকেছেন, তখন তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করে গুরুসেবা করতে হয়েছে, পালন করতে হয়েছে ব্রহ্মচর্য এবং শিক্ষা করতে হয়েছে বিনয় ব্রহ্মচারী বিনীতাত্মা...গুরুশুশ্রূষণে রতঃ। অগ্নিবেশ্যের আশ্রমে থাকতেও হয়েছে অনেক কাল, অনেক বৎসর। কষ্ট সহনের দিক থেকে সময়ের এই দীর্ঘতাও কিছু কম নয়। দ্রোণ বলেছেন —এক নয়, দুই নয় বহু বৎসর আমি গুরুর আশ্রমে থেকেছি, থাকতে থাকতে তৈলহীন মলিনতায় আমার মাথায় জমেছিল জটাজুট—অবসং সুচিরং তত্র জটিলো বহুলাঃ সমাঃ। তবু

সেই গুরুগৃহবাস কষ্টকর হয়ে ওঠেনি দ্রোণের কাছে। কষ্টকর হয়ে ওঠেনি যে, তার আপাতগ্রাহ্য কারণ আছে মাত্র দুটি। এক তো মনের মধ্যে সেই দুর্নিবার ইচ্ছা-অস্ত্রের শিক্ষায় সকলকে ছাড়িয়ে গিয়ে গুরু অগ্নিবেশের কাছ থেকে আগ্নেয় অস্ত্র লাভ করতে হবে তাঁকে। কিন্তু অনন্ত পরিশ্রমসাধ্য এই অস্ত্রশিক্ষার মধ্যেও যা তাঁকে শান্তি দিত, অথবা যা তাঁকে মুগ্ধ করত, সে হল এক অসাধারণ বন্ধুত্ব—মহর্ষি অগ্নিবেশের আশ্রমে ওই বন্ধুত্বই ছিল তাঁর নিশ্বাস এবং বিশ্বাস দুইই।

গুরুগৃহের অন্তেবাসী দ্রোণের এই বন্ধুর পরিচয় দিতে গেলে আবারও দ্রোণের পিতা ভরদ্বাজের কথা আসবে। পঞ্চাল রাজ্যের বিখ্যাত যেসব রাজা ছিলেন, সেই সৃঞ্জয় সোমকদের বংশধারার অধস্তন পুরুষ হলেন মহারাজ পৃষত। তিনি ছিলেন মহর্ষি ভরদ্বাজের অতি প্রিয় সখা—ভরদ্বাজসখা চাসীৎ পৃষতো নাম পার্থিবঃ। একজন শাসক রাজার সঙ্গে ব্রাহ্মণ-ঋষি ভরদ্বাজের বন্ধুত্ব কেন গড়ে উঠেছিল, সেটা ভালই অনুমান করা যেতে পারে। আমরা জানি ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রবিদ্যা খুব ভালই জানতেন। সবচেয়ে বড় কথা সে যুগের চরম এবং পরম যে অস্ত্রসন্ধি, সেই আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার জানতেন ভরদ্বাজ। হয়তো এই অস্ত্রকৌশল জানার প্রয়োজন ছিল মহারাজ পৃষতের। তাঁর নিজের বয়স বা আভিজাত্য ভরদ্বাজের সমানুপাতিক হওয়ায় পৃষত স্বয়ং ভরদ্বাজের কাছে শিষ্যবৎ আনত হননি। কিন্তু তিনি তাঁর বালক পুত্রকে ভরদ্বাজের কাছে পড়তে পাঠিয়েছিলেন। পৃষতের পুত্রের নাম দ্রুপদ।

না, এ কথা কখনওই বলব না যে, পড়ার অছিলায় ভরদ্বাজের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করানোটাই পৃষতের মূল উদ্দেশ্য ছিল। কেননা উদ্দেশ্য থাকলেও তিনি তা প্রকট করেননি। তিনি দ্রুপদকে বন্ধু-ঋষি ভরদ্বাজের কাছে পাঠিয়েছিলেন বেদ বেদাঙ্গ পড়বার জন্য। সেকালের দিনের রাজপুত্রদের ঋক সাম যজুর্বেদ জানা ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণের কাছে বেদ বেদাঙ্গ শিখতে হত সবিনয়ে। পৃষত সেই কারণেই পুত্র দ্রুপদকে প্রতিদিন নিয়ে আসতেন বন্ধু ভরদ্বাজের কাছে অথবা পাঠিয়ে দিতেন শিক্ষার জন্য। কিন্তু মুখে না বললেও তিনি মনে মনে জানতেন যে, ক্ষত্রিয়োচিত অস্ত্র শিক্ষার প্রতি ভরদ্বাজের এতটাই আগ্রহ আছে যে, একসময় না একসময়ে নিজ পুত্র দ্রোণকে তিনি অস্ত্রশিক্ষা দেবেনই। ঠিক সেই সুযোগে দ্রুপদও যাতে ভরদ্বাজের মতো মহান অস্ত্রগুরুর শিক্ষা লাভ করতে পারেন, সেইজন্যই শিশু অবস্থা থেকে বন্ধু ভরদ্বাজের সঙ্গে বালক দ্রুপদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন পৃষত।

তা হলে সেই বালক অবস্থায় পিতার আশ্রমে নিত্য আসা দ্রুপদের সঙ্গে বালক দ্রোণের পরিচয়—স নিত্যাশ্রমং গত্বা দ্রোণেন সহ পার্ষতঃ। প্রতিদিন তাঁদের লেখাপড়া চলত একসঙ্গে—বেদপাঠ এবং বেদ-বিদ্যার সহকারী শিক্ষা, কল্প, জ্যোতিষ, ব্যাকরণের অভ্যাস। এতসব পড়াশুনোর ফাঁকে যখন অবসর মিলত, তখন খেলাধুলোও চলত যথেষ্ট—চিক্রীড়াধ্যয়নঞ্চৈব চকার ক্ষত্রিয়র্ষভঃ। বালক দ্রোণ যখন বড় হলেন, অপিচ পিতার কাছে বেদ বেদাঙ্গের প্রাথমিক পাঠও যখন শেষ হয়ে গেল, তখন পিতা ভরদ্বাজ তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন প্রিয় শিষ্য অগ্নিবেশের আশ্রমে। পঞ্চালরাজ পৃষতের অভীষ্ট অনুসারে দ্রুপদেরও স্থান হল একই গুরুর কাছে। ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করার জন্য দ্রোণের মতো তিনিও হলেন আশ্রমের দ্বিতীয় আবাসিক—ইম্বস্ত্রহেতো-র্ন্যবসত্তস্মিন্নেব গুরৌ প্রভুঃ।

এ কথা ভাবার কোনও কারণ নেই যে, রাজপুত্র বলে গুরুগৃহে দ্রুপদের কিছু কম পরিশ্রম ছিল। সেকালের ব্রাহ্মণ গুরুরা এখনকার মতো ছিলেন না। রাজশক্তির কাছে আপন শিক্ষার গৌরব বিকিয়ে দিয়ে এখনকার শিক্ষকেরা যেমন সরকার এবং তার অনুগামী দলনেতাদের পদলেহন করেন, তখনকার দিনের শিক্ষায় এত অগৌরব ছিল না। রাজা হও বা রাজপুত্র, শিক্ষকের অনুগামী হতে হবে তাকেই। ফলে গুরুগৃহের যাগযজ্ঞ সমাধানের জন্য

শারীরিক যেসব খাটুনি আছে, তা দ্রোণকেও যেমন খাটতে হত, তেমনই খাটতে হত দ্রুপদকেও। এই পরিশ্রমের ওপরে ছিল অস্ত্রশিক্ষার পরিশ্রম এবং তাও এক বছর দু বছর নয়, বহু বছর ধরে।

ছাত্রাবস্থায় পিতামাতার ঘর ছেড়ে গুরুর আবাসে যারা থাকে, সেই আবাসিক ছাত্রদের মধ্যে এমনই এক বন্ধুত্ব হয়, যে বন্ধুত্ব সাধারণভাবে অকল্পনীয়। সমস্ত দিনের বিদ্যাশিক্ষার তন্ময়তা এবং পরিশ্রম যখন শেষ হয়, তখন ক্লান্ত অবসরে একজন আবাসিক সতীর্থ যে কতখানি বন্ধু হয়ে উঠতে পারে, একমাত্র আবাসিক ছাত্রেরই সেটা উপলব্ধিগম্য। নিজের জীবনের সুখ, দুঃখ, বঞ্চনা, প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি, পূর্বলব্ধ কষ্ট এবং ভবিষ্যতের ঈপ্সিত—এই সব কিছুই কোনও না কোনও সময় একজন আবাসিক ছাত্র তার সমানহৃদয় সতীর্থের কাছে বলে ফেলে। বলে ফেলে অন্তরঙ্গ মুহূর্তে, অবসরে, একাকিত্বের যন্ত্রণায় অথবা যন্ত্রণাবিলাসে।

ব্রাহ্মণ দ্রোণের সঙ্গেও পাঞ্চাল রাজপুত্র দ্রুপদের এমনই একটা বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। একই গুরুগৃহে থেকে একই শিক্ষা লাভ করতে গিয়ে যখন পরিশ্রম করতে হয়, হয়তো তখন উচ্চ নীচ ভেদ থাকে না, ধনী-দরিদ্রেরও ভেদ থাকে না, কিন্তু ভেদ যেটুকু থাকে সেটাকে ব্যাখ্যা করাও খুব কঠিন। আমি শিক্ষাক্ষেত্রে সতীর্থতার মধ্যে এমনটি দেখেছি যে, একজন মেধাবী অথচ দরিত্র ছাত্রের সঙ্গে যদি একজন অপেক্ষাকৃত অল্পমেধা অথচ ধনী ছাত্রের অন্তরঙ্গতা ঘটে, সেক্ষেত্রে পারস্পরিকভাবেই অদ্ভুত এক অল্প বয়সের রোমান্টিকতা কাজ করতে থাকে। ধনী ছাত্রটি তীক্ষ্ণধী দরিদ্র ছাত্রটিকে যথাসম্ভব অর্থের স্বাচ্ছন্দ্য দেবার চেষ্টা করে—বন্ধুকে সে ভাল খাওয়ায়, বড় বড় জায়গায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করে এবং মাঝে মাঝে মহার্ঘ্য বস্তু উপহার দিয়ে তার দারিদ্র্যের গ্লানি মুছে দেবার চেষ্টা করে। অন্যদিকে তীক্ষ্ণধী দরিদ্র—সে যেহেতু আর কিছুই পারে না—সে তাই যতটা সম্ভব লেখাপড়ার সাহায্য করে ধনী বন্ধুকে কৃতজ্ঞতা পাশে বেঁধে রাখতে চায়।

একটা কথা অবশ্য জানিয়ে রাখা ভাল। ধনী দরিদ্রের এই প্রগাঢ় বন্ধুত্বের মধ্যে—বন্ধুত্বটা অসমান বলেই—একটা অন্তর্গূঢ় অহংবোধ কিন্তু থেকেই যায়। যে ধনী সে তার উপকার বিতরণ করে এক রকমের তুষ্টি লাভ করে। অন্যদিকে দরিদ্র তার দারিদ্র্যের অহংকার অথবা মেধার অহংকার নিয়ে তুষ্ট থাকে আরও একভাবে। প্রগাঢ় বন্ধুত্বের অন্তরালে, পারস্পরিক আদানপ্রদানের আবরণে ওই অহংবোধটুকু কিন্তু বাইরে থেকে ভাল করে বোঝাও যায় না, অন্তত বন্ধুরা সেভাবে বুঝতে পারে না সেই অহংবোধের প্রবহমানতা।

একেবারে অনুরূপ এই উদাহরণেই দ্রুপদ আর দ্রোণের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, সে কথা নিশ্চয়ই বলছি না। কিন্তু গুরুগৃহে থাকাকালীন সময়ে—হয়তো রাজপুত্র হওয়ার সুবিধে ছিল বলেই পার্ষত দ্রুপদ নানাভাবে সাহায্য করার চেষ্টা করতেন দ্রোণকে। দ্রোণ কীভাবে তাঁর কৃতজ্ঞতার পরিশোধ করতেন, সে কথা জানাননি মহাভারতের কবি, কিন্তু দ্রুপদের উপকার নিজ মুখেই পরে স্বীকার করেছেন দ্রোণ। এতে দ্রোণের বন্ধুত্ব এবং প্রিয়ত্ব হয়তো দ্রুপদের প্রতি গাঢ়তর হয়েছিল। তাঁর নিজের ভাষায়—স মে তত্র সখা চাসীদ্ উপকারী প্রিয়শ্চ মে।

ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মালে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেকালে যে দারিদ্র্য বরণ করতে হত, উত্তরাধিকার সূত্রে দ্রোণও যে সেই দারিদ্র্যের অধিকারী হবেন ভবিষ্যতে—সে কথা দ্রোণ জানতেন। হয়তো কোনও অবসরের একাকিত্বে দ্রোণ সে কথা প্রকাশও করে থাকবেন দ্রুপদের কাছে। সেই কবে বাল্যকালে পিতা ভরদ্বাজের আশ্রমে দ্রোণের সঙ্গে দেখা হয়েছিল দ্রুপদের। সে দিন থেকে একসঙ্গে খাওয়া শোওয়া, ওঠা বসা, এবং একত্রে অধ্যয়ন চলেছে নিরন্তর। এখন এই অগ্নিবেশ্যের অস্ত্র পাঠশালাতেও সেই সহাধ্যয়ন, সহভোজন এবং সহ অবসর যাপন চলছে। রাজপুত্র দ্রুপদ যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন সতীর্থ

ব্রাহ্মণবন্ধুর গুরুগৃহবাসের কষ্ট লাঘব করে দিতে। কখনও প্রিয় কথা বলে, কখনও বা দ্রোণের প্রিয় কর্ম সম্পাদন করে দ্রুপদ তাঁর বাল্যবন্ধুর কষ্টসাধ্য অস্ত্রশিক্ষার দিনগুলি কথঞ্চিৎ মধুর করে তুলতেন। সবচেয়ে বড় কথা, দ্রুপদের এই প্রিয়বাদিতা অথবা দ্রোণের অভীষ্ট বুঝে কাজ করার কথাটা দ্রুপদ নিজে বলেননি। তাঁর এই সমস্ত বন্ধুত্বের কথা দ্রোণ নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন ভীষ্মের কাছে। বড় আদর করে বলেছেন—তিনি আমার আবাল্য বন্ধু, প্রিয়বাদী প্রিয়ংকর সখা—স মে সখা সদা তত্র প্রিয়বাদী প্রিয়ঙ্করঃ।

আমরা বুঝি—এইরকমই কোনও প্রিয়ত্বের মুহূর্তে দ্রুপদ দ্রোণকে কথা দিয়েছিলেন। দ্রোণ দরিদ্র ব্রাহ্মণ, অথচ ব্রাহ্মণ্যের অহংকারও তাঁর ছিল না, কারণ ব্রাহ্মণের বৃত্তিকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন না নিশ্চয়ই। পিতার গৃহে দারিদ্র্য দেখে দেখে একদিকে যেমন তিনি ক্ষত্রিয়োচিত অস্ত্রশিক্ষায় মন দিয়েছিলেন, তেমনই তাঁর অর্থস্পৃহাও ছিল দুরন্ত। জীবনে ভাল থাকব, ভাল ভোগ করব—এই আকাঙ্ক্ষা হয়তো একদিক দিয়ে স্বাভাবিক, কিন্তু সে যুগের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ে এই আকাঙক্ষার কোনও নৈতিক সমর্থন ছিল না। ত্যাগ এবং বৈরাগ্যই যেহেতু ব্রাহ্মণ্যের ভিত্তি ছিল, সেই নিরিখে দ্রোণের এই অর্থৈণা ছিল বিপরীত। গুরুগৃহবাসের ক্লান্ত অবসরে ব্রাহ্মণগৃহের ওই চিরন্তন দারিদ্র্যের কথা দ্রোণ নিশ্চয়ই কোনও সময় ব্যক্ত করেছিলেন বন্ধু দ্রুপদের কাছে। হয়তো বলেছিলেন—না, ব্রাহ্মণের যা স্বধর্ম, সেই যজনযাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা অথবা দানপ্রতিগ্রহের সরল জীবন তিনি চান না। এই জীবনে সম্মান থাকতে পারে অনেক, কিন্তু মুগ্ধতা নেই। দ্রোণ নিশ্চয়ই জানিয়েছিলেন যে, তিনি চান সেই উজ্জ্বল সমৃদ্ধির জীবন, যেখানে অর্থ, মান, ভোগ, দাস, দাসী, হস্তী, অশ্ব, রথ তাঁর করতলগত হবে। হয়তো দ্রোণ সুব্যক্তভাবে এসব কথা বন্ধু দ্রুপদের কাছে বলেননি, কিন্তু একটি নিশ্চিন্ত জীবন এবং অর্থৈষণার কথা প্রকটভাবে না বললেও ব্রাহ্মণ্য জীবনের অনিশ্চয়তা এবং দারিদ্র্য-চেতনা প্রকাশের মাধ্যমেও বিপ্রতীপভাবে তা প্রকট করা যায়। দ্রোণ হয়তো তাই করেছিলেন বন্ধুত্বের অবসরে অব্যক্ত হাহাকারে।

উলটো দিকে সেই কথাই আরও প্রমাণ হয় বন্ধু দ্রুপদের কৈশোরগন্ধী প্রতিজ্ঞাবাক্য থেকে। দ্রুপদ বাল্যসখাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন—আমি আমার পিতার অত্যন্ত আদরের ছেলে—অহং প্রিয়তমঃ পুত্রঃ পিতু-র্দ্রোণ মহাত্মনঃ। তিনি যখন আমাকে তাঁর রাজ্যে অভিষিক্ত করবেন, সেদিন আমার রাজ্য আমার মতো তোমারও ভোগ্য হবে। এ আমি সত্য-প্রতিজ্ঞা করে বলছি, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো—তদ্‌ভোগ্যং ভবিতা রাজ্যং সখে সত্যেন তে শপে। 'সত্য' শব্দটি উচ্চারণ করে প্রতিজ্ঞা করার মধ্যে সেকালের দিনে কিছু আইনি তাৎপর্য ছিল। সেকালের দিনের আইনের বই বলতে বোঝাত ধর্মসূত্র এবং ধর্মশাস্ত্রগুলিকে। এই ধর্মশাস্ত্র এবং উকিলি ব্যবহারবিধির বই থেকে বেশ তথ্য দিয়েই বলা যেতে পারে যে, উপযুক্ত সাক্ষী প্রমাণ থাকলে প্রতিজ্ঞাত সত্যের ফয়সালার জন্য ধর্মাধিকরণের দ্বারস্থও হওয়া যেত। দ্রুপদ সেই সত্য উচ্চারণ করে বলেছেন—আমার রাজ্য তোমারও ভোগ্য হবে। তবে এই ভোগ্য বস্তুর সীমা কী হবে, সে সম্বন্ধে দ্রুপদ খুব অসচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না। হয়তো সেই জন্যই 'সত্য' উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই বলেছেন—আমি যা ভোগ করব বা উপভোগ করব, তা তোমারও ভোগ্য হবে, ভাই! আমার অর্থ, ধন, আমার সুখভোগ, সেসব তোমারও অধীন হবে—মম ভোগাশ্চ বিত্তঞ্চ ত্বদধীনং সুখানি চ।

ভোগ বলতে কী বোঝায়? টীকাকার বলেছেন—যা ভোগ করে মানুষ তাই ভোগ—হাতি, ঘোড়া, রথ ইত্যাদি রাজযোগ্য বস্তু। আর কী? বিত্ত। অর্থ। আর কী? রাজার উপভোগ্য সুখ। উত্তম ভোজন, শয়ন, আসন, দাস, দাসী ইত্যাদি। মনে রাখা দরকার, দ্রুপদ কিন্তু গলিতহৃদয়ে এমন প্রতিজ্ঞা কখনও করেননি যে, তিনি তাঁর রাজ্যের ভাগ দ্রোণকেও কিছুটা দিয়ে দেবেন। তিনি যা বলেছেন তার নির্গলিতার্থ এই যে, দ্রুপদের রাজযোগ্য ভোগসুখ দ্রোণও লাভ করবেন ভবিষ্যতে।

যাই হোক বন্ধুত্বের খাতিরে এই যে সব সান্ত্বনা এবং প্রতিজ্ঞা-বাক্য উচ্চারিত হয়েছে, তা হয়তো দুই সতীর্থের গুরুগৃহবাসের শেষ পর্বেই হয়ে থাকবে। কেননা এর পরেই দ্রোণ বলেছেন—এইকথা বলে দ্রুপদ অস্ত্রশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে পাঞ্চাল রাজধানীতে ফিরে গেছেন—এবমুক্তাথ বব্রাজ কৃতাস্ত্রো পূজিতো ময়া। অর্থাৎ দ্রুপদের প্রতিজ্ঞাবাক্য শুনে দ্রোণ তাঁকে কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছেন এবং দ্রুপদও ফিরে গেছেন রাজধানীতে। এ প্রসঙ্গে একটা কথা কিন্তু দ্রোণের জবানীতে অনুক্ত রয়ে গেল। সেটা আগ্নেয়াস্ত্র লাভের কথা। দ্রোণ এবং দ্রুপদ একইসঙ্গে অস্ত্রশিক্ষা শেষ করলেন বটে, কিন্তু মহর্ষি অগ্নিবেশের কাছ থেকে দ্রোণই শুধু আগ্নেয় অস্ত্র অথবা সেকালে চরমভাবে যাকে 'ব্রহ্মাস্ত্র' বলা হত, সেই ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করলেন। দ্রুপদ কিন্তু নয়। হয়তো পিতা ভরদ্বাজের কাছ থেকে অগ্নিবেশ্য স্বয়ং আগ্নেয় অস্ত্র লাভ করেছিলেন, সেই কৃতজ্ঞতাতেই পক্ষপাতগ্রস্ত হয়েছেন অগ্নিবেশ্য অথবা দ্রোণ দ্রুপদের চেয়ে অস্ত্রবিদ্যায় বেশি কৃতী ছিলেন সেইজন্য—যে কোনও কারণেই হোক, দ্রোণ তাঁর গুরুর কাছ থেকে অসাধারণ আগ্নেয়াস্ত্রের সন্ধান শেখার সুযোগ পেলেন, কিন্তু দ্রুপদ এই সুযোগ পেলেন না।

অবশ্য এই বাবদে দ্রুপদের কোনও দুঃখ ছিল বলেও মনে হয় না। ঈর্ষা তো নয়ই। কেননা এর যে কোনও একটা থাকলেই দ্রুপদ দ্রোণকে রাজসুখের আশা দিয়ে রাজধানীতে ফিরে যেতেন না। অন্তত গুরুর আশ্রম ছেড়ে যাবার অন্তিম মুহূর্তে দ্রুপদের বক্তব্যের মধ্যে যে দ্রোণের প্রতি তাঁর আন্তরিকতার অভাব ছিল না, সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। দ্রোণের কথা থেকেই তা বোঝা যায়, তাঁর মৌখিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন থেকেও তাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

গুরুগৃহে অস্ত্রচর্যার শেষ পুরস্কার হিসেবে দ্রোণ যে অস্ত্রটি আচার্য অগ্নিবেশ্যের কাছ থেকে পেলেন, তার নাম ব্রহ্মশির। এই ব্রহ্মশির মহর্ষি ভরদ্বাজের দেওয়া আগ্নেয়াস্ত্রের নামান্তর কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এটা মনে রাখা দরকার, মহর্ষি ভরদ্বাজ ছাড়াও অগ্নিবেশ্য অগস্ত্যেরও শিষ্য ছিলেন। হয়তো তাঁর কাছেই তিনি ব্রহ্মশির নামে অতি ভয়ংকর এবং লোকক্ষয়কারী ওই অস্ত্রটি পেয়েছিলেন। দ্রোণের অস্ত্রচর্চা এবং তাঁর অস্ত্রসাধনায় তুষ্ট হয়ে অগ্নিবেশ্য তাঁর আপন গুরুপরম্পরায় প্রাপ্ত অস্ত্রটি দ্রোণের হাতে তুলে দিলেন। এ অস্ত্র তাঁর হাতেই তুলে দেওয়া যায়, যিনি পরবর্তী প্রজন্মের গুরু হবার উপযুক্ত। অস্ত্র শিক্ষার সঙ্গে অস্ত্র প্রয়োগের সংযম যাঁর সম্পূর্ণ অধিগত তাঁকেই এই ব্রহ্মশির দান করা যায়। দ্রোণের সেই সংযম বিনয় থাকা সত্ত্বেও অস্ত্রচালনার অসম্ভব ক্ষমতা যদি কখনও তাঁকে বিচলিত করে, সেই ভয়ংকর মুহূর্তের কথা ভেবেই দ্রোণের হাতে ওই চরমাস্ত্রের সন্ধান জানানোর সময় অগ্নিবেশ্য তাঁকে বলেছিলেন—বৎস দ্রোণ! তুমি এই অস্ত্র যেন কখনও সাধারণ মানুষের ওপর অথবা অল্পশক্তি লোকের ওপর প্রয়োগ কোরো না—ভারদ্বাজ বিমোক্তব্যম্ অল্পবীর্যেষ্বপি প্রভো।

অমানুষী অস্ত্র লাভ করে দ্রোণ ফিরে এলেন পিতা ভরদ্বাজের আশ্রমে এবং পাঞ্চাল রাজপুত্র ফিরে গেলেন পিতা পৃষতের রাজধানীতে। দুই বন্ধুর আশা আকাঙ্ক্ষা, প্রতিজ্ঞা-বিশ্বাসের সাক্ষী হয়ে রইল শুধু অস্ত্রচর্চার সেই পাঠশালাটি, গুরু অগ্নিবেশের বিদ্যায়তন।

দ্রোণ যে এতকাল সুখে দুঃখে, ভাল মন্দে পঞ্চালেই বাস করেছেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ভরদ্বাজের আশ্রম পঞ্চালের রাজধানী থেকে খুব বেশি দূরে নিশ্চয়ই ছিল না; তার প্রমাণ হয় নিত্যদিন ওই আশ্রমে বালক দ্রুপদের যাতায়াত থেকে—স নিত্যমাশ্রমং গত্বা দ্রোণেন সহ পার্যতঃ। আচার্য অগ্নিবেশের পাঠশালাও পঞ্চাল রাজ্যের সীমার মধ্যেই ছিল বলে মনে হয়। সেটা অন্য দেশভুক্ত হলে তার উল্লেখ করতে ভুলে যেতেন না মহাভারতের কবি। দ্রোণ পঞ্চাল রাজ্যের জাতক, পঞ্চাল রাজ্যেই বাল্য কৈশোর যাপন করে এখন যৌবনসন্ধিতে উপনীত দ্রোণ। কিন্তু পঞ্চাল রাজ্যের ভাবী রাজার কাছ থেকে নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশ্বাস পেয়ে দ্রোণ যখন পিতার আশ্রমে ফিরে এলেন, তখন দেখলেন—পূর্ববৎ স্বাহা-স্বধা-বষট্কার-ধ্বনিতে সেই একইরকম চলছে আশ্রমের ক্রিয়াকর্ম। অসাধারণ অস্ত্রশিক্ষায় শিক্ষিত দ্রোণের কাছে এই যজ্ঞক্রিয়া এবং ব্রাহ্মণের ওঙ্কার-ঘোষ ভাল লাগল না মন্দ লাগল—সে বিষয়ে কোনও স্পষ্ট মন্তব্য নেই মহাভারতে। তবে আশ্রমে ফেরামাত্রই সেকালের অন্যান্য বেবুঝ পিতার মতো ভরদ্বাজ তাঁর প্রিয় পুত্র দ্রোণকে যে বিষয়ে উত্যক্ত করে তুললেন—তা হল বিবাহ।

দ্রোণ যে আপন বিবাহের ইতিকর্তব্যতা নিয়ে খুব বেশি ভেবেছিলেন, তা নয়, কিন্তু পিতা ভরদ্বাজ তাঁকে গৃহী হওয়ার জন্য যথেষ্ট অনুরোধ উপরোধ করেছিলেন, সে কথা বেশ বোঝা যায়। হয়তো ভরদ্বাজ বৃদ্ধ হয়েছিলেন এবং পুত্রের যৌবনলগ্নে পুত্রবধূর মুখ দেখে যেতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ভাগ্য বিপরীত, ভরদ্বাজের জীবৎকালে দ্রোণের বিবাহ-সংঘটনা হয়ে ওঠেনি। এমনও হতে পারে—দ্রোণ ভেবেছিলেন—পঞ্চাল রাজ্যের রাজসুখ খানিকটা করতলগত হলে তিনি বিবাহ করবেন। কেননা, তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, বন্ধু দ্রুপদের কাছ থেকে পাওয়া রাজসুখের আশ্বাস তিনি মনে মনে সর্বদা লালন করছিলেন—তস্য বাক্যমহং নিত্যং মনসা ধারয়ংস্তদা। কিন্তু মুশকিল ছিল, বন্ধু দ্রুপদ তখনও পঞ্চাল রাজ্যের রাজা হননি। তৎকালীন পঞ্চালরাজ পৃষত যখন মারা গেলেন, ঠিক তার পর পরই দ্রোণ-পিতা ভরদ্বাজেরও দেহান্ত হল।

হঠাৎ করে পিতার মৃত্যু ঘটে যাওয়ায় দ্রোণের মানসিক প্রস্তুতি এমন ছিল না যে, তিনি তখনই দ্রুপদের কাছে গিয়ে রাজসুখের অধিকার চাইবেন। বরঞ্চ পিতা যে তাঁকে বার বার বিবাহের ব্যাপারে উপরোধ করে গেছেন, সেই উপরোধ অনুরোধের কথাগুলিই তাঁকে পীড়িত করতে লাগল। অন্যদিকে পিতৃবিয়োগের ফলে দ্রোণের হৃদয়ে নেমে এল নিদারুণ শূন্যতা। জননীকে তিনি কোনওদিন দেখেননি, প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে পিতাই তাঁর সব কিছু। অতএব সাময়িকভাবে দ্রোণের মনে গভীর বৈরাগ্যের সৃষ্টি হল। অতি নিকট জনের মৃত্যু অনেক সময়েই এই বৈরাগ্যদীর্ণ হৃদয়ে নতুনভাবে আস্বাদনীয় হয়ে ওঠে। হয়তো এই কারণেই দ্রোণ তপস্যায় মন দিলেন। বৈরাগ্য সাধনের পক্ষে তাঁর পিতার আশ্রমের পরিবেশ এমনিতেই অনুকূল ছিল। অতএব পিতার মৃত্যুর পর সেই আশ্রমে বসেই দ্রোণ যোগ, ধ্যান, তপস্যায় চঞ্চল মন স্থির করার চেষ্টা করলেন—তত্রৈব চ বসন্ দ্রোণস্তপস্তেপে মহাতপাঃ।

তপস্যার ঐকান্তিকতায় অবশ্যই একসময় তাঁর মনের মালিন্য, অবসাদ এবং অনিষ্ট ভাবনাও যত কিছু ছিল, সব দূর হয় গেল বটে,—তপসা দগ্ধকিল্বিষঃ—কিন্তু মনের শূন্যতাটুকু গেল কি? যায়নি বলেই হয়তো বিবাহ করার জন্য পিতার সেই সানুনয় উপরোধ বাক্য আবারও তাঁকে পীড়িত করতে লাগল। ধন মান সম্পত্তির উচ্চচূড় অভিলাষ, যা তাঁকে এতদিন অস্ত্রশিক্ষার নিরলস সাধনায় প্ররোচিত করেছিল, তার ফলপ্রাপ্তির জন্য কর্মক্ষেত্রে নিজেকে প্রয়োগ করার প্রয়োজন ছিল খুব তাড়াতাড়ি। দ্রুপদ যখন পৃষতের মৃত্যুর পর পঞ্চালে রাজা হলেন, তখনই যদি দ্রোণ পঞ্চালে গিয়ে পৌঁছোতেন, তা হলে হয়তো নবাভিষিক্ত বন্ধু-রাজার পূর্বাশ্বাস কাজ করতেও পারত। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য তাঁর নিজের

পিতাও প্রায় সেই সময়ই স্বর্গবাসী হলেন—ভরদ্বাজোপি ভগবান্ আরুরোহ দিবং তদা। পিতার মৃত্যু, মানসিক অবসাদ এবং তার নিরসনের জন্য যোগ, ধ্যান, তপস্যা—এই সব কিছুতেই বড় দেরি হয়ে গেল দ্রুপদের কাছে যেতে। এখন আবার তিনি ওই একই বিলম্ব সূত্রে বিবাহ পর্বটাও সেরে নিতে চাইছেন। কার্য এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে খুব দেরি হয়ে গেলে আরও দেরি করার একটা অবসাদ পরম্পরা তৈরি হতে থাকে, দ্রোণেরও তাই হল।

পিতার কথায় এবং হয়তো পিতৃঋণ পরিশোধের জন্যই—ততঃ পিতৃনিযুক্তাত্মা পুত্রলোভাদ্ মহাযশাঃ—দ্রোণ বিবাহ করলেন। অবশ্য বিবাহের পাত্রীটি যে তাঁর খুব পছন্দ হল, তা বোধহয় নয়। ইতিহাস পুরাণে বিবাহপূর্বা পাত্রীর যে রূপ বর্ণনা থাকে, তা তো এখানে নেইই, বরঞ্চ স্বানুরূপ পাত্রী লাভের ব্যাপারে সমস্ত ইচ্ছা পূরণের অতি প্রকাশের মধ্যেই তাঁর সামান্য হাহাকারটুকুও লুকিয়ে আছে। দ্রোণ বলেছেন—আমি যাঁকে বিয়ে করলাম, তাঁর মাথায় চুল ছিল বড়ই কম, কিন্তু তিনি খুব জ্ঞানী এবং যথেষ্ট ব্রতচারপরায়ণা—নাতিকেশীং মহাপ্রাজ্ঞাম্ উপযেমে মহাব্রতাম্।

মহাকাব্যের যুগে ব্রাহ্মণবংশীয় মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র সাধারণ অবস্থায় বিবাহের জন্য সুন্দরী পাত্রী খুঁজে পাচ্ছিলেন না অথবা তিনি জ্ঞানী পণ্ডিতা রমণীকে বিবাহ করতে চাইছিলেন, এটা খুব বিশ্বাসযোগ্য নয়। মেয়েটির মাথায় একদম চুল ছিল না, কিন্তু তিনি খুব জ্ঞানী ছিলেন—এ কথাটির মধ্যেও অদ্ভুত এক বিপ্রতীপ সান্ত্বনা আছে। বস্তুত, চুল ছিল না—এই সামান্য শব্দটির তাৎপর্য শুধু কেশহীনতার মধ্যেই নয়; কেশহীনতা এখানে উপলক্ষণ মাত্র, আসলে বিবাহেচ্ছু দ্রোণের পাত্রীটি সুন্দরী ছিলেন না। কথাটা পরিষ্কার করে বোঝা যায় দ্রোণের অন্যান্য মন্তব্য থেকেও। বার বার তিনি বলছেন—বিয়ে করলে একটি ছেলে হবে আমার, সেই লোভেই আমি বিয়ে করেছি—সোহং পিতুর্নিয়োগেন পুত্রলোভাদ্ যশস্বিনীম্। একই জায়গায় স্ত্রীর অসৌন্দর্যের সান্ত্বনা হিসেবেই তিনি যে তাঁর মহাপ্রাজ্ঞতা, কিংবা ব্রতনিয়ম আচার পরায়ণতার কথা বলেছেন, তা বুঝতে আমাদের অসুবিধে হয় না। দ্রোণ আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। বলেছেন—আমার অগ্নিহোত্র ইত্যাদি নিত্য বৈদিক কর্ম এবং অন্যান্য যজ্ঞক্রিয়ায় তিনি যেমন আমার সহায়তা করেছেন, তেমনই আমার ইন্দ্রিয়সংযম কার্যেও তিনি আমার সহায়তা করেছেন সতত—অগ্নিহোত্রে চ সত্রে চ দমে চ সততং রতাম্।

ঠিক এইখানেই আমাদের কলিদুষ্ট মানসিকতায় একখানি জিজ্ঞাসা জাগে। আমাদের সময়ে এক বিদুষী রমণী পড়তেন আমাদের সঙ্গে। দুর্ভাগ্যবশত তিনি দেখতে অসুন্দর অথবা বলা যায়, কুৎসিতই ছিলেন। পড়াশুনোর ক্ষেত্রেও খানিকটা আত্মম্ভরী ছিলেন তিনি। একদা এক বালক এ হেন মহিলা সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করায় অন্য একটি বালক তাকে বলেছিল—থ্যাৎ! ও তো 'ব্রহ্মচর্যের মেশিন'। তুই সরে পড়। অদ্ভুত কথা শুনে হতভম্ব বালক ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল—এর মানে কী? অন্যতর বলল—বুঝলি না? যাকে দেখামাত্রই ব্রহ্মচর্যের উদয় হয়, ইন্দ্রিয় আপনিই সংযত হয়ে ওঠে, সেই মহিলাই হলেন 'ব্রহ্মচর্যের মেশিন'। সেই বিদুষী রমণী এবং সেই হতভম্ব বালকের আর কোনও পরিণতি সম্বন্ধে আমি অবহিত নই। তবে এই কথাটাই এখানে সবচেয়ে জরুরি যে আপন স্ত্রীর প্রজ্ঞা এবং ব্রতনিয়মের গৌরবের চেয়েও দ্রোণের ইন্দ্রিয়সংযমে তাঁর সহায়তার সংবাদ বিবাহ নামক অনুষ্ঠানের গৌণ তাৎপর্যও বহন করে না, দাম্পত্য জীবনের প্রাথমিক মুগ্ধতার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। এরওপরে আছে সেই সান্ত্বনাবাক্য—বাবার কথায় এবং পুত্রলাভের ভাবনায় ভাবিত হয়ে আমি বিবাহ করেছি।

দ্রোণের সামগ্রিক বিবাহভাবনা থেকে বোঝা যায় যে, বিবাহের বিষয়ে তিনি খুব গুরুত্ব দিয়ে ভাবেননি, আর ভাবেননি বলেই বিবাহের মাধ্যমে ধন মান আভিজাত্যের আকাঙ্ক্ষাও

তিনি করেননি। যাঁর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হল, সেই গৌতমকন্যা কৃপীর জন্মগৌরব তথা লালিত পালিত হওয়ার আভিজাত্যও কিছু নেই। কৃপাচার্য এবং কৃপী এই দুই যমজ ভাইবোন গৌতমবংশীয় ঋষি শরদ্বানের ঔরসে জন্মেছিলেন পিতার সাময়িক রতিতৃপ্তির বিকারে, অনেকটা প্রায় দ্রোণের মতোই। কিন্তু পার্থক্য ছিল এই যে, দ্রোণের পিতা ভরদ্বাজ জননীর পরিত্যক্ত শিশু দ্রোণকে নিজে মানুষ করেছিলেন, কিন্তু কৃপ এবং কৃপী জনক এবং জননী উভয়েরই পরিত্যক্ত। হস্তিনাপুরের মহারাজ শান্তনু মৃগয়া করতে গিয়ে পরিত্যক্ত ওইদুটি শিশুকে আপন রাজধানীতে নিয়ে এসে মানুষ করেন। তিনি কৃপা করে এঁদের লালন করেছিলেন বলেই তাঁদের নাম কৃপ এবং কৃপী। পিতামাতা ছাড়া অন্য এক ব্যক্তির কৃপা-করুণা যাঁদের নামের মধ্যেই সংবৃত, তাঁদেরই একজনকে বিবাহ করলেন দ্রোণ।

এই বিবাহ-সংঘটনার মধ্যে আভিজাত্য বা অন্য কোনও কৌলীন্য না থাকলেও অন্যতর এক রহস্য অবশ্যই আছে। প্রথম কথা, কৃপ এবং কৃপীকে আমরা পঞ্চাল রাজ্যের জাতকজাতিকা বলে সন্দেহ করি, যাঁরা দৈবক্রমে হস্তিনাপুরের কুরুবংশীয় শান্তনুর লালন পালন লাভ করেছিলেন বলে কুরুবংশীয়দের কাছে জন্মগতভাবেই ঋণী। দ্বিতীয়ত লক্ষণীয়, কৃপ-কৃপীর পিতা শরদ্বান, ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও মহাভারতের কবির জবানীতে ব্রাহ্মণোচিত বেদ অধ্যয়নে তাঁর কোনও রুচি ছিল না—ন তস্য বেদাধ্যয়নে তথা বুদ্ধিরজায়ত। যে বিষয়ে শরদ্বানের রুচি ছিল, তা হল ক্ষত্রিয়ের বিদ্যা ধনুর্বেদ—যথাস্য বুদ্ধিরভবদ্ ধনুর্বেদে পরন্তপ।

ব্রাহ্মণ বংশে জন্মে যাঁরা বেদবিদ্যা ভুলে ধনুর্বেদ চর্চা করেছিলেন, তেমন ব্রাহ্মণরা যে ব্রাহ্মণ সমাজে খুব সুনামের অধিকারী হতেন না সেকালে, সে কথা ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সহজেই প্রমাণ করা যায়। ঠিক এইভাবে দেখলে—দ্রোণ অথবা কৃপ-কৃপীর সামাজিক মর্যাদা ছিল একইরকম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নিজের স্বধর্ম এবং বৃত্তি ত্যাগের কারণেই উপযুক্ত ব্রাহ্মণ ঘরের কোনও কন্যাকে দ্রোণ বিবাহ করতে পারেননি। তাঁকে বিবাহ করতে হয়েছে নিজের পালটি ঘরে, যিনি ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও বেদপাঠে রুচি দেখাননি, রুচি দেখিয়েছেন ধনুর্বেদে। হয়তো এই সমস্যার জন্যই কুৎসিতা অল্পকেশিনী শারদ্বতী কৃপীকে বিবাহ করা ছাড়া দ্রোণের কোনও গত্যন্তর ছিল না।

যাই হোক, দ্রোণের নিজের ভাষা ব্যবহার থেকেই বুঝতে পারি, রমণীর সৌন্দর্য মাধুর্য নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা ছিল না। বিবাহের অভীষ্ট ফল হিসেবে তিনি একটি পুত্র চেয়েছিলেন, শারদ্বতী কৃপী সেই অভীষ্ট পুত্র প্রসব করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সেদিক দিয়ে দ্রোণের কোনও অভিযোগ ছিল না। পুনশ্চ স্বামীর যত্নসাধনে অথবা তাঁর নিত্যকর্মে হোম যজ্ঞের সহায়তায় কৃপী যে দ্রোণের সহধর্মচারিণী ছিলেন সে কথা বার বার সগৌরবে দ্রোণের মুখেই ঘোষিত হয়েছে।

দ্রোণের পুত্রের নাম অশ্বত্থামা। তিনি জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম কান্নাটি যেমন করে কেঁদেছিলেন, তার সঙ্গে নাকি অশ্বের হ্রেষাধ্বনির একমাত্র তুলনা হয়। একটি শিশুর কান্নার সেই সামর্থ্য সাধারণত থাকে না, যাতে অশ্বধ্বনির সঙ্গে তার তুলনা চলে। হয়তো দ্রোণপুত্রের প্রথম ক্রন্দনধ্বনি অন্য শিশুর তুলনায় অনেক জোরালো ছিল এবং এই জোরের সংস্কৃত প্রতিশব্দ হল 'স্থাম'। 'স্থাম' শব্দটির আদ্যবর্ণ 'স'-কার ব্যাকরণের নিয়মে ত' কার হয়ে যায়। তাই দ্রোণের ছেলের নাম হল অশ্বত্থামা। অর্থাৎ জন্মের সময়েই অশ্বের হ্রেষার মতো শব্দ করার সামর্থ্য দেখিয়েছিলেন তিনি—অশ্বস্যেবাস্য যৎ স্থাম নদতঃ প্রদিশো গতম্।

অশ্বত্থামাকে লাভ করে দ্রোণ অনন্ত বাৎসল্যের আস্বাদ পেলেন। পুত্রকে নিয়ে তাঁর আনন্দের অন্ত ছিল না। অল্প বয়সেই ছেলেটির শরীরস্বাস্থ্যও যেমন সুন্দর হয়ে উঠল, তেমনই প্রকাশ পেতে লাগল তাঁর তেজ। এই বয়সে সুগঠিতভাবে বেড়ে ওঠার জন্য তাঁর

দরকার ছিল উপযুক্ত খাদ্য এবং যথাযথ লালন। লালনের ব্যাপারে দ্রোণের কোনও ত্রুটি ছিল না। শুধু পুত্রলাভের আকাঙক্ষাতেই যিনি বিবাহ করেছিলেন, সেই ব্যক্তি নিজের মতোই এক বীর পুত্র লাভ করলে তাঁর বৎসল হৃদয় যে কতটা পূর্ণ হবে তা বুঝতে পারি। তিনি নিজেই বলেছেন—পুত্র লাভ করে আমি ততটাই আনন্দ লাভ করেছিলাম, যতটা আনন্দ পেয়েছিলেন আমার বাবা আমাকে লাভ করে—পুত্রেণ তেন প্রীতো'হং ভরদ্বাজো যথা ময়া।

পরম অনুগামিনী স্ত্রী শারদ্বতী কৃপী আর হৃদয়-আনন্দন পুত্র অশ্বত্থামাকে নিয়ে দ্রোণের যে সংসার রচিত হয়েছিল, তাতে অর্থাভাব এমন বড় হয়ে ওঠার কথা ছিল না, যা কষ্টকর, অথবা লজ্জাকর হয়ে ওঠে। কথা ছিল না, কারণ দ্রোণ যদি পৈতৃক বৃত্তি ত্যাগ না করে যজনযাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনায় মন দিতেন, তা হলে এখানে ওখানে যাগযজ্ঞ করে দক্ষিণায় পুষ্ট হয়ে তাঁর দিন চলে যেত। ভালভাবে না চললেও চলে যেত। অগ্নিবেশের অস্ত্র পাঠশালা থেকে ফিরে এসে তিনি যে সাময়িকভাবে সে চেষ্টা করেননি, তাও মনে হয় না। কারণ তাঁকে আমরা পিতার মৃত্যুর পর ব্রতনিয়ম তপশ্চর্যায় দিন কাটাতে দেখেছি। কিন্তু এইভাবে চললেও যজ্ঞ-দানের ক্ষেত্রে যাজন করার জন্য তাঁর যে কোনও যজমান তৈরি হয়নি, তা বেশ বোঝা যায়। পুত্র লাভের পর তাঁর অর্থকৃচ্ছ্রতা বাড়তে থাকে। ফলে ব্রাহ্মণের বৃত্তিতে অর্থ সংঘটনার কথা সম্পূর্ণ মন থেকে দূর করে দিয়ে অন্তত যা তিনি ভাল করে শিখেছেন সেই অস্ত্রবিদ্যায় কোনও অর্থলাভ ঘটে কি না, সেই চেষ্টায় ব্রতী হলেন দ্রোণ। পূর্বশিক্ষিত ধনুর্বেদ তিনি আরও ভাল করে অভ্যাস করতে লাগলেন—তত্রৈব চ বসন্ দ্রোণো ধনুর্বেদপরো' ভবৎ।

আচ্ছা, কী পেতেন সেকালের ব্রাহ্মণরা? যজনযাজন করে কী দান দক্ষিণা পেতেন তাঁরা। আমাদের মনুমহারাজ খুব চাইতেন যাতে সমাজে ব্রাহ্মণদের কোনও আর্থিক কষ্ট না থাকে। অধ্যয়ন অধ্যাপনা করে যাঁরা দিন কাটাবেন, তাঁদের যাতে অন্নকষ্ট না হয়, তার জন্য তিনি চাপ সৃষ্টি করেছেন রাষ্ট্রশাসক রাজার ওপর। তিনি বলেছেন—রাজারা যেন বছরের নানান সময় অনেক অনেক যাগযজ্ঞ করেন—যজেত রাজা ক্রতুভিঃ—যাতে করে ব্রাহ্মণরা ভাল ভাল দক্ষিণা পান। এ হল একেকে দিয়ে অপরকে রক্ষা করার চেষ্টা; শাসক সম্প্রদায়কে দিয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়কে রক্ষা করার চেষ্টা। তবে মনুমহারাজ এত চেষ্টা করলেও কজন রাজা আর বাজপেয় অশ্বমেধের মতো বড় বড় যজ্ঞ করতে পারতেন। তবে সাধারণ যাগযজ্ঞের প্রক্রিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় অবশ্যই চলমান ছিল এবং ব্রাহ্মণরাও দান দক্ষিণা পেতেন মন্দ নয়। তবে এই দান দক্ষিণার হিসেবটা যদি ভারতবর্ষের সামগ্রিক ব্রাহ্মণ সমাজের নিরিখে করা যায়, তবে কার কতটুকু দক্ষিণা মিলত তা আন্দাজ করা যায়। অন্তত ব্রাহ্মণের বৃত্তি যে খুব লাভজনক ছিল না, সেটা বেশ বোঝা যায়।

বস্তুত জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্রাহ্মণকে পরিশ্রম যত করতে হত, দান দক্ষিণা সেই অনুপাতে মিলত না। দু-চারজনে যাঁরা রাজার মন্ত্রী-অমাত্য হতেন তাঁদের কথা নিশ্চয়ই আলাদা, কিন্তু বেশিরভাগ ঋষি মুনির অর্থাভাব কেমন ছিল, তা সেই বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটিমাত্র বক্তব্য থেকেই প্রমাণ করা যায়। সেই যেখানে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার বিশাল তর্কসভায় সমস্ত তাত্ত্বিকতা শিকেয় তুলে রেখে যাজ্ঞবল্ক্য যখন বলেছিলেন—আপাতত আমার প্রয়োজন এই গোরুগুলি—তখনই বোঝা যায় ব্রহ্মানুসন্ধানের মহান তত্ত্বের সঙ্গে জীবিকার জন্য ব্রাহ্মণের হাহাকারও কিছু ছিল। ব্রাহ্মণের প্রাপ্য সাধারণ দক্ষিণা বলতে ভূমি-হিরণ্যের দান সার্বত্রিক ছিল না, সাধারণ যজ্ঞিবাড়িতে একখানি পয়স্বিনী গাভী মেলাও অত সহজসাধ্য ছিল না। বিশেষত সে বামুন যদি বৃত্তিত্যাগী ব্রাহ্মণব্রুব হয়, তবে অন্যের দিক থেকে স্বতঃস্ফূর্ত দান পাওয়া তো দূরের কথা, চেষ্টা করেও একটি দুগ্ধবতী গাভী মিলত না।

দ্রোণের অবস্থা ছিল খুবই করুণ। তাঁর সংসার বড় হয়েছে, সেটা বড় কথা নয়। শারদ্বতী কৃপীর রূপ ছিল না বটে, কিন্তু তাঁর কোনও লোভও ছিল না। কিন্তু সংসারে যে শিশুপুত্রটি

বড় হচ্ছে, তার শুধু জীবন রক্ষার জন্যই যে একটু দুধের প্রয়োজন—সেই প্রয়োজনটা দ্রোণকে বড় পীড়িত করছিল। দ্রোণ যেখানে থাকতেন, সেখানে তাঁর পাড়ায় ধনীলোক কেউ ছিল না, এটা ভাবার কোনও কারণ নেই। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা প্রতিদিন দেখতেন—বড়লোকের ঘরের ছেলেরা দুধ খায়—গোক্ষীরং পিবতো দৃষ্টা ধনিনস্তত্র পুত্রকান্। প্রতিদিনের এই দেখা থেকেই বালক অশ্বত্থামার মনে কষ্ট জমা হতে থাকে। একদিন তিনি পিতামাতার কাছে দুধ খাবার বায়না আরম্ভ করলেন। স্বাভাবিকভাবেই দুধ জুটল না এবং বালক অশ্বত্থামা না-পাওয়া দুধের জন্যই কেঁদে আকুল হলেন। এই ঘটনা দ্রোণের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করল। মানসিক যন্ত্রণা তাঁকে অধীর করে তুলল—অশ্বত্থামা'রুদদ্‌বাল-স্তন্মে সম্মোহয়দ্দিশঃ।

তখনও পর্যন্ত দ্রোণ ভাবছেন—তিনি ব্রাহ্মণের ছেলে, অন্তত একখানি দুগ্ধবতী গাভী জোটানো তাঁর পক্ষে কঠিন হবে না কিছু। বিশেষত তখনও তিনি ব্রাহ্মণের বৃত্তি সম্পূর্ণ ত্যাগ করেননি। তখনও তিনি ধনুর্বেদের পরম আশ্রয়ে কোনও রাজার অধীনে অস্ত্র-জীবিকা গ্রহণ করেননি। তখনও একবার তাঁর শাস্ত্রের কথা মনে আছে। মনে আছে, শাস্ত্র বলে—ন স্নাতকো'বসীদেত—যজনযাজন আর অধ্যয়ন অধ্যাপনায় ব্যাপৃত ব্রাহ্মণ যেন নিন্দিত দান গ্রহণ করে ধর্মভ্রষ্ট না হন। অতএব দ্রোণ ব্রাহ্মণের বৃত্তি বজায় রেখেই কিছু দান লাভ করা যায় কি না সেই চেষ্টায় ছিলেন। বলা বাহুল্য, পঞ্চাল রাজ্যে সে চেষ্টা মোটেই সফল হল না। সে দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত তিনি অনেক ঘুরলেন—তং দেশং বহুশো ভ্রমন্। তখনও পর্যন্ত তাঁর মনে দৃঢ় সংকল্প জাগরূক—পিতৃ পিতামহের বৃত্তি ছাড়বেন না। কোথাও যাজন করেই হোক অথবা ধনী কোনও ব্রাহ্মণ যিনি দান করতে ইচ্ছুক, এমন ঘর থেকেই একটি দুগ্ধবতী গাভীর দান তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন—বিশুদ্ধমিচ্ছন্ গাঙ্গেয় ধর্মোপেতং প্রতিগ্রহম্। কিন্তু মিলল না সেই দান।

আসলে যে যুগের কথা এখানে হচ্ছে সে যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে পঞ্চাল রাজ্যের সুনাম ছিল। মহাভারতেরই অন্যত্র কর্ণপর্বে বিভিন্ন দেশের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করবার সময় বলা হয়েছে—পঞ্চাল দেশের মানুষেরা বেদবিহিত ব্রাহ্মণ্য ক্রিয়াকলাপের জন্যই বিখ্যাত, আর কুরুদেশের লোকেরা বোঝে ধর্ম, নীতি, নিয়ম, শৃঙ্খলা—ব্রাহ্মং পাঞ্চালাঃ কৌরবেয়াস্তু ধর্মম্। এই পরিষ্কার কথা থেকেই বোঝা যায়—কেন তেমন চেষ্টা করা সত্ত্বেও দ্রোণের ভাগ্যে একটি দুধেল গাই পর্যন্ত জোটেনি। পঞ্চাল রাজ্যে দ্রোণকে চিনতেন না এমন লোক ছিল না। মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র বলে কথা, বেদ জানা খাঁটি বামুন ঘরের জাতক তিনি। কিন্তু যে মানুষ অগ্নিবেশ্যর আশ্রমে অতকাল ধরে অস্ত্রবিদ্যা শিখলেন, তাঁকে ব্রাহ্মণ্য প্রধান পঞ্চালবাসীরা রাজবৃত্তিতেই বেশি আগ্রহী বলে মনে করেছিলেন। এই আগ্রহ তাঁদের কাছে লোভের পর্যায়বাচী। তাঁরা ভেবেছিলেন যে, মহর্ষি ভরদ্বাজের কাছে যে অস্ত্রকৌশল বিনোদনমাত্র ছিল, ভারদ্বাজ দ্রোণের কাছে তা জীবিকা হয়ে গেছে। 'ব্রাহ্ম' পাঞ্চালদের কাছে এটা অসহ্য।

সত্যি কথা বলতে কী, রাজসুখের প্রতি দ্রোণের লোভ কিছু ছিলই, নইলে নিজের জীবনকাহিনী অধিকতর সকরুণভাবে ব্যাখ্যা করে তিনি পাঞ্চাল দ্রুপদের সমব্যথা আদায় করতেন না। পঞ্চাল দেশে ভারদ্বাজ দ্রোণের সম্মান কিছু কম হত না। অন্য পাঁচটা ব্রাহ্মণ যেভাবে বাঁচতেন, সেইভাবেই তিনি বাঁচতে পারতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের এই অনাড়ম্বর উত্তেজনাহীন জীবন দ্রোণ পছন্দ করেননি। এবং করেননি বলেই ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রবিদ্যায় তিনি নিজেকে শিক্ষিত করেছিলেন চরমভাবে। পিতার মৃত্যু এবং বিবাহের অব্যবহিত পরেই হয়তো তিনি ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রবৃত্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেননি, কিন্তু নিজেকে যেভাবে তিনি প্রস্তুত করেছিলেন, তাতে ব্রাহ্মণ্য-প্রধান পঞ্চালে তাঁর ব্রাহ্মণোচিত দানলাভের প্রতিকূলতা ছিল। যার ফলে পঞ্চাল দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরেও তিনি একটি দুগ্ধবতী গাভী দান হিসেবে পেলেন না কারও কাছে—অন্তদন্তং পরিক্রম্য নাধ্যগচ্ছং পয়স্বিনীম্।

দ্রোণের মানসিক দুঃখ চরমে উঠল যখন দ্রোণ দেখলেন—অশ্বত্থামার খেলার বন্ধুরা একদিন পিটুলিগোলা ফেনায়মান সাদা জল দেখিয়ে অশ্বত্থামাকে দুধ খাবার লোভ দেখান। লুব্ধ অশ্বত্থামাও সেই পিটুলিগোলা জল খেয়ে ধেই ধেই করে নেচে উঠলেন দুধ খেয়েছি বলে—পীত্বা পিষ্টরসং বালঃ ক্ষীরং পীতং ময়াপি চ। দ্রোণ দেখলেন—সত্যিকারের দুগ্ধপায়ী বালকেরা সাবহাসে অশ্বত্থামাকে ঘিরে নাচছে আর তাদের সঙ্গে নাচছে অশ্বত্থামা, সরল, অবোধ, দুগ্ধভ্রান্তি-বিমোহিত—তং দৃষ্টা নৃত্যমানন্তু বালৈঃ পরিবৃতং সুতম্। ওই অত টুকু টুকু ছেলেরা সব! তারা উপহাসের সুরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল—তোর বাপ গরিব, টাকাপয়সা উপায় করার ক্ষমতা নেই তোর বাবার—দ্রোণং ধিগস্তু অধনিনং যো ধনং নাধিগচ্ছতি। দ্রোণের পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল। গৃহস্থ হয়েও যে পিতা পুত্রের জন্য সামান্য দুধ জোগাড় করতে পারে না, এতটা বয়স পর্যন্ত যাঁর অর্থসম্বল বলতে কিছু নেই এবং অর্থাভাবের জন্যই যাঁর ছেলেকে নিজের সামনেই উপহাসাস্পদ হতে হয়, সেই দ্রোণের বুদ্ধি ঠিক থাকবে কী করে? আর কতদিন তিনি ব্রাহ্মণের বৃত্তিতে শ্রদ্ধা রেখে বসে থাকবেন। তাঁর বুদ্ধি বিচলিত হল—বুদ্ধিরচ্যবৎ।

যিনি পূর্বেই ব্রাহ্মণের বৃত্তিতে শ্রদ্ধা হারিয়ে ক্ষত্রিয়ের বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন, তাঁকে যদি ব্রাহ্মণের বৃত্তিতে স্থিত রাখতে চাইতেন ব্রাহ্মণেরা, তা হলে পঞ্চাল দেশের ব্রাহ্মণদের দিক থেকে আরও কিছু সমব্যথার প্রয়োজন ছিল, ধৈর্যেরও প্রয়োজন ছিল। সেই সমব্যথা এবং ধৈর্য 'ব্রাহ্ম' পাঞ্চালেরা দেখাননি। বরঞ্চ দ্রোণের অস্ত্রশিক্ষার উন্মাদনাকে তাঁরা নিন্দা করেছেন এবং সেই নিন্দার সঙ্গে তাঁরা ত্যাগও করেছেন দ্রোণকে—অপি চাহং পুরা বিপ্রৈবর্জিতো গর্হিতো ভূশম্। শুধুমাত্র অস্ত্রশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য ব্রাহ্মণসমাজ যেভাবে দ্রোণকে বিসর্জন দিয়েছিলেন অথবা যেভাবে তাঁরা তাঁকে বৃত্তি ত্যাগের নিন্দাভাজন প্রতিপন্ন করে একটি গোরু পর্যন্ত পেতে দেননি, তাতে দ্রোণের দিক থেকে উলটো প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক। বৃত্তি ত্যাগের জন্য যাঁরা সমাজে নিন্দিত হতে থাকেন অথবা জাতিচ্যুতির জন্য যাঁদের নিজের সমাজেই বিব্রত হতে হয়, তাঁরা তখন পূর্ববৃত্তি এবং জাতির ওপরেই অভিমানী হয়ে ওঠেন। ব্রাহ্মণ্যের এই কঠিন শাস্তি দ্রোণকে ব্রাহ্মণ্যের ত্রুটি সন্ধানে প্ররোচিত করল।

দ্রোণের মনে হল—অন্নের জন্য যে ব্রাহ্মণকে পরের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়, অধ্যাপনা করে বা অন্যের যাজন করে যাঁদের দক্ষিণাভিমুখী হয়ে থাকতে হয়, অন্তত টাকাপয়সার জন্য তেমন জীবিকা তিনি গ্রহণ করবেন না। তেমন জীবিকা তাঁর কাছে পরের সেবাই বটে, পাপও বটে—পরোপসেবাং পাপিষ্ঠাং ন চ কুর্য্যাং ধনেচ্ছয়া। সত্যি কথা বলতে কী, শিক্ষা, জ্ঞান এবং ত্যাগ ধর্মের ওপর ব্রাহ্মণের জীবিকা নীতিগতভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও রাজা এবং অন্য ধনী ব্যক্তির দান গ্রহণ করে ব্রাহ্মণের জীবিকা চলত বলে এই দান প্রতিগ্রহের ব্যাপারটা অনেকের কাছেই দৃষ্টিকটু লাগত, যেমনটি দানের প্রতি আগ্রহ দেখালে আজও সেই ব্রাহ্মণের ব্যবহার আমাদের কাছে দৃষ্টিকটুই লাগে। মহাভারতের অন্যত্রও ত্যাগ বৈরাগ্য এবং জ্ঞানান্বেষণের নীতির দ্বারা প্রধানত চালিত ব্রাহ্মণ্যের পাশাপাশি বৈদিক ক্রিয়াকর্মে নিরত ব্রাহ্মণদের অর্থলাভের সূক্ষ্মাভিসন্ধিটুকু স্বয়ং অর্জুনের মুখেই বসানো আছে।

অর্জুন অর্থলাভের বাস্তব প্রয়োজনের কথা বৈরাগ্য প্রধান যুধিষ্ঠিরকে বোঝানোর সময় বলেছিলেন—ব্রাহ্মণেরা অধ্যাপনার উদ্দেশেই অধ্যয়ন করেন। কিন্তু অধ্যাপনার পিছনে আছে অর্থ উপার্জনের ইচ্ছা। লব্ধ অর্থ দিয়ে তাঁরা নিজেরা যাগযজ্ঞ করেন বটে, কিন্তু অন্যের যাজনাকর্ম করার সময় অর্থলাভ করাটাই তাঁদের মূল উদ্দেশের মধ্যেই পড়ে—যজনাধ্যাপন প্রতিগ্রহৈ ব্রাহ্মণো ধনমর্জয়েৎ। ব্রাহ্মণের যাগযজ্ঞ করা এবং দক্ষিণা গ্রহণের

প্রবৃত্তিকে আজকে যাঁরা আত্মভরণের অসদুপায় বলে চিহ্নিত করেন, তাঁরা অর্জুনের এই উক্তিতে খুশি হবেন বটে, তবে মনে রাখতে হবে—মহাভারতে অর্জুনের কথাই শেষ কথা নয়, মহাভারতের মূল অভিসন্ধিও সেটা নয়। অর্জুনকে এ কথা বলতে হয়েছে নিজের তাকালিক প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্য। একইভাবে দ্রোণও যে সাময়িকভাবে ব্রাহ্মণ বৃত্তির ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন, সে যেমন একদিকে ব্রাহ্মণ সমাজের অন্যায় প্রতিকূলতার জন্য, তেমনই তাঁর অন্তর্মূঢ় অর্থলাভের স্পৃহার জন্য। তিনি দরিদ্র ছিলেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণোচিত অভীষ্ট সত্ত্বগুণের অধিকারী ছিলেন না। আশ্চর্য ব্যাপার হল, যেখানে গুণকর্মের তারতম্যে চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হত, সেই সমাজের প্রতিভূরা বুঝলেন না যে, দ্রোণ রজোগুণের জাতক। রজোগুণই তাঁকে ক্ষত্রিয়োচিত অস্ত্রশিক্ষায় প্ররোচিত করেছে, রজোগুণই প্রচুর অর্থস্পৃহা জাগিয়েছে তাঁর মনে এবং রজোগুণই একসময় তাঁকে বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছে ব্রাহ্মণোচিত যাজন, অধ্যাপন এবং প্রতিগ্রহে। দ্রোণের অন্তর্জাত গুণকর্মের প্রতি ব্রাহ্মণ সমাজের সমব্যথা এবং সমান হৃদয়তা ছিল না বলেই দ্রোণকে তাঁরা সামাজিকভাবে বর্জন করেছিলেন, যদিও এই বর্জন ছিল অনুচিত এবং অনৈতিক।

অন্যদিকে বালক বয়স থেকেই যে মানুষ অস্ত্রবিদ্যা শিখে অর্থলাভে প্ররোচিত হয়েছিলেন, তিনি যে কোন দ্বিধায় অসহায়ের মতো ব্রাহ্মণের বৃত্তিতে ফিরে আসার চেষ্টা করছিলেন, তাও আমরা বুঝি না। মস্তকে লজ্জাবস্ত্র ঠিক রেখে যেমন নৃত্যচারিতা সম্ভব হয় না, তেমনই অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত হয়ে ব্রাহ্মণ্যের আবরণটুকু যথাসাধ্য বয়ে বেড়ানোর মধ্যেও তাঁর কোনও গৌরব ছিল না। যে আবরণ ভেদ করা তাঁর অনেক আগেই উচিত ছিল, সেই ঔচিত্য পালন না করার ফলে ব্রাহ্মণের বৃত্তির ন্যক্কারজনক দিকটায় তাঁর নজর গিয়ে পড়ল। তিনি তাঁর পিতৃ-পিতামহের বৃত্তির প্রতি বিষ উদ্‌গিরণ করলেন—আমি অর্থের জন্য এই পাপিষ্ঠা বৃত্তি পরের সেবায় নিযুক্ত হব না। অর্থাৎ তিনি ক্ষত্রিয়ের স্বাধীন বৃত্তি গ্রহণ করবেন। হায়! দ্রোণ বুঝলেন না—ভবিষ্যতে তাঁকে যা করতে হবে তারমধ্যেও পরোপসেবার ঘৃণ্যতাটুকু থাকবেই।

পূর্ববৃত্তির ওপর দ্রোণের বিষোদগার এবং ক্ষত্রিয়বৃত্তির প্রতি অনুরাগ ঘোষণার পিছনে আরও একটি আপাতিক কারণ আছে দ্রোণের পক্ষে। বিবাহোত্তর জীবনে গৃহে তখন অর্থকৃচ্ছ্রতা চলছিল হয়তো এবং অশ্বত্থামার দুগ্ধভাবিত পিষ্টরস সেবনের ঘটনাও তখন ঘটে গেছে হয়তো। দ্রোণ তখন হঠাৎই একদিন একটা খবর পেলেন ব্রাহ্মণ পরম্পরায়। খবর পেলেন—মহাবলী ক্ষত্রিয়ান্তক পরশুরাম তাঁর এতকালের সমস্ত সঞ্চিত ধনরত্ন ব্রাহ্মণদের দান করে বনে চলে যাবেন ব্রাহ্মণেভ্যস্তদা রাজন দিসন্তং বসু সর্বশঃ। একবার পরশুরামকে দেখার শখ অনেকদিন থেকেই থেকে থাকবে দ্রোণের। একদিকে নিজের সঙ্গে পরশুরামের জীবনধারারও মিল খুঁজে পান তিনি। পরশুরামও ব্রাহ্মণ এবং সর্বশাস্ত্রে প্রবীণ কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে তিনি ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি গ্রহণ করেছেন। এখানে অবশ্য অর্থলাভের স্পৃহা কিছু ছিল না, ক্ষত্রিয় জাতির প্রতি বংশগত প্রতিশোধস্পৃহায় ক্ষত্রিয় নিধনের জন্যই পরশুরাম কুঠার তুলে নিয়েছিলেন হাতে, স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন ধনুক তূণীর। দ্রোণের ইচ্ছা ছিল পরশুরামের ধনদান লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দিব্য অস্ত্রের সম্ভারও কিছু লাভ করা—স রামস্য ধনুর্বেদং দিব্যান্যস্ত্রাণি চৈব হি। শ্রুত্বা তেষু মনশ্চক্রে...।

দ্রোণ মহেন্দ্র পর্বতে রওনা হলেন। পরশুরাম সেখানেই থাকেন। দ্রোণ চললেন ব্রাহ্মণের গরিমায় শিষ্যসামন্ত সঙ্গে নিয়ে। যতই নিন্দিত হোন, তিনি মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র। পিতৃ-পিতামহক্রমে শিষ্যসামন্ত এখনও তাঁর অনুগামী হয়। অতএব ব্রতপরায়ণ শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে তিনি চললেন পরশুরামের উদ্দেশে মহেন্দ্র পর্বতে—বৃতঃ প্রায়ান্ মহাবাহু-র্মহেন্দ্রং পর্বতোত্তমম্। পরশুরাম বসে ছিলেন, শান্ত দান্ত ক্ষমাশীল ভঙ্গিতে। দ্রোণ সশিষ্য পরশুরামের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন—আমি মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র

দ্রোণ। আমি ধনলাভের ইচ্ছায় আপনার কাছে এসেছি—আগতং বিত্তকামং মাং বিদ্ধি দ্রোণং দ্বিজোত্তম। পরশুরাম দ্রোণের ইচ্ছাটা বোধহয় ভাল করে বুঝতে পারেননি প্রথমে। ভাল করে জিজ্ঞাসা করতে দ্রোণ এবার পরিষ্কার বললেন—আপনি ব্রাহ্মণকে ধনদান করছেন শুনলাম। আমার অর্থ দরকার, প্রচুর অর্থ দরকার, আমি আপনার কাছে সেই অর্থ চাইতে এসেছি—অহং ধনম্ অনন্তং হি প্রার্থয়ে বিপুলব্রত।

হায়! ব্রাহ্মণ কুলের অনভিজ্ঞ পুরুষ! দ্রোণ জানেন না যে, দানলাভের সংবাদ পেলে ব্রাহ্মণরা সেখানে আগে পৌঁছোন। বিকল্প জীবিকা নেই বলে অর্থের সন্ধান তাঁদের কাছে অনেক সময়েই প্রধান হয়ে পড়ে। দ্রোণ যতক্ষণে পরশুরামের কাছে পৌঁছেছেন, ততক্ষণে পরশুরামের দাতব্য ধনরত্ন সব শেষ হয়ে গেছে। অতএব সলজ্জে পরশুরাম দ্রোণকে জানালেন—ধনরত্ন যা ছিল সবই তো আমি পূর্বাগত ব্রাহ্মণদের দিয়ে দিয়েছি—ব্রাহ্মণেভ্যো ময়া দত্তং সর্বমেব তপোধন। তা ছাড়া অসংখ্য গ্রাম-নগরযুক্ত এই বসুন্ধরা, তাও আমি দিয়ে দিয়েছি মহর্ষি কশ্যপকে। এখন যা বাকি আছে, যা আছে এখনও অপ্রদত্ত, তারমধ্যে অবশিষ্ট আছে এই শরীর আর আছে অসাধারণ কতগুলি অস্ত্র—শরীরমাত্র মেবাদ্য ময়েদমবশেষিতম্। অস্ত্রাণি চ মহার্হানি শস্ত্রাণি বিবিধানি চ।

পরশুরামের বৃদ্ধ শরীর দিয়ে আর কী বা করবেন দ্রোণ। ধনসম্পত্তি, হিরণ্যভূমি তো কিছুই পাওয়া গেল না। কিন্তু অসাধারণ দৈব অস্ত্র যা ছিল—সেগুলি অন্তত ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে লাগবে দ্রোণের। সেই কথা ভেবেই দ্রোণ অবশিষ্ট সব দিব্য অস্ত্রের প্রয়োগ জেনে নিতে চাইলেন। শিখতে চাইলেন কীভাবে সেইসব প্রয়োগ করেও আবার সংবরণ করতে হয়। পরশুরাম তাঁর কাছে রাখা সমস্ত অস্ত্রের সংকেত, প্রয়োগ, সংবরণের অভিসন্ধি শিখিয়ে দ্রোণকে সেগুলি দান করলেন। পরশুরামের অস্ত্রসম্ভার লাভ করে দ্রোণের সামরিক পরাক্রম অনেক বেড়ে গেল। ব্রাহ্মণের বৃত্তি ত্যাগের সংকল্পও বোধ হয় এইসময় থেকেই তাঁর দৃঢ়তর হল।

এবারে লক্ষ করে দেখুন, কীভাবে দ্রোণ তাঁর জীবনের পরবর্তী পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করেন। পরশুরামের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র লাভ করার পরেই দ্রোণ ঠিক করলেন—গতানুগতিক জীবনের শেষ চেষ্টা হিসেবে তিনি তাঁর অস্ত্রাশ্রমের প্রিয়সখা পাঞ্চাল দ্রুপদের কাছে যাবেন। তাঁর পিতা পৃষত স্বর্গত হয়েছেন, দ্রুপদ এখন পুরোদস্তুর রাজা। দ্রুপদ যেমন কথা দিয়েছিলেন, তাতে পঞ্চাল রাজ্যের রাজসুখে তাঁরও তো ভাগ পাবার কথা। অতএব দ্রোণ এবার স্ত্রীপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন পঞ্চালের রাজধানীতে—সদারঃ সৌমকিং গতঃ।

মহাভারতের এক জায়গায় খবরটা এমন সহজভাবেই আছে বটে, তবে অন্যত্র আর এক জায়গায় দেখতে পাচ্ছি—পরশুরামের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্রের সম্ভার লাভ করার পরেই—প্রতিগৃহ্য তু তৎ সর্বং...জগাম দ্রুপদং প্রতি। এর তাৎপর্য দু রকম হতে পারে। এক, পূর্বের কথা মতো দ্রুপদের রাজ্যাধিকারে ভাগ পেলে তাঁর অস্ত্রশিক্ষার উন্নত প্রযুক্তি প্রিয়সখার কাজে লাগাতে পারেন। দুই, কোনওভাবে যদি দ্রুপদ পূর্বের কথা অস্বীকার করেন, তবে পরশুরামের কাছে অস্ত্র-পাওয়া দ্রোণকে দ্রুপদ ভয়ের চোখে দেখবেন। মনে রাখা দরকার, মহাভারতের কবি এসব তাৎপর্যের কথা উল্লেখ করেননি। অতএব সরলভাবেই আমরা আপাতত দ্রোণের বিচার করব। ঠিক যেমনটি তিনি পরে তাঁর আত্মকাহিনী বলেছেন, সেইভাবে।

লোকপরম্পরায় দ্রুপদের রাজ্যাভিষেকের কথা শুনেই দ্রোণ ভীষণ খুশি হয়েছিলেন। খুশির কারণ একটাই। তিনি ভেবেছিলেন—এবার তাঁর অভীষ্ট লাভ হবে—অভিষিক্তস্তু

শ্রুত্বৈব কৃতার্থো’স্মীতি চিন্তয়ন্। পুত্র-পরিবার সঙ্গে নিয়ে পঞ্চাল রাজধানীর পথে যেতে যেতে পাঞ্চাল দ্রুপদের সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হওয়ার দিনটি মনে পড়ল। মনে পড়ল শেষ দিনের কথাও—রাজা হলে দ্রুপদ তাঁর প্রিয় বন্ধুকে আপন সম্পদের ওপর আত্মসম অধিকার দেবেন। এত কথা ভাবতে ভাবতেই পঞ্চালের রাজবাড়িতে উপস্থিত হলেন দ্রোণ। দ্রুপদের সঙ্গে যখন দেখা হল, তখন তিনি সিংহাসনে বসে আছেন। দ্রোণ সুউচ্চ সখা সম্বোধনে দ্রুপদকে উচ্চকিত করে দিয়ে বললেন—আমি তোমার বন্ধু বটে। মনে নেই আমাকে—সখায়ং বিদ্ধি মামিতি।

পাঞ্চাল দ্রুপদ অন্যায় করলেন। চিনেও তাঁকে চেনা দিলেন না দ্রুপদ। এমনটি হয়। নিজের চোখেই দেখেছি—এমনটি হয়। এককালে যারা অবিমিশ্র বন্ধুত্বের কথা বলেছে অনর্গল, কত সত্য, কত প্রতিজ্ঞা, কত আশ্বাস এবং কত কথামালা—আবার বছর কুড়ি পরে—তাদের সঙ্গে দেখা হলে সেই বন্ধুত্বের পুরাতন সত্যগুলি আর সজীব থাকে না। তখন যা সত্য ছিল, আন্তরিক ছিল, কালের ধূলায় মলিন হয়ে সেই সত্য, সেই আন্তরিকতা একেবারে অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। ভাবাবেগের সমস্ত তাড়না যেহেতু পরিণত বয়সে লুপ্ত হয়ে যায়, মানুষ তখন অনেক সময়েই কাজ করে তাৎক্ষণিক বাস্তববোধে। দ্রোণ যখন প্রকাশ্য রাজসভায় এসে দ্রুপদকে সখা সম্বোধনে সম্ভাষণ জানালেন, পাঞ্চাল দ্রুপদের মধ্যে তখন রাজকীয় সত্তা কাজ করছে। তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণকে একেবারেই আমল দিলেন না। সভার মধ্যে ওই সম্ভাষণ যেন অত্যন্ত হাস্যকর হয়েছে, সেইভাবেই যেন তিনি হেসে উঠলেন। মানুষের শরীরে কুৎসিত রোগের চিহ্ন প্রকাশ পেলে অন্য মানুষ তার সঙ্গে কথা বলবার সময় যেমন দূরত্ব বজায় রাখবার চেষ্টা করে, দ্রুপদ সেই দূরত্বে কথা বলতে আরম্ভ করলেন দ্রোণের সঙ্গে—স মাং নিরাকারমিব প্রহসন্নিদমব্রবীৎ! দ্রুপদের কথার ভাষাও ছিল অমার্জিত, অন্তত কাউকে একেবারে ‘ধান্দাবাজ’ মনে হলেও, যার সঙ্গে কোনও কালে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ ছিল, তার সঙ্গে মানুষ এইভাবে কথা বলে না।

দ্রুপদ বললেন—ব্রাহ্মণ! শিক্ষাদীক্ষা ভাল না থাকায় তোমার বুদ্ধি পরিপক্ক হয়নি—অকৃতেয়ং তব প্রজ্ঞা ব্রহ্মন্ নাতিসমঞ্জসা। ফলে কোন দেশের কোন রীতি, কোন সমাজে কোন ব্যবহার করতে হয় তাও তুমি জান না। দ্রুপদ এইটুকু বলেই থামলেন। তিনি যে দ্রোণকে চেনেন অথবা কোনও কালে চিনতেন, সে কথাও প্রকাশ হল না তাঁর প্রতি সম্বোধনে। ‘সখা’ সম্বোধনের প্রতিসম্বোধন ছিল শুধুই ‘ব্রাহ্মণ’। বরঞ্চ দ্রোণের দিক থেকে সখা সম্বোধনটুকু কত যে অন্যায় হয়েছে সেটা বোঝানোর জন্য দ্রুপদ বললেন—তুমি যে জোর করে আমাকে ‘সখা’ বলে ডাকলে, সে বিষয়ে উত্তর শোনো—কালে কালে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যেমন জীর্ণ জড় হয়ে ওঠে, পুরাতন বন্ধুত্বও তেমনই জীর্ণ হয় একসময়—সঙ্গতানীহ জীর্য্যন্তে। আগে যে একসময় তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল, তার কারণ—আমরা একই উদ্দেশ্য নিয়ে একই জায়গায় থাকতাম বলে—সৌহৃদং মে ত্বয়া হ্যাসীৎ পূর্বং সামর্থবন্ধনম্। তা ছাড়া বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে—সাম্যাদ্ধি সখ্যং ভবতি—তখন আমরা গুরুর আশ্রমে সমান সমান ছিলাম, এখন নেই। তুমিই বলো, অব্রাহ্মণ কি কখনও ব্রাহ্মণের সখা হয়, অথবা রথচারী ব্যক্তি কি রথহীন ব্যক্তির সখা হয়? বন্ধুত্ব চিরকাল স্থায়ী হয় না, তখন কোনও কারণে তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল, এখন তা নষ্ট হয়ে গেছে। সেই কালজীর্ণ বন্ধুত্বকে আশ্রয় করলে তোমার কাছে এখন তা ছলনা হয়ে দাঁড়াবে—মৈবং জীর্ণমুপাস্স্ব ত্বং সখ্যং ভবদুপাধিকৃৎ।

দ্রোণ মনে মনে নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছিলেন। তবুও শেষ চেষ্টা সফল করার জন্য অথবা নিজের পুত্র পরিবারের সামনে নিজেরও অপমান ঢাকবার জন্যই তিনি নিশ্চয় স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন সেই অস্ত্রপাঠশালার দৈনন্দিন কথাবার্তা, স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন কোন অবসন্ন অবকাশে দ্রুপদ তাঁর বন্ধুকে রাজসুখ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। দ্রুপদ এসব

প্রশ্নের সোজা উত্তর দেননি। কেবলই বলেছেন—তুমি নির্বোধ। দরিদ্র কখনও ধনীর সখা হয় না, মূর্খ কখনও পণ্ডিতের সখা হয় না, অথবা বলহীন ব্যক্তি কখনও বীরের সখা হয় না। সবচেয়ে বড় কথা—তুমি সেই পূর্বের বন্ধুত্ব এখন আবার ফিরে পেতে চাইছ। কেন—সখিপূর্বং কিমিষ্যতে? আমি যে রাজ্যের বিষয়ে তোমার কাছে কোনও অঙ্গীকার করেছি, এমন তো আমার স্মরণেও আসছে না—অহং ত্বয়া ন জানামি রাজ্যার্থে সংবিদং কৃতাম্।

দ্রুপদ পূর্ব প্রতিজ্ঞার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন। রাজার রাজ্যপাট এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ মানুষকে অন্ধ করে তোলে বটে, তবে এত কঠিন ভাষায় দ্রুপদ দ্রোণকে কেন তিরস্কার করলেন, তা অনুমান করতে অসুবিধে হয়। একটা কথা অবশ্য এখানে না বললে নয়। দ্রুপদ যখন প্রিয় বন্ধুর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন—আমার যে রাজকীয় ভোগ, যে ধনসম্পদ লাভ হবে, তা তোমারও ভোগ্য হবে—মম ভোগাশ্চ বিত্তঞ্চ ত্বধীনং সুখানি চ। কিন্তু দ্রোণ বোধ হয় এই মুহূর্তে রাজকীয় ভোগসুখ বা ধন সম্পদের অধিকার চাননি, তিনি পূর্ব বন্ধুত্বের অঙ্গীকারে অর্ধেক রাজ্য চেয়ে বসেছেন দ্রুপদের কাছে, আর ঠিক সেই কারণেই দ্রুপদও এতটা অমার্জিত হয়ে উঠেছেন। রাজ্য না চাইলে দ্রুপদ হঠাৎ রাজ্যের প্রসঙ্গ তুলবেন কেন? কেন বলবেন—রাজ্যের ব্যাপারে কোনও কথা হয়নি তোমার সঙ্গে—ন জানামি রাজ্যার্থে সংবিদং কৃতাম্। পরেও যখন আমরা পাণ্ডব অর্জুনের কৃতিত্বে দ্রুপদকে মাথানত অবস্থায় দ্রোণের সামনে উপস্থিত দেখব, তখনও তিনি কিন্তু অর্ধেক পঞ্চালই জোর করে নিয়ে নিয়েছিলেন দ্রুপদের কাছ থেকে। কাজেই বন্ধুত্বের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিয়ে দ্রোণ যদি হঠাৎ অর্ধেক রাজ্য দাবি করে থাকেন, তবে দ্রুপদের এই কঠিন ব্যবহার তখন খানিকটা সযৌক্তিকই হয়ে ওঠে। রাজকীয় ভোগসুখ, ধনসম্পদের অধিকার এক কথা, আর রাজ্যের অধিকার আর এক কথা। দ্রোণ এই অনুচিত দাবি করে থাকলে—দারিদ্র্যের তাড়নায় অথবা পূর্ব প্রতিজ্ঞার সুযোগ নিতে হয়তো তিনি তাই করেছেন—তা হলে দ্রুপদের দিক থেকেও তাঁর ওই অনুচিত ব্যবহার সযৌক্তিক হয়ে পড়ে।

দেখুন, এ বিষয়টা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। সেকালের দিনে একজন ক্ষত্রিয়ের মুখে প্রতিজ্ঞার অনেক মূল্য ছিল। বিশেষত পঞ্চালের মতো ব্রাহ্মণ্য প্রধান জনপদের ভাবী রাজা তাঁর বাল্যসখার কাছে একটা প্রতিজ্ঞা করেছেন, আর কয়েক বছর পরেই তিনি ছলনা করে সে প্রতিজ্ঞা উলটে দিলেন—এমন অসৎ ব্যবহার দ্রুপদের কাছে আশা করা যায় না। কাজের ফল দেখে যেহেতু কখনও কখনও কারণের অনুমান করা যায়, তাতেই অনুমান করি—দ্রোণ প্রতিজ্ঞাত বস্তুর চেয়ে বেশি কিছু চেয়েছেন। দারিদ্র্যের কারণেই হোক, অথবা ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণেই হোক, দ্রোণ দ্রুপদের কাছে রাজ্যের ভাগ চেয়েছেন। এতদিন অর্থ এবং জীবিকার সন্ধানে ঘুরে ঘুরে ব্যর্থ হয়ে দ্রোণ এখন মরিয়া হয়ে উঠেছেন। অতএব খুব সহজে শুধু প্রতিজ্ঞাত সত্যের রূপায়ণে যা তাঁর প্রাপ্য হতে পারত—অর্থ, ধন, রাজসুখ—দ্রোণ তার চেয়ে নিশ্চয়ই বেশি চেয়ে বসেছেন।

দ্রুপদ বলেছিলেন—আমি রাজা হলে আমার রাজ্য তোমারও ভোগ্য হবে—ত্বদ্‌ভোগ্যং ভবিতা রাজ্যম্। কথাটা আইনের দৃষ্টিতে যথেষ্ট পরিষ্কার—অর্থাৎ ভোগ স্বত্বের সঙ্গে দখলি স্বত্ব গুলিয়ে ফেলো না যেন। কী ধরনের ভোগ দ্রোণ পেতে পারেন অথবা দ্রুপদের রাজ্য কীভাবে দ্রোণের ভোগ্য হবে, সেটা তার পরের লাইনেই পরিষ্কার করে দিয়েছেন দ্রুপদ। তিনি বলেছেন—মম ভোগাশ্চ—অর্থাৎ যা ভোগ করা যায় এমন। টীকাকার বলেছেন—ভোগ বলতে রাজকীয় ভোগ—হস্তী, অশ্ব, রথ ইত্যাদি যান ব্যবহারের সুখ। আর কী? 'বিত্তঞ্চ' অর্থাৎ উপার্জিত ধন এবং 'সুখানি চ' অর্থাৎ রাজারা যেসব বিলাসব্যসন ভোগ করেন সেই সুখ। এই প্রতিজ্ঞার প্রতিপক্ষে দ্রুপদ যখন দ্রোণকে প্রত্যাখ্যান করছেন, তখন বলছেন—রাজ্য নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার কোনও কথাই প্রতিজ্ঞাত হয়নি—অহং ত্বয়া ন জানামি রাজ্যার্থে সংবিদং কৃতাম্।

দ্রুপদের এই কঠোর প্রত্যাখ্যান শুনেই আমরা বুঝতে পারি যে, দ্রোণ কী চেয়েছিলেন এবং আরও বুঝতে পারি দ্রুপদ কেন তাঁর বন্ধুত্ব পর্যন্ত অস্বীকার করছেন। দ্রুপদ পূর্বপ্রণয়ের কথা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে দ্রোণকে বললেন—তুমি যখন প্রার্থী হয়ে এসেছ, তখন একরাত্রির উপযুক্ত সম্পূর্ণ ভোজন দিতে পারি তোমাকে, এর বেশি কিছু নয়—একরাত্রন্ত তে ব্রহ্মণ্ কামং দাস্যামি ভোজনম।

দ্রোণ চরমভাবে অপমানিত বোধ করলেন। দ্রুপদের দেওয়া সান্ধ্যভোজনের জন্য স্বাভাবিকভাবেই তিনি বসে রইলেন না। বরঞ্চ 'ঠিক আছে, দেখে নেব', 'আমাকে অপমান করার ফল তুমি তাড়াতাড়িই বুঝবে' ইত্যাদি ভয়ংকর প্রতিজ্ঞা করে তিনি রওনা হলেন হস্তিনাপুর নগরের দিকে। রাগে অপমানে জ্বলতে জ্বলতে—মন্যুনাভিপরিপ্লুতঃ—পুত্রপরিবারকে সঙ্গে নিয়ে দ্রোণ আপন পরিকল্পনা অনুযায়ী হস্তিনাপুরের পথে পা বাড়ালেন—জগাম কুরুমুখ্যানাং নগরং নাগসাহ্বয়ম্।

প্রশ্ন জাগে। প্রশ্ন জাগে—এত জায়গা থাকতে হস্তিনাপুরে কেন? হস্তিনাপুর কুরু রাজাদের রাজধানী। কুরুবংশের রাজারা বংশানুক্রমে পাঞ্চালদের শত্রু। আগে আগে এই দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহও অনেক হয়েছে। কখনও ওঁরা যুদ্ধ জিতেছেন কখনও এঁরা। দ্রোণ যখন কুরু রাজধানীতে আসছেন, তখন পূর্ব রাজা শান্তনু বেঁচে নেই, তাঁর পুত্রেরাও অকালে স্বর্গত। শান্তনু কিংবা তাঁর বাবা প্রতীপের সময় থেকে পাঞ্চালদের সঙ্গে তেমন বড় কোনও যুদ্ধবিগ্রহ হয়নি বটে, কিন্তু দুই দেশের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা সব সময়েই ছিল। দ্রোণ সেই উত্তেজনার সুযোগটুকু সদ্ব্যবহার করলেন আপন আনুকূল্যের জন্য। দ্বিতীয়ত, ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি গ্রহণে দ্রোণের সংকল্প এখন দৃঢ়! পিতৃপিতামহের বৃত্তি, বিশেষত ব্রাহ্মণের বৃত্তি ত্যাগের পক্ষে পূর্ব পরিচিত পরিবেশ এবং আগের চেনা জায়গাটি কখনই সুবিধের হয় না। ফলে হস্তিনাপুর চলে আসাটা দ্রোণের ভবিষ্যৎ আশাপূরণের পক্ষে তথা নিজের অস্ত্র-সামর্থ্য প্রকাশের পক্ষে বেশি সুবিধেজনক জায়গা ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, নতুন জায়গায় এলে প্রথমে একটা আশ্রয় দরকার হয়। নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে প্রাথমিক অবস্থানের সুযোগ পেলে খানিকটা অবশ্যই গুছিয়ে নেওয়া যায়, হস্তিনাপুরে দ্রোণের সেই সুযোগটাও ভালরকম ছিল। দ্রোণের অনুগতা পত্নী কৃপীর যমজ ভাই কৃপ এখানে থাকেন এবং তিনি পূর্ব রাজা মহারাজ শান্তনুর কৃপাধন্য। সবচেয়ে বড় কথা হল, কৃপ এবং কৃপী পঞ্চাল রাজবংশেই জন্মেছিলেন এবং যে কোনও কারণেই হোক, তিনি পঞ্চালে থাকেন না, হস্তিনাপুরে থাকেন। কুরুদের রাজবাড়িতে তাঁর মর্যাদা এবং সম্মান সুবিদিত। ফলে প্রাথমিকভাবে হস্তিনাপুরে থাকাটাই দ্রোণের পক্ষে সুবিধে।

শুধু আশ্রয় এবং সুবিধেই নয়। সেই বাল্যবয়সে যে তাড়নায় তিনি অস্ত্রশিক্ষা করেছিলেন, যে ভাবনায় এক রাজপুত্রের সঙ্গে মেলামেশা করে রাজকীয় মর্যাদা এবং সুখের প্রত্যাশা করেছিলেন, সেই উচ্চাশা পূরণের সবচেয়ে সুযোগ থাকবে হস্তিনাপুরেই। অন্যদিকে পাঞ্চাল দ্রুপদ তাঁকে যে অপমান করেছেন, তার প্রতিশোধ নিতে হলেও হস্তিনাপুরই ছিল তাঁর আদর্শ বাসস্থান। আপন উচ্চাভিলাষ এবং প্রতিশোধস্পৃহা কার্যকর করার প্রয়াসে দ্রোণ এই প্রথম পদক্ষেপ নিলেন, যেখানে কোনও ভুল নেই।

নিস্তব্ধ আক্রোশে পঞ্চালরাজ্যের প্রান্তবাহিনী গঙ্গানদী পেরিয়ে মহামতি দ্রোণ সপুত্র-পরিবারে হস্তিনাপুরে এসে পৌঁছোলেন শ্যালক কৃপাচার্যের বাড়িতে। ধনুর্বেত্তা আচার্য হিসেবে দ্রোণকে তখন সবাই চেনে। এমনকী তিনি যদি কৃপাচার্যের বাড়িতে না উঠে নিজেই হস্তিনাপুরের কুরুপ্রধানদের কারও সঙ্গে দেখা করে কর্মপ্রার্থী হতেন, তাতেও যে তাঁর খুব অসুবিধে হত, তা নয়। পিতামহ ভীষ্ম দ্রোণকে চিনতেন আগে থেকেই, দ্রোণ তাঁর কাছেও গেলেন না। তিনি বোধ হয় আর প্রার্থী হয়ে কারও কাছে, যেতে চান না। একবার পরশুরামের কাছে, একবার দ্রুপদের কাছে প্রার্থী হয়ে গিয়ে তিনি তাঁর অভীষ্ট লাভ করেননি। যে দারিদ্র্য তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, সেই দরিদ্রতার কারণ দেখিয়ে অর্থলাভের জন্য প্রার্থী হওয়াটা আর তাঁর ভাল লাগছিল না। দ্রোণ এবার চলবেন একান্ত আপন পুরুষকারের নির্দেশে। তিনি পুরুষকার প্রদর্শন করবেন এবং সেই পথে কেউ যদি ডেকে নিয়ে যায়, তবেই তিনি সেখানে যাবেন। অর্থাৎ তাঁর শক্তি এবং অস্ত্রকৌশল অন্যেরা যাচনা করুক প্রার্থীর মতো—এইরকম কোনও ভাবনায় তিনি কৃপাচার্যের বাড়িতে অবস্থান আরম্ভ করলেন গোপনে, আত্মপরিচয় আপাতত প্রচ্ছন্ন রেখে—ভারদ্বাজো’বসত্তত্র প্রচ্ছন্নং দ্বিজসত্তমঃ।

প্রচ্ছন্ন থাকলেও দ্রোণ কিন্তু কুরুরাজবাড়িতে প্রবেশের পথ খুঁজছিলেন অত্যন্ত সুকৌশলে। একটা সুবিধে তাঁর আগে থেকেই ছিল। তাঁর শ্যালক কৃপাচার্য পাণ্ডব কৌরবদের অস্ত্রশিক্ষায় নিযুক্ত হয়েছিলেন আগে থেকেই। কুরুবাড়ির প্রপিতামহ মহারাজ

শান্তনু কৃপাচার্যকে লালন পালন করেছিলেন এবং এখনকার কুরুবাড়ির প্রধান পুরুষেরা কৃপাচার্যকে সম্মান করেন আচার্যের মর্যাদায়। গাঁয়েগঞ্জের একান্নবর্তী পরিবারের একেকজন শিক্ষিত অলস পুরুষ যেমন বাড়ির ছেলেপিলেদের প্রাথমিক শিক্ষার কাজে নিযুক্ত হতেন, কৃপাচার্যের অবস্থাও তেমনই। তিনি অলস নন বটে, কিন্তু সেই শান্তনুর আমল থেকে কুরুবাড়ির রাজপরিবারে থাকতে থাকতে তাঁর পদমর্যাদা যতই বাড়ুক, অস্ত্রগুরু হিসেবে তিনি এক নম্বরের ছিলেন না, অন্যদিকে কৌরব পাণ্ডবদের প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে আবার তিনি ছিলেন যথেষ্ট। প্রখ্যাত ধনুর্বিদ বীর হওয়ার দরুণ মহামতি ভীষ্ম কৃপাচার্যের অস্ত্র-ক্ষমতাও যেমন জানতেন, তেমনই তাঁর সীমাবদ্ধতার কথাও জানতেন।

যাই হোক, যতদিন কৃপাচার্যের থেকে মহত্তর অস্ত্রগুরু না মেলে, ততদিন অন্তত তাঁর কাছেই কুরুবাড়ির ছেলেদের শিক্ষা হোক, এই কথা ভেবেই ছেলেদের ভার কৃপাচার্যের ওপর ন্যস্ত করেছিলেন ভীষ্ম। কৃপাচার্য তাঁদের যথাবুদ্ধি যথাসাধ্য শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছিলেন, এরইমধ্যে ছেলেরা সকৌতুকে লক্ষ করল যে, তাঁদেরই বয়সি একটি প্রায়-যুবক গৌরবর্ণ ছেলে কৃপাচার্যের বাড়িতে এসে থাকতে আরম্ভ করেছে। ছেলেটি ভারী সুন্দর এবং এই বয়সেই সে অস্ত্রবিদ্যার কৌশল অন্য বালকদের চেয়ে ভাল জানে। ছেলেটি ভারী সুন্দর, যথেষ্ট মিশুকে এবং অসুয়াহীন। সে নিজে যতটুকু অস্ত্রবিদ্যা শিখেছে, সেটুকু সে অন্য ছেলেদের শিখিয়ে দিতে একটুও কুণ্ঠিত হয় না। ফলত এমন ঘটনা মাঝে মাঝেই ঘটতে লাগল যে, কৃপাচার্যের শিক্ষাদান শেষ হয়ে গেছে, তিনি বাড়ি ফিরে এসেছেন, তখন সেই গৌরবর্ণ বালকটি কুরুবাড়ির কয়েকটি উৎসাহী ছেলেকে কৃপাচার্যের আরব্ধ পাঠ আরও ভাল করে বুঝিয়ে দিতেন, বা অভ্যাস করাতেন। লক্ষণীয়, এই উৎসাহী ছেলেগুলির মধ্যে পাণ্ডব ভাইরাই প্রধানত কৃপাচার্য চলে গেলেও সেই পাঠশালায় থেকে যেতেন এবং এই অবসরেই তাঁদের আরও একটু ভাল করে অস্ত্রপাঠ বুঝিয়ে দিতেন সেই যুবকপ্রায় ছেলেটি, যাঁর আসল পরিচয় —তিনি দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা—ততো'স্য তনূজঃ পার্থান্ কৃপস্যানন্তরং প্রভুঃ। অস্ত্রাণি শিক্ষয়ামাস...।

তখনও অন্যেরা কেউ তাঁর পরিচয় জানে না। পূর্ব পরিকল্পনা মতো কৃপ কিংবা অশ্বত্থামা কেউই দ্রোণের আগমনসংবাদ বা অশ্বত্থামার প্রকৃত পরিচয় পাণ্ডব কৌরব কারও কাছেই প্রকাশ করেননি—নাবুধ্যন্ত চ তং জনাঃ। পাণ্ডব ভাইরা ভাবতেন—কৃপাচার্যের কোনও আত্মীয় এসেছেন বাড়িতে, হয়তো কিছুদিন থাকবেন, হয়তো বা চলেও যাবেন। সত্যি কথা বলতে কী, তাঁদের এ ব্যাপারে খুব একটা কৌতূহলও ছিল না। কিন্তু দ্রোণের দিক থেকে তাঁর সযত্ন পদক্ষেপগুলি লক্ষ করুন। পুত্র অশ্বত্থামা কুরু রাজবাড়ির একাংশের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, তিনি কিন্তু বাধা দিচ্ছেন না। অন্যদিকে রাজবাড়ির এই ছেলেগুলিকে শিষ্য হিসেবে পেলে তাঁর অর্থলাভ এবং মর্যাদা লাভের যে অফুরান সুযোগ আসবে, সেটা তিনি জানতেন বলেই তিনি একটা উপযুক্ত সময় খুঁজছিলেন, যে সময় তিনি সকলকে হতচকিত করে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন।

সেই সুযোগ এসেও গেল। পাণ্ডব-কৌরবেরা একদিন খেলতে খেলতে হস্তিনানগরের বাইরে চলে এসেছেন খানিকটা। এখানে খেলবার মতো বিস্তীর্ণ প্রান্তর আছে আর এই হস্তিনাপুর নগরের প্রান্তদেশেই বোধ হয় কৃপাচার্যের আবাসস্থল নির্দিষ্ট হয়েছিল। এখনকার দিনে যেমন 'বল' খেলা হয়, সেকালের দিনে তেমন বল ছিল না নিশ্চয়ই; কিন্তু গোলাকার বস্তু নিয়ে বালকদের খেলবার প্রবণতা চিরন্তন কাল ধরে এতটাই 'ইনস্টিংটিভ্' যে, বস্ত্রখণ্ড দিয়ে গোলাকার বল তৈরি করে খেলাটা সে যুগেও অসম্ভব ছিল না। আমরা কন্দুকক্রীড়ার নাম শুনেছি, সেটা গুলিখেলাও হতে পারে, বলও হতে পারে। মহাভারতের কবি এই গোলাকার বস্তুটির নাম দিয়েছেন 'বীটা' এবং এটাও বলের মতোই কোনও জিনিস। ছোটবেলায় গাঁয়েগঞ্জে বাতাবিলেবু দিয়ে বল খেলে যারা বলাভাব মিটিয়েছে, তারা অবশ্যই

বুঝবে যে এই ‘বীটা’ বলের মতোই কোনও জিনিস এবং তা বাতাবিলেবু নাই হোক, কিন্তু বস্ত্রখণ্ডের তৈরি কোনও ‘গুটলি’ হওয়াই সম্ভব।

পাণ্ডব কৌরবরা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে ওই ‘বীটা’ নিয়ে খেলা আরম্ভ করেছিলেন এবং বীটার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ছোটাছুটিও ভালই চলছিল—ক্রীড়ন্তো বীটয়া তত্র বীরাঃ পর্য্যচরন্ মুদা। হাত কিংবা পায়ের জোরে অথবা অনবধানে সেই খেলার বীটা এক সময় গিয়ে পড়ল একটি অন্ধকূপের মধ্যে। বীর বালকেরা অনেক চেষ্টা করলেন—লাঠির খোঁচা, ঢিল ছোঁড়া—অনেক কিছুই হল বীটা ওপরে তোলার জন্য, কিন্তু শেষপর্যন্ত কোনও উপায়ই তাঁরা বার করতে পারলেন না—ন চ তে প্রত্যপদ্যন্ত কর্ম বীটোপলব্ধয়ে। উৎকণ্ঠিত বালকেরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগলেন। বীটা নেই, খেলা বন্ধ, অতএব এদিক ওদিক তাকানো, অপিচ নতুন খেলা আবিষ্কারের আগেই তাদের অনুসন্ধিৎসু চোখ গিয়ে পড়ল একটি বৃদ্ধপ্রায় মানুষের ওপর।

তাঁর গায়ের রং কালো, চাঁছাছোলা মেদবর্জিত শরীর, মাথার চুলে কেবলই কিছু পাক ধরেছে, তাঁর গলার উপবীত এবং সম্মুখের হোমকুণ্ডলী দেখে বালকেরা বুঝলেন—তিনি ব্রাহ্মণ—তে’পশ্যন্ ব্রাহ্মণং শ্যাম আপন্নপলিতং কৃশম্। ব্রাহ্মণের হোমযজ্ঞের প্রতি বালকদের যে খুব আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল, তা বোধ হয় না। তবে হ্যাঁ, খেলার বীটা হারিয়ে গেছে, হাতে অফুরান অবসর, তখন বনের প্রান্তে অগ্নিহোত্র করতে বসা একটি ব্রাহ্মণ দেখলেও বালকদের কৌতূহল হয়। কুরুবাড়ির রাজকুমারেরা ব্রাহ্মণকে ঘিরে তাঁর অগ্নিহোত্রের জোগাড়যন্ত্র দেখতে লাগলেন—ভগ্নোৎসাহ-কৃতাত্মানো ব্রাহ্মণং পর্য্যবারয়ন্।

দ্রোণ খুব স্বচ্ছ মনে আরণ্যক ব্রাহ্মণের তাগিদে এই উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে তাঁর নিত্য কর্ম সমাধা করতে এসেছেন, তা আমাদের মনে হয় না। কৃপাচার্যের বাড়িতে বসেই যথেষ্ট নিবিষ্টভাবে তিনি ওই অগ্নিহোত্র সমাধা করতে পারতেন। কাজেই এই যে তিনি বেরিয়ে প্রান্তরের মধ্যে অগ্নিহোত্র করতে বসেছেন, তা নিষ্কারণে নয়। হয়তো কুরুবালকদের ক্রীড়াকৌতুক, উন্মত্ত চিৎকার এবং পরিশেষে কূপগত বীটা উদ্ধারের প্রয়াস তাঁর কানে গিয়ে থাকবে। হয়তো তিনি চেয়েই ছিলেন—কোনও অজুহাতে রাজপুত্রদের সামনে উপস্থিত হতে। এতদিন প্রচ্ছন্নবাসের পর নিজের আত্মপ্রকাশের এই সুবর্ণসুযোগ তিনি ছেড়ে দিতে চাননি। অতএব অরণ্য প্রান্তরে এমন জায়গায় তিনি অগ্নিহোত্র করতে বসেছেন, যেখানে ক্রীড়াশীল বালকদের কৌতূহলী দৃষ্টি পড়বেই।

লোকদেখানো কায়দায়—কী হয়েছে বাছারা সব, বামুনের যাগযজ্ঞের সময় তোমরা গোল করছ কেন—নিশ্চয় এমন কিছু বলতেই রাজপুত্রেরা বলে উঠলেন—এই দেখুন না, আমাদের খেলার বীটা কুয়োয় পড়ে গেছে। আমরা আর খেলতেই পারছি না। অসমাপ্ত খেলায় বালকদের বিষন্ন দেখে—অথ দ্রোণঃ কুমারাংস্তান্ দৃষ্টা কৃত্যবতস্তদা—একটু হেসেই কথা বললেন। হাসলেন এই ভেবে যে, ওই বীটা কুয়ো থেকে তুলে আনাটা তাঁর কাছে কোনও শক্ত কাজই নয়। অন্যদিকে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার এই তো সুযোগ। দ্রোণ বললেন—ধিক তোমাদের শক্তিতে। তোমরা না ক্ষত্রিয়ের জাত! এত বয়স হল, কীরকম অস্ত্রশিক্ষা হয়েছে তোমাদের যে, সুপ্রসিদ্ধ ভরতবংশে জন্মে বুজে যাওয়া কুয়ো থেকে একটা বীটা তুলে আনতে পারছ না—ভরতস্যান্বয়ে জাতা যে বীটাং নাধিগচ্ছত!

কুরুবাড়ির রাজপুত্রেরা ধিক্কার শুনে লজ্জায় মাথা নোয়ালেন। দ্রোণ এবার নিজের অস্ত্রকৌশল সম্পর্কে বালকদের মনে চরম বিস্ময় জাগানোর জন্য প্রথমেই তাঁর হাতের আংটিটি খুলে সেই মজা কুয়োর মধ্যেই ফেলে দিলেন। বালকেরা যখন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন, দ্রোণ তখন বললেন—দেখো, তোমাদের বীটা তো রয়েইছে, তার মধ্যে আমার

আংটিটিও ওই কুয়োর মধ্যেই ফেলে দিলাম; এবার দেখো, কীভাবে দুটোই আমি তুলে আনি। যদি আনতে পারি, তবে আমাকে ভালরকম খাওয়াবে তো, বাছারা—উদ্ধরেয়মীষিকাভির্ভোজনং মে প্রদীয়তাম্।

খেলার সূত্রে কুরুবাড়ির ছেলেরা মাঝে মাঝেই এদিকে আসেন। ফলে কৃপাচার্যের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যে ছেলেটি তাঁদের অস্ত্রশিক্ষা দিতে আসেন, সেই অশ্বত্থামাকে যেমন কৃপাচার্যের আত্মীয় ভাবতে তাঁদের অসুবিধে হয় না, তেমনই দ্রোণকেও তাঁরা কৃপের বাড়িতেই দেখে থাকবেন বলে তাঁকেও কৃপের আত্মীয় ভাবতে অসুবিধে হয় না। এই সূত্র ধরেই পাণ্ডব কৌরবদের অগ্রজ যুধিষ্ঠির দ্রোণের কথার জবাব দিয়ে বললেন—কৃপাচার্যের যদি অনুমতি হয়, তবে এই একদিন কেন, আপনি প্রতিদিনই উত্তম ভোজন লাভ করবেন—কৃপস্যানুমতে ব্রহ্মন্ ভিক্ষামাপ্নুহি শাশ্বতীম্।

দ্রোণ হাসলেন। তারপর নলখাগড়ার বন থেকে কতগুলি খাগের তির বানিয়ে বললেন—এবার দেখো এর কেরামতি। এ ক্ষমতা অন্য কারও হবে না—অস্য বীর্য্যং নিরীক্ষধ্বং যদন্যস্য ন বিদ্যতে। আমার হাতের এই একমুঠি তিরের মধ্যে শুধু একটা দিয়ে আমি ওই বীটার গুলিকাটিকে বিদ্ধ করব। তারপর সেই তিরের পিছনে আরও একটা তির এবং তার পিছনে আরেকটা—এইভাবে তিরগুলি আমার হাতের নাগালে পৌঁছোলে তোমাদের বীটা আমি ওপরে তুলে আনব—তামন্যয়া সমাযোগে বীটায়া গ্রহণং মম। দ্রোণ যেমনটি বললেন, ঠিক সেইভাবেই বীটা তুলে আনলেন ওপরে। ঘটনা দেখে কুরুবাড়ির রাজপুত্রদের চোখ কপালে উঠল—তদবেক্ষ্য কুমারাস্তে বিস্ময়য়োৎফুল্ললোচনা। তাঁদের খেলার বীটা ওপরে উঠে এসেছে কিন্তু দ্রোণের হাতের আংটিটি তখনও পড়ে রয়েছে কুয়োর মধ্যেই। বালকরা বললেন—এবার আপনার আংটিটিও তুলে আনুন—মুদ্রিকামপি বিপ্রর্ষে শীঘ্রমেতাং সমুদ্ধর।

দ্রোণাচার্য আবারও হাতে তুলে নিলেন ধনুকবাণ। এই শরাসনের সন্ধানই তাঁর দেখানোর প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি। কারণ এতেই বালকেরা চমকিত হবে এবং সেই চমৎকারই জুটিয়ে দেবে তাঁর বৃত্তি। দ্রোণ এমনভাবেই আংটির গায়ে শরাঘাত করলেন যাতে একের পর এক বাণ-পরম্পরায় বাণবিদ্ধ আংটি উঠে এল ওপরে। দ্রোণ আংটিটি বিস্ময়স্তব্ধ বালকদের হাতে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন যেন কিছুই হয়নি। যেন এমনটি তিনি প্রায়ই করে থাকেন—দদৌ ততঃ কুমারাণাং বিস্মিতানাম্ অবিস্মিতঃ।

খেলার বীটা এবং আংটি তোলার কেরামতি দেখে রাজপুত্রেরা একযোগে দ্রোণকে বলল—আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন, বামুনঠাকুর! এমন ক্ষমতা কারও দেখিনি—অভিবন্দামহে ব্রহ্মণ্ নৈতদন্যেষু বিদ্যতে। সত্যি করে বলুন তো আপনি কে? কী আপনার পরিচয়? আর যেভাবে আপনি আমাদের উপকার করলেন, তাতে কীভাবেই আপনার প্রতিদান দেব—বয়ং কিং করবামহে? দ্রোণ দেখলেন এই সুযোগ। তিনি বললেন—বেশি কিছু করতে হবে না। তোমরা মহামতি ভীষ্মের কাছে গিয়ে বলো যে, আমি কী করেছি এবং তাঁর কাছে আমার অস্ত্রকৌশল বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে আমার চেহারার বর্ণনাটাও দিয়ো—আচক্ষধ্বঞ্চ ভীষ্ময় রূপেণ চ গুণৈশ্চ মাম্। তারপর আর তোমাদের চিন্তা করতে হবে না। তিনি যা করার করবেন।

কুরুবাড়ির রাজকুমারেরা দ্রোণের প্রতি কৃতজ্ঞতায় পূর্বে ঘটা সমস্ত কাহিনী এবং তাদের বিস্ময়ের অতিরেকটুকুও সবিস্তারে জানাল। ভীষ্ম বুঝতে পারলেন—দ্রোণ পঞ্চাল ছেড়ে এসেছেন এবং এই মহান অস্ত্রবেত্তাই কুমারদের সবচেয়ে উপযুক্ত অস্ত্রগুরু হতে পারেন—যুক্তরূপঃ স হি গুরুরিত্যেবমনুচিন্ত্য চ। মনে মনে এ কথা ভেবে ভীষ্ম ডেকে পাঠালেন দ্রোণকে। রাজবাড়ির রাজকীয় সৎকারে দ্রোণকে সম্মান করে তাঁর পঞ্চাল ছেড়ে

হস্তিনাপুরে আসবার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন—হেতুমাগমনে তত্র দ্রোণঃ সর্বং ন্যবেদয়ৎ—দ্রোণও তখন তাঁর জীবনের সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিকভাবে নিবেদন করলেন ভীষ্মের কাছে। অগ্নিবেশের অস্ত্রাশ্রমে পাঞ্চাল দ্রুপদের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সময় থেকে দ্রুপদের বন্ধুত্ব, তাঁর প্রতিজ্ঞা, দ্রোণের দরিদ্র অবস্থা, পুত্রের জন্ম, অশ্বত্থামার দুগ্ধবোধে পিষ্টরস সেবনে অন্যান্য বালকদের উপহাস, দ্রুপদের কাছে সপুত্র-পরিবারে দ্রোণের গমন, দ্রুপদের চরম অপমান—সবকিছু তিনি একের পর ঘটনা সাজিয়ে ভীষ্মের কাছে বলে গেলেন।

জীবনের দুঃখকষ্টগুলি অসহ্য হয়ে গেলে নিজেকে চরম অসহায় লাগে নিশ্চয়ই, কিন্তু সেই কষ্ট যদি সমব্যথী মানুষকে জানানো যায় এবং সে মানুষ যদি তা ধৈর্য ধরে শুনে প্রথম থেকেই সমব্যথার পরিচয় দিতে থাকেন, তবে তা ক্ষতস্থানে চন্দন লেপনের কাজ করে। দ্রোণের কাছে ভীষ্মের প্রত্যুত্তরটি সেইরকমই হল। দারিদ্র্য পীড়িত দ্রোণের জীবনকাহিনীর শেষে একটা হাহাকার ছিল। দ্রোণ বলেছিলেন, ভীষ্মের কাছে সানুনয়ে বলেছিলেন—আমি এখানে উপযুক্ত অস্ত্র-শিষ্য পাব বলে এসেছি—শিষ্যৈরর্থী গুণান্বিতৈঃ। কুরুবাড়ির রাজকুমারদের কাছে যে অস্ত্রশিক্ষা আপনি আশা করছেন, সে আশা আমি পূরণ করব। আপনার অভিলাষ পূর্ণ হবে। সেই জন্যই আমার হস্তিনাপুরে আসা। এবারে বলুন, আমি কী করতে পারি আপনার জন্য—ব্রহি কিং করবাণি তে। দ্রোণের অত্যাশ্চর্য অস্ত্র ক্ষমতার কথা ভীষ্ম আগে থেকেই জানতেন। কাজেই সেখানে তাঁর কোনও অপছন্দই নেই। অন্যদিকে দ্রোণকে শিক্ষক নিযুক্ত করার রাজনৈতিক তাৎপর্য কী, তাও ভীষ্মের অজানা নয়। পঞ্চাল রাজ্যের সঙ্গে হস্তিনাপুরের চিরন্তন শত্রুতার নিরিখে দ্রোণাচার্যের অস্ত্র শিক্ষা যদি কুরুবাড়ির রাজপুত্রদের পাঞ্চালদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী করে তোলে তা হলে ভীষ্মই পরিণামে লাভবান হবেন। অতএব ভীষ্ম দ্রোণকে ছাড়বেন কেন?

দ্রোণের করুণ কাহিনী শুনে ভীষ্ম তাঁকে সম্পূর্ণ আশ্বস্ততা দিয়ে বললেন—আপনি এখন নিশ্চিন্তে ধনুকের ছিলাটি আপনার ধনুক থেকে খুলে রাখুন এবং ভাল করে অস্ত্রশিক্ষা দিন এই বাড়ির রাজপুত্রদের—অপজ্যং ক্রিয়তাং চাপং সাধ্বস্ত্রং প্রতিপাদয়। আপনার ভোজন, আবাসনই শুধু নয়, কুরু রাজ্যের সমস্ত ভোগ্য বস্তু আপনার ভোগ্য হবে। কুরুদের এই যে রাজত্ব, ধনসম্পদ এবং রাজ্য—এগুলিতে আপনার অধিকারই শুধু নয়, আপনাকে রাজা বলে সম্মান করব আমরা। আপনি জানবেন—কুরুবাড়ির সকলেই আপনার অনুগত—ত্বমেব পরমো রাজা সর্বে চ কুরবস্তব—আপনি আমাদের হুকুম করবেন।

ভীষ্মের এই বক্তব্যের মধ্যে খানিকটা অতিরঞ্জনের গন্ধ পাওয়া যেতে পারে। বাস্তবে দ্রোণ কুরু রাজ্যের রাজত্ব লাভ করেননি হয়তো, কিন্তু এই আরম্ভ থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত যে সম্মান তিনি পেতে থাকবেন, তা রাজকীয় তো বটেই, একজন রাজার চাইতে তা কমও নয়। হয়তো এই সম্মান ব্রাহ্মণ বলেও খানিকটা, গুরু বলেও খানিকটা, হয়তো বা এ সম্মান খানিকটা পাঞ্চাল দ্রুপদের প্রতিজ্ঞাত সত্যের প্রতিপূরণও বটে—কুরূণামস্তি যদ্‌বিত্তং রাজ্যঞ্চেদং সরাষ্ট্রকম্—কিন্তু সবকিছু মিলিয়ে দেখতে গেলে সরাসরি রাজা না হয়ে উঠলেও দ্রোণ যেভাবে বাঁচতে চেয়েছিলেন, যে সম্মানের অভিলাষ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল, তার অনেকটাই ভীষ্মের বক্তব্যে সুখলভ্য বলে মনে হল—যচ্চ তে প্রার্থিতং ব্রহ্মন্ কৃতং তদিতি চিন্ত্যতাম্। শর্ত ছিল শুধু একটাই—রাজকুমারদের ভাল করে অস্ত্রশিক্ষা দিতে হবে।

ভীষ্ম রাজবাড়ির সমস্ত বালকদের কাছে ডাকলেন। কৌরব এবং পাণ্ডব সকলকে ডেকে তিনি বিধিনিয়ম অনুসারে দ্রোণের হাতে দিয়ে বললেন—এই আপনার শিষ্যকুল। আপনি এঁদের ভার নিন। দ্রোণকে হস্তিনাপুরের রাজবাড়ির বিধিসম্মত আচার্য নিয়োগ করার পরেই দ্রোণ এবার একটু চিন্তিত হলেন। এতদিন তিনি তাঁর শ্যালক কৃপাচার্যের বাড়িতে আশ্রিত

ছিলেন, এবং সেই কৃপাচার্যই এতদিন পাণ্ডব কৌরবের অস্ত্রশিক্ষার গুরু ছিলেন। দ্রোণ আচার্য নিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃপাচার্যের বৃত্তিলোপের সম্ভাবনা। ভীষ্মের সঙ্গে সমস্ত কথাবার্তা শেষ হয়ে যাবার পর দ্রোণ এখন কৃপাচার্যের কথা ভেবে অস্বস্তি প্রকাশ করছেন। অথচ এই কাজটি করার জন্যই তিনি প্রথম থেকে প্রস্তুত হচ্ছেন, কৃপাচার্যের গৃহে প্রচ্ছন্নভাবে থেকেই তিনি প্রস্তুত হচ্ছিলেন এর জন্য। দ্রোণকে আমরা দোষ দিই না। ছোটবেলা থেকে যেভাবে তাঁর দিন কেটেছে, তারপর বৃত্তিত্যাগ, বন্ধু দ্রুপদের প্রত্যাখ্যান এবং সর্বোপরি তাঁর আজন্ম সাধন ধন দারিদ্র্য—এই সবকিছুর নিরিখে কৃপাচার্যের কথা তাঁর পক্ষে পূর্বাহ্ণে ভাবনা করা সম্ভব ছিলও না হয়তো। কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁর জীবনের দুশ্চিন্তাপর্ব সম্পূর্ণ মিটে গেছে, সেই মুহূর্তেই তিনি কৃপাচার্যের ঋণের কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেছেন।

দ্রোণ বলেছেন—তা হলে কৃপের কী হবে? এতদিন তিনিই তো আচার্য হিসেবে ছিলেন। তিনি অস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি। অভিজ্ঞ লোকেরাও তাঁকে আচার্য হিসেবে মানেন। এখন আমি যদি কুমারদের আচার্য নিযুক্ত হই, তা হলে নিশ্চয় তাঁর মনে বড় কষ্ট হবে—ময়ি তিষ্ঠতি চেদ্‌বিপ্রো বৈমনস্যং গমিষ্যতি। কৃপের জন্য দ্রোণ যতই সমব্যথা প্রকাশ করুন, তিনি আসলে কুরুবাড়িতে কৃপের প্রতিষ্ঠা বুঝতেই পারেননি। কৃপ কুরুবাড়িতে আছেন প্রায় ভীষ্মের সময় থেকে। তিনি প্রায় ঘরের লোক। ভীষ্ম অবশ্য দ্রোণের অস্বস্তি বুঝে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বলেছেন—আরে কৃপ থাকুন কৃপের জায়গায়। তাঁর সম্মানও এতে নষ্ট হবে না আর তাঁর ভরণপোষণের কোনও সমস্যা হবে না এখানে—কৃপস্তিষ্ঠতু পূজ্যশ্চ্য ভর্তব্যশ্চ ময়া সদা। আমার নাতিদের শিক্ষার ভার আপনাকেই নিতে হবে। তাঁদের আচার্য হবেন আপনিই—ত্বং গুরুর্ভব পৌত্রাণামাচার্য্যস্ত্বং মতো মম।

দ্রোণের দুঃখী জীবনের অবসান ঘটল। তিনি কুরুকুমারদের আচার্য নিযুক্ত হলেন। এখন থেকে তাঁকে আমরা দ্রোণাচার্য বলব। তাঁকে আর কৃপাচার্যের আশ্রয়ে ফিরে যেতে হল না। সেই কখন অগ্নিহোত্র সারবার সময় বালকদের অনুরোধে তাঁদের খেলার বীটা তুলে দিয়েছিলেন, তারপর বালকদের পীড়াপীড়িতেই ভীষ্মের সঙ্গে তাঁকে দেখা করতে হয়েছে। এখন জীবিকার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে কুরুবাড়িতেই খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিলেন তিনি। ভীষ্ম যাঁকে সম্মান করে নাতিদের আচার্য পদে বরণ করেছেন, কুরুবাড়ির লোকে সেই মর্যাদা বুঝেই তাঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছে—বিশশ্রাম মহাতেজাঃ পূজিতঃ কুরুবেশ্মনি। খানিকক্ষণ বিশ্রাম হলে পাণ্ডব-কৌরব সকল কুমারদের দ্রোণাচার্যের হাতে তুলে দিয়ে ভীষ্ম তাঁর প্রাথমিক প্রয়োজনগুলির সুব্যবস্থা করলেন সবার আগে। নগদ টাকাপয়সা তো কিছু দিলেনই, সঙ্গে সঙ্গে একটি সুসজ্জিত গৃহের ব্যবস্থা করলেন আচার্যের জন্য। দ্রোণ সেখানে পুত্র-পরিবার নিয়ে থাকবেন সসম্মানে। অন্ন-পান-ভোজন যাতে তাঁকে যাচনা করে না নিতে হয় সেজন্য তাঁর গৃহের মধ্যেই মজুদ রইল ধনধান্যের ভাণ্ডার—গৃহঞ্চ সুপরিচ্ছন্নং ধনধান্যসমাকুলম্।

এমন একটি দিনের স্বপ্ন দেখেছেন দ্রোণ। এতকাল ধরে দেখেছেন। কিন্তু কোনও দিন যে স্বপ্ন সফল হবে এমনটি কি ভেবেছেন কখনও। এই একটু আগেই যখন কৃপাচার্যের বৃত্তিলোপের ভাবনা হল তাঁর মনে, তখনও তিনি ভীষ্মকে বলেছেন—তার চেয়ে এই ভাল। আমি কিছু ধন যাচনা করে নিই আপনার কাছ থেকে। তারপর খুশি হয়ে চলে যাই নিজের সেই পুরাতন আশ্রমে—স্বমাশ্রমপদং রাজন্ গমিষ্যামি যথাগতম্। দ্রোণ যে এর চেয়ে বেশি ভাবতে পারেন না। খানিকটা অর্থলাভ এবং তাত ক'দিন সংসার চালিয়ে দারিদ্র্য নিবৃত্তি করা, এই তো তাঁর অভ্যাস হয়ে গেছে। সেখানে আজ তাঁর একটি সুসজ্জিত গৃহ, ধনধান্য, দাসদাসী সব হয়েছে। আজ কি তাঁর পূর্বস্মৃতি জেগে উঠছে একটুও। মনে পড়ছে কি বালক অশ্বত্থামা দুগ্ধবোধে পিষ্টরস সেবন করছেন, আর অন্য ধনী বালকেরা তাই দেখে হাসছে। ভাবতে পারছেন কি—সারা পঞ্চাল দেশ ঘুরে ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য একটি দুগ্ধবতী গাভীর দানটুকুও পেলেন না।

সত্যি কথা বলতে কী, দ্রোণাচার্যের মনে এসব পুরাতন স্মৃতি দাগ কাটে না। কষ্ট করে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত হন, তাঁরা জীবনে একবার 'ব্রেক-থ্রু' পেলে আর দুঃখের স্মৃতি মনে রাখেন না, বরঞ্চ দরিদ্র জীবনে যাঁদের কাছ থেকে লাঞ্ছনা গঞ্জনা লাভ করেছেন, তাঁদের ওপর প্রতিশোধ নেবার স্পৃহা এবং তাঁদেরকে ছাড়িয়ে যাবার একটা নেশা তাঁদের মনের মধ্যে কাজ করতে থাকে। আর ঠিক সেই জন্যই পাণ্ডব-কৌরব-সকলকে শিষ্যত্বে স্বীকার করার পরেই তিনি তাঁদের একান্তে নিয়ে গেলেন নির্জনে, যেখানে তাঁর নবপাঠে আগ্রহী শিষ্যরা ছাড়া আর কেউ নেই—রহস্যেকঃ বিনীতাত্মা কৃতোপসদনাংস্তদা। দ্রোণ বললেন—আমার মনে একটা গভীর গোপন ইচ্ছে আছে, সে ইচ্ছে দিন-রাত ঘুরপাক খায় আমার মনের মধ্যে—কার্যং মে কাঙ্ক্ষিতং কিঞ্চিদ্ হৃদি সম্পরিবর্ততে—তোমাদের অস্ত্রশিক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, তোমরা আমার অভিলাষ পূর্ণ করবে, কথা দাও—কৃতাস্ত্রৈস্তৎ প্রদেয়ং মে তদৃতং বদতানঘাঃ।

আচার্যের সমস্ত আকুলতা সত্ত্বেও কেউ কিন্তু কথা দিলেন না। একশো ভাই কৌরবরা একেবারে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন—তচ্ছ্রুত্বা কৌরবেয়াস্তু তুষ্ণীমাসীৎ বিশাম্পতে। একমাত্র পাণ্ডব অর্জুন কোনও দ্বিধাদ্বন্দ্ব মনে না রেখে—গুরু বলেছেন অতএব করতে হবে —এইরকম এক দৃঢ়তায় জবাব দিলেন সপ্রতিজ্ঞ ভঙ্গিতে—আমি আপনার ইচ্ছা পূরণ করব আচার্য—অর্জুনস্তু ততঃ সর্বং প্রতিজজ্ঞে পরন্তপ। দ্রোণাচার্যের কী বাঞ্ছিত, তা অর্জুন জানেন না, কী তাঁকে করতে হবে, তাও তিনি জানেন না। শুধু জানেন—গুরু বলেছেন অতএব করতে হবে। অর্জুনের এই মানসিক দৃঢ়তা দ্রোণাচার্য বুঝেছেন। অসাধারণ বীরতা যে

একতমত্ব সৃষ্টি করে, মানসিক শৌর্য যে ‘হিরোয়িক আইসোলেশন’ তৈরি করে, সেই বীরতা এবং মানসিক শৌর্য যে এই ছেলেটির মধ্যে আছে, সেটা পুরোপুরি অনুভব করেই এক মুহূর্তেই যেন অর্জুনের প্রতি পক্ষপাতগ্রস্ত হয়ে পড়লেন দ্রোণাচার্য। কেউ তো জানে না, কত বড় অপমান হৃদয়ের মধ্যে পুষে রেখে দ্রোণাচার্য শিষ্যদের কাছে এই প্রতিদান কামনা করেছেন। অতএব যে মুহূর্তে অর্জুনের মুখে তাঁর প্রতিজ্ঞাবাক্য শুনেছেন, সেই মুহূর্তে তাঁর কল্পিত ইচ্ছাপূরণের ভাবনায় দ্রোণাচার্য জড়িয়ে ধরেছেন অর্জুনকে। বার বার সস্নেহে তাঁর মস্তকাঘ্রাণ করে আনন্দে কেঁদে ফেলেছেন। দ্রোণাচার্য—প্রীতিপূর্বং পরিষ্বজ্য প্ররুরোদ মুদা তদা। সঙ্গে সঙ্গে প্রিয় পুত্র অশ্বত্থামাকে ডেকে তাঁর হাতখানি অর্জুনের হাতে দিয়ে বলেছেন—বাছা! আজ থেকে এই অর্জুনকে তোমার প্রিয় সখা বলে জানবে। অর্জুন সখার মতো তাঁকে একবার জড়িয়ে ধরলেন বটে, কিন্তু ধর্মানুসারে গুরুপুত্র গুরুবৎ পূজ্য বলে সঙ্গে সঙ্গেই অশ্বত্থামার চরণ স্পর্শ করে বলেছেন—আজ থেকে দ্রোণাচার্যের মতো আমি আপনারও অধীন হলাম, আমি আপনারও শিষ্য বটে—শিষ্যো’হং তৎপ্রসাদেন...পরবানস্মি ধর্মতঃ।

মহাভারতের কথা প্রসঙ্গে অনেকে আমার কাছে অনুযোগ করে বলেন—এই দ্রোণাচার্য বড় পক্ষপাতগ্রস্ত মানুষ, বড়ই একপেশে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। পাণ্ডব অর্জুনের ব্যাপারে তিনি একেবারে অন্ধ। এই অর্জুনের কারণে কর্ণ তাঁর কাছে অস্ত্রশিক্ষা করতে গিয়েও ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন, এই অর্জুনের জন্য নিষাদ একলব্যের বুড়োআঙুল কাটা গেছে... ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি কথাগুলো শুনি আর ভাবি। ভাবি, মানবতার জন্য এই ব্যক্তিদের কত দরদ, কত ভাবনা। মানবতার কারণে যাঁদের এত সমানদর্শিতা তাঁরা কি মানবমনের গহন কথা একটুও বোঝেন? বোঝেন কি, যাঁরা গুরু হন, শিক্ষক হন, আচার্য হন, তাঁরা আগে একজন মানুষ, তারপরে তাঁরা গুরু শিক্ষক অথবা আচার্য। ভাবুন তো, দ্রোণের মনে দ্রুপদের ওপর প্রতিশোধ নেবার যে ভাবনা বার বার আবর্তিত হচ্ছিল—দ্রোণের নিজের ভাষায়—হৃদি সম্পরিবর্ততে—কই সে ব্যাপারে কেউ তো না বুঝে, না শুনে কথা দিলেন না। অর্জুন তো সে কথা দিলেন। তা হলে দ্রোণাচার্যের সুচিরদগ্ধ মানস লোকের কথা ভেবে বলুন—অর্জুনের প্রতি তিনি পক্ষপাতগ্রস্ত হবেন কি না?

এর পরেও কথা আছে। অর্জুন যখন দ্রোণের অস্ত্র-পাঠশালার ছাত্র হলেন, তখন তো সকলের মধ্যে তিনি একজনমাত্র। সেখানে কৌরব-পাণ্ডবরাই শুধু নন, দ্রোণের শিক্ষা পদ্ধতির প্রশংসা এত দূর পৌঁছেছিল যে শূরসেন-মথুরা অঞ্চলের বৃষ্ণি-অন্ধক বংশীয় রাজকুমারেরা তথা অন্যান্য দেশ থেকেও বহু রাজকুমার এসে দ্রোণের কাছে অস্ত্রশিক্ষা আরম্ভ করলেন—বৃষ্ণয়শ্চান্ধকাশ্চৈব নানাদেশ্যাশ্চ পার্থিবাঃ। এঁদের মধ্যে কর্ণও তো ছিলেন। কর্ণের ব্যথায় বিগলিত হৃদয় কিছু অল্পশ্রুত পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—দ্রোণাচার্য কর্ণকে সূতপুত্র বলে শিক্ষাদান অসম্পূর্ণ রেখে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। আমি বলি—ওরে! কর্ণকে প্রত্যাখ্যানের কারণ অন্য। তাঁকে যদি সূতপুত্র বলে প্রত্যাখ্যান করতেন দ্রোণ, তা হলে তিনি তাঁকে পাঠশালাতেই ঢোকাতেনই না। অথচ এটা জলের মতো পরিষ্কার যে, পাণ্ডব-কৌরবদের সঙ্গে কর্ণও অস্ত্রশিক্ষা করতে ঢুকেছিলেন দ্রোণের কাছে—সূতপুত্রস্তু রাধেয়ো গুরুং দ্রোণমিয়াত্তদা।

পাণ্ডব, কৌরব, কর্ণ এবং নানা দেশ থেকে আগত রাজপুত্রদের মধ্যে যিনি অস্ত্রশিক্ষায় সকলকে পিছনে রেখে এগিয়ে যেতে লাগলেন, তিনি কিন্তু সেই অর্জুন। কেমন করে এই এগোনো সম্ভব হল? মহাভারতের কবি বলেছেন—সে তাঁর নিজের গুণ। শিক্ষা, বাহুবল, উদ্যোগ এবং যা তিনি শিখছেন, তার প্রতি ভালবাসা ছিল বলেই শিক্ষাভুজবলোদ্যোগৈঃ... অস্ত্রবিদ্যানুরাগাচ্চ—অর্জুন সবার আগে এগিয়ে গেছেন। দু হাজার বছর আগে একজন শিক্ষকের অনুভূতিতে ব্যাস যা বলে গেছেন, তা এই বিংশ শতাব্দীর শেষ কল্পে দাঁড়িয়ে থাকা

একজন শিক্ষকের অনুভূতির সঙ্গে সমান মিলবে। আমরা বলে থাকি—ক্লাসের মধ্যে মাস্টারমশাই পঞ্চাশ জন ছাত্রকে একই পাঠ পড়ান, কিন্তু সকলের মধ্যে থেকেও এগিয়ে যায় সেই ছাত্র যার অনুসন্ধিৎসা, জিজ্ঞাসা বলবতী এবং শিক্ষিতব্য বিষয়ের প্রতি অনুরাগ প্রবল। মহাভারতের কবি তাই লিখেছেন—সকলকে একরকমভাবে শিক্ষা দিলেও—তুল্যেষ্বস্ত্রপ্রয়োগেষু—তির চালানোর শীঘ্রতা এবং শিল্পীজনোচিত সৌষ্ঠবে অর্জুন সবার আগে এগিয়ে রইলেন—সর্বেষামেব শিষ্যানাং বভূবাভ্যধিকো'র্জুনঃ।

এবারে আপনারা বলুন, এইরকম ছাত্রের প্রতি দ্রোণাচার্যের মতো অসাধারণ শিক্ষকের পক্ষপাত তৈরি হবে কি না। দ্রোণাচার্য নিজেও কি কম চেষ্টা করেছেন? মানুষ তো! মানুষের মনের গহনে কতরকম টানাপোড়েন থাকে। ভুলে গেলে চলবে না—দ্রোণের নিজের পুত্রটিও কিছু কম নন। যে সময় পাণ্ডব কৌরবরা কৃপাচার্যের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করছেন, সেই সময় অশ্বত্থামা তাঁদের অস্ত্রের তালিম দিতেন। কিন্তু সবার সঙ্গে যখন একত্র অস্ত্রবিদ্যার আসর বসল, তখন দ্রোণ সবিস্ময়ে লক্ষ করলেন—তাঁর প্রিয় পুত্র অশ্বত্থামা অন্তত একজনের চাইতে পিছনে পড়ে যাচ্ছেন, তিনি অর্জুন। হাজার হলেও পিতা তো? কোন পিতা পিতার ধর্মে এমন ঘটনা সইতে পারবেন যে, অসাধারণ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পুত্রটি তাঁর শিষ্যের চেয়ে পিছিয়ে পড়ছে।

দ্রোণ চেষ্টা আরম্ভ করলেন, যাতে অশ্বত্থামাকে আলাদা করে একটু বেশি শিখিয়ে দেওয়া যায়। ওই 'স্পেশাল কোচিং' বলি যাকে তাই। তিনি করলেন কী—সকালবেলায় বালকেরা যখন সন্ধ্যাআহ্নিক করার জন্য জল আনতে যায়, তখন তাঁদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে কমণ্ডলু দিয়ে দিলেন। আর অশ্বত্থামাকে দিলেন একটি কলসি। কমণ্ডলুর মুখ ছোট, গুবগুব করে জল ভরতে সময় লাগে, বালকেরা তাতে মজাও পায়, এবং তাতে আরও সময় যায়। আর অশ্বত্থামা কলসিতে ঘপাত করে জল ভরে আগে চলে আসেন পিতার কাছে। যতটুকু সময় এতে একান্তে পাওয়া যেত, তাতে ধনুর্বিদ্যার কিছু নতুন কৌশল অশ্বত্থামাকে শিখিয়ে দিতেন দ্রোণ। আপনারা কি এটাকেও পুত্রের প্রতি পক্ষপাত বলবেন না? বললেও ক্ষতি নেই, কেননা একজন স্নেহশীল পিতা নিশ্চয়ই কোনও ধর্মাধিকরণের 'জজসাহেব' নন, যে তাঁকে শত্রু এবং মিত্রের প্রতি সমান ব্যবহার করে ধর্মবিপ্লব রোধ করতে হবে।

কিন্তু শিক্ষার প্রতি অর্জুনের কী অসামান্য ধ্যান দেখুন, দ্রোণাচার্যের মতো পক্ষপাতগ্রস্ত পিতাও শেষপর্যন্ত পুত্রকে ছেড়ে শিষ্যের প্রতি অধিক পক্ষপাতী হতে বাধ্য হলেন। বিষয়ের প্রতি অনুরাগ এবং ধ্যান অর্জুনের এতই বেশি যে, দু'দিনেই তিনি অশ্বত্থামার কলসি-রহস্য ধরে ফেললেন। এরপর থেকে তিনি অস্ত্রের সাহায্যে কমণ্ডলুতে জল ভরে অশ্বত্থামার সঙ্গেই উপস্থিত হতে লাগলেন আচার্যের কাছে—সমমাচার্যপুত্রেণ গুরুমভ্যেতি ফাল্গুনঃ। দ্রোণের আর উপায় রইল না। যেটুকু তিনি বাড়তি শেখাচ্ছিলেন অশ্বত্থামাকে, তা শেখাতে হল অর্জুনকেও। ফলে নিজ পুত্রের অস্ত্রবিদ্যার সঙ্গে অর্জুনের ক্ষমতার কোনও তফাত রইল না—ন ব্যহীয়ত মেধাবী পার্থো'স্ত্রবিদুষাং বরঃ।

রামকৃষ্ণ মিশনের এক সাধুমহারাজ ছাত্রদের বলতেন—ওরে! যেখানে যা ভাল পাবি, চুরি করে নে। যে ছাত্র এমন করে চুরি করতে পারে, তার ওপরে শিক্ষক-গুরুর পক্ষপাত হবে না! তবু দ্রোণ শেষ চেষ্টা করেছিলেন যাতে প্রিয় পুত্রের সঙ্গে প্রিয় শিষ্যের অন্তত একটা ব্যাপারে তফাত থাকে। অন্তত একটা বিশেষ কলা, একটা বিশেষ কৌশল, যেখানে অর্জুনের একটু কমতি থেকে যাবে। প্রিয় পুত্র যাতে বলতে পারে—আমি মহামতি দ্রোণাচার্যের পুত্র। অস্ত্রকৌশলে আমার সমকক্ষ কেউ নেই। দ্রোণাচার্য চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু হল কই।

দ্রোণাচার্যের শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা ধনুর্বিদ, তাঁদের পাঠ তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

ধনুর্বিদ্যার চরম কৌশল হল শব্দভেদ—অর্থাৎ লক্ষ্যবস্তু চোখে না দেখে শুধুমাত্র শব্দ শুনে লক্ষ্যভেদ করা। শিক্ষার পাট যখন শেষ হয়ে আসে, তখন কেউ বা এ বিদ্যা শেখার চেষ্টা করে, কিন্তু বিদ্যা শেষের সঙ্গে ধৈর্যও শেষ হয়ে আসে বলে অনেকেরই আর এ বিদ্যা শেখা হয় না। শব্দভেদের সবচেয়ে বড় কৌশল হল অভ্যাস, নিরন্তর অভ্যাস। বিদ্যা শেষে যে ধানুষ্ক হয়ে ওঠে, সে ভাবে—যথেষ্ট হয়েছে, আর কত। এই তৃপ্তিই শেষপর্যন্ত শব্দভেদের বাধা হয়ে ওঠে। ওদিকে আরেক আশ্চর্য, দ্রোণাচার্য এ বিদ্যা শেখানোর নামও করছেন না। কিন্তু যে ছাত্র ধ্যানী, যে মেধাবী এবং সতত চেষ্টাশীল, সে কিন্তু নিজের মধ্যেই বুঝতে পারে—কতটুকু তার শেখা হল, আর কতটুকু তার বাকি রইল অথবা এতটুকুও বা বাকি থাকবে কেন? দ্রোণ বুঝতে পারছিলেন—অর্জুন এমনভাবেই এগোচ্ছেন, যাতে শব্দভেদের দিকে তাঁর নজর আছে। অথচ দ্রোণ কিছুতেই রহস্যটা বলছেন না। তিনি চাইছিলেনও না যাতে এ বিদ্যা অর্জুনের করায়ত্ত হয়।

দ্রোণাচার্যের আবাসস্থল হিসেবে যে গৃহখানি ভীষ্ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, সেখান থেকে তাঁর শিষ্যদের আবাসস্থল খুব দূরে নয়। সে আবাসস্থল অনেকটা এখনকার রেসিডেনশিয়াল কলেজের হোস্টেলের মতো। সেখানে ছাত্রদের খাবারদাবার ব্যবস্থা করে একজন পাচকঠাকুর। দ্রোণাচার্যকে সে ভালমতোই চেনে। একদিন ছাত্ররা যখন ঘরে নেই, তখন দ্রোণ এসে পাচকঠাকুরকে ডেকে বললেন—তুমি কখনও অন্ধকারের মধ্যে অর্জুনকে খেতে দিয়ো না—অন্ধকারে'র্জুনায়ান্নং ন দেয়ং তে কদাচন—আবার আমি যে এ কথা তোমাকে বলে গেলাম, সেটাও যেন অর্জুনকে বোলো না। পাচকঠাকুর আচার্যের কথার কোনও মাথামুণ্ডু বুঝল না। পূর্বেও সে যে কখনও অন্ধকারে অর্জুনকে খেতে দিয়েছে। এবং সেই জন্যই এই সতর্কীকরণ কি না—তাও তার তেমন ঠাহর হল না। অথবা আচার্য-বিদ্বানদের কখন কী মনে হয়, কী ভেবে তাঁরা আদেশ দেন—এসব ব্যাপারে তার যথেষ্ট মর্যাদাবোধ থাকায় সে সঙ্গে সঙ্গে দ্রোণাচার্যের আদেশ মেনে নিল।

কিন্তু দ্রোণাচার্য মনে মনে যা ভেবেই কথা বলুন, মেধাবী এবং উদ্যোগী পুরুষের কাছে ভাগ্যদেবী স্বয়ংবরা হন। সেদিন সারাদিন অস্ত্রাভ্যাসের পর পাঁচ ভাই পাণ্ডব খেতে বসেছেন। অন্ধকার রাত্রি বটে, তবে এই আবাসগৃহে তৈলপূর প্রদীপখানি যথেষ্টই ভাল জ্বলছিল। এই অবস্থায় কোথা থেকে উতলা হাওয়া এল আর প্রদীপখানি নিভে গেল—তেন তত্র প্রদীপঃ স দীপ্যমানো নিবাপিতঃ। ক্ষণিকের জন্য হতচকিত হলেও প্রদীপের অপেক্ষায় না থেকে অবশিষ্ট অন্ন যথাসম্ভব খেয়ে নেওয়াই ভাল—এই বুদ্ধিতে অর্জুন তাঁর ভোজনপর্ব চালিয়ে যেতে লাগলেন। অভ্যাসবশত খাবার গ্রাস ঠিক মুখেই যেতে লাগল। অন্নের আধারে হস্ত প্রসারণ থেকে আরম্ভ করে মুষ্টিবদ্ধ অন্ন মুখে প্রবেশ করানোর মধ্যে পর্যন্ত যতগুলি ক্রিয়াকলাপ আছে, তার কোনওটাই তো আটকে রইল না অন্ধকারে—ভুক্তং এব তু কৌন্তেয়ো নাস্যাদন্যত্র বর্ততে।

অর্জুন প্রথমটায় অত ভাবেননি, তার পরেই খেয়াল হল—আরে তাই তো। কোনওই তো অসুবিধে হচ্ছে না। তা হলে অভ্যাসই হল সেই রহস্য যা তাকে শব্দভেদেও সাহায্য করবে। সেই অন্ধকার রাত্রে অন্য বালকেরা যখন শ্রান্ত শরীরে ঘুমিয়ে পড়ল, অর্জুন তখন রাত্রিভেদী শব্দ শুনে কল্পিত লক্ষ্যের ওপর বাণক্ষেপ করতে লাগলেন। বাণক্ষেপের শন শন শব্দ ঠিক যাঁর কানে পৌঁছোল, তিনি আর কেউ নন, দ্রোণাচার্য ছাড়া—তস্য জ্যাতলনির্ঘোষং দ্রোণঃ শুশ্রাব ভারত। কথায় বলে—সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। দ্রোণ বুঝতে পারলেন—নব-নবোন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা যাঁর অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে, সে আপনিই সেই অপ্রতিপাদিত বিদ্যা করায়ত্ত করে। দ্রোণাচার্য এই অমানুষী প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়েছেন বিনা দ্বিধায় এবং সঙ্গে সঙ্গে। রাত্রির প্রৌঢ়তা এবং আপন প্রৌঢ়তার সমস্ত অবসাদ মুছে ফেলে তিনি সেই রাতের অন্ধকারেই শয়ন ছেড়ে উঠে এসেছেন নির্জন বনভূমিতে, যেখান থেকে

আওয়াজ আসছিল শন শন করে ছুটে যাওয়া অর্জুনের শব্দভেদী বাণের। দ্রোণ অর্জুনকে আলিঙ্গন করে বললেন—বাছা। আজ থেকে আমি তোমার শিক্ষার জন্য এমনই চেষ্টা করব, যাতে আর কেউ পৃথিবীতে তোমার সমকক্ষ ধনুর্ধর না হয়ে ওঠে—ত্বৎসমো ভবিতা লোকে সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে।

এই ঘটনার পরে আবারও আমি জিজ্ঞাসা করছি—এমন শিষ্যের ওপর শিক্ষক-গুরুরা পক্ষপাতী হবেন কি না? হবেনই, তিনি যদি মানুষ হন, মানুষের হৃদয় যদি তাঁর দেহে থাকে, তবে এমন উপযুক্ত গুণী শিষ্যের ওপর তাঁর পক্ষপাত আসবেই। শিক্ষকের পক্ষপাত-দোষকে গুণ বলে না মানলে অনেক ভাল ছেলেই আজকে আরও ভাল হতে পারত না। ভাল ছেলের ওপর পক্ষপাত আসবেই। আমাদের মাস্টারমশাইদেরও এই পক্ষপাত ছিল, আমাদেরও আছে। আর এখানে অর্জুনের মতো মেধাবী শিষ্যের প্রতি দ্রোণাচার্য যা করেছেন, তাতে আমার তো রামদাস বাবাজিমশায়ের কীর্তনের আখর মনে পড়ে। চৈতন্যদেব আর যবন হরিদাসের গুণকীর্তন করতে গিয়ে তিনি গাইতেন—‘গাইব বলো কার গুণ প্রভুর গুণ কি দাসের গুণ? গুণেতে কেহ নহে ঊন। গাইব বলো কার গুণ? অর্জুন নিজের অভ্যাসে অধ্যবসায়ে যা করেছেন, তাঁর প্রত্যেক পদক্ষেপে দ্রোণাচার্য তাঁর প্রিয় শিষ্যের মর্যাদা দিতে ভোলেননি এবং এই মর্যাদাবোধ আচার্য তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত পোষণ করেছেন। সেটা পরের কথা, অতএব সে কথা পরেই হবে।

আপাতত আরও দুটো কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার। সেটা হল, অর্জুনের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কারণে তিনি দুটি তথাকথিত অন্যায় করেছেন, যাতে বিংশ শতাব্দীর পরিশীলিত যুক্তিতে তিনি অশ্রদ্ধেয় হয়ে পড়েছেন। এর একটি কর্ণকে প্রত্যাখ্যান এবং অন্যটি একলব্যের প্রতি তাঁর নিষ্ঠুর ব্যবহার। এই দুটি ঘটনার মধ্যে প্রথমটি আমার চোখে একেবারেই অন্যায় নয় এবং দ্বিতীয়টি অবশ্যই অন্যায়, কিন্তু শিক্ষকের পক্ষপাত-দোষের মহিমায় তা ব্যাখ্যাও করা যায়। প্রথমে কর্ণের কথা বলি। কর্ণ দ্রোণাচার্যের পাঠশালায় ভর্তি হয়েছিলেন কৌরব-পাণ্ডবদের সঙ্গেই। তিনি যে অধিরথ সূতপুত্র, সেইভাবেই অন্যেরাও যেমন জানত, তেমনই দ্রোণাচার্যও তাই জানতেন। সূতজাতীয় বলে দ্রোণাচার্যের শিক্ষাশ্রমে প্রবেশ করতে তাঁর কোনও অসুবিধে হয়নি। কিন্তু দ্রোণের কাছে ঢুকে কৌরব-পাণ্ডবদের সতীর্থ হওয়ার আরও একটি বড় কারণ ছিল কর্ণের; সেটা হল, তিনি দুর্যোধনের বন্ধু। দুর্যোধনের মনের মধ্যে যে জ্ঞাতিশত্রুতার বিষ ছিল, যে পাণ্ডববিদ্বেষ তাঁর শোণিত-শিরায় ব্যাপ্ত হয়েছিল সেই বিদ্বেষবিষ তিনি সফলভাবে সংক্রমিত করতে পেরেছিলেন বন্ধু কর্ণের হৃদয়ে।

পাণ্ডব-কৌরবরা যখন দ্রোণের কাছে আসেননি, হয়তো তাঁরা তখনও কৃপাচার্যের পাঠশালায়, সেই তখন থেকে কর্ণ অর্জুনের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে আসছেন। কারণে অকারণে অস্ত্রশিক্ষা নিয়ে অর্জুনকে কটু কথা শোনান, যখন তখন তাঁকে অপমান করে অনর্থকভাবে প্রতিযোগী করে তুলতে কর্ণ মজা পেতেন এবং এ সবই তিনি করতেন দুর্যোধনের প্রশ্রয়ে—স্পর্ধমানস্তু পার্থেন সূতপুত্রো’মর্ষণঃ। দুর্যোধনমুপাশ্রিত্য সো’বমন্যত পাণ্ডবান্॥ যিনি আগে থেকেই এই ধরনের হীনতা করে আসছেন, তিনি যে দ্রোণের কাছে শিক্ষা নিতে এসেছেন সেই প্রতিযোগী মনোভাব নিয়েই, সেটা মহাভারতের কবি লুকোননি। তিনি লিখেছেন—যে কর্ণ অর্জুনের সঙ্গে সবসময় টক্কর দিতে চাইতেন, তিনি একই সঙ্গে ঢুকলেন দ্রোণের অস্ত্র-পাঠশালায়।

যে কর্ণ আগে এইভাবে অর্জুনের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন, তিনি যে দ্রোণের শিক্ষাশ্রমে ঢুকে হঠাৎ ভদ্রলোক হয়ে যাবেন, এটা ভাবার কোনও কারণ নেই এবং দ্রোণাচার্যও তা ভাবতেন না। কর্ণ অর্জুনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছিলেন না। নারদমুনি সেই

শান্তিপর্বে আমাদের জানিয়েছেন যে, অর্জুন এবং ভীমের অস্ত্রক্ষমতা দেখে কর্ণের রাগ বেড়েই চলছিল—চিন্তয়ানো ব্যদহ্যত। অন্যদিকে দুর্যোধন জ্ঞাতিশত্রুতার কারণে পাণ্ডবদের ওপর যে হিংসা করতেন, সেই হিংসার সাধারণ ধর্মটুকু মিলে গেল কর্ণের হিংসার সঙ্গে। কর্ণ যেহেতু অর্জুনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছিলেন না, অতএব তাঁর হিংসার প্রতিফলন ঘটল ওই প্রতিযোগী মনোভাবের মধ্যেই। দ্রোণাচার্যের অস্ত্রবিদ্যার পাঠশালায় কর্ণ এমন কিছু খারাপ ছাত্র ছিলেন না, আর তা ছিলেন না বলেই মনে মনে তিনি নিজের খামতিটুকু বেশ বুঝতে পারছিলেন।

দ্রোণাচার্য এসব খবর জানতেন। একজন গুরুমশাই যখন একটি পরিবার এবং তাঁর ঘরের আবাসিক হয়ে যান, তখন সেই পরিবারের সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ, মান অপমান তাঁকে একটু একটু করে স্পর্শ করতে থাকে। তিনি নিজে সরাসরি কোনও ব্যাপারে না জড়ালেও ঘরের মধ্যে জ্ঞাতিশত্রুতার পর্বতখানি যদি বহ্নিমান হয়, তবে তার আঁচটুকু পরবাসী আবাসিকের গায়ে লাগতে থাকে। কুরুবাড়ির ছত্রছায়ায় থাকতে থাকতে কুরুবাড়ির পারিবারিক রাজনীতি দ্রোণাচার্য একটু একটু করে বেশ বুঝতে পারছিলেন। দুর্যোধনের মনে যে পাণ্ডববিদ্বেষ ছিল, তা দ্রোণের পাঠশালায় আসা-মাত্র স্তব্ধ হয়ে শান্ত রসে পরিণত হবে —এটা যদি ভাবা না যায়, তবে দ্রোণাচার্য যে সেটা বুঝতেও পারতেন, এটা ভাবাই স্বাভাবিক। একইভাবে কর্ণ তাঁর প্রতিযোগী মনোভাবে অর্জুনকে যে সবসময়ই অতিক্রম করার চেষ্টা করছিলেন, সেটাও দ্রোণের মতো বুদ্ধিমান গুরুর অজানা থাকার কথা নয়।

তা হ্যাঁ, প্রতিযোগিতা খুবই ভাল জিনিস, দুই ছাত্রের প্রতিযোগিতায় দুজনেরই উপকার হয়, এটাও দ্রোণগুরু ভালই বুঝতেন। কিন্তু সময় যত যেতে লাগল, ততই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল যে, কর্ণ অর্জুনের সঙ্গে অস্ত্রশিক্ষায় পেরে উঠছেন না। কর্ণ নিজেও মনে মনে এটা বেশ বুঝতে পারছিলেন—সর্বথাধিকমালক্ষ্য ধনুর্বেদে ধনঞ্জয়ম্। এরকম একটা অবস্থা যখন হয়, তখন অসফল প্রতিযোগী, কূট উপায় এবং কূট কৌশল অবলম্বন করে সফল প্রতিযোগীকে যে কোনওভাবে হারাতে চায়, বিশেষত তার মনে যদি প্রতিহিংসার আগুন জ্বলতে থাকে।

এই কূট কৌশল কী? মারণাস্ত্র। কর্ণ যদি এমন কোনও মারণাস্ত্রের উপযোগ করতে পারেন, যার কাছে অর্জুনের অস্ত্রকৌশল খাটবে না, রণনৈপুণ্য বা অস্ত্রচালনার ক্ষিপ্রতা কোনই কাজে লাগবে না, তবে অর্জুনকে সর্বদা ভীতসন্ত্রস্ত করে রাখতে পারেন কর্ণ। কর্ণ সেই মারণাস্ত্র চান এবং তা দ্রোণের কাছেই আছে। একদিন যখন দ্রোণাচার্য আপন গৃহে বসে আছেন একাকী, তাঁর শিষ্য, অনুগামী এমনকী তাঁর পুত্র পর্যন্ত যখন তাঁর ঘরে নেই, তখন কর্ণ দ্রোণাচার্যের কাছে এসে বসলেন নিভৃতে। বললেন—গুরুদেব। আমি ব্রহ্মাস্ত্র মোক্ষণ করার কৌশল শিখতে চাই। শিখতে চাই এই অস্ত্র সংবরণের উপায়ও। কেন শিখতে চাই জানেন? এই বিদ্যা শিখলে আমি অর্জুনের সমান হতে পারি, তার সঙ্গে সমানে সমানে যুদ্ধও করতে পারি—অর্জুনেন সমং চাহং যুধ্যেয়ম্ ইতি মে মতিঃ।

অর্জুন নিজে এতদিন গুরু দ্রোণাচার্যের কাছ থেকে ব্রহ্মাস্ত্র চালনার অন্ধিসন্ধি শিখেছেন কি না, তা পরিষ্কার নয়। যদি তা না শিখেও থাকেন, তবে দ্রোণাচার্যের যত পক্ষপাত আছে অর্জুনের ওপর, তাতে এই বিদ্যা যে একদিন তাঁর অধিগত হবে, সে কথা কর্ণ ভালভাবেই জানতেন। গুরু হিসেবে দ্রোণ যেন একের প্রতি পক্ষপাতী হয়ে অন্যের প্রতি বিষমদর্শী না হন, কর্ণ তাই বললেন—গুরুদেব! সমস্ত শিষ্যের ওপর আপনার সমদৃষ্টি, আপনি নিজের পুত্রের সঙ্গে পর্যন্ত শিষ্যদের ভেদ করেন না—সমঃ শিষ্যেষু বঃ স্নেহঃ পুত্রে চৈব তথা ধ্রুবম্।

কর্ণ দ্রোণাচার্যের এই সমদর্শিতার কথা এত সাড়ম্বরে উল্লেখ করলেন এইজন্য যাতে তিনি বিগলিত হয়ে কর্ণকে সে যুগের চরম এবং পরম অস্ত্রের প্রয়োগসন্ধি শিখিয়ে দেন। কিন্তু দ্রোণাচার্য কিছু কম বুদ্ধিমান মানুষ নন। সেই ছোটবেলা থেকে যাঁকে অন্নের জন্য এবং অস্তিত্বের জন্য 'স্ট্রাগল' করতে হয়েছে, তিনি বেশ বোঝেন, কে, কী ভেবে কথা বলছে। বিশেষত কৌরবদের ঘরে পিতৃহীন পাণ্ডবদের অবস্থিতি এবং মর্যাদার কথা তাঁর অজানা নয়। দুর্যোধন-কর্ণরা অর্জুন-ভীমদের কী নজরে দেখেন, তাঁদের প্রতি কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র এবং সমস্ত রাজযন্ত্রের কতটুকু সমমর্মিতা আছে, দ্রোণাচার্য তা নিজের জীবনের নিরিখেই বুঝতে পারেন। কুরুগৃহে বহুদিন আবাসিক হবার দরুন সবই তাঁর কানে আসে। পাণ্ডব অর্জুন কেন যে অমন অসামান্য দৃঢ়তায় নিজেকে অসম্ভব রকমের প্রস্তুত করে তুলছেন, দ্রোণাচার্য তা হৃদয়ঙ্গম করেন বলেই অর্জুনের ওপর দ্রোণাচার্যের আলাদা মায়া আছে।

ফলে কর্ণের ওই চাটুকারিতা দ্রোণাচার্যের পছন্দ হল না, তাঁর হৃদয়ও সমদর্শিতার নীতিকথায় বিগলিত হল না। বিনয়ী এবং মেধাবী অর্জুনের ওপর যে পক্ষপাতে তাঁর চিত্তবৃত্তি মুগ্ধ ছিল, সেই মুগ্ধতাতে কিছুতেই তিনি ভাবতে পারলেন না যে, বিনা আয়াসে লব্ধ ব্রহ্মাস্ত্র তাঁর প্রিয় শিষ্যের ওপর প্রযুক্ত হোক। যে কর্ণ এখনও পর্যন্ত অস্ত্রকৌশলে অর্জুনের সমকক্ষ হতে পারেননি, তিনি অনুপযুক্ত অবস্থায় ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করে অর্জুনের সমকক্ষ হয়ে উঠবেন— দ্রোণের ভাবনায় এটা কোনও সমদর্শিতা নয়। অর্জুনের ওপর তাঁর অতি পৃথক এক মায়ালু অভিব্যক্তিতেই—সাপেক্ষঃ ফাল্গুনং প্রতি—দ্রোণাচার্য যেমন কর্ণকে ব্রহ্মাস্ত্রের কৌশল শেখাতে চান না, তেমনই কর্ণের দুষ্ট অভিসন্ধির কথাও তিনি বেশ ভাল করে অনুধাবন করেছিলেন বলেই অপরিশীলিত-বুদ্ধি কর্ণের হাতে এই মারাত্মক অস্ত্রের প্রযুক্তি তিনি তুলে দিতে চাননি—দৌরাত্ম্যঞ্চৈব কর্ণস্য বিদিত্বা তমুবাচ হ।

তবে হ্যাঁ, যাঁকে তিনি প্রত্যাখ্যান করছেন, তিনিও তাঁর শিষ্য বটে। অন্তত শিষ্য বলেই তাঁকে এমন কথা বলা যায় না যে,—দেখো হে! তুমি অতি অসভ্য বদমাশ, তোমার মনের পাপ আমি জানি, অতএব তোমাকে ব্রহ্মাস্ত্রের কৌশল শেখাব না। দ্রোণাচার্য তাই কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করার অন্য উপায় গ্রহণ করলেন। তিনি কর্ণকে ঘুরিয়ে বললেন—কী বললে বৎস। ব্রহ্মাস্ত্র। ব্রহ্মাস্ত্রের সন্ধি জানবার অধিকার আছে শুধু ব্রাহ্মণের, সচ্চরিত্র ব্রতচারী ক্ষত্রিয়ের, এমনকী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীও ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করতে পারেন, কিন্তু অন্য কেউ নয়— নানো বিদ্যাৎ কথঞ্চন।

ঠিক এই শব্দগুলির উচ্চারণ থেকেই আজকের দিনের বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন—কর্ণ সূতপুত্র বলে চিহ্নিত বলেই দ্রোণ তাঁকে বিদ্যাদান প্রত্যাখ্যান করেছেন। এঁরা বোঝেন না—দৈব তথা মারণাস্ত্র লাভ করার জন্য যে নিষ্কাম নিরপেক্ষতা দরকার, কর্ণের তা ছিল না। ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত ক্রোধ চরিতার্থ করার জন্য মারণাস্ত্রের প্রযুক্তি সেকালে শেখানো হত না। সমস্ত মহাভারত ভাল করে পড়লে দেখা যাবে—মারণাস্ত্র ঠিক তাঁদের কাছেই আছে, যাঁরা অস্ত্রপ্রয়োগের ক্ষেত্রে সংযমী এবং বিনয়শিক্ষায় শিক্ষিত। ঠিক এইজন্যই ব্রাহ্মণ, ব্রতচারী ক্ষত্রিয় অথবা সন্ন্যাসীর নাম করেছেন দ্রোণ এবং তা করেছেন সংযমের প্রতীক হিসেবে।

লক্ষ করে দেখুন, দ্রোণ অর্জুনকে ব্রহ্মাস্ত্রের প্রযুক্তি দান করেছেন। তিনি তাঁর গুরুদত্ত ব্রহ্মশির অর্জুনকে দান করবার সময় অর্জুনকে যথেষ্ট সংযত জানা সত্ত্বেও বলেছিলেন— দেখো বৎস! এই অস্ত্র সকলের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র এবং অপ্রতিরোধ্য। তুমি কোনও ভাবেই মানুষের ওপর এই অস্ত্র প্রয়োগ করবে না। তা করলে জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। তুমি এই অস্ত্র ধারণ করবে যথেষ্ট সংযত হয়ে এবং যা এতক্ষণ বললাম তা যেন তুমি শুনো—তদ্ধারয়েথাঃ প্রযতঃ শৃণু চেদং বচো মম। দ্রোণ আরও একটা কথা বলেছেন এবং সেটা অনেকটা

এখনকার ‘নিউক্লিয়ার ডেটারেন্টে’র মতো শোনাবে। দ্রোণ বলেছেন—মানুষ ছাড়া অন্য কোনও অসামান্য শত্রু যদি তোমাকে আক্রমণ করে তবে বাধা দেবার জন্যই শুধু এই অস্ত্র যুদ্ধের সময় প্রয়োগ করবে—তদ্‌বাধায় প্রযুঞ্জীথা স্তদাস্ত্রমিদমাহবে।

ভারতের পরমাণু বিস্ফোরণের পর বিরোধী পক্ষের অনেক কুশলীদের বলতে শুনলাম—যে অস্ত্র প্রয়োগ করাই যাবে না, কেননা অনেক পরমাণু শক্তিধর দেশই অনেক প্ররোচনা সত্ত্বেও পরমাণু শক্তি হাতে নিয়েই বসে আছেন, কিন্তু প্রয়োগ করেন না, তবে ভারত এই বিস্ফোরণ ঘটাল কেন? এই বিরোধীদের সবিনয়ে সেকালের পরমাস্ত্র-গুরু দ্রোণাচার্যের কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিই। দ্রোণ বার বার বলেছেন—একজনের কাছে ব্রহ্মাস্ত্র আছে, এইটাই পরম সম্মানের কথা এবং শত্রুর কাছে তা ভয়ের কথা। এই অস্ত্র প্রয়োগ করতে বারণ করছেন দ্রোণ—ন চ তে মানুষেষ্বেতৎ প্রয়োক্তব্যং কথঞ্চন। কিন্তু শত্রুকে বাড়তে না দেবার জন্য অথবা তাকে সংযত রাখার জন্য দ্রোণ শুধু বলছেন—তুমি সংযত হয়ে শুধু এই অস্ত্র ধারণ করো—তদ্‌ধারয়েথাঃ প্রযতঃ। বস্তুত অস্ত্রবিদ্যার চরম কৌশল এইটাই—সমস্ত বিশ্বে, সমস্ত যুগে এ কথা সত্য যে, সব শ্রেষ্ঠ অস্ত্র ধারণ করেই তবে শান্তির কথা বলা যায়। এখানে ‘ডিফেন্স;টাই ‘অফেন্সে’র কাজ করে—মারণাস্ত্র ধারণের সেইটাই কৌশল। ব্রহ্মাস্ত্র আছে—এই অস্তিত্ব ভাবনা যদি শত্রুর মনে প্রকট করে তোলা যায়, তবে সেটা ‘অফেন্সিভ ওয়র’-এর থেকেও কাজ দেয় বেশি। দ্রোণ তাই বলেছেন—ধারয়েথাঃ—ধারণ করো, কিন্তু —ন প্রযোক্তব্যম্—প্রয়োগ কোরো না।

অর্জুন শেষপর্যন্ত তাঁর গুরুর কথা রেখেছিলেন। আগেই তো বলেছি—দ্রোণাচার্যও মানুষ। মানুষের মমত্ব এবং মায়া সমস্ত নীতিকে অতিক্রম করে বলেই তিনি নিজ পুত্র অশ্বত্থামাকেও ব্রহ্মশির অস্ত্র দিয়েছিলেন। হয়তো অর্জুনকে দ্রোণ যেমন উপদেশ করেছিলেন, তেমনই করেছিলেন অশ্বত্থামাকেও। কিন্তু চরিত্রগতভাবেই অশ্বত্থামা কিছু ক্রোধী মানুষ ছিলেন, মহাস্ত্র ধারণের চূড়ান্ত সংযম তাঁর ছিল না। নইলে অত বড় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে রথী মহারথীদের মারবার জন্যও যেখানে অর্জুন কোনও ব্রহ্মশির, পাশুপত অস্ত্রের স্মরণও করেননি, অশ্বত্থামা সেই অস্ত্র মোক্ষণ করেছিলেন জগদ্‌ধ্বংসের প্রতিজ্ঞায়। অন্যদিকে অশ্বত্থামার ব্রহ্মশিরকে বাধা দেবার জন্য অর্জুন পাশুপত অস্ত্র মুক্ত করলেও বিশ্বজনহিতায় তিনি তা সংবরণও করে নিয়েছিলেন, কিন্তু দ্রোণের প্রশ্রয়লব্ধ প্রিয় পুত্র অশ্বত্থামার ব্রহ্মশির শেষপর্যন্ত জগদ্‌ধ্বংস না করলেও, তা পাণ্ডব কৌরবের শেষ সন্তান-বীজটিকে ধ্বংসই করে দিয়েছিল প্রায়। বেশ বোঝা যায়, অশ্বত্থামার সেই সংযম ছিল না, যা অর্জুনের ছিল এবং দ্রোণ সেটা বেশ বুঝতেও পেয়েছিলেন অনেক আগে থেকেই এবং তাঁর ভুল হয়নি। অর্জুন অশ্বথামার ব্রহ্মশির বাধা দিতে গিয়েই অন্যতম মারণাস্ত্র মুক্ত করেছিলেন এবং সময় তা সংবরণও করে নিয়েছিলেন।

অশ্বত্থামার মতো এক বিশাল মাপের মানুষও যেখানে সংযম সাধনায় ব্যর্থ হন, সেখানে কর্ণকে ব্রহ্মাস্ত্র দিলেও যে ভুল হত, তার প্রমাণ কর্ণের অন্য ব্যবহারে। কর্ণ ইন্দ্রের দেওয়া অস্ত্র সযত্নে তুলে রেখেছিলেন অর্জুনকে মারার জন্য। কিন্তু যেদিন ভীমপুত্র ঘটোৎকচের প্রবল আক্রমণে কৌরববাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে উঠল, সেদিন অন্যের প্ররোচনায় কর্ণ তা প্রয়োগ করলেন ঘটোৎকচের ওপর। কাজেই ব্যক্তিগত অসংযম এবং প্রধানত দুর্যোধনের প্ররোচনায় যিনি চলছিলেন, তাঁকে দ্রোণাচার্যের মতো আচার্য চিনতে পারবেন না, এমন হয় না। তিনি ঠিকই করেছিলেন।

দ্রোণাচার্যের আর এক কলঙ্ক হলেন একলব্য। অন্যান্য রাজপুত্রেরা যখন এখান ওখান থেকে এসে দ্রোণাচার্যের অস্ত্র-পাঠশালায় ভর্তি হতে লাগল, তখন নিষাদ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্যও এসেছিলেন দ্রোণের শিষ্য হতে। কিন্তু দ্রোণাচার্য তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেন এই

কথা ভেবে যে, রাজপুত্রদের সঙ্গে একত্রে নৈষাদি একলব্যকে শিক্ষা দেওয়া ঠিক হবে না—ন স তং প্রতিজগ্রাহ নৈষাদিরিতি চিন্তয়ন্। স্বাভাবিকভাবেই আজকের বিংশ শতাব্দীর পরিশীলিত যুক্তিতে আমাদের মনে হবে যে, দ্রোণাচার্য উচ্চনীচ ভেদ এবং জাতিভেদকে প্রশ্রয় দিয়ে নিষাদ একলব্যকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

এসব কথা বলাই যায় এবং বললে দ্রোণাচার্যের সমর্থনে যুক্তি খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। তবে হ্যাঁ, একলব্যকে প্রথম প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে দ্রোণের দিক থেকেও একটু ভেবে দেখার আছে। ভেবে দেখুন, এই মুহূর্তে ভীষ্মের আনুকূল্যে দ্রোণাচার্য কুরু রাজবাড়ির আশ্রিত। রাজপুত্রদের শিক্ষা সফলভাবে শেষ হলেই তবে দ্রোণাচার্যের ভবিষ্যতও সংরক্ষিত হবে। অতএব কুরুবাড়ির রাজপুত্রদের সঙ্গে অন্যান্য শিক্ষার্থী রাজপুত্রদের একত্রে শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে দ্রোণ কিছু স্বারোপিত স্বাধীনতা ব্যবহার করলেও নিষাদপুত্র একলব্যকে একসঙ্গে শিক্ষা দিলে রাজবাড়ির উচ্চ পর্যায়ে যদি বিরূপতা সৃষ্টি হয়, সেটা স্বয়ং আচার্যের ভবিষ্যত গঠনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। যে কোনও স্বার্থানুসন্ধিৎসু মানুষ এমন নির্বুদ্ধিতা করবেন না, অতএব দ্রোণও একলব্যকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

এ ছাড়া শিক্ষাদানের অনুকূল পদ্ধতি নিয়েও দ্রোণের দিকে কিছু যুক্তি আছে। মহাভারতের শব্দ-ব্যবহারটি খেয়াল করে দেখুন—নৈষাদিরিতি চিন্তয়ন্—ছেলেটা নিষাদ এই কথা ভেবে এবং দ্বিতীয়ত—তেষামেব অন্ববেক্ষয়া—অর্থাৎ রাজপুত্রদের সামাজিক মর্যাদার অনুক্রম অবেক্ষণ করে—দ্রোণ একলব্যকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করলেন না। এখানে শিক্ষাপদ্ধতি নিয়েও দুটো কথা আসে। আধুনিক যুগেও যাঁরা 'এজুকেশন' বা শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে মাথা ঘামান, তাঁদের কাছে ছাত্রসমস্যা নিয়ে কিছু কথা শুনেছি। তাঁরা বলেন—শিক্ষাবিদেরা একটি শ্রেণীতে ছাত্রদের মধ্যে যথাসম্ভব সমতা রাখা পছন্দ করেন। যার জন্য একটি-দুটি বেশি বয়সের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সিদের পঠনপাঠন তাঁরা পছন্দ করেন না। সিজোফ্রেনিয়া ইত্যাদি মানসিক রোগগ্রস্ত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে স্বাভাবিক ছাত্রছাত্রীদের একত্র পঠনপাঠন তাঁরা চান না। অনেক মেয়েদের স্কুলে ছাত্রীদের সম্ভাব্য পক্কতার ভয়ে বিবাহিতা মেয়েদের সঙ্গে অবিবাহিতা বয়ঃসন্ধিনীদের পড়তে দেওয়া পছন্দ করেন না শিক্ষাবিদেরা।

ভেবে দেখবেন, বেশিবয়স্ক বা রোগগ্রস্ত অথবা বিবাহিতরা কি সামাজিকভাবে অশুচি? তা তো নয়। দ্রোণাচার্যও যে নৈষাদি একলব্যকে ছাত্র হিসেবে গ্রহণ করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না, তা আমি মনে করি না। তবে রাজা এবং রাজপুত্রদের সামাজিক পরিচয় সেকালের দিনে যেহেতু অত্যন্ত সচেতনভাবেই ব্যবহার করা হত, সেখানে নৈষাদি একলব্য ছাত্র হিসেবে হাজার গুণ ভাল হলেও রাজপুত্রদের কাছে জাতি বিষয়ক অবমাননা তাঁকে শুনতেই হত হয়তো। এতে ছাত্রদের মধ্যে এক ধরনের 'টেনশন' তৈরি হওয়াও অসম্ভব নয়। দ্রোণাচার্য এই অসমতা চাননি। এতে তাঁর নিজের ক্ষতি, নৈষাদি একলব্যেরও ক্ষতি এবং সংখ্যাধিক রাজপুত্ররাও দ্রোণাচার্যের এই স্বাধীন ব্যবহারে খুশি হতেন না। অতএব একলব্যকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করলেন না দ্রোণ।

এই পর্যন্তও কিন্তু দ্রোণাচার্যকে আমরা ক্ষমা করতে পারি। কিন্তু যেদিন পাণ্ডব কৌরবরা মৃগয়া করতে গিয়ে নৈষাদি একলব্যের অসাধারণ অস্ত্রগুণ দেখে এলেন, সেদিন অন্যেরা অবাক হলেন বটে, কিন্তু দ্রোণাচার্যের শিষ্যপ্রধান অর্জুন কিন্তু ঈর্ষাকাতর হলেন। নৈষাদি একলব্য দ্রোণাচার্যের মৃন্ময় মূর্তি স্থাপন করে আপন প্রতিভায় আপনিই সিদ্ধ হয়েছিলেন। পাণ্ডব-কৌরবেরা একলব্যকে দেখেছিলেন—নিকষ কালো শরীর মেদহীন এক যুবা, মলিন বসন, ধূলিধূসরিত গায়ে একটানা অস্ত্রাভ্যাস করে যাচ্ছে মৃন্ময় দ্রোণাচার্যের সামনে। এতটুকু অমনোযোগ সে সহ্য করতে পারে না। রাজকুমারদের মৃগয়া-সহায় শিকারি কুকুরটি ডেকে

উঠেছিল বলে শব্দভেদী বাণে কুকুরটির মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন নৈষাদি একলব্য। তাঁর অস্ত্রচালনার ক্ষিপ্রতা এবং প্রখর শব্দানুমানের শক্তি যে কারও সঙ্গে তুলনীয় নয়, সেটা আর কেউ না বুঝুক অর্জুন বুঝেছিলেন। তাই অন্যেরা যখন কেউ বিস্মিত, কেউ বা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, অথবা সকলেই যখন একযোগে এই অস্ত্র নৈপুণ্যের কাহিনী সপ্রশংসভাবে দ্রোণের কাছে বর্ণনা করছেন, তখন অর্জুন শুধু ফাঁক খুঁজেছেন আচার্যকে একান্তে পাবার।

অর্জুন জানতেন, একজন ভাল ছাত্র যেমন নিজের ওপরে শিক্ষকের আস্থা এবং অনুরাগ বুঝতে পারে, সেই বোঝাটুকু থেকেই অর্জুন একান্তে দ্রোণাচার্যকে তাঁর দুর্বলতার সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়ে বলেছিলেন—গুরুদেব! আমাকে আপনি একসময় সপ্রণয়ে আলিঙ্গন করে বলেছিলেন—অর্জুন! আমার কোনও শিষ্য তোমার থেকে শ্রেষ্ঠতর হবে না—ভবতোক্তো ন মে শিষ্যস্তদ্‌বিশিষ্টো ভবিষ্যতি। কিন্তু এই এখনই নিষাদ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্যকে দেখে এলাম; সে আপনার অন্য শিষ্যদের চেয়ে এমনকী আমার চেয়েও অনেক বড় ধনুর্ধর এবং সবচেয়ে বড় কথা সে আপনারই শিষ্য—অন্যো’পি ভবতঃ শিষ্যঃ নিষাদাধিপতেঃ সুতঃ।

দ্রোণ একেবারে অবাক হলেন। নৈষাদি একলব্যের কথা তাঁর মনেও নেই ভাল। আবার মনে আছেও। প্রত্যাখ্যাত হয়েও বনের মধ্যে সে তাঁকে গুরুর মর্যাদায় স্থাপন করে আপন যোগ্যতায় এবং প্রতিভায় অর্জুনের থেকেও বড় ধনুর্ধর হয়ে গেল—এই ঘটনায় একদিকে তাঁর গর্ব হবারই কথা, কেননা প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও যাঁকে গুরু বলে কেউ মানে, তখন সে গুরুর যশ এবং মান অনেক উচ্চ পর্যায়ের বলেই বুঝতে হয়। অন্যদিকে এতে দ্রোণাচার্যের মতো মানী লোকের ক্রোধও হবার কথা। গুরুমুখী বিদ্যায় গুরুর কোনও প্রয়োজনই হল না এবং গুরু যাকে নিরন্তর হাতে ধরে অস্ত্রবিদ্যা শিখিয়েছেন, সেই অর্জুনের থেকেও সে ভাল ধনুর্ধর হয়ে গেল নিজের একক ক্ষমতায়—এমনটি দেখলে অনিরপেক্ষ তথা বিশেষ কোনও শিষ্যের প্রতি পক্ষপাতী গুরুর রাগই হবে, বিশেষত সে গুরু যখন পূর্বে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আমাদের ধারণা, গর্ব নয়, দ্রোণাচার্য খানিকটা অপমানিতই বোধ করেছেন। তার ওপর অর্জুন যখন এসে সাভিমানে তাঁকে তাঁর পূর্ব প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, তখন একটু ভেবেই তিনি ইতিকর্তব্যতা স্থির করে নিয়েছেন। ক্রোধ কিংবা অপমানবোধের কোনও বহিঃপ্রকাশ হল না তাঁর ব্যবহারে। ক্ষণমাত্র ভাবনা করে—মুহূর্তমপি তং দ্রোণশ্চিন্তয়িত্বা বিনিশ্চয়ম্—কী করবেন ঠিক করে নিয়েই দ্রোণাচার্য অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন নৈষাদি একলব্যের বাসভূমিতে। দ্রোণ দেখতে পেলেন—মলিন বসন ধূলিধূসর জটাধারী একলব্য এক ধ্যানে শরক্ষেপ অভ্যাস করে যাচ্ছে—একলব্যং ধনুষ্পাণিমসৃস্যন্তম্ অনিশং শরান্।

চিরকালের ধ্যানাবস্থিত গুরুকে নিজের আবাসে আসতে দেখে একলব্য সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে দ্রোণাচার্যের পায়ে মাথা নোয়ালেন। নৈষাদি একলব্য বিধিনিয়ম অনুসারে গুরুপূজা করে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করলেন গুরুর কাছে। কিন্তু দ্রোণাচার্য তো ঠিক করেই এসেছেন যে তিনি কী করবেন। অর্জুনকে তিনি কথা দিয়েছেন যে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ধনুর্ধর তাঁর শিষ্যদের মধ্যে থাকবে না। অতএব দ্রোণাচার্য যাঁকে নিজে কোনও শিক্ষাই দেননি, সে তাঁর আপন শিক্ষিত শিষ্যের চেয়ে বেশি হবে—এই অপমান সহ্য করতে না পেরেই বোধ হয় অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় একলব্যকে বললেন—তুমি যদি নিজেকে আমার শিষ্য বলেই মান, তবে আমার শিক্ষাদানের বেতন গুরুদক্ষিণা দিতে হবে তোমাকে—যদি শিষ্যোসি মে বীর বেতনং দীয়তাং মম।

সরল নৈষাদি এক বিন্দুও দ্বিধা না রেখে উত্তর দিলেন—কী দিতে হবে আজ্ঞা করুন,

গুরুদেব! এই পৃথিবীতে আপনার মতো গুরুকে আমার অদেয় কিছু নেই—ন হি কিঞ্চিদ্ অদেয়ং মে গুরবে ব্রহ্মবিত্তম। দ্রোণ একবারও ভাবলেন না যে, তাঁর অহৈতুকী গুরুভক্তিরও কোনও মর্যাদা দিলেন না তিনি। অকম্পিত কণ্ঠস্বরে শীতল মস্তিষ্কে দ্রোণ বললেন—তোমার ডান হাতের বুড়োআঙুলটি আমার দক্ষিণা চাই—অঙ্গুষ্ঠো দীয়তামিতি। এত বড় সাংঘাতিক কথাটা শুনেও একলব্য দ্বিতীয়বার ভাবলেন না। গুরুকে দেখার পর যেমন হর্ষোৎফুল্ল মুখটি হয়েছিল তাঁর, দক্ষিণা দানের কথায় যেমন উদার অকাতরতায় প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল তাঁর হৃদয়খানি, ঠিক সেইরকম সানন্দ বদনে, সেইরকম হৃদয়বৃত্তিতেই নিজের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ কর্তন করে দ্রোণের সামনে রাখলেন গুরুদক্ষিণা।

ঠিক এর পরেই অতিমেধাবী বঞ্চিত জনের যে ভাবনা হয়, সেই ভাবনাই স্বাভাবিকভাবে অধিকার করল একলব্যের মন। এতদিন ধরে নিরন্তর যিনি অস্ত্রবিদ্যা অভ্যাস করেছেন, সেই মানুষটি শরচালনার সাধকতম বুড়োআঙুলটি হারিয়ে বার বার পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন —তর্জনী, মধ্যমা অথবা অনামিকার উপযোগে বাণচালনার সেই ক্ষিপ্রতা আসে কি না। এমনটি হয় না যে, তা তিনিও জানেন, তবু দেখছেন—যদি হয়—ততঃ শরন্তু নৈষাদিরঙ্গুলীভির্ব্যকর্ষত। গুরুর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত যে ব্যক্তি সারা জীবন ধরে নিজের চেষ্টায় স্বপ্ন দেখেছে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর হবার, তার সমস্ত স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল। তার বাণক্ষেপণে যে অসাধারণ ক্ষিপ্রতা ছিল, তা নষ্ট হয়ে গেছে—ন তথা চ শীঘ্রো'ভূৎ যথাপূর্বং নরাধিপ।

অর্জুন খুশি হলেন। একজন 'প্রোফেশনাল' মানুষ স্বার্থলাভ করলে যেমন খুশি হয়, তেমনই খুশি হলেন অর্জুন। কিন্তু দ্রোণাচার্য এটা কী করলেন। যাঁকে তিনি কোনওদিন কিছু শেখানইনি, তাঁর কাছে তিনি শিক্ষাদানের বেতন চাইলেন কোন মর্যাদায়, কোন অধিকারে? এ কি তাঁর মৃন্ময় প্রতিমূর্তি সেবার মূল্য দিলেন একলব্য? দ্রোণাচার্যের মাথায় যে যুক্তিই থাকুক, যে প্রতিজ্ঞাই থাকুক প্রিয়তম শিষ্য অর্জুনের কাছে, দ্রোণাচার্যের এই ব্যবহার কোনও ভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। তবে হ্যাঁ, প্রিয়তম শিষ্যের প্রতি পক্ষপাতে এমন ব্যবহার যে গুরুরা করেন না, তা মোটেই নয়। এই আধুনিক তর্কযুক্তিময় শিক্ষিত জগতে একেবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে আমি এ-হেন অধ্যাপক অনেক দেখেছি, যাঁরা অকারণ সন্তুষ্টিতে—মেধা নয়, বিদ্যাবুদ্ধি নয়—অল্পশ্রুত ব্যক্তির সেবার সন্তুষ্টিতেই অনেক অধ্যাপক বশংবদ ছাত্রকে এমন করুণা করেন, যাতে অনেক ছাত্রেরই ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়। সেখানে দ্রোণাচার্যের দিকে একটাই বিশাল 'প্লাস পয়েন্ট', তিনি যে গর্হিত অন্যায় করেছেন, তা অর্জুনের মতো অসাধারণ মেধাবী ছাত্রের প্রতি পক্ষপাতী হয়ে করেছেন। এই পক্ষপাতকে একেবারে গর্হিত অন্যায় বলে চিহ্নিত করা মুশকিল, কেননা মেধার প্রতি এই পক্ষপাত সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক নয়।

যাই হোক, দ্রোণাচার্যের প্রশিক্ষণ একভাবে শেষ হল। একেবারে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করতে হয়নি, কারণ সে শিক্ষা কৃপাচার্যই দিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু অস্ত্রবিদ্যার ক্ষেত্রে যে 'হায়ার কোর্স' থাকে নীতি এবং কৌশল সংক্রান্ত, তা একভাবে শেষ হল দ্রোণাচার্যের চূড়ান্ত সফল প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই। অর্জুন, অশ্বত্থামার মতো বীরেরা যেখানে ধনুর্বিদ্যায় প্রাধান্য লাভ করলেন, তেমনই নিজেদের 'ন্যাক' এবং প্রবৃত্তি অনুযায়ী ভীম এবং দুর্যোধন গদাযুদ্ধে উৎকর্ষ দেখাতে লাগলেন। এইভাবে কেউ অসিযুদ্ধে, কেউ বা রথযুদ্ধে কেউ বা গুপ্ত অস্ত্র ব্যবহারে নিপুণ হয়ে উঠলেন। সকলেই নিজের নিজের মতো করে অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত হয়ে ওঠার পর দ্রোণাচার্যের দিক থেকে এবার দায় আসে রাজবাড়িতে কুরুকুলের প্রধানদের সামনে রাজপুত্রদের শিক্ষা প্রদর্শন করার। একেবারে 'ফাইনাল স্টেজে' অস্ত্র প্রদর্শনী করতে গিয়ে নিজেদের লোকের সামনে রাজকুমারদের যে মানসিক চাপের সম্মুখীন হতে হবে, তার আগে তাঁদের সম্পূর্ণ একটি পরীক্ষা নিয়ে নিতে চাইলেন দ্রোণ। এর জন্য তিনি কুমারদের চক্ষু এড়িয়ে একদিন হস্তিনানগরের বাজার অঞ্চলে গেলেন এবং উপযুক্ত একজন শিল্পীকে দিয়ে একটি পক্ষী বানালেন।

পাণ্ডব কৌরবদের কাছে পরীক্ষার দিনক্ষণ বলে দিয়ে নির্দিষ্ট কর্মকারের সাহায্যে কৃত্রিম পক্ষীটিকে একটি উচ্চচূড় বৃক্ষের শাখায় স্থাপন করলেন—কৃত্রিমং ভাসমারোপ্য বৃক্ষাগ্রে শিল্পিভিঃ কৃতম্। রাজকুমারেরা একে একে সারি বেঁধে দাঁড়ালেন এবং দ্রোণ তির ধনুক নিয়ে সকলকে লক্ষ্যভেদ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে বললেন। সকলকে এও বলে দিলেন যে, তাঁর আদেশ পাওয়ামাত্র আদিষ্ট ব্যক্তি যেন পক্ষীটির মাথা কেটে মাটিতে ফেলে দেন।

প্রথমেই সকলের জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের পালা এল এবং শরক্ষেপণের আদেশ দেবার আগে দ্রোণ তাঁর মানসিকতা পরীক্ষার জন্য বললেন—রাজপুত্র। তুমি এই পাখিটা দেখতে পাচ্ছ তো? যুধিষ্ঠির বললেন—হ্যাঁ আচার্য! দেখতে পাচ্ছি—পশ্যামীতি। দ্রোণ বললেন—তুমি কি ওই গাছটাকে, আমাকে এবং তোমার ভাইদেরও দেখতে পাচ্ছ? যুধিষ্ঠির সরলভাবে উত্তর দিলেন—হ্যাঁ আচার্য। আমি সবাইকেই দেখতে পাচ্ছি। এই গাছ, এই আপনি, এই আমার ভাইয়েরা, আর ওই পাখিটাও দেখতে পাচ্ছি। দ্রোণাচার্য যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে আর কষ্ট করালেন না। আচার্য হিসেবে তিনি জানেন যে, লক্ষ্যভেদ করতে গিয়ে অন্য সব দিকেই যার চোখ পড়ে, তার সেই একাগ্রতাই নেই, যা দিয়ে চরম ক্ষিপ্রতায় নির্দিষ্ট লক্ষ্য বিদ্ধ করা যায়।

দেখুন, এই গল্পটা শতবার শতমুখে বলা হয়েছে, কিন্তু কেউ কি একবারও দ্রোণাচার্যের কথা ভেবেছেন, যিনি একটি কৃত্রিম পক্ষীর মস্তকচ্ছেদনের পরীক্ষাকে অবলম্বন করে অতীত অনাগত সমস্ত ছাত্রকুলের সামনে শুধু এই প্রতিবেদন রেখেছেন যে, শুধু লক্ষ্য মাথায় রেখে পরিশ্রম করে গেলে লক্ষ্য তার করতলগত হবেই। জীবনে যে কেউ তার লক্ষ্যে পৌঁছোতে চায়, তার কাছে ভাই বন্ধু, পরিজন, পরিবেশ এমনকী গুরুর মুখাপেক্ষী হয়েও বসে থাকলে চলবে না। লক্ষ্যে পৌঁছোতে হলে সেই একাগ্রতা চাই যে একাগ্রতায় অর্জুনের মতো শুধু বলা যায়—এই গাছপালা, ভাই-বেরাদর, এমনকী আচার্য! আপনাকেও আমি দেখতে পাচ্ছি না। শুধু ওই পাখিটাকে দেখতে পাচ্ছি। না পাখিটাও পুরো নয়, শুধু তার মাথাটা দেখতে পাচ্ছি, যা আমার ছেদন করে মাটিতে ফেলতে হবে—শিরঃ পশ্যামি ভাসস্য ন গাত্রমিতি সো'ব্রবীৎ।

লক্ষণীয়, যুধিষ্ঠির সকল ভাইদের মধ্যে জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি বলে তিনি যা দ্রোণাচার্যকে বলেছিলেন, অন্যান্য পাণ্ডব কৌরব ভাইরাও তাঁর দেখাদেখি একই কথা বলে গেছেন এবং বলা বাহুল্য দ্রোণাচার্য কারও কথায় সন্তুষ্ট হননি এবং প্রত্যেককে ওই একই কথা বলে তিরস্কার করে গেছেন—তোমার দ্বারা এই লক্ষ্যভেদ করা সম্ভব হবে না—ততো সর্বে চ তৎ সর্বং পশ্যাম ইতি কুৎসিতাঃ। দ্রোণাচার্য বুঝিয়ে দিলেন—যে মানুষ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোতে চায়, তাকে অন্যের দেখাদেখি কাজ করলে চলে না। অভীষ্ট সাধনের জন্য স্বতন্ত্রতা লাগে। লাগে স্বাধীন চিন্তা। কাজেই অন্য সমস্ত ব্যাপারে অর্জুন যুধিষ্ঠিরের শিষ্যের মতো হওয়া সত্ত্বেও—ভ্রাতা চ শিষ্যশ্চ যুধিষ্ঠিরস্য—অর্জুন কিন্তু উত্তর দিলেন আপন স্বাতন্ত্র্যে। এই স্বাতন্ত্র্য মহাবীরের স্বাতন্ত্র্য, এই স্বাতন্ত্র্য তৈরি হয় নিরলস পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং একাগ্র ভাবনায়। ফলে অর্জুন যখন উত্তর দিলেন, তখন দ্রোণাচার্যের শরীর আনন্দে রোমাঞ্চিত হল —অর্জুনেনৈবমুক্তস্তু দ্রোণো হৃষ্টতনূরুহঃ।

অতঃপর দ্রোণাচার্যের আদেশে কৃত্রিম পক্ষীর শিরচ্ছেদ করলেন অর্জুন—এটা কোনও খবর নয়। বরঞ্চ অর্জুনের অসাধারণ উত্তরে দ্রোণাচার্য যে রোমাঞ্চিত হলেন, এই সানন্দ রোমাঞ্চের মধ্যে স্বয়ং দ্রোণাচার্য যে একাগ্রতায় তাঁর নিজস্ব লক্ষ্যপূরণের দিকে এগোচ্ছিলেন, তারই ইঙ্গিত আছে। পাঞ্চাল দ্রুপদের কাছে তিনি যে অপমান প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেটিও ওই কৃত্রিম পক্ষীর মস্তক ছেদনের মতোই একটা ঘটনা। কুরু পাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষাদান করার মতো বিশাল কর্মকাণ্ডের অন্তরাল থেকে তিনি শুধু একাগ্র ভাবনায় একই লক্ষ্যের ওপর দৃষ্টি রেখে চলেছিলেন—দ্রুপদকে পরাজিত করে তাঁরই

প্রতিজ্ঞাত রাজ্য লাভ করতে হবে। এবং তাও নিজে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করে যুদ্ধ করে নয়, এ কাজ তিনি করবেন শিষ্যদের দিয়ে, অর্থাৎ এতটাই সাবহেলে যে—আমি তো অনেক বড় কথা, আমার শিষ্যরাই এই সাধারণ কাজটা পারে। অতএব অর্জুন যখন কৃত্রিম পক্ষীর শিরচ্ছেদ করলেন, দ্রোণ তখন এই ভেবে আনন্দ পেলেন যে, দ্রুপদের পরাজয় হয়েই গেছে—মেনে চ দ্রুপদং সংখ্যে সানুবদ্ধং পরাজিতম্। এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই দ্রোণাচার্য অর্জুনকে ব্রহ্মশির অস্ত্র দান করেছেন, এবং আবারও আশীর্বাদ করে বলেছেন—এ জগতে তোমার মতো ধনুর্ধর দ্বিতীয় কেউ হবে না—ভবিতা ত্বৎসমো নান্যঃ পুমাল্লোঁকে ধনুর্ধরঃ।

পাণ্ডব কৌরবদের শিক্ষা এবং ব্যক্তিগত পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে দ্রোণাচার্য তাঁর নগরপ্রান্তিক আবাসস্থল ছেড়ে রাজবাড়িতে এলেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। দ্রোণাচার্যের অনুরোধে জরুরি সভা তলব করা হল। স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্র ছাড়াও সেখানে উপস্থিত হলেন দ্রোণের নিয়োগকর্তা ভীষ্ম, বিদুর, ব্যাস, বাহ্লীক এবং কৃপাচার্য। দ্রোণাচার্য সবার সামনে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে জানালেন—আপনাদের ঘরের রাজপুত্রেরা অস্ত্রশিক্ষা সম্পূর্ণ করেছে। আপনাদের অনুমতি হলে তারা সে বিদ্যা আপনাদের সামনে প্রদর্শন করবে। ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত খুশি হলেন। খুশি হলেন এই কারণে যে, একসময় তাঁর বড় দুশ্চিন্তা হয়েছিল। খেলাধুলো আর হইহল্লা করে রাজকুমারেরা একসময় বড় বেশি সময় নষ্ট করেছেন, অস্ত্র শিক্ষার কোনও ভাবনাই রাজপুত্রদের ছিল না—কুমারান্ ক্রীড়মানাংস্তান্ দৃষ্ট্বা রাজাতিদুর্মদান্। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্ভাবনা ছিল—কুরুবাড়ির বালকেরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁদের ক্ষত্রিয়োচিত শিক্ষা সম্পূর্ণই করতে পারবে না। কাজেই দ্রোণাচার্য যখন এসে রাজকুমারদের বিদ্যার কুশল নিবেদন করলেন, তখন ধৃতরাষ্ট্র সোল্লাসে বলে উঠলেন—ঠাকুর! আপনি তো অসম্ভব সম্ভব করে ফেলেছেন—ভারদ্বাজ মহৎ কর্ম কৃতং তে দ্বিজসত্তম।

পুত্রেরা উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করেছে, সেই আনন্দে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অস্ত্র প্রদর্শনীর সমস্ত ভারই আচার্য দ্রোণের ওপর ছেড়ে দিলেন। সেই প্রাচীনকালে রাজবাড়ির অন্নভোক্তা হওয়া সত্ত্বেও আচার্য এবং গুরুদেবের এই স্বাধীনতা আজও আমাদের কাছে দৃষ্টান্তের মতো। এখনকার দিনে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কর্ণধারদের যেভাবে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ মেনে চলতে হয়, দ্রোণাচার্যের উদাহরণ তাঁদের আপন স্বাধীনতা সম্বন্ধে মনে মনে পীড়িত করবে। কথাটা কালিদাসের পূর্বজন্মা কবি ভাসের নাটকে আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। সেখানে ভীষ্ম দ্রোণাচার্যকে সম্মান জানিয়ে বলেছেন—যেদিন থেকে কুমারদের ভার উপযুক্ত গুরুর হাতে দেওয়া হয়, সেদিন থেকে মাতাপিতারও সন্তানের ওপর অধিকার থাকে না। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ তো দূরের কথা।

ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণাচার্যকে বলেছেন—আপনি যে সময়, যে জায়গায়, যেভাবে, যা করা ভাল মনে করেন, সেই অনুসারেই আমাকে আদেশ করুন—যদানুমন্যসে কালং যস্মিন্ দেশে যথা যথা। আমি অন্ধ, কিন্তু আমাদের ছেলেদের এই পরাক্রম যারা চোখে দেখবে, তাদের মতো চোখ ফিরে পেতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে আদেশ দিলেন দ্রোণাচার্যের মতানুযায়ী সমস্ত ব্যবস্থা করার জন্য। অর্থাৎ দ্রোণাচার্যের ইচ্ছানুযায়ী অর্থব্যয়ের অনুমতি হয়ে গেল। দ্রোণাচার্য বিদুরের সঙ্গে অস্ত্র প্রদর্শনীর জায়গা দেখলেন আগে। গাছপালা নেই, উঁচু নিচু নয় এমন সমতল ভূমি পরীক্ষা করে জায়গা মাপ করে দিলেন দ্রোণাচার্য এবং সেখানে রাজা এবং রাজবাড়ির মেয়েদের বসবার জন্য দর্শনগৃহ তৈরি করলেন দ্রোণাচার্যের নিযুক্ত শিল্পীরা—প্রেক্ষাগারং সুবিহিতং চক্রুস্তে তস্য শিল্পিনঃ।

দ্রোণাচার্য শুভতিথি দেখে রঙ্গভূমিতে বাস্তুপূজা করলেন এবং ডিণ্ডিম বাজিয়ে ঘোষণা করালেন রাজকুমারদের অস্ত্র প্রদর্শনীর দিনক্ষণ। এমন একটা সংবাদ পেয়ে হস্তিনাপুরের ধনী জনপদবাসীরা নিজেদের খরচায় রঙ্গভূমির পাশে উঁচু উঁচু মঞ্চ তৈরি করলেন—মঞ্চাংশ্চ কারয়ামাসুস্তত্র জানপদা জনাঃ। এখনকার রাজকুমার ভবিষ্যতের রাজা। জনপদবাসীরা তাই রাজপুত্রদের অস্ত্রক্ষমতা দেখার ব্যাপারে কর্তব্য বোধ করে। অভিজাত ধনী ব্যক্তিরা পালকি করে ঘরের বউ-ঝিদেরও নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করেছেন। এমন রঙ্গ তো আর সব দিন হবে না।

রাজকুমারদের অস্ত্র প্রদর্শনীর নির্দিষ্ট দিন উপস্থিত হল। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রী অমাত্যদের সঙ্গে নিয়ে উপবিষ্ট হলেন দর্শনগৃহের মঞ্চে। তাঁদের সামনে সামনে হাঁটতে

হাঁটতে আগেই উপস্থিত হয়েছিলেন পিতামহ ভীষ্ম এবং প্রথম গুরু কৃপাচার্য। এলেন কুরুকুলের রাজমাতারা গান্ধারী, কুন্তী এবং অন্যান্য রমণীরা। আচার্য দ্রোণ তাঁর অস্ত্র-শিষ্যদের শেষ উপদেশ দিয়ে পুত্র অশ্বত্থামার সঙ্গে একটু পরে এসে উপস্থিত হলেন রঙ্গভূমিতে। তাঁর সাদা চুল, সাদা দাড়ির সঙ্গে সাদা কাপড় আর শুভ্র যজ্ঞোপবীতখানি অন্য এক গুরুতর মাত্রা এনে দিয়েছে উপস্থিত দর্শকদের চোখে। রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হয়েই দ্রোণাচার্য ইষ্ট দেবতার পূজা করলেন। ব্রাহ্মণরা স্বস্তিবাচন করলেন—স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো'রিষ্টনেমিঃ। রাজা ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণাচার্য এবং কৃপাচার্যকে অস্ত্র-প্রশিক্ষণের দক্ষিণা হিসেবে সোনা মণিমুক্তো এবং অনেক বস্ত্র দান করলেন। এরপর পুণ্যাহ শব্দ উচ্চারণ শেষ হয়ে গেলে রাজকুমারেরা যুদ্ধের উপযোগে সজ্জিত হয়ে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হলেন।

রাজপুত্রদের অস্ত্র প্রদর্শনীর বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। শুধু এইটুকু না বললে নয় যে, কুমারদের শক্তি এবং কৌশলের ক্ষেত্র যেখানে মাত্রা অতিক্রম করছিল, শুধু সেখানেই দ্রোণাচার্য এবং অশ্বত্থামা প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করছিলেন নিজেদের ব্যক্তিত্ব এবং বোধ অনুযায়ী। এই কারণেই ভীম এবং দুর্যোধনের শক্তি প্রদর্শনের তুঙ্গ মুহূর্তে দ্রোণের নির্দেশ অনুযায়ী অশ্বত্থামা তাঁদের থামিয়ে দিয়েছিলেন। রঙ্গভূমিতে সম্পূর্ণ সময়টাই বেশ ভালভাবে কেটে যাবার কথা ছিল, এমনকী বেশ সকৌতুকেও। কেননা অস্ত্র প্রদর্শনীর শেষ চমৎকার হিসেবে দ্রোণাচার্য অর্জুনকে পেশ করেছিলেন সকলের সামনে। তিনি বলেছিলেন—আমার পুত্রের থেকেও যে আমার প্রিয়তর, ভগবান বিষ্ণুর মতো যে পরাক্রমী, সমস্ত অস্ত্রে নিপুণ—যো মে পুত্রাৎ প্রিয়তরঃ সর্বশস্ত্রবিশারদঃ—সেই অর্জুনের শিক্ষা আপনারা দেখুন—স পার্থো দৃশ্যতামিতি।

দ্রোণাচার্যের এই সদৃপ্ত ঘোষণাই শেষপর্যন্ত নতুন এক বিপদ ডেকে এনেছিল রঙ্গভূমিতে। অর্জুন অনেক অস্ত্রকৌশল দেখালেন বটে কিন্তু তাঁর সমস্ত শিক্ষাটাকেই 'চ্যালেঞ্জ' জানালেন কর্ণ—যে কর্ণ দ্রোণাচার্যের কাছে ব্রহ্মাস্ত্র লাভের ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। কর্ণের মনোভাব ছিল অত্যন্ত আপত্তিজনক। রঙ্গভূমিতে দ্রোণাচার্যের মর্যাদা ছিল সবার ওপরে। সেখানে দ্রোণাচার্য এবং কৃপাচার্যকে এমন অস্পৃশ্যের মতো একটা সেলাম ঠুকে কর্ণ তাঁর কর্কশ কথাবার্তাগুলি আরম্ভ করলেন, যা সেকালের দিনের সভ্যতার রীতি অতিক্রম করে—প্রণামং দ্রোণকৃপয়ো-র্নাত্যাদৃতমিবাকরোৎ।

অর্জুনের হেনস্থাও কিছু কম হল না। তিনি অত্যন্ত ধীরভাবে এবং অবশ্যই বীরোচিত মর্যাদায় কর্ণকৃত অপমানের মৌখিক জবাব দিলেন বটে, কিন্তু রঙ্গভূমিতে সমস্ত জনপদবাসীদের সামনে তিনি যে মর্যাদায় স্থাপিত হয়েছিলেন, তা অনেকটাই ক্ষুন্ন হল কর্ণের বাগাড়ম্বরে। অর্জুন কর্ণের সম্ভাবিত দ্বৈরথ নিবারিত হল কৃপাচার্যের হস্তক্ষেপে। তিনি কোনও উপায় না দেখে কর্ণকে সূতপুত্রের কলঙ্কে কলুষিত করে রঙ্গভূমির মর্যাদা রক্ষা করলেন বটে, কিন্তু এইখানেই অর্জুন-কর্ণের হৃদয়ে সারা জীবনের শত্রুতার বীজ উপ্ত হয়ে গেল। এই শত্রুতার সঙ্গে দ্রোণাচার্যও একভাবে জড়িয়ে রইলেন এবং ভবিষ্যতে হস্তিনাপুরে যে ধরনের রাজনীতি চলবে, তাতে এই উদ্ধতস্বভাব কর্ণের নানা অমর্যাদা দ্রোণকে সহ্য করতে হবে—কখনও চোখ বুজে, কখনও বা সপ্রতিবাদে।

হস্তিনাপুরের রাজারাজড়া, মন্ত্রী-অমাত্যদের সামনে দ্রোণ যে মর্যাদায় তাঁর প্রশিক্ষণ প্রদর্শনী চালিয়ে গেলেন, তাতে রাজবাড়িতে তাঁর গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেল। রাজকুমারদের গুরুকে বয়োজ্যেষ্ঠতার কারণে এবং অবশ্যই ব্রাহ্মণ বলেও সকলে সার্বত্রিকভাবে গুরু বলেই মেনে নিয়েছিলেন। সকলের এই মান্যতা এবং গৌরব-ভাবনার মধ্যেই দ্রোণাচার্য প্রথমেই তাঁর নিজের কাজটি সেরে নেবার কথা ভাবলেন। অর্থাৎ পাঞ্চাল দ্রুপদকে উপযুক্ত

শিক্ষা দিতে হবে।

রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষাদানের প্রতিদান হিসেবে একটা বড়সড় গুরুদক্ষিণা দ্রোণাচার্যের প্রাপ্যই ছিল। আর গুরুদক্ষিণা এমনই এক জিনিস যাতে শিষ্যদের 'না' বলার উপায় থাকত না কোনও। 'না' বলাটা রীতিসম্মতও ছিল না। দ্রোণ তাঁর সমস্ত অস্ত্র-শিষ্যদের একসঙ্গে ডাকলেন এবং বললেন—তোমাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ গুরুদক্ষিণা হল—পঞ্চালরাজ দ্রুপদকে জীবন্ত ধরে আনতে হবে আমার কাছে—পাঞ্চালরাজং দ্রুপদং গৃহীত্বা রণমূর্ধনি। পর্য্যানয়ত ভদ্রং বঃ সা স্যাৎ পরমদক্ষিণা।

গুরুর কথা শুনে যৌবনোদ্ধত রাজকুমারেরা একেবারে হুড়মুড় করে রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে পড়লেন দ্রুপদকে ধরে আনবার জন্য। কেউ একবারও ভাবলেন না—এ কাজের গুরুত্ব কী, রাজনৈতিক তাৎপর্য কী, অথবা যাঁকে তাঁরা ধরতে যাচ্ছেন, তাঁর শক্তিই বা কতটা? দ্রোণাচার্যের দিক থেকেও ঘটনাটা ভেবে দেখুন। তিনি একবারও কুরুবাড়ির প্রধান পুরুষদের একজনকেও জিজ্ঞাসা করলেন না যে, তিনি পাঞ্চাল দ্রুপদকে ধরে আনবার জন্য কুরুবাড়ির রাজকুমারদের পঞ্চালে পাঠাচ্ছেন। তাঁর দিকে অবশ্য যুক্তির অভাব নেই। কেননা, অস্ত্র প্রশিক্ষণের কাজ নেবার আগেই তিনি তাঁর প্রতিশোধস্পৃহা পিতামহ ভীষ্মের কাছে ব্যক্ত করেছেন। অন্যদিকে শিষ্যদের কাছে দক্ষিণা চাওয়ার ব্যাপারেও তাঁর চিরাচরিত স্বাধীনতা আছে; এখানে পিতা বলে ধৃতরাষ্ট্রের, কাকা বলে বিদুরের, অথবা পিতামহ বলে ভীষ্মেরও কোনও হস্তক্ষেপের প্রশ্ন আসে না।

তবে এত যুক্তি থাকলেও প্রশ্নটা কিন্তু থেকেই যায়। পঞ্চাল আক্রমণ করে দ্রুপদকে ধরে আনার রাজনৈতিক তাৎপর্য যে কতখানি, তা দ্রোণাচার্যও যেমন জানতেন, ভীষ্ম, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্ররাও তেমনই জানতেন। পুনশ্চ এই যুদ্ধযাত্রা সম্বন্ধে তাঁরা অবহিত ছিলেন না মোটেই, এটা ভাবারও কোনও কারণ নেই। অতএব সব জানা সত্ত্বেও যে কুরুবাড়ির প্রধান পুরুষেরা দ্রোণাচার্যের অভিলাষ পূরণে বাধা দিলেন না, তার দুটো কারণ আছে। এক তো সেই পাঞ্চাল-কুরুদের পরস্পরাগত দ্বন্দ্ব, যাতে কোনও না কোনও ভাবে, বিশেষত এখানে দ্রোণের মতো এক পরস্মৈপদী আক্রমণেও যদি পাঞ্চালরা একবার পর্যুদস্ত হয়, তবে তা কুরুমুখ্যদের অনীপ্সিত ছিল না। দ্বিতীয় কারণ, দ্রোণাচার্যের প্রভাব বৃদ্ধি। হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে দ্রোণাচার্যের প্রভাব এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, তিনি নিজে থেকে যে কাজটা করছেন, সেটায় কুরুমুখ্যেরা কেউ বাধা দিতে চাননি। বিশেষত দ্রোণের মতো এক পাঞ্চাল-বিরোধী মহাবীরকে বাধা দিয়ে তাঁকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিকূল করে তুলতে চাননি তাঁরা।

দ্রুপদের বিরুদ্ধে দ্রোণশিষ্যদের প্রাথমিক অভিযান সফল হয়নি। দুর্যোধন ইত্যাদি একশো ভাই কৌরব এবং যাঁদের বন্ধু হিসেবে কর্ণও ছিলেন, তাঁদের আক্রমণ দ্রুপদ বিফল করে দিয়েছিলেন। এঁদের প্রায় পলায়মান অবস্থায় অর্জুন এবং ভীম যুদ্ধযাত্রা করেন এবং ভীমের সহায়তায় পঞ্চাল-সৈন্য নাশ করে অর্জুন শেষপর্যন্ত জীবন্ত ধরে ফেলেন দ্রুপদকে। দ্রুপদের এই হীন অবস্থাতেও অর্জুন কিন্তু তাঁকে অপমান করেননি। অপিচ তিনি এই অভিযানের রাজনৈতিক তাৎপর্যও যথেষ্ট অনুধাবন করেছিলেন বলেই দ্রুপদকে ধরে ফেলার পরেও তিনি তাঁর ভাবে ভাষায় দ্রুপদকে এটা বুঝিয়ে দিতে পেরেছিলেন যে, তিনি গুরু দ্রোণাচার্যের অভীষ্ট গুরুদক্ষিণা দিতে চেষ্টা করছেন মাত্র, দ্রুপদকে ধরার পিছনে তাঁর ব্যক্তিগত কোনও আক্রোশ নেই। উপরন্তু দ্রুপদকে ধরবার সময় তাঁকে কুরুবীরদের আত্মীয় বলে সম্বোধন করে তিনি দ্রুপদের প্রতি যে সম্মান দেখিয়েছেন তাতে এই হঠাৎ-আক্রমণে কুরুদের রাজনৈতিক দায়ও অনেকটা লঘু হয়ে গেছে। অর্জুন ভীমকে বলেছিলেন—শুধু শুধু দ্রুপদের সৈন্য বধ কোরো না। রাজশ্রেষ্ঠ দ্রুপদ কুরুবীরদের আত্মীয়। তিনি ধরা পড়েছেন অতএব তুমি শুধু গুরুদক্ষিণার কথাটা চিন্তা করো, আর কিছু নয়—সম্বন্ধী

কুরুবীরাণাং দ্রুপদো রাজসত্তমঃ। মা বধীস্তদ্‌বলং ভীম গুরুদানং প্রদীয়তাম। মহাভারতের পরবর্তী অংশ দেখলে বোঝা যাবে—অর্জুনের এই সংযমের ফলে পাঞ্চাল দ্রুপদের সমস্ত রাগটাই দ্রোণের ওপর গিয়ে পড়েছিল, যদিও দ্রোণের আশ্রয়দাতা হিসেবে কুরুমুখ্যরা পাঞ্চাল দ্রুপদের রোষ থেকে কোনওভাবেই মুক্ত হতে পারেননি।

থাক এ কথা, অর্জুন যখন দ্রুপদকে যুদ্ধে পরাজিত করে জীবন্ত অবস্থায় গুরু দ্রোণাচার্যের সামনে নিয়ে এলেন, তখন দ্রোণ একটি একটি করে দ্রুপদের কথাগুলি ফিরিয়ে দিলেন। বললেন—তোমার কথা ছিল,—রাজা নয় এমন মানুষ নাকি রাজার সখা হতে পারে না। তা আজ আমি নিজের জোরে তোমার রাজ্যও বিধ্বস্ত করেছি, তোমার রাজধানীও আমারই অধিকারে। এমনকী তোমার মরণ বাঁচনও এখন তোমার শত্রুর অধীন। এখন বলো, তোমার সঙ্গে পুরনো বন্ধুত্বের প্রতিদান হিসেবে তুমি কী চাও—সখিপূর্বং কিমিষ্যতে?

বক্রোক্তির জাল বোনা ছেড়ে দিয়ে দ্রোণ এবার সরল কথায় এসে বললেন—আরে আমরা বামুন মানুষ। ক্ষমাই আমাদের ধর্ম—ক্ষমিণো ব্রাহ্মণা বয়ম্। কাজেই তোমার প্রাণের ভয় নেই। ভুলে যেয়ো না ছোটবেলায় তুমি আমার সঙ্গে খেলেছ, আমাদের দুজনের ভাব-ভালবাসা-বন্ধুত্বও কিছু কম ছিল না। সে বন্ধুত্ব আমি এখনও চাই। তবে হ্যাঁ, তুমি যে বলেছিলে—অরাজা কখনও রাজার সখা হতে পারে না, তাই গঙ্গার দক্ষিণ তীরের পঞ্চাল রাজ্যটুকু তোমার, আর উত্তর দিকের রাজ্যভাগটুকু আমার—রাজাসি দক্ষিণে কূলে ভাগীরথ্যাহমুত্তরে। এখন দেখো, তুমি আমাকে বন্ধু বলে মেনে নিতে পার কি না?

না মেনে আর উপায় কী! শত্রুর দাপট সহ্য করে শত্রুর বশীভূত হয়ে তাঁর সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। দ্রোণাচার্যের শর্ত দ্রুপদ মেনে নিতে বাধ্য হলেন। তাঁর পিতৃপরম্পরালব্ধ পঞ্চাল রাজ্য ভাগ হয়ে গেল। গঙ্গার দক্ষিণভাগে কাম্পিল্য, মাকন্দী ইত্যাদি নগরীর সমাবেশে একেবারে চর্মণ্বতীর জলধোয়া চম্বল পর্যন্ত দ্রুপদের রাজ্যসীমা ঠিক হল। ওদিকে দ্রোণ গঙ্গার উত্তরে যে রাজ্য পেলেন তার রাজধানী হল অহিচ্ছত্র। শিষ্য অর্জুনের কল্যাণে দ্রোণ এতদিনে রাজা হলেন। ঋষিবংশের স্বাহাকার বষট্‌কার ছেড়ে শুধু ধনুষ্টংকারের জোরে দ্রোণের আশৈশব লালিত দারিদ্র্য এতদিনে একেবারেই ঘুচে গেল। এখন তিনি রাজা, অহিচ্ছত্র তাঁর রাজধানী—অহিচ্ছত্রঞ্চ বিষয়ং দ্রোণঃ সমভিপদ্যত। দ্রুপদ দ্রোণের কাছে এইভাবে হেরে গিয়ে মনে মনে সান্ত্বনা লাভ করলেন—ক্ষাত্রশক্তিতে তিনি যুদ্ধ হারেননি, তিনি হেরেছেন ব্রাহ্মণ দ্রোণের ব্রাহ্মণ্যের কাছে—হীনং বিদিত্বা চাত্মানং ব্রাহ্মেণ স বলেন তু।

দ্রুপদের ধারণায় ভুল ছিল। যে প্রক্রিয়ায় দ্রোণাচার্য তাঁর রাজ্যলাভের চিরন্তনী বাসনা চরিতার্থ করেছেন, তাতে ব্রাহ্মণের আদর্শ তাঁর কাজে কতটুকু সমুজ্জ্বল, তাতে সন্দেহ থেকেই যায়। তবে হ্যাঁ, একেবারে আধুনিকের দৃষ্টিতে যদি দেখি, তবে দ্রোণাচার্যের মতো এমন 'ইলাস্টিক' চরিত্র আধুনিক দৃষ্টিতে এক পরম আদর্শ। যাকে আমরা 'স্ক্র্যাচ্' থেকে ওঠা বলি, দ্রোণাচার্য হলেন, সেই চরিত্র। জীবনের যন্ত্রণা তাঁকে কম ভোগ করতে হয়নি। স্ত্রী-পুত্রকে তিনি একসময় উপযুক্ত অন্নপানও দিতে পারেননি। কিন্তু শুধু চেষ্টা এবং লেগে থাকার জোরে যিনি হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে সামান্য জায়গাটুকু করে নিয়েছিলেন, সেই পথে আজ তিনি কিন্তু রাজা। তাঁর শৈশবের স্বপ্ন আজ পূর্ণ হয়ে গেছে।

ঠিক এই মুহূর্তেই কিন্তু সেই সাংঘাতিক প্রশ্নটি আসবে। অহিচ্ছত্রের রাজা হবার পর অথবা তাঁর চিরকালের স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবার পরও কি তাঁর উচ্চাশার নিবৃত্তি ঘটেছিল? কই রাজা হবার পর আমরা দ্রোণকে তো সপুত্র-পরিবারে অহিচ্ছত্রের দিকে পা বাড়াতে

দেখছি না। একবারও তো পিতামহ ভীষ্মকে তিনি ডেকে বললেন না—আপনাদের উপকার স্মরণে রাখব। অহিচ্ছত্রে আপনাদের আতিথ্য কামনা করি। না, এসব কিছুই নয়। দ্রোণ হস্তিনাতেই রয়ে গেলেন। নিশ্চয় এই অনুপমা নগরী তাঁর ভাল লেগেছে। এখানকার রাজনীতির আস্বাদ নিশ্চয় অহিচ্ছত্রে মিলবে না এবং সেই আস্বাদ তিনি ভোগ করতে চান।

অবশ্য এই মুহূর্তে হস্তিনাপুরে থাকতে তাঁর সম্মানেও লাগছে না। এখন তাঁর সম্পূর্ণ সান্ত্বনা আছে যে, তিনি এক নগরীর রাজা, তিনি আর পরাশ্রিত নন। আমি এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়বাড়ির জনৈকা ঠাকুরমাকে চিনতাম। দেশের বাড়িতে তাঁর কিছু জমিজায়গা ছিল। কিন্তু তিনি শহরে পুত্রের বাড়িতে থাকতেই ভালবাসতেন। কারণে অকারণে পুত্র বা পুত্রবধূর সঙ্গে ঝগড়া লাগলেই তিনি বলতেন—আমাকে ভয় দেখাস না। আমি ইচ্ছে করলে এখনই গ্রামের বাড়িতে গিয়ে থাকতে পারি। নেহাত ওই 'নিমে'টার জন্য যেতে পারি না। নিমে হলেন ঠাকুরমার নাতি।

দ্রোণের ব্যাপারটা হয়তো একই রকম নিশ্চয়ই। কিন্তু রাজ্য থাকা সত্ত্বেও যে কারণে তিনি সে রাজ্যে জীবনেও পৌঁছোতে পারলেন না, সে হল আর এক 'নিমে'—হস্তিনাপুরের রাজনীতি। ভেবে দেখবেন, এই হস্তিনাপুরের রাজনীতির আস্বাদ এতই মধুর যে, অধিরথসূতপুত্র কর্ণ অঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর হিসেবে স্বীকৃত এবং অভিষিক্ত হবার পরেও তাঁকে কখনও আমরা অঙ্গরাজ্যের শাসন সামলাতে দেখিনি এবং একইভাবে দ্রোণাচার্যও অহিচ্ছত্রে রাজার স্বীকৃতি পাওয়া সত্ত্বেও সেখানে আর ফিরে গেলেন না। সত্যি কথা বলতে কী, হস্তিনাপুরে রাজনীতির বৈচিত্র্য এতই বেশি যে, দ্রোণাচার্যের মতো বুদ্ধিমান ব্যক্তি, যিনি মনুষ্য রাজনীতি বুঝে বুঝেই এতটা চুল পাকিয়ে ফেলেছেন, তিনি আর অন্যত্র গিয়ে অবশিষ্ট জীবনকে বৈচিত্র্যহীন কুপোদকে পরিণত করতে চাননি। অতএব দ্রোণাচার্য কৌরব-পাণ্ডবদের আচার্যের মহিমায় হস্তিনাপুরেই থেকে গেলেন।

বস্তুত যেদিন দ্রুপদ পাঞ্চালকে অর্জুনের মাধ্যমে হস্তিনায় একান্তে ধরে এনেছিলেন দ্রোণাচার্য এবং তাঁকে তাঁর পূর্বকৃত অপমানরাশি ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলেন, সেইদিন থেকেই চরম রাজনীতি শুরু হয়ে গেল। দ্রোণের প্রতি মরণান্তক প্রতিশোধস্পৃহায় দ্রুপদ এক দ্রোণহন্তা পুত্র কামনা করলেন। যজ্ঞের বেদি থেকে অলৌকিকভাবে সেই পরম আকাঙ্ক্ষিত পুত্রের জন্ম হল—রাজ্ঞঃ শোকাপহো জাত এষ দ্রোণবধায় বৈ—এবং তাঁর সঙ্গে জন্মালেন দ্রৌপদী, যাঁর জন্মলগ্নেই আকাশবাণী হল—এই কন্যার কারণে ভবিষ্যতে কৌরবদের মহাভয় সৃষ্টি হবে—অস্যা হেতোঃ কৌরবাণাং মহদুৎপৎস্যতে ভয়ম্। লক্ষণীয়, ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর আবির্ভাবের সময় থেকেই দ্রোণহন্তা বলে চিহ্নিত, অন্যদিকে দ্রৌপদী চিহ্নিত হলেন কৌরবকুলের ত্রাস হিসেবে। তা হলে দ্রোণ এবং দ্রোণের আশ্রয়দাতা কৌরবরা সকলেই পাঞ্চাল রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন এবং তা পড়লেন দ্রোণের জন্য।

যে অলৌকিক উপায়ে যুবক এবং যুবতী অবস্থায় ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং দ্রৌপদীকে পেলেন দ্রুপদ, তাতে আধুনিক মনে কিছু সন্দেহ থেকেই যাবে। তাঁদের সন্দেহ অনুযায়ী এঁরা দ্রুপদের পালিতা পুত্র-কন্যাই হোন, অথবা হোন দ্রোণবধের কারণেই অন্য দেশ থেকে আমদানি করা, তাতে মহাকাব্যের অন্তর বোঝা পাঠকের কোনও অসুবিধে নেই, দ্রুপদের পুত্রকন্যা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই মহাভারতের পাঠক বুঝে যান যে, এবার মহাকাব্যের অন্তরবাহিনী নাটকীয়তা অন্য খাতে বইতে আরম্ভ করেছে। কী অসাধারণ এই মহাকাব্যের কাহিনীর গতি। একদিকে ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনেরা নিজেদের জ্ঞাতিশত্রুতার কারণে পাণ্ডবদের বারণাবতে পুড়িয়ে মারার চক্রান্ত করেছেন, অন্যদিকে পাঞ্চাল দ্রুপদ পাণ্ডব অর্জুনকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাঁর সঙ্গে নিজ কন্যা কৃষ্ণা দ্রৌপদীর বিবাহ দেবার জন্য। অর্জুনের কথা ভেবেই

তিনি এমন এক ধনুক বানিয়েছেন, যা দিয়ে একমাত্র তিনিই লক্ষ্যভেদ করতে পারবেন, অন্য কেউ নয়—সো'ন্বেষয়ানঃ কৌন্তেয়ং...দৃঢ়ং ধনুরনানম্যং কারায়ামাস ভারত।

কুরুকুলের জ্ঞাতিশত্রুতার খবর দ্রুপদ জানেন এবং সেই শত্রুতার সুযোগ নিয়ে তিনি সেই কুলেরই মুখ্যতম ধানুষ্কের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দেবার কথা ভেবেছেন। শুধু তাই নয়, যে অর্জুনের মাধ্যমে দ্রোণাচার্য দ্রুপদকে চরম অপমান করেছেন, সেই অর্জুনকে, সেই দ্রোণের প্রিয়তম শিষ্যকে দ্রুপদ নিজের পক্ষে টেনে আনছেন একেবারে রাজনৈতিকভাবে। দ্রৌপদীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেওয়ার কথা ভাবাটা এখানে দ্রুপদের রাজনৈতিক ভাবনার অনুষঙ্গমাত্র। কুরুকুলের রাজবাড়িতে পরদেশি দ্রোণাচার্যকে পরোক্ষভাবে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক মেরুকরণ ঘটল, এর ভবিষ্যৎ ফল স্থায়ী হবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত।

দ্রুপদের পঞ্চাল রাজ্য অর্ধেক কেড়ে নিয়ে দ্রোণাচার্যও যে খুব শান্তিতে ছিলেন, তা নয়। তাঁর ভয় কিছু ছিল না, তবে অনুশোচনা কিছু ছিল। পাঞ্চালরা যাঁর কাছে অপমানিত হয়েছিলেন, তাঁর হত্যাকারী দ্রুপদের ছেলে হয়ে জন্মেছেন, এ কথা শুনে পাঞ্চালরা আক্রোশে সিংহনাদ করেছিল—ততঃ প্রণেদুঃ পাঞ্চালাঃ প্রহৃষ্টা সাধু সাধ্বিতি। ফলে এ খবর দ্রোণাচার্যের কাছে আসতে দেরি হয়নি। তিনি যে খুব বিচলিত হয়েছিলেন, তা অবশ্য নয়। বরঞ্চ, দৈবের গতি তো খন্ডাবার নয়, এমন একটা বুদ্ধিতে তিনি নিজের মহানুভবতা প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন পাঞ্চাল দ্রুপদের কাছে। কুমার ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিনি নিজে থেকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন অস্ত্রশিক্ষা দেবার জন্য—ধৃষ্টদ্যুম্নং তু পাঞ্চাল্যম্ আনীয় স্বং নিবেশনম্। দ্রুপদের রাজ্য কেড়ে নেবার প্রতিদান দিতে চেয়েছিলেন দ্রোণ। সেকালের দিনে এটা অস্বাভাবিক ছিল না। শত্রুর ছেলে বলে বিদ্যাশিক্ষা দেব না—গুরুমশায়রা এমন কুচুটে ছিলেন না। নৈতিক শত্রু বৃহস্পতির ছেলে কচকে যেমন শুক্রাচার্য শিক্ষা দিয়েছিলেন, দ্রোণাচার্যও তেমনই দ্রুপদের ছেলে ধৃষ্টদ্যুম্নকে ডেকে এনে অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছিলেন। এতে আর কিছু না হোক, দ্রোণ এক কালজয়ী যশস্বিতার অধিকারী হয়েছিলেন। জগতের কাছে তিনি প্রচার করতে পেরেছিলেন যে, না, লোভ নয়, শুধু দ্রুপদ তাঁর প্রতিজ্ঞাত সত্য লঙ্ঘন করেছিলেন বলেই দ্রোণ তাঁকে শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু মনে মনে তাঁর কোনও রাগ নেই। থাকলে কি শত্রুর পুত্রকে নিজের ভবিষ্যৎ-হন্তা জেনেও কেউ তাঁকে অস্ত্রশিক্ষা দেয়? দ্রোণ তাই দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই মহানুভবতা গুরু হিসেবে তাঁর নিরপেক্ষতা প্রমাণ করবার জন্য যতখানি, তার থেকে অনেক বেশি নিরপেক্ষ এবং মহানুভব হিসেবে নিজেকে প্রচার করার জন্য। এই যশটুকু তিনি ধরে রাখতে চান—তথা তং কৃতবান্ দ্রোণ আত্মকীর্ত্যনুরক্ষণাৎ।

কিন্তু দ্রোণের যশোভাবনা, মহানুভবতা, সবকিছু নিশ্চয়ই একেবারে গণ্ডগোল হয়ে গেল, যখন তিনি শুনলেন যে, তাঁর পুত্রাধিক প্রিয়তম শিষ্য অর্জুন পাঞ্চাল রাজকুমারীকে বিবাহ করেছেন এবং এই সূত্রে পঞ্চ পাণ্ডবই কৃষ্ণা দ্রৌপদীর স্বামিত্ব লাভ করেছেন। ঠিক এইসময় থেকেই কিন্তু দ্রোণাচার্যের ভাবনা চিন্তা পালটে যেতে থাকে। কৌরব-পাণ্ডবের পারিবারিক তথা পারস্পরিক বিরোধের সঙ্গে তাঁর দ্রুপদ-বিরোধিতা মিশে গেলেও পাণ্ডবদের সঙ্গে দ্রুপদকন্যার বিবাহসংবাদ যখন কৌরব রাজসভায় আলোচনার বস্তু হয়ে উঠল, তখন কিন্তু দ্রোণাচার্যকে একেবারে উলটো গাইতে শুনছি। তাঁর সেই তীব্র দ্রুপদ-বিরোধিতা আগেই কিছু প্রশমিত হয়েছিল বটে, এখন কিন্তু তিনি পাঞ্চাল দ্রুপদের বিরোধ মিটিয়ে নেবার পক্ষে। হয়তো এর প্রধান কারণ অর্জুন, যাঁর বীরত্ব সম্পর্কে দ্রোণাচার্যই সবচেয়ে অবহিত ব্যক্তি।

কৌরব-রাজসভায় আলোচ্য বস্তু ছিল—পাণ্ডবদের রাজ্যভাগ দেওয়া হবে কি না। সভায় ভীষ্ম সমস্ত আন্তরিকতায় পাণ্ডবদের পৈতৃক রাজ্যভাগ ফিরিয়ে দেবার কথা বলেন এবং তাঁকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেন দ্রোণ। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলেন—আপনি মন্ত্রিসভায় মন্ত্রণা দিতে

ডেকেছেন বলেই যেটা আপনার পক্ষে ন্যায় হবে এবং আপনার সুনাম হবে, সেই মন্ত্রণাই আপনাকে দেব। পাণ্ডবদের রাজ্যভাগ ফিরিয়ে দেবার ব্যাপারে ভীষ্মের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। অপিচ আমার পরামর্শ হল—আপনি দ্রুপদের কাছে এখনই এমন একজন লোক পাঠান যে ভাল কথা বলে—প্রেষ্যতাং দ্রুপদায়াশু নরঃ কশ্চিৎ প্রিয়ম্বদঃ। সে গিয়ে যেমন পাণ্ডবদেরও কুশল এবং বৃদ্ধি কামনা করবে, তেমনই মহারাজ দ্রুপদ এবং তাঁর পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নেরও বৃদ্ধি কামনা করবে এবং তা বার বার করবে—অসকৃৎ দ্রুপদে চৈব ধৃষ্টদ্যুম্নে চ ভারতে। দ্রুপদের সঙ্গে এই বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটায় কৌরবদের যে কত আনন্দ এবং কত লাভ হয়েছে, সেটাও যেন আপনার দূত পরিষ্কার করে বলে—উচিতত্বং প্রিয়ত্বঞ্চ যোগস্যাপি চ বর্ণয়েৎ।

বিবাহ উপলক্ষে পাণ্ডবদের কাছে যেসব ধনরত্ন বস্ত্রালংকার ইত্যাদি উপহার পাঠানোর প্রস্তাব করলেন দ্রোণ, তার সঙ্গে দ্রুপদ এবং দ্রুপদের ছেলেদের কাছেও প্রচুর উপহার সামগ্রী পাঠাতে বললেন তিনি—তথা দ্রুপদপুত্রাণং সর্বেষাং ভরতর্ষভ। দ্রোণাচার্যের এমনতর পরামর্শের জন্য তাঁকে সামান্য করে হলেও কথা শুনতে হল দুর্যোধনের বন্ধু কর্ণের কাছে। আসলে কুরুমুখ্যদের মন্ত্রণাসভায় একটা পরিবর্তন চোখে পড়ছে দ্রোণের। তিনি দেখতে পাচ্ছেন—ভীষ্ম, বিদুর ইত্যাদি কুরুপ্রধানদের বক্তব্য আজকাল যেন তেমন গুরুত্ব পায় না মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। পুত্রের স্বার্থে ধৃতরাষ্ট্র আজকাল দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ এবং শকুনিকে এতটাই প্রশ্রয় দিচ্ছেন, যাতে ভীষ্ম বিদুর এমনকী তিনি নিজেও যেন কেমন সংকুচিত বোধ করেন। দ্রোণ দেখলেন—ভীষ্মের কথার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি আপন সুচিন্তিত পরামর্শ কুরুসভায় নিবেদন করা সত্ত্বেও দুর্যোধনের প্রশ্রয়ে কর্ণ এমন একটু বাড়াবাড়ি কথা বলে ফেললেন যাতে মনে হয়—তিনি ভীষ্মের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং তাঁদের দুজনের মনেই যেন পাপ আছে—সর্বকার্যেষ্বনন্তরৌ...প্রচ্ছন্নেনান্তরাত্মনা। কর্ণ ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে দ্রোণাচার্যকে গালাগালি দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—আপনাকে এখন বুঝে নিতে হবে যে, আপনার দুষ্ট মন্ত্রীরা কী বলছেন এবং আপনার হিতকামী অদুষ্ট পরামর্শদাতারাই বা কী বলছেন—ধৃষ্টানাঞ্চৈব বোদ্ধব্যম্ অধৃষ্টানাঞ্চ ভাষিতম্।

দ্রোণ বুঝতে পারেন—কেন তাঁর ওপর এত রাগ কর্ণের। অর্জুনকে মারবার জন্য ব্রহ্মাস্ত্রের সন্ধি জানতে চেয়েও পাননি দ্রোণের কাছে, অতএব রাগ তো থাকবেই। কিন্তু তাই বলে রাজসভায় দাঁড়িয়ে এইভাবে ঘুরিয়ে অপমান করবে। তা ছাড়া দ্রোণের মর্যাদা কি কুরুবাড়িতে কিছু কম? আজও কি তিনি কুরুসভার মন্ত্রী নন? সেই বালকদের অস্ত্র পরীক্ষা শেষ হবার পর থেকে তিনি কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে পরিচ্ছন্ন উপদেশই দিয়ে আসছেন। এ কথা অবশ্যই সত্যি যে, দ্রুপদ পাঞ্চালের ওপর ব্যক্তিগত ক্রোধ থাকা সত্ত্বেও দ্রোণাচার্য কিন্তু সমস্ত ব্যক্তি-স্বার্থ ভুলেই এখন সদুপদেশ দিয়েছিলেন ধৃতরাষ্ট্রকে। রাজনীতির বোধ তাঁর কিছু কম নয় এবং সময় এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পালটানোটাই যদি রাজনীতির সিদ্ধি বলে চিহ্নিত হয়, তা হলে নিঃসন্দেহে দ্রোণাচার্য একজন বড় রাজনীতিবিদ।

ব্যক্তিগত সমস্ত ক্রোধ ভুলে তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পালটেছেন। পাণ্ডবদের মতো মহাবীর দ্রুপদের মতো সহায় পেলে যে কুরু রাজ্যের সামূহিক ক্ষতি করতে পারেন—এ কথা বুঝতে দ্রোণাচার্যের দেরি হয়নি। কাজেই কর্ণ কটু কথা বললেও দ্রোণ তাঁকে ছেড়ে দিলেন না। বললেন—ওরে বদমাশ। পাণ্ডবদের ওপর তোর চিরকালের রাগ আর, সেই জন্যই এ সব অন্যায় কথা তুই বলছিস—দুষ্ট! পাণ্ডবহেতো-স্ত্বং দোষমাখ্যাপয়স্যুত। তা বেশ তো, আমার কথাটা যদি এতই খারাপ, তত ভালটা তুই বল দেখি—ব্রূহি যৎ পরমং হিতম্। দ্রোণ এবার চরম কথাটা শুনিয়ে দিলেন। বললেন—ভাল কথা বললাম বাপু। যদি না শোনা হয়, তবে এই কুরুদের সর্বনাশ হবে বলে দিলাম—কুরবো বৈ বিনঙ্ক্ষ্যন্তি ন চিরেণৈব মে মতিঃ।

কর্ণ দ্বিতীয়বার দ্রোণের প্রতিবাদ করার আগেই বিদুর বলতে উঠেছেন। ভীষ্ম এবং দ্রোণ দুজনকেই পরম মর্যাদা দিয়ে তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছেন—বয়স, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং অভিজ্ঞতা—এই সবগুলিই এঁদের এত বেশি যে, ভীষ্ম-দ্রোণের কথা একেবারেই ফেলে দেওয়া যায় না। কুরুবাড়িতে এই দুই ব্যক্তির অবস্থিতি পরম মর্যাদার আসনে। এঁরা আগেও কোনওদিন কুরুদের অহিতের কথা বলেননি, কোনও দিন কোনও অপকারও করেননি এবং এঁরা আপনার প্রতি কপট আচরণ করবেন না—তন্নিমিত্তমতো নেমৌ কিঞ্চিদ্ জিহ্মং বদিষ্যতঃ। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝিয়ে বললেন—রাজনীতির কূট পরামর্শ বলে কথা। সবকিছু এঁরা তাই স্পষ্ট করে বলেনওনি—নোচতু-র্বিবৃতং কিঞ্চিৎ। বিদুর দ্রোণের কথারই ইঙ্গিত দিলেন। বোঝাতে চাইলেন—পাঞ্চাল দ্রুপদের রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে পাণ্ডবদের সামরিক শক্তি যুক্ত হয়ে যাওয়ায় রাজনীতির ক্ষেত্রে নতুন এক মেরুকরণ ঘটেছে।

বিদুর একে একে অর্জুন-ভীমের সামরিক পরাক্রমের কথাই শুধু বললেন না, কীভাবে পাণ্ডবদের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্ণি-অন্ধক জাতিগোষ্ঠীর প্রধান প্রতিভূ কৃষ্ণ এসে গেছেন পাণ্ডবদের সহায়তায় এবং পাণ্ডবদের শ্বশুর হিসেবে দ্রুপদ যে কৌরবদের কতটা প্রতিপক্ষতা করবেন—সেটা বুঝিয়ে দিলেন বিদুর। দ্রোণাচার্য বার বার পাণ্ডবদের সঙ্গে দ্রুপদের কথাটাও কেন উচ্চারণ করেছেন, সেটা আরও স্পষ্ট করে দিয়ে বিদুর বললেন—দ্রুপদ একজন বড় রাজা এবং আমরা কুরুরা তাঁর সঙ্গে কিছু শত্রুতা করেছি—দ্রুপদো'পি মহান্ রাজা কৃতবৈরশ্চ নঃ পুরা। এই বৈরিতার মধ্যে দ্রোণের দায়িত্বের কথা বিদুর এড়িয়ে গেলেন এবং বললেন—যাঁর সঙ্গে এই শত্রুতা আমরা করে রেখেছি, তাঁকে যদি আমাদের পক্ষে নিয়ে আসা যায়, তবে আমাদেরই বাড়বাড়ন্ত হবে—তস্য সংগ্রহণং রাজন্ অস্মৎকুল-বিবর্ধনম্।

বস্তুত দ্রোণ এই কথাটাই বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দ্রুপদের সঙ্গে শত্রুতা সৃষ্টি করার মধ্যে তাঁর নিজের যে সাময়িক ব্যক্তিস্বার্থ ছিল, সে কথা আর রাজসভায় বলে নিজের অসম্মান ডেকে আনেন কী করে! একেতেই তো কর্ণ মুখিয়েই আছে। রাজসভায় দাঁড়িয়ে দ্রুপদকে খুব বড় রাজা বলাও দ্রোণাচার্যের পক্ষে সম্ভব নয়, কেননা, তাতেও এই শত্রুতার ব্যাপারে তাঁর দায়িত্ব উচ্চারিত হতে পারে। বিদুর তাই খুব কায়দা করে পাণ্ডবদের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুপদকেও যে কেন তুষ্ট করতে বলেছেন দ্রোণ, সেটা ঘুরিয়ে বলে দিলেন। বললেন—যাঁদের শ্বশুর হলেন দ্রুপদ, যাঁদের শ্যালক সম্বন্ধীরা হলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন ইত্যাদি ভাইয়েরা, তাঁদের প্রাপ্য রাজ্য দিয়ে দিন তাঁদের। মনে রাখবেন—দ্রুপদ খুব কম বড় রাজা নয় এবং মিত্রপক্ষ হিসেবে কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর অনুগত দাশার্হ, বৃষ্ণি, অন্ধক ইত্যাদি গোষ্ঠীপতিরাও পাণ্ডবদের বিজয় ত্বরান্বিত করবেন।

দ্রোণাচার্য-কথিত রাজনৈতিক সমীকরণ বিদুরের মুখে স্পষ্টভাবে যখন উচ্চারিত হল, প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্র তখন পাণ্ডবদের বিবাহোত্তর রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঠিকঠাক বুঝতে পারলেন। দ্রোণ এবং ভীষ্মের প্রতি মৌখিক সম্মান তো তিনি দেখালেনই, উপরন্তু বিদুরকে পঞ্চালে পাঠিয়ে দিলেন দ্রুপদকে যথোচিত সম্মান জানানোর জন্য। কুন্তী এবং দ্রৌপদীর সঙ্গে পাণ্ডবদেরও তিনি ফিরিয়ে আনলেন রাজধানীতে। পাণ্ডবরা হস্তিনাপুরের কাছাকাছি পৌঁছোলে রাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী পাণ্ডবদের প্রত্যুদ্‌গমন করে রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসার জন্য ধৃতরাষ্ট্র যাঁদের পাঠালেন, তাঁদের মধ্যে দুর্যোধন, দুঃশাসনের মতো পাণ্ডববিদ্বেষী লোক মোটেই স্থান পেলেন না। স্থান পেলেন বিকর্ণ, যিনি কৌরবদের এক ভাই হওয়া সত্ত্বেও পাণ্ডবদের অনুকূল পুরুষ। আর স্থান পেলেন কৃপাচার্য এবং দ্রোণাচার্য—দ্রোণঞ্চ পরমেষ্বাসং গৌতমং কৃপমেব চ। দ্রুপদের বাড়ি-ফেরত বলে দ্রোণ কিন্তু পাণ্ডবদের প্রতি এই সময় বিমুখ হয়ে থাকেননি।

পাণ্ডবরা হস্তিনায় এলেন এবং রাজধানীর মন্ত্রীঅমাত্য তথা কুরুমুখ্যদের চাপে—এর মধ্যে দ্রোণাচার্যও অবশ্যই ছিলেন—ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের রাজ্য ভাগ করে দিতে বাধ্য হলেন। পাণ্ডবরা খাণ্ডবপ্রস্থে চলে গেলে কুরুবাড়ির রাজসভায় নতুন রাজনীতি শুরু হল। পাণ্ডবরা ময়দানবের সাহায্যে ধৃতরাষ্ট্রের দেওয়া নির্গুণ ভূমিতে ইন্দ্রপ্রস্থ তৈরি করলেন। তাঁদের বাড়বাড়ন্তও কিছু কম হল না। জরাসন্ধবধ এবং রাজসূয় যজ্ঞের শেষ কল্পে যুধিষ্ঠিরের মর্যাদা তুঙ্গে উঠল। মহামতি দ্রোণাচার্যকে এইসময় আমরা প্রায় অন্তরালবর্তী অবস্থায় দেখছি। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়তে তিনি অন্যান্য কৌরবদের সঙ্গে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন সাদরে। চতুর্থ পাণ্ডব নকুল পৃথকভাবে দ্রোণকে নিমন্ত্রণ করেন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ে যোগ দেবার জন্য এবং তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হলে যুধিষ্ঠির তাঁকে যে কাজ দিয়েছিলেন, মর্যাদায় তা ভীষ্মের সমান। যুধিষ্ঠির দ্রোণ এবং ভীষ্মকে বলেছিলেন—এই বিশাল যজ্ঞকার্যে যে কাজ করা হয়ে গেছে এবং যেসব কাজ করা হয়নি—সে বিষয়ে উপদেশ দেবেন আপনারা দুজন—কৃতাকৃত-পরিজ্ঞানে ভীষ্মদ্রোণৌ মহামতী।

রাজসূয় যজ্ঞের পর যুধিষ্ঠিরের মর্যাদা এবং ধনসম্পদ যত বাড়ল দুর্যোধনের ঈর্ষা এবং অসূয়া বাড়ল ঠিক ততখানি। এই ঈর্ষা অসূয়া দুর্যোধনের মাধ্যমে অনুসৃত হল ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয়ে। এর ফলে হস্তিনাপুরের রাজসভার বৃদ্ধ এবং অভিজ্ঞ মন্ত্রীদের প্রভাব প্রতিপত্তি যেন একটু কমে এল। দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ এবং শকুনিকে নিয়ে যে 'কিচেন ক্যাবিনেট' তৈরি হয়েছিল, স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্র প্রায় প্রত্যক্ষভাবেই তাঁদের কথায় সায় দিচ্ছিলেন। এরই ফলে পাশাখেলার আসর বসল এবং কৃষ্ণা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের মতো চরম অসভ্যতা চোখের সামনে দেখতে হল কুরুকুলের প্রধানদের এবং অবশ্যই চিরবিশ্বস্ত মন্ত্রী অমাত্যদেরও।

রাজবাড়ির ভিতরে এবং বাইরে সর্বত্রই দুর্যোধন দুঃশাসনেরা যে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে চরম বিদ্বেষ পোষণ করছেন, দ্রোণাচার্য তা জানেন। কিন্তু সে বিদ্বেষ যে এই পর্যায় পৌঁছেছে, তা তিনি বোঝেননি। পাশায় হারতে হারতে যুধিষ্ঠিরের পণ রাখার মতো আর যখন কিছু রইল না এবং শকুনি যখন তাঁকে কৃষ্ণা দ্রৌপদীকে পণ রাখার ইঙ্গিত দিলেন, দ্রোণ-ভীষ্মরা তখনও ভাবতে পারেননি যে, যুধিষ্ঠির এই ফাঁদে পা দেবেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন শেষপর্যন্ত পঞ্চস্বামী-গর্বিতা দ্রৌপদীকে দ্যূতক্রীড়ার তাড়নায় পণ রেখে বসলেন, সেই মুহূর্তে লজ্জায়, অপমানে দ্রোণাচার্যের সারা শরীর দিয়ে ঘাম বেরোতে লাগল। ভীষ্ম এবং কৃপের অবস্থাও একই রকম। কুরুবাড়িতে এঁরা তিনজনই প্রায় সমবয়স্ক মানুষ। কেউ বা একটু ছোট বড়, এই আর কী। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের এই আকস্মিকতার পরে যে কত কিছু ঘটবে, এটা তাঁরা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁদের সকলেরই সমান প্রতিক্রিয়া হল—ভীষ্মদ্রোণ কৃপাদীনাং স্বেদশ্চ সমজায়ত। কুরুসভার বৃদ্ধ উপদেষ্টা হিসেবে সভার মর্যাদাহানিকর সমস্ত ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধেই তাঁরা সোদ্‌বিগ্ন ধিক্‌কার জানালেন—ধিগ্‌ধিগিত্যেব বৃদ্ধানাং সভ্যানাং নিঃসৃতা গিরঃ।

কিন্তু রাজসভার মন্ত্রী হলে শুধু ধিক্‌শব্দ উচ্চারণ করে পার পাওয়া যায় না। সভার মর্যাদাহানি ঘটলে বিপন্ন ব্যক্তির প্রশ্নের সম্মুখীন হতেই হবে। অতএব দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করেছেন, তখন দ্রৌপদীর কাছে শেষ ভরসা ছিলেন কুরুসভার সভ্যরাই, যার মধ্যে দ্রোণও আছেন। দ্রৌপদী কুরুবৃদ্ধদের ধিক্‌কার শব্দ ফিরিয়ে দিয়েছেন প্রতিধিক্কারে। তিনি বলেছেন—কুরুসভার মধ্যে এই পাপিষ্ঠ আমার বস্ত্র আকর্ষণ করছে এবং কেউ তার প্রতিবাদ করছেন না। এতে মনে হয় বৃদ্ধদের এতে মত আছে, সায় আছে। ধিক্ এই ভরতবংশীয় পুরুষদের, তাঁদের ধর্ম নষ্ট হয়ে গেছে—ধিগস্তু নষ্টঃ খলু ভারতানাং ধর্মঃ—তাঁরা বসে বসে এই দুষ্কর্ম দেখছেন! দ্রৌপদী নাম করে বললেন—কৌরব পাণ্ডবদের গুরু দ্রোণাচার্য, পিতামহ ভীষ্ম এবং বিদুর—এঁদের শরীরে প্রাণ বলে কোনও বস্তু আছে বলে মনে হচ্ছে না—দ্রোণস্য ভীষ্মস্য চ নাস্তি সত্ত্বং—সবচেয়ে বড় কথা, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যে এই

অমানুষিক কর্ম করছেন, কুরুবৃদ্ধ এবং রাজসভার বৃদ্ধরা তা চোখে দেখতে পাচ্ছেন না—ন লক্ষয়ন্তে কুরুবৃদ্ধমুখ্যাঃ।

দ্রৌপদী অনেক কঠিন শব্দে রাজসভার মুখ্য পুরুষদের উদ্দেশে বক্রোক্তি করলেও দ্রোণাচার্য কোনও কথা বলতে পারলেন না। বলা উচিত ছিল, কিন্তু বললেন না বোধ হয় এই কারণে যে, তিনি স্পষ্টতই কুরুবাড়ির আত্মীয়-সম্বন্ধী কেউ নন। এ বাবদে প্রথম কথা বলা উচিত আত্মীয়দেরই এবং তাঁর এই ভাবনা সত্য করে ভীষ্মই প্রথমে কথা বলেছিলেন, যদিও সে কথা ছিল অনেকটাই নৈতিকতায় ভরা। তাতে দ্রৌপদীর কোনও কাজ হয়নি। সভায় কৌরবদের অসভ্যতার বিরুদ্ধে ধর্মনিষ্ঠ বিকর্ণও কঠিন কথা বলেছেন এবং সেখানেও দ্রোণাচার্যকে কথা শুনতে হয়েছে। কৌরব পাণ্ডবদের আচার্য হিসেবে তাঁর যে কিছু মন্তব্য করা উচিত ছিল—বিকর্ণ সে কথা উল্লেখ করতে ভোলেননি—ভারদ্বাজো হি সর্বেষামাচার্যঃ কৃপ এব চ। বিকর্ণের মতো আরও একজন ওই ঘটনার প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি বিদুর। তিনি এমনও বলেছিলেন যে, কুরুসভার সভ্যরা যদি দ্রৌপদীর প্রশ্নের জবাব না দেন, তবে সেটা ধর্মের অবমাননা এবং সেও এক ধরনের মিথ্যাচারিতা—ন চ বিব্রত তং প্রশ্নং সভ্যা ধর্মো'ত্র পীড্যতে।

দ্রোণাচার্য তবু কোনও কথা বলেননি। আসলে দ্রোণের বাস্তববোধ অতি প্রখর। ছোটবেলা থেকে দারিদ্র্য এবং বঞ্চনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সংসারকে তিনি বড় বেশি চিনে গেছেন। তিনি বেশ বুঝে গেছেন—দুর্যোধন দুঃশাসন কর্ণরা যে পরিমাণ প্রশ্রয় পেয়েছেন স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে, তাতে বৃদ্ধদের কথার কোনও মূল্য হবে না। উলটে তাঁকে অপমানিত হতে হবে ওই যুবক সদস্যদের কাছেই। অবশ্য এই অপমান ধরে নিয়েও তাঁর কথা বলা উচিত ছিল। কিন্তু বলেননি যে, তার কারণ খানিকটা স্বার্থবোধ আর খানিকটা বাস্তববোধ। যে অবস্থা থেকে তিনি কুরুসভার মন্ত্রীপদে উন্নীত হয়েছেন, তাতে কুরুকুলের প্রধানতম পুরুষ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে তাঁর ঋণ আছে। এখন এই বয়সে তাঁর প্রশ্রিত জনের প্রতিপক্ষতা করে নিজের স্বার্থহানি ঘটানোর প্রয়োজন বোধ করেননি দ্রোণাচার্য।

তবে এই স্বার্থচেতনার চেয়েও বড় তাঁর বাস্তববোধ। সেটা আরও বেশি করে প্রমাণ হয় যখন কর্ণ কটু ভাষায় সভামুখ্যদের নিন্দা করতে থাকেন। দ্রোণাচার্য কোনও কথা বলেননি, তবু কর্ণের কাছে তাঁকে কী না শুনতে হল। কর্ণ বললেন—এ সভায় তিনটি মানুষ আছেন, যাঁদের কাছে ন্যায় এবং ধর্মের কোনও বালাই নেই। এঁরা হলেন ওই ভীষ্ম, বিদুর এবং ওই কৌরবদের গুরুটা—ভীষ্মঃ ক্ষত্তা কৌরবাণাং গুরুশ্চ। এঁরা কী করেন জানেন? এঁরা যে প্রভুর আশ্রয়ে থাকেন, সেই প্রভুকেই এঁরা বদমাশ বলে গালাগাল দেন, সেই প্রভুরই মূলোচ্ছেদ কামনা করেন এবং এই পাপ করতে এঁদের কোনও লজ্জাও হয় না—যে স্বামিনং দুষ্টতমং বদন্তি, বাঞ্ছন্তি বৃদ্ধিং ন চ বিক্ষিপন্তি।

দ্রোণ কিছু বলেননি, কোনও প্রতিবাদও করেননি। অথচ তাঁকে এই অপমান সইতে হল এই কারণে যে, ভীম যখন উত্তাল সভার মাঝে দুর্যোধন দুঃশাসনদের মারণ-প্রতিজ্ঞা করছিলেন, তখন ভীষ্ম-দ্রোণ-বিদুরেরা তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। দ্রৌপদী এবং পাণ্ডবদের প্রতি এই পরোক্ষ সমর্থনেই এতখানি কঠিন কথা শুনতে হল কর্ণের কাছে। অবশ্য এই অপমানের পিছনে দ্রোণের প্রতি কর্ণের যে ব্যক্তিগত আক্রোশও ছিল এবং সে আক্রোশ যে সেই অস্ত্রশিক্ষার সময় থেকেই মনে মনে পুষে আসছেন কর্ণ, সে কথা দ্রোণ যথেষ্ট বোঝেন। এর পরেও দ্রোণ অবশ্য কিছু বলেননি, কিন্তু পক্ক কূটনীতিবিদের মতো কর্ণের অপমান তিনি মনে রেখে দিলেন।

দ্বিতীয়বার দ্যূতক্রীড়া হল এবং পাণ্ডবদের বনবাসে যেতেই হল। বনে যাবার আগে

পাণ্ডবরা কুরুবংশ ধ্বংশের প্রতিজ্ঞা করে গেলেন। কর্ণ-শকুনিও এই বধ-প্রতিজ্ঞার বাইরে রইলেন না মোটেই। ভীম-অর্জুনের কঠিন প্রতিজ্ঞায় এই ভয় এবং আশঙ্কা সকলের মনে সজীব থাকল যে, পাণ্ডবরা প্রতিশোধ নেবেন অবশ্যই। ঠিক এইসব সময় আমরা দ্রোণাচার্যের মর্যাদা বেড়ে উঠতে দেখছি। দুর্যোধনের প্রশ্রয়ে যে কর্ণ দ্রোণাচার্যকে চরম অপমান করেছিলেন, সেই কর্ণকে এখন অন্যরকম দেখছি। পাণ্ডবরা বনবাসে যাবার পর দেবর্ষি নারদ এসে আধুনিক কৌরব কর্তাদের সাবধানবাণী শুনিয়ে গেছেন। তিনি বলে গেছেন—এখন থেকে চোদ্দো বছরের মাথায় দুর্যোধনের অন্যায়ের চরম ফল ফলবে। ভীম অর্জুনের শক্তিতে কৌরবকুল ধ্বংস হবে—ইতশ্চর্তুদশে বর্ষে বিনঙ্‌ক্ষ্যন্তীহ কৌরবাঃ।

নারদের এই সাবধানবাণী শুনে—দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি—যাঁরা প্রধানত পাণ্ডবদের রাজ্যহরণের চক্রান্ত করেছিলেন—তাঁরা সবাই এসে হঠাৎ দ্রোণাচার্যের পায়ে পড়ে গেলেন। তাঁরা বিদুর কিংবা ভীষ্মের পায়ে পড়লেন না, কারণ, তাঁরা কৌরবদের এবং পাণ্ডবদের সমান আত্মীয়। কিন্তু দ্রোণ যেহেতু ভীষ্মের মতোই শক্তিশালী অথচ তিনি কৌরবদের ভরণপোষণ গ্রহণ করেন, অতএব বিপন্ন সময়ে তাঁর শরণাপন্ন হলে কৌরবদের প্রতি তিনি শেষপর্যন্ত অকরুণ হতে পারবেন না—এই ভেবেই কৌরবরা আচার্যের শরণাপন্ন হলেন—দ্রোণং দ্বীপমন্যন্ত রাজ্যং চাস্মৈ ন্যবেদয়ন্—শুধু তাই নয়, কৌরবরা সাময়িকভাবে সমস্ত কৌরব রাজ্যের ভালমন্দও ন্যস্ত করলেন দ্রোণের ওপর।

এই আপাতিক শরণাগতির ভাবুকতার মধ্যে দুর্যোধনের সঙ্গে যেহেতু কর্ণ-শকুনিরাও ছিলেন, এবং যেহেতু কুরু রাজ্যের শাসককুলের অন্নঋণ মনে রাখেন দ্রোণ, অতএব এই বিপত্তারণের ভার তিনি অস্বীকার করলেন না। কিন্তু আচার্যের স্মৃতিশক্তি যেহেতু একটুও দুর্বল নয়, তাই মুক্ত সভার মধ্যে কর্ণের কটূক্তিগুলি অবশ্যই তাঁর মনে আছে। দুর্যোধন কর্ণরা যতই এখন ভাল্‌ভালাই করুন, দ্রোণ অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁদের দুটো কথা শোনাতে ছাড়লেন না। দ্রোণ বললেন—সোজা কথা জেনে রাখো—পাণ্ডবদের মেরে ফেলা মোটেই সম্ভব হবে না। তবে হ্যাঁ, তোমরা বিপন্ন হয়ে আমার শরণাগত হয়েছ, আমি আমার শক্তি অনুসারে তোমাদের রক্ষা করার চেষ্টা করব। অন্তত এই সময় তোমাদের ত্যাগ করে যেতে পারি না আমি। তবে কপালে যা আছে, তা ঘটবে—নোৎসহেয়ং পরিত্যক্তুং দৈবং হি বলবত্তরম্।

দ্রোণাচার্য কর্ণের কথাটা একভাবে ফিরিয়েই দিলেন। কর্ণ বলেছিলেন যে, দ্রোণের মতো মন্ত্রীরা শত্রুর হিত চিন্তা করেন এবং তাতে লজ্জাও পান না। দ্রোণ বললেন—বাস্তব সেটাই। পাণ্ডবরা যেভাবে পাশায় হেরে বনে গেছেন তাতে তাঁদের ন্যায়বুদ্ধিতে বারো বছর বনে কাটালেও ফিরে এসে তাঁরা প্রতিশোধ নেবেনই—বৈরং নির্যাতয়িষ্যন্তি মহদ্‌দুঃখায় পাণ্ডবাঃ। দ্রোণ এবার আরও একটি কঠোর বাস্তব স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন কৌরবদের। তিনি বুঝেছেন—যতই কৌরবরা তাঁদের রাজ্যের ভালমন্দ তাঁর ওপরে ন্যস্ত করুন, রাজনৈতিকভাবে তাঁর সমস্যা রয়েই গেছে। দ্রোণ বলেছেন—আমিও তো মহারাজ দ্রুপদকে একসময় রাজ্যচ্যুত করেছি—ময়া চ ভ্রংশিতো রাজ্যাদ্ দ্রুপদঃ সখিবিগ্রহে। সেই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য সে ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং দ্রৌপদীকে লাভ করেছে। মনে রেখো—ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবদের শ্যালক এবং পাণ্ডবদের সঙ্গে তার প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ আছে। ঠিক এইখানেই আমার ভয়—পাণ্ডবানাং প্রিয়তরস্তস্মান্মে ভয়মাবিশৎ। দ্রোণ বলতে চাইলেন যেন—দুটি একাকার ঘটনা ঘটেছে। এক, কৃষ্ণা দ্রৌপদীর অপমান। তিনি পাণ্ডবদের প্রিয়া পত্নী। তাঁরই কারণে পাণ্ডবরাও রাজ্যভ্রষ্ট এবং বনবাসী। দুই, দ্রুপদকে অপমান করেছেন স্বয়ং দ্রোণ এবং সেই কারণে তিনিও রাজ্যভ্রষ্ট। দুটি রাজ্যচ্যুতির কারণ এখানে একাকার হয়ে গেছে এবং তাতে কৌরবদেরও রেহাই নেই, দ্রোণেরও রেহাই নেই। দ্রোণ বলেছেন—পার্ষত দ্রুপদ সর্বান্তঃকরণে পাণ্ডবদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন—গতো হি পক্ষতাং তেষাং পার্ষতঃ

পরবীরহা—ওদিকে পাণ্ডব অর্জুনও যুবক পুরুষ। যুদ্ধে অনেক রথী মহারথী তার কাছে হার মানবে। যুদ্ধে প্রাণের বিনিময়েও যদি তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়, তবে তার চাইতে দুঃখের আর কিছু নেই—কিমন্যদ্ দুঃখমধিকং পরমং ভুবি কৌরবাঃ।

পাণ্ডবদের বনবাস এবং অজ্ঞাতবাস শেষ হলে পাণ্ডবরা যেমন রুদ্রমূর্তি ধারণ করে যুদ্ধের জন্য ফিরে আসবেন—এই ভয়ের কথা শোনানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মিত্রশক্তি পাঞ্চাল এবং কৃষ্ণপক্ষীয় বৃষ্ণিবীরদের যৌথ আক্রমণের কথাও ঘোষণা করেছেন দ্রোণ। এঁদের সকলের মিলিত আক্রমণ কৌরবরা সহ্য করতে পারবেন না—এই ব্যক্তিগত বিশ্বাস পরিষ্কার জানিয়ে একই সঙ্গে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতিটুকুও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—পাণ্ডবদের সঙ্গে তোমাদের এই যুদ্ধবিগ্রহ আমার মোটেই পছন্দ নয় এবং কৌরবদের থেকে পাণ্ডবদের আমি অনেক বেশি শক্তিমান মনে করি—কুরুভ্যো হি সদা মন্যে পাণ্ডবান্ বলবত্তরান্। তা ছাড়া দুর্যোধন! এখনও সময় আছে। আমার কথা শুনে যেটা উপযুক্ত মনে হয়, করো। এমনকী পাণ্ডবদের সঙ্গে দুটো মৃদুমধুর কথা বলে এখনও তাদের ফিরিয়ে আনা যায়—সাম বা পাণ্ডবেয়েষু প্রযুঙ্ক্ষ্ব যদি মনসে।

দ্রোণাচার্য যেভাবে সমস্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা বর্ণনা করেছেন, তাতে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কিন্তু ভয় পেয়েছেন। একবার তিনি বিদুরকে বলেছেন যে, গুরু দ্রোণ ঠিকই বলেছেন। বিদুর তুমি পাণ্ডবদের ফিরিয়েই নিয়ে এসো—সম্যগাহ গুরুঃ ক্ষত্তরুপাবর্তয় পাণ্ডবান্। ধৃতরাষ্ট্রের এই মানসিকতা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কারণ দুর্যোধন কর্ণরা সাময়িকভাবে যতই দ্রোণাচার্যের পায়ে পড়ুন, পাণ্ডবদের ফিরিয়ে আনার মতো মহৎপ্রাণ তাঁরা ছিলেন না। অন্যদিকে পাণ্ডবদের বারো বচ্ছরের দীর্ঘ বনবাসকাল যত বৈচিত্র্যেই কাটুক, এই সময়টাতেই কিন্তু পাণ্ডব কৌরব দু পক্ষেই ভবিষ্যৎ যুদ্ধভাবনা সম্বন্ধে নীতি স্থির করছিলেন। দ্রোণাচার্য যেভাবে পাণ্ডবদের প্রশংসা করেও দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধবিগ্রহ করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন,—সেই ভাবটা পাণ্ডবরা নিশ্চয় আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। হয়তো রাজসভায় দ্রৌপদীর অপমানের সময় ভীষ্ম দ্রোণের নিস্তরঙ্গ আচরণ দেখেও তাঁদের ভাবটা অনেকটা বোঝা গিয়েছিল। বোঝা গিয়েছিল যে, এঁরা পাণ্ডবদের হিতকামী হলেও শুধুমাত্র কর্তব্যের তাড়নায় এঁরা কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করবেন। কিন্তু দ্রোণের মতো অস্ত্রগুরু শুধু কর্তব্যের বুদ্ধিতে কৌরবদের হয়ে যুদ্ধ করলেও সে ভার যে পাণ্ডবদের ওপর যথেষ্ট গুরুতর হয়ে দাঁড়াবে, সেটা আর কেউ না বুঝলেও পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির যথেষ্টই বুঝেছিলেন।

এই কারণেই দ্রৌপদী এবং ভীম যখন পর পর যুধিষ্ঠিরকে তাঁর কোমল স্বভাব এবং অপ্রতিহিংস স্বভাবের জন্য ভৎসনা করেছিলেন, তখন যুধিষ্ঠিরের মতো শান্ত স্বভাবের মানুষও বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। দ্রৌপদী এবং ভীমের বক্তব্য ছিল—কৌরবরা যখন শঠতা আচরণ করেছেন, তখন সেখানে বনবাসের সত্যরক্ষার কোনও প্রয়োজন নেই। বরঞ্চ শঠে শাঠ্যং এই নীতিতে অবিলম্বে কৌরব রাজ্য আক্রমণ করা উচিত বলে তাঁরা রায় দিয়েছিলেন। যুধিষ্ঠির এইখানে কৌরবদের রাজনৈতিক শক্তির রহস্যটুকু সঠিকভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন ভীম এবং দ্রৌপদীকে। যুধিষ্ঠির কৌরব-পক্ষপাতী অন্যান্য রাজা এবং বীরদের অস্ত্রক্ষমতা বর্ণনা করার পর বলেছিলেন—ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কৃপ—এঁরা যদিও আমাদের প্রতি এবং কৌরবদের প্রতি সম-ভাব পোষণ করেন, তবু এঁরা যেহেতু কৌরবকুলের প্রতি অন্নঋণে ঋণী, তাই ঋণ-পরিশোধের জন্যই তাঁরা কৌরবদের হয়ে যুদ্ধ করবেন—অবশ্যং রাজপিণ্ডৈস্তে র্নিবেশ্য ইতি মে মতিঃ। প্রাণ গেলেও এঁরা কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করবেন এবং এঁরা এতটাই যুদ্ধনিপুণ যে, দেবতারাও এঁদের সঙ্গে যুদ্ধে এঁটে ওঠেন না—অজেয়াশ্চেতি মে বুদ্ধিরপি দেবৈঃ সবাসবৈঃ।

দ্রোণাচার্যের কর্তব্যবোধ অথবা তাঁর নৈতিকতার নিরিখে যুধিষ্ঠির তাঁর মতো করে যা ভেবেছিলেন, তা হয়তো ভুল নয়। কিন্তু ভীষ্মের মতো দ্রোণাচার্যেরও এতটাই মমতা ছিল পাণ্ডবদের ওপর, বিশেষত অর্জুনের ওপর যে, ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনরা দ্রোণের সেই ভাবটাই বেশি বিশ্বাস করতেন। তাঁরা বলতেন—বুড়ো বলেই হোক অথব আচার্য স্থানে আছেন বলেই হোক, যুদ্ধের ব্যাপারে দ্রোণাচার্যের যেন তেমন মনোযোগ নেই—প্রমাদী চ আচার্যঃ স্থবিরো গুরুঃ। কী করেই বা থাকবে? এককালে আচার্যের দিন কেটেছে কৃচ্ছ্রতার মধ্য দিয়ে। তাঁর প্রিয়তম শিষ্য আজ বনবাসের কৃচ্ছ্রতায় দিনাতিপাত করছে—আচার্য কীভাবে কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধে মন দেবেন। তা ছাড়া আচার্য এতদিনে কৌরবদের সম্পূর্ণ চক্রান্ত বুঝে গেছেন। পিতামহ ভীষ্মের সঙ্গে সব সময় ওঠা-বসা করে বৃদ্ধ আচার্য পাণ্ডবদের স্নেহ করেন একই মমতায়। কী করে তিনি দুর্যোধন অথবা কর্ণ শকুনির পক্ষে কথা বলবেন?

পাণ্ডবদের বনবাসের সময় কেটে গেছে। শেষ হয়ে আসছে অজ্ঞাতবাসের কালও। কৌরব-শাসকদের চরেরা শত চেষ্টা করেও পাণ্ডবদের অজ্ঞাত অবস্থান নির্ণয় করতে পারেনি। কর্ণ দুর্যোধনকে আরও দক্ষতর চর পাঠাতে বললেন যারা সমস্ত জায়গা একেবারে চষে ফেলবে। দুঃশাসন কর্ণের কথা সমর্থন করেও খুব সন্দেহ প্রকাশ করলেন যে, পাণ্ডবরা মারা গেছেন। হয় তাঁরা বাঘের পেটে গেছেন, নয়তো বিপন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। কুরুসভার বৃদ্ধ সভাসদেরা এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। কিন্তু দুর্যোধন কর্ণ দুঃশাসনদের বহুতর যুক্তি-প্রতিযুক্তি শুনে দ্রোণাচার্য আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। দ্রোণ বললেন —অত সহজে ভেবো না, বাপু! পাণ্ডবরা যেমন প্রকৃতির মানুষ তাতে হঠাৎ করে মরে যাবার পাত্রও তাঁরা নন, আর সত্যভ্রষ্ট হয়ে জীবনযুদ্ধে হেরে যাবার পাত্রও তাঁরা নন—ন তাদৃশা বিনশ্যন্তি নাপি যান্তি পরাভবম্।

দ্রোণাচার্য পাণ্ডবদের শৌর্যবীর্য এবং বিদ্যাবুদ্ধির প্রশংসাই শুধু করলেন না, বিশেষ করে যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্য পাণ্ডবদের জিতেন্দ্রিয়তা এবং সত্যনিষ্ঠার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বললেন— পাণ্ডবরা তাঁদের ভাল সময়ের অপেক্ষা করছেন—তস্মাদ্ যত্নাৎ প্রতীক্ষন্তে কালস্যোদয়মাগতম্। দ্রোণাচার্য নিজের দৃঢ় বিশ্বাসে দুর্যোধন এবং তাঁর অনুগামীদের সাধু পরামর্শ দিয়ে বললেন—তোমাদের যা করা উচিত, তা হল—যথেষ্ট দেরি হয়ে গেলেও ভাবনাচিন্তা করে তাঁদের প্রাপ্য রাজ্য ছেড়ে দাও—বাসশ্চৈষাং প্রচিন্ত্যতাম। দ্রোণাচার্য কর্ণ দুঃশাসনের সোৎসাহ যুক্তিতে জল ঢেলে দিয়ে বললেন—চরই যখন পাঠাচ্ছ, তখন ব্রাহ্মণদের পাঠাও, নয়তো পাণ্ডবদের যারা প্রাণে-মনে চেনে তাদের পাঠাও। দ্রোণাচার্যের ভাব বুঝতে অসুবিধে হয় না। ব্রাহ্মণদের দূত করে পাঠানোর অর্থই হল শান্তির ভাবনা, সসম্মানে পাণ্ডবদের ফিরিয়ে আনার ভাবনা। দ্রোণাচার্য বার বার তাই বলছেন এবং তাঁর বক্তব্য শেষ হবার পর তাঁকে সোচ্চারে সাধুবাদ দিয়ে ভীষ্ম সর্বাত্মক সমর্থন জানালেন দ্রোণাচার্যকে—যথৈষ ব্রাহ্মণঃ প্রাহ...ন মে'স্ত্যত্র বিচারণা।

কুরুসভার হাওয়াটা হঠাৎই ঘুরে গেল। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসে বিরাট রাজ্যের সেনাপতি কীচক মারা গেলে ত্রিগর্তরাজ সুশর্মার বুদ্ধিতে কৌরব বিরাটরাজার গোধন হরণ করার জন্য যুদ্ধযাত্রা করলেন। এই যুদ্ধে অন্যান্য কুরুবৃদ্ধদের সঙ্গে দ্রোণাচার্যও শামিল হয়েছিলেন। খুব যে উৎসাহ নিয়ে দ্রোণাচার্য এখানে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন, তা নয়। কিন্তু কৌরবরা যেখানে যাচ্ছেন, সেখানে যাওয়াটা ওই অন্নঋণ শোধের মতোই কোনও যুক্তিতে ভীষ্ম কৃপের সঙ্গে দ্রোণাচার্যও সপুত্রক গেছেন। বিরাট রাজ্যে যুদ্ধযাত্রার ব্যাপারটা যথেষ্টই সহজ ব্যাপার ছিল, কিন্তু বিরাটরাজার গোধন হরণের পর সম্পূর্ণ ঘটনাটাই বেশ জটিল হয়ে উঠল।

কৌরবরা প্রায় বিনা বাধায় বিরাটের গোশালা থেকে শত শত গোরু ধরে নিয়ে চললেন।

অনেকগুলি গোরু রথের বেড় দিয়ে ঘিরে নিয়ে তাঁরা নগরপ্রান্তের বিশাল প্রান্তরে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগলেন। ভাবটা এই—আসুক না কেউ। একেবারে তার যুদ্ধভিলাষ জীবনের মতো শান্ত করে দেব। আপনারা জানেন—পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের কাল তখন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং সে হিসেবটা অর্জুনের বেশ ভালই জানা ছিল। অতএব তিনি নির্দ্বিধায় কুমার উত্তরকে রথের সারথি করে যুদ্ধে এসেছেন বৃহন্নলার বেশেই। বিশাল যুদ্ধপ্রান্তরের প্রান্তিক ভূমি থেকে বৃহন্নলাবেশী অর্জুন গাণ্ডীবে টঙ্কার দিলেন, যুদ্ধের ঘোষণা করলেন জলদগম্ভীর শঙ্খধ্বনি করে। গাণ্ডীবের টংকার এবং শঙ্খনিনাদ একত্রে মিশ্রিত হয়ে কুরুবীরদের কর্ণ বিদারিত করল।

প্রথম কথা বললেন দ্রোণাচার্য। সাপের হাসি বেদেয় চেনে—এই নিয়মেই যেন পুত্রাধিক প্রিয়তম শিষ্যের উপস্থিতি অনুমান করলেন। প্রতিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া দূরে থাক, দ্রোণ হেঁকেডেকে সবাইকে বলতে লাগলেন—দেখো বাপু! রথের আওয়াজ যেমনটি শুনছি, যেমন মেঘ ডাকছে আকাশে, পৃথিবী যেমন কম্পিত হচ্ছে, তাতে এ সব্যসাচী অর্জুন ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না—নৈষো'ন্যঃ সব্যসাচিনঃ। অর্জুনের উপস্থিতি দ্রোণাচার্য প্রকাশ করলেন হাজারো দুর্লক্ষণ আর দুনির্মিত্তের মাধ্যমে। দ্রোণ যা বললেন তার অর্থ দাঁড়ায়—শত্রুর রথনির্ঘোষ শুনে কোথায় ঝনঝন্ ঝলসে উঠবে অস্ত্রশস্ত্র, টগবগ করে ছুটে যাবে অশ্বকুল। সেখানে অস্ত্রশস্ত্র যেন ভোঁতা হয়ে গেছে, মিইয়ে গেছে ঘোড়াগুলি—শস্ত্রাণি ন প্রকাশন্তে ন প্রহৃষ্যন্তি বাজিনঃ।

রথের ধ্বজায় কাক, শকুনের গতায়াত, উল্কা পতন—আরও সব পৌরাণিক দুর্লক্ষণের কথা উচ্চারণ করে দ্রোণাচার্য বললেন—আমার ভাল ঠেকছে না বাপু—তন্ন শোভনম্—সব কিছুই যেন কেমন ভয়ের জানান দিচ্ছে—বেদয়ন্তি মহদ্ভয়ম্। আসলে অর্জুনের রথশব্দ এবং ধনুষ্টংকার শুনে কৌরবপক্ষের সেনারাও প্রমাদ গণছিল। তারা যেন যুদ্ধে হেরেই বসে আছে—পরাভূতা চ নঃ সেনা ন কশ্চিদ্ যোদ্ধুমিচ্ছতি—এমন ভাব দেখেই দ্রোণ এত দুর্লক্ষণের কথা বলেছেন, এবং আরও বলেছেন অর্জুন এসে গেছেন ভেবে। দ্রোণাচার্য ভেবেছিলেন—দুর্যোধন-কর্ণদের সুমতি হবে। তারা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ না করে সন্ধির পথ ধরবে। কিন্তু অহংকারী মানুষের হৃদয় বোঝেন না বৃদ্ধ, ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্রয়ে কুরুদের রাজবাড়িতে যে অন্তঃসভার সৃষ্টি হয়েছিল দুর্যোধন দুঃশাসন, কর্ণ আর শকুনিকে নিয়ে, তাঁদের ওপর বৃদ্ধদের মতামত চলে না। দুর্যোধন এতটাই দুর্বিনীত যে, তিনি নিজে অপমান না করে অন্য প্রশ্রিত জনকে দিয়ে দ্রোণ-ভীষ্মের অপমান ঘটান। এখানেও তাই হল।

দ্রোণাচার্যের মুখে অর্জুনের কথা শুনেই দুর্যোধন পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের তিথি-নক্ষত্র হিসেব করতে আরম্ভ করলেন। বার বার বলতে লাগলেন—আবার বনবাসে যেতে হবে পাণ্ডবদের। অন্যদিকে যুদ্ধের ভয়টাও তো কম নয়। অতএব অর্জুন যদি এসেই থাকেন তা হলে যুদ্ধ জেতার জন্য দুর্যোধন 'রেড অ্যালার্ট' দিলেন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা এবং বিকর্ণের প্রতি। লক্ষণীয়, এঁরা কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করতে এলেও মনে মনে পাণ্ডবদের পক্ষপাতী। বিশেষত দ্রোণাচার্য যেভাবে, যে মর্যাদায় অর্জুনের আগমন ঘোষণা করেছেন, তাতে অর্জুনের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী কর্ণের গা জ্বলে গেল। তিনি প্রধানত দ্রোণাচার্যকে উদ্দেশ করে দুর্যোধনকে বললেন—যা করবে করো, কিন্তু এই আচার্য দ্রোণকে সেনাপতির মুখ্য কর্ম থেকে মুক্ত করে পিছনে ঠেলে দাও আগে—আচার্য্যং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা তথা নীতি বিধীয়তাম্। তুমি তো এঁদের ভাবনাচিন্তা জান। শত্রুদের সম্বন্ধে এঁরা মর্যাদা পোষণ করেন বলেই আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন এইভাবে।

কর্ণ একেবারে গোড়া থেকে আরম্ভ করে বললেন—অর্জুনের ওপর এই দ্রোণাচার্যের সরসতা অত্যন্ত বেশি আর সেই জন্যই অর্জুনের কথা ভেবেই ইনি তাঁর প্রশংসা করে

যাচ্ছেন। অর্জুনের ঘোড়ার ডাক শুনেই যেখানে দ্রোণাচার্যের সব গুলিয়ে যাচ্ছে—হ্রেষিতং হ্যুপশৃণ্বানে দ্রোণে সর্বং বিঘট্টিতম্—সেখানে আমাদের সৈন্যরা যুদ্ধ করবে কী? তারা তো সেনাপতির অবস্থা দেখেই ভয়ে পালাবে। এই আচার্যের কাছে পাণ্ডবদের মতো ভাল কেউ নেই—ইষ্টা হি পাণ্ডবা নিত্যমাচার্য্যস্য বিশেষতঃ—সেই জন্য এত তাঁদের প্রশংসা। আর আমরা সবাই এঁর কাছে খারাপ, নইলে ঘোড়ার ডাক শুনতে পেলেই কি কেউ এমন প্রশংসা আরম্ভ করতে পারে—অশ্বানাং হ্রেষিতং শ্রুত্বা কঃ প্রশংসাপরো ভবেৎ।

কর্ণের জিহ্বা আরও শাণিত হল। যুদ্ধের মুখে হঠাৎই দ্রোণাচার্য অর্জুনের প্রশংসা করে ফেলায় কর্ণ বিরাট সুযোগ পেয়েছেন দ্রোণকে অপমান করার। কর্ণ বললেন—এসব বামুন-পণ্ডিত আচার্যরা বড় দয়ালু, বড় প্রাজ্ঞ হতে পারেন, তবে যুদ্ধের মতো ভয়ের সময় এঁদের কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না। রাজসভায় বক্তৃতা দিতে দাও, বাগানবাড়িতে গুষ্টিসুখের সময় বড় বড় কথা বলতে দাও, দেখবে এই বামুন-পণ্ডিতদের কেমন মানায়—কথা বিচিত্রা কুর্বাণাঃ পণ্ডিতস্তত্র শোভনাঃ। এঁদের মানানসই জায়গা আরও আছে। যজ্ঞের সময় কোনটায় জলের ছিটে মারতে হবে, কোনটা ধুয়ে নিতে হবে, কোন যাজ্ঞিক কোথায় ভুল করল—এসব ব্যাপারে এই দ্রোণাচার্যের মতো লোকেরা হলেন সবচেয়ে ওস্তাদ—পরেষাং বিবরজ্ঞানে মনুষ্যচরিতেষু চ। পুরাতন পুষে রাখা রাগ অনেকটা গালাগালিতে মিটিয়ে নিয়ে কর্ণ শেষ প্রস্তাব দিলেন—এইসব পরগুণগর্বিত বামুন-পণ্ডিতদের পিছনের দিকে রেখে, যাতে আমরা ঠিকঠাক যুদ্ধ করতে পারি, বিরাটরাজার গোরুগুলিকে ধরে রাখতে পারি, সেই কথা ভাবো, দুর্যোধন।

শুধুমাত্র বক্তব্য নিবেদন এবং পরামর্শের মধ্যেও কর্ণ দ্রোণাচার্যের যত নিন্দা করলেন, ততটাও বুঝি সওয়া যেত, কিন্তু এর সঙ্গে যুক্ত হল কর্ণের আত্মশ্লাঘা। এমনভাবে তিনি নিজের ক্ষমতা এবং অস্ত্রবিদ্যার কথা সাহংকারে ঘোষণা করতে আরম্ভ করলেন যাতে মনে হল—ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য—এইসব অস্ত্রবীরদের কোনও প্রয়োজনই নেই এবং তিনি একাই অর্জুনকে মেরে এক্ষুনি বন্ধু দুর্যোধনকে নিরঙ্কুশ যুদ্ধ জয়ের স্বাদ বিতরণ করবেন। দ্রোণের প্রতি যথেচ্ছ গালাগালির সঙ্গে এই আত্মশ্লাঘার ফল ভাল হল না। বৃদ্ধ দ্রোণাচার্য একটাও কথা বললেন না বটে, কিন্তু তাঁর শ্যালক কৃপাচার্য এবার দ্রোণের হয়ে মুখ খুললেন। অর্জুনের একক ক্ষমতা প্রদর্শনের বিভিন্ন উদাহরণ স্মরণ করিয়ে দিয়ে কর্ণকে বললেন—তুমি একটা অন্তত দৃষ্টান্ত দাও যেখানে একা কোনও ক্ষমতা দেখিয়েছ। কৃপাচার্যের দেখাদেখি দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাও কর্ণকে একহাত নিলেন। কৃপ তবু বলেছিলেন—অর্জুনের সঙ্গে সবাই মিলেই যুদ্ধ করব আমরা, কিন্তু কর্ণের মুখে পিতার নিন্দা শুনে অশ্বত্থামা কর্ণকে বললেন—অর্জুনের গাণ্ডীব থেকে পাশাখেলার গুটি বেরোয় না, কর্ণ! বেরোয় প্রাণান্তক শররাশি। ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় মাতুল শকুনির বুদ্ধিতে যেমন যুদ্ধ করেছিলে তুমি, সেইরকম যুদ্ধ করতে চাইলে, বেশ তো তুমি শকুনিকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করো, আমি যুদ্ধ করব না—নাহং যোৎস্যে ধনঞ্জয়ম্।

ভীষ্ম দেখলেন—অর্জুনের রথ আগতপ্রায়। তিনি কৌরবদের রাজমর্যাদার কথা ভাবলেন। এই যুদ্ধ হারা মানে বিরাটরাজার মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের কাছে হেরে যাওয়া। তিনি দ্রোণাচার্য অশ্বত্থামা এবং কৃপাচার্যকে যথোচিত মর্যাদা দিয়ে ক্ষমা করতে বললেন। বিশেষত যুদ্ধ এবং অস্ত্রক্ষমতার ক্ষেত্রে জামদগ্ন্য পরশুরামের পরে দ্রোণাচার্যের মতো ব্যক্তিত্ব যে আর নেই—সে কথা খুব জোর দিয়েই প্রতিষ্ঠা করলেন ভীষ্ম—জামদগ্ন্যাদৃতে রাজন্ কো দ্রোণাদধিকো ভবেৎ। ভীষ্মের ইঙ্গিত পেয়ে দুর্যোধনও ক্ষমা চাইলেন দ্রোণাচার্যের কাছে। তিনি বুঝেছিলেন যে, আসন্ন যুদ্ধের সময় তাঁর সেনাপক্ষের একটি প্রধান গোষ্ঠী যদি নিরুদ্যম হয়ে থাকে তবে বিপদ বাড়বে। বিশেষত এমন ঘটনা আছেই, যেখানে দ্রোণ ভীষ্ম কৃপ ছিলেন না, অথচ কর্ণ ছিলেন, কিন্তু তিনি একা যুদ্ধজয় করে দুর্যোধনের গৌরব বাড়াতে পারেননি। দুর্যোধন

অতএব খুব করে ক্ষমা চাইলেন দ্রোণের কাছে। এমনকী শেষ পর্যন্ত কর্ণও ক্ষমা চাইলেন তাঁর কাছে। হাজার হলেও দ্রোণ ব্রাহ্মণ এবং এতদিনের অভিজ্ঞতায় তিনি 'সময়' ব্যাপারটাও যথেষ্ট বোঝেন। কিন্তু ক্ষমার কথা স্পষ্ট উচ্চারণ করেও তিনি পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন যে, দুর্যোধন বা কর্ণের কথায় তিনি এই ক্ষমা করছেন না। করছেন ভীষ্মের কথায়। ভীষ্ম বলেছিলেন যে, এখন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করার সময় নয়—নায়ং কালঃ স্বভেদনে—সেই প্রথম কথাটা মনে রেখেই আমি সমস্ত ক্ষমা করে দিয়েছি—যদেতৎ প্রথমং বাক্যং ভীষ্মঃ শান্তনবো'ব্রবীৎ।

ক্ষমা হল, শান্তি হল, ভীষ্ম সমস্ত কৌরবসেনা ভাগে ভাগে রেখে মাঝখানে রাখলেন দ্রোণাচার্যকে এবং সামনে রাখলেন কর্ণকে। কর্ণ অনেক দর্প করেছিলেন বলেই তাঁর এই অগ্রস্থিতি নির্দিষ্ট হল হয়তো। ওদিকে শঙ্খ বাজিয়ে, গাণ্ডীবের শব্দ তুলে অর্জুন এসে গেলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। কতকাল পরে গুরুশিষ্যের দেখা হল সংগ্রামের মুখে। যে কোনও যুদ্ধ লাগলেই অর্জুনের মনে পড়ে দ্রোণাচার্যের কথা। কত যত্নে, কত পরিশ্রমে তিনি এই শিষ্যটিকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছেন। অর্জুন এই কৃতজ্ঞতা কখনও ভোলেন না। অন্যদিকে দ্রোণও ভাবছেন—এই সেই অর্জুন। সেই বালক বয়স থেকে কী অসাধারণ অভ্যাস এবং প্রতিভায় আজ সে পাশুপত অস্ত্রের অধিকারী। অর্জুনের প্রতি স্নেহে আচার্যের সব অন্যথা স্মৃতি নষ্ট হয়ে যায়। এতক্ষণ যে কথার জন্য তিনি কর্ণের কাছে এত গালাগালি খেলেন, অর্জুনের রথ স্পষ্ট দেখতে পেয়ে আত্মবিস্মৃত আচার্য আবার সেই একই কথা বলে উঠলেন—আরে এই তো, দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, এই তো অর্জুনের রথ। সেই গাণ্ডীবের টংকার, সেই পুরাতন রথঘর্ঘর, সেই পুরাতন রথচিহ্ন, কপিধ্বজ রথ—এষ ঘোষঃ স রথজো রোরবীতি বানরঃ।

দ্রোণাচার্যের মুখে সেই পুরাতন কথা সপ্রশংসায় উচ্চারিত হতে হতেই দুটি তীক্ষ্ণ বাণ দ্রোণের চরণের কাছে এসে ভূমিচ্ছেদ করল। আরও দুটি বাণ আচার্যের কানের পাশ দিয়ে শন্ শন্ করে বেরিয়ে গেল। দ্রোণ সোচ্ছ্বাসে চেঁচিয়ে উঠলেন—আমার পায়ের কাছে যে শর দুখানি, এ হল অর্জুনের গুরুপ্রণাম—অভিবাদয়তে পার্থঃ। আর ওই যে দুটি কর্ণস্পর্শী বাণ শন্ শন্ করে চলে গেল, ওইদুটির মাধ্যমে অর্জুন আমার কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করল—শোত্রে চ পরিপৃচ্ছতি। অর্জুন আরও বলতে চাইছে—বনবাসে তারা অনেক কষ্ট করেছে এবং সেই বনবাসের কাল তাদের শেষ হয়েছে। দ্রোণাচার্য বড় খুশি হলেন। তাঁর চোখেমুখে, সমস্ত শরীরে সেই খুশির উদ্ভাস দেখা গেল। বার বার বললেন—বহুকাল পরে আমরা এই অর্জুনকে দেখলাম। বড় ভালবাসে আমাদের সবাইকে—চিরদৃষ্টো'য়মস্মাভিঃ প্রজ্ঞাবান্ বান্ধবপ্রিয়ঃ।

দ্রোণের মুখে সেই চিরায়ত প্রশংসার কোনও প্রতিক্রিয়া আপাতত হয়নি। কারণ যুদ্ধ একেবারেই আসন্ন ছিল। তা ছাড়া অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে এসেই প্রথমে দুর্যোধন এবং কর্ণকে তাড়া করেছিলেন এবং তাঁরা কোনওরকমে পালিয়ে বেঁচেছেন। অর্জুন এবার কৌরব পক্ষের মূল বাহিনীর সামনে এসে পড়েছেন। অবশ্য এতক্ষণে দুর্যোধন কর্ণরা আবারও এসে যোগ দিয়েছেন মূল বাহিনীর সঙ্গে। অর্জুনের ব্যাপারে আচার্য দ্রোণের যেমন উচ্ছাস দেখেছি, আচার্য সম্বন্ধেও ঠিক তেমনই উচ্ছ্বাস আছে অর্জুনের মনেও। বিরাটতনয় উত্তরকে কৌরবদের বীর-পরিচয় করিয়ে দেবার সময় সসম্ভ্রমে দ্রোণের কথা উচ্চারণ করে অর্জুন বলেছেন—ওই যে রথটি দেখছ, যাঁর রথের ধ্বজায় সোনার কমণ্ডলু বসানো, ইনিই হলেন আচার্য দ্রোণ—ধ্বজে কমণ্ডলুর্যস্য শাতকৌম্ভময়ঃ শুভঃ। কুমার উত্তর! তুমি এই রথকে প্রদক্ষিণ করো। সমস্ত অস্ত্রবীরদের মধ্যে ইনি আমার সবচেয়ে মান্য।

সেকালের দিনে এমনটিই রীতি ছিল। মান্য ব্যক্তিকে শত্রুপক্ষে দেখলাম, আর আঘাত

হানলাম, এমন অসভ্যতা সেকালে চলত না। এ ছাড়া প্রিয়ত্বের সম্বন্ধযুক্ত এই গুরুশিষ্যের মধ্যে যুদ্ধে একটি পূর্বঘোষিত শর্তও ছিল। শর্ত ছিল—অর্জুন কোনওভাবেই দ্রোণের প্রতি প্রথম অস্ত্র নিক্ষেপ করবেন না—এখনকার ভাষায় 'নো ফার্স্ট স্ট্রাইক' আর কী। টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেছেন অর্জুনের দিক থেকে প্রথম এই অপ্রহারের মানে হল গুরুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন। অর্জুন নিজের মুখে বলেছেন—যদি দ্রোণ প্রথম আমার শরীরে অস্ত্রাঘাত করেন এবং তার পরে যদি আমি তাঁকে অস্ত্রাঘাত করি, তা হলে আর দ্রোণাচার্যের রাগ হবে না—ততো'স্য প্রহরিষ্যামি নাস্য কোপো ভবেদিতি।

প্রাথমিকভাবে আচার্যের সঙ্গে বাণের মাধ্যমেই অভিবাদন সম্ভাষণের পর কৌরব বাহিনীর একেক সেনাপতির সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। প্রথমেই অবশ্য দ্রোণ নন, তার আগে অর্জুনের সঙ্গে কৃপাচার্যের যুদ্ধ হয়ে গেছে। দুর্যোধন, কর্ণ এবং কৃপাচার্যের অক্ষমতা প্রকট হয়ে যাবার পর সেনাবাহিনীর মধ্যভাগের রক্ষক দ্রোণের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ আরম্ভ হল। এই প্রথম যুদ্ধ! গুরুশিষ্য কোনও দিন মুখোমুখি যুদ্ধ করেননি এর আগে। এই তাঁদের প্রথম 'এনকাউন্টার'। অর্জুন দ্বিতীয়বার উচ্ছ্বসিত হয়ে কুমার উত্তরের কাছে দ্রোণের কথা বলেছেন এবং এই আলাপচারিতার মধ্যেই আমরা প্রথম দ্রোণের চেহারা, তাঁর ছোট ছোট পছন্দ অপছন্দ, তাঁর আপাতকঠিন বীর স্বভাবের পিছনে তাঁর স্নেহ—সবকিছুই যেন একটু একটু করে চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

মহাভারতের কবি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার রচনা লিখতে বসেননি। মহাকবি বলেই তিনি দ্রোণের আকৃতি-প্রকৃতি বা পছন্দ-অপছন্দের কথা প্রথম দিকে উচ্চারণই করেননি। তিনি এগুলো অতি সংক্ষেপে অর্জুনের মুখ দিয়ে প্রকাশ করছেন। তাও কখন? যুদ্ধক্ষেত্রে যখন গুরুশিষ্য মুখোমুখি। পঞ্চাল রাজ্যের অর্ধভাগী রাজার পরিচয় দ্রোণের পরিচয় নয়। ঋষি ভরদ্বাজের ক্ষণিক অস্থিরতায় জাত এক ব্রাহ্মণের পরিচয়ও দ্রোণের পরিচয় নয়। তাঁর আসল পরিচয় তিনি গুরু, আচার্য এবং সব থেকে বড় পরিচয় তিনি অর্জুনের মতো সর্বজয়ী শিষ্যের গুরু। তাই যে মর্যাদা এবং যে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে এক জননী তাঁর পুত্রের আকৃতি-প্রকৃতি, পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে মাথা ঘামান, ঠিক সেই মর্যাদায়, সেই প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে এবং সেই ব্যাপ্তিতে অর্জুন দ্রোণের কথা বলেছেন।

অর্জুন বলেছেন—রথের ওপরে তাঁর সোনার যজ্ঞবেদি বাঁধানো, তাতে সোনার কমণ্ডলু। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম করলেও দ্রোণ নিজেকে ব্রাহ্মণ ভাবতেই ভালবাসেন। দ্রোণ বোঝাতে চান—তাঁর দারিদ্র্য, তাঁর অস্ত্রনিপুণতা এবং অবশ্যই তাঁর উচ্চাশাই যে শুধু তাঁকে ব্রাহ্মণ থাকতে দেয়নি, তা নয়। এগুলি নিয়েই তিনি ব্রাহ্মণ থাকতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সমাজ তাঁর প্রতি অনুকূল হয়নি। ধ্বজ মানে চিহ্ন। দ্রোণ তাই ব্রাহ্মণের চিহ্নটুকু রেখে দিয়েছেন মাথার ওপর, রথের গায়ে চিহ্ন এঁকে। ধ্বজের নীচেই ক্ষত্রিয় মূর্তি ক্ষত্রিয়ের কর্মকারী দ্রোণাচার্য, ব্রাহ্মণত্বের চিহ্নমাত্র বহনকারী আপাদমস্তক এক প্রতিবাদী বীরপুরুষ দ্রোণাচার্য।

দ্রোণের রথে যে ঘোড়াগুলি যোতা আছে তাদের রং কোমল লাল, চকচক করছে তেজে বিশাল ঘোড়াগুলির গা—অশ্বাঃ শোনা প্রকাশন্তে বৃহন্তশ্চারুবাহিনঃ। ক্ষুদ্র স্নিগ্ধ বট অশ্বত্থ নিমের কচি পাতাটি যেমন স্নিগ্ধ লাল দ্রোণের ঘোড়াগুলির রঙও সেইরকম লাল। তাদের মুখগুলি আবার তামাটে—স্নিগ্ধ বিদ্রুমসঙ্কাশা-স্তাম্রাস্যাঃ প্রিয়দর্শনাঃ। এত যে ঘোড়ার বর্ণনা, তার কারণ আছে। ক্ষত্রিয়ের গুণ হল রজোগুণ। লাল রং রজোগুণের প্রতীক। এই রজোগুণই দ্রোণের জীবন বহন করে নিয়ে চলেছে, রজোগুণই তাঁকে চালায়। দ্রোণ নিজে কেমন? দীর্ঘবাহুর্মহাতেজাঃ বলরূপসমন্বিতঃ। এই একটি বাক্যই যথেষ্ট। তাঁর চেহারার মধ্যে শক্তিমত্তার ছাপ যতটুকু আছে ততটুকুই তাঁর রূপ, তার সঙ্গে আছে দীর্ঘ বাহুর সুলক্ষণ,

অর্থাৎ রীতিমতো পুরুষালি চেহারা। রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক বুদ্ধিতে তিনি শুক্রাচার্য এবং বৃহস্পতির সমান। অর্থাৎ 'ডিপ্লোমেসি'র প্রশ্নে দ্রোণ 'রিজিড' নন। রামায়ণে দেখব—অসুর রাবণ অসুরগুরু শুক্রাচার্যের নীতিতে সেনাব্যূহ সাজাচ্ছেন আর দেবত্বের প্রতীক রামচন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতির মতানুযায়ী সেনাব্যূহ নির্মাণ করছেন। এঁরা নিজের নিজের জায়গায় 'রিজিড'। মহাভারতের কবি সেনাব্যূহের মতো সাধারণ কথা বলছেন না। বলছেন—বুদ্ধিতে অর্থাৎ 'ডিপ্লোমেসি'র ক্ষেত্রে তিনি শুক্রাচার্যের মতো—বুদ্ধ্যা হি উশনসা তুল্যঃ। আর রাজনৈতিক জ্ঞানগরিমার ক্ষেত্রে দ্রোণ বৃহস্পতির মতো প্রাজ্ঞ—বৃহস্পতিসমো নয়ে।

সত্যি কথা বলতে কী, 'ডিপ্লোমেসি' এবং রাজনীতি—এ দুটোই ভাল না জানলে কৌরব রাজ্যে বাস করে তাঁদের চিরায়ত শত্রুতার সুযোগ নিয়ে দ্রুপদের ওপর নিজের প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করা এবং শত্রু তৈরি করার পরও সেই রাজ্যেই সসম্মানে মন্ত্রী হিসেবে বাস করা দ্রোণের পক্ষে সম্ভব হত না। অর্জুন বলছেন—দ্রোণ বেদবিদ্যা এবং ব্রহ্মবিদ্যার রহস্য যেমন জানেন, তেমনই জানেন অস্ত্রবিদ্যা, দৈবমানুষ—সব রকমের অস্ত্রবিদ্যা। জীবনচর্যার মধ্যে গুণ এবং কর্মের এই দ্বৈরথ-সাধনের মধ্যেও দ্রোণের মূল চরিত্রের মধ্যে যে তাঁর জন্মমূল ব্রাহ্মণ্যের গুণটুকুই বেশি প্রকট, সেটি আর কারও চোখে না পড়ুক, কিন্তু অর্জুনের চোখে ঠিক পড়েছে। অর্জুন দ্রোণের শেষ পরিচয়-সারাংশে যা ব্যক্ত করেছেন, তা হল—ক্ষমা, নিজের উদ্ধত অজিতেন্দ্রিয়তা দমন করবার ক্ষমতা, সত্যের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা, অনৃশংসতা, ঋজুসরল স্বভাব—এইরকম যত গুণ একটি আদর্শ ব্রাহ্মণের মধ্যে থাকা উচিত, তা সবই দ্রোণের মধ্যে আছে—এতে চান্যে চ বহবো যস্মিন্ নিত্যং দ্বিজে গুণাঃ।

এই গুণের পরীক্ষা আমরা পেয়েছি। কর্ণ যেভাবে তাঁকে অপমান করেছিলেন, তার উত্তরে দ্রোণ একটা কথাও বলেননি। পরেও এরকম অপমানের সময় আরও আসবে এবং দ্রোণকে আমরা ক্ষমা করে দিতে দেখব। নিজে অমন ক্রূর ক্ষত্রিয় কর্ম করেন বলেই দ্রোণকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় সম্বোধন করলে বড় খুশি হতেন তিনি। মহামতি ভীষ্ম বোধ হয় তাঁর এই দুর্বলতাটুকু জানতেন আর জানতেন বলেই যখন তখন দ্রোণকে সমর্থন করার সময় তিনি বলতেন—যথৈতৎ ব্রাহ্মণঃ প্রাহ—এই ব্রাহ্মণ যেমন বলেছেন। আর দ্রোণ সবচেয়ে নিন্দিত বোধ করতেন তখনই, যখন কেউ তাঁকে বলত—যেমন কর্ণই তাঁকে বহুবার বলেছেন—বামুন হয়েও যাঁদের ক্ষত্রিয়কর্ম করতে লজ্জা হয় না—তখন অপমানে, রাগে, লজ্জায় দ্রোণের মুখ লাল হয়ে উঠত। এটাও নেতিবাচকতায় তাঁর দুর্বলতারই জায়গা। হায়! কর্ণের সুতপুত্রতার গালাগালিতে যাঁরা দুঃখিত, বিগলিত হন, তাঁরা কর্ণের এই গালাগালিকে কেমন উপভোগ করেন!

ক্ষত্রিয়কর্মা পুরুষের ব্রাহ্মণ্যের প্রতি এই দুর্বলতার কথা অর্জুন বড় সহৃদয়তার সঙ্গে বুঝেছেন বলেই দ্রোণের স্থান অর্জুনের কাছে অনেক উঁচুতে। অর্জুন তাঁর ব্রাহ্মণের গুণটুকুও বোঝেন এবং অগত্যা ক্ষত্রিয়কর্মটুকুও বোঝেন বলেই তিনি দ্রোণাচার্যের পুত্রাধিক প্রিয় শিষ্য। যাই হোক, সেই গুরুর সঙ্গে সেই শিষ্যের যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা হল এই প্রথম। রক্তাশ্ববাহন দ্রোণের রথের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল শ্বেতাশ্ববাহন অর্জুনের রথ। অর্জুন সানুনয়ে দ্রোণকে বললেন—অনেককাল বনবাসের কষ্ট সয়েছি, গুরুদেব। এবার আমাদের প্রতিশোধ নেবার সুযোগ দিন। আপনি রাগ করবেন না আমার ওপর—উষিতাঃ স্ম বনে বাসং প্রতিকর্মচিকীর্ষবঃ। তবে হ্যাঁ আচার্য! আপনি প্রথম প্রহার করবেন, তবে আমি। সেইরকমই কথা আছে—ইতি মে বর্ততে বুদ্ধিস্তদ্ ভবান্ কর্তুমর্হসি।

অর্জুনের কথা শোনার পরেই দ্রোণাচার্য বাণবর্ষণ করলেন অর্জুনের ওপর। এক মুহূর্তে সে সমস্ত বাণ কেটে ফেললেন অর্জুন। গুরুশিষ্যের মধ্যে এই যুদ্ধ শুরু হল, তা যেমন

ভয়ানক, তেমনই বিচিত্র। মহাভারতের কবি তাঁর অমানুষী ভাষা এবং ছন্দে এই যুদ্ধের যে বর্ণনা করেছেন, আমার ভাষায় তার নাগাল পাওয়া ভার। শুধু এইটুকু জানাই—অর্জুনের বয়স কম এবং অস্ত্রমোক্ষণের শীঘ্রতাও তাঁর অনেক বেশি। তার ওপরে ব্যক্তিগত অপমানে এবং তেরো বচ্ছরের কৃচ্ছ্রসাধনে তিনি আতপ্ত হয়ে আছেন। কর্ণ-কৃপরা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে ভঙ্গ দিয়েছেন। এইরকম অর্জুনের সঙ্গে বহুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর যুদ্ধপ্রেক্ষকেরা শুধু বলেছিলেন যে, প্রশংসা যদি করতে হয় তো দ্রোণেরই করো—দ্রোণস্তত্র প্রশংসতাম্। কেননা অর্জুনের সঙ্গে তিনি এতক্ষণ লড়াই চালিয়েছেন—দুষ্করং কৃতবান্ দ্রোণো যদর্জুনমযোধয়ৎ।

যে কোনও ক্ষেত্রেই ন্যায়সঙ্গতভাবে পুত্রের কাছে হেরে গেলে পিতার আনন্দ হয়, শিষ্যের কাছে হেরে গেলে গুরুর আনন্দ। কৃতী ছাত্র-শিষ্যকে অন্যেরা প্রশংসা করলে গুরু সগর্বে বলেন—আমার ছাত্র বটে। যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের বহু বিচিত্র রণকৌশল দেখে দ্রোণ কেবলই বিস্ময়ে আকুলিত হচ্ছিলেন—পার্থস্য সমরে দৃষ্ট্বা দ্রোণস্যাভূচ্চ বিস্ময়ঃ। কেবলই ভাবছিলেন—এই সেই বালক, যাকে অস্ত্রশিক্ষা দেবার সময়েই তিনি মহান সম্ভাবনা দেখেছিলেন। কিন্তু আজ! অভ্যাস এবং পরিশ্রমে তাঁর এই শিষ্যটি কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে একটি বাণ ছাড়ার পর সেই বাণের পশ্চাদ্‌গত দ্বিতীয় বাণের মধ্যে হাওয়াটুকুও ঢুকতে পারছে না যেন—ন চ বাণান্তরেপস্য বায়ুঃ শক্লোতি সর্পিতুম্।

অর্জুনের শররাশি একসময় দ্রোণের কমণ্ডলুবাহী রথের চারপাশ ঘিরে ফেলল। দ্রোণ তাঁর শিষ্যের অবিরাম বাণবৃষ্টি আর রোধ করতে পারছেন না। দ্রোণের অবস্থা দেখে সমস্ত সাধারণ সৈন্যেরা হাহাকার করে উঠল—হাহাকারো মহানাসীৎ সৈন্যানাং ভরতর্ষভ। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা দূর থেকে পিতার করুণ অবস্থা দেখতে পেয়েছেন। অর্জুনের অস্ত্রমোক্ষণের ক্ষমতা দেখে একদিকে তিনি তাঁর প্রশংসা করতে বাধ্য হলেন মনে মনে। অন্যদিকে দ্রোণের অবস্থা দেখে তাঁর রাগও হল। অশ্বত্থামা দ্রোণের সামনে এসে দাঁড়ালেন অর্জুনকে নতুনভাবে প্রতিরোধ করার জন্য। দ্রোণ এবার একটু সম্মান নিয়ে পালিয়ে যাবার সুযোগ পেলেন। তাঁর শরীরের বর্ম ছিন্ন হয়ে পড়ে গেছে। রথোপরি যজ্ঞবেদী-কমণ্ডলুর ব্রাহ্ম ধ্বজখানি কর্তিত হয়ে পড়েছে মাটিতে। কোনওরকমে শীঘ্রগামী অশ্বের সহায়তায় দ্রোণ পালিয়ে যাবার সুযোগ পেলেন—ছিন্নবর্মধ্বজঃ শূরো... ব্যপায়াজ্জবনৈ র্হয়ৈঃ। শিষ্যের কাছে হেরে দ্রোণ পালিয়ে গেলেন বটে, কিন্তু তাঁর হৃদয় ভরে গেল প্রিয়তম শিষ্যের নিপুণ অস্ত্রশক্তি দর্শন করে। সমস্ত কৌরববাহিনীর মধ্যে অর্জুনের মাহাত্ম্য কীর্তন করে তিনি যে কোনও ভুল করেননি, সে ব্যাপারে একটা দৃঢ়তাও কাজ করল তাঁর মনে।

বিরাটরাজার গোধন হরণ করে কৌরববাহিনীর সঙ্গে পাণ্ডব অর্জুনের যে মহাযুদ্ধ হয়ে গেল, সেটা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে একটা মহড়ামাত্র ছিল না, এই যুদ্ধের একটা ইঙ্গিত ছিল, একটা 'মেসেজ' ছিল। কৌরব-বাহিনীতে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হিসেবে ভীষ্ম এবং দ্রোণ নিজেরা যথেষ্ট বড় যোদ্ধা বলেই বুঝেছিলেন যে, অর্জুন-ভীমের মিলিত আক্রমণ যদি কৃষ্ণের বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হয়, তবে তাঁদের পরাজিত করা মোটেই সহজ হবে না। কৌরববাহিনীর মুখ্য পুরুষেরা বিরাট রাজার বাড়ি থেকে যে শিক্ষা পেয়ে এসেছিলেন, সেই শিক্ষার কথা অন্য কারও মনে না থাকলেও দ্রোণ-ভীষ্মের তা মনে ছিল এবং পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেবার বাস্তববোধও তাঁদের ছিল। অতএব ধৃতরাষ্ট্রের দূতিয়ালি করতে গিয়ে ভীম-অর্জুন-যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে যে সন্দেশ বয়ে আনলেন সঞ্জয়, তাতে প্রথম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন পিতামহ ভীষ্ম।

কৃষ্ণ এবং অর্জুনের মাহাত্ম্য ভীষ্ম ব্যক্ত করেছেন অলৌকিকতার ঐশ্বর্যে। প্রতিতুলনায় কৌরববাহিনীর মধ্যে সবসময়ই যিনি পাণ্ডবদের মৌখিক আড়ম্বরে উৎখাত করে ছাড়ছেন,

সেই কর্ণকে খানিকটা হীন প্রতিপন্ন করে ধৃতরাষ্ট্রকে বাস্তব বোঝাতে চেষ্টা করলেন ভীষ্ম। কর্ণ স্বভাবসিদ্ধভাবেই এইসব পাণ্ডব-প্রশংসার কঠিন প্রতিবাদ করলেন এবং ভীষ্মের কাছে তিনি তার জবাবও পেলেন। দ্রোণাচার্য কিন্তু এইসব তুলনা-প্রতিতুলনার মধ্যে গেলেন না। অর্জুন বা কৃষ্ণের অলৌকিক কোনও মহিমাও তিনি স্থাপন করলেন না। কর্ণকেও তিনি গ্রহণ করলেন না। শুধু ভীষ্ম যে পাণ্ডবদের প্রাপ্য মিটিয়ে দেবার কথা বলেছিলেন, সেই জায়গায় তাঁকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে যুদ্ধের চাইতে সন্ধিই যে কৌরবদের উপযোগী ব্যবহার হবে, সেটা বুঝিয়ে দিলেন ধৃতরাষ্ট্রকে। এক্ষেত্রে কোনও অলৌকিকতার আখ্যান অথবা কোনও অতিমানুষ ভাবনায় অর্জুনের কথা বলেননি দ্রোণাচার্য। কিন্তু তিনি তাঁর শিষ্যটিকে চেনেন। সঞ্জয়ের মাধ্যমে অর্জুন যেভাবে কৌরবদের ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন, সেগুলি যে ফাঁকা আওয়াজমাত্র নয়, কর্ণের মৌখিকতার বিপরীতে অর্জুন যে তাঁর বাক্য কার্যে পরিণত করবেন—এই দৃঢ় বিশ্বাসের কথা দ্রোণাচার্য ধৃতরাষ্ট্রকে জানালেন দুটিমাত্র কথায়। তিনি বললেন—অর্জুনের মতো ধনুর্ধর পুরুষ এই জগতে দুটি পাওয়া যাবে না—ন হ্যস্য ত্রিষু লোকেষু সদৃশো'স্তি ধনুর্ধরঃ।

সঞ্জয়ের কাছে সব কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র যে দ্রোণের কথা হৃদয়ঙ্গম করেননি, তা নয়। কিন্তু অন্ধ পুত্রস্নেহ এবং দুর্যোধন কর্ণের বাগাড়ম্বর তাঁকে সত্য এবং বাস্তব বুঝতে দেয়নি। দুর্যোধনকে বোঝাতে চেয়েও তিনি পারেননি। আর শুধু ধৃতরাষ্ট্র কেন, দ্রোণ তাঁর মন্ত্রিত্বের মর্যাদা থেকে এবং ভীষ্ম তাঁর পিতামহের মর্যাদা থেকে দুর্যোধনকে বার বার বোঝানোর চেষ্টা করেও বিফল হয়েছেন। যুদ্ধের উদ্যোগপর্ব শুরু হয়ে গেল। এখন দ্রোণ বড় অসহায় বোধ করেন। একদিন ব্যক্তিগত জীবনের স্বার্থ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য তিনি কুরুবাড়িতে এসে উঠেছিলেন। তাঁর জীবনের দুঃখ এবং অপমানের বৃত্তান্ত শুনে ভীষ্মই তাঁকে প্রথম নিযুক্ত করেছিলেন কুমারদের শিক্ষার কাজে। সেই কুমারেরা আজ বড় হয়ে নিজেদের মধ্যেই শত্রুতা আরম্ভ করেছে। বড় অসহায় বোধ করেন দ্রোণ। ব্যক্তিজীবনের চরিতার্থতা অনেককাল আগেই তাঁর হয়ে গেছে। কিন্তু সেই থেকে কুরুবাড়িতে বাস করতে করতে কুরুদের সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দের সঙ্গে তিনি এমনভাবেই জড়িয়ে গেছেন যে, এখান থেকে যাবার কথা তাঁর আর মনেও হয়নি।

কিন্তু সেই পাণ্ডবদের বনে যাবার কাল থেকে ঘটনাপ্রবাহ এমনভাবেই চলছে যে, তাঁর অন্যত্র চলে যাওয়াটা সৌজন্যের খাতিরেই আর সম্ভব হয়নি। এতকাল তিনি কুরুবাড়িতে থেকেছেন, এখন হঠাৎ কোনও অজুহাতে চলে যেতে চাইলেও একটা প্রশ্ন উঠবে যে, ভবিষ্যতে পাণ্ডবদের সম্ভাব্য সম্মিলিত আক্রমণের কথা প্রায় নিশ্চিত জেনেও তিনি এই সময়ে কুরুদের ছেড়ে চলে গেলেন। তা ছাড়া কৃতজ্ঞতার ব্যাপারও তো একটা আছে। তিনি যখন ব্যক্তিগত স্বার্থে পাঞ্চাল দ্রুপদকে শিষ্যদের মাধ্যমে বেঁধে এনে অপমান করেছিলেন, সেদিন তো কুরুবাড়ির শাসককুল একবারও তাঁকে দোষ দিয়ে বলেনি যে, দ্রোণের জন্যই পাঞ্চালদের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা হল।

দ্রোণ জানেন—পাণ্ডবরা ভবিষ্যতে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলে তাঁদের মিত্রশক্তির অন্যতম প্রধান হিসেবে দ্রুপদ অবশ্যই যুদ্ধ করতে আসবেন। কিন্তু কুরুদের ঘরে বাস করে যে দ্রুপদকে তিনি নিজের কারণে কুরুদের শত্রুতে পরিণত করেছেন, এখন তাদের বিপদকালে কুরুদের ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবেন, এমন অকৃতজ্ঞ তিনি নন। তিনি কুরুদের সঙ্গে আছেন, থাকবেনও। তাঁর সমস্যাটাই আলাদা। মহামতি ভীষ্মের কাছে কুরুকুলের ইতিহাস তিনি সমস্ত শুনেছেন, তিনি নিজেও ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনদের সঙ্গে কম দিন জড়িয়ে নেই। কিন্তু সব শুনে, সব বুঝে নিজের সত্য দৃষ্টিতেই তিনি বুঝতে পারেন যে, পাণ্ডবদের প্রতি অবিচার চলছে অনেক দিন ধরে। এই অবিচারের অবসান তিনি চান। বিশেষত পাণ্ডব অর্জুন, তাঁর প্রিয়তম শিষ্য পাণ্ডব অর্জুন তাঁর প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়ে তাঁরই সঙ্গে যুদ্ধ করবেন—

এমনটি তিনি সইবেন কী করে!

তবু জানেন তিনি, সইতেই হবে। কৌরব-পাণ্ডবের এক পিতামহ ভীষ্মকে যেমন সইতে হচ্ছে, তেমনই কৌরব-পাণ্ডবের এক আচার্য দ্রোণকেও তেমনই সহ্য করতে হবে। ভীষ্ম এবং দ্রোণের সমস্যা প্রায় সমান। দুজনে কথাও বলেন প্রায় একসঙ্গে, হয় আগে, নয় পরে। দুজনের কথার মিলও হয় যথেষ্ট। সামান্য সংকোচ যেটুকু কাঁটার মতো মাঝে মাঝে বেঁধে, সেটা হল—ভীষ্ম কুরুবাড়িতে রক্তের সম্বন্ধে পরম আত্মীয়, কিন্তু তিনি এখানে বহিরাগত। শিক্ষক এবং আচার্যের সম্বন্ধে তিনি কুরুবাড়িতে যথেষ্ট সম্মানিত বটে, তবু কুরুবাড়ির আধুনিক কর্তাদের সঙ্গে তাঁর যখন মতবিরোধ ঘটে, তখন এই বহিরাগতের সত্তা একভাবে তাঁর মনের মধ্যে ক্রিয়া করতে থাকে। তিনি তখন সত্যিই বড় অসহায় বোধ করতে থাকেন।

কৃষ্ণ যখন কুরুসভায় আসলেন শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্তিম প্রয়াস নিয়ে সেখানে অন্যদের সঙ্গে মন্ত্রী হিসেবে দ্রোণও উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণের চেষ্টা যখন ব্যর্থ হওয়ার মুখে তখন ভীষ্ম কঠিন ভাষায় দুর্যোধনকে শান্তির প্রস্তাব মেনে নিতে বলেন। ভীষ্ম বলার পরেই দ্রোণাচার্য ওঠেন কথা বলতে। এখানে কুরুবাড়ির আত্মীয় না হয়েও তিনি পরম যত্নে কুরুবাড়ির মর্যাদাময় ইতিহাসের কথা শুনিয়েছেন দুর্যোধনকে। তৎকালীন নিয়মবিধি অনুযায়ী পাণ্ডবদের রাজ্য পাওয়াটা যে যথেষ্টই ন্যায়সঙ্গত—একথা বলতে তাঁর এতটুকু সংকোচ হয়নি। কুরুবাড়ির নিশ্চিন্ত আশ্রয় হারানোর ভয় অথবা দুর্যোধনের পক্ষপাতী কর্ণ-শকুনিদের তিরস্কারের ভয়ে সত্য কথা বলতে ভয় পাননি দ্রোণাচার্য।

দ্রোণাচার্য বলেছেন—এই প্রসিদ্ধ ভরতবংশের সুস্থিতির প্রয়োজনে মহারাজ শান্তনু যা করেছেন, মহামতি ভীষ্ম যা করেছেন, পাণ্ডবদের পিতা পাণ্ডুও তাই করেছেন। পাণ্ডু বনে চলে যাবার পর ধৃতরাষ্ট্র রাজা হয়েছেন বটে, কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক, বিদুর এবং ভীষ্মের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে এই কুরু রাজ্যের শাসন চালানো সম্ভবপর ছিল না। দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধত্বের কথা স্পষ্টতই বলছেন না, তা বলা তাঁর শোভা পায় না; কিন্তু কুরুমুখ্য দুই ব্যক্তি, ভীষ্ম এবং বিদুরের অবদান ছাড়া ভরতবংশের অস্তিত্ব অকল্পনীয় বলেই তাঁদের কথাই যে দুর্যোধনের শোনা উচিত, সেটা দ্রোণাচার্য খুব ভাল করেই বুঝিয়ে দিলেন। দ্রোণ বললেন—ধৃতরাষ্ট্র রাজা হয়েছিলেন বটে, কিন্তু এই বৃহৎ কুরু রাজ্যের আয়-ব্যয় এবং কোশ-সংরক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সামলেছেন বিদুর। রাজশাসনের অন্যান্য বিভাগীয় কর্মে যে সমস্ত রাজভৃত্যরা নিযুক্ত আছেন, তাঁদেরও পরিচালনার ভার ছিল বিদুরের ওপরেই—কোশসংবননে দানে ভৃত্যানাঞ্চান্ববেক্ষণে। অন্যদিকে এই রাজ্যের পররাষ্ট্র বিষয়ক সমস্ত কাজকর্ম—সন্ধি-বিগ্রহ ইত্যাদি—এই সমস্ত বিষয় দেখাশোনা করতেন ভীষ্ম—সন্ধিবিগ্রহসংযুক্তো রাজ্ঞং সম্বাহনক্রিয়াঃ। এমন দুটি মহান ব্যক্তিত্বের পরিচালনায় যে কুরুকুল বর্ধিত হয়েছে, সেই বংশে জন্মে দুর্যোধন, তুমি যে কেন এই জ্ঞাতিভেদ ঘটাতে চাইছ, তা আমি বুঝতে পারছি না। তুমি পাণ্ডব ভাইদের সঙ্গে মিলে একসঙ্গে এই কুরু রাজ্য ভোগ করো—সম্ভূয় ভ্রাতৃভিঃ সার্ধং ভুঙ্ক্ষ ভোগান্ জনাধিপ।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সেই বহিরাগত ব্যক্তির অন্তর্গূঢ় যন্ত্রণা দ্রোণাচার্যকে গ্রাস করল। কেউ যদি এখন বলে—কর্ণ অথবা শকুনি, দুর্যোধন অথবা দুঃশাসন—কেউ যদি বলে—ওরে কেরে ব্যাটা তুই। ভরতবংশের ক্ষতিবৃদ্ধি নিয়ে তুই এত মাথা ঘামাচ্ছিস কেন? তুই কি এই বংশের কেউ যে, শান্তনু, ভীষ্ম অথবা পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্রকে নিয়ে তুই এত মাথা ঘামাচ্ছিস। দ্রোণাচার্যের কাছে এর জবাব নেই। কিন্তু এতকাল কুরুবংশের মন্ত্রিত্ব করে, এতকাল এই বংশের ভাল-মন্দের বিষয়ে মন্ত্রণা দিয়ে তিনিও তো বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। তিনি এই কুরুবাড়ি ছেড়ে যেতেও পারবেন না, অথচ ভাইতে-ভাইতে এই শত্রুতাচরণ তাঁর ভালও লাগছে না। বহিরাগত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও যেখানে শান্তির সমস্ত প্রস্তাব ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, সেখানে তিনি

চুপ করে থাকেন কী করে? এতকাল এই বংশের বন্ধনে জড়িয়ে আছেন বলেই তিনি সত্য কথা বলবেন। নইলে অকৃতজ্ঞতা হবে আরেকভাবে।

আবাসিক বহিরাগতের সমস্ত যন্ত্রণা হৃদয়ে নিয়েই দ্রোণাচার্য তাই বললেন—দেখো দুর্যোধন! আমি ভয় পেয়ে কিছু বলছি না—ব্রবীম্যহং ন কার্পণ্যাৎ। ভাবটা এই—উচিত কথা বলছি বলে এই কুরুবাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার ভয়েও বলছি না, আবার যুদ্ধ লাগলে কুরুদের হয়ে যুদ্ধে প্রাণ দেবার ভয়েও বলছি না। দ্রোণাচার্য আরও পরিষ্কার করে বললেন—দুর্যোধন! তুমি ভেবো না যে, অর্থের লোভে আমি সত্য-উচ্চারণ থেকে বিরত থাকব। এই বাড়ির রাজকুমারদের অস্ত্র শিক্ষক হিসেবে, আচার্য হিসেবে যে বৃত্তি আমি ভোগ করি সে বৃত্তি দেন ভীষ্ম। অতএব আমি তাঁর খাই, তোমার নয়—ভীষ্মেণ দত্তমশ্নামি ন ত্বয়া রাজসত্তম। আমার জীবনে এমন সময় কখনও আসবে না, যখন কুরুবাড়ির বৃত্তি লাভের জন্য তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। আর এটাও সঙ্গে সঙ্গে মনে রেখো—ভীষ্ম যেখানে যে ভাবনায় ভাবিত, দ্রোণও সেখানে সেই ভাবনাতেই থাকবেন। অতএব ভীষ্ম যা বলেন তাই করো—যতো ভীষ্মস্ততো দ্রোণো যদ্ভীষ্ম-সত্ত্বাহ তৎ কুরু।

আসলে দ্রোণ সেই প্রথম দিনটির কথা ভোলেননি। সেই যেদিন তিনি কুরুবাড়িতে এসে নিজের কষ্টক্লিন্ন জীবনকাহিনী ভীষ্মের কাছে বলে জীবনের প্রথম সমব্যথীর মুখ দেখেছিলেন, তাঁকে তিনি জীবনেও ভোলেননি। মহাভারতের কোথাও স্পষ্টত উচ্চারিত না হলেও বুঝতে পারি—হয়তো ভীষ্মের দাক্ষিণ্য এবং তাঁরই বুদ্ধি-ব্যবহারে দ্রোণাচার্য কুরুসভার অন্যতম মন্ত্রণাদাতা নিযুক্ত হয়েছিলেন। হয়তো বা তাঁরই সবিনয় অনুরোধে দ্রোণ অর্ধেক পঞ্চালের রাজত্বমোহ ত্যাগ করে কুরুবাড়িতেই থেকে গেছেন সারা জীবন। আজকে দ্রোণের কথা থেকে আরও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কুরুবাড়ির অর্বাচীন শাসকদের অভীষ্ট পূরণ করে তাঁর নিজের ভবিষ্যতের জীবিকার পথ প্রশস্ত করার জন্য অন্যায়ভাবে তাঁদের অনুকূল কথা তিনি বলবেন না। রাজবাড়ির কুলবৃদ্ধ পিতামহ হিসেবে ভীষ্ম যে অর্থবৃত্তি লাভ করেন, তা থেকেই তাঁর জীবিকা চলে। সেটা যত সামান্যই হোক, তবু তার মধ্যে সমব্যথা এবং সম্মান আছে বলেই তিনি ভীষ্মের পথেই চলবেন, অন্য কারও নয়।

দ্রোণাচার্য দুর্যোধনের কাছে এটাও উল্লেখ করতে ভোলেননি যে, কৌরব-পাণ্ডবদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ভীষ্মের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা আছে। তিনি যেমন দু-পক্ষের এক পিতামহ, দ্রোণও তেমনই দুই পক্ষের একই আচার্য, কাজেই সম্বন্ধটা সমান—সমমাচার্য্যকং তাত তব তেষাঞ্চ মে সদা। এইসমস্ত সমতার কথা বলেও পাণ্ডব অর্জুনের প্রতি তাঁর একান্ত পক্ষপাতের কথাও প্রকারান্তরে উল্লেখ করতে ভোলেননি দ্রোণ। অর্জুনের সঙ্গে যে তাঁর আত্মার সম্বন্ধ আছে সেই স্নেহাতিশয্য প্রকট করতে তাঁর দ্বিধা হল না একটুও। দ্রোণ বললেন—আমার অশ্বত্থামা আমার কাছে যেমন, আমার অর্জুনও আমার কাছে তেমনই—অশ্বত্থামা যথা মহ্যং তথা শ্বেতহয়ো মম। যে কুরুবাড়ির তিনি মন্ত্রী, যে বাড়িতে তিনি এতকাল আছেন, সেইখানে দাঁড়িয়ে তিনি স্পষ্ট করে বলতে পারেন না যে, কুরুদের জয় তিনি চান না, কিন্তু ধর্ম এবং ন্যায়চারিতার অভিধায় তিনি যা বলতে চাইলেন, তার মানে দাঁড়ায়—পাণ্ডবদেরই জয় হবে। তিনি বললেন—বেশি বকবক করে লাভ নেই—ধর্ম যেখানে জয়ও সেখানে—বহুনা কিং প্রলাপেন যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।

দ্রোণাচার্যের কাছে এ অতি অদ্ভুত এক দ্বৈরথ। তিনি কুরুবাড়ির অন্ন গ্রহণ করেন অথচ এই বাড়ির আধুনিক শাসকদের কাজকর্ম, ব্যবহার তিনি একেবারেই পছন্দ করতে পারছেন না। তিনি মুখে যতই বলুন—আমি ভীষ্মের খাই-পরি, তোদের নয়, কিন্তু মনে মনে তিনি জানেন—রাজপিতামহ হিসেবে স্বয়ং ভীষ্মও বৃত্তিভোগীই বটে, ভীষ্ম রাজা নন। তাঁর ভরণপোষণ, ইচ্ছাপূরণ কুরুবাড়ির মূল রাজকোষ থেকেই। অতএব কোনও সময় ভীষ্মও

যেমন বলতে পারেন না যে, তিনি স্বাধীনজীবিক, তেমনই দ্রোণও বলতে পারেন না যে, কুরুবাড়ির অন্নের সঙ্গে তাঁর কোনও সংস্পর্শ নেই। আর ঠিক এই কারণেই দুর্যোধনকে তিনি যতই তিরস্কার করুন, তিনি দুর্যোধনের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করবেন না—একথা তাঁর পক্ষে বলা সম্ভবই নয়। যেমন সেটা বলা সম্ভব ছিল না ভীষ্মের পক্ষেও।

সত্যি কথা বলতে কী, দুর্যোধনও বোধহয় দুই বৃদ্ধের ওই দুর্বলতার কথা ভালভাবেই জানতেন। এবং জানতেন কৃষ্ণও। কৃষ্ণের দৌত্যকালে দ্রোণ-ভীষ্ম অনেক তিরস্কার-ভর্ৎসনা করেছেন দুর্যোধনকে। কিন্তু তাঁরা যেহেতু একবারও দুর্যোধনকে এই হুমকি দেননি যে,—আমাদের কথা না শুনলে আমরা কিন্তু তোমার পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করতে পারব না—তাতে একদিকে যেমন দুর্যোধন মনে মনে খুশি হয়েছেন, তেমনই অন্যদিকে দৌত্যকর্মে নিযুক্ত কৃষ্ণ এতে অসুখী হয়েছেন। কৃষ্ণ খুব চেয়েছিলেন যে, কুরুসভার এই দুই 'ভেটারান্' একবার মুখ দিয়ে উচ্চারণ করুন যে, তাঁরা দুর্যোধনের কারণে যুদ্ধ করবেন না, তাতে দুর্যোধনকে দুবার ভাবতে হত অন্তত। দ্রোণ কিংবা ভীষ্ম—শুধু ব্যক্তিমাত্র নন, এঁদের যে কোনও একজনের হুমকির মূল্য অনেক। ভেবে দেখুন—দুর্যোধনের পক্ষে যাঁরা সেনাপতি নিযুক্ত হয়েছেন পরবর্তীকালে, তাঁদের অর্ধেকের বেশি জনকে দুর্যোধন ব্যবহারই করতে পারতেন না, যদি এঁদের যে কোনও একজন সরে দাঁড়াতেন দুর্যোধনের পাশ থেকে। ভীষ্ম যদি সরে দাঁড়াতেন, তা হলে দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা—এঁরা কেউ যেমন যুদ্ধ করতেন না কৌরবপক্ষে, তেমনই দ্রোণ রুখে দাঁড়ালেও কৃপ, অশ্বত্থামা সরে থাকতেন। হয়তো ভীষ্ম নয়, কেননা কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করার আরও যুক্তি আছে তাঁর সপক্ষে।

দুর্যোধনের প্রতি শত তিরস্কার নিক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও দ্রোণ-ভীষ্মের দিক থেকে ওই শেষ হুমকিটি অনুক্ত থাকায় কৃষ্ণ বেশ ক্ষুন্ন হয়েছিলেন। পাণ্ডবদের সামনে তিনি বলেও ফেলেছিলেন—আরে দুর দুর! এক বিদুর ছাড়া দ্রোণ-ভীষ্ম সকলেই ওই দুর্যোধনের পেছন পেছন চলছেন—সর্বে তমনুবর্তন্তে ঋতে বিদুরমচ্যুত। কৃষ্ণ বললেন—কই দ্রোণ-ভীষ্ম কেউ তো আসল কথাটা বললেন না। একবারও তো বললেন না—আমরা তোমার পক্ষে যুদ্ধ করব না—ন চ ভীষ্মো ন চ দ্রোণো যুক্তং তত্রাহতু র্বচঃ। তাই বলছিলাম—আসল জায়গায় ওঁরা সবাই আছেন দুর্যোধনের পেছনে।

দ্রোণাচার্যের মনের কথা অথবা তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত বোধ কী করে বুঝবেন কৃষ্ণ। যে মানুষটিকে যৌবনাধিক বয়স পর্যন্ত পুত্র পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ভাবনা নিয়ে দিন কাটাতে হয়েছে এবং কুরুবাড়ির আশ্রয় লাভ করে যিনি অর্থ, প্রতিপত্তি এবং সম্মানের নিশ্চিন্ত আস্বাদ লাভ করেছেন, তাঁর ভাবনা এবং কৃষ্ণের ভাবনা নিশ্চয়ই এক হবে না। তা ছাড়া এও সেই প্রাচীন মূল্যবোধ, বয়সের ব্যবধানে ব্যবহিত ব্যক্তির কাছে যা আপাতত একেবারেই মূল্যহীন। কৃতজ্ঞতা এবং কৃতজ্ঞতাই হল এমনই এক মূল্যবোধ, যা এক একজন মানুষকে শুধু পূর্বকৃত উপকারের স্মরণ, মনন এবং অনুধ্যানের নাগপাশে বেঁধে রাখে। দ্রোণের মতো মানুষ, যিনি কুরুদের অন্নে প্রতিপালিত, কুরুদের প্রাথমিক সহায়তায় যাঁর ধন, মান, যশ এবং বেঁচে থাকা, তিনি কী করে, কোন মূল্যবোধে বলতে পারেন—না দুর্যোধন! আমি তোমার পক্ষে যুদ্ধ করব না। পরান্নপ্রতিপালিতের এই আন্তর মূল্যবোধ স্বাধীন কৃষ্ণের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, তিনি বোঝেনওনি।

আবার এই মূল্যবোধেরই আরও এক বিচিত্র দংশন দ্রোণাচার্যকে অন্যদিকে কুরে কুরে খাচ্ছে। শুধুমাত্র পরাশ্রয়ী হওয়ার ঋণ মেটাতে গিয়ে তিনি এক অহংকারী, অসূয়াপরায়ণ, পররাজ্যগ্রাসী ব্যক্তির পক্ষে যুদ্ধ করতে বাধ্য হচ্ছেন। দ্রোণাচার্য এই বাধ্যতার প্রায়শ্চিত্ত করেছেন অন্যভাবে এবং সেটাও কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মের একাত্মতায়। যুদ্ধ যখন নিশ্চিত হয়ে গেল, তখন সকালবেলায় উঠেই এই দুই বৃদ্ধের প্রত্যেক দিনের নিত্যকর্ম ছিল পাণ্ডবদের জয়

কামনা করা। হয়তো বোঝাতে চাইতেন যে, কর্তব্যের অনুরোধে প্রতিপক্ষের হয়ে 'মেকানিক্যালি' একটা যুদ্ধ করলেও দ্রোণ-ভীষ্মের অন্তর পড়ে আছে পাণ্ডবদের দিকেই।

কথাটা ভীষ্ম তেমন পরিষ্কার করে না বললেও নিজের এই মানসিক দ্বৈরথ এবং যন্ত্রণা সম্পূর্ণ প্রকট করে দিতে দ্রোণাচার্যের বাধেনি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ তখন আরম্ভ হয়ে গেছে। ভীষ্মের সেনাপতিত্বে কৌরববাহিনী পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত। এই সময় যুধিষ্ঠির গুরুজনের আশীর্বাদ গ্রহণ করার জন্য উপস্থিত হলেন ভীষ্মের কাছে এবং আচার্য দ্রোণের কাছে। আচার্যের মানসিক অবস্থা তখন বলবার নয়। তাঁকে দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করতে হচ্ছে, অথচ যুধিষ্ঠিরের পক্ষ তাঁর অভিপ্রেত। যুধিষ্ঠির যখন ভাইদের সঙ্গে এসে আচার্য দ্রোণকে প্রণাম করে যুদ্ধ করার জন্য তাঁর অনুমতি ভিক্ষা করলেন, দ্রোণ তখন একটু অভিমান করেই বললেন—তুমি এসেছ, ভাল হয়েছে। নইলে অভিশাপ দিতাম তোমাকে—শপেয়ং ত্বাং মহারাজ। এখন আমি সানন্দে অনুমতি দিচ্ছি, তুমি যুদ্ধ করো এবং জয়লাভ করো।

এই কয়েক মুহূর্ত পরে যাঁদের সঙ্গে তিনি প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবেন, তাঁদের তিনি বললেন—বলো কী চাও আমার কাছে—ব্রুহি ত্বমভিকাঙ্ক্ষিতম্। বুঝতেই পারছ, আমাকে এইভাবেই যুদ্ধ করতে হবে, অতএব এই যুদ্ধে বিরত হওয়ার অনুরোধ ছাড়া আর যা চাও তুমি বলো—এবং গতে মহারাজ যুদ্ধাদন্যৎ কিমিচ্ছসি। দ্রোণকে এইসব মুহূর্তেই বড় অসহায় লাগে। অন্নঋণ পরিশোধের যুক্তি মাথায় নিয়ে তিনি সমস্ত কালের সমস্ত মানুষের জীবিকার্জনের অসহায়তার কথাটি উল্লেখ করেছেন। দ্রোণ বলেছেন—মানুষ অর্থের দাস, কিন্তু অর্থ কারও দাস নয়। আমার কাছে এই ভয়ংকর সত্যটা এতটাই প্রযোজ্য যে, ওই অর্থের দায়েই আমি কৌরবদের কাছে আবদ্ধ আছি—বদ্ধো'স্মি অর্থেন কৌরবৈঃ। তবে জেনে রেখো—কৌরবদের হয়ে যুদ্ধ করলেও আমি সব সময় তোমাদেরই জয় আকাঙ্ক্ষা করি—যোৎস্যে'হং কৌরবস্যার্থে তবাশাস্যো জয়ো ময়া।

অন্যায় কর্মকারী হওয়া সত্ত্বেও সেই দুর্যোধনের পক্ষেই যুদ্ধ করার মধ্যে দ্রোণের যে নিরুপায় অসহায়তা আছে, দ্রোণ নিজেই তার নাম দিয়েছেন ক্লীবত্ব—ব্রবীম্যেতৎ ক্লীববত্ ত্বাম—যে ক্লীবত্ব কাটিয়ে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিলে তিনি পরান্ন-ঋণের দায়ে দায়ী হয়ে থাকবেন চিরকাল। এই দায়টুকু বাদ দিয়ে শুধু যুদ্ধ জয়ের আশীর্বাদ করেই দ্রোণ ক্ষান্ত হননি, যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি তাঁর মৃত্যুর উপায়ও বলে দিয়েছেন। এই উপায় বলার সময় যোদ্ধা হিসেবে তাঁর আত্মসচেতনতা দেখলে আশ্চর্য হতে হবে। দ্রোণ বৃদ্ধ হয়েছেন বটে, কিন্তু চিরকালীন অস্ত্রপরিশীলন তাঁকে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত করেছিল যে, স্বয়ং ভীষ্ম পর্যন্ত বলেছিলেন—অনেকগুলি যুবকের সম্মিলিত অস্ত্রক্ষমতার চাইতেও দ্রোণের শক্তি অনেক বেশি—বৃদ্ধো'পি যুবভির্বরঃ।

দ্রোণ নিজের এই ক্ষমতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। অতএব যুধিষ্ঠির যখন জিজ্ঞাসা করলেন যে, কীভাবে তাঁকে জয় করা সম্ভব হবে, তখন দ্রোণ পরিষ্কার বলে দিলেন—আমার হাতে যতক্ষণ অস্ত্র আছে, বাপু, ততক্ষণ আমাকে মারা সম্ভব হবে না—ন তে'স্তি বিজয়স্তাবদ্ যাবদ্ যুধ্যাম্যহং রণে। এমন শত্রুও এখনও জন্মায়নি, বাপু! যে রথে দাঁড়িয়ে থাকতেও আমাকে হত্যা করবে। তবে হ্যাঁ, আমি যদি অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করি এবং অচেতন হয়ে যাই, তবেই আমাকে মারা যাবে। আর আমি অস্ত্র ত্যাগ করব তখনই, যখন কোনও ভয়ংকর দুঃসংবাদ শুনব। যার কথা বিশ্বাস করা যায় এমন মানুষ যদি আমাকে কোনও দুঃসংবাদ দেন, তবে নিশ্চয়ই আমি অস্ত্র ত্যাগ করব এবং আমাকে মারাও যাবে তখনই—শস্ত্রং চাহং রণে জহ্যাং শ্রুত্ব তু মহদপ্রিয়ম্।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যখন আরম্ভ হয়েছে, দ্রোণের বয়স তখন পঁচাশি। আজকের দিনে এই বয়সে যুদ্ধের কথা শুনে হাসি পেতে পারে, কিন্তু মহাভারতের যুগে অনেকেরই আয়ুর পরিমাণ অনেক বেশি দেখছি, কাজেই হয়তো যুদ্ধ করার ক্ষমতাও অনেক বেশি দিন থাকত। বিশেষত দ্রোণের যুদ্ধক্ষমতা যেহেতু অনেকটাই অভিজ্ঞতানির্ভর, তাই মহাভারতীয় আয়ুষ্কালের নিরিখে তাঁর যুদ্ধ করাটা মোটেই আশ্চর্যের নয়। ভীষ্মের সেনাপতিত্বকালে দ্রোণ যথেষ্ট যুদ্ধ করেছেন বটে, তবে তাঁর অস্ত্রক্ষমতা এবং অভিজ্ঞতা প্রদর্শনের সময় এল তিনি নিজে সেনাপতি নিযুক্ত হওয়ার পর।

লক্ষণীয় ঘটনা হল, যেদিন থেকে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে, সেদিন থেকেই দুর্যোধন ভীষ্ম-দ্রোণের মতো সর্বস্বীকৃত ব্যক্তিত্বদের যথেষ্ট সম্মান দিয়েই চলছিলেন। যুদ্ধের উদ্যোগকালেই দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে এক অক্ষৌহিণী সেনার নায়কত্বে নিযুক্ত করেছিলেন এবং দ্রোণও সে ভার বহন করছিলেন সানন্দে এবং দুর্যোধনের প্রীতি-ব্যবহারে খানিকটা অভিভূত হয়েই। দশদিন ভয়ংকর যুদ্ধ করে ভারত যুদ্ধের প্রথম সেনাপতি ভীষ্ম যখন শরশয্যা গ্রহণ করলেন, দুর্যোধন তখন বড় সমস্যায় পড়লেন। তাঁর পক্ষাশিত সম্মিলিত সেনার অধিপতিত্ব কাকে দেওয়া যায়, এই নিয়ে দুর্যোধনের মনে অনেক দুর্ভাবনা ছিল। এই সমস্যা নিয়ে যাঁর সঙ্গে তাঁর বিস্তারিত আলোচনা হয়, তিনি হলেন কর্ণ। সেই কর্ণ যিনি চিরকাল দ্রোণাচার্যকে বিদ্বেষ করে এসেছেন, সেই কর্ণ যিনি চিরকাল কুরুদের অন্নভোজী দ্রোণাচার্যকে কৃতঘ্নতার দায়ে অভিযুক্ত করেছেন।

আসলে বিপদ এবং বাস্তব পরিস্থিতি মানুষকে অনেক শিক্ষা দেয়। রাজনীতিতে যে নেতা বিরোধী পক্ষে দাঁড়িয়ে সরকারের আদ্যশ্রাদ্ধ করেন তিনিই সরকারি মন্ত্রী হলে কেমন নিশ্চুপ হয়ে যান। এখানেও সেইরকমই ঘটেছে। যে কর্ণ দ্রোণাচার্যের বিরোধিতায় সর্বদা মুখর ছিলেন, তিনিই আজ ভীষ্মকে শরশয্যা গ্রহণ করতে দেখে প্রখর বাস্তববোধে অন্য কথা বলছেন। কাকে সেনাপতি করা যায়—দুর্যোধনের এই সমস্যার মধ্যে কর্ণকেই সেনাপতি করার ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু কর্ণ বললেন—এখানে সেনাপতি হবার মতো গুণ অনেকেরই আছে। সমস্যা হল—সবাইকে তো আর একসঙ্গে সেনাপতি করতে পারবে না এবং সেনাপতি হবেন তিনিই যাঁর মধ্যে বিশেষ গুণ আছে—এক এব তু কর্তব্যো যস্মিন্ বৈশেষিকাঃ গুণা। কিন্তু সেই একজনকে সেনাপতি করলে সমগুণসম্পন্ন অন্যজন ব্যথিত হবেন এবং তিনি তোমার ভাল করবেন না মোটেই। অতএব সমাধান হল—এখানে সমস্ত বড় বড় যোদ্ধাদের আচার্যস্থানীয় দ্রোণ আছেন। সেনাপতি করো তাঁকেই। তাঁর অভিজ্ঞতা বয়স কোনওটাই কম নয়—স এব সর্বযোধানামাচার্য্যঃ স্থবিরো গুরুঃ। শুক্রাচার্য এবং বৃহস্পতির মতো তাঁর রাজনীতির জ্ঞান। অপিচ দ্রোণ যদি সেনাপতির কাজ করেন, তবে দুনিয়ায় এমন যোদ্ধা নেই, যে নাকি তাঁর অনুগামী না হবে—দ্রোণং যঃ সমরে যান্তং নানুযাস্যতি সংযুগে।

আজ এই পরম বিপন্নতার সময় একজন চিরন্তন দ্রোণবিরোধীর মুখে দ্রোণের যে মর্যাদার কথা শোনা গেল সেটা সত্য না হয়ে পারে না। কর্ণের কথা দুর্যোধনের পছন্দ হয়েছে এবং কৌরববাহিনীর সেনাপতিত্ব গ্রহণ করার জন্য তিনি দ্রোণকে সবিনয়ে অনুরোধ করেছেন। সেই মুহূর্তে তাঁর নিয়োগের কারণ হিসেবে দুর্যোধন দ্রোণের যে গুণগুলির কথা উল্লেখ করেছেন, তাতে বোঝা যায় যে, ভীষ্মের পতনের পর কৌরবদের মধ্যে এমন অধিগুণসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন না, যিনি দ্রোণের সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

দুর্যোধনের সেনাপতি-বরণ মেনে নিলেন দ্রোণ। তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন যে, তাঁর সেনাপতিত্বের কালটুকু পাণ্ডবদের পক্ষে সুখকর হবে না মোটেই। দ্রোণ যুদ্ধ করবেন, যুদ্ধে পাণ্ডবসৈন্য ধ্বংস করবেন—এসব ব্যাপারে অনেক কথা দিলেন। কিন্তু একেবারে শেষে

দৃঢ়ভাবে দুর্যোধনকে জানালেন যে, তিনি কোনও ভাবেই দ্রুপদের পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করবেন না। কারণ দ্রোণবধের জন্যই ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম। বেশ বুঝতে পারি, আচার্যের মনে সেই 'গিল্টি কনশিয়েনস' কাজ করে—একদিন তিনি দ্রুপদকে বেঁধে এনে তাঁর রাজ্যার্ধ কেড়ে নিয়েছিলেন। এই ঘটনায় দ্রুপদ যে কত অপমানিত, কত ক্ষুন্ন হয়েছিলেন—দ্রোণ তা অনুভব করেন। আজ এই বৃদ্ধ বয়সে হয়তো তিনি তাঁর পূর্বকৃত হঠকারিতার প্রায়শ্চিত্ত করতে চান। যেদিন থেকে তিনি শুনেছেন যে, দ্রুপদ তাঁরই বধের জন্য যজ্ঞাগ্নি থেকে লাভ করেছেন ধৃষ্টদ্যুম্নকে, সেদিন থেকেই পরম আদরে তিনি বরণ করেছেন এই নিয়তিকে। ধৃষ্টদ্যুম্ন শত্রুর পুত্র হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে অস্ত্রশিক্ষা দিতেও দ্বিধা করেননি দ্রোণ। আর আজ তিনি সেই নিয়তির পথ প্রশস্ত করে রাখলেন দুর্যোধনের কাছে—কুমার ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিনি বধ করবেন না।

দুর্যোধন দ্রোণের শেষ কথাটা শুনেছেন না শোনার মতো করে। দ্রোণাচার্য তাঁর সেনাপতিত্বের উপযোগ আরম্ভ করলেন যুদ্ধের একাদশ দিবস থেকে। দ্রোণাচার্য তাঁর বিশাল অভিজ্ঞতায় এটা ভালভাবেই জানতেন যে, শুধু অস্ত্র প্রয়োগ করে যুদ্ধ জেতা যায় না। যুদ্ধ জেতার জন্য সেনা সাজানোর কৌশলটাও অত্যন্ত জরুরি। সেনা সাজানোর কৌশলকে প্রাচীন রাজনীতির ভাষায় বলে ব্যূহ। রাজনীতির অনেক বিষয়েই দ্রোণ অভিজ্ঞ ছিলেন এবং সেই অভিজ্ঞতা এতটাই যে, প্রবীণ এবং প্রাচীন রাজনীতিক হিসেবে যে একজন ভারদ্বাজের কথা উল্লেখ করেছেন কৌটিল্য, তাঁকে আমাদের দ্রোণ বলেই মনে হয় এবং পণ্ডিতরাও তাই বলেছেন। যুদ্ধের সময় শুধু সেনা-সংস্থানের এদিক ওদিক করে বিচিত্র ব্যূহ রচনার মাধ্যমে দ্রোণাচার্য যে পাণ্ডবদের কত বিপদে ফেলেছেন, তা বলে বোঝানো যাবে না। এক্ষেত্রে অবশ্য দ্রোণের ব্যূহরচনা শক্তির যেমন প্রশংসা করতে হবে, তেমনই একই সঙ্গে বলতে হবে যে, এই ব্যূহরচনার বাহ্য আড়ম্বর অনেকটাই দুর্যোধনকে ফাঁকি দেবার জন্য। বিচিত্র ব্যূহ রচনা করে দ্রোণাচার্য পাণ্ডবদের সৈন্য শাতনের ব্যবস্থা করেছেন বটে, কিন্তু পাণ্ডবদের ব্যক্তিগত ক্ষতি করার যে ব্যক্তিগত উদ্যোগটুকু দ্রোণাচার্য নিতে পারতেন, ব্যূহরচনার আড়ম্বরে সেই উদ্যোগটুকুই গেছে হারিয়ে এবং সেটাই দ্রোণাচার্যের ঈপ্সিত ছিল।

যেমন দুর্যোধন খুব করে আচার্যকে ধরেছিলেন, যাতে তিনি যুধিষ্ঠিরকে জীবন্ত নিয়ে আসেন দুর্যোধনের কাছে। তবে তাঁর এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে 'কু' ছিল, সরলমতি আচার্য তা ধরতে পারেননি। আসলে কৌরববাহিনীর সেনাপতিত্ব লাভ করে আচার্য প্রথমে বেশ খুশিই হয়েছিলেন। এতকাল কুরু রাজ্যে আশ্রিত, ওদিকে অর্বাচীন কৌরবরা মনে মনে খুব যে তাঁকে মানেন, তাও তিনি মনে করেন না। এমন অবস্থায় চিরবিরোধী কর্ণের প্রস্তাবমতো দুর্যোধন তাঁকে সেনাপতিত্বে বরণ করায় দ্রোণাচার্য বেশ খুশি এবং গর্বিতও হয়ে পড়েছিলেন। দুর্যোধনকে তিনি বলেও ফেলেছিলেন যে—সেনাপতিত্বের ভার দিয়ে তুমি যথেষ্টই সম্মান দেখিয়েছ আমাকে—সৈনাপত্যেন মাং রাজন্ অদ্য সৎকৃতবানসি। অতএব বলো তুমি, কী বর চাও। দুর্যোধন গদ্গদ হয়ে বলেছিলেন—যদি বরই দিতে চান, আচার্য! তা হলে যুধিষ্ঠিরকে আপনি জীবন্ত ধরে এনে দিন আমার কাছে—জীবগ্রাহং যুধিষ্ঠিরম্... মৎসমীপমিহানয়।

দ্রোণ যুগপৎ আশ্চর্য হলেন এবং খুশিও হলেন। ভাবলেন—দুর্যোধনের সুমতি হয়েছে, তিনি যুধিষ্ঠিরকে বধ করতে চান না এবং তাঁকে জীবন্ত ধরে আনার পেছনে দুর্যোধনের কোনও সদুদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে। সরলমতি আচার্য শেষ পর্যন্ত খুশি হয়ে যুধিষ্ঠিরেরই প্রশংসা করতে লাগলেন। বললেন—আহা! কীরকম মানুষ তিনি! দুর্যোধন তাঁর বধাকাঙ্ক্ষা করেন না, শুধু ধরে আনতে চান—ধন্যঃ কুন্তীসুতো রাজা যস্য গ্রহণমিচ্ছসি। আচার্য দুর্যোধনের এই ইচ্ছার মধ্যে অনেক মহৎপ্রাণতার আভাস পেলেন। বললেন—তুমি তাঁকে এইভাবে ধরে নিয়ে এসে রাজ্য ফিরিয়ে দিতে চাইছ বুঝি। বুঝি ভাইতে ভাইতে ঝগড়া

মিটিয়ে নিয়ে তাঁকে রাজ্য ফিরিয়ে দিতে চাইছ—রাজ্যং সম্প্রতি দত্ত্বা তু সৌভ্রাত্রং কর্তুমিচ্ছসি?

দুর্যোধনের স্বরূপ বেরিয়ে পড়ল এক মুহূর্তের মধ্যে। তিনি জানালেন—যুধিষ্ঠিরকে জীবন্ত ধরে এনে তিনি আবারও তাঁর সঙ্গে পাশা খেলে তাঁকে বনে পাঠাতে চান। দ্রোণাচার্য দুর্যোধনের মনের কথা শুনে একেবারে ফাঁপরে পড়ে গেলেন। এদিকে তিনি দুর্যোধনকে বর দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অতএব কথা ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। দ্রোণ তাই বললেন-দেখো বাপু! যুধিষ্ঠিরকে ধরে আনা কোনও কঠিন কাজ নয়। তবে হ্যাঁ, অর্জুন যদি তাঁকে বাঁচিয়ে চলতে থাকেন ক্রমাগত, তবে আমি কেন, স্বর্গের দেবতারা নেমে এলেও যুধিষ্ঠিরকে তোমার কাছে এনে দিতে পারবেন না—গ্রহীতুং সমরে রাজন্ সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ। তবে হ্যাঁ, তোমরা একটা কাজ করো। তোমরা যুদ্ধক্ষেত্রের অন্যত্র অস্ত্রশস্ত্রের তীব্রতা বাড়িয়ে প্রভূত সৈন্য ধ্বংস করে অর্জুনকে সেই দিকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করো এবং সে যদি যুধিষ্ঠিরকে ছেড়ে একবার চলে যায়, তবেই জেনে রাখো যুধিষ্ঠির তোমার হাতে এসে গেছেন—অপনীতে ততঃ পার্থে ধর্মরাজো জিতস্ত্বয়া। কিন্তু জেনে রেখো অর্জুন যুধিষ্ঠিররের পাশে থাকলে এসব কিছুই সম্ভব হবে না।

দ্রোণ যেহেতু দুর্যোধনকে বর দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তাই সরলভাবে তাঁর সুবিধে অসুবিধে সবই তিনি দুর্যোধনকে জানিয়েছেন। কিন্তু কুটিল দুর্যোধন যে তাঁকে সর্বাংশে বিশ্বাস করেছেন, তা নয়। দ্রোণ যাতে কথা রাখেন, তার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাদের মধ্যে দ্রোণের কথা রটিয়ে দিলেন যে, আজ যুধিষ্ঠিরকে ধরা হবে। নির্বোধ সৈন্যরা নতুন উত্তেজনা পেয়ে হা-রে-রে-রে করে ছুটল বটে, কিন্তু গুপ্তচরদের মারফত দ্রোণের আলোচনার সমস্তটাই যুধিষ্ঠিরের কানে চলে এল। আচার্যও দুর্যোধনের এই প্রচারে অখুশি হননি, কেননা পাণ্ডবরা এ ব্যাপারে সচেতন হয়ে যান—এটাই তিনি চান।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্রোণের প্রতিজ্ঞা শুনে প্রমাদ গণেছেন এবং সভয়ে অর্জুনকে বলেছেন—তা হলে এখন কী হবে? অর্জুন আশ্বস্ত করেছেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে। বলেছেন—আচার্যকে আমি কখনও বধ করব না, এটা যেমন সত্য, তেমনই তোমাকেও একা ফেলে যাব না—এটাও তেমনই সত্য। আমি কোনওদিন আচার্যের বিরুদ্ধাচরণ করিনি, কিন্তু তাই বলে তিনি যদি দেবতাদের নিয়েও যুদ্ধে আসেন, তবু জেনো, তিনি তোমাকে নিয়ে যেতে পারবেন না—এও আমার প্রতিজ্ঞা।

সেদিনকার যুদ্ধে সত্যিই অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে আগলে আগলে রাখলেন এবং দ্রোণের ক্ষমতা হল না যুধিষ্ঠিরকে ধরার। দ্রোণ একটু লজ্জাই পেলেন এবং দুর্যোধনের সামনে সাফাই গেয়ে বললেন—আগেই বলেছিলাম বাপু!—উক্তমেতন্ময়া পূর্বং—অর্জুন থাকলে পারব না যুধিষ্ঠিরকে ধরতে। তা তোমরা কাউকে দিয়ে অর্জুনকে একটু অন্যদিকে নেবার চেষ্টা করো—কশ্চিদাহূয় তং সংখ্যে দেশমন্যং প্রকর্ষতু—তা হলেই তো যুধিষ্ঠিরকে ধরে আনতে পারি আমি। দ্রোণের কথার পরের দিন ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা তাঁর তীব্র যুদ্ধের ব্যপদেশে অর্জুনকে যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। অর্জুন পাঞ্চাল রাজকুমার সত্যজিৎ এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের ওপর যুধিষ্ঠিরকে রক্ষার ভার দিয়ে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়েই অন্যত্র গেলেন যুদ্ধ করতে।

স্বাভীষ্ট প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য দ্রোণ এগিয়ে এলেন যুধিষ্ঠিরের দিকে। পাঞ্চাল সত্যজিৎ সেদিন প্রাণ দিয়েছিলেন দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধে। পাণ্ডব পক্ষের বড় বড় যোদ্ধা, এমনকী ধৃষ্টদ্যুম্ন পর্যন্ত সেদিন দ্রোণকে আটকাতে পারেননি। কিন্তু শেষমেষ দ্রোণ যখন সকল প্রতিরোধ করে যুধিষ্ঠিরকে ধরতে যাবেন, তখন যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয়ের ধর্ম মাথায় রেখে একটি

শীঘ্রগতি অশ্বের সহায়তায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে বেঁচেছিলেন। যুদ্ধ চলল যুদ্ধক্ষেত্রের রীতি অনুযায়ী। ভয়ংকর সে যুদ্ধ, তাতে দ্রোণ এবং তাঁর স্বপক্ষের অন্য যোদ্ধাদেরও কৌশল কিছু কম ব্যক্ত হল না, অন্যদিকে পাণ্ডব অর্জুন যেভাবে সংশপ্তক বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে চলেছিলেন, তাঁরও সুনাম কিছু কম প্রকট হল না। যুদ্ধের সম্বন্ধে সাধারণ যে অভিব্যক্তি ছিল, তা হল—ইদং ঘোরম্, ইদং চিত্রম্, ইদং রৌদ্রম্ ইতি প্রভো।

কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে এখনও ধরা হল না। কেন, সেদিন কি আচার্য পারতেন না তাঁকে ধরতে। রথ ছেড়ে শীঘ্রগামী অশ্বের পিঠে চড়বার মধ্যে যে অবকাশ ছিল, তার মধ্যে আচার্য দ্রোণের মতো কুশলী যোদ্ধা কি পারতেন না যুধিষ্ঠিরকে ধরতে! হয়তো পারতেন। কিন্তু তিনি নিজের প্রতিজ্ঞা পূরণের স্বার্থেও তাঁকে ধরে ফেলেননি। তাঁর এই ব্যবহারের পিছনে যে দুর্বলতাটুকু আছে, তা ধরে ফেলতে দুর্যোধনের দেরি হয়নি। পরের দিন সকালে যখন কৌরবসৈন্যদের মধ্যেও অর্জুনের প্রশংসা চলছিল, তখন দুর্যোধন আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি অন্যান্য কৌরবযোদ্ধা এবং সৈন্যদের সামনেই দ্রোণাচার্যকে বললেন—আপনি যাঁদের বধ করবেন বলে ঠিক করেছেন, আমরা সেই বধ্যদের দলেই পড়ি। নইলে আপনি যুধিষ্ঠিরকে হাতের মুঠোয় পেয়েও ছেড়ে দিয়েছেন? আমি এটা বিশ্বাস করতে পারব না যে, আপনি যে শত্রুকে ধরতে চাইছেন, সে আপনার চোখের সামনে এসেছে অথচ আপনার অস্ত্রের ফাঁস ফসকে বেরিয়ে গেল—এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না—ইচ্ছতস্তে ন মুচ্যেত চক্ষুঃপ্রাপ্তো রণে রিপুঃ।

দুর্যোধন সাভিমানে বললেন—আপনি আমাকে আগে বর দান করে পরে নিজেই সেটা উলটে দিচ্ছেন। আপনার একান্ত অনুগত ভক্তের আশাভঙ্গ করাটা কি আপনার মতো আর্যপুরুষের শোভা পায়? দ্রোণ কী করেছেন দ্রোণই জানেন। তবুও অজুহাত হিসেবে সেই অর্জুনের কথাই আবারও তুললেন আচার্য। বললেন—যা ঘটেছে, তা থেকেই শুধু আমার বিচার কোরো না, দুর্যোধন! কী বলব, সত্যিই তো অর্জুন আর কৃষ্ণ যাঁকে রক্ষা করছেন তাঁকে ধরা কি মানুষের সাধ্য—বিশ্বসৃগ্ যত্র গোবিন্দঃ পৃতনানীস্তথার্জুনঃ।

বেশ 'ফিলসফারের'র মতো কথা। আকাশে উড়িয়ে দিলেই হল। দুর্যোধন মিথ্যা অবিশ্বাস করেননি দ্রোণকে। তিনি সত্যিই ধরতে পারতেন যুধিষ্ঠিরকে। অর্জুন বা কৃষ্ণ তখন ধারেকাছে ছিলেন না। কিন্তু মনে মনে তিনি জানেন—যুধিষ্ঠিরকে ধরার গুরুত্ব কী অথবা পাণ্ডবদের বিপদ তাতে কোথায়? সারা জীবন পাণ্ডবদের পক্ষপাতী হয়ে থেকেও তাঁকে যুদ্ধ করছে হচ্ছে অন্যায়পরায়ণ দুর্যোধনের সপক্ষে। কেন ধরবেন তিনি যুধিষ্ঠিরকে, আবার কেন পাণ্ডব ভাইদের বনবাসে পাঠাবার নিমিত্ত হবেন তিনি। অতএব আবারও সেই একই কথা বললেন দ্রোণ—আজকে আমি পাণ্ডবপক্ষের এক মহারথ যোদ্ধাকে শেষ করে ছাড়ব—অদ্যৈষাং প্রবরং কঞ্চিৎ পাতয়িষ্যে মহারথম্। তোমরা আরও একবার কায়দা করে অর্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাও—অর্জুনস্তু অপনীয়তাম্।

দ্রোণাচার্যের কথায় দুর্যোধনের সংশপ্তক বাহিনী আবারও ভয়ংকর যুদ্ধ আরম্ভ করে অর্জুনকে ব্যস্ত করে তুললেন যুদ্ধক্ষেত্রের দক্ষিণ দিকে। এদিকে দ্রোণ চক্রব্যূহ রচনা করলেন, যে ব্যূহের বিভিন্ন স্থানে ভয়ংকর যোদ্ধারা সন্নিবিষ্ট হলেন চক্রের নেমির মতো—দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ ইত্যাদি মহাবীরেরা। ব্যূহের মুখে দাঁড়িয়ে তাঁরা পাণ্ডব পক্ষের প্রাণান্তক যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। দ্রোণের শররাশিতে পাণ্ডব পাঞ্চালদের সমস্ত সৈন্য বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছে এবং পাণ্ডবপক্ষের কোনও যোদ্ধা দ্রোণকে কিছুই করতে পারছেন না। ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম, সাত্যকি সকলে ব্যূহভেদ করা দূরে থাকুক, দ্রোণের সামনেই দাঁড়াতে পারছেন না—ন শেকুঃ প্রমুখে স্থাতুং ভারদ্বাজস্য পাণ্ডবাঃ।

চক্রব্যূহ এমনই এক কঠিন সৈন্যসজ্জা যার ভিতরে প্রবেশ করা সকলের সাধ্য নয়। পাণ্ডবপক্ষে অর্জুন, কৃষ্ণ, কৃষ্ণের ছেলে প্রদ্যুম্ন এবং অর্জুনের ছেলে সৌভদ্র অভিমন্যু যুদ্ধ করতে করতে এই ব্যূহে প্রবেশ করতে পারেন। প্রদ্যুম্নের প্রশ্নই আসে না, তিনি যুদ্ধে যোগ দেননি। কৃষ্ণার্জুন যুদ্ধক্ষেত্রের অন্যত্র ব্যস্ত। অতএব বাকি রইলেন অভিমন্যু। নিরুপায় যুধিষ্ঠির বালক কিশোর অভিমন্যুকেই অনুরোধ করলেন চক্রব্যূহ ভেঙে ঢুকতে। অভিমন্যু সোৎসাহে বললেন—আমার পিতৃস্থানীয়দের জয়াকাঙক্ষায় এই সেনাসমুদ্রে অবগাহন করব আমি। কিন্তু কোনও বিপদ হলে এই বৃহ থেকে বেরোনোর উপায় আমি জানি না। অভিমন্যুর কথা শুনে যুধিষ্ঠির এবং ভীম দুজনেই তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন—তুমি সেনাচক্র ভেঙে ব্যূহের দ্বার তৈরি করো, আমরা তোমার পিছনে পিছন ঢুকব—ভিন্ধ্যনীকং যুধাং শ্রেষ্ঠ দ্বারং সংজনয়স্ব নঃ।

যুধিষ্ঠির, ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি—সবারই সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। ধৃতরাষ্ট্রের জামাই শিবের বরে অতুল পরাক্রমী হয়ে উঠেছিলেন এই সময়। তিনি সমস্ত মহাবীরদের পথ আটকে দিলেন। অভিমন্যুকে সাহায্য করার শত চেষ্টা করেও কেউ সফল হলেন না জয়দ্রথের পরাক্রমে। অভিমন্যু মারা গেলেন সপ্তরথীর জালে পড়ে। এই সপ্তরথীর মধ্যে দ্রোণও একজন বটে এবং অভিমন্যুর সঙ্গে যে তিনি যুদ্ধও করেননি, তাও নয়। তবু দুর্যোধন দ্রোণকে সন্দেহ করে বলেছিলেন—আর যাই হোক অর্জুনের ছেলেকে তিনি মারবেন না। শিষ্যকে যেহেতু গুরুরা ছেলের মতো ভালবাসেন, অতএব শিষ্যের ছেলেকে তিনি কখনওই মারবেন না—অর্জুনস্য সুতং মূঢ়ো নায়ং হন্তুমিহেচ্ছতি।

কথাটা একদিকে সত্যি, অন্যদিকে সত্যি নয়। সত্যি এইজন্য যে, দুর্যোধনের এই মনোভাবের নিরিখে অভিমন্যুকে মারবার দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছিলেন অন্য সব মহারথীরা—কর্ণ, দুঃশাসন প্রভৃতিরা। দ্রোণকে সেখানে কমই অস্ত্রাঘাত করতে হয়েছে অভিমনুর শরীরে এবং তা হয়তো অর্জুনের কথা মনে রেখেই। আবার সত্যি নয় এইজন্য যে, সপ্তরথীর মধ্যে দ্রোণ প্রথম স্মরণীয় নাম এবং তিনি জানতেন যে, এই ব্যূহ ভেদ করে যে ঢুকবে, সে অর্জুন ছাড়া অন্য কেউ হলে তাঁর কপালে দুঃখ আছে। আরও একটা উদ্দেশ্য এখানে কাজ করেছে দ্রোণের মনে। দুর্যোধনের বারংবার উপরোধে তিনি তিক্তবিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। যুধিষ্ঠিরকে তিনি ধরবেন না অথবা পঞ্চ পাণ্ডবের একতমের মৃত্যুর দায়ও তিনি নেবেন না—এটা ঠিকই ছিল। কিন্তু দুর্যোধনকে তিনি যেহেতু কথা দিয়েছেন, অতএব পাণ্ডবদের এমন একটা ক্ষতি তিনি করে দিয়েছেন, যা তাঁদের কাছে আপন মৃত্যুর চেয়েও দুঃসহ।

দুর্যোধনের কাছে তিনি কথা রেখেছেন এইভাবেই। কিন্তু তাতেও দুর্যোধন খুশি হননি। অভিমন্যুর মৃত্যুতে ক্রোধান্বিত হয়ে অর্জুন যখন পরের দিন জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞা নিলেন, তখনও প্রায় অভেদ্য এক শকটব্যূহ তৈরি করে ব্যূহমুখেই দাঁড়িয়ে ছিলেন দ্রোণ। তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রমোক্ষণের আগে অর্জুন অনেক সম্মান করে তাঁকে বলেছিলেন—আমার প্রতি স্বস্তিবাচন করুন, আচার্য। আপনার আশীর্বাদ নিয়েই এই সেনাব্যূহের ভিতরে প্রবেশ করতে চাই আমি। আপনি আমার পিতার মতো এবং সম্মানে আমার জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির অথবা কৃষ্ণের মতো। পুত্র অশ্বত্থামাকে যেমন আপনি সদাসর্বদা রক্ষা করেন, আমিও তেমনই আপনার রক্ষণীয়। আপনি আশীর্বাদ করুন, ভিতরে প্রবেশ করি আমি—তব প্রসাদাদিচ্ছামি প্রবেষ্টুং দুর্ভিদাং চমূম্।

দ্রোণ আশ্চর্য হলেন। অভিমন্যুর মতো পুত্রের মৃত্যুশোক পেয়েও অর্জুন আচার্যের মর্যাদা ভোলেননি, তবু দ্রোণের কোনও উপায় নেই যে। তিনি পরান্নের ঋণ শোধ করতে প্রতিপক্ষে যুদ্ধ করছেন। অতএব ধর্মত এবং ন্যায়ত তিনি বাধা দিলেন অর্জুনকে। ভয়ংকর যুদ্ধ আরম্ভ

হল। পরস্পরের মহাযুদ্ধ চলল কতক্ষণ। অর্জুন দেখলেন—মহা বিপদ! সূর্যাস্তের আগে জয়দ্রথবধ করতে হবে। অতএব অদ্ভুত বুদ্ধিতে অর্জুন অস্ত্রমোক্ষণ থামিয়ে দিয়ে আচার্যকে প্রদক্ষিণ করে সসম্মানে এড়িয়ে গেলেন তাঁকে। দ্রোণ বললেন—কর কী? কর কী? শত্রুকে না জয় করে কোথায় যাচ্ছ তুমি—ক্বেদং পাণ্ডব গম্যতে? অর্জুন সস্তোকে বললেন—আরে আপনি হলেন আমার গুরুমশাই। কবে আমার শত্রু হলেন আপনি? তা ছাড়া, কে আছে এই পৃথিবীতে, যে আপনাকে যুদ্ধে জয় করবে—ন চাস্তি স পুমাল্লোকে যসং যুধি পরাজয়েৎ।

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলেন দ্রোণ। অর্জুন শকটব্যূহে প্রবেশ করলেন শরবর্ষণ করতে করতে। দুর্যোধনের সেনা মরছে, যোদ্ধা মরছে, এবং কিছুতেই প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না অর্জুনকে। দুর্যোধন ফিরে এলেন আচার্যের কাছে। সক্রোধে সাভিমানে বললেন—অর্জুন যে ঢুকে গেল—গতঃ স পুরুষব্যাঘ্রঃ। আমার একপাশের সমস্ত সেনা নষ্টপ্রায়। সমস্ত মানুষ ভেবেছিল—অর্জুন জীবন থাকতে আপনাকে টপকে যাবে না—নাতিক্রমিষ্যতি দ্রোণং জাতু জীবন্ ধনঞ্জয়ঃ। কিন্তু এ কী হল। একটা কিছু ব্যবস্থা করুন জয়দ্রথকে বাঁচানোর জন্য। দুর্যোধন এতক্ষণ যা বলেছেন তাতে আবেগ থাকলেও অন্যায় নেই। কিন্তু এবার তিনি কঠিন সুরে বিদ্রূপ করতে আরম্ভ করলেন দ্রোণকে। বললেন—জানি, বেশ জানি আপনি পাণ্ডবদের ভাল চান—পাণ্ডবানাং হিতে রতম্। আমাদের ক্ষমতা অনুসারে আপনাকে আমরা ভালই একটা বৃত্তি দিয়ে থাকি এবং আপনাকে তুষ্ট করারও চেষ্টা করি কম না—যথাশক্তি চ তে ব্রহ্মন্ বর্তয়ে বৃত্তিমুত্তমাম্। প্রীণামি ত্বাং যথাশক্তি—কিন্তু আপনি দেখছি, সেসব কিছুই মনে রাখেন না।

আজকে ভীষ্ম শরশয্যায় শুয়ে আছেন। দ্রোণাচার্যের আর বলার উপায় নেই যে,—আমি ভীষ্মের বৃত্তি নিয়ে চলি, তোর নয়। অথচ সমস্ত শক্তি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রধানত ভীষ্মের মুখের দিকে তাকিয়েই তিনি কুরুবাড়ির আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে জড়িয়ে গেছেন। তাঁর সবচেয়ে যেটা দুর্বলতার জায়গা, আজ সেইখানেই আঘাত করছেন দুর্যোধন। তাও কী ভাষায়? দুর্যোধন বলছেন—আপনি আমাদেরই খেয়ে-পরে আমাদেরই সর্বনাশ করছেন—অস্মানেবোপজীবংস্ত্বম্ অস্মাকং বিপ্রিয়ে রতঃ। আমি ভাবতে পারিনি—আপনার হৃদয় এমন মধুমাখানো ক্ষুরের মতো।

দুর্যোধন বুঝলেন—একটু বেশি হয়ে গেছে। তাঁর মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ। অতএব খানিকটা অনুযোগের স্বরে এবার প্রকৃত করণীয় বিষয়ে ফিরে এসে বললেন—আপনি যদি আমাদের আশ্বাস না দিতেন যে, জয়দ্রথ সুরক্ষিত অবস্থায় বেঁচে থাকবে, তা হলে সে যখন ভয় পেয়ে বাড়ি ফিরে যেতে চেয়েছিল, আমি তাকে আটকাতাম না। আপনার অভয় দেবার কথা বলেই আমি তাকে আশ্বস্ত করেছি। এখন দেখছি, আমি তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছি। যমের দাঁতের মধ্যে পড়েও মানুষ ফিরে আসতে পারে, কিন্তু অর্জুনের হাত থেকে নয়। অর্জুন ব্যূহভঙ্গ করে ঢুকে পড়েছেন। টপকে গেছেন আচার্য দ্রোণকে। দুর্যোধনের সত্যিই মাথার ঠিক নেই। এত খারাপ খারাপ কথা বলার পরেও তিনি তাই পুনরায় সলজ্জে বলেছেন—আমি আর্ত বিপন্ন হয়ে কী বলতে কীই না বলেছি। সেসব আপনি ক্ষমা করুন আপনি জয়দ্রথকে বাঁচান।

শাস্ত্র বলে—কথা আর তির—একবার যদি ছুটল, তো সে আঘাত করেই ছাড়বে। তাকে শত চেষ্টা করলেও আর ফেরানো যায় না। দুর্যোধন যে ভাষায়, বিশেষত বৃত্তির কথা তিনি যেভাবে সশব্দে আচার্যকে শুনিয়েছেন, তাতে তাঁর হৃদয় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। তিনি কি কৌরবদের ভাড়াটে সেনাপতি, 'মার্সেনারি'! এতকাল কুরুবাড়িতে থেকে, তাঁদের ভালমন্দে জড়িয়ে থেকে তাঁকে এই ভাষা শুনতে হল? তবু দ্রোণাচার্য তত রাগ করলেন না, যতটা এইসব অভিযোগের পরে প্রত্যাশিত ছিল। তা ছাড়া, দুর্যোধন সত্যিই বিপন্ন, তাঁর এক এবং

অদ্বিতীয় ভগ্নীপতি অর্জুনের কোপে পড়েছেন। অতএব যথাসাধ্য ধৈর্য রেখেই দ্রোণাচার্য বললেন—তোমার কথায় আমি রাগ করিনি, বাছা। তুমি তো আমার কাছে অশ্বত্থামারই মতো। তবে সমস্যাটা কী জান—অর্জুনের সারথি হলেন বিশালবুদ্ধি কৃষ্ণ। আমার ব্যূহের মধ্যে সামান্য একটু ফাঁক তৈরি করে, সেখান দিয়ে কী দ্রুত বেরিয়ে গেল অর্জুন—অল্পঞ্চ বিবরং কৃত্বা তূর্ণং যাতি ধনঞ্জয়ঃ।

দ্রোণ এবার নিজের বৃদ্ধবয়সের কথা দুর্যোধনকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন—যে তাড়াতাড়ি অর্জুন চলে গেছে, তাতে তার পিছন পিছন তাড়া করে তার গতি রুদ্ধ করার ক্ষমতা আমার নেই। আমার বয়স হয়েছে, সেই শীঘ্রতা আমার থাকবে কী করে—ন চাহং শীঘ্রযানে'দ্য সমর্থো বয়সান্বিতঃ। দ্রোণ একটু অজুহাতও দিয়ে বললেন—তা ছাড়া আমি ভাবছিলাম, যুধিষ্ঠিরকে ধরতে হবে আমায়, কাজেই ব্যূহমুখ ত্যাগ করে সরে যেতে পারিনি আমি। এবারে সেই অপমানের কথা মনে পড়ল—কুরুদের কাছ থেকে বৃত্তি নেওয়ার খোঁটা। দ্রোণ ছাড়লেন না। বললেন—তুমি তো রাজা বটে। অস্ত্রশস্ত্রেও তোমার মতো কুশলী বীর কজন আছে? পাণ্ডবদের সঙ্গে তোমার শত্রুতাও তো আর আমার তৈরি নয়। সে তোমারই তৈরি। তা তুমি যাও না একটু যুদ্ধ করে এসো অর্জুনের সঙ্গে—বীরঃ স্বয়ং প্রযাহি অত্র যত্র যাতো ধনঞ্জয়ঃ।

দ্রোণের এই একটি কথায় দুর্যোধন একেবারে চুপসে গেলেন। স্বীকার করলেন যে, অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষমতা তাঁর নেই। মাথা নিচু করে বললেন—আমি আপনার সেবক, সেবকের যশ রক্ষা করা আপনারই কাজ। দ্রোণ যে খুব গলে গেছেন, তা নয়। অর্জুনের ক্ষমতার কথা স্বীকার করে নিয়েও তিনি বলেছেন—আরে আমি তোমাকে বর্ম পরিয়ে মন্ত্র পড়ে দিচ্ছি। দেখবে—তোমার সঙ্গে অর্জুন পারবে না। দ্রোণ খুব করে দুর্যোধনের বর্ম এঁটে অস্ত্রশস্ত্র হাতে দিয়ে অনেক মন্ত্র পড়ে পাঠিয়েছেন দুর্যোধনকে। দাম্ভিক দুর্যোধন আচার্যের পরীক্ষা বুঝতে পারেননি। দুর্যোধন জয়দ্রথকে রক্ষা করতে এসে হেরে পালিয়েছেন অর্জুনের কাছে। দুর্যোধন অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে এদিকে দ্রোণাচার্য আবারও যুধিষ্ঠিরকে ধরে ফেলেছিলেন প্রায়। কিন্তু বিপদ বুঝে পালাতে যুধিষ্ঠিরের জুড়ি নেই, তিনি পালিয়েই বেঁচেছেন।

দুর্যোধন যতই তিরস্কার করুন দ্রোণকে, তাঁর সেনাপতিত্বকালে তিনি যুদ্ধ কিছু কম করেননি। কিন্তু করলে কী হবে, অভিমন্যু অসহায়ভাবে নিহত হওয়ায় সমস্ত পাণ্ডবপক্ষ একেবারে তপ্ত হয়ে ছিল। দু-এক জায়গায় তাঁদের সাময়িক পরাজয় ঘটলেও সামগ্রিকভাবে তাঁরা কৌরবপক্ষের মাথার ওপর দিয়ে চলছিলেন। অর্জুনের অস্ত্রশিষ্য সাত্যকি এই সময়টায় এমন যুদ্ধ করেছেন যে, কৌরবপক্ষের মহা-মহাবীর রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাচ্ছিলেন। যুদ্ধ চলাকালীন এই সময়টাতে যথেষ্ট কৌতুক বোধ করেছেন আচার্য। একজন সেনাপতি হিসেবে তাঁর সমস্ত গাম্ভীর্য এবং কার্যক্ষেত্রে তাঁর অপেক্ষিত সফলতা দিয়েই দ্রোণাচার্যের চরিত্রবিচার হয় না। ভৎসনা শুনেও দুর্যোধনকে তিনি যে মধুরতায় অর্জুনের বিরুদ্ধে নিয়োগ করেছিলেন, তাতে ওই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর রসিকতাবোধ এবং দুষ্টুমি বেশ প্রকট হয়ে ওঠে।

অর্জুনশিষ্য সাত্যকির পরাক্রমে কৌরববীরেরা যখন প্রায় বিধ্বস্ত, এই সময় যুদ্ধক্ষেত্রের একান্তে দুঃশাসনের সঙ্গে দেখা হয়েছে দ্রোণের। কুচক্রী এই মানুষটির পীড়িত অবস্থা দেখে এবং অবশ্যই সব জেনে বুঝেই আচার্য সকৌতুকে বললেন—সবাই এমন পালিয়ে যাচ্ছে কেন, দুঃশাসন? দুর্যোধন ভাল আছে তো, জয়দ্রথের অবস্থা ঠিক আছে তো? তা হলে তুমি এমন পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? তুমি রাজপুত্র বলে কথা, রাজার ভাইও বটে, তাতে আবার এই কুরু রাজ্যের যুবরাজ হয়ে তোমার কি পালিয়ে যাওয়া শোভা পায়? তুমি একদিন দ্রৌপদীকে দাসী বলে গালি দিয়েছিলে। তাঁকে বলেছিলে—তোমার কোনও স্বামী নেই, তারা সব

নপুংসক। তা আজকে এমন করে পালাচ্ছ কেন? যেদিন পাশার ঘুটি নিয়ে খেলেছিলে, সেদিন বোঝনি যে, ঘুটিগুলো সব বাণ হয়ে ফিরে আসবে। তখন পাণ্ডবদের নিয়ে অনেক হাস্যকৌতুক করেছিলে, তর্জনগর্জনও কম নয়। তো এখন সেসব কোথায় গেল—ক্ক তে মানশ্চ দর্পশ্চ ক্ক তে তদ্‌বীরগর্জিতম্। এখন এই অর্জুনের শিষ্য সাত্যকিকে দেখেই পালাচ্ছ, তা হলে অর্জুন এলে কী করবে, ভীম এলে কী করবে? যাও শিগগির, যুদ্ধে যাও। যুদ্ধের মুখে তুমি এমন করে পালালে সমস্ত সৈন্য পালিয়ে যাবে, সেটা কি ভাল হবে?

দুঃশাসন পুনরায় যুদ্ধে যেতে বাধ্য হয়েছেন। দ্রোণ নিজেও নিযুক্ত হয়েছেন সংগ্রামে। মহাভারতের কবি একাধিক অধ্যায় জুড়ে দ্রোণাচার্যের পরাক্রম বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কুমার অভিমন্যুর মৃত্যু পাণ্ডবপক্ষের প্রত্যেকটি বীরের মনে এমনই এক ইন্ধনের কাজ করেছিল যে, শত চেষ্টা করেও দ্রোণাচার্য কৌরবপক্ষের অনেক বড় বড় যোদ্ধাকে বাঁচাতে পারেননি। মারা গেছেন ভূরিশ্রবা। মারা গেছেন জয়দ্রথ। জয়দ্রথের মৃত্যুর সমস্ত দায় দ্রোণাচার্যের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন দুর্যোধন। সমস্ত দিনের যুদ্ধক্লান্তির পর সন্ধ্যার আলোচনা সভায় এমন নিদারুণ কথা শুনে আচার্য আর নিজেকে রোধ করতে পারলেন না। বললেন—কেন দুর্যোধন! বার বার আমাকে এইভাবে বাক্যবাণে জর্জরিত করছ—বাক্‌ছরৈরভিকৃন্তসি? কেন, জয়দ্রথ যেখানে মারা গেছেন, সেখানে অর্জুনকে তো তোমরা সবাই মিলে ঘিরে ধরেছিলে। তুমি ছিলে, কর্ণ ছিল, কৃপ ছিলেন এবং আমার পুত্র মহাবীর অশ্বত্থামাও ছিল, তা হলে জয়দ্রথ মরল কেন—সিন্ধুরাজানমাশ্রিত্য স বো মধ্যে কথং হতঃ?

দ্রোণাচার্য ভীষ্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন দুর্যোধনকে। বলেছেন—তিনি তো কম বীর ছিলেন না। অর্জুনের পরাক্রমে তাঁরও পতন ঘটেছে এই যুদ্ধে। তা ছাড়া সারা জীবন যাঁদের বিরুদ্ধে অন্যায় আচরণ করেছ, যাঁদের কুলবধূকে রাজসভায় ধরে এনে যথেচ্ছ অপমান করেছ, যাঁদের পাশা খেলে বনে তাড়িয়ে দিয়েছ—সেইসব অন্যায়ের ফল ঘটছে এখন—তদিদং বর্ততে ঘোরম্ আগতং বৈশসং মহৎ। দুর্যোধনের সহস্র অন্যায় স্মরণ করিয়ে দিয়ে শেষে নিজেকে ধিক্‌কার দিয়ে দ্রোণ বললেন—যাঁরা আমার পুত্রের মতে, সারা জীবন যাঁরা ন্যায়ের পথে সত্যের পথে চলেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আজ আমার যুদ্ধ করতে হচ্ছে। আমার মতো যারা বামুনের ঘরে জন্মেও বামুনের কাজ করে না, তাদেরই এমন অসহায়ভাবে ন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়—দ্রুহ্যেৎ কো নু নরো লোকে মদন্যঃ ব্রাহ্মণব্রুবঃ।

প্রসিদ্ধ ভরদ্বাজের পুত্র হওয়া সত্ত্বেও দ্রোণ যে ব্রাহ্মণের স্বাধীন বৃত্তি ছেড়ে পরাধীন যুদ্ধবৃত্তি গ্রহণ করেছেন এবং সেই জন্যই যে তাঁকে আজ এক অন্যায়কারী কুচক্রীর পক্ষ হয়ে সদাচারী সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হচ্ছে—সেই কথা ভেবে ভীষণ অনুতাপ ভোগ করেন দ্রোণ। কিন্তু হাজার অনুতপ্ত হলেও পরান্ন-ঋণ তাঁকে ক্লিষ্ট করে, দুর্যোধনের বৃত্তিভোগ তাঁকে আত্মহত্যার কষ্ট দেয়। তিনি আবারও উদ্‌যুক্ত হন যুদ্ধে জয়দ্রথের মৃত্যুর পর দুর্যোধনের বাক্যবাণ শুনে দ্রোণাচার্য তাঁকে তিরস্কার করেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবারও অঙ্গীকার করেন—তোমার বাক্যশূলে দগ্ধ হয়ে আবারও আমি যুদ্ধ করতে যাচ্ছি, দুর্যোধন—রণায় সহতে রাজংস্ত্বয়া বাক্‌ছল্যপীড়িতঃ।

জয়দ্রথবধের দিন সকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ভয়াবহ সংগ্রাম চলেছে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর পঁচাশি বছরের বৃদ্ধ এখন ক্লান্ত, শ্রান্ত। তবু শুধু অপরের বৃত্তির দায় শোধ করার জন্য তিনি রাত্রিকালেও যুদ্ধের আদেশ দিলেন—রাত্রাবপি যোৎস্যন্তে সংরব্ধাঃ কুরুসৃঞ্জয়াঃ। পুত্র অশ্বত্থামার সঙ্গে নিজেও চললেন যুদ্ধে। আচার্যের এই আকুল ব্যবহারেও অবশ্য দুর্যোধনের সন্দেহ গেল না। বন্ধু কর্ণের কাছে তিনি সসন্দেহে বলেছেন—সব গেল। সব গেল। একা অর্জুন আমার সৈন্য এবং যোদ্ধাদের যা ক্ষতি করে গেল, তা সবই দ্রোণের জন্য। আমার বিশ্বাস হয় না—যদি আচার্য সেই দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিরোধ করতেন অর্জুনকে,

তা হলে অর্জুনের পক্ষে অসম্ভব ছিল ব্যূহ ভেঙে ঢোকা। অর্জুনকে তিনি অতিরিক্ত ভালবাসেন এবং সেই জন্যই শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ না করে তিনি ব্যূহের দ্বার মুক্ত করে দিয়েছেন অর্জুনের কাছে—ততো'স্য দত্তবান্ দ্বারম্ অযুদ্ধেনৈব শত্রুহন্।

কথাটা সত্যিই একেবারে মিথ্যে নয়। অর্জুন যেভাবে অস্ত্র ত্যাগ করে আচার্যকে প্রদক্ষিণ করে সস্তোকে রথ নিয়ে ব্যূহের ভিতরে প্রবেশ করেছেন, তাতে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে সত্যিই যে তিনি তাঁর গতিরোধ করতে পারতেন না—এটা বিশ্বাস্য নয়। কিন্তু ওই যে বলেছি—আচার্যের মনে অদ্ভুত এক দ্বৈরথ কাজ করে। যুধিষ্ঠির-অর্জুনের মতো কষ্টক্লিষ্ট ধর্মনিষ্ঠদের বিপক্ষে যুদ্ধ করার যে অনুতাপ তাঁর আছে, তিনি সেই অনুতাপের সান্ত্বনা লাভ করেন যুধিষ্ঠিরকে না ধরে তাঁকে পলায়ন করতে দিয়ে, অর্জুনকে ব্যূহমুখে প্রবেশ করতে দিয়ে এবং পশ্চাদ্ধাবন না করে। অপরদিকে অন্নঋণ শোধ করার জন্য এই বৃদ্ধ বয়সেও প্রাণান্তক যুদ্ধ করেন তিনি। অন্তত লোকচক্ষুতে সে যুদ্ধের ভয়াবহতা কম লক্ষণীয় হয়ে ওঠে না।

সেই জন্যই দুর্যোধনের যথাযথ সন্দেহের উত্তরে কর্ণের মতো এককালের দ্রোণবিরোধী মানুষের মুখেও সান্ত্বনা শুনি—এমন করে আচার্যকে দোষ দিয়ো না, দুর্যোধন! নিজের ক্ষমতা অনুসারে তিনি যথেষ্টই চেষ্টা করছেন, নিজের জীবন পণ করে যুদ্ধও করে যাচ্ছেন তোমার জন্য—আচার্য্যং মা বিগর্হস্ব শক্ত্যাসৌ যুধ্যতে দ্বিজঃ। কর্ণ আরও বললেন—দেখো, আচার্য বুড়ো হয়েছেন—আচার্যঃ স্থবিরো রাজন্—তুলনায় অর্জুন কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন! অসাধারণ যুদ্ধক্ষমতা থাকায় অর্জুনের পক্ষে তাঁকে অতিক্রম করে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। কোন শক্তিতে আচার্য অর্জুনের মতো শীঘ্রগামী যোদ্ধাকে ধরবেন। অস্ত্রচালনায় হাতের যে শীঘ্রতা চাই, যে ক্ষমতা চাই, আচার্য দ্রোণের কাছে তা আশা করা যায় না—বাহুব্যায়ামচেষ্টায়াম্ অশক্তস্তু নরাধিপ। আমি এখানে সত্যিই বৃদ্ধ দ্রোণের দোষ দেখতে পাচ্ছি না।

দ্রোণের পরিচালনায় রাত্রি-যুদ্ধ আরম্ভ হল কুরুক্ষেত্রে—যা এতকাল হয়নি। কিন্তু রাত্রি-যুদ্ধে কৌরবদের কাল হয়ে উঠলেন ভীমপুত্র ঘটোৎকচ। কর্ণের বাণে তিনি শেষ পর্যন্ত মারা গেছেন বটে, কিন্তু ক্ষতি হয়ে গেছে কৌরবদেরই বেশি। সবচেয়ে বড় কথা, কর্ণ যে একাগ্নী বাণ রেখেছিলেন অর্জুনকে মারার জন্য, সেটিও খরচ হয়ে গেল ঘটোৎকচবধের জন্য। দ্রোণ তাঁর প্রিয়তম শিষ্যের জীবন সম্বন্ধে মনে মনে আশ্বস্ত হলেন কি না, সে খবর মহাভারতের কবি দেননি। কিন্তু রাত্রিদিন অবিরাম যুদ্ধ করে পাণ্ডবদের যথাশক্তি ক্ষতি করেও দ্রোণ কোনও মর্যাদা পাননি দুর্যোধনের কাছে। দিনের পর অবিরাম রাত্রি-যুদ্ধ করার শেষে সমস্ত সেনাবাহিনী নিদ্রালাভের জন্য কাতর হয়ে গিয়েছিল। নিদ্রাতুর সৈন্যরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে স্বপক্ষীয়দের শরীরেই অস্ত্রমোক্ষণ করছিল। এই অবস্থায় অর্জুন জোর করে যুদ্ধ বন্ধ করে দিয়েছিলেন, যাতে সাধারণ সৈন্যরা খানিকক্ষণ অন্তত ঘুমিয়ে নিতে পারে।

পাণ্ডব সেনানীরা পরস্পর চেঁচিয়ে একসময় দুর্যোধন-কর্ণকে জানিয়ে দিতে পেরেছিল যে তারা অস্ত্রত্যাগ করে যুদ্ধক্ষেত্রেই ঘুমিয়ে নিতে চাইছে। কুরু সৈন্যদের কাছেও এই সংবাদ ছিল আশীর্বাদের মতো। তারাও ঘুম চায়। দিনরাত পরিশ্রমের পর তারাও ঘুম চায়। সেনাপতি হিসেবে দ্রোণ এই দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সমস্ত সৈন্যদের তখন কী অবস্থা! আলস্যে অবসাদে যে যেখানে ছিল, রথে, অশ্বপৃষ্ঠে, হস্তিপৃষ্ঠে, ভূমিতে—যে যেখানে পেরেছে ঘুমের আয়োজন করেছে। পূর্ব দিগ্‌বধূর মুখখানি রাঙিয়ে দিয়ে একা জেগে ছিল শুধু আকাশের চাঁদ আর যুদ্ধক্ষেত্রে জেগেছিলেন ক্রোধান্বিত দুর্যোধন।

সমস্ত রণভূমি উচ্চকিত করে আবারও তিনি এসেছেন দ্রোণের কাছে। আবারও অভিযোগ—যুদ্ধবিরতির এই আবদার কেন মেনে নিলেন আচার্য। দুর্যোধন রুক্ষস্বরে বললেন

—শত্রুপক্ষকে এইভাবে বিশ্রাম দেওয়াটা মোটেই সহ্য করা যায় না—ন মর্ষণীয়াঃ সংগ্রামে বিশ্রমন্তঃ শ্রমান্বিতাঃ। ক্ষতি হয়েছে আমাদেরই বেশি এবং বিশ্রান্তি লাভ করলে আরও বলবান হয়ে উঠবে আমার শত্রুপক্ষ। জগতে আপনার মতো ধনুর্ধর দ্বিতীয় নেই। তবু যে বার বার আপনি এদের ছেড়ে দিচ্ছেন, সে কি আপনার শিষ্যের প্রতি স্নেহে, নাকি আমার ভাগ্য খারাপ বলে। কত কত দিব্য অস্ত্রের সন্ধি আপনার জানা আছে, সেসব প্রয়োগ করুন এই শত্রুদের ওপর।

দ্রোণ ভীষণ ভীষণ বিরক্ত হলেন দুর্যোধনের অযৌক্তিক কথা শুনে। ক্রুদ্ধও বটে। যথেষ্ট কর্কশ এবং কটুভাবেই দুর্যোধনকে তিনি বললেন—আমি বুড়ো বয়সেও সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি যুদ্ধ করতে। এই যে সব সাধারণ মানুষ, যারা অস্ত্রের প্রয়োগ জানে না, একজন অস্ত্রবিদ হয়ে কীভাবে এদের ওপর আমি দিব্যাস্ত্রের প্রয়োগ করতে পারি? তোমার কথায় হয়তো এখন তাই করতে হবে আমাকে, ভাল হোক বা মন্দ হোক, তাই করতে হবে আমাকে —যদ্ভবান্ মন্যতে চাপি শুভং বা যদি বাশুভম্। আজ মনে পড়ছে দ্রোণের—মহর্ষি অগ্নিবেশ্যের কাছে, মহর্ষি অগস্ত্যের কাছে দিব্যাস্ত্র লাভ করেছিলেন তিনি, পরম্পরাক্রমে সেই অস্ত্র তিনি দিয়েছেন প্রিয়তম শিষ্য অর্জুনকে আর পুত্র অশ্বত্থামাকে। কই শত বিপদ সত্ত্বেও সেই যুবক তো দুর্যোধনের এই একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের ওপরে, কিংবা লোকপ্রসিদ্ধ কৌরব যোদ্ধাদের ওপরে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করেনি। অথচ পরান্ন গ্রহণের কী জ্বালা যে, আজ সমস্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও দ্রোণাচার্যকে দুর্যোধনের অঙ্গুলীহেলনে আপন স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হচ্ছে। এতৎ সত্ত্বেও হয়তো তিনি ওই অস্ত্রপ্রয়োগ ঘটাবেন না, কিন্তু তবু এই মুহূর্তে দুর্যোধনের অযাচিত উপদেশ শ্রবণ করে চলতে হচ্ছে তাঁকে।

দ্রোণাচার্য তবু সাবধান করে দিয়েছেন দুর্যোধনকে। বিশেষত অর্জুনের প্ররোচনায় যুদ্ধ বন্ধ হয়েছে এবং বিশ্রাম লাভ করে সে আরও শক্তিমান হয়ে উঠবে—এই অভিযোগের উত্তরে দ্রোণ বলেছেন—তুমি এটা মনে কোরো না যে, দিনরাত্রির অবিরাম যুদ্ধের পর অর্জুন বড় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে—মন্যসে যচ্চ কৌন্তেয়ম্ অর্জুনং শ্রান্তমাহবে। তার ক্ষমতার কথা যদি না শুনে থাক তো শোনো। দ্রোণাচার্য আবারও অর্জুনের অস্ত্রক্ষমতা, বহুত্র তাঁর যুদ্ধজয়ের কথা বলতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু দুর্যোধন বৃদ্ধ আচার্যের সমস্ত আবেগ থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—অর্জুনের জন্য আপনাকে ভাবনা করতে হবে না। আমি আছি, দুঃশাসন আছে, কর্ণ আছেন, শকুনি আছে, আমরা শেষ করে ছাড়ব অর্জুনকে—হনিষ্যামো'র্জুনং সংখ্যে দ্বিধা কৃত্বাদ্য ভারতীম্।

হো হো করে হাসতে ইচ্ছা করছিল আচার্যের—ভরদ্বাজো হসন্নিব। সেই অস্ত্রপরীক্ষার দিন থেকে এই যুদ্ধারম্ভ পর্যন্ত কতবার তিনি ওই অর্জুনের সম্বন্ধে একই কথা বলেছেন। কতবার অর্জুনের কাছে প্রত্যক্ষ পরাজয়ের স্বাদ পেয়েছেন দুর্যোধন-কর্ণরা, তবু সেই দম্ভ, সেই আত্মতুষ্টি। বার বার এই দুর্যোধনের কাছে তিনি ধিক্কার লাভ করেছেন, বার বার শুনেছেন কুরুবাড়ির বৃত্তিভোগের বিদ্রূপ। আজ আর তাঁর লজ্জা, ভয় কিছুই নেই। যে বৃত্তি ভোগ করে তাকে বৃত্তিভোগী বললে তার মানসিক যন্ত্রণা বাড়ে, কারণ বৃত্তিভোগের অসহায়তা তাকে অবচেতনে পীড়িত করে সব সময়। আচার্য তাই দুর্যোধনের দম্ভোক্তি একেবারে নস্যাৎ করে দিয়ে বললেন—দেখো বাছা! তুমি স্বর্গের রাজা ইন্দ্র নও, যম, বরুণ, কুবেরের মতো প্রভাবশালী কোনও দেবতাও নও। এমনকী অসুর রাক্ষস হলেও চলত, তাও নও তুমি। সত্যি কথা বলতে কী, তোমাদের মতো অবুঝ এবং বোকা আমি দেখিনি যে, এই ধরনের সাহংকার বচন এখনও আউড়ে যাচ্ছ—মূঢ়াস্তু এতানি ভাষন্তে যানীমান্যাত্থ ভারত। যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনকে প্রতিপক্ষে দেখে কেউ বাপু স্বস্তি নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবে না—স্বস্তিমান্ কো ব্রজেদ্ গৃহান্ —ফিরলেও ভাববে—আজকে কিছু হল না বটে, কিন্তু কালই তার অন্তকাল ঘনিয়ে না আসে।

আচার্য এবার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে এলেন। বার বার পক্ষপাতের অভিযোগ শুনতে শুনতে আজ তিনি রূঢ় কঠিন হয়ে উঠেছেন। বৃত্তিভোগীকে বৃত্তিভোগী বললে যেমন রাগ হয়, দুর্যোধনকেও তিনি তাই তাঁর বাস্তব চরিত্রটি উদ্‌ঘাটন করে লজ্জা দিতে চাইলেন। দ্রোণ বললেন—তুমি শুধুই সকলকে সন্দেহ কর, দুর্যোধন! এত নিষ্ঠুর তোমার হৃদয়, এতই তা পাপের সঞ্চয়ে স্ফীত যে, বাস্তব পরিস্থিতিটা কী, তা কখনওই তুমি বোঝনি, আর সেই জন্য সন্দেহের বশে পরকে কটু কথা বলতে তোমার একটুও বাধে না—ত্বন্তু সর্বাভিশঙ্কিত্বান্ নিষ্ঠুরঃ পাপনিশ্চয়ঃ। তুমি স্বয়ং যাও অর্জুনের সামনে, তোমার নিজের কারণেই তো তাঁকে তোমার বধ করা দরকার, অন্যদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ কেন? পাণ্ডবদের সঙ্গে সমস্ত শত্রুতার মূলে আছ তুমি, অতএব তুমি তার মুখোমুখি হও—ত্বমস্য মূলং বৈরস্য তস্মাদাসাদয়ার্জুনম্। তুমি ক্ষত্রিয় বীর, এটাই উপযুক্ত ব্যবহার হবে তোমার।

সারা জীবন নিজের বিরুদ্ধে যেসব কথা শুনেছেন সেই সমস্ত বিদ্রুপ, বক্রোক্তি আজ দুর্যোধনকে ফিরিয়ে দিতে চান আচার্য। বললেন—তবে হ্যাঁ, যুদ্ধে তুমি একা যেয়ো না, সঙ্গে তোমার মামা ওই পাশাড়ে শকুনিকে নিয়ে যেয়ো। ব্যাটা কুটিল, প্রবঞ্চক, শুধু ঘুটি চালিয়ে গেল জীবন ভরে। ওকে নিয়ে যেয়ো, ও হারিয়ে দিয়ে আসবে পাণ্ডবদের—দেবিতা নিকৃতিপ্রজ্ঞো যুধি জেষ্যতি পাণ্ডবান্। দ্রোণাচার্য এবার ফেটে পড়লেন ক্রোধে। কত কাল ওই একই দম্ভোক্তি শুনে আসছেন। আজকে আর ছাড়লেন না দুর্যোধনকে। শোনালেন কর্কশ কঠিন প্রত্যুত্তর। বললেন—শুধু আজকে নয়, দুর্যোধন! শুধু আজকে নয়। ধৃতরাষ্ট্রের কানের কাছে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে অনেকবার তুমি এই কথা বলেছ যে, তুমি, কর্ণ, আর দুঃশাসন—এই তিনজন মিলে নাকি পাণ্ডব ভাইদের অন্ত করে ছাড়বে। একবার নয়, তোমার এই দম্ভস্ফীত শূন্য গর্জন কুরুসভার প্রত্যেক আলোচনায় শুনেছি—ইতি তে কত্থমানস্য শ্রুতং সংসদি সংসদি। আজকে সেই সুযোগ তোমার এসেছে, যাও পাণ্ডব অর্জুনকে মেরে যশ ছিনিয়ে নাও। তোমার তো ভয় নেই কোনও, যাও যুদ্ধ করো—মা ভৈর্যুদ্ধস্ব পাণ্ডবম্।

কথাগুলো বলে দ্রোণ আর দাঁড়ালেন না। রাত্রির তিন ভাগ তখন কেটে গেছে। এক ভাগ বাকি। দুর্যোধনের ওপর যে দুর্দম্য রাগ হয়েছিল, আচার্য সেই রাগের পথ উন্মুক্ত করে দিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। কৌরব-পাণ্ডব পক্ষের কোনও সৈন্যই আর সম্পূর্ণ বিশ্রাম পেল না। ধুন্ধুমার যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল শেষ রজনীতে মশাল জ্বালিয়ে—ত্রিভাগমাত্রশেষায়াং রাত্র্যাং যুদ্ধমবর্তত। রাত্রিশেষের এই যুদ্ধের মধ্যে এক করুণ ঘটনা আছে, যদিও মহাভারতের কবি সেই ঘটনার প্রতি তাঁর কবিজনোচিত মর্মবেদনা প্রকাশ করেননি।

লক্ষণীয় ব্যাপার হল, সমগ্র দ্রোণপর্বের মধ্যে দ্রোণ যখনই যুদ্ধে গেছেন অথবা তিনি যখন ভয়ংকর লোকক্ষয়ে লিপ্ত, তখনই দেখেছি—যুদ্ধের অধিকাংশ সময়েই দ্রোণের বাণ-লক্ষ্য হলেন পাঞ্চালরা। পাণ্ডবরা নন। দুর্যোধনকে কথা দিয়েও তিনি যুধিষ্ঠিরকে হাতের মুঠোয় পেয়েও ধরেননি। ভীম, নকুল কিংবা সহদেবও অতি মাত্রায় কখনও তাঁর লক্ষ্য নন। অর্জুন তো ননই। অথচ দুর্যোধন এঁদেরই মৃত্যু চেয়েছিলেন। সেনাপতি হিসেবে দ্রোণ যে পথ বেছে নিয়েছিলেন, তা হল—যথাসম্ভব পাঞ্চাল সৈন্য ধ্বসং করা এবং সেই সূত্রে পাঞ্চাল-প্রধানদের সংখ্যা কমানো। যেখানেই দ্রোণ যুদ্ধ করছেন, সেখানেই বর্ণনা পাচ্ছি—তিনি শত শত পাঞ্চাল সৈন্য বিনাশ করছেন।

আশ্চর্যের কথা আরও আছে। জয়দ্রথ এবং ভূরিশ্রবা যখন মারা গেলেন, তখন দুর্যোধন দ্রোণকে দোষ দিয়েছিলেন যে, তিনি শিষ্যের প্রতি অনুকম্পায় তাঁকে ঠিকমতো শাস্তি দিচ্ছেন না—ভবানুপেক্ষাং কুরুতে শিষ্যত্বাদ্ অর্জুনস্য হি। উত্তরে যদি সত্যিই দ্রোণ পুনরায় যুদ্ধোদ্যোগী হয়ে ওঠেন তা হলে দ্রোণের কী বলা উচিত ছিল? উচিত ছিল এই বলা যে—

আচ্ছা! অর্জুনকে এবার আমি দেখছি। কিন্তু না দ্রোণ এ কথা বলেননি। তিনি অর্জুনের ক্ষমতার কথা খুব বলেটলে দুর্যোধনের কাছে প্রতিজ্ঞা করে বললেন—তোমায় কথা দিচ্ছি, দুর্যোধন! আমি সমস্ত পাঞ্চালদের না মেরে এই যুদ্ধবর্ম খুলব না দেহ থেকে—নাহত্বা যুধি পাঞ্চালান্ কবচস্য বিমোক্ষণম্। শুধু নিজে নয়, পাঞ্চালদের প্রতি তাঁর এই বিদ্বেষ তিনি তাঁর পুত্র অশ্বত্থামার মধ্যেও অনুস্যূত করতে পেরেছিলেন। দুর্যোধনের কাছে কথা দেবার সময় তিনি পুত্রকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন—দুর্যোধন! তুমি আমার ছেলেকে বলো যে, নিজের জীবন থাকতে একটি পাঞ্চালও যেন তার হাত থেকে বেঁচে না ফেরে—ন সোমকাঃ প্রমোক্তব্যা জীবিতং পরিরক্ষতা।

বেশ বুঝতে পারি—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটা দ্রোণের কাছে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ নয়, সে যুদ্ধ কুরু আর পাঞ্চালদের যুদ্ধ। কথাটা ঐতিহাসিক দিক থেকে মিথ্যেও নয়, কিন্তু পাঞ্চালরা যে কারণেই কুরুদের শত্রু হোন, দ্রোণাচার্যের পাঞ্চাল-বিদ্বেষ নিতান্তই ব্যক্তিগত। সেই যে যৌবনসন্ধির কালে তিনি পাঞ্চাল দ্রুপদের কাছে অপমানিত হয়েছিলেন, সে অপমান তিনি কোনও দিন ভোলেননি। দ্রুপদকে প্রতি-অপমান করার পরেও, তাঁর রাজ্যার্ধ ছিনিয়ে নেবার পরেও দ্রুপদের ওপর রাগ তাঁর যায়নি। কুরুবাড়ির মর্যাদা এবং মন্ত্রিত্ব লাভ করে অপমানিত দ্রুপদের ওপর তাঁর মায়া হয়েছে বটে কখনও কখনও, কিন্তু তাঁর ক্রোধের যে মূল ঘটনা—দ্রুপদ তাঁর বন্ধুত্ব অস্বীকার করেছিলেন—এ অপমান তিনি কখনও ভোলেননি আর ভোলেননি বলেই সমস্ত সেনাপতিত্বের কাল ধরে পাঞ্চালদের প্রতি তাঁর শত আক্রোশ দেখেছি আর আগ্রহ দেখেছি শুধুই পাঞ্চালবধে।

আজ যখন রজনী শেষে দুর্যোধনের কাছে অপমানিত হয়ে দ্রোণ সাক্রোশে যুদ্ধ করতে গেলেন, তখনও তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল পাঞ্চালরাই। দুর্যোধনের কাছে অপমানিত হওয়ার ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রোণ ভয়ংকর হয়ে উঠেছিলেন এবং স্বদেশের মর্যাদা রক্ষার তাগিদে সেদিন দ্রুপদ এবং বিরাট দ্রোণের মুখোমুখি হয়েছিলেন। পাণ্ডবদের এই দুই চিরবন্ধু সেদিন দ্রোণকে রুখতে পারেননি এবং এই যুদ্ধের ফলও হয়েছিল ভয়ংকর। রাজা বিরাট এবং পাঞ্চাল দ্রুপদ দুজনেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন দ্রোণের ভল্লক্ষেপণে। বড় আশ্চর্য এখানে মহাভারতের অকরুণ কবি! খুব স্বল্পসংগ্রামের পর কৈশোরগন্ধী বয়সের দুই বন্ধুর দেখা হল যুদ্ধক্ষেত্রে, আর কী অল্প কথায় তাঁদের একতরের নিধন-সংবাদ পাওয়া গেল—দ্রুপদ এবং বিরাটকে মৃত্যুর পথ দেখালেন দ্রোণ—-দ্রুপদঞ্চ বিরাটঞ্চ প্রেষয়ামাস মৃত্যবে।

মহাভারত খুলে দেখবেন—এইরকমই এক সংগ্রামমুখর অবস্থায় দুর্যোধন আর সাত্যকির দেখা হয়েছিল। সেখানে দুর্যোধনের মতো প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্যক্তিও যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নিজেদের শৈশব কৈশোরের বাল্যক্রীড়ার কথা স্মরণ করেছেন। এমনকী সাত্যকিও সেখানে পূর্বানুস্মরণে মোহিতপ্রায়। অথচ এই বাল্য বন্ধুত্বের কথা মহাভারতের কবি পূর্বে কোথাও বলেননি। সেখানে এই দ্রোণ এবং দ্রুপদের বাল্য বন্ধুত্বের কথা কত সাড়ম্বরে বর্ণনা করেছেন মহাকবি। অথচ আজ যখন বিনা কোনও আড়ম্বরে মারা গেলেন পাঞ্চাল দ্রুপদ, একটি পূর্বানুস্মরণের কথাও শুনলাম না দ্রোণের মুখে, অথবা দেখলাম না বাল্য বন্ধুর জন্য দ্রোণের কপোলে এক বিন্দুও অশ্রুপাত।

মহাভারতের কবিরও কোনও দোষ নেই। আসলে পাঞ্চালদের ওপর দ্রোণের পূর্বজাত ক্রোধ দুর্যোধনের ক্রোধের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। যৌবনবয়সে পরের পর দারিদ্র্যের আঘাত সহ্য করতে করতে দ্রোণের মতো মানুষ যখন মর্যাদা, ধন, সম্পত্তির তুঙ্গবিন্দুতে পৌঁছোন, তখন সেই পূর্বকৃত অপমান-বোধ আরও প্রখর হয়, আরও ক্ষুরধার হয়। আর সুযোগ পেলে—সুযোগটা এমনই যে দুর্যোধনের প্রতিহিংসা এবং প্রয়োজনের সঙ্গে কত সূক্ষ্মভাবে দ্রোণ মিশিয়ে দিতে পেরেছেন নিজের প্রতিহিংসা এবং প্রয়োজন, যাতে সুযোগ পেলে দ্রুপদকে

হত্যা করতে তাঁর এতটুকু হাত কাঁপে না অথবা হৃদয়ে রেখাপাত করে না বন্ধুত্বের শোণিতবিন্দু। এমন কঠিন মনস্তত্ত্ব বর্ণনা করতে মহাভারতের কবির বেধেছে, তাই কোনও বর্ণনা, কোনও করুণার স্পর্শ তিনি লাগতে দেননি পাঞ্চাল দ্রুপদের মৃত্যুতে।

শেষরজনীর আলোআঁধারি যুদ্ধে দ্রুপদ মারা গেলেন। প্রাতঃ সূর্যের প্রথম রক্তরাগ যখন দ্রুপদের রক্তের সঙ্গে মিশে গেল, তখন যুদ্ধ একটু থামল বটে, কিন্তু সূর্যের আলো প্রকট হতে আবারও আরম্ভ হল ভয়ংকর যুদ্ধ। দ্রুপদের জন্য শোক করারও সুযোগ পেলেন না পাণ্ডবরা, এমনকী পাঞ্চালকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নও। সকালে যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল তা একসময় দ্রোণ এবং অর্জুনের যুদ্ধ পর্যন্ত গড়াল এবং এ যুদ্ধ অর্জুনের গুরু-গৌরবে অথবা দ্রোণের শিষ্য-ভাবনায় প্রায় অমীমাংসিতই রইল। দ্রোণ আবারও পাঞ্চালদের নিয়ে পড়লেন—পাঞ্চালানাং ততো দ্রোণো'প্যকরোৎ কদনং মহৎ। দ্রোণ পাণ্ডবদের দিকে তাকিয়েও দেখলেন না আর। তাঁর দৃষ্টি এবং লক্ষ্য শুধুই পাঞ্চাল-নিধন।

সর্বত্র, যুদ্ধক্ষেত্রের সর্বত্র দ্রোণের শরবৃষ্টিতে শুধু পাঞ্চালরাই নিহত হচ্ছে। তাঁকে কেউ কোনওভাবে প্রতিরোধ করতে পারছে না। শিশিরের কাল চলে গেলে ঘরের চাল যেমন শুকনো খড়খড়ে হয়ে থাকে এবং তাতে আগুন লাগলে যেমন মুহূর্তে তা ভস্মীভূত হয়, দ্রোণের শরবর্ষণে পাঞ্চালদের অবস্থাও হল সেইরকম। পাণ্ডবরা রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলেন—পাণ্ডবান্ ভয়মাবিশৎ। দ্রোণ এমনই মেতে উঠেছিলেন এই নিধনযজ্ঞে যে, তাঁকে প্রতিরোধ করাটা অন্য কারও পক্ষে সম্ভবই হচ্ছিল না, আর যিনি এই প্রতিরোধ করতে পারতেন, সেই পাণ্ডব অর্জুন কোনও ভাবেই আগ বাড়িয়ে গিয়ে গুরুর সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না—ন চৈনম্ অর্জুনো জাতু প্রতিযুধ্যেত ধর্মবিৎ।

ফলে এই যুদ্ধে পাঞ্চালদের অসংখ্য ক্ষতি ছাড়া অন্য কোনও পৃথক ফল দেখা যাচ্ছিল না। পাণ্ডবরা ভাবছিলেন যে, এইভাবে যদি পাঞ্চাল-নিধন চলতে থাকে এবং বাড়তে থাকে দ্রোণের বিক্রম, তা হলে যুদ্ধ জয় তো দূরের কথা, পাণ্ডবপক্ষের সকলেই না এক সময় শেষ হয়ে যায়—ক্বচিদ্ দ্রোণঃ ন নঃ সর্বান্ ক্ষপয়েৎ পরমাস্ত্রবিৎ। দ্রোণের আক্রমণ আরও কঠিন, তীক্ষ্ণ এবং প্রায় সর্বনাশা হয়ে উঠলে পার্থসারথি কৃষ্ণ, যিনি পাণ্ডবদের সমস্ত ভালমন্দে বন্ধু এবং পরামর্শদাতা, তিনি অর্জুনকে বললেন—দেখো ভাই! যুদ্ধ করে এই মানুষটিকে শায়েস্তা করতে পারবে না—নৈব যুদ্ধেন সংগ্রামে জেতুং শক্যঃ কথঞ্চন। অতএব এই আচার্যই যেমন বলেছিলেন যে, কোনও বিষাদ-সংবাদে যদি তাঁকে অস্ত্রত্যাগ করানো যায়, তবেই এঁকে হত্যা করা যাবে।

হ্যাঁ, এ পর্যন্ত দ্রোণই বলে দিয়েছিলেন যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধারম্ভের মুহূর্তে। কিন্তু কী সেই কঠিন সংবাদ যা আচার্যের কানে দিলে তিনি অস্ত্রত্যাগ করবেন—এ ব্যাপারে কেউ ভাবেননি, যুধিষ্ঠির তো ননই, অর্জুন তো কখনওই নয়, যত বিপর্যয়ই ঘটুক তবু এই পরম প্রিয় আচার্যের মৃত্যু হোক—এ অর্জুন চান না। অথচ তাঁকে সত্যিই চিরশান্ত করা দরকার—এই বাস্তব পরিস্থিতি অন্য কেউ না বুঝলেও কৃষ্ণ বুঝেছেন। যার জন্য কথার পৃষ্ঠে কথার তাড়নায় সেই মৃত্যুর উপায় সৃষ্টি করতে দূরদর্শী কৃষ্ণের বাধেনি। কৃষ্ণ বলেছেন—দেখো অর্জুন! এখন যুদ্ধ জয়টাই সমূহ প্রয়োজন, ধর্মরক্ষা বা ন্যায়বিধিতে তা সম্ভব নয়, অতএব দরকার হলে অন্যায়ই করতে হবে—আস্থীয়তাং জয়ে যোগো ধর্মমুৎসৃজ্য পাণ্ডবাঃ। আমাদের মনে রাখতে হবে—দ্রোণ যেন আমাদের সবাইকে শেষ করে না ফেলেন। তা হলে আর যুদ্ধক্ষেত্রে আসা কেন?

সামান্য ভনিতা করেই আসল কথাটা পেড়ে ফেলেছেন কৃষ্ণ। তিনি বলেছেন—এঁকে তাঁর প্রিয় পুত্র অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদ দিতে হবে। কেউ গিয়ে তাঁর সামনে মিছিমিছিই এই কঠিন

সংবাদ শুনিয়ে আসুক—তং হতং সংযুগে কশ্চিদ্ অস্মৈ শংসতু মানবঃ। অন্যান্য রাজন্যবর্গ এবং পাঁচ পাণ্ডব ভাইদের সামনে যখন কৃষ্ণের প্রস্তাবটা পরিবেশিত হল, তখন নিজেদের বিপন্ন অবস্থা বুঝে সকলেই সেটা মেনে নিলেন। পাণ্ডব-পাঞ্চালদের এই বিপন্নতা যে অর্জুনও বোঝেন না, তা নয়। কিন্তু কৃষ্ণের এই বজ্রকঠিন অন্যায় পরামর্শ কিছুতেই তিনি মেনে নিতে পারলেন না—এতন্নারোচয়দ্ রাজন্ কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ। ন্যায়নিষ্ঠ যুধিষ্টির—তিনি নিজেই দ্রোণকে মৃত্যুর উপায় জিজ্ঞাসা করার সময় দ্রোণের কাছে ওইরকমই একটা উত্তর শুনেছিলেন বলে তাঁর শুধু এইটুকু মানসিক প্রস্তুতি ছিল যে—আচার্যকে কোনও দুঃসংবাদ দিয়ে অস্ত্রত্যাগ করাতে হবে। কিন্তু সেটা যে তাঁর পুত্র অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদ—এই প্রস্তাব তাঁকে মেনে নিতে হল খুব কষ্ট করেই—কৃচ্ছ্রেণ তু যুধিষ্ঠিরঃ। কষ্ট করে এইজন্য যে, অন্য কোনও দুঃসংবাদ সইবার মতো মানসিক দৃঢ়তা দ্রোণের আছে। অতএব অগত্যা—।

এই মিথ্যা সংবাদ দেবার মধ্যে সত্যের একটু প্রলেপ দেওয়া হল এবং সেটা হয়তো যুধিষ্ঠির অত বড় ডাহা মিথ্যেটা সইতে পারছিলেন না বলেই। ভীম একটা হাতিকে মেরে ফেললেন যার নাম ছিল অশ্বত্থামা। তারপর ভীম উদ্বাহু হয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে—দ্রোণ যাতে শুনতে পান—সেইভাবে বললেন—অশ্বত্থামা মারা গেছে। কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে দ্রোণের মনে একটা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হল বটে, তাঁর শরীরও খানিকটা ঠান্ডা হয়ে এল, কিন্তু ধৈর্য হারালেন না। প্রিয় পুত্রের অস্ত্রক্ষমতা এবং শক্তির কথা তাঁর মনে পড়ল এবং সভয়েই ভাবলেন—-খবরটা মিথ্যা—শঙ্কমানঃ স তন্মিথ্যা বীর্যজ্ঞঃ স্বসুতস্য বৈ। এই ভাবনা তাঁকে নতুন শক্তি যোগাল। ক্ষণিকের হারানো চেতনা ফিরে এল নতুন প্রাণশক্তি নিয়ে। তিনি ধেয়ে গেলেন পাঞ্চালকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে। ভাবলেন বুঝি—তাঁর পূর্বশত্রু পাঞ্চালরা ছাড়া এত বড় ক্ষতি তাঁর আর কেউ করতে পারে না।

দুর্দম্য প্রতিশোধস্পৃহায় তিনি আবারও পাঞ্চাল-হত্যায় মনোনিবেশ করলেন। ক্রোধ তাঁকে অন্ধ করে তুলল। যে অস্ত্র সাধারণ মনুষ্যের ওপর প্রয়োগ করতে তিনি বারংবার বারণ করেছিলেন অর্জুনকে, সেই ব্রহ্মাস্ত্র তিনি তুলে নিলেন হাতে। পাঞ্চালদের তিনি শেষ করে ছাড়বেন। তাঁদের জন্যই আজ তাঁর এই দুর্গতি। যৌবনে তিনি অপমানিত হয়েছেন, আর সারা জীবন ধরে তাঁকে কৌরবদের বৃত্তিভোগী হয়ে থাকতে হয়েছে। অপিচ সেই পরাধীনতা মাথায় নিয়েই আজ তাঁকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাণ্ডবদের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। অতএব ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে পাঞ্চালদের অবশেষটুকুও শেষ করে দিতে চান তিনি—বধায় তেষাং শূরাণাং পাঞ্চালানামমর্ষিতঃ।

অগণিত পাঞ্চালসৈন্য মারা গেল দ্রোণের হঠকারিতায়। তাঁর এই বিপরীত আচরণ দেখে যুদ্ধদর্শী সমবুদ্ধি ঋষিরা উপস্থিত হলেন দ্রোণের কাছে। তাঁরা নিজেদের ক্ষোভ চেপে রাখলেন না দ্রোণের কাছে, এবং অনুরোধ করলেন দ্রোণকে অস্ত্র ফেলে দেবার জন্য। ঋষিরা বললেন—যারা এই অস্ত্রের ক্ষমতা এবং শক্তি সম্বন্ধে অচেতন এবং কোনও ভাবেই যারা এই ভয়ংকর ব্রহ্মাস্ত্রের প্রতিরোধ জানে না, সেইসব সাধারণ সৈন্যের ওপর এই দিব্যাস্ত্রের প্রয়োগ অত্যন্ত অন্যায়। দ্রোণ তাই করেছেন—ব্রহ্মাস্ত্রেণ ত্বয়া দগ্ধা অনস্ত্রজ্ঞা নরা ভুবি।

ঋষিদের তিরস্কারবচন শুনে দ্রোণ শান্ত হলেন। পরিত্যাগ করলেন সমস্ত অস্ত্র। কিন্তু শারীরিকভাবে শান্ত হলেই তো আর সব সময় মানসিক শান্তি আসে না। বরঞ্চ অন্য কর্মে ব্যস্ততার অভাবে সেই পূর্ব সন্দেহ জোরদার হয়ে উঠল আবার—অশ্বত্থামা বেঁচে আছে তো—অহতং বা হতং বেতি। দ্রোণের মনে হল—আর যেই হোক, যুধিষ্ঠির কখনও মিথ্যে কথা বলবে না, তিন ভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্যের প্রলোভন দেখালেও যুধিষ্ঠির মিথ্যা কথা বলবে না। দ্রোণ অতএব যুধিষ্ঠিরকেই সংকেত করলেন কাছে আসবার জন্য। দ্রোণের আকারইঙ্গিত

দেখেই মহামতি কৃষ্ণ ততক্ষণে বুঝে ফেলেছেন দ্রোণের মতিগতি, ভাবনা। যুধিষ্ঠিরকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন—দেখো দাদা! দ্রোণাচার্য যদি আর আধবেলা এই ক্রোধ-রক্ত ভঙ্গিতে যুদ্ধ চালিয়ে যান—যদি অর্ধদিবসং দ্রোণো যুধ্যতে মন্যুমাস্থিতঃ—তা হলে কেউ আর বেঁচে থাকবে না। এখন শুধু আপনিই আছেন, যিনি আমাদের সকলকে এই মৃত্যুর মতো বিপদ থেকে ত্রাণ করতে পারেন।

কৃষ্ণ জানতেন যে, যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা বলতে বললেই তিনি বলবেন না, তাঁকে বোঝাতে হবে দার্শনিকভাবে। কৃষ্ণ বললেন—দেখুন কখনও কখনও সত্যের চেয়ে মিথ্যা ভাষণই মঙ্গল ঘটায়। এখানে মিথ্যা বললে এতগুলো লোক বাঁচবে। আপনি একটা মিথ্যা উচ্চারণ করলে যদি এতগুলি মানুষের জীবন বাঁচে, তো সে মিথ্যা স্পর্শ করে না বক্তাকে—অনৃতং জীবিতস্যার্থে বদন্ন স্পৃশ্যতে'নৃতৈঃ। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কথার ফাঁকে মধ্যম পাণ্ডব ভীম ঢুকে পড়লেন হঠাৎ করে। তিনি বললেন—এই তো আমি অশ্বত্থামা নামে একটা হাতিকে মেরে আচার্যের সামনে চেঁচিয়ে বললাম—অশ্বত্থামা মারা গেছে, আপনি যুদ্ধ থেকে বিরত হোন। কিন্তু তিনি আমার কথা বিশ্বাস করেননি। ভীম এবার সানুরোধে বললেন—তোমাকে সকলেই সত্যবাদী বলে জানে, তুমি অশ্বত্থামার মৃত্যু সংবাদ দাও দ্রোণকে।

কৃষ্ণের উপরোধ, ভীমের অনুরোধ এবং সবার ওপরে পাণ্ডবপক্ষীয় পাঞ্চাল সেনাদের দুর্গতি অবস্থা দেখে মনে মনে অসত্য-বিধ্বস্ত যুধিষ্ঠির দ্রোণের সামনে উচ্চারণ করলেন অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদ, সঙ্গে নীচ অব্যক্ত স্বরে বললেন—হাতি কিন্তু। সে শব্দ প্রবেশ করল না দ্রোণের কর্ণপুটে। সত্যভাষী যুধিষ্ঠিরের মুখে প্রিয় পুত্র অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লেন আপন জীবনের প্রতি। ঋষিদের কথায় আগেই তিনি অস্ত্রত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মুখে অশ্বত্থামার মৃত্যুর কথা শুনে পঁচাশি বছরের বৃদ্ধ একেবারেই ভেঙে পড়লেন। তাঁর শরীরে আর যুদ্ধ করবার শক্তি রইল না যেন—পুত্রব্যসনসন্তপ্তো নিরাশো জীবিতে'ভবৎ।

দ্রোণাচার্যের এহেন নির্জীব অবস্থা দেখে পাঞ্চাল ধৃষ্টদ্যুম্ন তৎপর হয়ে উঠলেন। তিনি জানতেন যে, তাঁরই হাতে দ্রোণাচার্যের মৃত্যু। তিনি হাতে তুললেন ধনুঃশর এবং বাণবর্ষণ করতে আরম্ভ করলেন দ্রোণের ওপর। জীবনে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে উঠলেও আত্মরক্ষার এমন এক স্বাভাবিক প্রবণতা মানুষের থাকে যে, মৃত্যু যদি একান্ত অভীষ্টও হয়, অথবা নিশ্চিত, তা হলেও মানুষ শারীরিক আঘাত রোধ করার চেষ্টা করে। সেই যে গল্প শুনেছি—এক বৃদ্ধ জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে রাতের অন্ধকার নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল। এদিকে তার হাতে একটি লণ্ঠন। একজন পথচারী তাকে জিজ্ঞাসা করল—কোথায় চললেন ঠাকুর? বৃদ্ধ বললেন—আত্মহত্যা করতে! পথচারী অবাক হয়ে বলল—তা, হাতে লণ্ঠন কেন? বৃদ্ধ বললেন—যদি আবার অন্ধকারে সাপখোপ বেরোয়, তাই।

এই গল্পের মর্ম হাসিতে নয়। মৃত্যু অভীষ্ট হলেও চিরাভ্যস্ত আত্মরক্ষার প্রবণতা কীভাবে নিজের অজান্তেই কাজ করতে থাকে, এ গল্প তারই উদাহরণ। পুত্রের জন্য শোকসন্তপ্ত হয়ে জীবনে নিরাশ হয়ে উঠেছিলেন দ্রোণ। কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্ন যখন তাঁর ওপরে অস্ত্রবৃষ্টি আরম্ভ করলেন, তখন দ্রোণও থেমে থাকলেন না। আবারও অস্ত্র হাতে নিয়ে তিনি যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। অস্ত্রের বিনিময় চলতে লাগল এবং এতটাই ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রতিরুদ্ধ করে রাখতে সমর্থ হলেন তিনি যে, ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁকে সোজাসুজি হত্যা করতে সমর্থ হলেন না। একটা সময় এল, যখন ওই শোকাচ্ছন্ন অবস্থাতেও তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনুকটি কেটে ফেলে দিলেন।

মধ্যম পাণ্ডব ভীমকে এই সময় দুই ধনুর্ধরের কাছাকাছি আসতে দেখা গেল। ভীম মহাবলবান এবং প্রকৃতিতে রুক্ষ এবং কঠিন। কোনও কথাও তাঁর মুখে আটকায় না। ছিন্নধনু

ধৃষ্টদ্যুম্নের বিহ্বল অবস্থায় চিন্তিত হয়ে ভীম এসে আচার্যের রথখানিকেই জাপটে ধরলেন। রণভূমিতে দ্রোণের রথ চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। ভীম এবার নির্লজ্জভাবে কথা শুনিয়ে আচার্যকে বললেন—যাঁরা ব্রাহ্মণের যজন-যাজন-অধ্যাপনায় শিক্ষিত হয়েও ব্রাহ্মণের আচরণ করেন না, নিজের পরম্পরাগত ব্রাহ্মণ্যবৃত্তিতেও যাঁরা কোনও দিন সন্তুষ্ট হননি, এবং ধ্বজাধারী, নামে-বামুন লোকগুলো যদি অন্তত যুদ্ধ না করে এমনিই বসে থাকত, তা হলে অন্তত এই পরিমাণ ক্ষত্রিয় নিধন হত না—ন স্ম ক্ষত্রং ক্ষয়ং ব্রজেৎ।

কথাটার মধ্যে অসম্মানও আছে, সম্মানও আছে। অসম্মান এইখানে যে, ভীম দ্রোণকে স্বকর্মত্যাগী, ব্রাহ্মণ্যের বৃত্তিত্যাগী বলে উপহাস করলেন। আর সম্মান এইখানে যে, যজ্ঞযাজী বামুন আজ ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি গ্রহণ করে সমস্ত ক্ষত্রিয়ের মহাকাল হয়ে উঠেছেন। ভীমের সম্মান-আচরণ অবশ্য বেশিক্ষণ থাকল না। বললেন—কাদের এতদিন ধরে মেরেছেন আপনি? সাধারণ সৈন্য। দুটো পয়সার জন্য যেসব ম্লেচ্ছ, কিরাত যুদ্ধ করতে এসেছে, সৈন্যদলে যোগ দিতে এসেছে, তাদের এবং অবশ্যই পাঞ্চালদের অনেককে মেরেছেন আপনি। কেন মেরেছেন, তাও জানি। অজ্ঞান বোধশূন্য ব্যক্তির মতো এবং তা মেরেছেন নিজের পুত্র পরিবার ভরণপোষণের জন্য, ধনের জন্য—আজ্ঞানান্‌মূঢ়বদ্‌ ব্রহ্মন্‌ পুত্রদার ধনেপ্সয়া। আপনার লজ্জা হওয়া উচিত যে, শুধুমাত্র নিজের ভবিষ্যৎ ভাল রাখার জন্য আপনি অন্যায়ভাবে এতগুলি সাধারণ সৈন্য বধ করে গেলেন—একস্যার্থে বহূন্‌ হত্বা পুত্রস্যাধর্মবিদ্যয়া।

কথাগুলির মধ্যে মর্মান্তিক খোঁচা ছিল দ্রোণের প্রতি। দ্রোণ দুর্যোধনের বৃত্তিভোগী আপাতত। পুত্র-পরিবার ভরণপোষণের জন্যই তিনি কুরুবাড়িতে প্রথম এসেছিলেন, এবং পুত্র-পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই তিনি কুরুবাড়িতে গেছেন এবং তাঁদের মন্ত্রীও হয়েছেন একসময়। তারপর তিনি যে এই যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দিয়েছেন, তাতেও তো এই প্রমাণই হয় যে, এখনও তাঁর ঐশ্বর্যের আকাঙ্ক্ষা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে স্ত্রীকে অক্লেশে রাখার। পুত্রকে প্রতিষ্ঠিত দেখার।

কী করে বোঝাবেন দ্রোণ। কথাটা যে সত্যও বটে অসত্যও বটে। যখন তিনি পাঞ্চাল দ্রুপদের কাছে অপমানিত হয়ে কুরুবাড়িতে এসেছিলেন তখন তো সত্যি বৃত্তিরই প্রয়োজন ছিল তাঁর। ব্রাহ্মণের সমাজে তিনি যে পরিত্যক্ত হয়েছিলেন একসময়। পুত্রের মুখে সামান্য দুধ তুলে দেবার জন্য একটি দুগ্ধবতী গাভীও যে তিনি পাননি। তাঁর দোষ কী ছিল, ব্রাহ্মণের যজনযাজন, অধ্যয়ন অধ্যাপনা তাঁর ভাল লাগত না—শুধু এই দোষে তিনি ব্রাত্য হয়ে গেলেন। ভীম এসব বুঝবেন কী করে? আবার ভীমের কথাও যে সত্যিও বটে খানিকটা। ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি গ্রহণ করেও তিনি তো কুরুবাড়িতে ব্রাহ্মণের সম্মানই পেয়েছেন এবং তাঁর মন্ত্রিত্বও জুটেছে হয়তো সেই মর্যাদাতেই। কিন্তু অসত্যটা যেখানে, সেটা ভীমের মতো অসংবেদনশীল মানুষের বোধগম্য নয় একটুও। নিজের ক্ষমতায় দ্রুপদকে অপমানিত করে তিনি তো অর্ধেক পাঞ্চাল পেয়েই গিয়েছিলেন। তখন তো পুত্র-পরিবার পোষণের অসুবিধে ছিল না। কিন্তু যেতে যে পারেননি, সে তো এই কুরুবাড়ির প্রতি মায়ায়, আর সম্ভবত বৃদ্ধ ভীষ্মের উপরোধে। তিনি স্বোপার্জিত বৃত্তি দ্রোণকে দান করে রেখে দিয়েছিলেন কুরুবাড়িতে এবং সেই জন্যই কুরুদের হিত চিন্তার ক্ষেত্রে সব সময় ভীষ্মের সঙ্গে একত্রে উচ্চারিত হয়েছে তাঁর নাম।

কিন্তু মনের গভীরের এইসব জটিলতা তিনি শুষ্কবুদ্ধি ভীমকে বোঝাবেন কী করে? বিশেষত ভীষ্মের শরশয্যা-শয়নের পরে এসব কথা আজ তাঁকে বড় পীড়িত করছে, অবলুপ্ত করে দিচ্ছে জীবনধারণের অবশিষ্ট অভিলাষ। ভীম তো থামেন না, প্রবল জয়াভিলাষদিদ্ধ ক্ষত্রিয়ের নীচ নির্লজ্জ তাড়না তাঁর মুখের আগল ভেঙে দেয়। তিনি নির্লজ্জভাবে আবার সেই

অসত্য উচ্চারণ করেন,—আরে, কার জন্য আর বাঁচতে চান আপনি। যার জন্য এমন ধনুকবাণ হাতে ধরে যুদ্ধ করছেন, যার জন্য বাঁচতে চাইছেন এ জীবনে, সেই তো মরে গেছে। বললাম, তবু বিশ্বাস হল না—স চাদ্য পতিতঃ শেতে পৃষ্ঠেনাবেদিতস্তব। অন্তত যুধিষ্ঠিরের কথায় তো বিশ্বাস করুন।

যুধিষ্ঠির নিজে তাঁর জীবনের একতম মিথ্যা কথা বলে কোথায় গিয়ে লুকিয়েছেন কে জানে? কিন্তু ভীম ঠিক চালিয়ে যাচ্ছেন। নির্লজ্জ নীচতর বশংবদ রাজশক্তি এমনই নির্মোহ হয়। দ্রোণাচার্য আর সহ্য করতে পারলেন না। এই নিয়ে তিনবার তাঁর সামনে উচ্চারিত হল সেই কঠিন প্রাণঘাতী শব্দরাশি—যার জন্য তিনি বেঁচে আছেন, সেই অশ্বত্থামা মারা গেছে। একমুহূর্তের মধ্যে দ্রোণ রথের ওপর নামিয়ে রাখলেন অস্ত্রশস্ত্রের ভার, তূণীর, জৈত্র ধনুকবাণ—যা তাঁর শত শত শিষ্যকে পরমাস্ত্রে শিক্ষিত করেছে। অস্ত্রত্যাগ করার মুহূর্তেও তিনি তাঁর অধিনায়কের কর্তব্য বিস্মৃত হলেন না। সেনাপতির কর্মভার অন্য কারও ওপরে ন্যস্ত করার আশায় সেই বিশাল যুদ্ধনাদী রণক্ষেত্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন—কর্ণ! কোথায় আছ তুমি কর্ণ! কৃপ! তুমি শুনতে পাচ্ছ। বৎস দুর্যোধন! আমি এই অস্ত্রত্যাগ করে সেনাপতির ভারমুক্ত হলাম। বার বার এ কথা বলছি, শুনতে পাচ্ছ তো? তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাও—সংগ্রামে ক্রিয়তাং যত্নে ব্রবীম্যেষ পুনঃ পুনঃ। কর্তব্য এবং কর্তব্যের বোধেই কর্ণ-কৃপ-দুর্যোধনের উদ্দেশে এই সংবাদ রেখে গেলেন দ্রোণ। আর পাণ্ডব ভাইরা—যাঁদের মধ্যে তাঁর পুত্রাধিক প্রিয়তম শিষ্য অর্জুন আছেন, যাঁদেরকে তিনি ন্যায়পক্ষ বলে মনে করেন, তাঁদের উদ্দেশে বললেন—মঙ্গল হোক তোমাদের, অস্ত্র ত্যাগ করলাম আমি।

সমস্ত কর্তব্য-শব্দ উচ্চারিত হবার পরে দ্রোণের মুখ দিয়ে হাহাকার ধ্বনির মতো দুটি শব্দ হৃদয় থেকে বেরিয়ে এল—অশ্বত্থামা! অশ্বত্থামা আমার—ইতি তত্র মহারাজ প্রাক্রোশদ্ দ্রৌণিমেব চ। যে পুত্রের মুখে সামান্য দুগ্ধ তুলে দেবার জন্য পাঞ্চালের চিরাবাস ছেড়ে পরবাসে কুরুদের আশ্রয়ে এসেছিলেন দ্রোণ, সেই পুত্রের মৃত্যুসংবাদ যখন পরম সত্যের মতো ঘনিয়ে এল জীবনে, তখন তাঁর উদ্দেশে দুটি শব্দে স্নেহাঞ্জলি উচ্চারণ করা ছাড়া আর কীই বা করতে পারতেন দ্রোণ। তিনি বুঝতে পারছিলেন, তাঁর মৃত্যুকাল উপস্থিত।

ক্ষত্রিয়ের সমস্ত রজোবৃত্তি নিরস্ত করে এখন তিনি শান্ত সমাহিত। ব্রাহ্মণের চিরাভ্যস্ত যোগ-ধ্যান-প্রাণায়াম তাঁরও পূর্বায়ত্ত ছিল। যোগ-প্রাণায়ামে সমস্ত জাগতিক চিত্তবৃত্তির নিরোধ ঘটে। দ্রোণ সেই যোগনিরুদ্ধ অবস্থায় সমাহিতের মতো বসে থাকলেন রথের ওপরে—অভয়ং সর্বভূতানাং প্রদদৌ যোগমীয়িবান। যুদ্ধজয়ের দিক দিয়ে দেখলে এই তো বিবৃত ছিদ্র। পাঞ্চাল ধৃষ্টদ্যুম্ন এরই অপেক্ষায় ছিলেন এতদিন। তিনি খড়্গ হাতে লাফিয়ে পড়লেন রথ থেকে। সমস্ত সাধারণ মানুষ হাহাকার করে উঠল। যুদ্ধেরও তো একটা নিয়ম আছে। শান্ত সমাহিত নিরস্ত্র যোগাচ্ছন্ন পুরুষ—যিনি ক্ষণিক আগে ধৃষ্টদ্যুম্নের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন—তাঁকে এখন এইভাবে সদর্পে লাফিয়ে আসতে দেখে সাধারণ যুদ্ধদর্শী মানুষেরা ধিক ধিক করতে লাগলেন—হাহাকারং ভূশং চক্রুরহো ধিগিতি চাব্রুবন্।

অস্ত্রত্যাগী দ্রোণ তখনও সমাহিত। তিনি যোগজ ভাবনায় মনের মধ্যে আধান করার চেষ্টা করছেন পুরাণ-পুরুষ বিষ্ণুকে—সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ—সর্বব্যাপ্ত, সর্বময়, জ্যোতিঃস্বরূপ সেই পুরুষ—পুরাণং পুরুষং বিষ্ণুং জগাম মনসা পরম্। এই অসাধারণ মুহূর্তেও দ্রোণের পূর্বাগত এবং পরম্পরাপ্রাপ্ত দৈবসিদ্ধির বিশেষত্বটুকু বলতে ভুল করেননি মহাভারতের কবি। যাঁরা দর্শনের ইতিহাস নিয়ে বিবেচনা করেন, তাঁরা কী বলবেন জানি না, তবে দ্রোণের দিনশেষের এই পারম্য ভাবনা ব্যাস যেভাবে প্রকাশ করেছেন, তাতে মনে হয়—বৈদান্তিক, ব্রহ্মভাবনা, অথবা বেদান্ত দর্শনের মোক্ষভাবনার চেয়েও পুরাতন সাধন বোধ হয় সাংখ্য-যোগ। বৈদান্তিক ব্রহ্মের অতল গভীর দার্শনিক কাঠিন্যের চাইতে জীবনের ক্ষেত্রে

আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ইত্যাদি ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি এবং সেই দুঃখ নিবারণের জন্য যোগ ধারণ—এইগুলিই বোধ হয় অতি প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যের স্বভাবসিদ্ধ ছিল। নইলে কী আশ্চর্য —পরম ব্রহ্মের জ্যোতিঃস্বরূপ অদ্বৈত-ভাবনা—যা নাকি পরবর্তী সাহিত্যে সিদ্ধমৃত্যুর লক্ষণ হয়ে গেছে—মহাভারতের কবি দ্রোণের ক্ষেত্রে তার আভাসমাত্র দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর মূল বক্তব্য অন্য। তিনি বললেন—সমস্ত অস্ত্র ত্যাগ করে দ্রোণ পরম সাংখ্যে আহিত হলেন এবং নিজেকে ধারণ করলেন যোগের দ্বারা—তথোক্ত্বা যোগমাস্থায়...পরমং সাংখ্যমাস্থিতঃ। আর এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বৈদিক বিষ্ণুর অক্ষর স্বরূপ—তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। ভাবে বুঝি —বেদান্তের চেয়েও সাংখ্য-যোগের দার্শনিক প্রস্থান বোধ হয় আরও পুরাতন।

যাই হোক, এতসব দর্শনতত্ত্বের আলোচনার অবসর এটা নয়—আমরা দ্রোণকে এখন দেখছি—তাঁর মুখটি সামান্য উঁচু করা—মুখং কিঞ্চিৎ সমুন্নাম্য—চক্ষু নিমীলিত, দুটি হাত বুকের ওপর, তাঁর সত্ত্বোদ্রিক্ত হৃদয়ে জ্যোতিঃস্বরূপ অক্ষরপুরুষের ভাবনা জেগে উঠল। মৃদুস্বরে নিনাদিত হল ওঙ্কার শব্দ—ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম জ্যোতির্ভূতো মহাতপাঃ। দ্রোণের প্রাণজ্যোতি উৎক্রান্ত হল আকাশে। সাংখ্য-যোগের সাধনেপায়ে এমন ব্রহ্ম নিলয় সাধ্যকে আত্মগত করা—এ বুঝি এক দ্রোণের পক্ষেই সম্ভব, আর তা বর্ণনা করা সম্ভব ব্যাসের পক্ষেই—সাংখ্য, যোগ এবং বেদান্তকে যিনি একাকার করে দিয়েছেন দ্রোণের মৃত্যুতে।

যোগের দ্বারা যাঁর প্রাণজ্যোতিঃ উৎক্রান্ত হল, সেই দ্রোণের স্থূল শরীরের দিকে ধৃষ্টদ্যুম্নের নজর পড়ল এবার। তিনি এগিয়ে গেলেন খড়্গ-তরবারি হাতে নিয়ে। সমস্ত সাধারণের ধিক্কারের মধ্যে দিয়ে এগোতেও তাঁর লজ্জা হল না। লজ্জা হল না দ্রোণের প্রাণহীন নিশ্চল স্থূল শরীর থেকে তরবারির আঘাতে বৃদ্ধ অবসন্ন মস্তকটি কেটে ফেলার উদ্যোগে। দূর থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন অর্জুন। যোগারূঢ় আচার্যকে এতক্ষণ তিনি দেখছিলেন, ভাবছিলেন তাঁর পরমা বিভূতির কথা। হঠাৎ ধৃষ্টদ্যুম্নকে ওইভাবে তরবারি হাতে আসতে দেখে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—মেরো না, মেরো না যেন, তুমি আচার্যকে জীবন্ত ধরে আনতে পার তো আনো। কিন্তু মেরো না যেন আচার্যকে। তাঁর কথা শুনে সাধারণ সৈনিকেরাও একইভাবে চেঁচাতে লাগল। এতক্ষণ ধরে মার খেলেও তারা আচার্য দ্রোণের মর্যাদা জানে—ন হন্তব্যো ন হন্তব্য ইতি তে সৈনিকাশ্চ হ।

কিন্তু এই মর্যাদার কোনও মূল্য নেই ধৃষ্টদ্যুম্নের কাছে। তিনি রথের কাছে পৌঁছোতেই তাঁর দিকে নিষেধাত্মক ভঙ্গীতে ধেয়ে চললেন অর্জুন। কিন্তু অর্জুন এবং অন্যান্য রাজাদের নিষেধাত্মক চিৎকার অগ্রাহ্য করে নিশিত তরবারির এক কোপে দ্রোণের মাথা কেটে ফেললেন ধৃষ্টদ্যুম্ন। তখন কী তাঁর গৌরব, কী দর্প, কী অভিমান! যিনি বেঁচে থাকতে তাঁর বৃদ্ধপলিত কেশের অগ্রটুকুও স্পর্শ করতে পারেননি, আজ তিনি সেই পলিত-শ্যাম মস্তকটি আকাশে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সাবজ্ঞে ফেলে দিলেন কৌরবদের মাঝখানে—তাবকানাং মহেম্বাসঃ প্রমুখে তৎ সমাক্ষিপৎ। এমন একজন অধিনায়কের মৃত্যুতে সমস্ত কৌরব সৈন্যই শুধু নয়, যুদ্ধে নিরস্ত হল সকলে কুরু পাণ্ডব পাঞ্চাল সকলে—হতে দ্রোণে নিরুৎসাহা কুরু পাণ্ডব সৃঞ্জয়াঃ।

দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর রেশ বহু দূর পর্যন্ত গড়িয়েছে; একেবারে কুরুক্ষেত্রের শেষ যুদ্ধ পর্যন্ত দ্রোণাচার্য ভর করে ছিলেন কুরু পাণ্ডবদের ওপর। প্রথমত দ্রোণের মৃত্যুর পর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা যখন নিদারুণ ক্রোধে পাণ্ডব পক্ষের দিকে ধেয়ে এলেন, তখনও নিদারুণ শোকে মগ্ন হয়ে রয়েছেন অর্জুন। তাঁকে জানানোও হল যে, অশ্বত্থামা ক্রোধাগ্নি-রুষিত হয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধের প্রতিজ্ঞা নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আসছেন। স্বয়ং যুধিষ্ঠিরই এ কথা সভয়ে জানালেন অর্জুনকে। কিন্তু অর্জুনের প্রতিক্রিয়া হল একেবারেই নেতিবাচক। দ্রোণের মৃত্যু, বিশেষত ধৃষ্টদ্যুম্নের ওই নৃশংস আচরণ কিছুতেই তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না।

আর সত্যিই তো, কী করেছেন ধৃষ্টদ্যুম্ন! মহাভারতের কবি কী অদ্ভুত উপায়ে প্রকট করে দিয়েছেন তাঁর অন্তঃসারশূন্য আচরণ। বুঝিয়ে দিয়েছেন—অনেক নাম-ডাকের বাজনা বাজিয়ে এক এক জন মানুষ এইরকমই উচ্চচূড় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়, অথচ তার কর্মক্ষমতা নেই, প্রতিভা নেই, শক্তি নেই। মহাভারতের কবি দ্রুপদের যজ্ঞের কথায় ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম-সজ্জা বর্ণনা করেছেন। পাঞ্চাল দ্রুপদের গৌরবে পাণ্ডবপক্ষের সেনাপতিও নিযুক্ত হয়েছেন ধৃষ্টদ্যুম্ন। অথচ সম্পূর্ণ ভীষ্মপর্ব এবং দ্রোণপর্ব জুড়ে তাঁকে এমন একটি কঠিন শত্রুও মারতে দেখিনি, যা পাণ্ডবদের কাছে স্পৃহনীয় ছিল। দ্রোণাচার্যকে তিনি মারলেন বটে, কিন্তু সে প্রায় নিমিত্তের মতো; যজ্ঞাগ্নির অমোঘ পবিত্রতা হয়তো রক্ষা পেল তাতে, কিন্তু মহাভারতের কবি প্রকট করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, এত বাজনা আর নাম-ডাক নিয়ে যাঁরা অধিনায়কের আসনে বসেন, তাঁদের দ্বারা কাজের কাজ তো হয়ই না, যা হয়, তা অপকর্ম। ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই অপকর্ম করেছেন, আর দ্রোণশিষ্য অর্জুন তা সইবেন কী করে? তিনি যে অস্ত্রজ্ঞ, তিনি যে মর্যাদা বোঝেন।

অর্জুন খুব রাগ করে যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন—আসুক এবার অশ্বত্থামা। যে নাকি আমার আচার্যের চুলের মুঠি ধরে অপমান করেছে—গুরুং মে যত্র পাঞ্চাল্যঃ কেশপক্ষে পরামৃশৎ—তাকে ক্ষমা করবে না অশ্বত্থামা। অর্জুন ক্ষোভে দুঃখে যুধিষ্ঠিরকেও গালাগালি দিয়েছেন কম না। বলেছেন—আপনি অমন করে মিথ্যাচারণ করলেন কী করে? এখন আপনি গিয়ে রক্ষা করুন ধৃষ্টদ্যুম্নকে। তা ছাড়া আমি অত করে চেঁচিয়ে বারণ করলাম ধৃষ্টদ্যুম্নকে সে আমার কথাটা কানেই নিল না—অপাকীর্য্য স্বয়ং ধর্মং শিষ্যেণ নিহতো গুরুঃ। রাগে ক্ষোভে অর্জুনের চোখে জল এসে গেল। স্মরণের পথ ধরে মনে এল সুখস্মৃতি কত।

অর্জুন বললেন—তিনি আমাকে ভালবাসতেন পিতার মতো। শৈশবে আমি পিতাকে হারিয়েছি, অতএব ধর্মতও তিনি ছিলেন আমার পিতা। সেই পিতৃকল্প বৃদ্ধকে সামান্য রাজ্যের জন্য বধ করেছি আমরা। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অনেক দোষ থাকতে পারে, কিন্তু তিনি ভীষ্ম এবং দ্রোণের ওপর যথেষ্ট বিশ্বাস রেখেছেন, তাঁর রাজ্যের ভালমন্দও তাঁদের ওপরেই ন্যস্ত ছিল। আর আমার কথা যদি বলি, তবে বলতে হবে—তিনি তাঁর পুত্র এবং শিষ্যের মধ্যে আমাকেই বেশি ভালবেসেছিলেন—অবৃণীত সদা পুত্রান্ মামাভ্যধিকং গুরুঃ। সেই গুরুকে আমরা মেরেছি, আমাদের আর বেঁচে থাকার মানে হয় না।

অর্জুনের মনোবেদনা যুধিষ্ঠিরের মতো মহাপ্রাণ সংবেদনশীল মানুষ অবশ্যই বুঝতে পারেন এবং পারেন বলেই অর্জুনের কথার একটা জবাবও তিনি দেননি। কিন্তু ভীম অর্জুনের এই বিলাপ শুনে বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারেননি। তিনি পালটা গালাগালি দিয়েছেন অর্জুনকে। কৌরবদের চিরকালীন অপমানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেছেন—যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি যখন কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করতে এসেছেন, তখন তাঁকে বধ করাই আমাদের ধর্ম। এরজন্য তুমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে অপমান করতে পারো না। সুযোগ বুঝে ভীমের পিছন পিছন ধৃষ্টদ্যুম্নও গলা বাড়িয়েছেন। অজুহাত সৃষ্টি করেছেন দ্রোণকে হত্যা করার। সমস্ত রাজন্যবর্গের সামনে অর্জুন ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীম সাত্যকি—তাঁরা নিজেদের মধ্যেই ঝগড়াঝাটি করতে আরম্ভ করলেন দ্রোণাচার্যকে নিয়ে। মহাভারতের কবি বুঝিয়ে দিলেন—একজন সার্থক শিক্ষকের মর্যাদা কতখানি। শুধু নিজের পক্ষে নিজের ঘরে নয়, শত্রুপুরীর হৃদয়ের মধ্যেও তিনি নির্বাধে বিচরণ করেন।

দ্রোণাচার্য নিজের কারণে পাঞ্চালদের শত্রুপক্ষে পরিণত করেছিলেন। সেই শত্রুতা মিশে গিয়েছিল কুরুদের সাধারণ পাঞ্চাল-বিরোধিতার সঙ্গে। কিন্তু তাঁর যখন মৃত্যু হল, সেই মৃত্যুর রেশ শুধুমাত্র পাঞ্চাল-নিধনেই শেষ হল না। যুদ্ধের শেষ পর্বে দুর্যোধনও যখন মৃত্যুর

দিন গুনছেন, তখন অশ্বত্থামা পাঞ্চাল-শেষ ধৃষ্টদ্যুম্নকে তো মেরেই ছিলেন, আরও মেরে ফেলেছিলেন পাণ্ডবদের ঔরসে পাঞ্চালীর গর্ভজাত পঞ্চ পুত্রকে। অর্থাৎ পাঞ্চালী দ্রৌপদীর মাধ্যমে যদি বা পঞ্চাল দেশের রক্তধারা কুরু দেশে কিছু বইত, তাও স্তব্ধ হয়ে গেল দ্রোণমৃত্যুর প্রতিশোধস্পৃহায়।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ কৌরব পাণ্ডবের জ্ঞাতিযুদ্ধ বলে সর্বত্র চিহ্নিত, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত মতে এই মহাযুদ্ধে দ্রোণের কারণতা কিছু কম নয়। কিন্তু বিপদ হল—প্রথম জীবনে দ্রোণাচার্যের স্বার্থ-প্রণোদনা কিছু থাকলেও কুরুবাড়ির আন্তর রাজনীতিতে জড়িয়ে যাবার পর দ্রোণাচার্য পুরোপুরি আপন স্বার্থে চালিত হননি। কিন্তু ঘটনার গতি রুদ্ধ করার ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। অগত্যা যুদ্ধ যখন লাগল—তখন হয়তো শুধু বৃত্তিভোগের কারণেই নয়, দ্রুপদ-বিরোধিতার পূর্ব কারণবশতও তিনি কৌরবপক্ষেই থেকে গেছেন। পাঞ্চালদের ধ্বংস করে পূর্বের ক্রোধও তিনি প্রশমন করেছেন কিছুটা। কিন্তু লক্ষ করে দেখুন, যুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাণ্ডব ভাইদের তিনি স্পর্শও করেননি। যুধিষ্ঠিরকে ধরব বলে কথা দিয়েও ধরেননি, ভীমকে হাতের নাগালে পেয়েও কিছু করেননি। আর অর্জুন! তাঁর কথা সারা জীবন ধরে তারস্বরে গাইতে গাইতে সারা জীবন ধরেই দুর্যোধনের লাঞ্ছনা লাভ করে গেলেন। আসলে অর্জুনের মধ্যেই দ্রোণাচার্য নিজেকে দেখতে পেয়েছিলেন। আচার্য হিসেবে তাই শত অপমান লাঞ্ছনা ভোগ করেও উপযুক্ত শিষ্যের মধ্যে নিজেকে রেখে যাওয়ার উপভোগটুকু ত্যাগ করতে পারেননি দ্রোণ।

কৃপাচার্য

অন্ধকার রাত্রিতে কিছুক্ষণ আগেই পাণ্ডবদের বিজয়োল্লাসও স্তব্ধ হয়ে গেছে। দীর্ঘ যুদ্ধশ্রমে পাঞ্চাল-যুবরাজ ধৃষ্টদ্যুম্ন ঘুমে অচেতন হয়ে আছেন আপন শিবিরে। ঘুমিয়ে আছেন পাণ্ডবদের পাঁচ পুত্র—দ্রৌপদীর গর্ভজাত। এইরকম ঘুমন্ত অবস্থায় রাতের অন্ধকারে অশ্বত্থামা পাণ্ডবদের শিবিরে ঢুকে ধৃষ্টদ্যুম্নকে লাথি মেরে জাগিয়ে হত্যা করলেন। হত্যা করলেন নিরীহ অপ্রস্তুত প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শতানীক—ইত্যাদি দ্রৌপদেয় পাণ্ডবদের। ভীত ত্রস্ত পাণ্ডবশিবিরের অন্যান্য অবশিষ্টরা চিৎকার করতে করতে শিবিরের বাইরে বেরোতে চাইলেন প্রাণে বাঁচতে, শুধু প্রাণে বাঁচতে—শিবিরান্নিষ্পতন্তি স্ম ক্ষত্রিয়া ভয়পীড়িতাঃ। ঠিক এই অবস্থায় এক-একজন শিবিরের বাইরে বেরোচ্ছেন, আর তাঁদের প্রত্যেকের গলা কাটা যাচ্ছে শিবিরের দরজার দুই দিকে দাঁড়ানো কৃতবর্মা এবং কৃপাচার্যের হাতে—কৃতবর্মা কৃপশ্চৈব দ্বারদেশে নিজঘ্নতুঃ।

এইসব নিরীহ ক্ষত্রিয় যোদ্ধা—যারা কেউ কৌরবপক্ষের কারও চিহ্নিত শত্রু নয়, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে বলে যারা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে ছিল, তারা শুধু বেঘোরে প্রাণ দিল এই কারণে যে, তারা পাণ্ডবপক্ষের সৈনিক। এবং তাদের মারা হল কোন অবস্থায়? তখনকার দিনে অস্ত্রপাতের নিয়ম মহাভারতে, মনুতে যেমনটি আছে, তাতে নিদ্রিত, সুপ্তজনকে মারাটা যেমন বীর যোদ্ধার নীতি-বিরোধী, তেমনই যে প্রাণ হাতে নিয়ে পালাচ্ছে, তার ওপরে অস্ত্র প্রয়োগ করাটাও ছিল যুদ্ধনীতির প্রবল বিরুদ্ধ কর্ম। অথচ অশ্বত্থামা ঘুমন্ত পাণ্ডবপুত্রদের এবং ধৃষ্টদ্যুম্নকে মেরে ফেললেন বিনা দ্বিধায়। তবু তাঁর এই প্রতিহিংসার কারণ আমরা সমান-হৃদয়তায় বুঝতে পারি। পাঞ্চাল যুবরাজ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর পিতা দ্রোণাচার্যকে নিরস্ত্র এবং প্রায় ধ্যানস্থ অবস্থায় বধ করেছিলেন। কিন্তু কৃপাচার্যের কী আক্রোশ ছিল পাণ্ডবদের ওপর? দুর্যোধনের প্ররোচনায় অশ্বত্থামা যে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিরস্ত্র অবস্থায় মেরেছিলেন, তারও আক্রোশটুকু আমরা বুঝতে পারি। অপমান, প্রত্যপমান, হিংসা-প্রতিহিংসার একটা বৃত্ত সেখানে আবর্তিত হয়েছে। কিন্তু কোনও যুক্তি দিয়েই যে আমরা কৃপাচার্যের কর্মটুকু বুঝতে পারি না।

সন্ধ্যা থেকে রাত্রি হতে যতটুকু সময় লাগে, তারমধ্যেই কত বড় একটা পার্থক্য হয়ে গেল। এই সন্ধ্যার আগেই ভীমের গদাঘাতে ভগ্ন-ঊরু দুর্যোধনের পতন ঘটেছে। এখনও প্রাণ আছে তাঁর দেহে এবং প্রাণ আছে বলেই তাঁর প্রতিহিংসাবৃত্তি তখনও নিবৃত্ত হয়নি। সেই প্রতিহিংসা সংক্রামিত হয়েছিল গুরুপুত্র অশ্বত্থামার মধ্যে—যিনি পিতৃবধের প্রতিশোধ নেবার জন্য অদ্ভুত এবং অবীরোচিত এক পরিকল্পনা নিয়েছিলেন।

এতে অবাক হবার কিছু নেই, কেননা শত্রুবধের জন্য অনেক অন্যায়ই ক্ষত্রিয়রা করে থাকেন এবং সেরকম অন্যায় পাণ্ডবরাও করেছেন, কৌরবরাও করেছেন। কিন্তু এই অন্যায়-সংঘটনার মধ্যে কাকে দেখছি আমরা? কৃপাচার্য, যিনি চিরকাল ন্যায়পক্ষে কথা বলেছেন, চিরকাল যিনি বঞ্চিত পাণ্ডবদের হিতচিন্তা করে গেছেন, সেই কৃপাচার্যকে আমরা অন্ধকার রাত্রিতে যে অদ্ভুত অন্যায়ের মধ্যে শামিল হতে দেখলাম, তাতে মনুষ্যচরিত্রের বিচিত্র একটি দিক আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

রাজবাড়ির ভেতরটায় এ-রকম থাকে। একান্নবর্তী বড় পরিবারেও এরকম হত। এক-একটা বাড়িতে দু-তিনটি বুড়ো মানুষ, গুরুঠাকুর পুরোহিত, ছোট স্কুলের মাস্টারমশাই, বড় কাকা, মেজ, ছোট, ন কাকা, দাসদাসী পুরনো চাকর, কোচোয়ান—সবকিছু মিলে এক বিরাট সংসার। লক্ষ করলে দেখে থাকবেন—এই সব বড় বড় সংসারে এক-এক জনের মূল্য এবং ওজন এক এক রকম। মানুষ তো সকলে একরকম হন না, একই সংসারে সমান ব্যক্তিত্বপূর্ণ, সমান ধুরন্ধর, সমান সম্মানিত পুরুষ তো বেশি হয় না। বিশেষ একটি

রাজপরিবারে যদি দু-তিনটি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব থাকেন, তবে দু-একটি ব্যক্তিত্ব চাপা পড়ে যায়।

এরমধ্যে আরও একটি গুরুতর ব্যাপার আছে, সেটা হল রাজবাড়ির অন্ন। রাজবাড়ির অন্নভোজী ব্যক্তিদের মনস্তত্ত্ব বহু বহু ঘটনা এবং দানাদানের মধ্য দিয়ে স্থিতিশীলতা লাভ করে। মহাভারতের কৌরববাড়িতে দ্রোণাচার্যও ধৃতরাষ্ট্রের অন্নভোজী পুরুষ। কিন্তু তিনি যেহেতু তাঁর অস্ত্রশিক্ষার ভাণ্ডার কুরুবাড়ির সকল রাজকুমারদের জন্য উজাড় করে দিয়েছিলেন, তাই প্রতিদানের মাপকাঠিতে তাঁর ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটেছে অনেক বেশি। অন্যদিকে কৃপাচার্য কিন্তু কুরুবাড়িতে দ্রোণাচার্যেরও অনেক আগে থেকে অবস্থিত, কিন্তু তিনি যেহেতু চিরকাল দ্রোণাচার্যের উপগ্রহবৃত্তি করে গেলেন, তাই ব্যক্তিত্বের মাত্রাটা সীমিত হয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় কথা, ব্যক্তিত্ব কম হলে সে ব্যক্তি সমকালীন ঘটনার দ্বারা এতটাই প্রভাবিত হন যে, পদে পদে তিনি দ্বিধাদ্বন্দ্বে আকীর্ণ হতে থাকেন। বিশেষত তিনি যদি উপগ্রহবৃত্তিতে এক প্রধান ব্যক্তিত্বের ছায়ানুসারে চলতে থাকেন, তবে গ্রহস্বরূপ প্রধান ব্যক্তিত্বের অবর্তমানে তিনি অন্য কোনও প্রধান ব্যক্তিত্বের ছায়াতেই চলতে থাকেন। তিনি নিজে আর স্বনির্ভর হয়ে চলতে পারেন না। কৃপাচার্যের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। দ্রোণাচার্য বেঁচে থাকতে তিনি প্রায় সদাসর্বদা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার ব্যক্তিত্ব এড়াতে পারলেন না। অশ্বত্থামার কথা মানতে গিয়ে তিনি এমন একটা কাজ করে বসলেন, যা তাঁর সুপরিচিত অমরত্বকেও সকলঙ্ক করে তুলল।

তবে এই যে কৃপাচার্যের ব্যক্তিত্বহীনতা, এটা এক দিনে তৈরি হয়নি। কৃপাচার্যের জন্ম থেকে আরম্ভ করে সমস্ত জীবন ধরে যত ঘটনা ঘটেছে এবং সেইসব ঘটনায় যাঁরা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের ব্যক্তিত্ব এতই বেশি যে, তাঁদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে কৃপের পক্ষে নিজস্ব স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভবই হয়নি। সেখানে কীভাবেই বা তিনি আর নিজেকে প্রকটিত করতে পারতেন! নইলে দেখুন জন্মের ব্যাপারে তাঁর অবস্থাটা বিখ্যাত দ্রোণাচার্যের থেকে কিছু অন্যরকম নয়। কিন্তু জন্মের পরে দ্রোণ যতটুকু পিতার সাহচর্য পেয়েছিলেন, কৃপ তা পাননি। জন্মলগ্নেই তিনি পরের ঘরে, পরান্নপ্রতিপালিত। সহজেই অন্ন জুটে যাবার ফলে জীবনে কোনও লড়াই ছিল না তাঁর, ছিল না কোনও জ্বালাও। কিন্তু দ্রোণাচার্যের জ্বালা ছিল, দারিদ্র্যের পীড়ন তাঁকে বিবাহ-পরবর্তী সময়েও তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। জীবনযন্ত্রণা এবং জীবনের সঙ্গে লড়াই ব্যাপারটাই শেষ পর্যন্ত দ্রোণাচার্যের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়েছে। কিন্তু কৃপাচার্যের জীবনে পরান্নের সুখ, মর্যাদা এবং শান্তি তাঁকে চিরকাল দ্রোণাচার্যের অন্তরালবর্তী করে রেখেছে। এই নির্মোক থেকে তিনি কোনও দিন বেরোতে পারেনওনি, বেরোতে চাননি এবং বোধ হয় বেরোনোর মতো কারণও তিনি তাঁর বুদ্ধিমতো খুঁজে পাননি।

কৃপাচার্যের জন্মের মধ্যে সামাজিকতার স্বভাবসিদ্ধি ছিল না। বংশমর্যাদার দিক থেকে বিচার করলে কৃপাচার্যের পিতৃপরিচয় কিছু কম ছিল না এবং পিতার শাস্ত্রীয় তথা শস্ত্রীয়—দুয়েরই উত্তরাধিকার তিনি পেয়েছিলেন। তবু কৃপাচার্য অন্যান্য কুরুবৃদ্ধদের চেয়ে হীন রয়ে গেলেন। এর কারণ তাঁর জন্মলগ্ন এবং তাঁর প্রতিপালনের জগৎ। নইলে ভাবুন, জগন্মান্য মহর্ষি গৌতম তাঁর পিতামহ, সে কি কম কথা হল! গৌতমের পুত্র হলেন শরদ্বান্। শোনা যায়—ধনুকের প্রধান সহায় ‘শর’ সঙ্গে নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন অথবা বলা যায়—ছোটবেলা থেকেই ধনুকবাণই তাঁর সবচেয়ে বড় বন্ধু ছিল বলেই তাঁর নাম ছিল শরদ্বান্—জাতঃ শরবরৈর্বিভো। সেকালের ব্রাহ্মণদের স্বভাব অনুযায়ী বেদাদি শাস্ত্রে তাঁর আবেশ ছিল না, যেমনটি ছিল ক্ষত্রিয়ের ব্যবহার্য অস্ত্রশস্ত্রে। ব্রহ্মচারী অবস্থায় অন্যান্য ব্রাহ্মণবালকেরা যখন বেদবিদ্যা অধিগত করে ফেলল, সেই সময়ের মধ্যে শরদ্বান্ ধনুর্বিদ্যা শিখে ফেললেন চমৎকারভাবে—তথা স তপসোপেতঃ সর্বাণ্যস্ত্রান্যবাপ হ।

ঋষি-ব্রাহ্মণের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও শরদ্বান্ যে ধনুর্বিদ্যায় মন দিলেন তার দুটো কারণ থাকতে পারে। এক, ব্রাহ্মণের কুলোচিত অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন-যাজনের থেকে ক্ষত্রিয়ের সাধ্য অস্ত্রবিদ্যা তাঁর কাছে বেশি 'চ্যালেঞ্জিং' এবং বেশি ভাল লেগেছিল। আর দ্বিতীয় কারণটা দ্রোণাচার্যের সঙ্গে মেলে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যবৃত্তিতে জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ঐহিকলাভ তেমন ছিল না, প্রতিযোগিতাও সেখানে অনেক বেশি; সেখানে সুশিক্ষিত অস্ত্রবিদ্যার শেষে অর্থলাভের কোনও ঝুঁকি ছিল না। অতএব শরদ্বান্ এমনভাবেই অস্ত্রশিক্ষার তপস্যায় নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন যে, স্বর্গের দেবরাজও তাঁর তপস্যায় শঙ্কিত হলেন—বুঝি বা ভবিষ্যতে তাঁর ইন্দ্রত্বও চলে যাবে, চলে যাবে স্বর্গের নিরঙ্কুশ রাজত্ব। চিন্তিত দেবরাজ জানপদী নামে এক অপ্সরাকে গৌতম শরদ্বানের কাছে পাঠালেন তাঁর তপস্যার বিঘ্ন করার জন্য—ততে জানপদীং নাম দেবকন্যাং সুরেশ্বরঃ।

'দেবকন্যা' বা 'অপ্সরা' শব্দটার মধ্যে যতই স্বর্গের মাহাত্ম্য লুকোনো থাকুক, অপ্সরা আসলে স্বর্গবেশ্যা। তবে এক্ষেত্রে 'জানপদী' নামটি দেখে আমাদের আরও সন্দেহ হয় যে, সে তেমন উত্তমা প্রকৃতির কোনও স্বর্গসুন্দরীও নয়। উর্বশী, মেনকা, রম্ভার মতো এর কোনও বিশ্রুত নামও নেই, সে জানপদী। অর্থাৎ যেখানে শরদ্বান্ তপস্যা করছিলেন অথবা ধনুর্বাণের অভ্যাসে নিরন্তর যেখানে তিনি নিযুক্ত ছিলেন, সেই জনপদেরই কোনও বিলোভিনী রমণী হবে এই জানপদী। দেবরাজ তাকেই খুঁজে বের করেছেন জনপদ থেকে এবং তাকে পাঠিয়েছেন শরদ্বানকে প্রলুব্ধ করার জন্য—প্রাহিণোৎ তপসো বিঘ্নং কুরু তস্যেতি কৌরব।

দেবরাজের পরামর্শে জানপদী সেই রমণী শরদ্বানের নির্জন আশ্রমে উপস্থিত হয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা আরম্ভ করল। তার পরিধানে সুসূক্ষ্ম বসন। যদিও সেইকালে রমণীর অধমাঙ্গ এবং উত্তমাঙ্গের আবরণ হিসেবে দুটি পৃথক বসনের ব্যবহার চালু ছিল। কিন্তু প্রলুব্ধ করাই যার উদ্দেশ্য, সেই জানপদী রমণী উত্তমাঙ্গ মুক্ত করে একটিমাত্র বসন পরিধান করেই ঋষি শরদ্বাকে আকর্ষণ করতে আরম্ভ করল—তাম্ একবসনাং দৃষ্ট্বা গৌতমো'স্পরসং বনে। দেবরাজ-প্রেরিত এই রমণী জানপদী হলে কী হবে, তার উদ্ভিন্ন অঙ্গসংস্থান এতই মনোহর যে, শরদ্বান্ যদিও তখন ধনুকবাণ হাতে নিয়েই তাঁর অভ্যস্ত বিদ্যা পুনরভ্যাস করছিলেন, তবু উত্তমাঙ্গের বসনমুক্ত একবসনা এই সুন্দরীর অঙ্গলাবণ্য দেখে একেবারে বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন—লোকে'প্রতিমসংস্থানাং প্রোৎফুল্লনয়নো'ভবৎ। এই প্রলুব্ধতা, এই দুর্নিবার আকর্ষণে কখন যে শরদ্বানের হাত থেকে তাঁর প্রিয় ধনুকবাণটি নিঃসাড়ে খসে পড়ল, তা তিনি নিজেও জানতে পারলেন না—ধনুশ্চ হি শরাস্তস্য করাভ্যাম্ অপতন্ ভুবি। সাময়িক প্রফুল্লতায় তাঁর শরীরটিও কেঁপে উঠল এবং সেটাও তিনি বুঝতে পারলেন না বোধ হয়।

খুব তাড়াতাড়িই অবশ্য চেতনা লাভ করলেন শরদ্বান্। নিরন্তর অভ্যাস-তপস্যায় যিনি ধনুর্বেদের চরম লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছেন, তিনি ক্ষণিক বিচলিত হলেও পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানগরিমায় এবং তপস্যার শক্তিতে নিজেকে সংযত করলেন। তাঁর হস্তস্খলিত ধনুঃশর যেমন পড়েছিল, তেমনই পড়ে রইল, পড়ে রইল অদূরেই তাঁর গায়ের চাদর, কৃষ্ণাজিন। সব ফেলে রেখে তিনি জানপদী রমণী এবং আশ্রম দুইই ত্যাগ করে চলে গেলেন অন্যত্র। কিন্তু ওই যে ক্ষণিকের তরেও তাঁর শরীরের যে বিকার দেখা দিয়েছিল, ক্ষণিকের তরে তাঁর শরীরটি যে কেঁপে উঠছিল, তাতেই তাঁর শরীরান্তঃস্থিত তেজোবিন্দু নির্গত হয়ে পতিত হয়েছিল একটি শরস্তম্বের ওপর। শরস্তম্বের ওপর পতিত সেই তেজোবিন্দু দ্বিধা হয়ে যায় এবং তার থেকেই জন্মায় এক মিথুন—একটি যমজ ভাইবোন। জানপদী অপ্সরার প্রলোভন থেকে মুক্ত হবার তাড়ায় তিনি এও বুঝতে পারলেন না যে, তিনি মুহূর্তের জন্য হলেও

স্খলিত হয়েছেন—জগাম রেতস্তৎ তস্য শরস্তম্বে পপাত চ।

‘শর’ মানে এক ধরনের ঘাস, যাকে আমরা কুশ বলি, আর ‘শরস্তম্ব’ কুশের গুচ্ছ, যেখানে প্রচুর কুশের গাছ ছিল। বস্তুত ‘শরস্তম্ব’ কথাটা আমাদের কাছে এক ধরনের মহাকাব্যকল্প। দেবসেনাপতি কার্তিক শরবনে জন্মেছিলেন, ওদেশে মোজেস শরবনে পরিত্যক্ত হয়েছিলেন, শরদ্বানের তেজও শরস্তম্বে পতিত হল। মহাকাব্যের কবি কোনওভাবে বোঝাতে চান—জানপদী রমণীর সঙ্গে শরদ্বানের শারীরিক কোনও মিলন হয়নি যেন, শুধু কামলুব্ধ ব্রাহ্মণের মুগ্ধ তেজ অতিক্রান্ত হয়েছিল অজ্ঞাতসারে এবং যেন সেই মহাসত্ত্ব ব্যক্তির বীজটুকুই বড় কথা, সেই বীজের এমনই প্রভাব যা মাতৃগর্ভের আধার ছাড়াই সন্তানের জন্ম দেয়।

আমাদের বাস্তববোধে এই বক্তব্য তাই মহাকাব্যকল্প। আমরা মনে করি—আপন অন্তরের কোনও তাড়না ছাড়াই শুধুমাত্র সাময়িক এবং দৈহিক তাড়নায় শরদ্বান্ অবশ্যই এই জানপদী রমণীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর মন এবং বুদ্ধি নিরন্তর তাঁকে বাধা দিচ্ছিল, তবুও যতই তিনি অবিচল থাকুন, শারীরিক বিধান অনুসারেই তাঁর শরীর কেঁপে উঠেছিল, তাঁর অনিচ্ছারূপ অজ্ঞানের মধ্য দিয়েই তাঁর তেজোবিন্দু প্রবেশ করেছিল জানপদীর শরীরে এবং ঠিক এমন ঘটনার পরেই তো মুহূর্তেই চৈতন্য ফিরে আসে। অতএব মানসিক অনিচ্ছার প্রাবল্যেই শরদ্বান্ আপন তেজ অনুৎস্পৃষ্ট ভেবেই মুহূর্তের মধ্যে তিনি জানপদী রমণীকেও ত্যাগ করে গেছেন। ত্যাগ করেছেন আশ্রমও। মহাভারতের কবি মন্তব্য করেছেন—জানপদীর প্রলুব্ধতায় তাঁর শরীরে যে বিকার দেখা গিয়েছিল, তাতেই তাঁর তেজ নির্গত হয়েছিল, যদিও সম্পন্ন-চৈতন্য মুনি নিজস্ব তর্কেই শুধু ভেবেছেন যে, তাঁর বীজ নিঃসৃষ্ট হয়নি—তেন সুস্রাব রেতো’স্য স চ তন্নাববুধ্যত।

আমরা মনে করি—জানপদীর গর্ভেই শরদ্বানের নিঃসৃষ্ট বীজ থেকে তাঁর যমজ পুত্রকন্যা জন্মেছে, এবং জানপদী বেশ্যার যেহেতু এখানে কোনও মায়া ছিল না, তাই দেবকার্য সম্পন্ন হতেই সে তার গর্ভমুক্ত পুত্রকন্যাদুটিকে কুশতৃণের অন্তরালে ফেলে রেখে প্রস্থান করেছে। শরস্তম্ব ব্রাহ্মণ্য যাগযজ্ঞের প্রধান উপকরণ, শরস্তম্বের ওপর পুত্রকন্যাকে পরিত্যাগ করে জানপদী বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে, ব্রাহ্মণের অভীপ্সিত সন্তানকে ব্রাহ্মণ্যের প্রতীক শরস্তম্বের কাছেই সে রেখে গেল। কুশের আঘাতে দ্বিধাভূত তেজোবিন্দু থেকে একটি যমজ সন্তানের জন্মরহস্য এখানেই। হয়তো জানপদী তার মৌহূর্তিক কামবলি শরদ্বানের ধনুকবাণ আর কৃষ্ণসার মৃগের আবরণ-চর্মটুকু সাজিয়ে দিয়ে গিয়েছিল তাঁর পরিত্যক্ত শিশু পুত্রকন্যার পাশে। হয়তো ওইটুকু মায়া তার অন্তরে ছিল।

এদিকে হস্তিনাপুরের রাজা প্রাতিপেয় শান্তনু বনের মধ্যে মৃগয়া করতে বেরিয়েছিলেন অল্পসংখ্যক পাত্রমিত্র সঙ্গে নিয়ে। এই পাত্রমিত্রের মধ্যে রাজরক্ষী সৈন্যও যেমন কিছু থাকত, তেমনই থাকত সেনাচর। মৃগয়ার সময় যেসব লোক নিশ্চুপে গিয়ে অরণ্যভূমিতে পশুর অবস্থান এবং তাদের গতিবিধি তথা সংখ্যা দেখে এসে রাজাকে খবর দিত, তারাই হল সেনাচর। এইরকমই একটি সেনাচর অরণ্যে পশু দেখতে গিয়ে দেখল দু-দুটি শিশু অরক্ষিত অবস্থায় কুশঘাসের মধ্যে পড়ে আছে। শরদ্বানের ফেলে যাওয়া ধনুকবাণ এবং ব্রাহ্মণের ব্যবহার্য কৃষ্ণাজিন দেখে সেনাচর ব্যক্তি অনুমান করল—শিশুদুটি নিশ্চয়ই কোনও ব্রাহ্মণের সন্তান এবং সে ব্রাহ্মণ অবশ্যই ধনুকবাণের রসিক—জ্ঞাত্বা দ্বিজস্য চাপত্যে ধনুর্বেদান্তগস্য চ।

বুদ্ধিমান সেনাচর পুরুষটি সেই পরিত্যক্ত ধনুঃশর এবং অজিন-আবরণখানি সংগ্রহ করে শিশুদুটিকে কোলে তুলে নিল। তারপর মহারাজ শান্তনুর কাছে এসে সবকিছুই দেখলি

সেনাচর। অনুমান করি, মহারাজ শান্তনুর সঙ্গে তখনও গঙ্গার দেখা হয়নি, অথবা দেখা হয়ে থাকলেও গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম তখনও গঙ্গার তত্ত্বাবধানেই ছিলেন; অর্থাৎ গঙ্গা তখনও কুমার দেবব্রতকে পিতা শান্তনুর হাতে তুলে দেননি। ফলে শান্তনুর পিতৃহৃদয় তখনও অননুভূত বাৎসল্যে বিদীর্ণ ছিল। দ্বিতীয় অনুমানই যথোচিত মনে হয়। কেননা সমস্ত মহাভারতের মধ্যে বিভিন্ন ইঙ্গিত থেকে কখনও মনে হয় না—দ্রোণ, কৃপ—এঁরা কেউ পিতামহ ভীষ্মের চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। অতএব একবার পুত্রমুখ দেখেও যে মহারাজ পুত্রকে কাছে পাননি, সেই মহারাজ শান্তনু সেনাচরের কোলে দুটি শিশু দেখেই তাদের পরম করুণায় নিজের কোলে তুলে নিয়েছেন—স তদাদায় মিথুনং রাজা চ কৃপয়ান্বিতঃ। শুধু তাই নয়, সেই মুহূর্তেই মৃগয়ার সমস্ত কৌতূহল নিবারণ করে তিনি রাজধানীতে ফিরলেন এবং কেউ প্রশ্ন করলেই বলতে লাগলেন—এরা আমারই ছেলেমেয়ে—আজগাম গৃহানেব মম পুত্রাবিতি ব্রুবন্।

মহারাজ শান্তনু পরম আদরে নিজের বাৎসল্যরসেই শিশুদুটিকে মানুষ করতে লাগলেন। তখনকার দিনে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মালে জাতকর্ম থেকে যেসব সংস্কার প্রাপ্য হত, মহারাজ শান্তনু তাঁর পুত্রপ্রতিম বালকটিকে সেইসব সংস্কারকর্ম থেকে বঞ্চিত করেননি। শিশুদুটিকে তিনিই যেহেতু নিজের পিতৃরচিত মায়ায় (কৃপা) বড় করে তুলেছিলেন—কৃপয়া যন্ময়া বালাবিমৌ সম্বর্ধিতাবিতি—সেই জন্য তিনি তাদের নামও রাখলেন কৃপ এবং কৃপী—সার্থক নাম, শান্তনুর কৃপা বা মায়াই কৃপের নামকরণের মধ্যে অন্বর্থক হয়ে উঠল। কিছুদিনের মধ্যেই নামগোত্রহীন কৃপ ধনুর্বেদে এবং অন্যান্য অস্ত্রচালনায় অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। পিতার বীজ কীভাবেই না কাজ করে! ব্রাহ্মণ হয়েও তাঁর পিতা শরদ্বান্ যেভাবে আপন আনন্দে ধনুর্বিদ্যা শিখেছিলেন, কিন্তু কৃপ—তিনি ব্রাহ্মণ, না ক্ষত্রিয়, বৈশ্য না শূদ্র—কেউ তা এখনও জানে না, তবু পিতার অন্তর্গত মানসিক গতি কীভাবে যেন তাঁকেও একই পথে প্রবৃত্ত করল।

কৃপের জাতি-গোত্র অবশ্য কিছুকালের মধ্যেই জানা গেল। মহাভারত বলেছে—গৌতম শরদ্বান্ ধ্যানযোগে জানতে পারলেন যে, তাঁর দুটি পুত্রকন্যা মহারাজ শান্তনুর রাজবাড়িতে মানুষ হচ্ছে—গোপিতৌ গৌতমস্তত্র তপসা সমবিন্দত। আমার ধারণা—এই ধ্যানটুকু চর্মাসনে বসে ঈশ্বর-প্রণিধানের মতো কিছু নয়। বৃহৎসত্ত্ব মানুষ যে কাজটুকু করে ফেলেন, তারমধ্যে যদি অন্যায়ের লেশ থাকে, স্খলন থাকে, ত্রুটি থাকে, তবে সেটা তাঁকে ভাবায়। অন্তরের অন্তঃস্থলে পূর্বকৃত দোষ বা দোষাভাস বার বার ফিরে আসে এবং মিলিয়ে যায়। মিলিয়ে যাবার জন্য দেরি হয়, কিন্তু বারম্বারোত্থিত দোষাভাস একবার তাঁকে প্রবৃত্ত করে ত্রুটিমুক্ত হবার জন্য। এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটাকেই আমি ধ্যান বলি। এই ধ্যান কৃতপূর্ব কর্মের ভাবনা। শরদ্বান্ বুঝেছেন—জানপদী রমণীর সঙ্গে তাঁর ক্ষণিক মিলনের ফলশ্রুতি কিছু ঘটেছেই। হয়তো নিরন্তর ধনুর্বেদের সাধন-তপস্যার মধ্যে জানপদীর সঙ্গে তাঁর মিলন যে ব্যাঘাতটুকু ঘটিয়েছিল, তাতে তিনি সাময়িক অনুতাপ, নিস্পৃহতা, এবং আত্মধিক্কারে পলায়নে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু সময়ের গতি এবং নিরন্তর অনুধ্যানে তিনি বুঝেছিলেন যে, পূর্বের সেই মিলন এখন যতই অনীপ্সিত লাগুক, কিন্তু মিলনের সেই ক্ষণটুকু মিথ্যে নয়। তার ফলশ্রুতি ঘটেছেই এবং কোনও না কোনওভাবে তাঁর কাছে খবর এসেছে যে, মহারাজ শান্তনু সেই পূর্বমিলনের স্থানেই দুটি শিশুকে পেয়েছেন এবং তাদের তিনি মানুষও করছেন।

গৌতম শরদ্বান্ শেষ পর্যন্ত হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে এসে শান্তনুর সঙ্গে দেখা করে সমস্ত ঘটনা জানালেন। জানালেন যে, কৃপা-করুণায় যাঁকে তিনি মানুষ করেছেন এবং কৃপ বলে যাঁর নামকরণ করেছেন, তিনি অজ্ঞাতকুলশীল নন। মহর্ষি গৌতমের গোত্রে তাঁর জন্ম এবং তিনি তাঁরই ছেলে গৌতম শারদ্বত। শরদ্বানের কৃতজ্ঞতাবোধ যথেষ্ট। একবারের তরেও তিনি শান্তনুর কাছে ছেলে ফেরত চাইলেন না। শান্তনু তাঁর আত্মজ পুত্রকন্যাকে মানুষ করেছেন, বাৎসল্য দিয়েছেন, অতএব সেই বাৎসল্যের বাঁধন থেকে মুক্ত করে তিনি

মহারাজ শান্তনুকেও পীড়িত করলেন না, অন্যদিকে রাজগৃহে অভ্যস্ত পুত্রকে আরণ্যক আশ্রমে নিয়ে গিয়েও তাঁর সুখভঙ্গ করলেন না শরদ্বান্। কিন্তু বীজপ্রদ পিতা হিসেবে যে কাজটি তিনি করলেন, সেটিই শরদ্বানের উপযুক্ত ছিল। অস্ত্রচালনায় পুত্রের মতিগতি দেখে শরদ্বান্ ঠিক করলেন তাঁর ধনুর্বেদের স্বাধীত গূঢ় তত্ত্বগুলি কৃপকে শিখিয়ে যাবেন। মহারাজ শান্তনুর অনুমতি নিয়ে বেশ কিছু দিন সময় নিয়ে শরদ্বান্ তাঁর গূঢ় অস্ত্রনৈপুণ্যগুলি কৃপকে শিখিয়ে দিয়ে গেলেন।

কিছু সময়ের মধ্যেই কৃপ অস্ত্রবিদ্যায় পরম নৈপুণ্য লাভ করলেন এবং নিঃসন্দেহে একজন অস্ত্রগুরু হবার উপযুক্ত হয়ে উঠলেন—সো'চিরেণৈব কালেন পরমাচার্যতাং গতঃ। এরপর হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে বহু পরিবর্তন ঘটে গেছে। মহারাজ শান্তনু মারা গেছেন এবং বিচিত্রবীর্য তাঁর সিংহাসনে বসেছেন। আমরা জানি বিচিত্রবীর্য রাজা হলেও তাঁর রাজ্যের শাসনসংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারেই ভাবনাচিন্তা করতে হত ভীষ্মকে। শাসনের ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটালেও ভীষ্ম কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও পিতৃপালিত কৃপাচার্যের সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন তোলেননি। বয়সে কৃপ হয়তো ভীষ্মের চেয়ে একটু ছোটই ছিলেন, কিন্তু কৌরবগৃহের অন্ন-প্রতিপালিত এই মানুষটির প্রতি ভীষ্ম যেমন কখনও অনাদর প্রকাশ করেননি, তেমনই তাঁর বৈমাত্রেয় বিচিত্রবীর্যও কোনওদিন কৃপকে আচার্য ছাড়া আর কিছু ভাবেননি।

নামে আচার্য হলেও কৃপাচার্যের খুব একটা কাজ ছিল না প্রথমদিকে। এমনকী বিচিত্রবীর্যের অকালপ্রয়াণের পর ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডু এবং বিদুরদের অস্ত্রশিক্ষার ভারও কৃপাচার্যকে নিতে হয়নি। সে কাজটা ভীষ্ম স্বয়ংই করেছেন, পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রগুলিকে অসীম মমতায় মানুষ করেছিলেন বলে অস্ত্রশিক্ষার ভারটুকুও ভীষ্ম কারও হাতে ছাড়েননি। তবে এই সময়টার মধ্যেই কৃপের জীবনে কতগুলি ঘটনা ঘটে গেছে। মনে থাকার কথা যে, কৃপের সঙ্গে তাঁর যমজা ভগ্নী কৃপীও এসেছিলেন হস্তিনাপুরে মহারাজ শান্তনুর সমাদরে। কিন্তু কৃপীর যে কী হল, কবে অথবা কেমন করে তিনি বড় হলেন, হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে তিনি কোথায় কাদের সঙ্গে অন্তঃপুরবাসিনী হয়েছিলেন, তার কোনও খবর মহাভারতের কবি দেননি। মহাভারতের প্রমাণে আমরা শুধু এইটুকু জানি যে, গুরুকুলের ব্রহ্মচর্য্যকাল অতীত হলে পাঞ্চাল দ্রুপদ ওদিকে সিংহাসন পেলেন আর আচার্য দ্রোণ কঠিন তপস্যা আরম্ভ করলেন পিতৃবিয়োগের পর। পিতা ভরদ্বাজ পূর্বেই দ্রোণকে বিবাহ করতে বলেছিলেন, কিন্তু তপস্যার কারণে এই বিবাহ বিলম্বিত হল। কিন্তু বিবাহ করা যখন তিনি মনস্থ করলেন তখন হস্তিনাপুরে অবস্থিত কৃপাচার্যের ভগিনী কৃপীর সঙ্গেই তাঁর বিবাহ হল—শারদ্বতীং ততো ভার্য্যাং কৃপীং দ্রোণো'ন্ববিন্দত।

কীভাবে পাঞ্চালনিবাসী দ্রোণের সঙ্গে হস্তিনার অন্তঃপুরনিবাসিনী কৃপীর যোগাযোগ হল, মহাভারতের কবি সে খবর দেননি। তবে আমার ধারণা, গৌতম শরদ্বান্ তাঁর পূর্বজাত পুত্রকন্যার মায়ায় হস্তিনাপুরে এসে শান্তনুর বাড়িতে থেকে যখন প্রিয়পুত্রের অস্ত্রশিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন, সেই সময় এই কন্যাটিকে পাত্রস্থ করার কথাও তিনি ভেবেছিলেন। হয়তো এ বাবদে বৈবাহিক কথাবার্তা হয়েছিল কৃপীর পিতা শরদ্বান্ এবং দ্রোণের পিতা ভরদ্বাজের মধ্যেই। কেননা মহাভারতে দেখেছি—দ্রোণপিতা ভরদ্বাজ স্বর্গত হবার পরেও এই কথা বলা হচ্ছে যে, অতঃপর পিতার দ্বারা নিযুক্ত হয়ে দ্রোণাচার্য শারদ্বতী কৃপীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলেন—ততঃ পিতৃনিযুক্তাত্মা পুত্রলোভান্মহাযশাঃ। তার মানে, ভরদ্বাজের সঙ্গে কথা হয়েই ছিল, তাই পিতৃবিয়োগের পর দ্রোণের যখন ইচ্ছা হল তখন তিনি পিতার ইচ্ছার প্রতি মর্যাদা দিয়েই শারদ্বতী কৃপীকে বিয়ে করেছিলেন।

যে কথায় কথাটা এল। কৃপীর সঙ্গে দ্রোণের বিয়েটা যে ঠিক কোন সময় হল, তা ঠিক বোঝা যায় না বটে, তবে দ্রোণাচার্যের জীবনী থেকে আন্দাজ করি যে, পাঞ্চাল দ্রুপদের

সঙ্গে সেই অপমানজনক সাক্ষাৎকারের অনেক আগেই দ্রোণের সঙ্গে কৃপীর বিবাহ হয়ে গিয়েছিল; কেননা ওই সাক্ষাৎকারের আগেই অশ্বত্থামা জন্মে গেছেন এবং তিনি তখন যথেষ্টই সাবালক। যাই হোক, আপন ভগিনীকে সুপাত্রস্থ করার কাজটুকু কৃপের পিতাই করে যাওয়ায় কৃপাচার্য কুরুবাড়িতে নিশ্চিন্ত আয়েসেই দিন কাটাচ্ছিলেন বলে মনে করি।

কিন্তু এই আয়েস এবং নিশ্চিন্ততার মধ্যে সেই শুভসংবাদটুকু আমরা পাইনি, যাতে বোঝা যায় যুবক কৃপের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। ভীষ্ম তার নিজস্ব কারণে বিবাহ করেননি, কিন্তু তার নিশ্চিন্ততা দেখে প্রলুব্ধ কৃপ আর নিজেও মায়ার বাঁধনে জড়াননি। হয়তো বা এখানেও বৃহত্তর ব্যক্তিত্বের আচরণের প্রতি তাঁর বশ্যতা আছে। এরমধ্যে অবশ্য অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। মহারাজ শান্তনুর শেষ বংশধর বিচিত্রবীর্য মারা গেছেন এবং তাঁর ক্ষেত্রজ পুত্র পাণ্ডুও মারা গেছেন অল্প সময়ের ব্যবধানে। অন্তত মহাকাব্যিক সময়ের হিসেবে সেটা অল্প সময়ই বটে। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর পাঁচ ভাই পাণ্ডবদের সঙ্গে নিয়ে কুন্তী ততদিনে হস্তিনাপুরীতে ধৃতরাষ্ট্রের রাজবাড়িতে অবস্থিত হয়েছেন। কিন্তু এরই মধ্যে বালক অবস্থাতেই ধার্তরাষ্ট্র দুর্যোধন পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এই প্রতিহিংসা চরিতার্থতার চরম দৃষ্টান্ত ইতিমধ্যেই প্রকট হয়ে পড়েছে—দুর্যোধন ভীমকে বিষ খাইয়ে মারতে চেয়েছেন।

এই খবর খুব প্রকট এবং প্রত্যক্ষভাবে ধৃতরাষ্ট্রের কানে আসেনি বটে, তবে তিনি যে কিছুই জানতেন না, তাও বিশ্বাস করা কঠিন। দুর্যোধনের প্রতি যতই প্রশ্রয় থাক, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কিন্তু লক্ষ করছিলেন যে, কৌরব-পাণ্ডবদের সমস্ত রাজকুমারেরাই বড় আলস্যে দিন কাটাচ্ছে এবং সেই অলসতায় কারও কারও মস্তিষ্ক আসুরিক তথা আভিচারিক বুদ্ধিতে ভরপুর হয়ে উঠছে। ধৃতরাষ্ট্র অনুধাবন করলেন যে, কুমারদের বিদ্যাশিক্ষা এবং অস্ত্রশিক্ষার প্রয়োজন, তিনি ভাবলেন—বাড়িতে কৃপাচার্যের মতো একজন অস্ত্রগুরু রয়েইছেন, অতএব তাঁকে ডেকে কুমারদের অস্ত্রশিক্ষার ভার দিলেন ধৃতরাষ্ট্র—গুরুং শিক্ষার্থমন্বিষ্য গৌতমং তান ন্যবেদয়ৎ। কৌরব এবং পাণ্ডবদের নিয়ে গৌতম কৃপাচার্যের অস্ত্রপাঠশালা আরম্ভ হল বটে, কিন্তু এমন উপযুক্ত গুরুর খবর অন্য দেশেও রটে গেল। ফলে মথুরা-শূরসেন অঞ্চল থেকে বৃষ্ণি-যাদবেরা এবং অন্যান্য কিছু দেশ থেকেও অনেকে অস্ত্রশিক্ষা নিতে এলেন কৃপাচার্যের কাছে—বৃষ্ণয়শ্চ নৃপাশ্চান্যে নানাদেশ-সমাগতাঃ।

গুরু হিসেবে কৃপাচার্য হয়তো যথেষ্ট অস্ত্রজ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তার শিক্ষাদানের পদ্ধতি হয়তো এতটা উচ্চমানের ছিল না, যাতে শিষ্যেরা গ্রহণ, ধারণ, স্মরণ, বর্জন এবং অবশেষে আত্মসাৎ-করণের মাধ্যমে অধীত বিদ্যাকে যথাযথ প্রয়োগ-সুকর করে তুলতে পারে। প্রধানত পাণ্ডব-কৌরব কুমারদের অস্ত্রশিক্ষার মান দিন দিন কতটা উন্নত হচ্ছে, সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রেখে চলেছিলেন সেকালের পরমাস্ত্রবিদ আরও একজন। তিনি ভীষ্ম, কুরুবৃদ্ধ পিতামহ। তিনি নিজে এই অস্ত্রশিক্ষার ভার নেননি, কারণ—গভীর আত্মীয়তার সম্বন্ধ, বিশেষত পৌত্র-পিতামহের সম্বন্ধ বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রে সস্নেহ প্রশ্রয় তৈরি করতে পারে। কিন্তু পাণ্ডব-কৌরব কুমারদের কার কী সম্ভাব্য ক্ষমতা, সেটা তিনি আপন অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারেন। ভীষ্ম বুঝতে পারছিলেন যে, কৃপাচার্য নিজে জ্ঞানী এবং অস্ত্রকুশল ব্যক্তি, কিন্তু তাঁর শিক্ষায় কুমারেরা যা শিখছেন, তা সাধারণ মানের। অন্তত যে শিক্ষা এক-একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ করে তুলবে, সেই শিক্ষায় ঠিকমতো 'মোটিভেট' করতে পারছেন না কৃপাচার্য। ভীষ্ম বুঝেছেন—ধনুর্বেদে অর্জুনের মেধা আছে অথবা গদাযুদ্ধে মেধা আছে ভীম-দুর্যোধনের।কিন্তু কোথায় যেন কৃপাচার্যের শিক্ষায় এই বিষয়-বিশেষজ্ঞতা ফুটে উঠছে না, অথচ তিনি চান এই বিশেষজ্ঞতা বিকশিত হোক উপযুক্ত আধারে—বিশেষার্থী ততো ভীষ্মঃ পৌত্রাণাং বিনয়েপ্সয়া।

ভীষ্ম কিন্তু মানীর মান বোঝেন। তিনি নিজে কৃপাচার্যের মান বজায় রেখে কিচ্ছুটি তাকে বলেননি। কিন্তু অন্যান্য অস্ত্রবিদ পণ্ডিত গুরু, যারা হস্তিনায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, ভীষ্ম তাঁদের সামনে কুমারদের দাঁড় করিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন—কার কোথায় খামতি—ইষ্বস্ত্রজ্ঞান্ পর্যপৃচ্ছদ্ আচার্যন্ বীর্যসম্মতান্। এই বাস্তব পরীক্ষায় ভীষ্ম কিন্তু বুঝে গিয়েছিলেন যে, কৃপাচার্যকে দিয়ে ঠিক হচ্ছে না। আসলে এমন শিক্ষক আগেও ছিলেন, এখনও ভূরি ভূরি আছেন। এমন শিক্ষক, যাঁরা এককালে নিজেরা ভালো মেধার পরিচয় দিয়ে ভালো ফল করেছেন, তারপর চাকরির নিশ্চিন্ত আরামে তাঁদের মেধা 'গেঁজিয়ে' গেছে। মেধা এমনই এক বস্তু যা থাকলেই শুধু হয় না, তাকে শান দিতে হয় ছুরির মতো। নিয়মিত শাস্ত্রাভ্যাস এবং উন্নত-উন্নততর পরিচর্যার মাধ্যমে মেধাকে শানাতে হয়। কিন্তু নিয়মিত অর্থপ্রাপ্তি এবং নিশ্চিন্ততায় যেমন বহুতর উপযুক্ত শিক্ষকও অনুপযুক্ত হয়ে যান, কৃপাচার্যেরও তাই হয়েছিল। কুরুবাড়ির নিশ্চিন্ত আশ্রয় এবং আরাম এই মহান আচার্যকে আজকের দিনের বহুতর তমোগুণী শিক্ষকের মতো জড় করে তুলেছিল।

ভীষ্ম বুঝতে পারছিলেন যে, কৃপাচার্যকে দিয়ে হবে না। কেন হবে না, তা স্পষ্টত কৃপাচার্যের নাম করে তিনি বলছেন না, কিন্তু ঠিক কৃপাচার্যের প্রসঙ্গের পরেই তিনি বলছেন —এমন গুরুর দ্বারা পাণ্ডব-কৌরবের শিক্ষা হতে পারে না, যিনি অল্পধী অর্থাৎ যাঁর মেধা কম। কৃপাচার্যের কি মেধা কম ছিল? তা নয়, কিন্তু অনভ্যাসে অচর্চায় শিক্ষকের মেধায় জড়তা আসে, সেখানে যেমন বহুপূর্বের মেধাস্ফুরণের অজুহাত দিয়ে চলে না, কৃপাচার্যেরও সেই অবস্থা। ভীষ্ম বলেছেন—যিনি মহাভাগ নন, তাঁর দ্বারা শিক্ষাদান চলে না, যিনি নানাবিধ অস্ত্রে কুশল, তার দ্বারাই শিক্ষাদান কর্ম সম্ভব। 'মহাভাগ' কথাটা রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণে খুব পাওয়া যায়। কথাটার সাধারণ অর্থ—যার খুব ভাগ্য আছে। কিন্তু আমরা যখন বলি—সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে—তখন এই অর্থ হবে কি যে, সরস্বতী ঠাকুরের খুব ভাগ্য আছে? আসলে মহাভাগ শব্দের অর্থ হল—যাঁর মধ্যে খুব বড় বড় কিছু গুণ আছে, সেটা পরম ঔদার্যও হতে পারে, পরম ঐশ্বর্য-ধনশালিত্বও হতে পারে, এমনকী দয়া, ক্ষমা, অহিংসা, ঋজুতা ইত্যাদি অষ্ট মহাগুণ যাঁর আছে, তাঁকেও মহাভাগ বলা যেতে পারে।

একজন শিক্ষককে 'মহাভাগ' বলতে পারি কখন? যিনি নিজে অসাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও সদা সর্বদা ভাবেন—আমার ছাত্রকেও এই অধীত গুরুপরম্পরালব্ধ বিদ্যা শিখিয়ে যেতে হবে। আমার জীবনেই আমি এমন 'মহাভাগ' শিক্ষক দেখেছি। দেখেছি সংস্কৃত কলেজের ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায়কে, দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রবাল সেনকে। বিদ্যাদানের ব্যাপারে সকাল পাঁচটা থেকে রাত একটা পর্যন্ত সব সময় এঁদের সময় ছিল। এই উদারতা, অকার্পণ্য, অবিচ্ছিন্ন বিদ্যাব্যসনিতা যার মধ্যে আছে তিনিই তো 'মহাভাগ'। ভীষ্ম লক্ষ করেছেন যে, কৃপাচার্য শেখান বটে, কিন্তু সেই শেখানোর মধ্যে পুষ্টি, তুষ্টি এবং উছলে পড়ার ভাবটুকু নেই। ভীষ্ম এই 'মহাভাগ' শব্দের অর্থটাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন আরও একটি অসাধারণ শব্দ ব্যবহার করে। বলেছেন—যাঁর মধ্যে দেবতার মতো সামর্থ্য নেই, তিনি কখনও কুরুকুমারদের বিদ্যা-শিক্ষা দিতে পারেন না—নাদেবসত্ত্বো বিনয়েৎ কুরূনস্ত্রে মহাবলান্।

আসলে ভাল ছাত্র, মন্দ ছাত্রেরও একটা ব্যাপার আছে। যে কলেজে বেশির ভাগ ছাত্রই মেধাবী, সেই কলেজের মাস্টাররা যদি জড় হন, যদি শিক্ষাদানের পরম্পরা তাঁদের আত্মগত না হয়, অথবা যদি তাঁরা নিজেরাই অল্পধী অসমর্থ হন, তবে তাঁরা মেধাবীকে উত্তরাধিকার দেবেন কী প্রকারে। বস্তুত 'দেব' শব্দের অর্থ যিনি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন; 'সত্ত্ব' মানে প্রাণ, প্রাণশক্তি। যে শিক্ষকের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী প্রাণশক্তি আছে তিনিই মেধাবী ছাত্রকে পড়াতে পারেন। মেধাবী ছাত্রদের পড়ানোর জন্য অথবা তাঁদের অস্ত্রশিক্ষা দানের জন্য যে তিনটি অসাধারণ গুণের কথা বলেছেন ভীষ্ম, সেই গুণগুলি তিনি কৃপাচার্যের মধ্যে

দেখতে পাননি। কৃপ বহুকাল কুরুবাড়িতে আছেন, তাঁর আচার্যের সম্মানও অটুট রইল, কিন্তু দ্রোণাচার্যের কথা শোনার পর তাঁর মধ্যে এই তিনটি গুণের সমবায় লক্ষ করেই ভীষ্ম কৃপাচার্যের গুরুত্ব লঘু করে দিয়ে বলেছেন—অল্পধী, অনুদার অথবা অল্পপ্রাণ অসমর্থ গুরু কখনও কুরু-পাণ্ডবদের মতো মেধাবী ছাত্রদের শিক্ষক হতে পারেন না—নাল্পধীর্নামহাভাগস্তথা নানাস্ত্রকোবিদঃ। নাদেবসত্ত্বো বিনয়েৎ কুরূনস্ত্রে মহাবলান্ ॥ এই কথা ভেবে কুমারদের অস্ত্রবিশেষজ্ঞতার আশায় ভীষ্ম ভারদ্বাজ দ্রোণাচার্যের হাতে কুরু-পাণ্ডবদের সঁপে দিলেন—পাণ্ডবান্ কৌরবাংশ্চৈব দদৌ শিষ্যান্নরর্ষভঃ।

বড় বলে কৃপাচার্যের নিজেরও কোনও গুমোর ছিল না; ছিল না এমন কোনও আত্মসচেতনতা যাতে করে খুব অপমানবোধে ক্লিষ্ট হবেন তিনি। দ্রোণ যখন অন্ধকূপ থেকে পাণ্ডবদের খেলার বীটা তুলে দিয়েছিলেন, তখন সবার বড় হিসেবে চমৎকৃত যুধিষ্ঠির তাঁকে পরম অভ্যর্থনায় বলেছিলেন—আমাদের গুরু কৃপাচার্যের অনুমতি হলে আপনি প্রত্যেক দিনই আমাদের কুরুবাড়িতে ভক্ষ্য-ভোজন পাবেন—কৃপস্যানুমতে ব্রহ্মন্ ভিক্ষাম্ আপ্নুহি শাশ্বতীম্। বালক যুধিষ্ঠির জানতেন না যে, হস্তিনাপুরে আসা ইস্তক কৃপের বাড়িতেই আছেন দ্রোণ এবং কৃপ মনেপ্রাণে চান যে, রাজবাড়িতে দ্রোণের একটা চিরন্তনী ব্যবস্থা পাকা হোক। আসলে কৃপাচার্যের মনে কোনও জ্বালা নেই, তিনি দ্রোণাচার্যকে একটুও হিংসে করেন না। শিশু অবস্থা থেকে রাজবাড়িতে থেকে থেকে, ভক্ষ্য-ভোজন, সম্মান-ঐশ্বর্য সব পেয়ে পেয়ে তিনি এমনই অভ্যস্ত যে, কোনও কিছুতেই তিনি অসন্তুষ্ট বোধ করেন না। রাজবাড়ির দ্বিতীয় অস্ত্রগুরু হিসেবে দ্রোণাচার্যের যে অধিকতর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে—এর জন্য তাঁর মনে বিন্দুমাত্রও ক্ষোভ-প্রতিহিংসা নেই। হয়তো এই প্রতিহিংসা, প্রতিযোগিতা এবং উচ্চাভিলাষ কিছু ছিল না বলে তিনি তাঁর অধ্যাপনা বৃত্তিতেও খানিকটা জড় হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু এই সন্তুষ্টিই তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

অন্যদিকে দ্রোণাচার্যকে দেখুন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, উচ্চাভিলাষ এবং অভিমান তাঁকে পঞ্চাল রাজ্য থেকে হস্তিনাপুরে তাড়িয়ে এনেছে। উপরন্তু ভীষ্ম যখন কৃপাচার্যকে অতিক্রম করে একবারও তার অনুমতি না নিয়ে নির্দ্বিধায় কৃপাচার্যের শিষ্যদের দ্রোণের হাতে তুলে দিলেন, সেদিন কিন্তু শঙ্কিত দ্রোণাচার্য তাঁর মুগ্ধ-সন্তুষ্ট শ্যালকটির জন্য শঙ্কিত হয়ে ভীষ্মকে প্রশ্ন করেছিলেন—আপনার গৃহে অস্ত্রাভিজ্ঞ কৃপাচার্য তো রয়েইছেন। তাকে সকলেই আচার্য হিসেবে মানে—কৃপস্তিষ্ঠতি চাচার্য্যঃ শস্ত্রজ্ঞঃ প্রাজ্ঞসম্মতঃ। এই অবস্থায় আমি যদি রাজবাড়ির বৃত্তি গ্রহণ করে কুমারদের অস্ত্রশিক্ষার ভার নিই, তা হলে তাঁর মনে বড় লাগবে। তাই নয় কি—ময়ি তিষ্ঠতি চেদ্ বিপ্রো বৈমনস্যং গমিষ্যতি। দ্রোণাচার্য কৃপের কথা ভেবে ভীষ্মকে আরও বললেন—তারচেয়ে বরং এই ভাল, আমি আপনার কাছ থেকে কিছু ধন যাচনা করে নিই, তারপর আমি যেমন এখানে এসেছিলাম, তেমনই চলে যাব।

মুশকিল হল—দ্রোণাচার্য নিজের হৃদয়-অনুমানে কৃপকে যেমন বিচার করছেন, কৃপ তেমন নন। সবচেয়ে বড় কথা—দ্রোণাচার্য তাঁর শ্যালক কৃপকে যতখানি চেনেন, তারচেয়ে ভীষ্ম তাঁকে চেনেন অনেক বেশি। দ্রোণ তাঁকে যতখানি কাছ থেকে যতদিন দেখেছেন, তার চেয়ে ভীষ্ম তাঁকে অনেক বেশি কাছ থেকে অনেক বেশি দেখেছেন। দ্রোণাচার্যের আশঙ্কা একেবারে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে ভীষ্ম বললেন—আরে! কৃপাচার্যের কথা ভেবে আপনি একটুও চিন্তিত হবেন না। তিনি কুরুবাড়ির আচার্যস্থানে আছেন, তিনি আচার্যই থাকবেন, তার সম্মান রক্ষা করা, তার ভরণপোষণ—সে সব আমার দায়িত্ব—কৃপস্তিষ্ঠতু পূজ্যশ্চ ভর্তব্যশ্চ ময়া সদা। আমি আপনাকে আমার নাতিদের অস্ত্রগুরু হিসেবে ঠিক করেছি, আপনিই তঁদের গুরু হবেন। কৃপকে নিয়ে আপনার কোনও ভাবনা নেই।

কুরুবাড়ির এলাকাতেই দ্রোণাচার্যের বাসস্থান নির্ধারিত হল, তাঁর ভোজন-শয়নের ব্যবস্থা

হল এবং কৃপকে অতিক্রম করেই কুরু-পাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষার ভার দেওয়া হল দ্রোণাচার্যের ওপর। কুমারদের ওপর নতুন গুরু দ্রোণের প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণও অনেক বাড়ল। কিন্তু এসবে কৃপাচার্যের কোনও ব্যত্যয় হল না। তিনি যেমন ছিলেন, তেমনই রইলেন। মাঝখান থেকে যেটা হল—দ্রোণাচার্যের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে কৃপাচার্য একসময় দ্রোণের ব্যক্তিত্বের অনুগামী হয়ে পড়লেন। এটা আশ্চর্য কিছু নয়, কেননা, যে ব্যক্তি পঞ্চাল দেশ থেকে হস্তিনায় এসে, কৃপের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে, কদিনের মধ্যে নিজের ব্যক্তিত্বে আপন আশ্রয়দাতার চাকরি খেয়ে নিয়ে তাঁরই পদে বসে যেতে পারেন বিনা প্রতিরোধে, হয় তিনি অধিগুণসম্পন্ন অধিকতর ব্যক্তিত্বের অধিকারী, নয়তো অন্যজন ঈর্ষাহীন, মানাপমানে সমদর্শী ভালো মানুষ। আমরা দুই আচার্যকে এই দৃষ্টিতেই দেখতে পেয়েছি, ফলে ভালোমানুষ কৃপাচার্য আস্তে আস্তে একদিন দ্রোণাচার্যের উপগ্রহে পরিণত হয়েছেন।

সমগ্র কুরুবাড়ি যে কৃপাচার্যকে আচার্য বলে মানত, সেটা প্রধানত কুরুবাড়ির গুণ এবং সেটা গুরু বলে কুরুবাড়িতে কৃপাচার্যের চিরকালীন অভ্যস্ততা। লক্ষ করে দেখুন, দ্রোণাচার্য যখন কুমারদের অস্ত্রশিক্ষার প্রদর্শনী আরম্ভ করলেন, তখন প্রারম্ভেই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আচার্যের উপযুক্ত যে উপচার সংগ্রহ করেছিলেন, সেই সুবর্ণ-মণি-রত্ন এবং বস্ত্রের একতর সম্ভার তিনি যেমন দ্রোণাচার্যের হাতে তুলে দিলেন, তেমনই অন্যতর সম্ভারটি তিনি তুলে দিলেন কৃপাচার্যের হাতে—প্রদদৌ দক্ষিণাং রাজা দ্রোণায় চ কৃপায় চ। কৃপাচার্য নিরভিমান, তিনি দ্রোণ-আয়োজিত অস্ত্রশিক্ষার আসরে দ্রোণকে সাহায্য করতে এসেছেন। অস্ত্ররঙ্গ প্রদর্শনের সময় হঠাৎই যখন কর্ণ এসে প্রতিযোগীর মতো মঞ্চ জুড়ে দাঁড়ালেন, তখন দ্বিধাভূত রঙ্গস্থলে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা কর্ণের সাহায্যে এগিয়ে এলেন, কিন্তু কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম এবং দ্রোণের পন্থা অবলম্বন করে কৃপ কিন্তু এসে দাড়ালেন অর্জুনের পাশে—ভারদ্বাজঃ কৃপো ভীষ্মো যতঃ পার্থস্ততো'ভবন্।

তবে বৃদ্ধ এবং সম্মানিতের অনুগামিতা সত্ত্বেও কৃপাচার্যের কোনও স্বাতন্ত্র ছিল না, তা ঠিক নয়। তবে এই স্বাতন্ত্র্য তাঁর ব্যক্তিত্বের নয়, বহুকাল কুরুবাড়িতে থাকার ফলে এবং ব্রাহ্মণ আচার্য হিসেবে প্রথম থেকেই সম্মানিত হওয়ার ফলে মাঝে মাঝে তিনি নিজের সিদ্ধান্ত-মতো কথা বলতেও পারতেন। তবু লক্ষণীয় যে, সেই সিদ্ধান্ত কখনও ভীষ্ম-দ্রোণাচার্যের মতো বিশাল ব্যক্তিত্বের মানসলোক অতিক্রম করেনি। রঙ্গ-প্রদর্শনীর সময় যখন অর্জুন-কর্ণের দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রায় আসন্ন হয়ে উঠল, সেই সময় কর্ণকে চরমভাবে নিবৃত্ত করার জন্য ভীষ্ম-দ্রোণ চুপ করে থাকলেও কৃপাচার্য নিজের বুদ্ধিতেই কথা বলেছিলেন—অর্জুনের পিতৃ-মাতৃ-পরিচয় শুনলে তো? এবার তোমার মাতা-পিতা এবং তাঁদের রাজকৌলীন্যের পরিচয় তুমি বলো। সেটা জানার পর অর্জুন তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতেও পারেন, আবার নাও পারেন। কিন্তু এটা ঠিক যে, হীনবংশজ ব্যক্তির সঙ্গে রাজার ছেলেরা কখনও দ্বন্দ্বযুদ্ধ করে না—বৃথাকুলসমাচারৈর্ন যুধ্যন্তে নৃপাত্মজাঃ।

কথাটা শুনে কর্ণের মাথা নিচু হল, আবার দুর্যোধনের দিক থেকে তর্কযুক্তিও আরম্ভ হল। কিন্তু আমাদের ধারণা—কৃপাচার্য কর্ণের এই দুর্বলতার কথা জানতেন, কেননা দ্রোণাচার্যের পাঠশালায় কর্ণও ছাত্র ছিলেন প্রথম দিকে এবং তাঁর সূতপুত্রতার প্রবাদ তখন থেকেই লোক-প্রচারিত। কিন্তু চরম একটি মুহূর্তে যখন দুই মহাবীরের দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রায় লাগে লাগে, এবং বিশেষত কর্ণের আস্ফালন যখন অস্ত্ররঙ্গের মূল আকর্ষণ দ্রোণাচার্যের প্রশিক্ষণটুকুই নস্যাৎ করতে উদ্যত, তখনই কৃপাচার্যের এই স্বানুভাব-প্রযুক্ত ভূমিকা ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্য উভয়কেই অসীম লজ্জা থেকে মুক্তি দিয়েছে। কৃপাচার্য কর্ণকে যা বলেছিলেন, তা ঠিক বলেছিলেন, না ভুল বলেছিলেন, সে তর্ক এখানে অবান্তর। কিন্তু এই যে গুরুস্থানীয় মর্যাদা—যাঁর একটি কথা তর্কযুক্তি দিয়ে প্রতিহত করতে চাইলেও—যেমন দুর্যোধন তা করেইছিলেন কর্ণের সম্মান বাঁচাতে—কিন্তু এই মর্যাদা লঙঘন করা যায় না।

কৃপাচার্যের এই অলঙ্ঘনীয়তা তৈরি হয়েছিল দুটি কারণে। এক, তিনি ব্রাহ্মণ, ঋষি শরদ্বানের পুত্র; দুই তিনি কুরুবাড়িতে আছেন প্রায় ভীষ্মের সমকাল থেকে। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রও তাঁকে আচার্যের সম্মানে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছেন শিশুকাল থেকে এবং এই অভ্যস্ততা সংক্রান্ত হয়েছে কুরু-পাণ্ডবকুলের কুমারদের মধ্যেও। দ্বিতীয়, আচার্যবরণের প্রশ্নে যুধিষ্ঠির তাই দ্রোণাচার্যকে পরিষ্কার বলেছিলেন—আচার্য কৃপের অনুমতি হলে—আপনি প্রতিদিনই কুরুবাড়িতে ভোজন-আহার লাভ করবেন—কৃপস্যানুমতে ব্রহ্মন্ ভিক্ষামাপ্নুহি শাশ্বতীম্।

অন্তত যুধিষ্ঠির কৃপাচার্যের এই সুচিরাভ্যস্ত সম্মান কোনও দিনও লঙঘন করেননি। তিনি যে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞের বিশাল আয়োজন করেছিলেন, সেখানে যে পাঁচটি প্রধান মানুষকে চরম মর্যাদায় নকুলের মাধ্যমে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনজন বৃদ্ধপ্রায়, অন্য দুজন প্রৌঢ়। এই পাঁচজনের প্রথম হলেন ভীষ্ম, তার পরেই এসেছে দ্রোণের নাম। কৃপাচার্যের নাম এসেছে ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুরের পরে—

> নকুলং হস্তিনপুরং ভীষ্মায় পুরুর্ষভঃ।
> দ্রোণায় ধৃতরাষ্ট্রায় বিদুরায় কৃপায় চ॥

প্রাথমিক দৃষ্টিতে মনে হয়—কৃপের নামটা দ্রোণের ঠিক পরে দিলে সংস্কৃতের ছন্দোনিয়মে অনুষ্টুভ ছন্দটি ধরে রাখা কঠিন হত। কিন্তু মহাভারতের কবি, যিনি শত-সহস্র অনুষ্টুভ ছন্দ গেঁথেছেন, তাঁর কাছে এটা কোনও সমস্যাই নয়। আসলে শ্লোক-সংস্থানের মধ্যেই কৃপের প্রকৃত অবস্থানটি লুকিয়ে আছে। লক্ষ করে দেখবেন—কুরুসভায় যত সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সেখানে স্বতন্ত্র এবং প্রধান মতামতগুলি আবর্তিত হয়েছে ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুরের মধ্যেই। আচার্যস্থানীয় হওয়া সত্ত্বেও কৃপ কখনও ভীষ্মের অনুবর্তী হয়েছেন, কখনও বা দ্রোণের। কৃপাচার্য কখনও নিজেকে খুব 'একজার্ট' করেন না, অথচ তিনি অন্য প্রবীণদের মতোই সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। কুরুবাড়ির অন্যতম সদস্যের মতোই তাঁর ওপরে সকলের অগাধ বিশ্বাস। রাজসূয়ের বিশাল আয়োজনে যুধিষ্ঠির তাঁকে যে গুরু দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তারমধ্যে বিশ্বাসের সঙ্গে মর্যাদার এক অপূর্ব মিশ্রণ ঘটেছে। যজ্ঞের আয়োজন প্রযুক্ত যত সোনাদানা, মণিমুক্তো এবং অন্যান্য রত্ন ছিল, সেসবের সুরক্ষার ভার যুধিষ্ঠির ন্যস্ত করেছিলেন কৃপের ওপর। পুনশ্চ কৃপ যেহেতু ক্ষত্রিয়ের প্রশাসনিক কাজে বহুকাল যুক্ত আছেন অথচ ব্রাহ্মণ বলে যজ্ঞাদিকর্মও বোঝেন ভাল, তাই যুধিষ্ঠির তাঁকে অন্য একটি ধৈর্যবহুল কাজেও নিযুক্ত করেছেন। রাজসূয়ের মতো বিশাল যজ্ঞকর্মে যত ব্রাহ্মণ-পুরোহিত নিযুক্ত করতে হয়, তাঁদের প্রত্যেকের দক্ষিণাদানের ক্লিষ্টকর্মভারটুকুও ছিল কৃপাচার্যের ওপরেই—দক্ষিণানাং প্রদানে চ কৃপং রাজা ন্যযোজয়ৎ। আপনজনের মতো নির্ভর না করতে পারলে যেমন কারও ওপর এই ভার ন্যস্ত করা যায় না, তেমনই বিশ্বাস এবং মর্যাদাও এখানে নিতান্ত অপেক্ষিত।

যেকথা বলছিলাম—কুরুসভার অন্যতম প্রবীণ সদস্য হওয়া সত্ত্বেও কৃপাচার্য কখনও নিজেকে খুব বেশি প্রয়োগ করেন না। পাণ্ডবরা যখন জতুগৃহের আগুন থেকে বেঁচে দ্রুপদের রাজসভায় দ্রৌপদীকে লাভ করলেন, সেই সময় ধৃতরাষ্ট্রের ওপর প্রবীণ মন্ত্রীদের প্রবল চাপ এল যাতে পঞ্চাল থেকে পাণ্ডবদের ফিরিয়ে আনা হয়। এই সময় ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্যকে আমরা নামভূমিকায় দেখছি এবং তাঁরা দুর্যোধন-ধৃতরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে স্বাধীন মত ব্যক্ত করছেন। এখানে বিদুরও কথা বলছেন ভীষ্ম-দ্রোণের পরেই। কিন্তু কৃপাচার্যকে আমরা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তৃতীয় বক্তার ভূমিকায় দেখছি না। ভীষ্ম-দ্রোণের পরেই বিদুরের বক্তব্য শুনতে পাচ্ছি আমরা, কিন্তু কৃপাচার্যের কোনও কথা নেই। থাকলেও হয়তো তা ভীষ্ম-দ্রোণের অনুগামিতায় অনুক্তই থেকে গেছে। ঘটনা হল—কৃপাচার্য ন্যায়-নীতি এবং ধর্মের

পক্ষেই থাকেন। কিন্তু কঠিন ধর্মসংশয়েও তাঁর তেমন বাক্যস্ফূর্তি হয় না, যেমনটি ভীষ্মের হয়, দ্রোণের হয়, অথবা বিদুরের হয়।

কুরুসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের মতো অসভ্যতা ঘটল। তাতে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ—কেউই কোনও কথা বলতে পারেননি। তাঁদের প্রত্যেকের রক্তচাপ বৃদ্ধি হয়েছিল এবং তাঁরা শুধুই বসে বসেই ঘেমেছিলেন—ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপাদীনাং স্বেদশ্চ সমজায়ত। তবু যখন কৌরবসভায় কুরুমুখ্যদের উত্তর চেয়ে দ্রৌপদী প্রশ্ন করলেন, তখন তিনি বুঝি জানতেনই যে, ভীষ্ম-দ্রোণ-বিদুর যদি বা কিছু বলেন, কিন্তু কৃপাচার্য কিছু বলবেনই না। সেই জন্য কুরুমুখ্যদের ধর্মবোধ নিয়ে গালাগালি দেবার সময়ও দ্রৌপদী ভীষ্ম-দ্রোণ-বিদুরের নাম করেছেন, কিন্তু কৃপাচার্যের নামও করেননি। কৃপ বুঝি এতটাই উদাসীন, কোনও কিছুতেই তাঁর তেমন বিকার হয় না। দ্রৌপদীর প্রশ্নে অবশ্য নমো নমো করে যতটুকু উত্তর দিয়েছিলেন, তা ভীষ্মই দিয়েছিলেন। দ্রোণও কোনও কথা বলেননি, ফলত বোধ হয় কৃপাচার্যও নিশ্চুপ ছিলেন। কিন্তু এঁদের এই তুষ্ণীংভাব নিয়ে কথা উঠেছে। দুর্যোধনের ভাই বিকর্ণ দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায় উদ্বেলিত হয়ে দ্রৌপদীর যুক্তিসঙ্গত প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় দ্রোণ এবং কৃপ—দুজনের দিকেই আঙুল তুলেছেন। বলেছেন—আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি—এখানে সকলের সম্মানিত দুই আচার্য আছেন—ভারদ্বাজো হি সর্বেষমাচার্যঃ কৃপ এব চ—তাঁরা কেন দ্রৌপদীর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন না?

বিকর্ণের কথা থেকে বোঝা যায় যে, এইধরনের সংকটে কৃপ এবং দ্রোণের কথা বলাটাই স্বাভাবিক ছিল এবং তাঁদের সেই মান্যতাও ছিল যাতে বিকর্ণ মনে করেছেন—কৃপ-দ্রোণের কথা দুর্যোধনের অসভ্যতার বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধ তৈরি করত। তবে ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের ধারণা—দ্রৌপদীর চরম লাঞ্ছনার সময়েও যে দ্রোণ-কৃপের মতো আচার্যরা কথা বললেন না, তার কারণ এঁরা মহামতি বিদুরের করুণ অবস্থা দেখেছেন। দুর্যোধন-কর্ণরা সেদিন খুব 'হাই' দিলেন; বিশেষত দুর্যোধন যে ভাষায় বিদুরকে অপমান করেছেন, কর্ণ যেভাবে ভীষ্ম-দ্রোণকে পরান্নভোজী প্রবঞ্চকের আসনে বসিয়েছেন, সেখানে সাধারণত বিকারহীন কৃপ কী কথা বলবেন? সে প্রশ্নই ওঠে না। শেষমেশ তিনজনেই—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ এবং অন্যান্য গুরুস্থানীয় ব্যক্তিরাও কুরুসভা ছেড়ে চলে গেছেন নিজেদের সম্মান বাঁচাতে।

কর্ণ যে ভীষ্ম, দ্রোণ এবং বিদুরকে পরান্নভোজী প্রবঞ্চক বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন—এই অভিযোগ দ্রোণাচার্য সম্বন্ধে যদি বা খাটে, কিন্তু ভীষ্ম এবং বিদুরের সম্বন্ধে তা খাটে না। আর কৃপাচার্যকে কর্ণ পাত্তাই দেননি। শক্তিমত্তা এবং অস্ত্রনৈপুণ্যের ক্ষেত্রে কৃপাচার্য কোনও ভাবেই ভীষ্ম-দ্রোণের সমকক্ষ ছিলেন না, সেই জন্য কর্ণ হয়তো তাঁকে স্মরণও করেননি। এমনকী যুধিষ্ঠিরও বনপর্বে যখন কৌরবদের যুদ্ধসহায় যোদ্ধাদের নাম করে নিজেদের সম্বন্ধে দুর্বলতা ব্যক্ত করছেন, তখন তিনিও কৃপাচার্যের নাম করছেন না। কিন্তু একটা কথা তিনিও মনে রাখছেন। অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টিতে—ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপরা কর্ণকথিত পরান্নভোজী না হলেও এঁরা রাজবাড়ির বৃত্তিভোগী অর্থাৎ রাজোপজীবী। যুধিষ্ঠিরের মার্জিত ভাষায় 'রাজপিণ্ডদ'। যুধিষ্ঠির মনে করেন—যুদ্ধ যখন লাগবে তখন ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কৃপ—এঁরা কৌরব এবং পাণ্ডবদের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হলেও যেভাবে হোক, প্রাণ দিয়েও এঁরা রাজার ঋণ চুকোবেন অর্থাৎ 'রাজপিণ্ড' দেবেন—দ্রোণস্য চ মহাবাহো কৃপস্য চ মহান্তনঃ। অবশ্যং রাজপিণ্ডস্তৈর্নির্বেশ্য ইতি মে পতিঃ।

বোঝা যায়, ভীষ্ম-দ্রোণের সমকক্ষায় যুদ্ধবীর্য প্রকাশ না করতে পারলেও এই দুইজনের সঙ্গে যুক্ত হলে কৃপাচার্যের শক্তিও কম নয়। কিন্তু কৃপের ব্যক্তিগত মানসিক শক্তি তথা যুদ্ধক্ষমতা কম ছিল বলেই হয়তো 'রাজপিণ্ডদ' হওয়া সত্ত্বেও ভীষ্ম-দ্রোণ অন্যায়ের যতটুকু

কঠিন প্রতিবাদ করতে পেরেছেন, কৃপাচার্য তা কখনওই পারেননি। তাই বলে অন্তরে তাঁর কোনও প্রতিবাদ ছিল না, এমন নয়। তিনি আচার্যস্থানীয় গুরু, চিরকাল ভীষ্মের ছত্রছায়ায় থেকেছেন। কিন্তু তবু স্থিরবুদ্ধি এই ব্যক্তিটি নিজেকে খুব জড়াতেন না রাজনীতির পক্ষপাতে। একবারই অবশ্য আমরা তাঁকে ভীষণ ক্রুদ্ধ-ক্ষুব্ধ হতে দেখেছি এবং সেটা বোধ হয় সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হয়েছিল বলেই। নইলে এই ক্রোধ রাজবাড়ির প্রথম আচার্যের স্বাভাবিক নয়।

তখন দুর্যোধনের প্ররোচনায় ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ সকলেই বিরাট রাজ্যে গেছেন বিরাট রাজার গোধন হরণ করতে। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস তখন কেবল শেষ হয়ে গেছে। অর্জুন উত্তরকে সারথি করে একাকী যুদ্ধে এসেছেন। এদিকে দ্রোণাচার্য প্রিয়শিষ্য অর্জুনের রথশব্দ শুনে একটু উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছিলেন। এমনকী সে কথা সরলভাবে বলেও ফেললেন একটু প্রশংসা করে। বললেন—এই যেমন রথের শব্দ শুনতে পাচ্ছি তাতে এ অর্জুন না হয়ে যায় না—যথা রথস্য নির্ঘোষো...নৈষো'ন্যঃ সব্যসাচিনঃ। অর্জুনের উপস্থিতি অনুমান করে ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপরা একটু নিরুৎসাহ হয়েই বসেছিলেন। এতকাল বনবাস, অজ্ঞাতবাস ইত্যাদি যন্ত্রণার পর অর্জুনের এই উপস্থিতি তাঁদের মনে যুদ্ধের উত্তেজনা প্রশমিত করে দিয়েছিল। দুর্যোধন ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপদের অবস্থা দেখে খানিকটা যুদ্ধোন্মাদনা সৃষ্টি করতে চাইলেন। বলেও ফেললেন—এ কী? রথের ওপর আপনারা এমন জড়ের মতো বসে আছেন কেন? এই যে আপনারা—ভীষ্মো দ্রোণঃ কৃপশ্চৈব বিকর্ণ দ্রোণিরেব চ।

দুর্যোধন কথার রেশ ধরে এবার টিটকিরি কাটলেন কর্ণ। বললেন—আরে! অর্জুনের ঘোড়ার গলা শুনেই দ্রোণের সব গণ্ডগোল হয়ে গেছে। দুর্যোধন তুমি সৈন্যদের ঠিক রাখো। এই দ্রোণের কাছে পাণ্ডবরা আমাদের চেয়ে অনেক প্রিয়তর। নইলে কেউ ঘোড়ার চিঁহি-শব্দ শুনেই তার সওয়ারির প্রশংসা করতে থাকে—অশ্বানাং হ্রেষিতং শ্রুত্বা কঃ প্রশংসাপরো ভবেৎ? কর্ণ অনেকক্ষণ আচার্য দ্রোণের ওপর কটূক্তি বর্ষণ করে এবার আত্মশ্লাঘা আরম্ভ করলেন। আমি 'এই করব, সেই করব', আমার শরধারে অর্জুনের মাথা ঘুরিয়ে ছাড়ব—ইত্যাদি অনন্ত আত্মশ্লাঘা। দ্রোণাচার্য কর্ণের একটি কথারও উত্তর দিলেন না। কিন্তু প্রথম রীতিমতো ক্ষিপ্ত হতে দেখলাম কৃপাচার্যকে। তিনি বোধ হয় দ্রোণাচার্যকে নিয়ে কর্ণের উপহাসটুকুও সহ্য করতে পেরেছিলেন, কিন্তু কর্ণের আত্মশ্লাঘা যখন সীমাহীন হয়ে পড়ল, কৃপাচার্য তখন আর সহ্য করতে পারলেন না।

সত্যিই কেন যেন কৃপাচার্য কর্ণকে একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। যে দুবারই তিনি ভীষ্ম-দ্রোণের নিরপেক্ষতায় নিজের মত ব্যক্ত করেছেন, সেই দুবারই কিন্তু তিনি কথা বলেছেন কর্ণের বিরুদ্ধে। সেই একবার বালক বয়সেও কর্ণের আত্মশ্লাঘা শুনে অস্ত্ররঙ্গভূমিতে কৃপাচার্য থামিয়ে দিয়েছিলেন কর্ণকে। আজ আরও একবার দ্রোণের প্রতি কর্ণের তাচ্ছিল্য-টিটকিরি এবং আত্মশ্লাঘা শুনে কৃপ বললেন—তোমার বুদ্ধিটাই বড় কুটিল হে৷ তাই এত যুদ্ধ যুদ্ধ করছ। তুমি যা চাইছ অথবা যা তোমার লক্ষ্য, তা কী করে পেতে হবে তাও তুমি বোঝ না, এবং তার আরম্ভ-পরিণামও তুমি বোঝ না—নার্থানাং প্রকৃতিং বেত্সি নানুবন্ধমপেক্ষসে। এটা জেনে রেখো—যুদ্ধের মতো খারাপ জিনিস আর দ্বিতীয় নেই। তাও বা যুদ্ধ যদি করতেই হয় এবং সেই যুদ্ধে যদি জয়লাভ করতে হয়, তার স্থানকালের ভেদ আছে। এখন যুদ্ধের সময়ই নয়।

আসলে কর্ণ দ্রোণ-কৃপকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছিলেন—আয়ুষ্মান যুদ্ধবীরদের সবাইকে এত ভীত দেখছি কেন, সবাই যেন কাবু হয়ে আছে—সর্বানায়ুষ্মতো ভীতান্ সন্ত্রস্তানিব লক্ষয়ে। কৃপাচার্য সেই কথারই উত্তর দিয়ে বলছেন—এটা যুদ্ধের সময়ই নয়। বস্তুত সেই সময়ে গ্রীষ্মকাল চলছিল। শ্রান্তি এবং জলাভাবে এই সময় রথের সারথি এবং বাহন মৃত্যুর

মুখে এসে দাঁড়ায়। তারমধ্যে এই যুদ্ধের প্ররোচনা নিয়ে দুর্যোধন-কর্ণরা যেখানে যুদ্ধ করতে এসেছেন, সে জায়গাটা হল বিরাট রাজ্য, যেটা এখনকার রাজস্থানের জয়পুর-ভরতপুর অঞ্চল। পাহাড়ঘেরা এই গিরিদুর্গে এসে বাইরের সমতলের বীরপুরুষদের যে কী দুর্গতি হতে পারে, সেটা কৃপাচার্য জানেন বলেই কর্ণকে বলেছেন—যুদ্ধের ব্যাপারে যদি দেশ এবং কালের বোধ থাকে, তবেই যুদ্ধটা জয় করা যায়—দেশকালেন সংযুক্ত যুদ্ধং বিজয়দং ভবেৎ।

কৃপাচার্য বললেন আরও। বললেন—আমরা যে এখানে যুদ্ধ করতে এসেছি, তার কোনও অনুকূল পরিস্থিতিই নেই এখানে। আর কর্ণ! তোমার অবস্থাটা হয়েছে সেই প্রাবাদিক রথকারের মতো। যে রথ বানায়, সে দিব্যি একটা রথ বানিয়ে যোদ্ধাকে বলে—একখানা রথ দিলুম, কত্তা! এই রথে চড়ে যে যুদ্ধই করবেন, সেই যুদ্ধই জিতবেন। তুমি হচ্ছ সেই রথকারের মতো। সেই তোমার ভরসায় স্থানকাল কিছুই না বুঝে আমাদের মতো লোকেরা যুদ্ধ করতে পারেন না—ভারং হি রথকারস্য ন ব্যবস্যন্তি পণ্ডিতাঃ। কৃপ স্থানকালের কথা বলে এবার কর্ণের প্রতিতুলনীয় যুদ্ধের পাত্র বিবেচনা করে বললেন—আর কার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছি আমরা? না, অর্জুনের সঙ্গে। যে অর্জুন একা সমগ্র উত্তরকুরু দেশ জয় করে রাজসূয় যজ্ঞের সহায়তা করেছিলেন, যিনি একা খাণ্ডববন দহন করে অগ্নিদেবের ক্ষুধা-তর্পণ করেছিলেন, যিনি একা সুভদ্রাকে হরণ করে যদু-বৃষ্ণিদের যুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন, যিনি একা মহাদেবকে তুষ্ট করে পাশুপত অস্ত্র লাভ করেছেন এবং যিনি একা গন্ধর্ব চিত্রসেনকে জয় করে দুর্যোধনের লজ্জা নিবারণ করেছিলেন...।

একটার পর একটা অর্জুনের বিজয়বার্তা শুনিয়ে কৃপাচার্য এবার কর্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন—কর্ণ! তুমি একা-একা কোন যুদ্ধটা জিতেছ—একেন হি ত্বয়া কর্ণ কিন্নামেহ কৃতং পুরা? তুমি কী করছ জান?—একটি ক্রুদ্ধ সর্পের দিকে আঙুল তুলে শাসানোর চেষ্টা করছ এবং মুক্ত অবস্থায় সেই একটি ক্রুদ্ধ সর্পকে তর্জনী তুলে শাসাচ্ছ, আর ভাবছ সেই শাসানি দিয়েই তুমি তার বিষদাঁত উপড়ে নেবে—অবমুচ্য প্রদেশিন্যা দংষ্ট্রামাদাতুমিচ্ছসি। ব্যাপারটা অত সোজা নয় কর্ণ! যে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও চান না, তুমি তাঁর সঙ্গে একা যুদ্ধ করবে কর্ণ! এর চাইতে বরং বল—আমি গলায় পাথর বেঁধে সমুদ্রে নামব, তারপর হাত দিয়ে সাঁতার কেটে সমুদ্র পার হব। তেরোটা বছর বনে বনে ঘুরে যে কষ্ট পেয়েছে পাণ্ডবরা, আজ তার প্রতিশোধ নেবার জন্য ক্ষুধার্ত সিংহের মতো আসছে অর্জুন। অতএব কর্ণ, একা একা বেশি সাহস কোরো না, যুদ্ধ করতে হয় সবাই মিলে করব, এসব তোমার বড় বড় কথা থাক—সর্বে যুধ্যামহে পার্থং কর্ণ মা সাহসং কৃথাঃ।

কৃপাচার্য এই প্রথম খুব বড় বিকার দেখালেন কর্ণের বিরুদ্ধে অথবা দুর্যোধনের বিরুদ্ধে এবং এর কারণ নিশ্চয়ই দ্রোণাচার্যের অপমান। এই মহাস্ত্রবিদ জামাইবাবুটির জন্য কারণে-অকারণে কৃপের এত মায়া এবং প্রীতি ছিল যে, তাঁর কোনও আচরণেই তিনি কোনও দিন বাধা দেননি এবং সব সময় তাঁর উপযুক্ত মর্যাদা রেখেছেন নিজেকে অতিক্রম করে। কৃপাচার্যের কথার সূত্র ধরে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাও খুব একহাত নিলেন কর্ণকে এবং ব্যাপারটা এমন এক তুমুল পর্যায়ে পৌঁছোল যে, পিতামহ ভীষ্মকে এগিয়ে আসতে হল এই দুই প্রবীণ-নবীন ব্রাহ্মণকে থামাতে। ভীষ্ম অবশ্য কৃপের মত মেনে নিয়েও কর্ণকে একটু বাঁচাবার চেষ্টা করলেন—কারণ অর্জুন আসছেন—যুদ্ধ করতে হবে সবাইকেই। পরিশেষে ভীষ্ম এবং দুর্যোধন দুজনেই ক্ষমা চাইলেন কৃপাচার্যের কাছে এবং অশ্বত্থামার কাছেও—আচার্য এষক্ষমতাং শান্তিরত্র বিধীয়তাম্।

অর্জুনের কারণেই সাময়িক শান্তি এল যুদ্ধক্ষেত্রে। যুদ্ধে অবশ্য প্রথম পালাতে হল কর্ণকে যিনি প্রচুর আত্মশ্লাঘা করেছিলেন, তারপর সমবেত যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার মুখে মহাবীর

অর্জুন বিরাটপুত্র কুমার উত্তরকে পরম শ্রদ্ধায় যাঁকে প্রথম চিনিয়ে দিলেন, তিনি হচ্ছেন তাঁর প্রথম পাঠশালার গুরু কৃপাচার্য। অর্জুন উত্তরকে বললেন—ওই যে দেখছ—লালচে রঙের ঘোড়াগুলি, বাঘের চামড়া-মোড়া রথ, নীল পতাকা—ওটা কৃপাচার্যের রথ। কৃপাচার্যের রথের চিহ্নটাও চিনে নাও। দেখো, রথের মাথায় সোনার যজ্ঞবেদি বসানো, তুমি ওই রথের দক্ষিণে স্থাপন করো আমার রথ—তস্য দক্ষিণতো যাহি কৃপঃ শারদ্বতো যতঃ।

অর্জুন প্রথমে কৃপাচার্যের রথ প্রদক্ষিণ করে সম্মান জানালেন তাঁকে। তারপর উভয়ের প্রবল শঙ্খধ্বনির সূচনায় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হল। এই যুদ্ধে প্রত্যাশিতভাবেই কৃপাচার্য অর্জুনের কাছে হেরে গেলেন। তাঁর রথ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, ধনুক ছিন্ন, অশ্ব-সারথি মৃত্যু বরণ করেছে। অন্যান্য যোদ্ধারা কৃপের করুণ অবস্থা দেখে কোনওরকমে তাঁকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেছে—ততঃ কৃপমুপাদায় বিরথং তে নরর্ষভাঃ। আমরা জানি—এই যুদ্ধে শুধু কৃপ কেন, কৌরবপক্ষের সবাই হেরে গিয়েছিলেন এবং অর্জুনের বাণাচ্ছন্ন মূর্ছায় সকলের মতো কৃপের মাথার শুক্ল আবরণখানিও খোয়া গিয়েছিল। তবু অর্জুনের কাছে এই পরাজয়ে আচার্য কৃপ বিষণ্ণও হননি, বিস্মিতও হননি।

বার বার যা দেখা গেছে, তা হল—অনবস্থিত এবং বঞ্চিত পাণ্ডব ভাইদের ওপর ভীষ্ম-দ্রোণের যেমন পক্ষপাত ছিল, কৃপাচার্যেরও ছিল সেইরকমই। কিন্তু সোচ্চারে, জোর গলায় কখনওই কিছু বলেন না কৃপাচার্য। এই যে যুদ্ধের উদ্যোগপর্বে এত কাণ্ড ঘটে গেল, কৃষ্ণ এলেন শান্তির দূত হয়ে, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর এমনকী ধৃতরাষ্ট্র পর্যন্ত সংযত হতে বললেন দুর্যোধনকে, কিন্তু কোথাও আমরা কৃপাচার্যের গলা শুনলাম না। কৌরবসভায় ভীষ্ম এবং দ্রোণ খুব কড়া ভাষায় হৃতরাজ্য ফিরিয়ে দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন দুর্যোধনকে, কিন্তু ভীষ্ম-দ্রোণের কণ্ঠস্বরে কৃপাচার্যের কণ্ঠ সেখানে মিলিয়ে গেছে। কিন্তু অন্যান্যদের মতো কৃপও যে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ চাননি, সে কথা ধৃতরাষ্ট্রের কথা থেকেই প্রমাণিত হয়। তিনি একসময় দুঃখ করে সহযোগী সঞ্জয়কে বলেছিলেন—তবু সেই যুদ্ধ হল। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, গান্ধারী, কেউ চাননি যুদ্ধ হোক, তবু সেই যুদ্ধ হল—ন কৃপো ন চ গান্ধারী নাহং সঞ্জয় রোচয়ে।

কৃপাচার্যকে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে দ্রোণ-ভীষ্মের কারণেই। এঁরা প্রত্যেকেই কুরুবাড়ির অন্নঋণ চুকোচ্ছেন। ফলে দুর্যোধন যখন এক অক্ষৌহিনী সেনার ভার দিয়ে কৃপকে নিজের স্বপক্ষে যুদ্ধ করতে বলেছেন, তখন তিনি প্রত্যাখ্যান করেননি দুর্যোধনকে। স্বপক্ষের যুদ্ধনায়কেরা কে কত শক্তিধর এবং কে কত দিনে পাণ্ডবসৈন্যের বিনাশ ঘটাতে পারেন, এই প্রশ্নে কৃপাচার্যের সততা এবং সচেতনতা পরম কৌতূহল জাগায়। এই প্রশ্নে কর্ণ বলেছিলেন—আমার পাঁচ দিন লাগবে; অশ্বত্থামা দশ দিন সময় চেয়েছেন, ভীষ্ম-দ্রোণ বলেছেন—আমাদের এক-একটি মাস সময় লাগবে; সেখানে কৃপাচার্য নিজের ওজন বুঝে পুরো দু মাস সময় চেয়েছেন পাণ্ডবসৈন্য শাতন করার জন্য।

পাণ্ডবদের রাজ্যলাভের ব্যাপারে তাঁর পূর্ণ সমর্থন থাকা সত্ত্বেও যে তাঁকে দুর্যোধনের পক্ষে অংশগ্রহণ করতে হল, তার কারণ কৃপাচার্য নিজেই জানিয়েছেন যুধিষ্ঠিরকে। যুদ্ধারম্ভে গুরু এবং আচার্যের আশীর্বাদ লাভ করার জন্য যুধিষ্ঠির ক্রমান্বয়ে ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কৃপের কাছে এসেছেন এবং এঁরা প্রত্যেকেই যুধিষ্ঠিরকে একই কথা বলেছেন। ভীষ্ম-দ্রোণের পরেই কৃপ বলেছেন—যুধিষ্ঠির! কৌরবপক্ষে থেকেই আমাকে যুদ্ধ করতে হবে। এ ব্যাপারে আমি নিরুপায়। কেন জান? কেননা, মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কারও দাস নয়, আর ঠিক সেই জন্যই কৌরবপক্ষে আমি বাঁধা পড়ে আছি। আমি জানি—আমি ক্লীব ব্যক্তির মতো কথা বলছি। তবু এই সত্যটা জেনে আমাকে যুদ্ধত্যাগের পরামর্শ ছাড়া আর তুমি যা চাও, তাই তোমাকে দেব, যুধিষ্ঠির—অতস্ত্বাং ক্লীববৎ ব্রূয়াং যুদ্ধাদন্যৎ কিমিচ্ছসি?

তিন বৃদ্ধের মুখেই এই অসহায় উক্তি আমাদের আশ্চর্য করে। এই এক পরম আশ্চর্য নীতিবোধ—অন্নের ঋণ চুকোতে হবে। সেই কবে মহারাজ শান্তনুর কোলে চেপে কুরুবাড়িতে এসেছিলেন কৃপাচার্য। এই বাড়িতে তিনি মানুষ হয়েছেন, স্থিত হয়েছেন মর্যাদার আসনে। চিত্রাঙ্গদ, বিচিত্রবীর্য এবং পাণ্ডু—এই তিন রাজাকে তিনি মরতে দেখেছেন। তারপর এই ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্যোধনের আমলে ভীষ্ম-দ্রোণের মতো কৃপাচার্যও তাঁদের নৈতিকতায় সন্দিহান, কিন্তু সেই শান্তনুর সময় থেকে এতাবৎ কালের রাজবৃত্তিভোগের ঋণ কৃপাচার্যও ভোলেননি। ভীষ্ম বলেছিলেন—নিজের প্রাণের পরিবর্তেও কৃপাচার্য তোমার শত্রুদের বধ করে যাবেন, সে কথাটা বড়ই ঠিক। দুর্যোধনের পক্ষে তাঁকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে রাজপিণ্ড দানের দায়ে। তাই যুধিষ্ঠিরের কাছে তাঁকে মাথা নিচু করতে হচ্ছে ক্লীবের মতো। কেননা তিনি যুধিষ্ঠিরকে এবং তাঁর নীতিধর্মকে সমর্থন করছেন একদিকে। অন্যদিকে শরীর দিয়ে তাঁকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে দুর্যোধনের পক্ষে, বলা উচিত প্রাতীপেয় শান্তনুর উত্তাধিকারীর পক্ষে, কেননা হস্তিনাপুরের রাজলক্ষ্মী তখনও যুধিষ্ঠিরের অঙ্কশায়িনী নন।

যুধিষ্ঠির বুঝেছেন, এই অসহায়তা যুধিষ্ঠির বোঝেন। বুঝেই তিনি জিজ্ঞাসা করতে চাইলেন—কী উপায়ে কৃপাচার্য বধ্য হবেন। ঠিক এই কথাগুলো তিনি ভীষ্ম এবং দ্রোণকেও জিজ্ঞাসা করেছেন, উত্তরও পেয়েছেন একভাবে। কিন্তু কৃপকে জিজ্ঞাসা করেই তিনি লজ্জায় পড়ে গেছেন। সবাই জানে কৃপাচার্য চিরজীবী। তিনি কারও বধ্য নন। কেমন করে, কী উপলক্ষে অথবা কোন তপস্যায় কৃপাচার্য এই চিরজীবিতার বরলাভ করেছিলেন, সে প্রসঙ্গ মহাভারতে কোথাও পাইনি। হয়তো বা মহাভারতের বিশাল যুদ্ধে যেখানে ভীষ্ম-দ্রোণের মতো মহাবীরের পতন ঘটেছে, অথচ কৃপাচার্যের সেই গতি হয়নি, হয়তো এই সৌভাগ্যই তাঁকে চিরজীবিত্বের মহাকাব্যিক স্থিতি জুগিয়েছে। নইলে তাঁর জন্মলগ্নেও পিতা শরদ্বানের কাছ থেকে নেমে আসেনি আশীর্বাদ অথবা পরেও কোনও তপস্যার ফলে বর্ষিত হয়নি এই দৈববাণী। অথচ লোকপ্রবাদ—কৃপাচার্য চিরজীবী। আমাদের ধারণা—মহাভারতের কবি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরেও কৃপাচার্যকে বেঁচে থাকতে দেখে কাব্যিক অভিসন্ধিতেই কৃপাচার্যের এই চিরজীবিতার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন তাঁর কালজয়ী মহাকাব্যে।

যুধিষ্ঠির তাই কথাটা বলে লজ্জাই পেলেন—ইত্যুক্ত্বা ব্যথিতো রাজা নোবাচ গতচেতনঃ। যুধিষ্ঠিরের মুখে কথা জোগাচ্ছে না দেখে কৃপ বললেন—তুমি তো জানই আমি অবধ্য। তবে আমার আশীর্বাদ—এ যুদ্ধে তোমারই জয় হবে। তুমি এখানে এসেছ, আমার আশীর্বাদ চেয়েছ—এতেই আমি পরম প্রীত হয়েছি, তোমার জয় হোক—প্রীতস্তে'ভিগমেনাহং জয়ং তব নরাধিপ।

যুদ্ধ একটা মানুষকে কেমন চিনিয়ে দেয়, এমনকী তাঁর ব্যক্তিচরিত্রের দ্বিধা-দ্বন্দ্বগুলির দিকেও কেমন অঙ্গুলিসংকেত করে। এই যে বিরাট যুদ্ধ লাগল এবং তাতে ভীষ্মের মতো মহাবীরও শরশয়নে স্থিত হলেন, এই পুরো দশ দিন সময় জুড়ে কৃপাচার্যের উপস্থিতি আমরা টেরই পাই না। মাঝে মাঝে এর-ওর-তার সঙ্গে কৃপাচার্যের যুদ্ধ হচ্ছে, কিন্তু তাতে পাণ্ডবদের এমন কিছু ক্ষতি হচ্ছে না, অথবা দুর্যোধনেরও কিছু বৃদ্ধি ঘটছে না। ভীষ্মের পর কৃপের অতি-কাছের মানুষ দ্রোণাচার্যের সেনাপতিত্বকালেই বা কৃপাচার্যের কী ভূমিকা! দ্রোণের সেনাপতিত্বকালে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে চক্রব্যূহে অভিমন্যুবধ, সেই যুদ্ধেও কৃপাচার্য সপ্তরথীর অন্যতম রথী বটে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে যুদ্ধেও অভিমন্যুর কোনও সমস্যা হয়নি। কৃপাচার্যের অশ্বগুলি অভিমন্যুর হাতে মারা যায় বটে, তবে তিনি বেশি মার খানও না, আবার মারেনও না তত।

অভিমন্যুবধের প্রতিক্রিয়ায় কৌরবপক্ষে ধৃতরাষ্ট্রের জামাই জয়দ্রথ মারা গেলেন। এবারে

এই নক্ষত্র-পতনের ভয়ংকর প্রভাব এসে পড়ল দ্রোণাচার্যের ওপর। দ্রোণ দুর্যোধনের কাছে চরম গালাগালি খেলেন এবং তিনি গালাগালি দিলেনও। তবু যুদ্ধ চলল যুদ্ধের মতো। দ্রোণ পাণ্ডবদের কাউকে হত্যা করলেন না। ঠিক এই সময় সেই পুরনো ঝগড়াটা আবার চেতিয়ে উঠল। দুর্যোধন দ্রোণের ব্যাপারে হতাশ হয়ে কর্ণকে ধরলেন পরিত্রাতার মর্যাদায়। এবার আবার শুরু হল সেই আত্মশ্লাঘা-অর্জুনকে মারব, ভীমকে মারব, সমস্ত পাণ্ডবদের মারব, পাঞ্চালদের মারব—তারপর দুর্যোধন! তোমার হাতের মুঠোয় এনে দেব বিজয়লক্ষ্মী—জয়ং তে প্রতিদাস্যামি বাসবস্যেব পাবকিঃ। অন্তত আমি বেঁচে থাকতে তোমার দুঃখ করার কোনও কারণ নেই—ময়ি জীবতি কৌরব্য বিষাদং মা কৃথাঃ ক্বচিৎ।

এই সব বারফাট্টাই কথা কৃপের সামনেই হচ্ছিল বলে তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। অনেকক্ষণ তিনি শুনছেন এবং আগেও একবার শুনেছেন সেই বিরাট রাজ্যে গোহরণের সময়। সেবার আগুয়ান অর্জুনের কারণে প্রসঙ্গটা ধামাচাপা পড়েছিল। আজ সে দায় নেই বটে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে একের পর এক মহাবীরের পতন ঘটেছে। সদ্য মারা গিয়েছে জয়দ্রথ। অতএব এই বিষম মুহূর্তে দ্রোণাচার্যের গুরুত্ব হ্রাস করে, কর্ণের এই মৌখিক আস্ফালন সহ্য করতে পারলেন না কৃপ। তিনি প্রায় হাততালি দিয়ে বললেন—আরে বাঃ। দারুণ খবর! দারুণ খবর এটা! এতদিনে আমাদের দুর্যোধন তাঁর পরিত্রাতাকে খুঁজে পেয়েছেন—শোভনং শোভনং কর্ণ সনাথঃ কুরুপুঙ্গবঃ। তবে হ্যাঁ, যুদ্ধজয়ের কাজটা যদি বাক্যি দিয়েই সিদ্ধ হত, তা হলে তো ভালই ছিল। বহুকাল ধরে এই বাক্যি শুনছি, আর এই হামবড়াইটাও শুনছি, কিন্তু কোনও দিন তেমন কোনও ফল দেখলাম না যাতে তোমার বিক্রম জয় এনে দিল দুর্যোধনকে। বহুবার পাণ্ডব অর্জুনের সঙ্গে তোমার মুখোমুখি লড়াই হয়েছে, কিন্তু একটা উদাহরণও তুমি দিতে পারবে না যেখানে তুমি না হেরে জিতে এসেছ—সর্বত্র নির্জিতশ্চাসি পাণ্ডবৈঃ সূতনন্দন।

কৃপাচার্য এবার একটি একটি করে উদাহরণ দিলেন—যেখানে যেখানে কর্ণ দ্বৈরথ-যুদ্ধে হেরেছেন অর্জুনের সঙ্গে। তারপর কঠিন ব্যঙ্গোক্তি মিশিয়ে কৃপ বললেন—তুমি একা অর্জুনের সঙ্গেই এঁটে উঠতে পার না, যেখানে নাকি সমস্ত পাণ্ডবদের যুদ্ধে হারাবে তুমি। তারচেয়ে ভাল কথা বলি শোনো, কর্ণ—তুমি কথা কম বলো, আর যুদ্ধের কাজটা করে দেখাও—অব্রুবন্ কর্ণ যুধ্যস্ব কত্থসে বহু সূতজ—নইলে এই মেলা বকবকানি শরৎকালের মেঘের মতো শুধু গর্জায়, বর্ষায় না। তোমার এত মেজাজ, এত গর্জন, সবই চলবে যতক্ষণ না অর্জুন তোমার সামনে আসছে—যাবৎ পার্থং ন পশ্যসি—আর অর্জুন সামনে এলেই এই গর্জন তোমার ছুটে যাবে—দুর্লভং গর্জিতং পুনঃ।

কৃপের ব্যঙ্গোক্তি শুনে কর্ণ কিন্তু একটুও দমলেন না। বললেন—বীরেরা যে কাজটা করে, সেটা মনে মনে আগে ভেবে নেয়,—মনসা হি ব্যবস্যতি—তারপর কাজটা করে দেখায়, আর আমি নিজের ক্ষমতা জানি বলেই গর্জন করছি। তা ছাড়া কৃষ্ণকে এবং পাণ্ডবদের হত্যা করার ব্যাপারে যদি আমি গর্জন করেই থাকি, তাতে বামুন ব্যাটা! তোর কী ক্ষতি হচ্ছে—গর্জামি যদ্যহং বিপ্র তব কিং তত্র নশ্যতি। কৃপ বললেন—চিরকাল এই কাজটাই করে গেলি, সারথির পো! চিরটা কাল ওই কৃষ্ণকে, ওই যুধিষ্ঠিরকে আর ওই অর্জুনকে গালাগালিই দিয়ে গেলি, আর জয়ের ইচ্ছাটা তোর মনেই রয়ে গেল—আমি তোর এই মনের প্রলাপ গ্রাহ্যই করি না—মনোরথপ্রলাপা মে ন গ্রাহ্যাস্তব সূতজ। কৃপাচার্য এবার পাণ্ডবদের শক্তিমত্তা ছাড়াও যুদ্ধে উপস্থিত কোন কোন মহাবীরের সঙ্গে কর্ণকে লড়াই করে জিততে হবে, তার একটা তালিকা দিয়ে বললেন—এঁদেরও সবাইকে তুই জয় করবি ভাবছিস। তবে সবচেয়ে আশ্চর্য—তুই ভাবিস—তুই কৃষ্ণকেও জয় করবি—যস্ত্বমুৎসহসে যোদ্ধুং সমরে শৌরিণা সহ।

এই প্রথম কর্ণ স্বীকার করলেন যে, পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধজয়ের হিসেব কষাটা দেবতাদের পক্ষেও কঠিন, কিন্তু কর্ণ যে কখনও ভেঙেও পড়েন না এবং তিনি মচকানও। অতএব সঙ্গে সঙ্গেই বললেন—আমার কাছে ইন্দ্রের দেওয়া সেই একবীরঘাতিনী অব্যর্থ শক্তিটি আছে, সেটা দিয়ে আমি একটি লোককেই মারব এবং সেটা হবে অর্জুন সব্যসাচী। আর তাকে যদি একবার মারতে পারি তা হলে কোনও ভাবেই এই অনর্জুন পৃথিবী অন্য পাণ্ডবরা ভোগ করতে পারবে না। তখন আপনিই এই পৃথিবী দুর্যোধনের করায়ত্ত হবে। নিজের মৌখিক আড়ম্বরের পিছনে বেশ যেন একটা বাস্তব সত্যের ভিত্তি আছে—এমন একটা আভাস দিয়েই কর্ণ আবার নেমে এলেন তাঁর তিরস্কারের গণ্ডীতে। বললেন—আমার রাজনৈতিক কৌশল (এ ক্ষেত্রে একাঘ্নী বাণ) আমারই হাতে আছে বলেই আমি গর্জাচ্ছি—ততো গর্জামি গৌতম। এর পরেই গালাগালি—আর তুই তো ব্যাটা বুড়োহাবড়া, তার ওপরে বামুন, তার ওপরে তোর ক্ষমতাও কিছু নেই—ত্বন্তু বিপ্রশ্চ বৃদ্ধশ্চ অশক্তশ্চাপি সংযুগে। পাণ্ডবদের ব্যাপারে তোর রসও আছে যথেষ্ট। কিন্তু এইবার শেষ কথা বললাম—ফের যদি আমার ব্যাপারে এমন উলটোপালটা কথা শুনি, তা হলে এই খড়্গ দিয়ে তোর জিবটাই কেটে নেব—ততস্তে খড়্গমুদ্যম্য জিহ্বাং ছেৎস্যামি দুর্মতে।

ঘটনা যেটা ঘটল—কর্ণ তাঁর মৌখিকতার মধ্যেই খড়্গ দিয়ে কৃপাচার্যের জিব কাটার কথা বলেছিলেন, কিন্তু মাতুল কৃপাচার্যের অপমান দেখে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা একেবারে খড়্গ নিয়ে তেড়ে গেলেন কর্ণের দিকে। মারামারি লাগে প্রায়। এই অবস্থায় স্বয়ং দুর্যোধন এসে দু'পক্ষকেই থামালেন এবং শান্তিপ্রক্রিয়ায় অংশ নিলেন স্বয়ং কৃপাচার্য। বললেন—আমরা তোকে ক্ষমা করে দিলাম, তবে এই যে তোর অহঙ্কার, এই যে সকলকে ছোট করে দেখা স্ফীতভাব, এই অহঙ্কার তোর চূর্ণ করে দেবে অর্জুন—দর্পমুৎসিক্তমেতত্তে নাশয়িষ্যতি ফাল্গুনঃ।

এই প্রথম আমরা কৃপাচার্যকে অনেকক্ষণ ধরে কোনও ঘটনার মধ্যে আকুল হতে দেখলাম। আমরাও যে এই দীর্ঘ উতোর-চাপান উল্লেখ করলাম, তার দুটো কারণ আছে। প্রথমত এটা তো পরিষ্কার যে, পাণ্ডব অর্জুন এবং তাঁর সূত্রে সমস্ত পাণ্ডবদের ওপর কৃপাচার্যের একই স্নেহ-মমতা আছে যা দ্রোণাচার্য এবং ভীষ্মের সমগোত্রীয়। দ্বিতীয়ত লক্ষণীয় অন্যতর এক চক্র, যা পাণ্ডব-কৌরব নিরপেক্ষ একটি উপদলের মতো। আগেও সেই বিরাট রাজার গোধন হরণের সময়েও দেখেছি যে, অর্জুনকে কেন্দ্র করে কর্ণের সঙ্গে ঝগড়া লাগার সময় দ্রোণাচার্য-কৃপাচার্য এবং অশ্বত্থামার অর্থাৎ এক দল পিতা-পুত্র-মাতুলের সমীকরণ ঘটছে। এখনও দেখলাম সেই সমীকরণ, আরও দৃঢ়, আরও ঘনিষ্ঠভাবে।

এর পরে দ্রোণ মারা গেছেন এবং সেখানে প্রধান নিমিত্ত কারণ হয়ে রইলেন পাঞ্চাল ধৃষ্টদ্যুম্ন। দ্রৌণি অশ্বত্থামা পিতার মৃত্যুর পর সমগ্র পাঞ্চালবাহিনীর ওপর পরম রুষ্ট হয়ে রইলেন, যদিও পাণ্ডব অর্জুন নিজেই গুরুহত্যার প্রক্রিয়ায় ধৃষ্টদ্যুম্নের ওপরে ক্ষুব্ধ থাকায় অশ্বত্থামা তাঁর রোষাগ্নিবেষ্টনীর মধ্যে ছিলেন না। যুদ্ধপর্বে যখন কর্ণের মৃত্যুর সময় আসন্ন হয়ে আসছে, সেই সময় অশ্বত্থামা কিন্তু দুর্যোধনকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে বলেছিলেন—দুর্যোধন! তুমি শেষ করো এই ভয়ংকর যুদ্ধ। তোমার-আমার সকলের গুরু ব্রহ্মার সমান দ্রোণাচার্য মারা গেছেন। মারা গেছেন ভীষ্ম। আমি এবং আমার মাতুল কৃপাচার্য দুজনেই অবধ্য কাজেই আমাদের জন্য নয়, সকলের মঙ্গলের জন্যই বন্ধ হোক এই যুদ্ধ। দুর্যোধন শোনেননি। এরপর মারা গেছেন কর্ণও, দুর্যোধনের প্রধান সহায়। কৌরবদের সেনা-পরিবারে সর্বত্র হতাশা নেমে এসেছে। মদ্ররাজ শল্য তখনও সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হননি এবং কোনওভাবে পাণ্ডবদের ঠেকানো যাচ্ছে না। দুর্যোধনের প্রিয়তম ভাই দুঃশাসন, কুরুবাড়ির জামাতা জয়দ্রথ, দুর্যোধনের পুত্র লক্ষ্মণ এবং দুর্যোধনের অন্যান্য ভাইরাও মারা গেছেন। ঠিক এই পরিস্থিতিতে বৃদ্ধ কৃপাচার্য দুর্যোধনের কাছে আসছেন একান্তে।

কৃপাচার্যের বয়স হয়েছে। কর্ণ সেটা টিটকিরি দিয়ে বলেছিলেন, কিন্তু কথাটা তো মিথ্যে নয়। তার মধ্যে কৃপের স্বভাবটাও অন্য যোদ্ধাদের মতো উগ্র নয়। কর্ণ তাঁকে অনেক গালাগালি দেবার সময়েও তাঁর যে চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে, তা মহাভারতের কবিকে উল্লেখ করতে হয়েছে। অশ্বত্থামার মতো সাংঘাতিক বীরকে নিজের পক্ষে পেয়েও তিনি যে তাঁকে কর্ণের বিরুদ্ধে থামিয়ে দিতে পেরেছিলেন, সেটা সেই স্বভাবেরই বিবর্তনে। ক্রুদ্ধ হলেও তাঁর রাগ পড়ে যেত খুব তাড়াতাড়ি—সোম্যস্বভাবাদ্ রাজেন্দ্র ক্ষিপ্রমাগতমার্দবঃ। আজকে সেই সৌম্যতা এবং মৃদুতা নিয়েই তিনি দুর্যোধনের কাছে এসেছেন 'বয়ঃশীলসমন্বিত' বৃদ্ধ ব্রাহ্মণঃ। বিশেষত দ্রোণাচার্য বেঁচে নেই বলেই আজ যেন তিনি অধিকতর দায়িত্ব বোধ করছেন দুর্যোধনকে শান্ত করার।

কৃপ বললেন—আমার কথাটা মন দিয়ে শোনো, দুর্যোধন! তারপর যা তোমার মনে হয়, করো। এটা তো ঠিকই যে, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যুদ্ধ করা এবং যুদ্ধে পরাঙ্‌মুখ হওয়াটা অধর্ম বটে। কিন্তু যারা বাঁচতে চায়, তাদের কাছে বড় কঠিন এই ক্ষত্রিয়জীবিকা—তস্মাদ্ ঘোরাং সমাপন্না জীবিকাং জীবিতার্থিনঃ। বস্তুত কৃপাচার্য নিজেই এক জীবনকামী ব্রাহ্মণ। এই যুদ্ধ, এত যুদ্ধ তাঁর ভাল লাগে না। বয়সের ভারে ক্লান্ত ব্রাহ্মণ মৃত্যু দেখে দেখে বিপর্যস্ত হয়ে দুর্যোধনকে বলছেন—তোমার ভালর জন্যই বলছি, বাছা! দেখ, ভীষ্ম শরশয্যায় পড়ে আছেন, দ্রোণ মারা গেছেন এবং তোমার প্রিয়তম সহায় কর্ণও চলে গেছেন। আজ জয়দ্রথ নেই, তোমার ভাইরা বেঁচে নেই, তোমার পুত্রটিও মারা গেছে। আর বাকি রইল কে—কিং শেষং পর্য্যুপাস্মহে? যাদের ভরসায়, যাদের আশায় তুমি এই রাজ্য শাসন করবে ভেবেছিলে—যেষু ভারং সমাসজ্য রাজ্যে মতিমকুর্মহি—তারা সবাই একে একে চলে গেছে।

কৃপাচার্য কৌরবপক্ষের এই অদ্ভুত অবস্থা সহ্য করতে পারছেন না। আজকে যুদ্ধের সতেরোতম দিন। অষ্টাদশতম দিবসের পরিণতি কৃপাচার্য চোখে দেখতে পাচ্ছেন যেন। কুরুবাড়ির এই দামাল ছেলে দুর্যোধনকে তিনি বুঝি শুধু অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের শেষ সান্ত্বনার জন্য বাঁচিয়ে রাখতে চান। কৃপ বললেন—এত বড় বড় যোদ্ধারা সব যুদ্ধে মারা গেলেন, তাঁদেরকে বাদ দিয়ে আমরা বড় করুণ অবস্থায় এসে ঠেকেছি এবং আরও করুণ অবস্থায় থাকব—কৃপণং বর্তয়িষ্যামঃ পাতয়িত্বা নৃপান্ বহূন্। অথচ ব্যাপারটা যুক্তিতে এনে দেখো। এত বড় বড় যোদ্ধারা বেঁচে থেকেও কিন্তু কেউ অর্জুনকে আটকাতে পারেননি। তোমার সেনারা আজ চোখে আঁধার দেখছে, সব সময় কাঁপছে অর্জুনকে দেখে। অথচ কোথায় আজ তোমার সহায় সূতপুত্র কর্ণ, কোথায় তোমার সহায় দ্রোণ, কোথায় ভাই দুঃশাসন? অথচ বিপরীত দেখো, ভীম! সেই নষ্টচরিত্র কৌরবসভায় দ্রৌপদীর অপমানের সময় ভীম যা যা বলেছিল, সব কিন্তু সে করেছে এবং আরও করবে—কৃতঞ্চ সকলং তেন ভূয়শ্চৈব করিষ্যতি।

পূর্ব-ঘটনার প্রমাণে ভবিষ্যতে দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গের কথাটাও বুঝি স্মরণ করিয়ে দিতে চাইলেন কৃপাচার্য—আরও কিন্তু করবে—ভূয়শ্চৈব করিষ্যতি। কৃপাচার্য এবার রাজনীতিকে দর্শনের পর্যায়ে উন্নীত করে বললেন—তুমি তোমার নিজের সুরক্ষার জন্য দিগ্‌বিদিক থেকে সহায় সংগ্রহ করেছিলে, কিন্তু সেই তোমার অস্তিত্বই পরম সংশয়িত—স চ সংশয়িতস্তাত আত্মা চ ভরতর্ষভ। দুর্যোধন তুমি নিজের জীবনটুকু অন্তত বাঁচাও, কেননা তোমার এই জীবনই সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দের আধার। কৃপাচার্য যুদ্ধ ছেড়ে 'ডিপ্লোম্যাসি'র উপদেশ দিলেন দুর্যোধনকে। বললেন—যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল, তখন ধরে নিই, তোমার বলাবল, সেনাক্ষমতা পাণ্ডবদের চেয়ে ভাল ছিল, যুদ্ধ চলাকালীন তা সমান হয়েছিল এবং তা এখন প্রতিতুলনায় ক্ষীণ। কূটনীতিতে সমানে সমানে সন্ধি হয়, আর হীন অবস্থায় তো হয়ই—হীয়মানেন বৈ সন্ধি পর্যেষ্টব্যঃ সমেন চ—এটাই বৃহস্পতি-কথিত কূটনীতি। এখন যেহেতু

তোমার অবস্থা পাণ্ডবদের চেয়ে খারাপ, তাই আমি বলছিলাম—যুদ্ধ থামিয়ে আপাতত সন্ধি করো পাণ্ডবদের সঙ্গে—তদত্র পাণ্ডবৈঃ সার্ধং সন্ধিং মন্যে ক্ষমং প্রভো।

কৃপাচার্য উপদেশ দিয়ে যাচ্ছিলেন বটে, কিন্তু কেমন যেন বুঝতে পারছিলেন যে, দুর্যোধন তাঁর কথা শুনবেন না। আর এত কথা বলার পরেও কেউ যদি তা না শোনে, তবে একটু খারাপ তো লাগবেই। কৃপাচার্য সেই মনখারাপের কথাটাও প্রকাশ করে দুর্যোধনকে বললেন—দেখ বাছা! যে তার নিজের ভাল বোঝে না এবং ভাল বললে শোনেও না, তার রাজ্য থাকলেও ধ্বংস হয়ে যায়। আর আমি বলি কী, এইভাবে মূর্খের মতো ধ্বংস হয়ে যাবার কোনও অর্থ নেই, যুধিষ্ঠিরের কাছে একটু নিচু হলেই যদি তুমি রাজ্য পাও, তো সেটাই তো সবচেয়ে ভাল। একটা কথা জেনো—যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের কথা কখনও ফেলবেন না। তিনি চাইলে যুধিষ্ঠির এই হস্তিনাপুরে আবার তোমাকে রাজা করবেন এবং মহামতি কৃষ্ণেরও সে ব্যাপারে সম্মতি থাকবে—বিনিযুঞ্জীত রাজ্যে ত্বাং গোবিন্দবচনেন চ। এই সপ্তদশ দিবস যুদ্ধের পরেও কৃপাচার্য তাঁর বিরুদ্ধপক্ষের যোদ্ধাদের ওপরেই আস্থা রাখেন। তিনি মনে করেন—কৃষ্ণই পাণ্ডবপক্ষের প্রকৃত নেতা এবং ধৃতরাষ্ট্র যদি কৃষ্ণকে একটা কথা বলেন তিনি তা অমান্য করবেন না, আবার কৃষ্ণও যা বলবেন যুধিষ্ঠির তা অমান্য করবেন না —নাতিক্রমিষ্যতে কৃষ্ণো বচনং কৌরবস্য চ।...নাপি কৃষ্ণস্য পাণ্ডবঃ।

দুর্যোধনকে সদুপদেশ দিয়েও কৃপ শান্তি পেলেন না। তিনি বুঝলেন যে, দুর্যোধনের কাছে এগুলো বলাটা অনেকটা নিজে নিজেই বিলাপ করে চুপ করে যাওয়ার মতো—ইতি বৃদ্ধো বিলপ্যৈতৎ কৃপঃ শারদ্বতো বচঃ। এতক্ষণ কথা বলে তাঁর শ্বাস দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হল, আর দুর্যোধন শুনবেন না বুঝে কষ্টও হল যথেষ্ট। পরিশেষে নিজের ব্যাপারেও তাঁর অবস্থানটুকু তিনি পরিষ্কার জানিয়ে বললেন—যা আমি এতক্ষণ ধরে বললাম, তা যুধিষ্ঠিরের প্রতি মায়া বা করুণায় বলিনি, অথবা নিজে বেঁচে থাকার জন্যও বলিনি—ন ত্বাং ব্রবীমি কার্পণ্যাৎ ন প্রাণপরিরক্ষণাৎ। যা বলেছি, তোমার ভালর জন্য বলেছি এবং হয়তো তুমি মরার পরে তা বুঝবে—পথ্যং রাজন্ ব্রবীমি ত্বা তৎপরাসুঃ স্মরিষ্যসি।

দুর্যোধন কৃপের কথা শুনলেন না। তবে যুদ্ধের এই সপ্তদশতম দিবসে তাঁর যত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, যত নিকট জন তাঁর মারা গেছেন, তার নিরিখে দুর্যোধন এখন কিছু আবেগপ্রবণ। বিশেষত যাঁরা তাঁর জন্য যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের বিনিময়ে এখন তিনি নিজে বেঁচে থেকে রাজ্য ভোগ করবেন—এমনটি তিনি চাইলেন না এবং সেটা এই মুহূর্তে সত্যিই খুব অযৌক্তিক নয়। যুদ্ধের সতেরোতম দিনটি শল্যের সেনাপতিত্বে কাটল এবং অষ্টাদশ দিবসেই ঊরুভগ্ন দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরদেশে পড়ে রইলেন নিঃসহায়, ভীমের গদাঘাতে দীর্ণ অবস্থায়। আত্মকৃত দোষের জন্য তিনি বিলাপও করলেন, আবার ভীমের অন্যায় আঘাতের জন্য ক্রুদ্ধও হলেন যথেষ্ট। কৌরবপক্ষে তখন জীবিত শক্তিধর বীর মাত্র তিনজন—কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা এবং যদুবংশীয় হৃদিকের পুত্র কৃতবর্মা। দুর্যোধন যখন ভীমের গদাঘাতে ধরাশায়ী হলেন, তখনও কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা এবং কৃতবর্মা যুদ্ধক্ষেত্রে রয়েছেন। বার্তাকথকদের কাছ থেকে দুর্যোধনের আর্ত সংবাদ শুনে তাঁরা দ্রুতগামী অশ্বে ত্বরিতে উপস্থিত হলেন দুর্যোধনের কাছে—অশ্বত্থামা কৃপশ্চৈব কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ।

ভগ্নোরু দুর্যোধনের করুণ অবস্থা দেখে তিন জনেই তাঁর পাশে মাটিতে বসে পড়লেন। অশ্বত্থামা দুর্যোধনের প্রায় সমবয়সি, সেই ছাত্রকাল থেকে তিনি দুর্যোধনের সঙ্গে আছেন। প্রবল প্রতাপী অহঙ্কারী রাজা দুর্যোধনের করুণ অবস্থা দেখে অশ্বত্থামার হৃদয় একেবারে উত্তাল হয়ে উঠল। বিশেষত ভীমের অন্যায় গদাঘাত তাঁকে তাঁর পিতার অন্যায় মৃত্যু স্মরণ করিয়ে দিল। বিশেষত অস্ত্রত্যক্ত অবস্থায় পাঞ্চাল ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর পিতার প্রতি যে আচরণ করেছেন, তাতে এখন যেন আরও জ্বলে উঠলেন অশ্বত্থামা। তিনি দুর্যোধনের হাতখানি

সজোরে চেপে ধরে বললেন—আমার পিতাকে এই ক্ষুদ্র অসভ্যেরা যেভাবে অন্যায়ের আশ্রয় নিয়ে হত্যা করেছিল, তাতেও আমার তেমন দুঃখ হয়নি, যেমনটি হচ্ছে তোমাকে দেখে। আমি এর প্রতিশোধ নেব রাজা। আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে এই পাঞ্চালদের আমি যমের বাড়ি পাঠাব। তুমি আদেশ করো—অদ্যাহং সর্বপাঞ্চালান...প্রেতরাজ নিবেশনম্।

লক্ষণীয়, অশ্বত্থামা কিন্তু পাণ্ডবদের নাম করেননি, মনে থাকলেও মুখে বলেননি, শুধু উপলক্ষণে তিনি পাঞ্চালদের কথা বলেছেন। কিন্তু তাতেও পরম প্রীত হলেন দুর্যোধন। ভাবলেন—তা হলে এখনও একটি লোক আছে যে, পাণ্ডবদের ক্ষতি চায় অন্তত। তিনি সানন্দে সামনে দাঁড়ানো বৃদ্ধ কৃপাচার্যকে বললেন—আচার্য! আমাকে তাড়াতাড়ি এক কলস জল ভরে এনে দেবেন দয়া করে—আচার্য শীঘ্রং কলসং জলপূর্ণং সমানয়। দুর্যোধনের এই বিপন্ন মুহূর্তে এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো কাজ করছেন। দুর্যোধনের কথা শুনে কৃপাচার্য দ্বৈপায়ন হ্রদ থেকে কলস ভরে নিয়ে আসলেন জল। দুর্যোধনের সামনে দাঁড়াতেই তিনি বললেন—আমার আজ্ঞায় আপনি এই দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে সেনাপতির কর্মে অভিষিক্ত করুন, আচার্য। এই মরণমুহূর্তে আমার প্রিয় কিছু যদি কিছু করার ইচ্ছে থাকে, তবে রাজাজ্ঞা পালন করুন, আচার্য। রাজার আদেশের পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে কৃপাচার্য পূর্ণ কলসের জল ঢেলে দিলেন অশ্বত্থামার মাথায়—রাজ্ঞস্তু বচনং শ্রুত্বা কৃপঃ শারদ্বতস্ততঃ।

সেনাপতি অশ্বত্থামা শেষবারের মতো রাজা দুর্যোধনকে জড়িয়ে ধরে বিদায় নিলেন। সঙ্গে কৃপাচার্য এবং কৃতবর্মা। যেতে যেতেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। সামনে বিস্তীর্ণ বন। এই বন পার হতে গেলে রাত্রির অন্ধকারে আর পথ চেনা যাবে না। অতএব তিনজনই একটি বটগাছের তলায় এসে ঘোড়া ছেড়ে দিলেন। মাটিতে বসে একটু বিশ্রাম নিতেই বৃদ্ধ কৃপাচার্য এবং কৃতবর্মা—দিনশ্রান্ত দুই যোদ্ধার চোখ একেবারে ঘুমে জড়িয়ে এল—ততো নিদ্রাবশং প্রাপ্তৌ কৃপভোজৌ মহারথৌ। যাঁদের সুখশয্যায় শয়ন করার কথা, তাঁরা দুজনেই মাটিতে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন অঘোরে। জেগে রইলেন শুধু অশ্বত্থামা, ক্রোধে, রোষে, আত্মগ্লানিতে দগ্ধ দ্রৌণির ঘুম আসে না। তিনি জেগে বসে রইলেন। হঠাৎই অন্যদিকে তাঁর মন চলে গেল। দেখলেন—এতক্ষণ যে শত শত কাকেরা উপনীত-সন্ধ্যায় ঘরে ফেরার আয়োজনে চিৎকার করে উড়ছিল, রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই তারা শান্ত হল। কিন্তু এই সময় এক রাত্রিচর পেচক এসে বসল বটগাছের ডালে, আর রাত্র্যন্ধ কাকেদের একটি একটি ধরে তার ভোজন সম্পূর্ণ করল। ত্বরিতে বুদ্ধি খেলে গেল অশ্বত্থামার মাথায়।

একেবারে চমকে উঠলেন তিনি। ঠিক করলেন—এইভাবেই তিনি পাণ্ডব-পাঞ্চালদের আয়ুঃশেষ করবেন। সামনাসামনি যুদ্ধে পাণ্ডবদের সঙ্গে তিনি পেরে উঠবেন না জানেন, অতএব এই উপায়—ইত্যেবং নিশ্চয়ং চক্রে সুপ্তানাং নিশি মারণে—তিনি সুপ্ত অবস্থায় রাত্রির অন্ধকারে পাণ্ডব-পাঞ্চালের শেষ করে দেবেন। এই মানসিক সিদ্ধান্তে এত উত্তেজনা হল অশ্বত্থামার যে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাতুল কৃপাচার্য এবং কৃতবর্মাকে গভীর ঘুম থেকে জাগালেন—সুপ্তৌ প্রাবোধয়ত্ তৌ তু মাতুলং ভোজমেব চ। সুপ্তোত্থিত দুই বীরকে তিনি তাঁর পরিকল্পনার কথা জানালেন। জানালেন রাগের কথাও—পিতা দ্রোণাচার্যকে অন্যায়ভাবে মারা হয়েছে, অন্যায়ভাবে ঊরুভঙ্গ করা হয়েছে দুর্যোধনের। তার ওপরে ভীমসেন পদাঘাত করেছেন দুর্যোধনের মাথায়, যিনি একাদশ অক্ষৌহিনী সেনার অধিপতি ছিলেন।

এসব কথা শুনে হার্দিক্য কৃতবর্মার কোনও বিকার হল না, কিন্তু কৃপাচার্য অশ্বত্থামার পরিকল্পনার কথা ভেবে একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেলেন। তার পরেই তাঁর মনে হল—এই ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামাকে কিছু বোঝানো দরকার। আজ প্রবলপ্রতাপী দুর্যোধনকে ভূমিশয়ান দেখে অশ্বত্থামার যে করুণা হচ্ছে, কৃপাচার্য এই করুণার অংশীদার নন। তিনি সবিস্তারে অশ্বত্থামার কাছে দৈব এবং পুরুষকারের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে দুর্যোধনের অপব্যবহারগুলি স্মরণ করতে

বললেন অশ্বত্থামাকে। কৃপ মনে করেন—যে দুর্যোধন কারও কথা পূর্বে শোনেননি এবং নিজে শত রকম অন্যায় করার পরেও সমস্ত গুরুজন এবং বৃদ্ধবাক্য অনাদর করে অভদ্র ইতরজনের মন্ত্রণায় এই বিরাট যুদ্ধ আরম্ভ করেছিলেন, তার প্রতি এত মায়ার কোনও প্রয়োজন নেই এবং তার অভীষ্ট পালনের জন্যও অশ্বত্থামার এত উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠার কারণ নেই। অশ্বত্থামার এই আকস্মিক পরিবর্তনে কৃপ শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন—আজকে যে অন্যায়-অপনয় আমাদের এসে স্পর্শ করেছে, তার কারণ—চিরটা কাল এই পাপী দুর্যোধনের পিছন পিছন যেতে হয়েছে আমাদের—অনুবর্তামহে যত্তু বয়ং তং পাপ-পূরুষম্।

বৃদ্ধ কৃপাচার্য এতকাল কৌরব রাজসভায় থেকেছেন। মন্ত্রণা দেবার কালে তিনি সব সময় পাশে পেয়েছেন ভীষ্ম-দ্রোণের মতো বিশাল ব্যক্তিদের। আজকে তাঁরা কেউ নেই বটে, কিন্তু কৃপাচার্য কী করে একাকী সিদ্ধান্ত দেবেন। এটা তাঁর অভ্যাসই নয়। তিনি অশ্বত্থামাকে বললেন—এই দুর্যোধনের মতো অন্যায়ী লোকের জন্যই আজকে আমাকে অদ্ভুত বুদ্ধিবিপাকের মধ্যে পড়তে হয়েছে—অনেন তু মমাদ্যাপি ব্যসনেনোপতাপিতা—এখন যে বুদ্ধি মাথায় আসছে, তাতে কোনটা ঠিক আমার নিজের ভাল, তা আমি ঠিক করতে পারছি না।

কৃপ এটা সম্যক অনুভব করছেন যে, অশ্বত্থামার প্রস্তাবটা খুব আকস্মিক এবং এটা তাঁদের এতকালের নৈতিকতার বিরুদ্ধচারী। তিনি এটাও বুঝতে পারছেন যে, তাঁরা একটা ঘোরের মধ্যে দিয়ে চলছেন। কৌরবপক্ষের কেউ বেঁচে নেই। ভগ্নোরু দুর্যোধন ভূমিশয়ান, অথচ সেই ব্যক্তিত্বশালী রাজার করুণ পরিণতি দেখে অশ্বত্থামার মধ্যে এক আকস্মিক পরিবর্তন এসেছে। নইলে, যে অশ্বত্থামা পিতার মৃত্যুর পরেও এমন অন্যায় প্রতিশোধের কথা ভাবেননি এবং কোনও দিনই দুর্যোধনের অন্যায় কর্মগুলি সমর্থন করেননি, সেই তিনি আজ ঘুমিয়ে থাকা পাণ্ডব-পাঞ্চালদের মারতে চাইছেন। কৃপ বললেন—দেখ, নানা কারণেই আমাদের এখন মাথার ঠিক নেই, আর এমন অবস্থা হলে সুহৃদ-বন্ধুদের কাছে ইতিকর্তব্যতা নিয়ে প্রশ্ন করতে হয়—মুহ্যতা তু মনুষ্যেণ প্রষ্টব্যাঃ সুহৃদো জনাঃ। তাঁরা স্থিরমস্তিষ্কে যে বুদ্ধি দেন, তাতেই মঙ্গল সম্পন্ন হয়।

আসলে কৃপ অশ্বত্থামার এই আকস্মিক আকুল ভাবটুকু মেনে নিতে পারছেন না। এত কাল কুরুসভায় থেকে থেকে তাঁর কেশ পক্ক হয়েছে। সমস্ত ঘটনার সঙ্গেই তিনি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত। কোন মূল থেকে ঘটনারাশি বিবর্তিত হতে হতে আজ এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ পরিণতি ঘটেছে এবং কেনই বা আজ দুর্যোধনের এই পরিণতি, কৃপাচার্য তার মূল অন্বেষণ করতে বলছেন অশ্বত্থামাকে। তিনি নিজেকে অশ্বত্থামার সঙ্গে জড়িয়ে বললেন—দেখ, আমরা খানিকটা মোহগ্রস্ত অবস্থায় আছি। চলো, আমরা সুহৃদ-বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করি। তাঁরা সমস্ত ঘটনার মূল কারণ কী, তা স্থির বুদ্ধিতে বিচার করে আমাদের সিদ্ধান্ত দেবেন। আমরা যেতে পারি প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্রের কাছে, যেতে পারি দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারীর কাছে, অথবা যেতে পারি মহামতি বিদুরের কাছে। তাঁরা এ অবস্থায় যা কার্যনির্ণয় করবেন, আমরা তাই করব—তদস্মাভিঃ পুনঃ কার্য্যমিতি মে নৈষ্ঠিকী মতিঃ। যারা পুরুষকারের দ্বারা নিজের কাজ সিদ্ধ করতে পারে না, দৈব কিন্তু তাদের আরও বিপদে ফেলে—সেটা মনে রেখো।

অশ্বত্থামা কৃপের কোনও ভাল কথা শুনতে চাইলেন না। কাউকে তিনি জিজ্ঞাসা করার পক্ষপাতী নন। তিনি বললেন—পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষই একটা ব্যাপার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে, সেটা হল নিজের বুদ্ধি—তুষ্যন্তি চ পৃথক্ সর্বে প্রজ্ঞয়া তে স্বয়া স্বয়া। অতএব আমার বুদ্ধি যখন এই কাজ করতে বলছে, আমি তবে তাই করব। আমি বামুন হয়ে ক্ষত্রিয়ের কাজ করে যাচ্ছি, অতএব আমার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করাটাই উপযুক্ত কর্ম, নইলে লোকের

কাছে আমি বলব কী—পিতরং নিহতং দৃষ্ট্বা কিং নু বক্ষ্যামি সংসদি। এটা অবশ্যই ঠিক যে, পিতা দ্রোণের অন্যায়প্রযুক্ত অভাবিত মৃত্যু তাঁর অন্তরের মধ্যে তুষের আগুনের মতো জ্বলছিল, কিন্তু দুর্যোধনের করুণ অবস্থা নৈমিত্তিকভাবে তাঁর ক্রোধাগ্নি উদ্দীপিত করেছে। নিজের মধ্যে চিরন্তন বৈরিতা পুষ্ট করে রাখা যাঁর স্বভাব, সেই দুর্যোধন ভগ্ন অবস্থাতেও অশ্বত্থামাকে সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত করেছেন—এই দুরূহ সৌভাগ্য বহন করতে গিয়েই আজ যেন তিনি দুর্যোধনের সব অন্যায় ভুলে যাচ্ছেন। কৃপাচার্য সেই মূলটাই স্মরণ করাচ্ছেন অশ্বত্থামাকে।

অশ্বত্থামা অবশ্য কিছুই মানলেন না। তিনি এই অন্যায় প্রতিশোধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জেনে কৃপাচার্য খানিকটা কালক্ষেপ করতে চাইলেন, অর্থাৎ যদি এর মধ্যে অশ্বত্থামার মাথা ঠান্ডা হয় এবং এই অন্যায় নিরুদ্ধ হয়। তিনি বললেন—বেশ তো, ভাল কথা, তুমি প্রতিশোধ নিয়ো। কিন্তু এই রাতটা অন্তত যেতে দাও। মুক্ত করো এই লৌহবর্ম, এই রাতটুকু তুমি বিশ্রাম নাও। তারপর সকাল হলে আমি এবং কৃতবর্মা তোমার সহগামী হব—অহং ত্বামনুযাস্যামি কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ। কৃপাচার্য একটু স্তুতিবাদও শোনালেন অশ্বত্থামাকে। বললেন—কে তোমাকে যুদ্ধে আটকাবে। তবে কী, সামান্য একটু বিশ্রাম নিলে শক্তিটা আরও বেশি পাবে। তা ছাড়া তোমার অস্ত্রশস্ত্র তো আর খুব সাধারণ অস্ত্র নয়, সব দিব্য অস্ত্র। আমার অস্ত্রও তাই এবং কৃতবর্মাও কিছু কম নয়। অতএব আজকে রাতটা তুমি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করো, ঘুমোও ভাল করে—বিশ্রমস্ব ত্বমব্যগ্রঃ স্বপ চেমাং নিশাং সুখম্। আর কালকে দেখো, পাণ্ডব-পাঞ্চালদের যুদ্ধে না হারিয়ে আমি কিংবা কৃতবর্মা কেউ যুদ্ধ থেকে ফিরব না—ন চাহং সমরে তাত কৃতবর্মা ন চৈব হ। কিন্তু আজ তুমি ঘুমোও।

কৃপ বোধ হয় চাইছিলেন—অন্তত কিছু না হোক, সোজাসুজি যুদ্ধ করে প্রাণ দেওয়াও ভাল। কিন্তু অশ্বত্থামা কৃপের কথা শুনে আরও রেগে বললেন—কীসের ঘুম, কীসের সুখ? যে দুঃখার্ত, যে ক্রোধী, যে অর্থ লাভের চিন্তা করে আর যে নাকি কামুক, তারা কখনও ঘুমোয় না। অশ্বত্থামা এক এক করে পাণ্ডবদের তথাকথিত অন্যায়-যুদ্ধের প্রসঙ্গ তুললেন—শিখণ্ডীর মাধ্যমে ভীষ্মের পতন, কর্ণের মৃত্যু, দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ এবং বিশেষভাবে পিতা দ্রোণকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, তাতে অশ্বত্থামা যেন স্থির থাকতে পারছেন না—যথা চ নিহতঃ পাপৈঃ পিতা মম বিশেষতঃ। অশ্বত্থামা বললেন—আমাকে আজ কেউ রোধ করতে পারবে না। আজ রাত্রেই আমি পাণ্ডব-পাঞ্চালদের শেষ করে তবে ঘুমোব। আমার এই উদ্যত ক্রোধাগ্নি প্রশমিত করার শক্তি কারও নেই—ন তং পশ্যামি লোকে'স্মিন্ যো মাং কোপান্নিবর্তয়েৎ।

এই কথার পরেও কৃপ চেষ্টা করেছেন অশ্বত্থামাকে বোঝাতে। বেশ একটু গালাগালিও দিয়েছেন তাঁকে। বলেছেন—ডাল-তরকারির মধ্যে হাতা ডুবিয়ে রাখলেও সে হাতা যেমন ব্যঞ্জনের সরসতা বোঝে না, তেমনই জড় ব্যক্তি বহুকাল ধরে পণ্ডিতজনের সঙ্গ করলেও, তার কথার মর্ম বুঝতে পারে না। আমি বার বার বলছি, অশ্বত্থামা! তুমি ভেবে কাজ করো, আমার কথা শোনো, পরে যাতে তোমাকে অনুতাপ করতে না হয়—কুরু মে বচনং তাত যেন পশ্চান্ন তপ্স্যসে। একটা কথা মনে রাখো—যে ঘুমিয়ে আছে, তাকে কখনও মেরো না। পাঞ্চালরা সব আজকে যুদ্ধের বর্ম খুলে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। এই ঘনান্ধকার রজনী কত বিশ্বস্ত, সকলে মৃতজনের মতো নিশ্চিন্ত নিদ্রায় মগ্ন—বিশ্বস্তা রজনীং সর্বে প্রেতা ইব বিচেতসঃ। আর এই অবস্থায় তুমি তাদের মারবে?

অশ্বত্থামা আবারও পুরনো কথা তুললেন এবং শেষ কথা বললেন—আমি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবই নেব। এই আমার সংকল্প। কথাটা বলেই তিনি রথে ঘোড়া জুতলেন এবং একা রথ ছুটিয়ে দিতে চাইলেন শিবিরের উদ্দেশে—একান্তে যোজয়িত্বাশ্বান্ প্রায়াদভিমুখঃ

পরান্। কৃপ এবং কৃতবর্মা দুজনেই বুঝলেন যে, অশ্বত্থামাকে আটকানো যাবে না এবং যা করবার, তা এই অন্ধকার রাত্রেই সম্পন্ন করবেন অশ্বত্থামা। সেদিক থেকে একক অশ্বত্থামার বিপদও অনেক বেশি। অতএব দুজনেই বললেন—হঠাৎ করে তুমি একাই রথ নিয়ে দৌড়োচ্ছ কেন? আমরা একই স্বার্থ বহন করে তিনজনেই একসঙ্গে বেরিয়েছি—একস্বার্থপ্রয়াতৌ স্বস্ত্বয়া সহ নরর্ষভ। কাজেই একযাত্রায় পৃথক ফল হতে পারে না এবং যাই বলে থাকি তাতে তোমার ওপর সহমর্মিতার ক্ষেত্রে আমাদের সন্দেহ কোরো না—নাবাং শঙ্কিতুমর্হসি৷

এতক্ষণ কথা যা বলেছিলেন, তা কৃপই বলেছিলেন। অতএব একথাগুলিও কৃপাচার্যেরই উক্তি, কৃতবর্মা এখানে শ্রোতা-সাক্ষীমাত্র। নিরুপায় কৃপাচার্য কৃতবর্মাকে নিয়ে অশ্বত্থামার পিছন পিছন চললেন—তমন্বগাৎ কৃপো রাজন্ কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ! কৃপাচার্য কোনও মানসিকতাতেই অশ্বত্থামার সঙ্গে ছিলেন না, একা ভাগিনেয়কে সহায়তা দেবার জন্য তিনি নিজের ভাবনা থেকে চ্যুত হলেন। আগে বলেছিলাম—কৌরবদের মধ্যে বাস করেও দ্রোণ-কৃপ-অশ্বত্থামার একটা ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীচেতনা ছিল। অপিচ দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যে কৃপ দ্রোণের মতানুসারী উপগ্রহমাত্র ছিলেন, এখন দ্রোণের মৃত্যুর পর তিনি তাঁর পুত্রের ব্যক্তিত্বকেও অতিক্রম করতে পারছেন না। এতকাল অন্যের মতে স্থিত থেকেও কৃপাচার্য ন্যায়ধর্মে স্থিত ছিলেন, কিন্তু আজ অনিচ্ছাসত্ত্বেও পরম প্রিয় ভাগিনেয়র মত অনুবর্তন করে তিনি বিমূঢ় হয়েছেন বটে, কিন্তু অশ্বত্থামার উপগ্রহবৃত্তি ত্যাগ করতে পারলেন না।

সুপ্ত পাণ্ডবশিবিরের দ্বারে কৃপ এবং কৃতবর্মাকে রেখে ভিতরে প্রবেশ করলেন অশ্বত্থামা। যাবার আগে বললেন—আপনারা সম্মুখ সমরেই বহু ক্ষত্রিয়-নিধনে সমর্থ, সেখানে এরা তো সমস্ত যোদ্ধাদের অবশেষ এবং তারা ঘুমিয়ে আছে। শুধু একটাই কথা, এই শিবিরের দ্বার দিয়ে যারা বেরোবে, তাদের একজনও যেন বেঁচে না ফেরে—যথা ন কশ্চিদপি বাং জীবন্ মুচ্যেত মানবঃ। অশ্বত্থামা শিবিরের প্রতিষ্ঠিত দ্বার দিয়ে প্রবেশ করলেন না, কারণ দ্বারদেশে রক্ষী পুরুষেরা ছিল। তিনি প্রবেশ করলেন শিবিরের ফাঁকফোকর দিয়ে। শিবিরে প্রবেশ করার পর অশ্বত্থামার আচরণ হল মহাকালের মতো। একে একে তাঁর হাতে মারা পড়লেন ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র। কালান্তক যমের মতো অশ্বত্থামার বিচরণে, বাধায়, প্রত্যাঘাতে শিবিরের সমস্ত স্তিমিত প্রদীপগুলিও নিবে গেছে। এমন বিমূঢ় অবস্থা হল যে, এ ওকে শত্রু ভেবে অস্ত্রাঘাত করছিল, অথচ সে হয়তো তার অতি কাছের মানুষ। চিৎকার, অন্ধকার, ভয়, ত্রাস মাথায় নিয়ে ছাউনির সৈন্যরা শিবিরের দ্বারদেশ দিয়ে বেরোতে চাইল। কিন্তু যারাই বেরোল, তারা প্রত্যেকে কাটা পড়ল কৃপাচার্যের হাতে অথবা কৃতবর্মার হাতে—কৃতবর্মা কৃপশ্চৈব দ্বারদেশে নিজঘ্নতুঃ। তাদের কারও হাতে অস্ত্র নেই, গায়ে বর্ম নেই, সবাই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আসন্ন বিপদে হাত জোড় করে শিবির থেকে বেরোচ্ছিল, কিন্তু কেউ তারা কৃপ কিংবা কৃতবর্মার অসিধারা থেকে মুক্ত হল না—নামুচ্যত তয়োঃ কশ্চিন্নিষ্ক্রান্তঃ শিবিরাদ্ বহিঃ।

এই মুহূর্তে মহাভারতের কবি কৃতবর্মার বিশেষণ হিসেবে যে শব্দটা ব্যবহার করেছেন, সে শব্দটা কৃপাচার্যের বিরুদ্ধে সলজ্জে ব্যবহার করতে পারেননি। তিনি বলেছেন—দুর্মতি কৃতবর্মা এবং কৃপের খড়্গাঘাত থেকে কেউ তারা বাঁচল না—কৃপস্য চ মহারাজ হার্দিক্যস্য চ দুর্মতেঃ। কৃতবর্মা কৃষ্ণের নারায়ণী সেনার সঙ্গে কৌরবপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন, তিনি 'মার্সেনারী' যোদ্ধার একজন। কাজেই যুদ্ধের সময় তাঁর মায়াদয়া, আত্মভাব কিছুই নেই। কিন্তু কৃপ! যে কৃপ এতকাল ভীষ্ম-দ্রোণাচার্যের সঙ্গে সমান মর্যাদায় বসেছেন, সেই কৃপ এখন ব্যাসের দৃষ্টিতে দুর্মতি কৃতবর্মার সঙ্গে একাত্মক। শুধু অশ্বত্থামা যেমন বলেছিলেন, তাই পালন করা নয়—দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে পলায়মান নিরীহ সৈনিকদের শুধু হত্যা করাই নয়, অশ্বত্থামার সুবিধা এবং অধিক সন্তোষ বিধানের জন্য—ভূয়শ্চৈব চিকীর্ষন্তৌ দ্রোণপুত্রস্য তৌ

সুখম্-কৃপের মতো ব্যক্তি কৃতবর্মার সহায়তায় সেই সুপ্ত শিবিরের তিন দিকে আগুন ধরিয়ে দিলেন। তাতে অশ্বত্থামার বড় সুবিধে হল, অন্ধকার কেটে যাওয়ায় তিনি দ্বিগুণ বিক্রমে গণহত্যা চালিয়ে গেলেন।

অশ্বত্থামার সংকল্প-পূরণ হওয়ার পর তিনি পরম উল্লাসে মিলিত হলেন কৃপ এবং কৃতবর্মার সঙ্গে। ভাগ্যিস সে শিবিরে পাণ্ডবরা সেদিন ছিলেন না। থাকলে অশ্বত্থামা-কৃপদের অথবা পাণ্ডবদের কী অবস্থা হত, তা সহজে অনুমেয় নয়। সুপ্ত শিবির ধ্বংস করার পর কৃপাচার্য অশ্বত্থামার অনুবর্তী হয়েই ভূলুণ্ঠিত দুর্যোধনের সামনে এলেন। তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে তখন। চিরদর্পী দুর্যোধনকে দেখে কৃপাচার্যের মনে খুব ব্যথা লাগল। বললেন—এখন দেখছি, দৈবের থেকে বড় কিছু নেই। নইলে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি এইভাবে রক্তমাখা অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকেন। আর এই যে সুবিশাল গদাটি, কোনও যুদ্ধে যে গদা হাত থেতে নামাননি দুর্যোধন, সেই গদা তাঁর কাছটিতে পড়ে আছে শয়ানা বধূটির মতো। সেই দুর্যোধন, যিনি সমস্ত যোদ্ধাদের মাথার ওপরে বসে ছিলেন, তিনি আজ মুমূর্ষ অবস্থায় ধুলো খাচ্ছেন শুয়ে শুয়ে। যাঁকে দেখলে পরে বড় বড় রাজারা ভয়ে মাথা নোয়াত, আজ তাঁর মৃত শরীরের জন্য অপেক্ষা করে আছে মাংসাশী পশুর দল—উপাসতে চ তং হ্যদ্য ক্রব্যাদ্যা মাংসহেতবঃ।

তখনও দুর্যোধনের জ্ঞান ছিল। অতএব অশ্বত্থামা তাঁকে মরণঘুম থেকে জাগিয়ে পাঞ্চালদের সমূলে বিনাশের খবর তথা পাণ্ডবদের শেষ বংশলুপ্তির সুখ-সংবাদ দিলেন দুর্যোধনকে। দুর্যোধন ভূলুণ্ঠিত অবস্থাতেও মাথাটি ঈষৎ তুলে অশ্বত্থামাকে বললেন—মহামতি ভীষ্ম, কর্ণ, এমনকী তোমার পিতাও যা পারেননি, আজ কৃপ আর কৃতবর্মার সঙ্গে সেই কাজটি তুমি করেছ, ভাই—যত্ত্বয়া কৃপভোজাভ্যাং সহিতেনাদ্য মে কৃতঃ। তোমাদের মঙ্গল হোক, আজ মরেও আমার সুখ।

উপগ্রহবৃত্তিতে যে কৃপাচার্য অন্যায়ী দুর্যোধনকে শোধরাবার চেষ্টা করেছেন, সেই অন্যায়ের সঙ্গে কৃপাচার্যের নাম জড়িয়ে গেল তাঁর দুর্ভাগ্যবশত। একথা বুঝি যে, এই অন্যায়কর্মে তাঁর সায় ছিল না, যথাসাধ্য তিনি বারণও করার চেষ্টা করেছেন অশ্বত্থামাকে, কিন্তু ঘটনার চক্রচাল এমনই যে, শেষ পর্যন্ত তিনি পরম প্রিয় ভাগিনেয়টিকে নিঃসঙ্গ করে দিতে পারেননি। অথবা পারেননি তাঁরও ব্যক্তিত্ব অতিক্রম করতে। অশ্বত্থামাকে এই ঘটনার ফল ভোগ করতে হয়েছিল। চরম অপমান সহ্য করে তাঁকে নির্বাসনে যেতে হয়েছিল, কিন্তু এই সম্পূর্ণ ঘটনার মধ্যে কৃপাচার্য যে নিতান্ত অসহায় ছিলেন—সেকথা পাণ্ডবরা সবাই বুঝেছিলেন। এমনকী অশ্বত্থামা যে উত্তরার গর্ভ লক্ষ্য করে পাণ্ডবদের শেষ সন্তানবীজ ধ্বংস করার জন্য অস্ত্রমোচন করেছিলেন, তখনও কৃষ্ণ বলেছিলেন-আমার তপস্যায় তোমার অস্ত্রহত সন্তানও বেঁচে উঠবে, সে বড় হবে এবং সমরকালে সে শারদ্বত কৃপের কাছে অস্ত্রশিক্ষাও লাভ করবে—কৃপাচ্ছারদ্বতাচ্ছুরঃ সর্বাস্ত্রাণ্যুপলপ্স্যতে।

কৃষ্ণের এই কথা থেকেই বোঝা যায় যে, কৃপাচার্য সাময়িকভাবে ভুল করলেও পাণ্ডবরা তাঁদের প্রথম গুরুর হৃদয় বুঝতেন। অবশ্য পাণ্ডবরা যাই বুঝুন, কৃপ কিন্তু নিজেই বুঝতে পারেননি যে, পাণ্ডবরা তাঁকে কী চোখে দেখেন। রাত্রির দুর্ঘটনায় পাণ্ডবদের মনে যে ক্রোধ তৈরি হবে, সেই ক্রোধাগ্নি থেকে বাঁচবার জন্য কৃপ এবং কৃতবর্মা অশ্বত্থামার সঙ্গেই পালাচ্ছিলেন। পথে পাণ্ডবরা অশ্বত্থামাকে ধরে ফেলায় কৃতবর্মা তাঁকে ফেলে চলে যান এবং অপেক্ষা করতে থাকেন। পরে মণিহীন, চরম অপমানিত অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য এবং কৃতবর্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে এগোতে থাকেন গঙ্গার দিকে। ঠিক এই পথেই প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে দেখা হয় কৃপাচার্যের। অশ্বত্থামা এবং কৃতবর্মা তাঁর সঙ্গে।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সর্বশেষ পতনের সংবাদ পেতে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী—সবাই তখন যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে চলেছেন। কৃপাচার্যের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি বললেন—সব শেষ মহারাজ! দুর্যোধনের সমস্ত বাহিনীর মধ্যে আমরা এই তিনজনেই মাত্র বেঁচে আছি। আর সব শেষ—দুর্যোধন-বলান্মুক্তা বয়মেব ত্রয়ো রথাঃ। এর পরে পুত্রহারা ক্ষত্রিয় জনক-জননীকে যা বলে সেকালের দিনে সান্ত্বনা দিত লোকে, কৃপাচার্য সেই সম্মুখ-সমরে মৃত্যুবরণ করার মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়ে দুর্যোধনের প্রভূত প্রশংসা করলেন এবং এই প্রশংসা বেশি করে শোনালেন গান্ধারীকে। আশ্চর্য হল, এই সপ্রশংস উচ্চারণের পরে কৃপাচার্য গান্ধারীকে বললেন—মহারানি! আমরা কিন্তু কৌরবদের শত্রু পাণ্ডবদের ছাড়িনি, তাদেরও বিজয়োৎসব ম্লান করে দিয়েছি আমরা—ন চাপি শত্রবস্তেষামৃধ্যন্তে রাজ্ঞি পাণ্ডবাঃ। আমরা যেই ভীমের অন্যায় গদাঘাতে দুর্যোধনকে ধূলিপতিত হতে দেখেছি, তার পরেই তাদের সুখসুপ্ত শিবিরে প্রবেশ করে দ্রুপদের ছেলেদের এবং দ্রৌপদীর ছেলেদের শেষ করে দিয়েছি এবং তা করেছি এই অশ্বত্থামার সেনাপতিত্বে—শৃণু যৎ কৃতমস্মাভিরশ্বত্থাম-পুরোগমৈঃ।

এই সোৎসাহ ভাষণে বৃদ্ধ কৃপাচার্যের কতটা মর্যাদা বাড়ল, আর দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারীই বা এই রাত্রিবধের চক্রান্তে কতটা খুশি হলেন, তা মহাভারতের কবি লেখেননি, তবে এই কথায় বোঝা যায়—কৃপাচার্য এখনও অশ্বত্থামার ব্যক্তিত্বে আচ্ছন্ন আছেন। গান্ধারীকে তাঁর পুত্রবধের প্রতিশোধ-গ্রহণের সংবাদ দিয়েই কৃপ বলেছেন—আমরা পালিয়ে যাচ্ছি রানি। কেননা, পুত্রবধের প্রতিশোধস্পৃহায় পাণ্ডবরা খুব শীঘ্রই আমাদের পিছনে তাড়া করবে এবং তাদের সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করার ক্ষমতা আমাদের নেই—প্রাদ্রবাম রণে স্থাতুং ন হি শক্যামহে ত্রয়ঃ। পাণ্ডবদের শিবিরে আমরা যে অভিযান চালিয়েছি এবং তাতে যা ক্ষতি হয়েছে তাদের, তার পরে আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকার উপায় নেই আমাদের, তারা আসবেই। আপনি ভাল থাকুন, শোক করবেন না কোনও। ভাল থাকুন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র। আমাদের আজ্ঞা দিন, আমরা পালাব—অনুজানীহি নো রাজ্ঞি মা চ শোকে মনঃ কৃথাঃ।

কৃপ অন্তর্যন্ত্রণায় ভুগছেন, তাই সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করলেন গান্ধারীর কাছে। বস্তুত তিনি জানেনও না যে, পাণ্ডবরা তাঁদের গুরু কৃপাচার্যকে কোনও ভাবেই দায়ী করেননি। পথ চলতে চলতে সেটা বুঝি উপলব্ধিও করলেন কৃপাচার্য। কোনও দিন তো তিনি পাণ্ডবদের অমঙ্গল চাননি, সাময়িকভাবে তিনি অশ্বত্থামার দুর্মন্ত্রণায় আচ্ছন্ন হয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেটা হার্দিক সত্য নয়। পাণ্ডবদের হাতে অশ্বত্থামার শাস্তি হবার পরেও কেউ যখন তাঁকে ধরতে এল না এবং অশ্বত্থামাও যখন প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করার জন্য ব্যাসের আশ্রমের দিকে রওনা দিলেন, তখন এই বৃদ্ধও বুঝি আবিষ্কার করলেন নিজেকে। অশ্বত্থামা চলে গেলেন, কৃতবর্মাও চলে গেলেন স্বস্থানে দ্বারকায়। সঙ্গে সঙ্গে কৃপও ভাবলেন নিশ্চয়—কেনই বা তিনি ফিরবেন না হস্তিনায়! যেখানে তিনি শিশুকাল থেকে আজ বৃদ্ধ হয়েছেন, সেই প্রিয় আবাস ছেড়ে তিনি কোথায় যাবেন। কাজেই ক্লান্ত পদক্ষেপ আবার তিনি নির্দিষ্ট করলেন হস্তিনাপুরীর দিকে—জগাম হাস্তিনপুরং কৃপঃ শারদ্বতস্তদা।

কৃপাচার্য হস্তিনাপুরে ফিরলেন বটে, কিন্তু তাঁর খবর আর তেমন করে পাই না আমরা। হয়তো তিনি খানিকটা নিশ্চেষ্ট, নির্বিকার হয়ে গিয়েছিলেন, হয়তো বা থাকলেনও একটু দূরে দূরেই। পাণ্ডবদের রাজত্বকালে তাঁকে রাজসভাতেও বসতে দেখিনি, অথবা তাঁকে দেখিনি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সন্নিকটে কোনও স্থানে, কোনও মন্ত্রণায়, কোনও যন্ত্রণায়ও তাঁকে দেখিনি। এমনকী যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধকালে যখন আমরা কৃপের অন্যায়কর্ম-সহচারী কৃতবর্মাকেও ভীমের কাছে অভ্যর্থনা লাভ করতে দেখেছি, কিন্তু কৃপাচার্যকে কোথাও দেখিনি। একেবারে মহাভারতের শেষ পর্বে যখন যুধিষ্ঠির সপরিবারে মহাপ্রস্থানে বেরোচ্ছেন, তখন কৃপাচার্যকে দেখছি আকস্মিকভাবে। মহাপ্রস্থানের সময় কুমার পরীক্ষিৎকে রাজ্য দিয়ে তিনি কৃপাচার্যকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেছেন—এই আপনার শেষ

শিষ্যকে আপনার হাতে তুলে দিলাম, আপনি দেখে রাখবেন—শিষ্যং পরিক্ষিতং তস্মৈ দদৌ ভরতসত্তমঃ। কৃপাচার্য পাণ্ডবদেরও গুরু ছিলেন, তিনি শেষও করলেন পাণ্ডবদের বংশগুরু হিসেবে।

আমি বলি—ঠিক এইখানেই কৃপাচার্যের চিরজীবিতার রহস্য রয়ে গেছে যা বুঝতে হবে আজকের দিনের আলোকে। চিরন্তন শ্লোকপ্রবাদ—অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস, হনুমান, বিভীষণ, পরশুরাম এবং কৃপাচার্য চিরজীবী—যাঁরা কেউ মরেননি। এখানে অন্যের কথা থাক। কিন্তু কৃপের কথা যদি বলি, তা হলে বলতে হবে—দেখুন, কৃপ কোনও অসাধারণ ব্যক্তি নন। ভীষ্ম-দ্রোণাচার্যের মতো অমানুষী শক্তি কিংবা অস্ত্রক্ষমতা কোনওটাই তাঁর নেই, তিনি ব্যাসের মতো মহাকবিও নন, ঋষিও নন। বিদুরের মতো মহাপ্রাণও তিনি নন। অথচ তিনি চিরজীবী।

কৃপাচার্যের এই চিরজীবিতার কারণ যদি মহাভারতের ভাবনাতেই ভাবতে হয়—কেননা তাই ভাবা উচিত—তা হলে একটাই কথা বলতে হবে। সেটা হল—সমগ্র মহাভারত জুড়ে কৃপাচার্যের অবস্থান। কোনও অলৌকিক ঐশ-শক্তিতে তিনি অমর, এমন হদিশ মহাভারতে কোথাও নেই এবং তিনি মরণের ভয়ও পেয়েছেন একাধিকবার, মরণের ভয়ে তিনি পালিয়েও গিয়েছিলেন। কিন্তু যেটা গ্রহণযোগ্য যুক্তি, তা হল—সেই শিশুকালে হস্তিনাপুরের মহারাজ শান্তনু তাঁকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। সেই থেকে কুরুবাড়ির সমস্ত সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বিপদে, তিরস্কারে-পুরস্কারে সব সময়েই তিনি আছেন। হয়তো খুব প্রগাঢ়ভাবে, মহান একাত্মতায় তিনি কারও সঙ্গেই নেই, কিন্তু তিনি আছেন। সবচেয়ে বড় কথা, কুরুক্ষেত্রের বিশাল যুদ্ধে যেখানে সব ধ্বংস হল, সেখানেও তিনি অক্ষত রইলেন। ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রের মৃত্যুর কথা লিখলেন, বিদুরের মৃত্যুর কথা লিখলেন, এমনকী মৌষল-মহাপ্রস্থানিকে ভগবত্তার চিহ্নে চিহ্নিত কৃষ্ণ এবং পাণ্ডব পরিবারেরও তিরোভাব ঘটালেন, কিন্তু কৃপের মৃত্যুর কথা তিনি লিখতে পারলেন না। কুরুবংশবীজ পরীক্ষিতের সঙ্গে কৃপাচার্য যুক্ত হয়ে রইলেন শেষ আচার্য হিসেবে এবং এই যোগের ফলেই মহাভারত শেষ হয়ে গেল, কিন্তু কৃপ শেষ হলেন না। মহাকাব্যের এই বিশাল 'প্যানোরমা'র মধ্যেও মহাকাল যাঁকে গ্রাস করল না, তাঁর মাথায় চিরজীবিতার প্রাবাদিক বরটুকু তো জুটবেই, নইলে ভীষ্ম-দ্রোণের সঙ্গে একাসনে তিনি বসবেন কোন লজ্জায়!

ধৃতরাষ্ট্র

আজ থেকে ষাট-সত্তর বছর আগে পূর্ববঙ্গের এক গ্রামের বাড়িতে ঠাকুরদাদা মারা গেছেন। বসতবাড়ি ছাড়াও ঠাকুরদাদার ভূসম্পত্তি অনেক এবং সবই তাঁর দুই ছেলের মধ্যে ভাগ হবে। বড় ভাই এতকাল বাইরে বাইরে কাজ করতেন। কিন্তু বড় গিন্নি থাকতেন বাড়িতে। তাঁর ছেলেমেয়েও সেই বাড়িতে মানুষ হচ্ছে। ছোট ভাই বিবাহিত। তাঁরও ছেলেমেয়ে আছে। ছোট ভাইয়ের কর্মস্থল গ্রামের কাছাকাছি বলে তিনি বাড়িতেই থাকেন এবং সংসারের যত ঝুটঝামেলা—সে দাদার সংসারেই হোক, অথবা নিজের সংসারে—সবই তিনি পোয়ান। বড় গিন্নি মাটির মানুষ। অসামান্য তাঁর হৃদয়। ছোট দেবরটির ওপর তাঁর স্নেহ পুত্রস্নেহের চেয়েও বেশি এবং এই একান্নবর্তী পরিবারের সমস্ত সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা সবই তিনি ভাগ করে নেন ছোট দেবরটির সঙ্গে। বড় কথা হল—এই সংসারের সুখ এবং বোঝাপড়া অন্য অনেক পরিবারেরই ঈর্ষার কারণ।

এরই মধ্যে ঠাকুরদাদা মারা গেলেন এবং বড় ভাই বাড়ি ফিরলেন। প্রথম কদিন ভালই কাটল। তারপর এক এক করে নানারকমের ছোটখাটো স্বার্থ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীনতা আঘাত হানতে আরম্ভ করল একান্নবর্তী পরিবারের গায়ে। বড় ভাই অনেক টাকা উপায় করেছেন, অতএব তাঁর বক্তব্য হল—আমার ছেলেপিলেরা এমন অনাদরে মানুষ হবে কেন? তারা দামি জামাকাপড় পরবে, ভাল খাবার খাবে এবং আরও ভালভাবে থাকবে। বড় গিন্নি খুব আপত্তি করেছিলেন। বলেছিলেন—ছোটর ছেলেপিলেরা এসব দেখলে কী ভাববে? ভাল জামাকাপড় পরাতে চাও তো ছোটর ছেলেপিলের জন্যও কিনে আনো, কে না করেছে? কর্তা বললেন—আমার অত টাকা নেই যে, দানছত্র করব। গিন্নি বললেন—তাই যদি হয়, তো নিজের ছেলেদের পিছনেও দানছত্রটি বন্ধ করো, তাতে তোমার আরও টাকা বাঁচবে, সংসারে সুখও থাকবে।

বড় ভাইয়ের রাগ আস্তে আস্তে চড়তে আরম্ভ করল। তারমধ্যে বড় গিন্নি যখন আবার ছোট দেবরটিকে ডেকে আলাদা করে ক্ষীর ননি খাওয়ান, কর্তার কেনা জামাকাপড় থেকে নতুন ধুতিটি কি চাদরটি দেবরকে দিয়ে দেন, তখন কর্তার রাগ আরও বাড়ে। বলেন—যত সব আদিখ্যেতা। ওকে অত মাথায় তোলার কী আছে। গিন্নি বলেন—ওগো তুমি যখন ছিলে না, তখন কে আমার সব কিছু করেছে, তুমি, না ছোট? সেই যেবার তোমার ছেলের ধুম জ্বর এল, তখন ডাক্তার-কবিরাজ, রাত জেগে বসে থাকা, কত্তামশায়ের সেবা করা—এ সব কে করেছে, তুমি, না ছোট? বড় ভাই রেগে বললেন—বেশি বাড়াবাড়ি কথা বলো না। আমি থাকলে আমি করতাম, আর ছোট না থাকলে পাড়ার লোকে করত। অসুখ, ডাক্তারবদ্যির জন্য পাড়ার লোকও দৌড়ায়, তার জন্য ওই অপকম্মাটিকে মাথায় তোলার নেই অত কিছু।

গিন্নি বললেন—মাথায় কেউ কাউকে তোলে না। সে নিজের কাজে, ত্যাগে, সহিষ্ণুতায় এই পরিবারের মাথায় উঠেছে, আমি তাকে মাথায় তুলিনি। আর এই যে তুমি! তোমাকে তো আমি মাথায় তুলিনি, তুমি আপন অহংকারে চেঁচিয়ে মেচিয়ে নিজেই আমাদের মাথায় চেপে বসছ। তবে তোমার মাথায় চাপা আর ছোটর মাথায় ওঠার তফাত আছে বিলক্ষণ।

এই পরিবারে সুখ শান্তি বেশিদিন টেকেনি। বড় ভাই হাঁড়িকুড়ি আলাদা করে নিয়েছিলেন। যে সংসারে ডাল রান্না করতে আগে একটি মাত্র শুকনো লঙ্কা লাগত, এখন সেখানে দুটি শুকনো লঙ্কা লাগে। কিন্তু এও খুব বড় কথা নয়। এখন বড় ভাইয়ের ছেলেরা তাদের খুড়তুতো ভাইদের দেখিয়ে দেখিয়ে নতুন জামাকাপড় পরে, দেখিয়ে দেখিয়ে ক্ষীর রাবড়ি খায়। পিতার করুণায় ছেলেদের মনে এবং মজ্জায় প্রবেশ করল হিংসা, লোভ অহংকার। ছোটভাই একদিন বাড়ি ঘরদোর দাদার কাছে বিক্রি করে দিয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে চলে গেলেন অন্যত্র। যেদিন তিনি গেলেন, সেদিন বড় গিন্নি বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে অশ্রুমোক্ষণ করলেন বারংবার। আশীর্বাদ করে বললেন—ছোট! যদি ভগবান থাকেন, যদি ধর্ম বলে কিছু থাকে, তবে কর্তা একদিন তোকে ডেকে এই বাড়িতে আনবেন। কিন্তু সেদিন যেন তুই আসিসনে, ভাই! আমার মাথা খা, সেদিন যেন তুই আসিসনে।

পরবর্তীকালে বড় গিন্নির কথা সত্যি করে দিয়ে বড় করুণ ঘটনা ঘটেছিল। বড় ভাইয়ের দুই ছেলে দিব্যি আড়ম্বরে মানুষ হয়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে শহুরে মেয়ে বিয়ে করে শহরের চালে চলে আর কখনও গ্রামের বাড়িতে আসেননি। বাবামা শহরে ছেলের বাড়িতে গিয়ে কিন্তু কিন্তু করে গ্রামের বাড়িতে ফিরেছেন আবার। শেষ বয়সে বড় ভাইয়ের কঠিন অসুখ করল। ডাক্তারবদ্যি, সেবাপথ্যি?—বুড়ো বড় গিন্নিই বা কত পারেন! শেষে বড় ভাই কাঁপা কাঁপা হাতে চিঠি লিখলেন ছোট ভাইকে। ছোট ভাই খবর পাওয়ামাত্র ছেলেকে নিয়ে হাজির হলেন দাদার বাড়ি। বড় গিন্নি আবারও খুব কাঁদলেন। অনেক সেবাযত্নের পর বড় ভাই বেঁচে উঠলেন বটে, তবে কাজকর্ম করা, জমিজমা দেখা এ সবের ক্ষমতা রইল না আর।

ছোট ভাই বললেন—দাদা! আর কেন। আমারও তো ঘরসংসার রয়েছে। আর কতদিনই বা এখানে থাকব? তার চাইতে চলো আমার বাড়ি, সেখানে দাদাভাইয়ে মিলে শেষজীবন কাটিয়ে দেব। বড় ভাই বললেন—সে কেমন করে হয়? তোমার সংসারে অসুবিধে হবে না? তোমার ছেলেরা? ছোট ভাই বললেন—আমার বাড়ি যে তোমারই বাড়ি, দাদা! আর আমার ছেলেরা কি ওদের বড়মার ছেলে নয়।

বড় ভাই আর কথা বাড়াননি। কত্তাগিন্নি ছোট ভাইয়ের বাড়িতে এসে উঠলেন। ছোট গিন্নি বললেন—এতকাল রান্নাবাড়ি করেও তোমার দেওরটিকে সুখী করতে পারলাম না। খালি বলে—বউদিদি যা শুকতো রান্না করতেন! বউদিদি যা পায়েস রান্না করতেন! এবার তুমি এসেছ সব সামলাও।

মহাভারতের অন্যতম এক প্রধান চরিত্র ধৃতরাষ্ট্রের প্রসঙ্গে যাবার আগেই পূর্ববঙ্গের এই গ্রাম্য পরিবারের কাহিনী কেন বললাম, তার উত্তর মিলবে পরে।

ঠাকুর নরোত্তম দাস একজন বৈষ্ণব পদকর্তা। প্রিয় প্রভুর উদ্দেশে তিনি অনেক ভক্তিগীতি রচনা করেছেন, নিজের বৈষ্ণবোচিত মনঃশুদ্ধির জন্য এবং সিদ্ধির জন্য প্রভুর কাছে অনেক প্রার্থনাও করেছেন। তাঁর একটি প্রার্থনা ছিল—'দয়া কর, না করিহ মায়া'। অর্থাৎ মায়া যদি কর, তবে যেখানে পড়ে আছি, সেইখানেই পড়ে থাকব; ত্যাগ বৈরাগ্য আসবে না, চিত্তশুদ্ধি হবে না, ইন্দ্রিয়জয় হবে না, ইহকালেও তাঁকে পাওয়া হবে না। সত্য কথা বলতে কী, মানবজীবনের কোনও বড় পাওয়াই মায়া করে হয় না। যদি তিনি দয়া করেন, দয়া করে মনের বল বাড়িয়ে দেন, কৃচ্ছ্রসাধনের শক্তি দেন, তবেই সম্ভব তাঁকে পাওয়া, তবেই সম্ভব সাধনের সিদ্ধিলাভ।

বস্তুত রাত্রির অঘোর ঘুমে শায়িত একটি কিশোরের নিদ্রালুব্ধ মুখ দেখে আমি যদি তাকে আরও ঘুমোতে দিতাম, ছেলে পড়াশুনো করতে চায় না বলে আমি যদি তাকে বলতাম—পড়াশুনোয় বড় কষ্ট বাবা! দরকার নেই অমন পড়াশুনোয়। তুমি খেলা করো, টিভি দেখো, জীবনের যত মজা আছে সব লুটে নাও—তা হলে এইটা হত নরোত্তম দাস ঠাকুরের মতে মায়া করা। যদি এমন হত যে, আমার আদরের ছেলেটি বন্ধু হওয়া উচিত এমন অন্য একটি ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করে তার মাথাটি ফাটিয়ে দিয়ে এসে আমায় বলত—বাবা! অমুক ছেলেটি মহা বদমাশ, তখন যদি বাবা হিসেবে আমি সেই ছেলেটিকে গিয়ে গালাগালি দিতাম, তার বাবামার কাছে গিয়ে নালিশ করতাম, তবে নরোত্তম দাস ঠাকুরের মতে সেটি মায়া করা।

পদকর্তার 'মায়া' শব্দটি বোঝাতে পেরেছি বলে মনে হয়, তবে তাঁর পদপংক্তিতে 'দয়া' কথাটি বড়ই কঠিন। বলা উচিত—এ প্রায় নির্দয়তার শামিল। মায়া ত্যাগ করে যে ছেলেকে পাঁচটার সময় ঘুম থেকে ওঠাচ্ছি, মায়া ত্যাগ করে যাকে অধ্যয়নের তপস্যায় বসাচ্ছি, মায়া ত্যাগ করে যাকে সামাজিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করছি, মায়া ত্যাগ করে যাকে কর্মযোগ, সদভ্যাস, সদব্যবহার শেখাচ্ছি, নরোত্তমের অভিপ্রায়—এইটাই আসল দয়া করা।

প্রত্যেক বাবামায়ের মধ্যেই পুত্র সম্বন্ধে এই মায়া এবং দয়ার বৃত্তি কাজ করতে থাকে। যে দম্পতি মায়া বজায় রেখেও সন্তানের মধ্যে শৃঙ্খলার অন্তর্জন্ম দিতে পারেন, তিনি আদর্শ দম্পতি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই জনক জননীর মধ্যে মায়ার ভাগই বেশি থাকে, আবার কখনও বা কারও মধ্যে শিক্ষাদানের আদর্শও বড় হয়ে ওঠে। অতিরিক্ত শিক্ষা দিতে গিয়ে কোনও কোনও জনক জননী আবার সন্তানের সুকুমার বৃত্তিগুলিই নষ্ট করে ফেলেন। কিন্তু তবু কী জানেন—এই শেষোক্ত কোটির দম্পতিকে আমরা দোষ দিতে পারি না। তাঁদের মনের মধ্যে যে আদর্শের অতিরেক আছে, সে অতিরেকটুকু তাঁদের অজান্তেই সন্তানের মনের রাজ্যে বিপদ ডেকে আনে হয়তো। কিন্তু এইটুকু বাদ দিলেও তাঁদের আদর্শের ভাবনাটাকে অশ্রদ্ধা করতে পারি না মোটেই।

কিন্তু যাঁরা শুধু মায়ার তাড়নায় সমস্ত শৃঙ্খলার তাড়না অতিক্রম করেন, যাঁরা পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে জগতের সমস্ত শুভবুদ্ধিকে অতিক্রম করেন, যাঁরা পুত্রকন্যার স্বার্থ দেখতে গিয়ে পরার্থ অনুমান করতে পারেন না, তাঁদের সংজ্ঞাই হল ধৃতরাষ্ট্র। আমাদের ভাবনায় এখন ধৃতরাষ্ট্র কোনও কুরুকুলপতির নামমাত্র নয়, ধৃতরাষ্ট্র এক স্বার্থান্বেষী জনকের সংজ্ঞা। তর্ক যুক্তির বালাই না রেখে যখনই মানুষ আবেগের দ্বারা তাড়িত হয়ে পুত্রের স্বার্থচিন্তায় ভাবিত হয়েছে, তখনই আমরা তাকে ধৃতরাষ্ট্র বলেছি। এই ধৃতরাষ্ট্র আমাদের মধ্যে আছেন শত শত, হাজার হাজার।

ঠিক এত সংখ্যায় আছেন বলেই আমার লেখনী আজ কম্পিত হচ্ছে। কেবলই ভাবছি—

ধৃতরাষ্ট্রের বিচার হওয়া উচিত একটু অন্যভাবে। আজকে আমরা যারা একান্নবর্তী পরিবারগুলি খণ্ড বিখণ্ড করে দিয়ে প্রত্যেকে একেকটি দুর্ভাগ্যের পারিবারিক 'ইউনিট' তৈরি করেছি, তারা ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয় বুঝবেন খুব তাড়াতাড়ি। বস্তুত ধৃতরাষ্ট্রের ভালবাসার প্রকৃতিও অন্যের থেকে আলাদা। ধৃতরাষ্ট্র রাজা হননি বটে, কিন্তু রাজকীয় সুখভোগ, কর্তৃত্ব এবং স্বাধীনতা কোনও সময়েই তাঁর কম ছিল না। কিন্তু সব থাকা সত্ত্বেও এগুলি 'অফিসিয়ালি' তাঁর ভাগ্যে আসেনি এবং সে জন্য তাঁর ক্ষোভের অন্ত ছিল না। অবশেষে নিজের যখন হলই না, তখন ওই রাজ্যপাট, রাজসুখ অন্তত তাঁর ছেলের ভাগ্যে 'অফিসিয়ালি' জুটুক, সেটা তিনি চেয়েছিলেন। দুর্ভাগ্য এমনই যে, ছেলের ভাগ্যেও 'অফিসিয়ালি' রাজ্য এল না। ধৃতরাষ্ট্রের চরম মানসিক দ্বন্দ্বের আরম্ভ এইখান থেকেই। যা তিনি চান, তা যখন নিয়মমতো অপ্রাপ্য রয়ে গেল, তখন নিয়ম-বহির্ভূতভাবে সেটা কী করে পাওয়া যায়—এই চরম দ্বন্দ্বেই তাঁর সমস্ত জীবন কেটে গেল এবং এই দ্বন্দ্বের চিরন্তন মাধ্যম হয়ে রইলেন তাঁর প্রিয় পুত্র দুর্যোধন।

অথচ একটি মানুষ, যাঁর মধ্যে এক বিরাট যুদ্ধবীরের সম্ভাবনা ছিল, যাঁর মধ্যে রাজা হবার বীজ এবং স্বপ্ন দুইই ছিল, শুধুমাত্র শারীরিক কারণে সেই ব্যক্তি পরিপূর্ণ রূপ পেলেন না—এটা ইতিহাসের অবিচারও নয়, খুব যে বড় সামাজিক অবিচার, তাও নয়, নিতান্তই এক কঠিন বাস্তব তাঁর স্বপ্ন ধূলিসাৎ করে দিয়েছে।

কেমন করে ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল আমরা জানি। তাঁর জননী অম্বিকা এমন করে বোধ হয় তাঁর এই সন্তানটি চাননি। অম্বিকার স্বামী বিচিত্রবীর্য অকালে মারা গেছেন। স্ত্রীর প্রতি তাঁর প্রেমের কোনও অভাব ছিল না। বরঞ্চ অতিরিক্ত আসক্তি এবং দেহজ সম্ভোগ বিচিত্রবীর্যকে রোগে আক্রান্ত করল। স্ত্রী-সম্ভোগের ফল পরিণত হওয়া দূরে থাক, তার সম্ভাবনাই ঘটল না। বিচিত্রবীর্য অকালে মারা গেলেন। তাঁর অতি-রতির স্মৃতি নিয়ে দুই যৌবনবতী রমণী হস্তিনাপুরীর অন্তঃপুরে কোনওমতে বেঁচে রইলেন।

বিচিত্রবীর্যের জননী সত্যবতী তখনও বেঁচে। দুই বিধবা পুত্রবধূকে দেখে তাঁর অন্তর দগ্ধ হয়—ততো সত্যবতী দীনা কৃপণা পুত্রগৃদ্ধিনী। কেবলই ভাবেন—এই তরুণীদুটির কোলে একটি পুত্রসন্তানও যদি থাকত! সত্যবতী রাজমাতা বলে কথা। পুত্রের পরিবর্তে পৌত্র নিয়ে সুখী হওয়াটা তাঁর পারিবারিক সুখের কারণ হত নিশ্চয়ই। কিন্তু এই সুখের চেয়েও তাঁর কাছে বৃহত্তর স্বার্থ ছিল আরও একটি বিখ্যাত পুরু-ভরত বংশের কোনও উত্তরাধিকারী রইল না। যে মানুষটি তাঁর পিতার বিবাহের সুখ সম্পাদন করতে গিয়ে নিজে অবিবাহিত থাকলেন, এবং তাঁর বিমাতা সত্যবতীর সন্তানের রাজসুখের স্বার্থে নিজে রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করলেন, সেই ভীষ্মের কাছেও দায় আছে সত্যবতীর।

সব ভাবনা ভেবে—বধূদের মনের শূন্যতা, পিতৃ-মাতৃবংশের শূন্যতা এবং রাজপরিবারের উত্তরাধিকারের কথা ভেবে—ধর্মঞ্চ পিতৃবংশঞ্চ মাতৃবংশঞ্চ ভাবিনী—জননী সত্যবতী ভীষ্মের সঙ্গে গূঢ় আলোচনায় বসলেন। ভীষ্মের সম্মান, তাঁর বঞ্চনা এবং তাঁর সঙ্গে মৃত বিচিত্রবীর্যের ভ্রাতৃসম্পর্কের নিরিখে সত্যবতী প্রথমে ভীষ্মকেই অনুরোধ করলেন তাঁর বিধবা পুত্রবধূদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করতে। কিন্তু ভীষ্ম তাঁর পূর্বকৃত ভীষণ প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন সত্যবতীকে এবং কোনওভাবেই তিনি সত্য থেকে চ্যুত হতে চাইলেন না। অবশ্য তাই বলে যে তিনি প্রসিদ্ধ পুরু-ভরতবংশের বিপৎকাল সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না, তা মোটেই নয়। পিতৃ-পিতামহের গৌরবোজ্জ্বল বংশ যাতে চিরতরে উৎসন্ন না হয়ে যায়, সে জন্য তিনি বিকল্প ব্যবস্থা দিলেন সত্যবতীকে। বললেন—আপনি অর্থের বিনিময়ে একজন গুণবান বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দিয়ে পুত্রবধূদের গর্ভাধান করান—ব্রাহ্মণো গুণবান্ কশ্চিদ্ধনেনোপমন্ত্র্যতাম্। তিনি আপনার পুত্রবধূদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করে এই প্রসিদ্ধ কূলের বৃদ্ধি ঘটাবেন।

কথাটা সত্যবতীর বেশ পছন্দই হল। সেকালের দিনে নিয়োগপ্রথা ছিল সমাজ-সচল প্রথা। বহু বড় বড় রাজবংশ এইভাবেই পুত্রসন্তানের মুখ দর্শন করেছে—যে পুত্রেরা বংশ পরম্পরায় রাজার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। সত্যবতী তাই ভীষ্মের প্রস্তাবে রাজি হলেন বটে, কিন্তু অর্থধনের বিনিময়ে কোনও গুণবান ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ জানানোর আগেই তিনি একটি পালটা প্রস্তাব দিলেন। সত্যবতী মহর্ষি ব্যাসের কথা জানালেন ভীষ্মকে। জানালেন যে, সেই অমিততেজা মহর্ষি তাঁর বৈবাহিক জীবনের পূর্বলব্ধ সন্তান—কন্যাপুত্রো মম পুরা দ্বৈপায়ন ইতি শ্রুতঃ। সত্যবতী ভীষ্মকে জানালেন যে, তিনি যদি তাঁর পুত্রকে এই বিপন্ন সময়ে ডেকে পাঠান, তবে তিনি অবশ্য আসবেন এবং জননীর অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করবেন না। তিনি অবশ্যই তাঁর ভ্রাতৃকল্প বিচিত্রবীর্যের পত্নীদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করবেন—ভ্রাতুঃ ক্ষেত্রেষু কল্যাণম্ অপত্যং জনয়িষ্যতি।

ভীষ্ম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে যথেষ্টই চেনেন এবং তাঁর ক্রিয়াকলাপ তথা মাহাত্ম্য সম্বন্ধেও যথেষ্টই অবহিত। শুধু এটাই তিনি এতকাল জানতেন না যে, মহর্ষিও একভাবে তাঁর ভ্রাতৃকল্প। সত্যবতীর কথা শুনে তিনি মহানন্দে তাঁকে আমন্ত্রণ করার প্রস্তাব সমর্থন করলেন—উক্তং ভবত্যা যচ্ছ্রেয়ং স্তন্মহ্যং রোচতে ভূশম্। জননী সত্যবতী স্মরণ করলেন তাঁর পুত্র দ্বৈপায়ন ব্যাসকে এবং তিনি অবিলম্বে উপস্থিত হলেন জননীর কাছে। সত্যবতী তাঁকে বহু সমাদর করে নিজের তথা রাজবংশের সমস্যার কথা জানালেন। সত্যবতী পুত্রের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন যাতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বিচিত্রবীর্যের বিধবা পত্নীদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করেন—তয়োরুৎপাদয়াপত্যং সমর্থো হ্যসি পুত্রক।

ব্যাস মায়ের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেননি। কেননা এই প্রথা সমাজ-সচল এবং বিশেষত এই কর্মে জননী সত্যবতী তথা মহামতি ভীষ্মের মতো ব্যক্তির অনুমতি। ব্যাস শুধু বললেন—একটাই কথা আছে, মা! তুমি তোমার পুত্রবধূদের এক বৎসর আমারই দেওয়া বিধানে ব্রতনিয়ম পালন করতে বলো। তারপর তাঁদের সঙ্গে আমার মিলন হবে। কেননা ব্রতনিয়মের শুদ্ধতা ছাড়া আমার সঙ্গে তাঁদের সঙ্গতি হতে পারে না—ন হি মাম্ অব্রতোপেতা উপেয়াৎ কাচিদঙ্গনা।

জননী সত্যবতী বললেন—এক বছর! সে তো অনেক কালের কথা, বাবা! তুমি এখন এখনই ব্যবস্থা না করলে যে এ রাজ্য উচ্ছন্নে যাবে, বাবা! রাজ্যে রাজা না থাকলে কি বেশিদিন চলে? তুমি বাপু সেই ব্যবস্থা করো, যাতে সদ্য সদ্যই আমার পুত্রবধূরা সন্তানবতী হয়—সদ্যো যথা প্রপদ্যেতে দেব্যৌ গর্ভং তথা কুরু। ব্যাস বলেছিলেন—তাই যদি করতে হয় মা, তা হলে আমার এই বিরূপ বীভৎস রূপ সহ্য করতে হবে তোমার পুত্রবধূদের। আমার গায়ের দুর্গন্ধ, বিকট রূপ, মলিন বেশ এবং সবার ওপরে এই বিচ্ছিরি শরীরটা! এসব যদি তোমার পুত্রবধূরা সহ্য করতে পারেন—যদি মে সহতে গন্ধং রূপং বেষং তথা বপুঃ—তা হলে আজই তাঁরা গর্ভলাভ করতে পারেন।

ব্যাস তাঁর নিজের ছেলে বলেই হয়তো সত্যবতী তাঁর আকৃতি এবং বেশভূষা নিয়ে মাথাই ঘামাননি। হয়তো ভেবেছেন—ছেলে আমার ঋষি হয়েছে, যোগী হয়েছে—পারাশর্য মহাযোগী সব বভুব মহানৃষিঃ—তার আবার বেশভূষা কী, চেহারা কী? এ সব নিয়ে কীসের মাথাব্যথা? ভরতবংশের সন্তান-ভাবনা নিয়ে তাঁর মাথাখারাপ হয়ে যাচ্ছে, সেখানে কি এ সব ভাবলে চলে? অর্থাৎ ব্যাস তাঁর সহৃদয় বুদ্ধিতে বধূদের যন্ত্রণা যতটুকু আশঙ্কা করেছিলেন, সত্যবতী মেয়ে হয়েও সেটা তেমন করে বুঝলেন না।

তিনি সোজা গিয়ে উপস্থিত হলেন বিচিত্রবীর্যের প্রথমা স্ত্রী অম্বিকার কাছে। বললেন—মা! একটা ধম্মোকথা বলছি শোনো—ধর্মতন্ত্রং ত্বাং যদ্ব্রবীমি নিবোধ তৎ। আমার পোড়া কপালে এই প্রসিদ্ধ ভরতবংশ তো নির্মূল হয়ে যাবার জোগাড়। তো আমার মনের দুঃখ বুঝে, আর ভরতবংশের দুরবস্থা বুঝে মহামতি ভীষ্ম আমাকে একটা বুদ্ধি দিয়েছেন—ভীষ্মো বুদ্ধিমাদান্-মহ্যং কুলস্যাস্য বিবৃদ্ধয়ে। কিন্তু যে বুদ্ধিটা তিনি দিয়েছেন, সেই বুদ্ধি কাজে পরিণত করতে হলে তোমার সাহায্য ছাড়া হবে না—সা চ বুদ্ধিস্ত্বয্যধীনা। তুমি তো বোঝ এই বংশের অবস্থা। অতএব এই উচ্ছিন্নপ্রায় ভরতবংশ উদ্ধার করবার ভার তোমার ওপরে। তুমি একটি পুত্রের জননী হও এবং সে এই হস্তিনাপুরের রাজ্যপাট সামলাক—স হি রাজ্যধুরং গুর্বীমুদ্বক্ষ্যতি কুলস্য নঃ।

সত্যবতীর অনুরোধ শুনেই বিচিত্রবীর্যের প্রথম বধূটি বুঝে গিয়েছিলেন যে তাঁকে নিয়োগপ্রথায় পুত্র উৎপাদন করতে হবে। কিন্তু কে সেই ভাগ্যবান পুরুষটি, যাঁর সঙ্গে তাঁকে মিলিত হতে হবে—এই প্রয়োজনীয় খবরটুকু তিনি জানতে পারলেন না। সেকালের দিনে

গুরুজনদের অনুমতি নিয়ে এই নিয়োগ সম্পন্ন হত এবং এটা অনেকটাই ছিল শুষ্ক কর্তব্যরক্ষার দায়ের মতো। কিন্তু যে বধূটি এই কার্যে নিযুক্তা হতেন, তাঁর মানসিকতা নিয়ে গুরুজনেরা যে খুব ভাবতেন তা মোটেই নয়। রাজবাড়ির প্রথমা বধূটির যন্ত্রণাটা তাই রয়েই গেল।

সন্ধ্যার সময় জননী সত্যবতী অম্বিকাকে স্নান করে আসতে বললেন। শুদ্ধ নির্মল বাসখানি পরে অম্বিকা যখন শাশুড়ির কাছে উপস্থিত হলেন, তখন সত্যবতী তাঁকে বললেন—তোমার এক দেবর মিলিত হবেন তোমার সঙ্গে। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে তার জন্য অপেক্ষা কোরো। রাত্রে তিনি তোমার ঘরে আসবেন। অম্বিকা অপেক্ষা করতে লাগলেন। মনে মনে চলতে লাগল নানা জল্পনাকল্পনা। কে হবেন এই দেবরটি? বিচিত্রবীর্যের ছোট ভাই তো কেউ নেই। তবে দেবর শব্দটা হয়তো সংজ্ঞামাত্র। এই মানুষটি ভীষ্মও হতে পারেন। হতে পারেন কুরুবংশের লতাপাতায় জড়ানো বিচিত্রবীর্যের অন্য কোনও ভাই—সাচিন্তয়ৎ তদা ভীষ্মমন্যাংশ্চ কুরুপুঙ্গবান্।

অম্বিকার ঘরে তৈলপূর প্রদীপ জ্বলছিল অনেকগুলি। আর তাঁর ভাবনায় যন্ত্রণার আগুন লাগছিল একটু একটু করে। আকাশপাতাল ভাবনা শেষ হতে-না-হতেই আপন প্রকোষ্ঠের আলোকপ্রভায় মহামতি ব্যাসকে দেখা গেল—তিনি অম্বিকার ঘরে প্রবেশ করছেন। মসীর মতো কালো তাঁর গায়ের রং, মাথায় জটাভার, দীপ্ত চক্ষু জ্বলছে আগুনের ভাটার মতো—তস্য কৃষ্ণস্য কপিলাং জটাং দীপ্তে চ লোচনে। মুখভর্তি পাঁশুটে দাড়ি এক অদৃষ্টপূর্ব বিকট মানুষ দেখে অম্বিকা ভয়ে ত্রাসে চোখ বন্ধ করলেন। নিমীলিত চোখে শয়ানা রাজবধূর সঙ্গে ব্যাসের মিলন সম্পূর্ণ হল সুন্দর রাজপুরুষ বিচিত্রবীর্যের প্রতিস্মৃতিতে।

ব্যাস যতক্ষণ অম্বিকার ঘরে ছিলেন, ততক্ষণ তিনি চক্ষু মুদে রইলেন। মিলন সম্পূর্ণ করে ব্যাস ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই ব্যগ্র সত্যবতী ছেলেকে শুধোলেন—সব ঠিক আছে তো? আমরা ভরতবংশের অনুরূপ পুত্র লাভ করব তো, বাবা! ব্যাস যোগেশ্বরের দৃষ্টিতে জননীকে জানালেন—শত সহস্র হাতির শক্তি নিয়ে জন্মাবে এই ছেলে। বিদ্বান হবে, রাজর্ষি হবে। অনেক বুদ্ধি, অনেক শক্তি, সবই থাকবে, মা! কিন্তু ছেলেটি অন্ধ হয়েই জন্মাবে। কী করব? বধূ তোমার সারাক্ষণ চক্ষু মুদেই রইল—কিন্তু মাতুঃ স বৈগুণ্যাদন্ধ এব ভবিষ্যতি।

জননী সত্যবতী প্রমাদ গণলেন। বললেন—কী করে, একটি অন্ধ রাজপুত্র এই প্রসিদ্ধ কুরুবংশের রাজ্যপাট সামলাবে, কী করেই বা এই বিশাল রাজ্য রক্ষা করবে সে? তুমি বাপু দ্বিতীয় একটি পুত্র জন্মের প্রযত্ন গ্রহণ করো, যাতে একটি উপযুক্ত রাজা পাই আমরা।

বাস! ভবিষ্যতে যিনি ধৃতরাষ্ট্র হয়ে জন্মাবেন, জন্মলগ্নেই তাঁর কপাল থেকে রাজা হবার লিখনটি মুছে গেল অম্বিকার গর্ভের আর্দ্র জলরাশিতে। আমরা বলি—যোগমূর্তি ব্যাসের অলৌকিক ভবিষ্যৎবাণীতে বিশ্বাস নাই করলেন আপনারা। ধরেই নিতে পারেন—শুধুমাত্র চক্ষু নিমীলনের কারণে একটি অন্ধ পুত্রের জন্ম হতে পারে না। একটু আধুনিক দৃষ্টিতে যদি দেখি, তবে ব্যাসের সঙ্গে অম্বিকার মিলনের ঘটনাকে রীতিমতো এক ধর্ষণের ঘটনা বলেই মেনে নেওয়া যেতে পারে। এমন এক ধর্ষণের ঘটনা, যাতে কুরুরাজবধূর শারীরিক মানসিক কোনও সম্মতি ছিল না। আর কে না জানে যে, ধর্ষণের ফলে অনেক সময়েই বিকলাঙ্গ সন্তানের জন্ম হয়। বস্তুত বিকটরূপী ব্যাসের সেই মিলন-আয়াস সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত এক রমণীর কাছে এতটাই 'শকিং' ছিল যে, অম্বিকার গর্ভধারণ সার্থকভাবে সুশ্রী মিলনের পরিণতি লাভ করেনি। আমরা এই ঘটনাকে ধর্ষণ বলছি না, কিন্তু যদি একে অম্বিকার দিক থেকে মানসিক প্রস্তুতিহীন আতঙ্ক-মুহূর্ত বলে মেনে নিই, তবে তারই ফল অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র। অম্বিকার গর্ভকাল সম্পূর্ণ হলে অন্ধ হয়ে তিনি জন্মালেন—সাপি কালেন কৌশল্যা সুষুবে'ন্ধং তমাত্মজম্।

বস্তুত ধৃতরাষ্ট্র নামটা যে তাঁর কেমন করে হল, তাও আমাদের ভাল জানা নেই। নামের সঙ্গে কাজের মিল ঘটে না তাই মানুষের নাম সব সময়েই প্রায় অসার্থক হয়। কিন্তু যিনি যা

কাজ করেন, সেই কর্মানুসারে মানুষের নতুন নামকরণও হয়। এই যেমন নেতাজি, দেশবন্ধু ইত্যাদি। ধৃতরাষ্ট্রও সেইরকম কোনও নাম নাকি কে জানে। তিনি কোনও রাজ্যই পেলেন না অথচ তাঁর নাম ধৃতরাষ্ট্র—রাষ্ট্রকে যিনি ধারণ করেছেন। আমাদের ধারণা যদি ভুল না হয়, তা হলে এইভাবে ভাবা যেতে পারে যে, আমরা জানি—ভবিষ্যতে পাণ্ডু যখন রাজ্য ছেড়ে বনে চলে যাবেন, তখন থেকে তাঁর এই অন্ধ দাদাটিই কিন্তু পাণ্ডুর প্রতিভূ হিসেবে রাজ্যশাসন করবেন এবং তা করবেন সেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত। তা হলে বোঝা যাচ্ছে হস্তিনার স্বীকৃত রাজা পাণ্ডু যতদিন রাজত্ব করেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি রাজ্যশাসন করেছেন তাঁর বড় দাদা। তবুও তিনি রাজা নন, সব সময়েই তাকে অন্যের প্রতিনিধিত্ব করে রাজ্যভার সামলাতে হয়েছে, রাজ্যটাকে কোনওমতে ধারণ করতে হয়েছে। হয়তো এই জন্যই তাঁর নাম ধৃতরাষ্ট্র।

অন্ধ হয়ে জন্মেছিলেন বলেই ধৃতরাষ্ট্রকে রাজপুত্রের শিক্ষা দীক্ষা থেকে মোটেই বঞ্চিত করা হয়নি। ব্রহ্মচারী হয়ে বেদ পাঠ করা থেকে আরম্ভ করে যা যা ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব— মল্লযুদ্ধ, ব্যায়াম, দ্রুত দৌড়োনো—এগুলো তাঁকে শেখানো হল যথেষ্ট করে। ধৃতরাষ্ট্রের শারীরিক বল পাণ্ডুর চেয়েও বেশি অন্যেভ্যো বলবানাসীদ্ ধৃতরাষ্ট্রো মহামতিঃ কিন্তু চক্ষুহীনতার জন্য ধনুর্বেদ বা অন্যান্য চক্ষুঃসাধ্য অস্ত্রবিদ্যা তাঁকে শেখানো গেল না।

ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুর—এই তিন রাজকুমারকেই ভীষ্ম অসীম মমতায় মানুষ করেছিলেন। কিন্তু এবারে সেই সময় এল, যখন এমনই এক সংকট উপস্থিত, যাতে ভীষ্মের পক্ষে নিরপেক্ষভাবে এক সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। হস্তিনাপুরের সিংহাসনে উপস্থিত কোনও রাজা নেই এবং প্রসিদ্ধ ভরতবংশের উত্তরাধিকারীর জন্যই জননী সত্যবতী অন্য উপায়ে এই তিনটি কুমারকে লাভ করেছেন। কিন্তু উত্তরাধিকারী এবং একটি উপযুক্ত রাজা পাবার জন্য সত্যবতীর তাড়না কতটা ছিল, তা বোঝা যাবে মহামতি ব্যাসের সেই ভবিষ্যৎবাণীর সময়। অম্বিকার সঙ্গে ব্যাসের মিলন সম্পূর্ণ হবার পরেই সত্যবতী তাঁকে বলেছিলেন—কেমন হবে এই পুত্র। ব্যাস বলেছিলেন—এই পুত্র বলবান, ভাগ্যবান সবই হবে কিন্তু এ পুত্র অন্ধ হয়েই জন্মাবে।

সত্যবতী হাহাকার করে ব্যাসকে বলেছিলেন—একটি অন্ধ ছেলে কী করে কুরুবংশের রাজা হবে, বাছা—নান্ধঃ করুণাং নৃপতিরনুরূপস্তপোধন। তুমি দ্বিতীয় একটি পুত্রের জন্ম দাও, যে রাজা হবে এই প্রসিদ্ধ ভরতবংশের—রাজানং দাতুমর্হসি। ধৃতরাষ্ট্র সেদিন এ কথা শুনতে পাননি অথবা শুনলেও বোঝেননি, কিন্তু ব্রহ্মচর্য বেদবিদ্যা, এবং শারীর শিক্ষার পালা যখন শেষ হল, সেদিন হঠাৎ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের জীবনে আরও এক অদ্ভুত অন্ধকার নেমে এল। চিরকাল তিনি শুনে এসেছেন—বাড়ির জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজা হন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র হওয়া সত্ত্বেও কেউ তাঁকে রাজা হবার কথা বলল না। কোনও প্রতিহারী আকালিক মুহূর্তে এসে তাঁকে জানাল না—রাজপুত্র! রাজসভায় আপনার ডাক পড়েছে। ধৃতরাষ্ট্র যে কিছুই জানতেন না, তা নয়। তিনি বেদ বেদাঙ্গ রাজধর্মের গ্রন্থ অনেক পড়েছেন। রাজধর্মের নীতিনিয়মে বলা আছে—বামন, ক্লীব, পতিত, জন্মান্ধ এবং জন্মবধির ব্যক্তিরা রাজ্যলাভের অধিকারী নন—অনংশৌ ক্লীব-পতিতৌ জাত্যন্ধবধিরৌ তথা।

কেন যে তাঁরা রাজত্বের অধিকারী নন সে সম্বন্ধে শাস্ত্রকারদের নিরপেক্ষ যুক্তি আছে। সত্যিই তো একটি রাজ্যের শাসন সুষ্ঠুভাবে চালাতে হলে যে পরিমাণ সজাগ থাকতে হয়, তাতে সাধারণ অঙ্গবৈকল্যও বাধা সৃষ্টি করে। সেখানে চক্ষুহীনতা একজন রাজার কাছে এতটাই বাস্তব অসুবিধে তৈরি করে, যে পদে পদে তাঁকে মন্ত্রী সেনাপতিদের কাছে পরোক্ষভাবে নিগৃহীত হতে হবে। ধৃতরাষ্ট্র এসব জানেন না, তা নয়। কিন্তু তবু জ্যেষ্ঠপুত্র বলে, অথবা অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও বেশ কিছু শারীর শিক্ষা তাঁর হয়েছিল বলে, হয়তো অন্তরের অন্তঃস্থলে এতটুকু আশা ছিল—যদি তিনি রাজা হন! কিন্তু তা হল না। সমাজ এবং রাষ্ট্রের শৃঙ্খলিত নিয়মে কোনও এক পুণ্যপ্রভাতে পাণ্ডু হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনে বসলেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলে সিংহাসনের অধিকার পেলেন না—ধৃতরাষ্ট্রস্ত্বচক্ষুস্ত্বাদ্, রাজ্যং ন প্রত্যপদ্যত।

রাজ্যের জ্যেষ্ঠ পুত্রটি সিংহাসনে বসতে পারলেন না বলে পাণ্ডুরও কোনও সাড়ম্বর অভিষেক সম্পন্ন হল না। দিন চলতে লাগল অন্য দিনগুলির মতোই। অন্ধের জীবনেও তার কোনও ব্যতিক্রম হল না। শুধু অন্তরে এক কূট দীর্ঘশ্বাস তৈরি হল—যে জন্মান্ধ তার অধিকার কী শুধু অন্যের করুণায়?

পাণ্ডুর অভিষেকে তেমন কোনও উৎসব হয়নি বলেই এবং জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মনে কিছু দুঃখ আছে জেনেই ভীষ্ম নতুন এক উত্তেজনা সৃষ্টি করলেন, যাতে বেশ ভালরকম একটা উৎসবও করা যায় এবং অন্ধ পৌত্রটির মনও যাতে অন্যদিকে চালিত হয়। ভীষ্ম একদিন বিদুরকে ডেকে পরামর্শ আরম্ভ করলেন। রাজপুত্রদের বিয়ের পরামর্শ। বিদুরকে তিনি বললেন—আমাদের এই প্রসিদ্ধ ভরতবংশ যাতে ফুলে ফেঁপে সাগরের মতো হয়ে ওঠে—তস্যৈতদ্ বর্ধতে ভূয়ঃ কুলং সাগরবদ্ যথা—সেই চিন্তাই এখন করতে হবে। মনে রেখো—আমি, জননী সত্যবতী এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এই তিনজন মিলে এই বংশের সুস্থিতি রাখবার যে চেষ্টা করেছি, সে ভার এখন তোমাদের ওপর—সমবস্থাপিতং ভূয়ো যুস্মাসু কুলতন্তুষু।

ভীষ্ম বিদুরকে কয়েকটি কন্যারত্নের খবর দিলেন, যাঁদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটলে ভরতবংশের পক্ষে অনকূল হবে বলে তিনি মনে করেছেন। আসলে ভরতবংশের পরম্পরা নিয়ে ভীষ্মের মনে এক অদ্ভুত ভয় আছে। মহারাজ শান্তনুর সঙ্গে সত্যবতীর সেই বিবাহের সময় থেকে এই সমস্যা আরম্ভ হয়েছে। তিনি নিজে বিবাহ করতে পারলেন না, চিত্রাঙ্গদ মারা গেলেন, বিচিত্রবীর্য মারা গেলেন। তার বহু সাধ্যসাধনা করে ভরতবংশে যে পুত্রগুলি জন্মাল, তাঁদের মধ্যে একজন অন্ধ, একজন শূদ্রার সন্তান। বাকি রইলেন শুধু পাণ্ডু। তিনিই রাজা হয়েছেন বটে, কিন্তু ভীষ্ম চান তাঁদের বংশধারায় অনেকগুলি পুত্র সন্তান জন্মাক, যাতে ভরতবংশে উত্তরাধিকারের কোনও সমস্যা না হয়।

সেকালের দিনে ভাল পাত্রীর খবর পাওয়া যেত মুনি ঋষিদের কাছে। তাঁরা তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতেন, এ-রাজা সে-রাজার যাগযজ্ঞে উপস্থিত হতেন, কখনও বা স্বেচ্ছায় আতিথ্য গ্রহণ করতেন রাজাদের বাড়িতে। এইভাবেই রাজবাড়ির রাজকন্যার খবর হয়ে যেত। ভীষ্ম গান্ধারীর খবরও পেলেন এইভাবে। ভীষ্ম ব্রাহ্মণদের কাছে শুনতে পেলেন—গান্ধার দেশের রাজা সুবলের একটি ভারী লক্ষ্মীমতী মেয়ে আছে। শিবের আরাধনা করে সে শত পুত্রের জননী হবার বর লাভ করেছে—গান্ধারী কিল পুত্রাণাং শতং লেভে বরং শুভা।

এই পুত্রসংখ্যার ওপর ভীষ্মের কিছু দুর্বলতা আছে। এতকাল ভরতবংশের কর্ণধার হয়ে তাঁর বড় দুর্ভাবনা গেছে। তিনি এইরকমই একটি সৌভাগ্যবতী রমণী চান, যে তাঁকে ভাবনামুক্ত করবে। সমস্ত দিক বিবেচনা করে ভীষ্ম একটি বিশ্বস্ত দূত পাঠালেন গান্ধার রাজা সুবলের কাছে। দূতের মুখে ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত বর্ণনা শুনে বড় দ্বিধায় পড়লেন গান্ধাররাজ। যাঁর সঙ্গে গান্ধারীর সম্বন্ধ ঘটালেন ঈশ্বর, তিনি অন্ধ। একটি অন্ধ রাজপুত্রের হাতে চিরজীবনের মতো মেয়েকে সঁপে দেবার ইচ্ছে হল না তাঁর—অচক্ষুরিতি তত্রাসীৎ সুবলস্য বিচারণা। অন্যদিকে এই কথাটাও বার বার সুবলের মনে ক্রিয়া করতে লাগল যে, ছেলেটি বিখ্যাত ভরতবংশের জাতক। এই বংশের খ্যাতিতেই একটি বিশাল দেশ আজ ভারতবর্ষ নামে চিহ্নিত হয়েছে। অনেক ভাবনা, অনেক দুশ্চিন্তার পর ভরতবংশের খ্যাতির কথাই তাঁর মনে ক্রিয়া করতে লাগল। মহামতি ভীষ্ম তাঁর কন্যাকে চেয়ে পাঠিয়েছেন, এই গৌরবও তাঁকে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে ত্বরান্বিত করল। ধৃতরাষ্ট্রের কুল, তার প্রসিদ্ধি এবং ভরতবংশীয়দের চরিত্র স্মরণ করে মহারাজ সুবল রাজি হলেন বিবাহে। তিনি দূতের কাছে কথা দিলেন—এ বিয়ে হবে—দদৌ তাং ধৃতরাষ্ট্রায় গান্ধারীং ধর্মচারিণীম।

যথাসময়ে এই বিয়ের কথা গান্ধারীর কানেও গেল। তিনি যখন বুঝলেন যে, তাঁর পিতামাতা ভরতবংশের খ্যাতি-কীর্তিতে মুগ্ধ হয়ে একটি অন্ধ রাজপুত্রের সঙ্গেই তাঁর বিবাহ ঠিক করেছেন, তখন তিনি মাতাপিতাকে যেমন অতিক্রম করলেন না, তেমনই তাঁর ভাবী স্বামীর প্রতিও একই সঙ্গে সমব্যথী হয়ে উঠলেন। যাঁর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবে, তিনি এই সুন্দর ভুবনের রূপ রস কিছুই অনুভব করতে পারবেন না, আর তাঁরই সহধর্মিণী হয়ে তিনি চক্ষুর বিষয়গুলি ভোগ করবেন—এমনটি তিনি চাইলেন না। ভাবী স্বামীর প্রতি সমব্যথায় তিনি একটি পট্টবস্ত্র বেঁধে নিলেন নিজের চোখের ওপর। স্বামীর উপযুক্ত হবার জন্য এই ছিল তাঁর প্রথম সাধন। তাঁর ধারণা—চক্ষুদুটি দিয়ে দেখতে পেলে, সেও এক ধরনের অতিক্রম করা হবে স্বামীকে। গান্ধারী কোনও ব্যাপারেই স্বামীকে অতিক্রম করতে চান না—নাতিশিষ্যে পতিমহম্ ইত্যেবং কৃতনিশ্চয়া। স্বামীর দুঃখ গান্ধারী যেন আগে থেকেই আত্মসাৎ করে নিলেন।

গান্ধার রাজ্যটা ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে এখনকার পাকিস্তান ছাড়িয়ে আরও কিছু দূরে। সেখান থেকে হস্তিনাপুরে আসা তো খুব কম কথা নয়। পাহাড়ি পথ নদ নদী, পথের ভয়। কিন্তু সেকালের দিনে এই নিয়মও ছিল—মেয়েকে শ্বশুরবাড়িতে উঠিয়ে এনে বিয়ে দেওয়া হত। অতএব যুবতী এবং সুন্দরী গান্ধারীকে নিয়ে তাঁর ভাই শকুনি রওনা দিলেন হস্তিনাপুরের পথে। সঙ্গে চলল গান্ধাররাজ্যের রথ, অশ্ব, পদাতিক—স্বসারং পরয়া লক্ষ্ম্যা যুক্তামাদায় কৌরবান্। হস্তিনায় পৌঁছে শকুনি ভীষ্মের অনুমতি নিলেন। বিবাহের দিন ঠিক হল তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে। তারপর পরম আদরে ভগিনী গান্ধারীকে ধৃতরাষ্ট্রের হাতে তুলে দিলেন শকুনি। সঙ্গে দিলেন রাজকীয় উপহার—রথ, অশ্ব, হাতি, বহুমূল্য বস্ত্র।

শকুনি ভগিনীকে রেখে আপাতত ফিরে গেলেন গান্ধারে। আর রাজকন্যা গান্ধারী নিজের চরিত্র এবং আচারব্যবহারে মুগ্ধ করে দিলেন কুরুবাড়ির সকলকে। তাঁর স্বামীনিষ্ঠার মধ্যে যে

শুধু কর্তব্যের বাহ্য আড়ম্বর ছিল, তা মোটেই নয়। তিনি যে স্বামীর মন বা মনস্তত্ত্ব কতটা বুঝতেন, তার পরিচয় আমরা সেইদিনই বুঝেছি, যেদিন গান্ধারী তাঁর চোখদুটি বেঁধে নিয়েছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র নিশ্চয়ই মনে মনে ভীষণ খুশি হয়েছিলেন। অন্ধত্বের জন্য রাজ্য পাননি বলে তাঁর মনের মধ্যে যে অনন্ত জটিলতা ছিল, সেই জটিলতা হয়তো আরও বাড়ত, যদি তিনি দেখতেন তাঁর একান্ত সহধর্মিণী জগতের রূপ, রস, গন্ধ স্বাধীনভাবেই ভোগ করছেন, আর তিনি পড়ে আছেন সেই অন্ধত্বের কূপগৃহে। অতএব গান্ধারীর এই স্বারোপিত অন্ধত্ব ধৃতরাষ্ট্রকে খুশি করেছিল অন্তরে।

ধৃতরাষ্ট্রের বিয়ের পর পর পাণ্ডুরও বিয়ে হয়ে গেল কুন্তী এবং মাদ্রীর সঙ্গে। লক্ষণীয় ব্যাপার হল, বিয়ের পর ঠিক এক মাস যেতে না যেতেই পাণ্ডু দিগ্‌বিজয়ে বেরোলেন। নানা দেশ জয় করে পাণ্ডু যে ধনরত্ন সঞ্চয় নিয়ে এসেছিলেন, সেগুলি ভাগ করে দেবার সময় পাণ্ডুকে কিন্তু আমরা ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নিতে দেখছি—ধৃতরাষ্ট্রাভ্যনুজ্ঞাতঃ স্ববাহুবিজিতং ধনম্। হয়তো পাণ্ডুর এই ব্যবহারের মধ্যে রাজোচিত উদারতার সঙ্গে বড় দাদার প্রতি মায়াও কিছু ছিল। যিনি অন্ধত্বের জন্য রাজ্য পাননি, তাঁকে অতিরিক্ত মর্যাদা দিয়ে যদি তাঁর ক্ষোভ কিছুটা কমানো যায়—এই চেষ্টাই হয়তো করেছেন পাণ্ডু।

পাণ্ডুর এই দান মানের প্রক্রিয়ায় ধৃতরাষ্ট্র যে অখুশি হয়েছেন তা মোটেই নয়, তবে এই মায়ার দান তাঁর মনে যে কোনও জটিলতার সৃষ্টি করেনি, তা বলা যাবে না। পাণ্ডুর দানে মানে পুলকিত হয়ে তাঁর লব্ধ অর্থ দিয়ে ধৃতরাষ্ট্র যজ্ঞটজ্ঞ অনেক করেছেন। তবে এই প্রকট আনন্দ প্রকাশের অন্তরালে হতাশার এক বিচিত্র অন্তঃক্রিয়া চলছিলই, যা ধৃতরাষ্ট্র নিজেও খুব যে বুঝতে পারছিলেন, তা নয়।

সঠিক কী যে হল, তা জানি না, কিন্তু দিগ্‌বিজয় সেরে কিছুদিনের মধ্যেই পাণ্ডু রাজভোগ রাজসুখ ত্যাগ করে দুই স্ত্রীকে নিয়ে বনে চলে গেলেন। জ্যেষ্ঠ দাদার ওপর কোনও অভিমান ছিল কি না, কোনও নিঃশব্দ ক্রোধ ছিল কি না, মহাভারতের কবি তা স্পষ্টত বলেননি। শুধু বলেছেন—মৃগয়ার ব্যপদেশে পাণ্ডু দুই স্ত্রীকে নিয়ে অকালে বনবাসী হলেন। এই অবস্থায় ধৃতরাষ্ট্রকে আমরা অস্থায়ী এক কার্যনির্বাহী রাজার ভূমিকায় দেখতে পাচ্ছি, আরও দেখতে পাচ্ছি, পাণ্ডুর বনবাসের প্রথম কল্পে ধৃতরাষ্ট্র যথেষ্ট আদর করার চেষ্টা করছেন বনবাসী পাণ্ডুকে। উৎসাহী লোক দিয়ে পাণ্ডুর চিরাভ্যস্ত বিলাসদ্রব্য অথবা প্রিয় ভোজ্যদ্রব্য ধৃতরাষ্ট্র পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন বনে—তস্য কামাংশ্চ ভোগাংশ্চ নরা নিত্যমতন্দ্রিতাঃ। উপাজহ্রু-বর্নান্তেষু...

পাণ্ডু বন থেকে মোটেই ফিরে এলেন না। কিন্তু এক ভাই বনে এবং আরেক ভাই রাজধানীতে থাকলেও তাঁদের দুজনের মধ্যেই যে সাধারণ প্রচেষ্টা দেখা গেল, সেটা হল যত শীঘ্র সম্ভব পুত্রলাভের চেষ্টা। ধৃতরাষ্ট্রপত্নী গান্ধারী পূর্বে মহাদেবকে তুষ্ট করে শত পুত্র লাভের বর পেয়েছিলেন, সে বর আরও পরিপুষ্ট হল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের কৃপায়। কোনও এক সময় ক্ষুধাশ্রান্ত ব্যাসকে অতিরিক্ত শুশ্রূষা করে গান্ধারী তাঁর পূর্বান্বিষ্ট বরই ব্যাসের কাছে পুনরায় চাইলেন। তিনি শতপুত্রের জননী হতে চান। এর পরেই গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবীজ ধারণ করলেন আপন গর্ভে।

লক্ষণীয় ব্যাপার হল, মহারাজ পাণ্ডু শতশৃঙ্গ পর্বতে থেকেও এই গর্ভধারণের খবর পেয়েছেন মনে হয়। দুর্ভাগ্য, এরই মধ্যে তাঁর প্রজননক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে। এর জন্য তথাকথিত মৃগ-মুনির অভিশাপই দায়ী, নাকি আদতেই তাঁর প্রজননক্ষমতা ছিল না, সে অন্য তর্ক। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হল, গান্ধারীর গর্ভধারণের অনুরূপ সময়েই পাণ্ডুও কিন্তু আপন পুত্রলাভের জন্য পাগল হয়ে উঠলেন। যে কোনও কারণেই হোক গান্ধারীর পুত্রলাভে বিলম্ব

হচ্ছিল, এদিকে পাণ্ডুর প্রথমা পত্নী কুন্তী দুর্বাসার দেববশীকরণ মন্ত্রের সুযোগ নিয়ে গর্ভধারিণী গান্ধারীর পূর্বেই পুত্রলাভ করলেন—পাণ্ডুর অনুমতিক্রমে, নিয়োগপ্রথায়। পাণ্ডু এবং ধৃতরাষ্ট্র—এই দুই পরস্পরস্পর্ধী রাজভ্রাতার মধ্য পাণ্ডুর প্রথম পুত্র যুধিষ্ঠিরই যে পরবর্তী প্রজন্মের জ্যেষ্ঠ পুত্র, সে কথা সেই শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে একজন এসে জানিয়েও গেল ধৃতরাষ্ট্রের রাজধানী হস্তিনাপুরে। পাণ্ডুর অরণ্যনিবাস থেকে যে লোকটি এসেছিল, সে এই কথাদুটি গুরুত্বপূর্ণ লোকের কানে দিয়ে গেল। তাঁদের একজন কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম, অপরজন কুরুরাষ্ট্রের বিবেক বিদুর—তদাখ্যাতন্তু ভীষ্মায় বিদুরায় চ ধীমতে। তবে আমাদের ধারণা এ খবর দিয়েছিলেন স্বয়ং মহামতি ব্যাস।

খবরটা ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না। গান্ধারী যখন কুন্তীর পুত্রলাভের কথা শুনলেন, তখন তাঁর মতো মনস্বিনী ধীরা রমণীও ঈর্ষায় কাতর হলেন। বোধ করি—ধৃতরাষ্ট্রের মানসিক জটিলতা তাঁরও অন্তরে কোনওভাবে প্রবেশ করেছিল। অন্ধত্বের জন্য নিজে রাজ্য পাননি বলে ধৃতরাষ্ট্র নিশ্চয়ই চেয়েছিলেন—তাঁর পুত্রটি অন্তত রাজ্য লাভ করুক, হস্তিনাপুরে জ্যেষ্ঠের পরম্পরা থাকুক। হয়তো গান্ধারীকে তিনি বার বার এই ব্যাপারে সচেতন করেছিলেন। এই উদ্দেশেই গান্ধারী কুন্তীর পূর্বে গর্ভধারণ করেন। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য কুন্তীর গর্ভেই পাণ্ডুর প্রথম পুত্র জন্মাল।

ঈর্ষায়, দুঃখে অধীর হয়ে গান্ধারী তাঁর নিশ্চল গর্ভে আঘাত হানলেন পুত্রলাভের আশায়। মহাভারতের কবি লিখেছেন—ধৃতরাষ্ট্রের অজ্ঞাতসারেই গান্ধারী এই কাজটি করেন—অজ্ঞতাং ধৃতরাষ্ট্রস্য। কিন্তু কেন গান্ধারী এই অধৈর্যের পরিচয় দিলেন, তা আমরা জানি। ধৃতরাষ্ট্র যে খুশিটুকু চেয়েছিলেন, সেই খুশিটুকু দিতে পারলেন না বলেই স্বামীকে না জানিয়ে কুন্তীর ওপর অক্ষম ঈর্ষা মেটালেন তিনি—সোদরং ঘাতয়ামাস গান্ধারী দুঃখমূর্ছিতা। গর্ভে আঘাত করেও গান্ধারী পুত্র পেলেন না। লোহার মতো শক্ত একটি মাংসময়ী পেশি প্রসব করে গান্ধারী নিরাশ হয়ে বসে রইলেন। মাংসপেশিটি ফেলেই দিতেন তিনি, কিন্তু সেই মুহূর্তেই বেদব্যাস এসে পড়লেন গান্ধারীর কাছে। কুন্তীর ওপর পুনরায় তাঁর ঈর্ষা সুব্যক্ত হল। ব্যাসকে তিনি জানালেন—কুন্তীর ছেলে হয়েছে শুনেই আমি এই আকালিক গর্ভপাত ঘটিয়েছি—দুঃখেন পরমেনেদম্ উদরং পাতিতং ময়া।

আমরা জানি—ব্যাস অসীম করুণায় ঘৃতপূর্ণ কলসিতে শীতল জলের মধ্যে সেই মাংসপেশি রক্ষণ করেছিলেন এবং সেই শীতল-কলসির প্রক্রিয়ায় একদিন তা থেকেই গান্ধারীর শত পুত্র জন্ম লাভ করেছিল। ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র যেদিন জন্মাল, সেদিন কবির বর্ণনায় অনেক অলক্ষণ দুর্লক্ষণ দেখা গেছে। কিন্তু সেগুলিকে আক্ষরিক অর্থে না ধরাই ভাল। আসলে এইসব দুর্লক্ষণ ধৃতরাষ্ট্রের প্রথমজন্মা পুত্রের ব্যাপারে সমকালীন মানুষের দুশ্চিন্তা এবং দুর্ভাবনা সূচনা করে। ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্রটিকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত দেখতে চান বলেই, কুরুবাড়ির কর্তাব্যক্তিদের মনে নতুন এক বিপন্নতা তৈরি হয়েছে এবং এই বিপন্নতাই দুর্লক্ষণের প্রতিরূপে মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে।

দুর্যোধন নাকি জন্মের সময়েই একটি গর্দভের মতো কর্কশ স্বরে কেঁদে উঠেছিলেন এবং তাঁর সেই ক্রন্দনধ্বনির উত্তর শোনা গিয়েছিল শেয়াল শকুন কাকের চিৎকারে। কিন্তু এগুলি বড় কথা নয়। দুর্যোধন জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রীপ্রতিম ব্রাহ্মণদের ডেকে এবং বিশেষত ভীষ্ম এবং বিদুরকে ডেকে একটি সভায় মিলিত হন—সমানীয় বহূন বিপ্রান্ ভীষ্মং বিদুরমেব চ। সভায় তাঁর বক্তব্য ছিল একটাই। সমবেত মন্ত্রীদের তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—আমাদের বংশের ভূষণ যিনি, সেই যুধিষ্ঠির তো নিজের গুণে রাজ্য পেয়েই গেছেন। অতএব সে ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই—প্রাপ্তং স্বগুণতো রাজ্যং ন তস্মিন্ বাচ্যমস্তি নঃ। এই কথা থেকে যুধিষ্ঠিরের সম্বন্ধে ধৃতরাষ্ট্রের যে বড় তৃপ্তি ছিল, এটা ভাবার কোনও কারণ নেই। কেননা ধৃতরাষ্ট্র সভা ডেকেছিলেন সভয়ে—ততস্তু ভীতবদ্ রাজা

ধৃতরাষ্ট্রো’ব্রবীদিদম্—তাঁর মনে ভয় ছিল—তিনি যা বলছেন, ভীষ্ম-বিদুররা তা সমর্থন করবেন তো? যুধিষ্ঠিরের কথা বলেই ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করেছিলেন—যুধিষ্ঠির এখন না হয় রাজ্য পেলেন, কিন্তু তাঁর পরেই আমার ছেলেটি রাজ্য পাবে তো—অয়ন্তু অনন্তর-স্তস্মাদ্ অপি রাজা ভবিষ্যতি?

ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন শুনে তাঁর মন্ত্রী, ব্রাহ্মণরা, ভীষ্ম, বিদুর সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। আবার সেই শেয়াল শকুনের দুর্লক্ষণ রূপক বর্ণনা করতে হয়েছে মহাভারতের কবিকে। মহামতি বিদুর তাঁকে সদুপদেশ দিয়ে বলেছিলেন—যেসব দুর্লক্ষণ দেখছি, তাতে আপনার এই ছেলেটি আমাদের বংশনাশের কারণ হয়ে উঠবে। অতএব আপনি একে পরিত্যাগ করলেই অনিষ্ট হবার সম্ভাবনাটা কম থাকবে। একে রাখলে অনেক অনর্থ ঘটবে—ব্যক্তং কুলান্তকরণো ভবিতৈষ সুতস্তব।

বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝানোর জন্য একটু ভাবাবেগও প্রয়োগ করলেন। বললেন—একশোটার জায়গায় আপনার বরং নিরানব্বইটি ছেলে থাকুক মহারাজ! কিন্তু একটা ছেলেকে আপনি ত্যাগ করুন। এতে এই বংশেরও মঙ্গল হবে, জগতেরও মঙ্গল হবে—একেনৈব কুরু ক্ষেমং কুলস্য জগত স্তথা। আসলে শেয়াল শকুনের দুর্লক্ষণ নয়, ধৃতরাষ্ট্রের মনের মধ্যেই সেই ভয়ংকর চাওয়াটুকু দেখা দিয়েছিল, যাতে ভবিষ্যতের জ্ঞাতি-বিরোধ স্পষ্টভাবে অনুমান করা যাচ্ছিল। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের কথা শোনেননি, হয়তো শোনা সম্ভবও ছিল না। আজকের আধুনিক দৃষ্টিতে এবং মানবিক ভাবনায় ধৃতরাষ্ট্রের এই ব্যবহার হয়তো স্বাভাবিকই ছিল। সে-কালের দিনের প্রজারঞ্জক রাজার সুউচ্চ আদর্শের নিরিখে ধৃতরাষ্ট্রের এই মানসিকতা ঠিক ছিল না। প্রসিদ্ধ ভরতবংশে স্বার্থান্বেষী রাজার স্থান হয়নি কোনওদিন। স্বয়ং ভরত দৌষ্মন্তি তাঁর নিজের ছেলেগুলিকে রাজকর্মের অযোগ্য দেখে তাঁদের রাজসিংহাসনের অধিকার কেড়ে নিয়েছিলেন—নাভ্যনন্দত তান্ রাজা নানুরূপা মমেত্যুত। ভরতের তিন রানি রাগে দুঃখে নিজেদের ছেলেগুলিকে মেরে ফেলেছিলেন, সে খবরও আমরা মহাভারতেই পাই—ততস্তান্ মাতরঃ ক্রুদ্ধাঃ পুত্রান্ নিন্যুর্যমক্ষয়ম্।

কিন্তু সেই ভরতবংশের জাতক হওয়া সত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্র কিন্তু তাঁর প্রথম পুত্রটির মায়া ত্যাগ করতে পারলেন না—ন চকার তথা রাজা পুত্রস্নেহ-সমন্বিতঃ। ধৃতরাষ্ট্রের একশো পুত্রই রইল, সঙ্গে একশো ভাইয়ের এক বোন, ধৃতরাষ্ট্রের একটি কন্যাও জন্মাল। তার নাম দুঃশলা। গান্ধারী যখন গর্ভের ভারে শ্রান্তক্লান্ত, তখন ধৃতরাষ্ট্র তাঁর কামবেগ প্রশমনের জন্য একটি বৈশ্যজাতীয়া দাসীর সঙ্গে মিলিত হন। তাঁর গর্ভেও ধৃতরাষ্ট্রের একটি পুত্র হয়। তাঁর নাম যুযুৎসু। সে কালের দিনের সমাজে এই জাতীয় মিলনের বৈধতা সম্পূর্ণ নির্ভর করত পিতামাতার স্বীকৃতির ওপর। কাজেই বৈশ্যা রমণীর গর্ভজাত পুত্রটির সামাজিক কোনও সমস্যা হয়নি।

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রসংখ্যা ঠিক একশো কি না এই সংখ্যাতত্ত্বের সত্যতার মধ্যে আমরা যাচ্ছি না। এমন হতেও পারে ধৃতরাষ্ট্র অনেকগুলি পুত্রের জনক ছিলেন বলেই হয়তো শতসংখ্যার গৌরবটুকু তিনি পেয়েছেন। যাই হোক এতগুলি পুত্রকন্যা নিয়ে ধৃতরাষ্ট্র সানন্দে দিন কাটাচ্ছিলেন। ওদিকে সেই শতশৃঙ্গ পর্বতের অরণ্য-আবাসে পাণ্ডু তাঁর পঞ্চপুত্র নিয়ে বাৎসল্য রস চরিতার্থ করছেন। কিন্তু সেই পুত্রদের নিয়ে হস্তিনায় ফিরে আসার কথা এখনও ভাবেননি পাণ্ডু। অতএব হস্তিনাপুরের রাজসুখের অধিকার এখনও সম্পূর্ণভাবেই ধৃতরাষ্ট্রের। পূর্বে তিনি ভৃত্যজনের মাধ্যমে পাণ্ডুর প্রিয় বিলাসদ্রব্য পাণ্ডুর কাছে পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু এখন পাণ্ডু কোথায় আছেন—ধৃতরাষ্ট্রও তা ভাল করে জানেন না। আসলে একটা সময় ছিল যখন মৃগ-মুনির অভিশাপগ্রস্ত পাণ্ডু পুত্র হবে না ভেবে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন এবং সে খবর তিনি সাড়ম্বরে ধৃতরাষ্ট্রকে জানিয়েও দিয়েছিলেন। এমনকী হস্তিনার রাজবাড়ি থেকে

আসা যেসব ধনরত্ন পাণ্ডুর কাছে অবশিষ্ট ছিল, তাও তিনি এক ভৃত্যের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে—কথয়াঞ্চক্রিরে রাজ্ঞ-স্তব্ধনং বিবিধং দদুঃ।

পাণ্ডু তখন নানা বনপর্বত এবং তীর্থগুলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। কাজেই ধৃতরাষ্ট্রের খুব দোষ ছিল না। পাণ্ডুর প্রব্রজ্যা গ্রহণে তিনি দুঃখও পেয়েছিলেন যথেষ্ট। অন্যদিকে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে একবার একরকম বলে, তারপর পঞ্চপুত্র লাভের পর হস্তিনায় ফিরে আসাটা পাণ্ডুর রুচিতে বেধেছে। আর তারপর তো পাণ্ডু মারাই গেলেন।

তথ্যের দিকে তাকিয়ে দেখুন—পাণ্ডু মারা যাবার পর কুন্তী যখন তাঁর পঞ্চ পুত্রের হাত ধরে হস্তিনায় এসে পৌঁছোলেন, তখন যুধিষ্ঠিরের বয়স ষোলো, তার মানে, আগের প্রবজ্যা গ্রহণের সময় থেকে ধরলে অন্তত কুড়ি-বাইশ বছর ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর কোনও খবর পান না। আর এই কুড়ি-বাইশ বছরে রাজসুখ তাঁর এতটাই অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারে যাতে আশঙ্কা করার মতো কিছু থাকে না। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররাও মানুষ হচ্ছিলেন রাজবাড়ির বাতাবরণে। বিশেষ জ্যেষ্ঠ দুর্যোধনের সম্বন্ধে ধৃতরাষ্ট্রের দুর্বলতা ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র বলেই হোক অথবা তার জন্মের সময় অন্য লোকে অকথাকুকথা বলেছিল বলেই হোক, দুর্যোধনের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহ প্রশ্রয় ছিল বাঁধভাঙা। ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্রয়ে দুর্যোধন ভবিষ্যতের রাজা হবার স্বপ্ন দেখছিলেন এবং সে স্বপ্ন ধৃতরাষ্ট্রের ছিল, যা আমরা দুর্যোধনের জন্মের সময়েই দেখেছি।

দীর্ঘ পনেরো-কুড়ি বছরের অন্তর থাকায় ধৃতরাষ্ট্র ভুলেই গিয়েছিলেন যে পাণ্ডুরও পাঁচটি পুত্র আছে। তিনি আপন রাজসুখের বিলাসে যত না ব্যস্ত ছিলেন, তারচেয়ে অনেক বেশি আচ্ছন্ন ছিলেন সেই ভ্রান্তিবিলাসে, যাতে তিনি হয়তো ভেবেছিলেন—পাণ্ডু আর দেশে ফিরবেন না, তিনি প্রব্রজিত। বাস্তবে পাণ্ডু সত্যিই ফিরলেন না বটে, কিন্তু তাঁর মৃতদেহ ফিরে এল হস্তিনাপুরে। শতশৃঙ্গ পর্বতের আরণ্যক ঋষি মুনিরা পাণ্ডু এবং মাদ্রীর মৃতদেহ নিয়ে হস্তিনাপুরে এসেছেন; তাঁদের সঙ্গে এসেছেন কুন্তী এবং পাণ্ডুর পঞ্চ পুত্র, সহায়হীন, সম্বলহীন, হস্তিনার রাজবাড়ির দুয়ারে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁরা।

সমস্ত রাজধানী ভেঙে পড়েছিল তাঁদের দেখবার জন্য। ভীষ্ম বিদুর ধৃতরাষ্ট্র সকলে শশব্যস্তে বাইরে এসেছিলেন সমাগত মুনি ঋষিদের বক্তব্য শোনার জন্য। গান্ধারী এবং অন্তঃপুরের রমণীরা যে যেভাবে ছিলেন সে অবস্থাতেই এসে দুখিনী কুন্তীর হাত ধরেছিলেন। কিন্তু দুর্যোধনরা শত ভাই যেভাবে সালংকারে সেজেগুজে পিতৃহীন পাণ্ডবদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তাতে ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহান্ধতার অবধিটুকু বিচার করা যায়।

পাণ্ডুর মৃত্যুতে ধৃতরাষ্ট্র যে যথেষ্ট কষ্ট পেয়েছিলেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মুনি ঋষিদের সাক্ষীপ্রমাণ শুনে কুন্তী এবং তাঁর পঞ্চ পুত্রের ভরণপোষণের ব্যবস্থাও তিনি করেছেন এবং প্রয়াত পাণ্ডুর সৎকারের ব্যবস্থাও তিনি এমন রাজকীয়ভাবে করেছেন যে, তাতে ছোট ভাইয়ের প্রতি তাঁর যে কোনও অসদ্ দৃষ্টি ছিল, তা বোঝা যাবে না। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের মানসিকতা পরিবর্তিত হতে সময় লাগেনি। হয়তো সেদিনকার কথা তিনি ভাবতে পারেননি, যেদিন পাণ্ডুর পঞ্চ পুত্র তাঁদের মায়ের হাত ধরে আশ্রয়প্রার্থীর মতো হস্তিনার রাজবাড়িতে প্রবেশ করেছিলেন। হয়তো এমন তিনি ভেবেছিলেন যে, রাজকীয় মর্যাদা নয়, সাধারণ ভরণপোষণের সুবিধা দিলেই মৃত পাণ্ডুর হাত থেকে তিনি মুক্তি পাবেন। কিন্তু তিনি একবারের তরেও হয়তো মনে রাখেননি যে, পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্ম-সংবাদ হস্তিনাপুরে জানিয়ে দিয়ে গিয়েছিল একটি অজ্ঞাতনামা লোক এবং তাও কুরুবংশের অলিখিত কর্ণধার ভীষ্মের কাছে এবং নীতিবিদ বিদুরের কাছে।

পাণ্ডব-ভাইরা-কৌরব ভাইদের সঙ্গেই বড় হচ্ছিলেন। তফাত শুধু এইটুকুই যে, দুর্যোধনরা যে রাজকীয়তার মধ্য দিয়ে বড় হচ্ছিলেন, পাণ্ডব-ভাইরা তা হচ্ছিলেন না হয়তো।

খাবারদাবার বা সাধারণ অন্নবস্ত্রের ভোগ থেকে পাণ্ডবরা নিশ্চয়ই বঞ্চিত হচ্ছিলেন না—সংবব্যর্ধন্ত ভোগাংস্তে ভুঞ্জানাঃ পিতৃবেশ্মনি। কিন্তু ষোলো-সতেরো বছরের দুর্যোধন যে ব্যক্তিত্ব নিয়ে রাজকীয় কায়দায় জলক্রীড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন, তা পাণ্ডবদের ভাবনার মধ্যেও ছিল না। বালকোচিত নানা ক্রীড়াকৌতুকের সময় ভীম কিছু শারীরিক অত্যাচার করে ফেলতেন কৌরব-ভাইদের ওপর। দুর্যোধন এতে অসন্তুষ্ট হয়ে ভীমকে বিষ খাওয়ানোর মতো সাংঘাতিক পরিকল্পনা করলেন। ধৃতরাষ্ট্রের পরোক্ষ প্রশ্রয় ছাড়া দুর্যোধনের পক্ষে এতটা কি ভাবা সম্ভব ছিল? ভীমকে বিষ খাওয়ানোর পরিকল্পনা নিয়ে দুর্যোধন রাজধানীর বাইরে গঙ্গার তীরে এক অস্থায়ী আবাস গড়ে তুললেন এবং অস্থায়ী আবাসের গঠন-পরিকল্পনা এবং ভক্ষ্য ভোজ্য পেয়র ব্যবস্থা—সবটাই ছিল রাজকীয়। সেই কৈশোরগন্ধী যুবক বয়সেই এই কাজের জন্য দুর্যোধন রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন। কারও কাছে তাঁর অনুমতি নেবার প্রয়োজন হয়নি। ধৃতরাষ্ট্রের নিঃশব্দ নিরুচ্চার প্রশ্রয় ছাড়া এই কাজ কি সম্ভব ছিল? তাই বলছিলাম, পাণ্ডবরা কৌরব-ভাইদের মতো একই সমতায় মানুষ হচ্ছিলেন না। ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষপাত তখন থেকেই সুস্পষ্ট ছিল।

ধৃতরাষ্ট্রের এই মানসিকতা আরও পরিষ্কার করে বোঝা যাবে ভীমের বিষ পানের পর। পাণ্ডব-ভাইরা যখন ভীমের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছেন, তখন জননী কুন্তী বিদুরকে ডেকে এনে ভীমের হারিয়ে যাবার ঘটনা জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি কিন্তু সঠিক সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন—ভীমের অস্তিত্ব দুর্যোধনকে কখনও খুশি করে না। কারণ দুর্যোধন খলস্বভাব, দুষ্টবুদ্ধি, রাজ্যলোভী এবং নির্লজ্জ—ক্রূরো’সৌ দুর্মতিঃ ক্ষুদ্রো রাজ্যলুব্ধো’নপত্রপঃ। কুন্তীর আশঙ্কা থেকে বোঝা যায়, ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যলিপ্সা ষোলো-সতেরো বছরের দুর্যোধনের মধ্যে এরই মধ্যে সংক্রমিত হয়ে গেছে।

এমনকী কুন্তী যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন—এটা উচ্চ স্বরে বলাটাও পাণ্ডবদের পক্ষে বিপজ্জনক ছিল। কারণ বিদুর কুন্তীকে বলেছিলেন—আপনার কথাগুলি বড় করে জোর গলায় বলবেন না, যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁদেরকে অন্তত বাঁচান। কারণ চেঁচিয়ে তিরস্কার করলে এই দুরাত্মা দুর্যোধন পরে আরও ক্ষতি করবে আপনার—মৈবং বদস্ব কল্যাণি শেষ-সংরক্ষণং কুরু। তার মানে, দুর্যোধন তখনই ধৃতরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। অথবা ধৃতরাষ্ট্র তখনই দুর্যোধনের সমস্ত ব্যবহার সমর্থন করেন; তা না হলে কুন্তী তাঁর ভাশুরের কাছেও নিজপুত্রের জীবনরক্ষার আর্জিটুকুও জানাতে পারছেন না কেন?

লক্ষ করে দেখুন, ভীম যখন বিষমুক্ত হয়ে ফিরে এসেছেন এবং তিনি দুর্যোধনের সমস্ত অসদ ব্যবহার চিৎকার করে বলছেন, তখন যুধিষ্ঠির তাঁকে থামতে বলেছেন। বলেছেন, কারণ ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনের কানে গেলে এ ঘটনা বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে। আজকের দিনের গুন্ডা-রাজনীতিতে দেখেছি—সাধারণ একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন সাধারণ মানুষ খুন হয়ে যাবার পরেও, সে বাড়ির অন্য লোকেরা চেঁচিয়ে পাড়ামাত করেন না। খুন হয়ে গেছে—এ যেন তাঁদেরই দোষ; লোক জানাজানি হয়ে নিজেদের ক্ষোভের কথা গুন্ডা-রাজনীতির নেতার কানে গেলে যদি আবারও হামলা হয়, সেই ভয়ে চুপ করে সিঁটিয়ে থাকতে হয় পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যকে। এখানেও ঠিক তাই। নিজের জ্যাঠা ধৃতরাষ্ট্রের শাসনে যুধিষ্ঠিররা পাঁচ ভাই পরস্পরকে পরস্পর রক্ষা করার ভার নিয়েছেন, কিন্তু সন্দেহতীতভাবে দুর্যোধন এখানে খুনি বলে জানা থাকলেও রাজা হিসেবে ধৃতরাষ্ট্রকে তা জানানো সম্ভব হয়নি। ধৃতরাষ্ট্র যদি সমদর্শী হতেন, তা হলে যুধিষ্ঠিরকে শাসন করে ভীমকে বলতে হত না—তুমি চুপ করো ভীম। এ কথা কেউ যেন জানতে না পারে। আজ থেকে কুন্তীর পুত্রেরা নিজেরাই নিজেদের রক্ষা করবেন—অদ্য প্রভৃতি কৌন্তেয়া রক্ষতান্যোন্যমাদৃতাঃ। তার মানে, দেশের রাজা এবং পাণ্ডবদের রক্ষাকর্তা হিসেবে ধৃতরাষ্ট্রের যে ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত হবার কথা ছিল, তা নস্যাৎ হয়ে গেল।

যদিও এই সমস্ত পক্ষপাতটাই এখনও পর্যন্ত ধৃতরাষ্ট্রের অবচেতনে ছিল। কারণ দুর্যোধন যে কাণ্ডটি করেছেন, সেটা তাঁর কর্ণগোচর হয়নি। ধৃতরাষ্ট্র আপাতত বরং কৌরব-পাণ্ডবদের ভবিষ্যৎ নিয়ে একটু চিন্তিত হয়ে আছেন। ছেলেরা দিনরাত খেলে বেড়াচ্ছে দেখে তাঁর ভাল লাগছে না মোটেই—কুমারান্ ক্রীড়মানাংস্তান্ দৃষ্ট্বা রাজাতিদুর্মদান্। তিনি তাঁদের উপযুক্ত শিক্ষার জন্য ভর্তি করে দিলেন গৌতম-গোত্রীয় কৃপাচার্যের অস্ত্রপাঠশালায়। তবে কৃপাচার্যের কাছে কিছুদিন শিক্ষা হবার পরেই দ্রোণাচার্য হস্তিনায় এসে উপস্থিত হওয়ায় কৌরব-পাণ্ডদের আসল শিক্ষা আরম্ভ হল তখনই।

এই সম্পূর্ণ অস্ত্রশিক্ষার সময়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কোনও ভূমিকা নেই। এই সম্পূর্ণ সময়ের মধ্যে তিনি নিজ পুত্রদের শিক্ষা নিয়ে কোনও আত্মঘাতী ব্যবহার করেননি। এমনকী দ্রোণাচার্য যখন অস্ত্রপরীক্ষার আয়োজন করলেন সেই সময়েও তাঁর এই সমদর্শিতা ছিল যে, কৌরব এবং পাণ্ডবরা নিজেদের শক্তিবুদ্ধি অনুযায়ী যথাসম্ভব অস্ত্রশিক্ষা লাভ করুক। অস্ত্রপরীক্ষার দিনে তাঁর দুঃখ ছিল অফুরান। দ্রোণাচার্যের কাছে তিনি আপন দুর্ভাগ্যের কথা ব্যক্ত করে বলেছেন—যারা চোখে দেখতে পায়, তারা আজকে এই কুরুবাড়ির কুমারদের অস্ত্রশিক্ষার সমস্ত কৌশল দেখতে পাবে। আমি অন্ধ বটে, কিন্তু আজকে আমার দৃষ্টি ফিরে পেতে ইচ্ছে করছে, আচার্য—স্পৃহয়াম্যদ্য নির্বোদাৎ পুরুষাণাং সচক্ষুষাম্।

কুমারদের অস্ত্রপরীক্ষার সময় ভীম এবং দুর্যোধনের মতো প্রিয় পুত্রের তুল্যবল গদাযুদ্ধের বিবরণ তিনি শ্রবণ করেছেন, কিন্তু তবু পক্ষপাতের দৃষ্টিতে কোনও মন্তব্য করেননি। এমনকী অর্জুনের অপূর্ব অস্ত্রকৌশল যখন তাঁর কাছে অনুপুঙ্খভাবে বিবৃত হচ্ছিল, তখনও ধৃতরাষ্ট্র কোনও ঈর্ষাচিহ্ন প্রকট করেননি। অস্ত্রবিদ, ধনুর্বিদ হিসেবে দ্রোণশিষ্য অর্জুনের এতটাই সুনাম হয়েছিল যে, রঙ্গস্থলে অস্ত্রকৌশল দেখাবার জন্যে তিনি উঠে দাঁড়াতেই সর্বত্র শোরগোল উঠল। ধৃতরাষ্ট্র কোন অজানা আশঙ্কায় বলে উঠেছিলেন, কী হল, বিদুর। এমন আকাশ ফাটানো চিৎকার কীসের—ভিন্দন্নিব নভস্তলং...কিমেষ সুমহাস্বনঃ? বিদুর বললেন—পাণ্ডব অর্জুন বর্ম পরে রঙ্গস্থলে এসেছেন, তাই এই শব্দ। ধৃতরাষ্ট্র ভারী খুশি হলেন যেন। বললেন—কুন্তীর গর্ভজাত এই তিনটি পাণ্ডব-অগ্নির দ্বারা আমি আজকে ধন্য। আমি এদের জন্য পরম সম্মানিত এবং সুরক্ষিত বোধ করছি।

বৈদিক যজ্ঞে পবিত্র যজ্ঞকাষ্ঠ বা অরণি মন্থন করে তিন রকমের পবিত্র অগ্নি উৎপাদন করতেন ঋষিরা। এই অগ্নি তিনটির নাম গার্হপত্য অগ্নি, দক্ষিণাগ্নি এবং আহবনীয় অগ্নি। এই তিন অগ্নির দ্বারাই সে কালের সমস্ত গৃহকর্ম এবং শ্রৌতকর্ম সম্পন্ন হত। উপনিষদ এবং বিশেষত মহাভারতে বিবাহজ পুত্রকন্যার সঙ্গে অরণিকাষ্ঠজাত অগ্নির তুলনা বার বারই আমরা দেখতে পেয়েছি এবং সব সময়েই সেটা পুত্রকন্যার মাহাত্ম্য সূচনা করেছে। ধৃতরাষ্ট্র সেই বৈদিক মাহাত্ম্য জুড়ে দিলেন তিন পাণ্ডব ভাইদের নিজস্ব মাহাত্ম্যের সঙ্গে, যদিও আমরা জানি না—এটা সম্পূর্ণই তাঁর বিশ্বাস বা শ্রদ্ধাবৃত্তির অঙ্গ কি না।

রঙ্গস্থলে অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে কর্ণের উপস্থিতি কুরুকুলের সকলকেই বিব্রত করেছিল। দুর্যোধন তাঁকে সামনে দেখামাত্রই স্বাগত জানিয়েছিলেন, কিন্তু কর্ণকে নিয়ে যত কথা হয়েছে, কৌরব-ভাই এবং পাণ্ডব-ভাইদের মধ্যে যত বাদপ্রতিবাদ হয়েছে এবং শেষাশেষি দুর্যোধন যখন কর্ণকে অঙ্গরাজ্য দান করে তাঁর মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিলেন, তখন পর্যন্ত ধৃতরাষ্ট্রের মুখ দিয়ে একটি কথাও কিন্তু শোনা যায়নি। কোনও সন্দেহ নেই—কর্ণের প্রতি কৃপাচার্য বা পাণ্ডবদের অন্যায়, অযথা আক্ষেপগুলি মোটেই যুক্তিপূর্ণ ছিল না, কিন্তু অন্যদিকে কর্ণের প্রতি দুর্যোধনের সোচ্চার সমর্থন এবং রাজ্যদান নৈতিক দিক দিয়ে যতই গৌরবজনক হোক, এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার মধ্যে কর্ণের জন্য দুর্যোধনের মর্যাদাবোধ যত

না ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল পাণ্ডবদের প্রতি বিরুদ্ধতা। আর ঠিক এই জায়গাটাতেই ধৃতরাষ্ট্রের নিশ্চল নিশ্চুপ ব্যবহার আমাদের মনে সংশয়ের সৃষ্টি করে। ছোট ভাইয়ের পুত্রগুলির জন্য তাঁর হৃদয়ে যদি কোনও মায়া বা মমত্ববোধ থাকত, তা হলে জ্ঞাতিভাইদের মধ্যে কর্ণকে নিয়ে যে উদগ্র বিরুদ্ধতার সৃষ্টি হল, সেটা তিনি সানন্দ নৈঃশব্দে মেনে নিতেন না।

কর্ণ অর্জুনকে যথেষ্ট অপমান করতে পেরেছেন বলেই দুর্যোধন কর্ণের মর্যাদা রক্ষায় ব্যস্ত হয়েছেন। অর্থাৎ পাণ্ডব-বিরোধিতা থেকেই তাঁর কর্ণের প্রতি ভালবাসা জন্মেছে। কিন্তু সেই ভালবাসায় এক বহিরাগত এবং অপরিচিত ব্যক্তিকে দুর্যোধন রাজ্যদান করে ফেললেন —এটা নিঃসন্দেহে বাড়াবাড়ি ছিল কি না জানি না, কিন্তু দুর্যোধনের এই স্বাধীনতায় কোনও হস্তক্ষেপ করেননি ধৃতরাষ্ট্র। মনে রাখতে হবে, তখনও পর্যন্ত পাণ্ডবরা হস্তিনাপুরের এককণা জমিও পাননি, সেই অবস্থায় কর্ণের জন্য দুর্যোধনের ওই অতুলনীয় সমব্যথা যে রাজবাড়ির অর্ন্তদ্বন্দ্বে নতুন মাত্রা যোগ করবে, সে সম্বন্ধে ধৃতরাষ্ট্রের ধারণা যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে মুখর হওয়ার চেয়ে স্বেচ্ছাকৃত নৈঃশব্দ্য বেশি পছন্দ করেছেন। হয়তো এই নৈঃশব্দ্যের মধ্যেও এক পক্ষপাতী মুখরতা আছে, যা কিছু দিন পরেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

রাজকুমারদের অস্ত্রপরীক্ষা হয়ে যাবার পর দ্রোণাচার্য গুরুদক্ষিণা চাইলেন। টাকা পয়সা নয়, ভূসম্পত্তি নয়, দ্রোণাচার্য পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে জীবিত ধরে আনতে বললেন। কৌরব ভাইরা কর্ণের সহযোগিতা নিয়েও এ কাজ করতে পারলেন না। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন ভীমের সহযোগিতায় দ্রুপদকে ধরে আনলেন দ্রোণাচার্যের কাছে। অর্জুনের বীরত্ব প্রকাশিত হল পুরোমাত্রায়। এরপর কুরুবাড়ির বৃদ্ধদের চাপেই হোক অথবা স্বেচ্ছায়ই তোক মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করলেন। যুধিষ্ঠিরের নিজস্ব গুণ এত বেশি ছিল যে, তাঁর পক্ষে মানুষের মন পাওয়াটা খুব সহজ ব্যাপার ছিল। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের যৌবরাজ্যের সুযোগ নিয়ে পাণ্ডবরা নিজেদের শক্তিমত্তা আরও একটু বাড়িয়ে নিলেন। বিশেষত অর্জুন হস্তিনাপুরের রাজ্যসীমা বাড়ানোর জন্য যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়ে বহু রাজ্য জয় করে রাশি রাশি ধন পৌঁছে দিলেন হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে। পাণ্ডু বেঁচে থাকতে যেসব রাজ্য জয় করতে পারেননি, সেগুলোও অর্জুন জয় করে আসার ফলে সমস্ত পাণ্ডব-ভাইয়েরই গুরুত্ব বেড়ে গেল হস্তিনানগরীতে—পররাষ্ট্রানি নির্জিত্য স্বরাষ্ট্রং ববৃধুঃ পুরা।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যে রাষ্ট্রের রাজা হয়ে আছেন, পাণ্ডবরা সেই রাষ্ট্রেরই সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন বলে ধৃতরাষ্ট্রের খুশি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পুর-জনপদবাসীরা যেহেতু অর্জুন-যুধিষ্ঠিরের গুণগানে মুখর হয়ে উঠছিল, এবং যেহেতু রাজবাড়ির ভিতরেই ভীষ্ম-বিদুরের মতো মানুষেরা পাণ্ডবদের সদা সর্বদা সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাই ধৃতরাষ্ট্রের মানসিক জটিলতা বৃদ্ধি পেল। পাণ্ডবদের জনপ্রিয়তা তাঁকে এতটাই আকুল করে তুলল যে, এতদিন পাণ্ডবদের প্রতি কোনও সদাচরণ না করেও যে মৌখিকতার আড়ম্বরটুকু করে যাচ্ছিলেন তিনি, সেটাও আর তিনি ধরে রাখতে পারলেন না। হঠাৎ করেই যেন পাণ্ডবদের প্রতি তাঁর চরম বিদ্বেষ জেগে উঠল মনে—দুষিতো সহসা ভাবো ধৃতরাষ্ট্রস্য পাণ্ডুষু। প্রাণপ্রিয় পুত্র দুর্যোধনকে কোনওমতেই যেহেতু জনপ্রিয়তার কোনও প্রকোষ্ঠেই স্থাপন করা যাচ্ছে না—এই দুর্বিপাক তাঁকে অস্থির করে তুলল। তিনি এখন রাত্রে আর ঘুমোতে পারেন না ভাল করে। রাজবাড়িতে কেউ বুঝবে না, পৌর-জনপদবাসীরা আন্দাজ করতে পারবে না, অথচ নিশ্চুপে পাণ্ডবদের মাহাত্ম্য খাটো করে দেওয়া যাবে—এই কৌশল ভাবতে ভাবতে এখন তাঁর সুপ্তিহীন রাত্রি প্রভাত হয়ে যায় —স চিন্তাপরমো রাজা ন নিদ্রামলভন্নিশি।

ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রিসভায় অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞ এক মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর নাম কণিক। পণ্ডিতেরা কেউ কেউ তাঁকে কণিক-ভরদ্বাজ বলেও ডাকেন। ধৃতরাষ্ট্র এই মন্ত্রিপ্রবরকে

ডেকে পাঠালেন নিজের বাড়িতে। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের সঙ্গে আলোচনা করতে পারতেন, ভীষ্মের সঙ্গে আলোচনা করতে পারতেন—এঁরাও কেউ কম রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না—কিন্তু কণিক ছিলেন নিরপেক্ষ রাজনীতিবিদ। রাজনীতির 'থিয়োরি' তাঁর খুব ভাল জানা আছে, রাজা যাকে পছন্দ করছেন না—সে বন্ধু হোক, শত্রু হোক—কীভাবে তাকে শায়েস্তা করতে হবে—সেটা তিনি খুব সুন্দর বাতলে দিতে পারেন। ধৃতরাষ্ট্র বুঝেছিলেন—এঁকে তিনি মনের ব্যথা জানিয়ে ব্যথার ওষুধ চাইতে পারবেন, ভীষ্ম-বিদুরের কাছে তিনি তা পারবেন না, অতএব নিজের জটিল বুদ্ধি সম্পূর্ণ সমর্থিত হবে বুঝেই তিনি কূটবুদ্ধি ভরদ্বাজ কণিককে ডেকে পাঠালেন আপন প্রকোষ্ঠে—তত আহূয় মন্ত্রজ্ঞং রাজশাস্ত্রার্থবিত্তমম্।

চিকিৎসকের কাছে যেমন রোগের কথা খুলে বলতে হয়, তেমনই কণিকের কাছেও ধৃতরাষ্ট্র প্রাণ খুলে বললেন—পাণ্ডবদের বাড়-বাড়ন্ত তো খুব হল। তাদের কীর্তিকাহিনী তো সবার মুখে মুখে। এদের অবস্থা দেখে আমি আর সহ্য করতে পারছি না, ঈর্ষায় আমার গা জ্বলে যাচ্ছে—উৎসিক্তাঃ পাণ্ডবা নিত্যং তেভ্যো'সূয়ে দ্বিজোত্তম। এদের সঙ্গে মানিয়ে গুনিয়ে থাকব, নাকি ঝগড়াবিবাদ করব—এ বিষয়ে কিছু ভাবতেই হবে। কণিক! তুমি বরং বলো, তোমার শাস্ত্র এবং বুদ্ধি কী বলে, আমি তোমার কথা শুনব—করিষ্যে বচনং তব।

ধৃতরাষ্ট্রের আগ্রহ দেখে কণিক যত উপদেশ করেছিলেন, পরবর্তী সময়ে তা কণিকনীতি নামে বিখ্যাত হয়েছে। কণিকনীতির প্রধান বিশেষত্ব এই যে, দরকার হলে রাজা তাঁর আপন সমৃদ্ধির জন্য যে কোনও অসুদপায়ও অবলম্বন করতে পারেন। কণিক ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন—যে পর্যন্ত সুযোগ না আসে, দরকার হলে ততদিন শত্রুকে ঘাড়ে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে—বহেদমিত্রং স্কন্ধেন। কিন্তু সুযোগ এলে পাথরের ওপর আছাড় মেরে যেমন কলসি ভাঙে, তেমনি করে শত্রুর মাথা ফাটিয়ে দেবে—ভিন্দ্যাদ্ ঘটম্ ইবাশ্মনি। কণিকের কথা ধৃতরাষ্ট্রের বেশ পছন্দ হল। তিনি আরও জিজ্ঞাসা করলেন, যে, ঠান্ডা মাথায় কী করে শত্রু শাসন করা যায়। এর উত্তরে কণিক এমন সব কূটবুদ্ধির গল্প শোনালেন, যা অন্য কেউ হলে দ্বিতীয়বার অন্তত ভাবতেন। কণিক বলেছিলেন—'তোমার কোনও ক্ষতি করব না।' এইরকম প্রতিজ্ঞা করেই হোক, সাময়িকভাবে কিছু দান করেই হোক, অথবা দরকারে বিষ খাইয়েই হোক, সুকৌশলে শত্রুকে হত্যা করতে হবে। কণিকের মতে—হত্যার মতো সাংঘাতিক কাজ করতে হলে মুখে রাখতে হবে হাসি, কিন্তু মনটাকে রাখতে হবে ক্ষুরের মতো—বাচা ভৃশং বিনীতঃ স্যাদ্ হৃদয়েন তথা ক্ষুরঃ।

কণিকের শেষ কথা হল—আপনি যদি নিজের ছেলেদের চেয়ে পাণ্ডবদের বেশি বলশালী মনে করেন, তবে সেই ব্যবস্থা করুন, যাতে আপনার আর কোনও ভয় না থাকে—যথা ভয়ং ন পাণ্ডুভ্যস্তথা কুরু নরাধিপ। কণিক উপদেশ দিয়ে বাড়ি গেলেন, ধৃতরাষ্ট্রও চিন্তা করতে আরম্ভ করলেন—কীভাবে পাণ্ডবদের ঠেকানো যায়। এদিকে আরও একটি ঘটনা ঘটে গেল। হস্তিনাপুরের পুরবাসী এবং জনপদবাসীরা হাটেমাঠে, সভাসমিতিতে সর্বত্র যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা করে বেড়াচ্ছিল। নানা জায়গায় তারা এই মতও ব্যক্ত করল যে, যুধিষ্ঠিরকেই হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনে বসানো উচিত। মুশকিল হল—এই কথাগুলি দুর্যোধন দুঃশাসনদেরও কানে গেল। তাঁরা হিংসায় জ্বলতে লাগলেন, এসব কথা তাঁরা সহ্য করতে পারলেন না—ঈর্ষ্যয়া চাপি সন্তপ্তো তেষাং বাচো ন চক্ষমে।

সেদিন ধৃতরাষ্ট্র একা একাই বসেছিলেন নিজের ঘরে ব্যাকুল, চিন্তান্বিত। সেই সময়ে দুর্যোধন এসে উপস্থিত হলেন তাঁর কাছে। দুর্যোধন বললেন—পিতা! পুরবাসীরা আমাদের সম্বন্ধে যা-তা বলছে, সে সব আমি নিজের কানে শুনেছি—শ্রুতা মে জল্পতাং তাত পৌরাণামশিবা গিরঃ। তারা আপনাকে এবং পিতামহ ভীষ্মকে অগ্রাহ্য করে পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরকে রাজা বানাতে চাইছে।

দুর্যোধন দেখাতে চাইছেন যেন পিতার মর্যাদাহানিতে তিনি বিরক্ত। পিতার হৃদয়ের ক্ষত তিনি জানেন, অতএব সেই ক্ষতে ক্ষার নিক্ষেপ করে তিনি বললেন—আপনি তো জন্মান্ধ বলে নিজের প্রাপ্য রাজ্যই পাননি। এখন যদি পাণ্ডুর ছেলেই উত্তরাধিকার সূত্রে পাণ্ডুর রাজ্য পায়, তবে তারপরে তারই ছেলে আবার রাজ্য পাবে, তারপর তার ছেলে, তারপর আবার তার ছেলে—তস্য পুত্রো ধ্রুবং প্রাপ্তস্তস্য তস্যাপি চাপরঃ। এইভাবে যদি চলতে থাকে তা হলে এই রাজবংশে জন্মেও আমরা চিরকাল রাজ্য থেকে বঞ্চিত থাকব, আমাদের ছেলেপিলেরাও কোনওদিন আর রাজ্যসুখ পাবে না—তে বয়ং রাজবংশেন হীনাঃ সহ সুতৈরপি।

দুর্যোধন খুব করুণ ভাষায় নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনকে আরও করুণ করে তুলে বললেন—চিরকাল লোকে আমাদের অবজ্ঞা করবে, উপেক্ষা করবে। অতএব মহারাজ! যাতে আমাদের পরের ভাত খেয়ে জীবনধারণ করতে না হয়, আপনি তার ব্যবস্থা করুন—ন ভবেম রাজন্...পরপিণ্ডোপজীবিনঃ। দুর্যোধনের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্রের পিতৃহৃদয় একেবারে মথিত হয়ে উঠল। দুর্যোধন তাঁকে বুদ্ধি দিলেন—পাণ্ডবরা যাতে আমাদের কিচ্ছুটি করতে না পারে, সে জন্য তাদের নির্বাসিত করুন বারণাবতে—তান্ বিবাসয়তাং ভবান্।

পুত্রের কথা ধৃতরাষ্ট্রের ভাল লাগল বটে, কিন্তু পৌর-জানপদগণের ইচ্ছা এবং হস্তিনাপুরের পূর্বপুষ্ট মন্ত্রী অমাত্যদের নিয়ে তাঁর ভয় ছিল। তিনি অন্ধ হলেও রাজনীতি যথেষ্ট বোঝেন। সেই রাজনৈতিক সমস্যার কথা চিন্তা করেই তিনি বললেন—পাণ্ডু রাজা হিসেবে যথেষ্ট ভাল ছিলেন। সমস্ত জ্ঞাতিবর্গকে যেমন তিনি সন্তুষ্ট রেখেছিলেন, তেমনই আমার ব্যাপারে তাঁর ন্যায় বা কর্তব্যনিষ্ঠার কথা ভাবা যায় না। রাজ্যটাও তিনি আমার হাতেই সবসময় দিয়ে রাখতেন—নিবেদয়তি নিত্যং হি মম রাজ্যং ধৃতব্রতঃ।

আমরা আগে বলেছি—ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যাকাঙক্ষা এতটাই বেশি ছিল যে, পাণ্ডু সেটা খুব ভালই বুঝতে পারতেন। সেইজন্যই পাণ্ডু তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় রাজ্যের বাইরে বাইরে থাকার চেষ্টা করেছেন। শেষের দিকে তিনি বনবাসী হয়েছেন এবং আর রাজ্যে ফিরেও আসেননি। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর এই সৌজন্যটুকু স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন, কিন্তু এও তিনি মনে মনে জানেন যে, পাণ্ডুর এই সৌজন্য, অন্ধ বড় ভাইটির জন্য তাঁর এই মমতা এবং ত্যাগ পৌর-জানপদের মনে পাণ্ডুর সম্বন্ধে আরও গভীরতর শ্রদ্ধা তৈরি করেছে। অন্যদিকে পাণ্ডু রাজা থাকাকালীনই অপরিণত বয়সে মৃত্যুবরণ করায় যুবরাজ যুধিষ্ঠিরের পালে করুণা এবং সমব্যথার হাওয়া লেগেছিল। পুর-জনপদবাসীরা যুধিষ্ঠিরের অসাধারণ গুণে যেমন মুগ্ধ ছিলেন, তেমনই পাণ্ডুর মৃত্যুজনিত সমবেদনা যুধিষ্ঠিরকে আরও প্রিয় করে তুলেছিল তাদের কাছে। রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রের অন্যতম অঙ্গ মন্ত্রী-অমাত্য, সেনাপতি এবং সৈন্যসামন্তরাও যুধিষ্ঠিরের সংস্পর্শে এসে তাঁর গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েছেন।

ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনাপুরের অন্তঃরাষ্ট্রীয় রাজনীতির এই বৈশিষ্ট্যটুকু দুর্যোধনকে বুঝিয়ে দিয়ে বললেন—এই অবস্থায় কী করে পাণ্ডুপুত্রদের জোর করে তাদের পৈতৃক রাজ্য থেকে নির্বাসিত করি—স কথং শক্যতে'স্মাভি রপাকর্তুং বলাদিতঃ। বিশেষত মন্ত্রী, অমাত্য, জনপদবাসীরা যুধিষ্ঠিরের প্রতি এই অপকারের প্রতিশোধ নেবার জন্য আমাদের যে মেরেই ফেলবে না, তারই কী কারণ আছে—কথং যুধিষ্ঠিরস্যার্থে ন নো হন্যুঃ সবান্ধবান্?

বস্তুত ধৃতরাষ্ট্রের মনের মধ্যে যুক্তিবুদ্ধি, শুভশক্তি যে একেবারেই ক্রিয়া করে না, তা মোটেই নয়। করে, খুবই করে; কিন্তু সেই যুক্তি ততক্ষণই কাজ করে যতক্ষণ তাঁর প্রিয় পুত্রটি ক্লিষ্টবোধ না করছেন। কিন্তু যে মুহূর্তে দুর্যোধন ক্লিষ্টবোধ করবেন অথবা কষ্ট পাবেন, তখনই এইসব যুক্তি তিনি দেন—এবং মনে রাখবেন—এইসব যুক্তি তিনি দুর্যোধনের

প্রতিপক্ষতার জন্য দেন না। দেন পূর্বপক্ষতার জন্য। অর্থাৎ একটা কাজ করতে গেলে, বিশেষত সেটা যদি পাণ্ডবদের অপকার-সাধনের উপায় হয়, তবে সেই কাজের অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করার জন্যই তিনি এই পূর্বপক্ষগুলি সাজিয়ে দেন, যাতে দুর্যোধন কোনও বিপদে না পড়েন। তার মানে দুর্যোধন ক্রোধের বশে মাথা গরম করে যে কাজটা করতে চান, ধৃতরাষ্ট্র তার অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করেন ঠান্ডা মাথায়।

পাণ্ডবদের বারণাবতে নির্বাসন দেবার ব্যাপারে মন্ত্রী-অমাত্য এবং পৌর-জনপদবাসীর সম্ভাব্য বিরুদ্ধতার যে প্রসঙ্গটি ধৃতরাষ্ট্র তুলেছিলেন, দুর্যোধন সেটা উড়িয়ে দিয়ে বললেন—এসব সমস্যা আছে জেনেই আমি প্রচুর টাকাপয়সা ছড়িয়ে ধনেমানে প্রজাদের তুষ্ট করে ফেলেছি—প্রকৃতয়ঃ সর্বে অর্থমানেন পূজিতাঃ। মন্ত্রীদেরও আমি হাত করে নিয়েছি, রাজকোষও এখন আমারই অধীনে—অর্থবর্গঃ সহামাত্যো মৎসংস্থো'দ্য মহীপতে। অতএব আপনি ঠান্ডা মাথায় কোমল-হাস্য মুখে পাণ্ডবদের বারণাবতে নির্বাসিত করুন। এরপর সম্পূর্ণ রাজ্যে যখন আমার প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হবে, সেইদিন পাণ্ডবরা কুন্তীর সঙ্গে এখানে ফিরে আসুক, আমার আপত্তি নেই।

ধৃতরাষ্ট্র যেই বুঝলেন—সম্ভাব্য বাধা দূর হয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের হৃদয় উন্মুক্ত করে দিয়ে বললেন—পাণ্ডবদের এখান থেকে তাড়িয়ে দিই, এটা আমারও মনের ভিতরকার ইচ্ছে। কিন্তু যেহেতু ব্যাপারটা বাইরে থেকে খুব খারাপ দেখায়, তাই বাইরে প্রকাশ করিনি—দুর্যোধন মমাপ্যেতদ্ হৃদি সম্পরিবর্ততে। ধৃতরাষ্ট্র নিজের দুষ্টবুদ্ধি একবারমাত্র প্রকাশ করেই আবার পুত্রের হিতসাধনে মন দিচ্ছেন। তিনি এবার রাজবাড়ির ভিতরকার বলাবল বিবেচনা করছেন। নির্বাসন কথাটা নিশ্চয়ই উচ্চারিত হবে না, কিন্তু হঠাৎ করে পাণ্ডবদের অন্যত্র সরিয়ে দিলে রাজবাড়ির ভিতরে কী প্রতিক্রিয়া হবে, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, কৃপ—এঁরা ব্যাপারটাকে কীভাবে দেখবেন, কে কোন পক্ষ নেবেন—সেসব কথাও প্রতিযুক্তি হিসেবে দুর্যোধনের সামনে পেশ করলেন ধৃতরাষ্ট্র। দুর্যোধন সে রাজনীতি সরল করে বুঝিয়ে দিলেন ধৃতরাষ্ট্রকে। বুঝিয়ে দিলেন—ভীষ্মের কাছে পাণ্ডব এবং কৌরব-দু'পক্ষই সমান। পাণ্ডবরা বিপন্ন হলে তিনি অন্তত কৌরবদের ক্ষতি করবেন না। অন্যদিকে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা দুর্যোধনের পক্ষে থাকায় দ্রোণ তাঁরই পক্ষে আসবেন, আর দ্রোণ যে পক্ষে থাকবেন সেই পক্ষেই থাকবেন কৃপ, কারণ তিনি দ্রোণের শ্যালক। বাকি রইলেন শুধু বিদুর। দুর্যোধন বললেন—বিদুর একা আমাদের কোনও ক্ষতিই করতে পারবেন না, অতএব আপনি নিশ্চিন্তে আজকেই পাণ্ডবদের সমাতৃক বারণাবতে নির্বাসনের ব্যবস্থা করুন—বারণাবতম্ অদ্যৈব যথা যান্তি তথা কুরু। হৃদয়ে যে আগুন জ্বলছে, সে আগুন নিভিয়ে দিন একেবারে।

দুর্যোধনের কথায় সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হলেন ধৃতরাষ্ট্র। অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও কী ঠান্ডা মাথায় কত নিপুণ কৌশলে তিনি পাণ্ডবদের বারণাবতে নির্বাসন দেবার ব্যবস্থা করেছেন, তা ভাবলে তাঁকে সর্বকালের অন্যতম কূটবুদ্ধিসম্পন্ন রাজা বলেই মানতে হয়। দুর্যোধন যেমনটি ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন, তেমনটিই করলেন। নিজে এবং ভাইয়েরা মিলে খুব করে টাকাপয়সা বিতরণ করলেন প্রজাদের মধ্যে। তারা এই অহেতুক বদান্যতায় দুর্যোধনকে ধন্য ধন্য করতে লাগল। এদিকে ধৃতরাষ্ট্র এক অদ্ভুত কৌশল করলেন। তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে যাঁরা ভাল কথা বলতে পারেন, ভাল বর্ণনা করতে পারেন, তাঁদের দু-একজনকে তিনি নিযুক্ত করলেন একটি বিশেষ কাজে। তাঁদের কাজ হল—পাণ্ডবদের কাছে বারণাবতের রম্যতা বর্ণনা করা। জায়গাটা কত সুন্দর, কত উদার অরণ্যশোভায় পরিপূর্ণ, সেখানে থাকতে কত ভাল লাগে—এগুলি তাঁরা পাণ্ডবদের সামনে খুব করে বর্ণনা করলেন—কথায়াঞ্চক্রিরে রম্যং নগরং বারণাবতম্।

একটা সুন্দর জায়গার কথা শুনলে আমাদের মন যেমন যাই যাই হয়ে ওঠে, ঠিক

তেমনই পাণ্ডবরা বারণাবতে যাবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলেন। তারমধ্যে একেকটা জায়গার প্রাকৃতিক শোভার সঙ্গে যদি আবার সেখানকার স্থানীয় উৎসব এবং পর্বের কথা শুনি, তা হলে যেমন জায়গার মাহাত্ম্য দ্বিগুণ বেড়ে যায়, এখানেও তেমনই হল। বর্ণনা-নিপুণ মন্ত্রীরা বলল—বারণাবতে ঐশ্বর্যের কোনও অভাবই নেই এমনিতে, তারমধ্যে সেখানে আবার ভগবান মহাদেবের মহোৎসব উপলক্ষে বিরাট মেলা হবে। মানুষজনে ভরে উঠবে এই রমণীয় প্রদেশ—অয়ং সমাজঃ সুমহান্ রমণীয়তমো ভুবি।

ধৃতরাষ্ট্র যেমন যেমন বলে দিয়েছিলেন, ঠিক সেইভাবেই তাঁর মন্ত্রীরা বারণাবতের শোভা এবং সরসতা বর্ণনা করল—ইত্যেবং ধৃতরাষ্ট্রস্য বচনাচ্চক্রিরে কথাঃ। ছোটবেলায় শতশৃঙ্গ পর্বতের পাহাড়ি এলাকায় মানুষ হয়েছেন পাণ্ডবরা, নতুন জায়গার কথা শুনে একবার একটু মুক্তি পাবার সাধ জাগল তাঁদের মনে। বেশ ইচ্ছে হল একবার ঘুরে আসবেন বারণাবতে—গমনে পাণ্ডুপুত্রাণাং জজ্ঞে তত্র মতি-র্নৃপ। এদিক ওদিক পাণ্ডবদের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র বুঝলেন—বারণাবতে যাবার জন্য পাণ্ডবদের বেশ ইচ্ছে হয়েছে মনে। নিজের কৌশল পরিপক্ক হয়েছে বুঝেই ধৃতরাষ্ট্র এবার পাণ্ডবদের ডেকে বললেন—এই লোকগুলো খালি খালি আমাকে বলে—বারণাবতের মতো সুন্দর জায়গা নাকি আর হয় না—মমৈতে পুরুষা নিত্যং কথয়ন্তি পুনঃ পুনঃ। আরে আমি অন্ধ মানুষ আমি গিয়েই বা কী করব, দেখব কী? তা ওরা এত ভাল বলছে, তোমাদের যদি তেমন ইচ্ছে হয় তো ঘুরে এস একবার। লোকজন যেমন দরকার নিয়ে যাও, দানধ্যান করার জন্য ধনরত্নও নিয়ে যাও যা লাগে—প্রযচ্ছধ্বং যথাকামং দেবা ইব সুবর্চসঃ। সেখানে কিছুদিন থেকে আমোদপ্রমোদ করে, তারপর না হয় ফিরে এস হস্তিনাপুরে—কঞ্চিৎ কালং বিহৃত্যৈবম্ অনুভয় পরাং সুখম্।

সমস্ত পাণ্ডব-ভাইদের উদ্দেশে এই কথাগুলি বলা হলেও সিদ্ধান্ত নেবার ভার থাকে যুধিষ্ঠিরের ওপরেই। তিনি খুব ভাল করে বুঝতে পারলেন না—ধৃতরাষ্ট্র ঠিক কী চাইছেন। যুধিষ্ঠির এটা বুঝলেন যে, তাঁদের বারণাবতে যাওয়াটা ধৃতরাষ্ট্র খুব চাইছেন, কিন্তু এই চাওয়ার মধ্যে যেন একটা ইচ্ছাকৃত জোর আছে। আর ঠিক এই জায়গাতেই তাঁর যেন কেমন সন্দেহ হল। তিনি খুব অসহায় বোধ করতে আরম্ভ করলেন, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের অতিরিক্ত সদিচ্ছা, যাকে কথ্য বাংলায় 'ভাল্‌ভালাই' বলে তাই দেখে যুধিষ্ঠির তাঁকে মুখের ওপর 'না'ও বলতে পারলেন না—আত্মনশ্চাসহায়ত্বং তথেতি প্রত্যুবাচ তম্৷

বারণাবতে যাবার আগে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, কৃপাচার্য ইত্যাদি মাননীয় ব্যক্তিদের কাছে অনুমতি চাইলেন যুধিষ্ঠির। কিন্তু বিদায় নেবার সময় তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, নিজের ইচ্ছেতে তিনি বারণাবতে যাচ্ছেন না, যাচ্ছেন ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞায়, তাঁরই ইচ্ছেকে সম্মান দেবার জন্য—সগণাস্তত্র গচ্ছামো ধৃতরাষ্ট্রস্য শাসনাৎ। যুধিষ্ঠির সবার কাছে বিদায় নিয়ে যখন মা-ভাইদের সঙ্গে করে বারণাবতের পথে পা বাড়ালেন, তখন তাঁদের পিছন পিছন প্রজারাও অনেকে চললেন বারণাবতের দিকে। আর তাঁদের সঙ্গে অনুগমন করে চললেন মহামতি বিদুর। হস্তিনাপুরের নির্ভীক ব্রাহ্মণ সমাজের অনেকেই চললেন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে।

বারণাবতের নির্বাসন-যন্ত্রণা পাণ্ডবরা লুকিয়ে রাখেননি। তাঁদের মুখেও সে যন্ত্রণার প্রকাশ ঘটেছিল। হস্তিনাপুরের ব্রাহ্মণরা এই যন্ত্রণা দেখতে পাচ্ছিলেন পাণ্ডবদের চোখেমুখে। তাঁরা কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রকে ছাড়লেন না। পাণ্ডবদের বারণাবতে পাঠানোটা যে সম্পূর্ণই ধৃতরাষ্ট্রের চাল, সে সম্বন্ধে তদানীন্তন সমাজমুখ্য ব্রাহ্মণরা মন্তব্য করতে ছাড়লেন না। তাঁরা বললেন—এই বদমাশ ধৃতরাষ্ট্রটা তার নিজের ছেলেদের সঙ্গে একরকম দৃষ্টিতে পাণ্ডবদের দেখে না—বিষমং পশ্যতে রাজা সর্বথা স সুমন্দধীঃ। এই যুধিষ্ঠিরের মধ্যে পাপ বলে কোনও জিনিস নেই। কিন্তু পাপী ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম বোঝে না। যুধিষ্ঠিরকে সে পছন্দ করে না, ভীম অর্জুনকেও না। আর মাদ্রীর ছেলেদুটিকে তো খেয়ালই করে না। পাণ্ডবরা নিজের উত্তরাধিকারেই পিতৃরাজ্যের অধিকারী, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র সেটা সহ্য করতে পারছে না—তান্ রাজ্যং পিতৃতঃ প্রাপ্তান্ ধৃতরাষ্ট্রো ন মৃষ্যতে।

ব্রাহ্মণরা অবাক হলেন—কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রের এই আচরণ সহ্য করছেন কী করে? তাঁরা দুঃখ করে বললেন—এই সেদিন এই ছেলেগুলোর বাপ মারা গেল! আর এই ছোট্ট ছোট্ট ছেলেগুলিকে ধৃতরাষ্ট্র এখনই সহ্য করতে পারছে না? যাক, ঠিক আছে। এই ছেলেদের সঙ্গে আজ আমরাও হস্তিনাপুর ছেড়ে বারণাবতে চলে যাব। যেখানে যুধিষ্ঠির থাকবে, আমরাও সেখানেই থাকব—গৃহান্ বিহায় গচ্ছামো যত্র গন্তা যুধিষ্ঠিরঃ।

বোঝা যাচ্ছে—যুধিষ্ঠির রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের মধ্যে, সমাজমুখ্য ব্রাহ্মণ এবং প্রজা-সাধারণের মধ্যে একটা সাধারণ কোপের সঞ্চার হয়েছিল। কুরুবৃদ্ধরা ধৃতরাষ্ট্রের কূটবুদ্ধি টের পাননি, আর যিনি টের পেয়েছিলেন, সেই বিদুর যুধিষ্ঠিরের কাছে ধৃতরাষ্ট্রের পরিকল্পনা ম্লেচ্ছভাষায় প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। যুধিষ্ঠির অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে হস্তিনাপুরের জনপদবাসীদের রাজধানীতে ফেরত পাঠিয়েছিলেন এবং আমরা জানি—বিদুরের বুদ্ধিতে পাণ্ডবরাও জতুগৃহের আগুন থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন।

পাণ্ডবদের এই মুক্তির কথা অবশ্য ধৃতরাষ্ট্রের জানা ছিল না। জতুগৃহ দগ্ধ হবার পর বারণাবতের নগরবাসীজনেরা ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশে যথেষ্ট গালাগালি দিয়েছে। এমন কথাও বলেছে যে, ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমেই তাঁর গুণধর ছেলেটি ওই জঘন্য কাজ করেছে এবং তিনি দুর্যোধনকে বারণও করেননি—বিদিতে ধৃতরাষ্ট্রস্য...ন হ্যেনং প্রতিষিধ্যবান্। নগরবাসীরা যখন ধৃতরাষ্ট্রকে পাণ্ডবদের তথাকথিত মৃত্যুসংবাদ জানাল, তখন ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে খুশি হয়েছিলেন কি না জানি না, কিন্তু বাহ্যত তিনি খুব কান্নাকাটি করেছিলেন—বিললাপ সুদঃখিতঃ। বলেছিলেন—আজকেই আসলে আমার ভাই পাণ্ডুর মৃত্যু হল। মায়ের সঙ্গে তাঁর সব ছেলেগুলি মারা গেল, পাণ্ডুর উত্তরাধিকারী হিসেবে একটি পুত্রও বেঁচে রইল না—অদ্য পাণ্ডুর্মৃতো রাজা মম ভ্রাতা মহাযশাঃ। ধৃতরাষ্ট্র সঙ্গে সঙ্গে নিজের লোকজনকে পাঠালেন বারণাবতে, যাতে মহারানি কুন্তী এবং তাঁর পুত্রদের অন্তিম সংস্কার করার ব্যাপারে কোনও অসুবিধে না হয়।

ঠিক এইসব জায়গায় ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝতে আমাদের একটু অসুবিধে হয়। যদি এই বিলাপ, এই শ্রাদ্ধক্রিয়া এবং এই অনুভূতির সবটাই লোক দেখানো মৌখিকতা হত, তা হলে ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্র ব্যাখা কঠিন হত না আমাদের পক্ষে। তা ছাড়া ভবিষ্যতে ধৃতরাষ্ট্রের আরও অনেক ব্যবহারে আমরা আবারও ধৃতরাষ্ট্রের দ্বিধাভিন্ন বিপ্রতীপ আচরণ লক্ষ করব। ছোট ভাই পাণ্ডুকে তিনি যথেষ্টই ভালবাসতেন, কিন্তু অন্ধত্ববশত তিনি নিজে রাজা হতে পারেননি—এই ভাবনাটুকুকে অতিক্রম করে নয়। পাণ্ডুপুত্রদেরও তিনি পছন্দ করতেন না, তা নয়। কিন্তু সে পছন্দটা ততক্ষণই, যতক্ষণ না সেটা নিজপুত্র দুর্যোধনের স্বার্থ অতিক্রম করছে। পাণ্ডবদের বারণবাতে নির্বাসন দেওয়া বা তাঁদের পুড়িয়ে মারাটা দুর্যোধন কোনও অন্যায়ের

মধ্যেই গণ্য করেন না, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে অন্তত এটাকে পাপ বলে মনে করতেন—অভিপ্রায়স্য পাপত্বাৎ নৈবং তু বিবৃণোম্যহম্। কিন্তু দুর্যোধনের স্বার্থ দেখে এই গুরুতর অন্যায় কাজটি তিনি করে গেলেন।

কোনও সন্দেহ নেই—দুর্যোধনের স্বার্থের বিরুদ্ধেই তো তিনি যুধিষ্ঠিরকে হস্তিনাপুরের যুবরাজ নির্বাচিত করেছিলেন। হয়তো এর পিছনে কুরুবৃদ্ধ এবং হস্তিনাপুরের পৌর-জনপদবাসীদের কিছু চাপ ছিল, কিন্তু তবু সেটা দুর্যোধনকে অতিক্রম করেই করেছিলেন। কিন্তু যে মুহূর্ত থেকে পাণ্ডবদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বেড়ে চলল, সেই মুহূর্ত থেকেই তিনি আপন পুত্রের স্নেহে ক্লিষ্ট বোধ করতে আরম্ভ করলেন। বিশেষত দুর্যোধনের মনোবেদনায় অভিভূত হয়ে পাণ্ডবদের নির্বাসনে পাঠালেন। নিজের 'অভিপ্রায়' পাপমূলক জেনেও তিনি তাঁর স্নেহান্ধ হৃদয়বৃত্তি রোধ করতে পারলেন না। অথচ বারণাবতের জতুগৃহে পাণ্ডবদের দগ্ধ হওয়ার কাহিনী শুনে এখন তিনি বিলাপ করছেন।

ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে এই দ্বৈতসত্তা সব সময় কাজ করতে থাকবে। কিন্তু বিলাপ প্রলাপের অন্তে গিয়ে আমরা ধৃতরাষ্ট্রকে বেশ শক্ত হয়েই দুর্যোধনের পিছনে দাঁড়াতে দেখছি। আসলে ধৃতরাষ্ট্র জানেন—পাণ্ডবরা জতুগৃহের আগুনে অনেকদিন আগেই দগ্ধ হয়ে গেছেন। প্রাথমিকভাবে পাণ্ডুপুত্রদের জন্য তাঁর হৃদয়ে কিছু আঘাত লাগলেও প্রিয় পুত্র দুর্যোধন একেবারে জ্ঞাতিশত্রুহীন হয়ে যাওয়ায় ধৃতরাষ্ট্র পরম আনন্দ লাভ করেছিলেন। দুর্যোধনের সিংহাসন লাভের অধিকারে আর কেউ হস্তক্ষেপ করবে না, অতএব হস্তিনাপুরের রাজ-পরম্পরা চলবে তাঁরই অনুক্রমে—এই সুখ-ভাবনা তাঁর অন্তর আপ্লুত করে রেখেছিল।

অন্ধ, স্নেহাতুর রাজা ধৃতরাষ্ট্র আন্দাজও করতে পারেননি যে, বাস্তব জগৎ কত কঠিন। এদিকে পাঞ্চাল রাজ্যে দ্রৌপদী পাঞ্চালীর স্বয়ংবরসভার খবর এসে পৌঁছেছে। দুর্যোধন ভাইদের সঙ্গে নিয়ে, বন্ধু কর্ণকে নিয়ে পাঞ্চালসভায় গেলেন—দ্রৌপদীকে পাবার আশায়। দ্রৌপদীর রূপ গুণ এবং ব্যক্তিত্বের কথা তখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। বোধ করি ধৃতরাষ্ট্রের কানেও তা এসে থাকবে। দুর্যোধনের পাঞ্চাল-প্রয়াণে তিনি নিশ্চয় মনে মনে খুশিই হয়েছিলেন। কারণ তখনও দুর্যোধনের বিয়ে হয়নি এবং পাঞ্চালীর সঙ্গে বিবাহ ঘটে গেলে সেটা যে একটা দারুণ আনন্দের ব্যাপার হবে তাঁর কাছে, সেটা আন্দাজ করা যায় ধৃতরাষ্ট্রের পরবর্তী ব্যবহার থেকে।

অনেককাল পাণ্ডবদের নামই কেউ করে না ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। তাঁদের কথা তিনি প্রায় ভুলেই ছিলেন। এরইমধ্যে হস্তিনাপুরের গুপ্তচরেরা এসে খবর দিল—যিনি সেদিন লক্ষ্য ভেদ করে দ্রৌপদীকে স্বয়ংবরে জিতেছেন তিনি অর্জুন। যিনি যুদ্ধে অসাধারণ বিক্রম প্রকাশ করেছিলেন তিনি ভীম। খবর এল—পাণ্ডবরা ব্রাহ্মণের রূপ ধরে বসেছিলেন। যাঁরা জতুগৃহের আগুনে পুড়ে গিয়েছিলেন বলে শোনা গিয়েছিল তাঁদের যেন পুনর্জন্ম হয়েছে। পাণ্ডবদের পরিচয় জানার পর অন্যান্য সকলেই যে ধৃতরাষ্ট্রের নিন্দেমন্দ করছেন, সে কথাও গুপ্তচরেরা লুকোল না। কথাটা অবশ্য ধৃতরাষ্ট্রের কানে সোজাসুজি পৌঁছোল না। কৌরব-ভাইরা গুপ্তচরদের মুখেই প্রথম এই খবর শুনলেন। তাঁদের দুঃখ-কষ্ট এবং ঈর্ষা ক্রোধের অন্ত রইল না। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রকে খবরটা দিতে এলেন বিদুর, যিনি পূর্বাহ্ণেই জানতেন যে জতুগৃহের আগুন থেকে পাণ্ডবরা রক্ষা পাবেনই।

পাণ্ডবদের বিবাহের সংবাদ অবশ্য তিনি জানতেন না। গুপ্তচরদের মুখে অর্জুনের লক্ষ্যভেদ এবং দ্রৌপদী-লাভের কথা শুনে তিনি পরম আনন্দে সে কথা জানাতে এলেন ধৃতরাষ্ট্রকে। কৌরব-পাণ্ডবদের প্রতি সমবুদ্ধিতে বিদুর কথা আরম্ভ করলেন নিতান্তই সাধারণভাবে। বললেন—কী সৌভাগ্য। কী সৌভাগ্য কুরুদের আজ বড়ই বাড়বাড়ন্ত হল—

দিষ্ট্যা কুরুবো বর্দ্ধন্তে। ধৃতরাষ্ট্র কানাঘুষোয় শুনেছিলেন যে, দ্রৌপদীর সঙ্গে হস্তিনাপুরের একটা সম্বন্ধ ঘটেছে, অতএব বিদুরের মুখে সাধারণ একটা মন্তব্য শোনামাত্রই তিনি ভাবলেন —দুর্যোধনকেই স্বয়ংবরে বরণ করেছেন পাঞ্চাল রাজনন্দিনী—মন্যতে স বৃতং পুত্রং জ্যেষ্ঠং দ্রুপদকন্যায়া।

বিদুরের কথা শোনামাত্রই ধৃতরাষ্ট্র আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে পুত্রবধূ দ্রৌপদীর জন্য প্রচুর গয়না বানানোর আদেশ দিলেন, আর বিদুরকে বললেন—সত্যিই আজ বড় সৌভাগ্য আমাদের, বড় সৌভাগ্য! ওরে কে আছিস, যা এক্ষুনি—এ কথা বলার আগেই তিনি পুত্র দুর্যোধনকেই আদেশ দিলেন—যাও এক্ষুনি, আমার পুত্রবধূ পাঞ্চালী কৃষ্ণাকে নিয়ে এসো আমার সামনে—আনীয়তাং বৈ কৃষ্ণেতি পুত্রং দুর্যোধনং তদা (আজ্ঞাপয়ামাস)।

জীবন-নাটকের চরম 'আয়রনি' ঘটিয়ে বিদুর গম্ভীর স্বরে জানালেন—দুর্যোধনকে নয়, পাঞ্চালী কৃষ্ণা পাণ্ডবদেরই বরণ করেছেন বিবাহসভায়। মহারাজ দ্রুপদ তাঁদের অনেক সম্মান করে দ্রৌপদীকে তুলে দিয়েছেন পাণ্ডবদের হাতে। পাঞ্চালদের পক্ষপাতী অন্যান্য অনেক রাজাই সেই স্বয়ংবরসভায় পাণ্ডবদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

ধৃতরাষ্ট্র অন্ধত্ববশে রাজা হননি বটে, তবে কী অসাধারণ তাঁর ক্ষমতা। বিদুরের কথা শুনে তিনি একটুও চমকিত হলেন না। এতকাল পরে পাণ্ডবদের কথা শুনে তিনি এতটুকুও আন্দোলিত হলেন না। তাঁর আকার ইঙ্গিত এবং হস্তপদের বিক্ষেপ দেখে এতটুকুও বোঝবার উপায় নেই যে, মনে মনে আবারও তাঁর ঈর্ষাবহ্নি জ্বলে উঠছে। সুনিপুণ অভিনয়ে এক মুহূর্তের মধ্যে তাঁর ব্যক্তি এবং অভিব্যক্তি দুইই পালটে গেল। মুখেচোখে নতুন অভিব্যক্তি যোগ করে ধৃতরাষ্ট্র বললেন—তাই নাকি, তাই নাকি, সে তো খুব ভাল কথা। আমার কাছে আমার নিজের ছেলেরা যেমন, তার চেয়ে পাণ্ডুর ছেলেরা অনেক বেশি—যথৈব পাণ্ডোঃ পুত্রাস্তু তথৈবাভ্যধিকা মম। অনেক বেশি কেন জান—তারা যে ভাল আছে, তারা যে ভাল আত্মীয় এবং বন্ধু পেয়েছে—সেটা জেনে আমার কত ভাল লাগছে জান? তা ছাড়া দ্রুপদ রাজাকে আত্মীয়-কুটুম্ব হিসেবে লাভ করে সকলেই সম্মানিত বোধ করবে, আমিও করছি।

বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয়বৃত্তি জানতেন, অতএব একটু অবাক ব্যঙ্গোক্তি মিশিয়ে বললেন— পাণ্ডবদের প্রতি আপনার এই বুদ্ধিই যেন চিরকাল থাকে, মহারাজ! বিদুর চলে গেলেন। কিন্তু দুর্যোধন-কর্ণরা এতক্ষণ ধৃতরাষ্ট্রের সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন। বিদুরের কাছে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের সম্বন্ধে যত প্রশংসা বর্ষণ করছিলেন, তাতে তাঁরা মোটেই খুশি হননি। অতএব বিদুর চলে যেতেই তাঁরা ধৃতরাষ্ট্রের সামনে এসে বললেন—উনি সামনে ছিলেন, তাই কিছু বলতে পারিনি, কিন্তু এখন বলছি—এ আপনার কী ব্যবহার? আপনি সত্যিই কী করতে চাইছেন বলুন তো—কিং তবেদং চিকীর্ষিতম্? আপনি এতক্ষণ ধরে আমাদের শত্রুপক্ষের প্রশংসা করে গেলেন বিদুরের কাছে। শত্রুরা যাতে আমাদের সপরিবারে গ্রাস না করে, আমাদের এখন সেই ভাবনা করা দরকার। কিন্তু কী করা উচিত, আর কী আপনি এতক্ষণ করে গেলেন—অন্যস্মিন্ নৃপ কর্তব্যে ত্বমন্যং কুরুষে'নঘ।

ধৃতরাষ্ট্র ঠান্ডা মাথায় দুর্যোধনকে বললেন—তোমরা যা করতে চাইছ, আমিও তাই করতে চাইছি। কিন্তু আমি কি সেটা বিদুরের সামনে প্রস্ফুটভাবে প্রকাশ করব নাকি? আমি যে এতক্ষণ বিদুরের সামনে পাণ্ডবদের প্রশংসা করে গেলাম, তাতে লাভ হল এই যে, বিদুর আমার অভিপ্রায় বা মনের কথা কিছুই বুঝতে পারল না। এখন তোমরা বলো, কী করতে চাও? দুর্যোধন অনেক কথা বললেন। কিন্তু তার মধ্যে কূটবুদ্ধি আর প্রবঞ্চনার কথাই বেশি। কীভাবে পাণ্ডবদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করা যায়, সে ভেদ ভাইতে ভাইতে হোক, পাণ্ডব এবং দ্রৌপদীর সম্বন্ধেই সে ভেদ হোক, অথবা দ্রুপদরাজার সঙ্গে পাণ্ডবদের যাতে ভেদ সৃষ্টি করা

যায়—এই সব কূট পরামর্শেই তাঁর মন্তব্য শেষ হল। কর্ণ দুর্যোধনের কথা মানলেন না। তিনি বললেন—যুদ্ধ। এখনই যুদ্ধযাত্রা করা উচিত পাঞ্চালদের বিরুদ্ধে, যাতে তারা আর বাড়তে না পারে। খলতা এবং তঞ্চকতায় কর্ণের কোনও বিশ্বাস নেই, যা দুর্যোধনের আছে।

ধৃতরাষ্ট্র কিন্তু কর্ণের কথাই শুনলেন এবং বললেন—রাধেয় কর্ণই ঠিক বলছে। তবে যুদ্ধের কথা ভাবলে তো আমরা এই ক'জনে মিলে সিদ্ধান্ত নিলে হবে না। সেখানে ভীষ্ম আছেন, দ্রোণ আছেন, বিদুর আছেন এবং তোমরাও আছ। সবাই মিলেই একটা কিছু ঠিক করতে হবে যাতে ভবিষ্যৎটা আমাদের পক্ষে সুখের হয়—যুবাঞ্চ কুরুতং বুদ্ধিং ভবেদ্ যা নঃ সুখোদয়া।

শুনেছি যাঁর অঙ্গহানি ঘটে, তাঁর অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেশি সক্রিয় হয়। তবে ধৃতরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চেয়ে বুদ্ধিটাই বেশি সক্রিয় হয়েছে। কী ধুরন্ধর মানুষ তিনি। পুত্র দুর্যোধন তাঁর যতই প্রিয় হোক, তাঁর কূট তঞ্চকতার মধ্যে তিনি আপাতত যেতে চাইলেন না। কারণ পাণ্ডবদের জতুগৃহে পাঠিয়ে পূর্বাহ্ণেই তিনি অনেক দুর্নাম কুড়িয়েছেন। কিন্তু সে কথা তিনি দুর্যোধনকে বললেন না। কর্ণ দুর্যোধনের প্রাণের বন্ধু। তাঁর কথায় সায় দিলে দুর্যোধন রাগ করতে পারবেন না। আবার কর্ণ যেহেতু যুদ্ধের কথা বলেছেন এবং যুদ্ধ করতে গেলে যেহেতু সকলের মত চাই, তাই সেই সুযোগে মন্ত্রীসভার অধিবেশন ডাকা যাবে। আর ধৃতরাষ্ট্র খুব ভালই জানতেন যে, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর—এঁরা কেউই এইসময়ে যুদ্ধের ব্যাপারে সায় দেবেন না। অতএব সমস্ত ব্যাপারটার ওপরেই এখন ধামাচাপা পড়ে যাবে। অন্তত এই মুহূর্তে তিনি পাণ্ডবদের সঙ্গে আর বিবাদ চাইছেন না। বারণাবতে পাণ্ডবদের নির্বাসন দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের কোনও মানসিক চাপ তৈরি হয়নি, তা মোটেই নয়। নির্বাসিত পাণ্ডবদের বিপদ যা হবার হয়ে গেলে তা একরকম ছিল। কিন্তু তাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁদের উপযুক্ত ঘরে বিয়ে হয়েছে—অন্তত এইসময়ে যুদ্ধবিগ্রহ করে ধৃতরাষ্ট্র তাঁর মনের শান্তি নষ্ট করতে চাননি। তিনি আরও বুঝেছিলেন—এইসময়ে যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে গেলে—কুরুবৃদ্ধ এবং মন্ত্রী-অমাত্যরাই শুধু নয়, তাঁর রাজ্যবাসী প্রজারাও তাঁকে ছাড়বে না।

অতএব তিনি মন্ত্রীসভার অধিবেশন ডাকলেন। ঠিক যা হবার তাই হল। ভীষ্ম দ্রোণ মোটেই যুদ্ধবিগ্রহ সমর্থন করলেন না, বরং দুর্যোধনের ওপর ধৃতরাষ্ট্রের অতি স্নেহের নিরিখে তাঁরা প্রস্তাব করলেন—যদি নিজের মঙ্গল চাও, তো কুরুরাজ্যের অর্ধেক অন্তত পাণ্ডবদের দিয়ে দাও—ক্ষেমং যদি কর্তব্যং তেষামর্ধঃ প্রদীয়তাম্। বিদুর তো ভীষ্ম-দ্রোণকে সমর্থন করলেনই, উপরন্তু পাঞ্চাল দ্রুপদের সঙ্গে পাণ্ডবদের বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও যে তাঁদের এক মিত্রবলয় তৈরি হয়েছে, সেটা বেশ বুঝিয়ে দিলেন। শেষে বললেন—পৌর জনপদবাসীরা যখন শুনবে যে, পাণ্ডবরা বেঁচে আছেন, তখন তারাও এঁদের দেখার জন্য উৎসাহিত হবে। তা ছাড়া বারণাবতের জতুগৃহে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার জন্য যেভাবে পুরোচনকে লাগানো হয়েছিল, সেই দুঃখক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার অনুগ্রহের বুদ্ধিটাই এখন ঠিক হবে। আপনি দুর্যোধনের বুদ্ধিতে চলার চেষ্টা করবেন না, তাতে রাজ্য ছারখার হয়ে যাবে।

ধৃতরাষ্ট্র সভা ডেকে একদিকে দুর্যোধন-কর্ণকে অন্যের মুখ দিয়ে নিজের বক্তব্য শুনিয়ে দেবার সুযোগ পেলেন। তাতে দুর্যোধন-কর্ণরা আপাতত স্তিমিত হলেন। অন্যদিকে ভীষ্ম দ্রোণের মত নিয়ে নিজেকে খানিকটা সমদর্শী রাজার ভূমিকায় নিয়ে এলেন। ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র রায় দিলেন—তুমি পাণ্ডবদের এবং তাঁদের জায়া জননীকে পরম সমাদরে হস্তিনাপুরে নিয়ে এসো। ভাগ্যিস তাঁরা বেঁচে আছেন, ভাগ্যিস বেঁচে আছেন তাঁদের জননী পৃথা। পুরোচনের চেষ্টা যে সফল হয়নি, এও আমার ভাগ্য। দ্রুপদের সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধ ঘটেছে, কৃষ্ণা পাঞ্চালীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তাঁদের—এ আমার পরম সৌভাগ্য।

আমার সমস্ত দুঃখ থেকে আজ আমি মুক্ত হয়েছি। যাও সবাইকে নিয়ে এসো, বিদুর! পরম আদরে হস্তিনাপুরে নিয়ে এসো—ক্ষত্তরানয় গচ্ছৈতান্ সহ মাত্রা সুসৎকৃতান্।

বিদুর পাঞ্চালে গিয়ে পাণ্ডবদের নিয়ে এলেন হস্তিনানগরে। সঙ্গে দ্রৌপদী এবং জননী কুন্তী। রাজপুরীর বাইরে থেকে তাঁদের সাভিনন্দন নগরপ্রবেশ করানোর জন্য ধৃতরাষ্ট্র চারটি মানুষকে পাঠালেন—দ্রোণাচার্য কৃপাচার্যের মতো দুই গুরুকে, আর কৌরবকুলের বিকর্ণ এবং চিত্রসেনকে। প্রজাদের প্রবল উচ্ছ্বাসের মধ্যে যুধিষ্ঠির সপরিবারে নগরে প্রবেশ করে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করলেন। তারপরেই ধৃতরাষ্ট্রের ডাক পেয়ে ভাইদের নিয়ে তিনি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এলেন।

যদি দুর্যোধনের স্বার্থরক্ষার নিরিখে কথাটা ভাবা যায়, তা হলে এই মুহূর্তে অসাধারণ কূটনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দিলেন ধৃতরাষ্ট্র। ভীষ্ম-দ্রোণের মতো বৃদ্ধ হিতৈষীরা ধৃতরাষ্ট্রকে রাজ্য ভাগ করে দিতে বলেছিলেন; সেই অনুজ্ঞা মেনে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের একটি জায়গা দিলেন রাজত্ব করার জন্য। জায়গার নাম খাণ্ডবপ্রস্থ। জায়গাটা ঘন জঙ্গলে ভরা, কোনও ভদ্র মানুষ থাকে না সেখানে। শস্য ভাল হয় না। একেবারে পাথুরে বনাঞ্চল। এমন জায়গায় রাজত্ব করে ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি ঘটানো অত্যন্ত কঠিন বলেই ধৃতরাষ্ট্র এই জায়গাটাই ঠিক করলেন পাণ্ডবদের বসবাস এবং রাজত্বের জন্য। এতে ভীষ্ম-দ্রোণ-বিদুররা মনে মনে যত ক্ষুব্ধই হোন না কেন, মুখে তাঁদের কিছু বলার মতো থাকবে না। কারণ ধৃতরাষ্ট্র তো একটি রাজ্যের রাজত্ব করার সুযোগ দিচ্ছেনই পাণ্ডবদের।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন যুধিষ্ঠিরকে। বললেন—ভাইদের সঙ্গে আমার কথা শোনো, যুধিষ্ঠির! তোমরা সবাই খাণ্ডবপ্রস্থে যাও এবং রাজত্ব করো সেখানে। সেখানে তোমাদের কেউ বিরক্ত করবে না, আর তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন তোমাদের সকলকে সুরক্ষিত রাখবে। খাণ্ডবপ্রস্থের রাজত্ব স্বীকার করলে তোমাদের সঙ্গে আমাদের আর কখনও কোনও বিবাদ বিসংবাদ হওয়ার সুযোগ থাকবে না—পুনর্নো বিগ্রহো মাভূৎ খাণ্ডবপ্রস্থমাবিশ।

ভীষ্ম কিংবা বিদুর যেমন স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে, তাঁদের অর্ধরাজ্য দেবার প্রস্তাব ধৃতরাষ্ট্র এইভাবে কার্যে পরিণত করবেন, তেমনই ধৃতরাষ্ট্রও কল্পনা করতে পারেননি যে, আপন উদ্যমে পাণ্ডবদের মতো মানুষেরাই খাণ্ডবপ্রস্থের বিপরীত পরিবেশকে স্বর্গে পরিণত করতে পারেন। ধৃতরাষ্ট্র নিশ্চয়ই খুব ভালবেসে পাণ্ডবদের রাজত্ব করার জন্য জমি দেননি। কিন্তু পাণ্ডবরা যখন কৃষ্ণ এবং ময়দানবের সাহায্যে খাণ্ডবপ্রস্থে ইন্দ্রপ্রস্থ তৈরি করলেন, তখন সেই রাজধানীই তাঁদের কাল হয়ে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে অবশ্য পাণ্ডবদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে গেল। তখনকার দিনের একছত্র সম্রাট বলে পরিচিত জরাসন্ধ ভীমের হাতে মারা গেলেন। এদিকে রাজসূয় যজ্ঞ করে যুধিষ্ঠির তখনকার রাজ-সমাজের চূড়ায় অধিষ্ঠিত হলেন। পাণ্ডব ভাইদের দিগবিজয়ের মাধ্যমে যেমন সামন্ত রাজারা আনত হলেন, তেমনই রাজকর এবং উপঢৌকনের মাধ্যমে যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি ঘটল বহু গুণ।

রাজসূয় যজ্ঞের আনুষ্ঠানিক পর্বে যুধিষ্ঠির নকুলকে পাঠালেন হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে নিমন্ত্রণ করার জন্য। নকুল গিয়ে ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র সবাইকে নিমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু কুরুবাড়ির সকলেই এক উদ্দেশ্য নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে এলেন না। এঁদের মধ্যে ভীষ্ম যদি আর-এক ঘরের নাতিদের বাড়বাড়ন্ত দেখতে এসে থাকেন, তবে ধৃতরাষ্ট্র এসেছিলেন যুধিষ্ঠিরের ক্ষমতা-ঐশ্বর্য পরিমাপ করার জন্য। দুর্যোধন শকুনিরা এসেছিলেন ঈর্ষায়, বিদুর এসেছিলেন অসীম মমত্ববোধে। আরও অনেকেই এসেছিলেন, কিন্তু তাঁদের মন বোঝার দরকার নেই আমাদের। হস্তিনাপুরের রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের যতটুকু অনুভব করে গেলেন, সেই অংশটুকুই আমাদের প্রয়োজন।

বস্তুত ধৃতরাষ্ট্র যা অনুভব করে গেলেন, সে কথা খুব বড় করে বলেননি মহাভারতের কবি। কিন্তু দুর্যোধন যা অনুভব করে গেলেন, তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা আছে মহাভারতে এবং তা আছে পিতাপুত্রের কথোপকথনে। ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে ফিরে এসে দুর্যোধন ঈর্ষা অসূয়া আর পরশ্রীকাতরতায় জ্বলতে লাগলেন সব সময়। অবস্থা দেখে শকুনিমামা একদিন ধৃতরাষ্ট্রকে বলেই ফেললেন—ভাগনে দুর্যোধনের দুঃখের কথা। শকুনি বললেন—আপনার বড় ছেলেটির দিকে একটু খেয়াল করেন না, মহারাজ! তার দুঃখটা কোথায়—একবারও ভেবে দেখেছেন—জ্যেষ্ঠপুত্রস্য হৃচ্ছোকং কিমর্থং নাববুধ্যসে? কী রোগা আর শুকনো হয়ে গেছে চেহারাটা—বিবর্ণো হরিণঃ কৃশঃ। ধৃতরাষ্ট্র, অন্ধ স্নেহে আত্মহারা হয়ে দুর্যোধনকে ডেকে বললেন—কী হয়েছে, বাছা আমার! এত দুঃখের কারণ কী? এই যে শকুনি বলে গেল—তোমার চেহারা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। গায়ের রং হয়ে যাচ্ছে কালো—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না বাবা! হঠাৎ করে এত শোকের কী কারণ ঘটল—তা তো কিছুই আন্দাজ করতে পারছি না—চিন্তয়ংশ্চ ন পশ্যামি শোকস্য তব সম্ভবম্।

জীবনে এটা প্রথমবার নয় অবশ্য। ধৃতরাষ্ট্র যে একজন যুক্তিবাদী মানুষের মতো কথা বলছেন, তা এই প্রথম নয়। তাঁর মধ্যে এখন সেই শুভসত্তা কাজ করছে। তিনি নিশ্চয় ভেবেছিলেন যে, শত হোক, পাণ্ডবদের পৃথক রাজ্য দেওয়া হয়েছে এক অতি নিকৃষ্ট জায়গায়, দুর্যোধন হস্তিনাপুরে বাপ ঠাকুরদার সাজানো রাজ্য পাবেন, অতএব তাঁর ঈর্ষা থাকার কারণ নেই কোনও। কিন্তু তবু কেন এই ঈর্ষা, তা তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। দুর্যোধনকে বলেও ফেললেন সে কথা। বললেন—রাজঐশ্বর্য! সেও তো তোমার কিছু কম নেই বাবা। তোমার ভাইরা—সে তোমার নিজের ভাইই হোক অথবা পাণ্ডবরা—কেউ তো তোমার কোনও ক্ষতি করছে না। তা ছাড়া খাচ্ছ ভাল, পরছ ভাল—আচ্ছাদয়সি প্রাবারান্ অশ্নাসি পিশিতৌদনম্—তাও, আশ্চর্য কথা, তুমি নাকি রোগা হয়ে যাচ্ছ? ধৃতরাষ্ট্র আরও বললেন—ভাল বাড়ি, ভাল গাড়ি—অজানেয়া বহন্তশ্বাঃ—সে সব তো কিছুর অভাব নেই তোমার। এমনকী মহার্ঘ শয্যায় স্ত্রীলোকের রতিকল্প, সেও তোমার করায়ত্ত—শয়নানি মহার্হানি যোষিতশ্চ মনোরমাঃ। অতএব তোমার আবার দুঃখ কীসের? তোমার এই দুঃখ শুধু দুঃখ নয় মোটেই, এ হল মৌখিক দুঃখবিলাস—বাচি বদ্ধং ন সংশয়?

ধৃতরাষ্ট্রের এই কথার উত্তরেই দুর্যোধনের ভাষা কবিতায় রূপান্তরিত হতে পারে—সুখ চাহি নাই মহারাজ। দুর্যোধন বললেন—ভাল খাবার আর ভাল পরিধানেই যারা খুশি, তাদের মতো সাধারণ পুরুষ কি আমি—অশ্নাম্যাচ্ছাদয়ে চাহং যথা কুপুরুষ স্তথা। হৃদয়ে চিরকালের এক রাগ পুষে রেখে আমি কাল কাটাতে চাই। আমার কোনও সন্তুষ্টি নেই জীবনে, কারণ সন্তুষ্টিই তো সবসময় সমৃদ্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, সন্তুষ্টি বড় হওয়ার অহংকার নষ্ট করে দেয়। দুর্যোধন এবার সোজাসুজি ধৃতরাষ্ট্রের যুক্তিতে এসে বললেন—আপনি আমার মহার্ঘ ভোজন পরিধানের কথা বললেন তো? তার উত্তরে বলি—যুধিষ্ঠিরের সমৃদ্ধি দেখবার পর থেকে আমার ভাত হজম হয় না—ন মাং প্রীণাতি মদ্ভুক্তং শ্রিয়ং দৃষ্টা যুধিষ্ঠিরে। যুধিষ্ঠিরের ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্যের চোখ ধাঁধানো রঙই আমাকে একেবারে বিবর্ণ করে দিয়েছে।

দুর্যোধন পিতার কাছে পাণ্ডবদের ঋদ্ধি এবং প্রতাপের বর্ণনা দিলেন যথাসম্ভব। কথার মাঝখানে শকুনি তাঁর সেই ভয়ংকর প্রস্তাব করলেন। পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে তিনি পাশায় হারিয়ে দিতে চান। দুর্যোধন তাঁকে অনুমোদন করে ধৃতরাষ্ট্রের মত চাইলেন পাশাখেলার ব্যাপারে। ধৃতরাষ্ট্র সঙ্গে সঙ্গে মত দিতে পারলেন না। তাঁর ভিতরে এখন শুভসত্তা এবং অশুভসত্তার দ্বন্দ্ব চলছে। ধৃতরাষ্ট্র বললেন—মহামতি বিদুরকে একবার জিজ্ঞাসা করতেই হবে, দুর্যোধন। তিনি আমাদের মন্ত্রী তথা প্রাজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি নিরপেক্ষভাবে তাঁর মত জানাবেন এবং তাতে পাণ্ডব-কৌরব উভয়পক্ষের ভবিষ্যৎই ভাল হবে।

দুর্যোধন বললেন—আপনি বিদুরকে জিজ্ঞাসা করবেন? তা হলেই হয়েছে। তিনি জীবনেও এ ব্যাপারে মত দেবেন না। আর মত না দিলে আপনিও যদি সেইসঙ্গে পিছিয়ে আসেন, তবে মৃত্যু ছাড়া আর কোনও গতি থাকবে না আমার। আমি মরলে তখন বিদুরকে নিয়ে রাজ্যসুখ ভোগ করুন আপনি। আমার কী প্রয়োজন আছে বেঁচে থেকে—স ত্বং ময়ি মৃতে রাজন্ বিদুরেণ সুখী ভব।

বীরমানী দুর্যোধনের মুখে এমন আর্ত কণ্ঠস্বর শুনে ধৃতরাষ্ট্রের অন্তরশায়ী মায়াধার উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তিনি প্রথমত একটু সরল করেই ব্যাপারটা ভাবলেন। ভাবলেন—যুধিষ্ঠিরের নবনির্মিত অসাধারণ রাজসভাটির নির্মাণ-নৈপুণ্য দেখেই বোধহয় দুর্যোধনের মাথাটা খারাপ হয়েছে। তিনি হস্তিনাপুরের সভাটাকে নতুন স্থাপত্যরীতিতে গড়ে তোলার আদেশ দিলেন—মনোরমাং দর্শনীয়াম্ আশু কুর্বন্তু শিল্পিনঃ। কিন্তু এসব কাজে যে দুর্যোধন শান্ত হবেন না, সেটা ধৃতরাষ্ট্র জানতেন। এদিকে পাশাখেলার মাধ্যমে নিরীহ পাণ্ডবদের রাজ্য জিতে নেওয়ার ব্যাপারটাও ধৃতরাষ্ট্রের ভাল লাগছিল না। পণ ফেলে পাশার বাজি জেতার মধ্যে যে ভয়ংকর এক অভিশাপ আছে, তা তিনি জানতেন। দুর্যোধন সেই সর্বনেশে ব্যাপারে তাঁকে রাজি করাতে চাইছেন—এটা বুঝেও প্রিয় পুত্রকে তিনি সরাসরি ‘না’ বললেন না। রাজবাড়ির ভিতরে মন্ত্রী অমাত্য এবং কুরুবৃদ্ধদের মধ্যে এর কী প্রতিক্রিয়া হবে, সেটাও তিনি বুঝে নিতে চান বিদুরের সঙ্গে কথা বলে। অতএব পাশাখেলার কুফলের জন্য নয়, দুর্যোধনের প্রতি মায়াবশতই তিনি পাশাখেলার ব্যাপারে মাথা ঘামাতে আরম্ভ করলেন—দ্যূতে দোষাশ্চ জানন্ স পুত্রস্নেহাদ্ অকৃষ্যত।

বিদুর এলেন এবং সোচ্চারে জানালেন যে, কলহ সৃষ্টির এই প্রকৃষ্টতম আদর্শে তাঁর কোনও শ্রদ্ধা নেই। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের মায়ায় বিদুরকে বোঝালেন—আরে না না, ঝগড়া হবে কেন? ছেলেতে ছেলেতে এ ঝগড়া সম্ভব নাকি? তা ছাড়া ভীষ্ম, দ্রোণ, আমি, তুমি—সবাই তো রয়েছি। আমরা থাকতে কোনও অন্যায়ই আমরা হতে দেব না। তবে হ্যাঁ, একটা ব্যাপার সত্যি যে, তোমাকেই গিয়ে ডেকে আনতে হবে যুধিষ্ঠিরকে এবং ভাল হোক মন্দ হোক, মঙ্গল কিংবা অমঙ্গল—পাশা খেলানোর ব্যবস্থা একটা করতেই হবে। তুমি গিয়ে বলবে—এই পাশাখেলা হবে বন্ধুর মতো, অর্থাৎ জয়-পরাজয়ে কোনও সুখদুঃখের বালাই নেই এতে—কিন্তু খেলাটা হবেই—প্রবর্ততাং সুহৃদ্দ্যূতং দিষ্টমেতন্ন সংশয়।

বিদুরকে ঝোঁকের মাথায় একটা আদেশ দিয়ে দিলেও ধৃতরাষ্ট্র বুঝতে পারছিলেন যে, ঘটনাটা ভয়ংকর হতে চলেছে। দুর্যোধনকে তিনি একান্তে ডেকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলেন। বিদুরের উপদেশ স্মরণ করিয়ে দিয়ে ধৃতরাষ্ট্র জানালেন যে, বিদুরের মতো হিতবক্তা প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দ্বিতীয় নেই। তিনি দুর্যোধনের হিতের কথাই বলেছেন। ধৃতরাষ্ট্র জোর দিয়ে বললেন—পাশাখেলা মানেই ভাইতে ভাইতে বিরোধ সৃষ্টি হবে আর বিরোধ মানেই রাজ্যনাশ। অতএব এই কাজ করতে যেয়ো না—ভেদে বিনাশো রাজ্যস্য তৎ পুত্রং পরিবর্জয়। তা ছাড়া তুমি তো বাছা পিতৃপিতামহের রাজ্য পেয়েইছ। সেখানে শয়ন ভোজন আচ্ছাদন যা তুমি পাচ্ছ, তা তো কেউ কেড়ে নিচ্ছে না তোমার কাছ থেকে—পৃথগ্‌জনৈরলভ্যং তৎ ভোজনাচ্ছাদনং পরম্। সেখানে তোমাদের সকলের বড় ভাই তার নিজের রাজ্যে রাজা হয়েছে—সেটাকে তুমি খারাপ ভাবে দেখছ কেন—মন্যসে কিং ন শোভনম্।

দুর্যোধন এবার তাঁর অপমানের কথা শোনালেন ধৃতরাষ্ট্রকে। ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসভায় স্ফটিক-স্বচ্ছ ভূমিতলে কীভাবে তাঁর জলভ্রম হয়েছিল এবং অস্থানে স্থানচ্যুত হওয়ায় পাণ্ডব-ভাইরা, এমনকী দ্রৌপদীও কীভাবে হেসে উঠেছিলেন, সে সব বর্ণনা দিলেন। রাজসভায় সামন্তরাজারা কে কত উপঢৌকন দিয়েছিলেন এবং সেই অতুল ধনৈশ্বর্য হাতে ধরে রাখতে

রাখতেই তিনি কত শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাও অনেক ঘটা করে শোনালেন দুর্যোধন। সম্পূর্ণ তিন-চার অধ্যায় জুড়ে দুর্যোধনের এই সন্তাপপর্ব বর্ণিত হয়েছে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। ধৃতরাষ্ট্র কিন্তু তাতেও খুব একটা বিগলিত হননি। দুর্যোধনকে তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, পাণ্ডব যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের সমান শক্তিসম্পন্ন এক রাজামাত্র তার বেশি নয়। তা ছাড়া যুধিষ্ঠির যেখানে তাঁর প্রতি লেশমাত্র বিদ্বেষ পোষণ করেন না, সেখানে তাঁকে বিদ্বেষ করা কি দুর্যোধনকে মানায়—অদ্বিষন্তং কথং দ্বিষ্যাৎ ত্বদৃশো ভরতর্ষভ।

ধৃতরাষ্ট্র আরও একটা প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের ঐশ্বর্য দেখে যদি দুর্যোধনের মনে কোনও যজ্ঞ করার বাসনা জেগে থাকে! ধৃতরাষ্ট্র বললেন—যদি বড় একটা যজ্ঞ করে কীর্তি অর্জন করতে চাও, তো ঋত্বিক ব্রাহ্মণরা কোনও যজ্ঞকর্মে দীক্ষিত করুন তোমাকে। তাতেও নানা দেশের রাজারা এসে তোমার হাতে উপহার তুলে দেবেন। কিন্তু শুধু শুধু ভাইদের প্রতি বিদ্বেষ করো না। এইভাবে পাণ্ডবদের রাজ্য ছিনিয়ে নেওয়াটা মিত্র-দ্রোহের পর্যায়ে পড়বে। পাণ্ডুপুত্রেরা তোমারই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো। তাঁদের ছেঁটে দেওয়া মানে তো নিজের হাতদুখানি কেটে ফেলার মতো। মনে রেখো—পাণ্ডবের কৌরবের এক পিতামহ—পিতামহা যে তব তে’পি তেষাম্।

এতক্ষণ দুর্যোধন তবু শুনছিলেন, এবার তিনি গালাগালি দিতে আরম্ভ করলেন ধৃতরাষ্ট্রকে। বললেন—আপনি আমাদের স্বার্থের দিকে তাকাচ্ছেন না, আমাকেই গালাগালি দিচ্ছেন—স্বার্থে কিং নাবধানং তে উতাহো দ্বেষ্টি মাং ভবান্। আরে পাণ্ডবদের যা বাড়বৃদ্ধি হয়েছে, তাতে আপনার ছেলেরা, যাঁদের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে শাসন করছেন আপনি, তারাই ভবিষ্যতে কেউ থাকবে না, সেখানে আপনি ভবিষ্যতের মঙ্গল শোনাচ্ছেন—ন সন্তীমে ধার্তারাষ্ট্রা যেষাং ত্বমনুশাসিতা। দুর্যোধন অনেক আশঙ্কার কথা শোনালেন ধৃতরাষ্ট্রকে। যেভাবে হোক শত্রুকে, অন্তত দুর্যোধন পাণ্ডবদের পরম শত্রু মনে করেন বলেই, যেভাবে হোক তাঁদের রাজ্য কেড়ে নেওয়াটাই প্রয়োজন বলে মনে করেন দুর্যোধন। মাতুল শকুনি ধৃতরাষ্ট্রের সামনেই দুর্যোধনের মহতী পরিকল্পনা সত্যে পরিণত করার উপযোগিতা প্রকট করলেন।

পুত্রস্নেহের স্বাভাবিক বৃত্তি এবং অন্ধতার বিরুদ্ধে গিয়ে ধৃতরাষ্ট্র এতক্ষণ অনেক যুক্তি দেখিয়েছেন। এইভাবে বিনা কারণে পাণ্ডবদের সঙ্গে বঞ্চনা করলে যে, ঘরেবাইরে সর্বত্র অসহায় এবং বিপন্ন হয়ে পড়বেন দুর্যোধন—এটাও ধৃতরাষ্ট্র তাঁর স্নেহ-প্রবৃত্তির মাধ্যমেই বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু আর তিনি পারছেন না। ঈর্ষা অসূয়ায় পীড়িত দুর্যোধন এমনভাবে ধৃতরাষ্ট্রকে আক্রমণ করছেন, এমনভাবেই মর্যাদাহানি করছেন, যাতে উত্তরোত্তর তাঁর শক্তি কমে আসছে, তিনি দুর্বল হয়ে পড়ছেন। পুত্রকে আর তিনি রোধ করতে পারছেন না। স্নেহবৃত্তির প্রতিরোধও আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ছে। দুর্যোধন শকুনির যৌথ পরামর্শে শেষ পর্যন্ত তিনি আকুল হয়ে বলে উঠলেন—আমার কথা যখন শুনলে না, তখন যা তোমাদের ভাল লাগে, তাই করো—যত্ তে প্রিয়ং তৎ ক্রিয়তাং নরেন্দ্র। এই পাশাখেলার সীমাহীন বিপদ সম্বন্ধে বিদুর যা বলেছিলেন, আমি তাই মনে করি। কিন্তু তোমরা যখন শুনবে না, তখন ভবিষ্যতে অনুতাপ করতে হবে এই কথা ভেবেই এগিয়ে যাও।

আমরা জানি—তবু একমাত্র ধৃতরাষ্ট্রই এই পাশাখেলার তঞ্চকতা বন্ধ করতে পারতেন। দুর্যোধনের সমস্ত দুঃখ শোক এবং ক্রোধের কারণ বুঝেও তিনি যদি এই ব্যাপারে উদাসীন থাকতেন বা পাশাখেলার অনুমতি না দিতেন, তা হলেই পাণ্ডব কৌরবের অন্তর্ভেদ অত শীঘ্র জটিল হয়ে উঠত না। কিন্তু না, দুর্যোধনকে যখন তিনি কিছুতেই মানাতে পারলেন না, তখন তিনি ভাবলেন—এটাই দৈব এবং দৈবের বিধান দুরতিক্রম্য—দৈবং মত্বা পরমং দুস্তরঞ্চ। কিন্তু মহাভারতের কবি লক্ষ করেছেন যে, এই দুস্তর দৈবকে তিনি প্রতিরোধ করতে পারতেন

কারণ দুর্যোধনের ঈর্ষা অসূয়ায় নির্মাণ করা হয়েছে এই দৈবের শরীর। কবি তাই ছোট্ট মন্তব্য করেছেন—ধৃতরাষ্ট্র এটাকে দুস্তর দৈবের বিধান মনে করে আসলে পুত্রের বাক্যেই স্থিত হলেন, অর্থাৎ পুত্র যা বলছেন, তাই মেনে নিলেন—পুত্রবাক্যে স্থিতো রাজা দৈব-সংমূঢ়চেতা। ধৃতরাষ্ট্র এবার নিজের রাশ ছেড়ে দিলেন দৈবরূপী পুত্রের হাতে।

পাশক প্রতিযোগিতার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের সভা নতুন করে গড়া হল। বড় বড় দরজা, দামি দামি আসন, আর রত্ন বৈদুর্যখচিত সভাস্তম্ভে ধৃতরাষ্ট্রের সভার চেহারা হল অভিনব। রাজ্যের ছোট বড় সমস্ত পাশাড়েকে খবর দেওয়া হল দ্যূতসভায় যোগদান করার জন্য। ধৃতরাষ্ট্র এখন আর কারও কথা শুনছেন না। শুভাশুভের সমস্ত দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হয়ে এখন তিনি তাই করে যাচ্ছেন, যা তাঁর ছেলে দুর্যোধন বলছেন—মতমাজ্ঞায় পুত্রস্য ধৃতরাষ্ট্রো নরাধিপঃ। বিদুরকে তিনি আগেই আদেশ করেছিলেন—যুধিষ্ঠিরকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু কী ভেবে বিদুর তক্ষুনি যাননি। তিনি ভীষ্মকেও কথাটা বলেছিলেন। এখন দুর্যোধনের মতে স্থিত হবার পর ধৃতরাষ্ট্রের ঘরে আবারও ডাক পড়ল বিদুরের।

বিদুর আগের মতো করেই আবারও বোঝাবার চেষ্টা করলেন অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্রকে। বার বার বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে, ওই পাশাখেলা থেকেই চিরন্তন কলহ তৈরি হবে পাণ্ডব-কৌরবের মধ্যে। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের কথা উড়িয়ে দিয়ে বললেন—দেখো বিদুর! দৈব যদি অন্যরকম না হয়, তা হলে এসব কলহটলহ নিয়ে আমি একটুও ভাবছি না—নৈবং ক্ষত্তঃ কলহস্তপ্স্যতে মাং/ন চেদ্দৈবং প্রতিলোমং ভবিষ্যৎ। আমরা সকলেই বিধাতার বিধানে দৈবের হাতে ক্রীড়নকমাত্র, স্বতন্ত্রভাবে আমি কীই বা করতে পারি? যাই হোক, এত কথার দরকার নেই, তুমি আমার আদেশ অনুসারে এখনই কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে এখানে নিয়ে এসো—ক্ষিপ্রমানয় দুর্ধর্ষং কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।

ধৃতরাষ্ট্র এখন কথায় কথায় দৈবের অজুহাত দিচ্ছেন এবং সেইজন্যই সামান্য একটু দার্শনিক কথা এখানে বলে নেওয়া দরকার। কথাটা আরম্ভ করতে হবে অন্য একটা প্রসঙ্গ দিয়েই। আমাদের মতো সাধারণ গৃহস্থের ঘরে বার বার আমি একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। দেখেছি—গৃহস্থের ঘরে কোনও বিপদ ঘটলেই—সে কঠিন অসুখবিসুখ, মৃত্যু থেকে মেয়ে পালানো পর্যন্ত—এমনি কোনও বিপদ ঘটলেই মানুষ কপাল চাপড়ে বলে—ভগবান! এই আমার কপালে ছিল! আমরা তো জ্ঞানত কোনও অন্যায় করিনি, তবে তুমি কেন আমাকে এই দুঃখ দিলে? মানুষ প্রচণ্ড সুখের মধ্যে ভগবানকে একইভাবে যে দায়ী করে, তা তো নয়, তবে দুঃখের মধ্যে অন্তত দায়ী করার জন্যই ভগবানকে মনে করে—সেটা বেশ দেখেছি।

যাই হোক, দার্শনিকভাবে যদি উপরিউক্ত কথার উত্তর দিতে হয়, তবে বলতে হবে যে, ঈশ্বর কারও পাপ পুণ্যের জন্য দায়ী নন। জন্মের মুহূর্ত থেকেই মানুষের স্বাধীনতা আছে পাপ কর্ম করার বা পুণ্য কর্ম করার। ভারতীয় দর্শন মতে—মানুষের সদসৎ কর্মের পরিণামেই তার সুখ এবং দুঃখ নিয়ন্ত্রিত হয়। অপরিণত মৃত্যু বা আপাতিক বিপদ সম্বন্ধে পূর্বজন্মকৃত পাপের কথা স্মরণ করা হয়। কিন্তু কোনওভাবেই কোনও বিপদ বা মৃত্যু বা সম্পদ বা অতি-সুখের নিয়ন্তা হিসেবে ভগবান চিহ্নিত নন। খুব সোজা কথায় এটা বলা হয়েছে ভগবদ্গীতায়—নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভো। কাজেই যিনি গাড়ি বাড়ি, সম্পদ বা আয়ু ভোগ করছেন, তিনি সেটা তাঁর ইদানীন্তন পুরুষকার অথবা প্রাক্তন পুণ্যবশেই করছেন, আবার যিনি দারিদ্র, দুঃখ বা মৃত্যুর যাতনা ভোগ করছেন, তিনিও তাঁর ইদানীন্তন আলস্য, অচেষ্টা অপচেষ্টা অথবা প্রাক্তন পাপকর্মবশেই তা ভোগ করছেন। পরম ঈশ্বর মানুষকে এই সাধু অসাধু কর্ম করার অধিকার দিয়েছেন এবং কোনও অবস্থায় তিনি এইসব কর্মের রাশ ধরে নেই। তাঁর জন্য জগৎ-সংসারে আরও অনেক বড় বড় কাজ নির্দিষ্ট আছে।

সত্যি কথা বলতে কী এখানে ব্রহ্মসূত্র থেকে শঙ্করাচার্য অনেক কিছুই আলোচনা করা যেত, কিন্তু একে জায়গা কম, তাতে আবার ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্রের অনেকখানি বাকি পড়ে আছে। অতএব সেসব বড় বড় কথায় না গিয়ে, যে প্রসঙ্গে পাপ পুণ্যের কথায় এলাম, সেটা শেষ করে নিই। দার্শনিক দিক থেকে মানুষের পাপ পুণ্যের ব্যাপারে যদি ঈশ্বরের হাত কিছুই না থাকে, তা হলে মানুষকেও তো এক স্বাধীন স্বতন্ত্র ঈশ্বরে পরিণত করা যায়। ঠিক এইখানে সার্বত্রিকভাবে ঈশ্বরের কাছে মানুষ জীবের কিছু অধীনতা আছে বলে বেদান্ত দর্শনে একটি সূত্র আছে। সেখানে শঙ্করাচার্য তাঁর টীকায় একটি শ্রুতিবাক্য উদ্ধার করেছেন, যা মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠও উচ্চারণ করেছেন ধৃতরাষ্ট্রের দৈবের অজুহাত খোঁজার প্রসঙ্গে।

শ্রুতি বলেছে—যে ভাল কাজ করে ঈশ্বর তাকে আরও উন্নততর লোকে স্থাপন করেন, আর যে খারাপ কাজ করে ঈশ্বর তাকে আরও অধমভূমিতে স্থাপন করেন। জীবের স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব আছে কি না অথবা জীবের কর্তৃত্ব ঈশ্বরের অধীন কি না এই নিয়ে বিরাট বিচার আছে বেদান্ত দর্শনে। কিন্তু নীলকণ্ঠ এখানে বলতে চাইছেন—পূবকর্মবশেই ধৃতরাষ্ট্রকে ঈশ্বর আরও খারাপ দিকে প্রযোজিত করছেন। অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র পাপ কর্ম করে করে নিজেকে পূর্বাহ্নেই অধমভূমিতে স্থাপন করেছেন, এখন দৈব বা ঈশ্বর তাঁকে আরও অধম গতি দান করছেন। অর্থাৎ ঈশ্বর এখানে প্রযোজক কর্তামাত্র, মূল কর্তৃত্ব ধৃতরাষ্ট্রেরই—পূর্বকর্মাপেক্ষ ঈশ এব সত্যসতি বা সর্গে প্রবর্তয়তীতি শ্রুতেঃ।

ধৃতরাষ্ট্রের শাসন মেনে বিদুর শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রপ্রস্থে গেলেন যুধিষ্ঠিরকে নিমন্ত্রণ করার জন্য। বিদুর অত্যন্ত অনিচ্ছুকভাবেই ইন্দ্রপ্রস্থে গেলেন—বলান্নিযুক্তো ধৃতরাষ্ট্রেণ রাজ্ঞা—এবং পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা বললেনও। যুধিষ্ঠির নিজে পাশাখেলার দোষ যথেষ্টই জানতেন এবং বিদুরের মাধ্যমে তিনি খবরও পেলেন যে, ধৃতরাষ্ট্রের সভায় কারা কারা পাশা খেলতে এসেছেন। কিন্তু সব শুনেও তিনি পাশাখেলার লোভ সংবরণ করতে পারলেন না এবং তিনিও দৈবেরই অজুহাত দিতে লাগলেন। টীকাকার নীলকণ্ঠ এ স্থলে কোনও মন্তব্য করেননি, কারণ পাশাখেলার লোভটা যুধিষ্ঠিরের অশেষ সদ্‌গুণের মধ্যে একটা মাত্র বদগুণ। তাও তিনি কারও ক্ষতি করবেন বলে পাশা খেলেন না। পাশাখেলাটা তাঁর বড় ভাল লাগে, কিন্তু খেলতেও ভাল পারেন না—দ্যূতপ্রিয়শ্চ কৌন্তেয়ো ন স জানাতি দেবিতুম্।

পৃথিবীতে এমন মানুষ অনেক পাওয়া যাবে। যে খেলতে জানে না, অথচ খেলাটা ভীষণ ভালবাসে, তার খেলার রোখ সবচেয়ে বেশি। কিন্তু এই খেলার মধ্যে দুর্যোধন-ধৃতরাষ্ট্রের দুরভিসন্ধি নেই বলেই টীকাকার নীলকণ্ঠকে এখানে শ্রুতিবাক্য উচ্চারণ করতে হয়নি। অর্থাৎ পাশাখেলার জন্য যুধিষ্ঠিরের বলা দৈবের দোহাই একেবারেই দোহাই মাত্র। তিনি প্রতিযোগিতা জিততে চান। আর তাতে খুব ভয় থাকারও কথা নয়, কারণ, ধৃতরাষ্ট্র 'সুহৃদদ্দ্যূত' বা বন্ধুভাবে খেলার জন্য যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করছেন বলে জানিয়েছেন। কিন্তু সরলপ্রাণ যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে খানিকটা চিনলেও ধৃতরাষ্ট্রকে মোটেই চেনেননি। খেলার দিন যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের সভায় প্রবেশ করে রীতিমতো ভয় পেয়েছেন। বার বার তিনি বলেছেন—এই খেলায় শঠতা করো না, শকুনি! অন্যায় করো না। কিন্তু শকুনির কথার চালে হেরে গিয়ে যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের পাতা ফাঁদে পা দিয়েছেন।

রাজসভায় প্রবেশ করলেন ধৃতরাষ্ট্র। তাঁর পিছন পিছন অন্যান্য রাজারা এবং অবশ্যই ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর, যাঁরা ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে এলেন—নাতিপ্রীতেন মনসা—অর্থাৎ অপছন্দ হলেও নিয়মরক্ষা করতে এলেন। খেলা আরম্ভ হল। পণ রাখা আরম্ভ হল। যুধিষ্ঠির একের পর এক বাজি হারতে আরম্ভ করলেন। ধন রত্ন সম্পত্তি অনেক জিতে নিলেন শকুনি। ধৃতরাষ্ট্র নিশ্চয়ই যথেষ্ট আনন্দ পাচ্ছিলেন। মহাভারতের কবি স্পষ্ট করে ধৃতরাষ্ট্রের কথা এখন বলেননি, কিন্তু দ্যূতসভার প্রক্রিয়ায় একের পর এক জয়ের খবর যখন আসছে, তখন তাঁর অন্তরাত্মা তাঁর প্রিয় পুত্রের অন্তরাত্মার সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছে। তিনি মুখে কিছু প্রকাশ করেননি বটে এবং আকার-ইঙ্গিতে প্রকাশ না করে তিনি যে বেশ ভালই অভিনয় করতে পারেন, সেটা আমরা আগেই টের পেয়েছি। কিন্তু অন্তরের এই অস্থির আনন্দের পরিমাণ কতটা, সেটা বোঝা যাবে তাঁর পরবর্তী আচরণে।

শকুনির জয়ের নেশা এবং যুধিষ্ঠিরের হারার নেশা দেখে প্রমাদ গুণলেন মহামতি বিদুর। তিনি নানা উদাহরণ দেখিয়ে পাশাখেলা বন্ধ করতে বললেন ধৃতরাষ্ট্রকে। এই পাশাখেলাই যে শেষ পর্যন্ত এক ভয়ংকর যুদ্ধে পরিণত হবে, সে সম্বন্ধেও তিনি দুই অধ্যায় জুড়ে সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! যে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের প্রজ্ঞা এবং ভবিষ্যদ্-বুদ্ধির উদাহরণ দিয়ে দুর্যোধনকে পাপকর্ম থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করছিলেন, সেই বিদুরের সাবধানবাণীতে ধৃতরাষ্ট্র কর্ণপাতও করলেন না। তাঁর কথার উত্তরও দিলেন না। উলটে বিদুরের সমস্ত সম্মান নস্যাৎ করে দিয়ে দুর্যোধন এমন ভাষায় বিদুরকে গালাগালি দিলেন, যার প্রতিবাদ করা উচিত ছিল ধৃতরাষ্ট্রের।

দুর্যোধন বিদুরকে কুরুবাড়ির অন্নধ্বংসী এক পরজীবী মার্জার বলে চিহ্নিত করলেন এবং দুর্যোধনের ওপর সর্দারি না করার পরামর্শ দিয়ে তাঁকে নিজের সম্মান নিজে রাখতে বললেন—যশো রক্ষস্ব বিদুর সম্প্রনীতং মা ব্যাপৃতঃ পরকার্যেষু ভূস্ত্বম্। দুর্যোধন বিদুরকে উপহাস করতে করতে একসময় বাড়ি ছেড়ে চলেও যেতে বলেছেন—স যত্রেচ্ছসি বিদুর তত্র গচ্ছ—কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তাঁর প্রিয় পুত্রকে বাধা দেননি। বিদুর এরপরেও ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁর প্রিয় পুত্রের দোষ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র একটি কথারও উত্তর দেননি। বিদুরকে তিনি ভদ্রতাবশেও শান্ত করার চেষ্টা করেননি, অন্যদিকে দুর্যোধনকেও তিনি শাসন করেননি। ভাবে বুঝি—শকুনির ওই বঞ্চনা এবং দুর্যোধনের ওই পৈশাচিক উল্লাস তাঁর ভাল লাগছিল।

খেলা আবারও আরম্ভ হল। শকুনি যুধিষ্ঠিরের সমস্ত ভাইদের একে একে জিতে নিলেন। যুধিষ্ঠির নিজেকেও পণ রেখে হেরে যাবার পর দ্রৌপদীর পালা এল। দ্রৌপদীকে বাজি ধরার কথা যুধিষ্ঠিরের মনে ছিল না। কিন্তু শকুনি কথার চালে শেষপর্যন্ত যুধিষ্ঠিরকে পথে নিয়ে আসেন। যুধিষ্ঠির বাজি ধরলেন দ্রৌপদীকে। সমস্ত রাজসভা হায় হায় করে উঠল ধিক্কারে। এ ধিক্কার যুধিষ্ঠিরের প্রতি, নাকি কুরুরাজ দুর্যোধনের প্রতি তা ভাল করে বোঝা না গেলেও কুলবধূর এই অপমানে ধৃতরাষ্ট্রের সভার বৃদ্ধজনেরা যখন হায় হায় করে উঠলেন, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্যের কপালে যখন ঘাম জমে উঠেছে উত্তেজনায়, বিদুর যখন অসহ্য বেদনায় কপাল টিপে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, তখন ধৃতরাষ্ট্র আর তাঁর আকার ইঙ্গিত চেপে রাখতে পারলেন না। সমস্ত অভিনয়-দক্ষতায় জলাঞ্জলি দিয়ে ধৃতরাষ্ট্র বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—জিতেছে কি, আমার পুত্র কি দ্রৌপদীকে জিতেছে—কিং জিতং কিং জিতমিতি হ্যাকারং নাভ্যরক্ষত। সভার মাঝখানে কর্ণ-দুর্যোধনেরা সাট্টহাসে চিৎকার করছেন এবং সেই হাসির রোল স্তব্ধ হবার আগেই শকুনি বললেন—জিতেছি।

এবার সেই চরম অপমানের দৃশ্য। বিদুর দুর্যোধনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন বলেই দ্রৌপদীকে বাজি জেতার পর দুর্যোধন প্রথম তাঁকে অপমান, উপহাস করে বললেন—এই যে

মশাই বিদুর! যাও এবার দ্রৌপদীকে এখানে নিয়ে এসো। আমাদের বাড়িঘর পরিষ্কার করুক। আমাদের ঝিদের সঙ্গে পরিচয় করে নিক। বিদুর দুর্যোধনকে ছেড়ে দেননি। কড়া ভাষায় তিনি দুর্যোধনের নিন্দা করেছেন এবং প্রত্যেক জায়গায়, যেখানে দুর্যোধনকে সম্বোধন করতে হয়েছে অথবা নিন্দাবাক্য রচনা করার সময় বিদুরের মুখে যখন দুর্যোধনই কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি, সেইসব সময়ে বিদুর ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্যোধনের নামও উচ্চারণ করেননি। দুর্যোধনের অপব্যবহার স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর মাধ্যমে অন্য কজনকে উদ্দেশ করার জন্য বিদুর এই মুহূর্তে অত্যন্ত সচেতনভাবে দুর্যোধনের বদলে 'ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র' শব্দটি ব্যবহার করতে লাগলেন। হয়তো ভাবলেন—স্থূলচর্ম দুর্যোধনের তো কিছুই গায়ে লাগে না, অন্তত এতে যদি ধৃতরাষ্ট্রের কিছু বোধোদয় হয়। বিদুর যখন বারে বারে বলছেন—মূঢ়ো রাজা ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রঃ—তখন ওই মূঢ়তা প্রধানত ধৃতরাষ্ট্রকে উদ্দেশ করেই বলা, আর রাজা শব্দটা এমনভাবেই প্রয়োগ করা হয়েছে, যাতে সেটা দুর্যোধনের বিশেষণ না হয়ে সোজাসুজি ধৃতরাষ্ট্রকেই বোঝাতে পারে।

কিন্তু অভিধা-ব্যঞ্জনায় যতকিছুই বোঝানো যোক ধৃতরাষ্ট্র নিশ্চুপে দুর্যোধনের বিকট সরসতাগুলি উপভোগ করতে লাগলেন। দুর্যোধন বিদুরকে গালাগালি দিলেন, ধৃতরাষ্ট্র কিছু বললেন না। সারথিজাতীয় এক প্রতিকামী রাজকুলবধূ দ্রৌপদীকে ভিতর বাড়ি থেকে আনতে গেল, ধৃতরাষ্ট্র কিছু বললেন না। দুঃশাসন দ্রৌপদীকে চুলের মুঠি ধরে উন্মুক্ত রাজসভায় নিয়ে এলেন, ধৃতরাষ্ট্র টুঁ-শব্দটি করলেন না। সভায় সকলের মধ্যে দ্রৌপদীকে নিয়ে হাসাহাসি আরম্ভ হল, দ্রৌপদী কুরুবৃদ্ধদের কাছে ন্যায়বিচার চেয়ে কত কাঁদলেন, ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয় এতটুকু বিগলিত হল না। তাঁর নিজের ছেলে বিকর্ণ পর্যন্ত দ্রৌপদীর পক্ষ হয়ে কথা বললেন, ধৃতরাষ্ট্র তাঁকেও কোনও সমর্থনের আভাস দিলেন না এবং কর্ণ যখন বিকর্ণকে থামিয়ে দিলেন তাতেও ধৃতরাষ্ট্রের কিছু হল না।

হবেই বা কী করে, কুলবধূ দ্রৌপদীর গায়ের কাপড় খুলে নিচ্ছিল তাঁরই ছেলে, সেই বস্ত্র উন্মোচনের সময়েও একজন বৃদ্ধ রাজা যখন তাঁর নিস্তব্ধ অন্ধত্বের আড়াল থেকে চুপ করে বসে সব দেখছিলেন, সেই ধৃতরাষ্ট্র কথা বলবেন কী, প্রতিবাদ করবেন কী, বারণ করবেন কী, পুত্রদের সঙ্গে তিনি মনশ্চক্ষে এই দৃশ্য উপভোগ না করলে সভার নিয়ন্তা রাজার পক্ষে চুপ করে বসে থাকা কোনওভাবেই সম্ভব ছিল না। দুর্যোধনের লোভ, ক্রোধ সবটাই প্রকট, তার মানেও বোঝা যায়, কিন্তু অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের লোভ, মোহ, বাসনা প্রত্যক্ষত বোঝা যায় না। তিনি কোনও কথা না বলে, দুর্যোধনকে কোনও বাধা না দিয়ে নিজের রুচিবিকার উপভোগ করে যাচ্ছেন।

ধৃতরাষ্ট্রের টনক নড়ল যখন ভীম দুঃশাসনের রক্ত পান করার প্রতিজ্ঞা করলেন এবং দুর্যোধনের উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করলেন। সভায় নানারকম উৎপাত দেখা দিল, শৃগাল ডাকল, শকুন উড়ে গেল—এতসব দেখে গান্ধারী-বিদুর আর্ত চিৎকার করে উঠলেন এবং সেই জন্যই যে এবার ধৃতরাষ্ট্র ক্ষমাসুন্দর অন্ধচোখে দ্রৌপদীকে বরদানে প্রবৃত্ত হলেন, তা মোটেই নয়। আমরা তা মনে করি না। আমরা পরিষ্কার মনে করি—ধৃতরাষ্ট্র আপাতত ন্যায়পথে ফিরে এলেন ভীমের কারণে, তাঁর মরণান্তক ভয়ংকর প্রতিজ্ঞার কারণে। আসলে এই ভীমকেই তিনি যা একটু ভয় পেতেন। ভবিষ্যতে যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হবে, তার আগে তিনি এই ভয় প্রকট করে বলেছেন—ভীমের দিক থেকেই আমার যত ভয়। হরিণ যেমন ক্রুদ্ধ বাঘকে ভয় পায় আমিও তেমনই ক্রুদ্ধ ভীমকে ভয় পাই—ভীমসেনাদ্ধি মে ভুয়ো ভয়ং সংজায়তে মহৎ।

কাজেই শেয়াল-শকুনের অলক্ষণ দেখে নয়, আপন দুই পুত্রের জঘন্য আচরণ এবং তারই পৃষ্ঠে ভীমের ভয়ংকর প্রতিজ্ঞায় ভীত হয়েই ধৃতরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত দ্রৌপদীকে বর-দানে

প্রবৃত্ত হলেন। দ্রৌপদী প্রথম বরে তাঁর জ্যেষ্ঠ স্বামী যুধিষ্ঠিরকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে নেন এবং দ্বিতীয় বরে ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেবকে। ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তৃতীয় বরও দিতে চেয়েছেন এবং বর দেবার সময় তাঁর দিক থেকে স্তোকবাক্যেরও কোনও অন্ত ছিল না। হয়তো এই স্তোকবাক্যও ভীম-অর্জুনের ভয়েই। কেননা, দ্রৌপদীকে রাজসভায় নিয়ে আসার পূর্বাহ্নে যাঁর কোনও লজ্জা বা অপমানবোধ কাজ করেনি, তাঁকে আপন পুত্রের হাতে হৃতবস্ত্রা হতে দেখার পর খুব তাঁকে সতীলক্ষ্মী মনে হচ্ছে, সকল পুত্রবধূদের মধ্যে তাঁকে শ্রেষ্ঠতমা মনে হচ্ছে—বধূনাং হি বিশিষ্টা মে ত্বং ধর্মপরমা সতী—ধৃতরাষ্ট্রের এই ব্যবহার যুক্তিযুক্ত নয় বলেই আরও মনে হয়—তিনি স্তোকবাক্য দিচ্ছেন।

তবে ধৃতরাষ্ট্র যখন দ্রৌপদীকে তৃতীয় বর দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, তখন সেই বরদান প্রত্যাখ্যান করার সঙ্গে সঙ্গে দ্রৌপদী এমন একটি কথা বলেছেন, যা সেই মুহূর্তে তাঁর নিজের সম্বন্ধে প্রযোজ্য তো বটেই, তেমনই ধৃতরাষ্ট্রকে শুনিয়ে দেবার পক্ষে সেটা ছিল যথেষ্ট। দ্রৌপদী বলেছিলেন—আপনি দুটি বর দিয়েছেন, ওই যথেষ্ট। লোভ মানুষের ধর্ম নষ্ট করে—লোভে ধর্মস্য নাশায়—আমার তৃতীয় বরের কোনও প্রয়োজন নেই। ধৃতরাষ্ট্র যে লোভের বশেই তাঁর ধর্ম নষ্ট করেছেন—এই উপদেশটা ধৃতরাষ্ট্রকে সব্যঙ্গে শুনতে হল পুত্রবধূর মুখে, কিন্তু তবু তাঁর চেতনা হয়নি। পাণ্ডবরা ইন্দ্রপ্রস্থে আর ফিরে যেতে পারেননি। রাস্তা থেকেই তাঁদের আবারও ফিরতে হল, আবারও দ্যূতক্রীড়ার জন্য।

অথচ প্রথমবার দ্যূতক্রীড়ার পর যুধিষ্ঠিরকে কত বড় বড় কথা, কত প্রলেপবাক্য দিয়ে ভুলিয়ে ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। তোমার মতো ধর্মপরায়ণ মানুষ হয় না। দুর্যোধনের অসৌজন্যের কথা মনে রেখে না। এই বৃদ্ধ পিতার কথা মনে রেখে—এইরকম ইনিয়েবিনিয়ে কত কথাই না যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। কিন্তু দুর্যোধনের স্বার্থ উপস্থিত হলে ধৃতরাষ্ট্র যে সমস্ত কিছু ভুলে যান, ধর্ম, সৌজন্য, এমনকী চোখের লজ্জাটুকুও যে তাঁর নষ্ট হয়ে গেছে, সেটা বোঝা যায় তাঁর পরবর্তী ব্যবহারে।

পাণ্ডবরা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই দুর্যোধন এসে ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝিয়েছেন—এটা কী করলেন মহারাজ! আমরা পাণ্ডবদের অপমান করে ক্রুদ্ধ করে ফেলেছি। বিশেষত দ্রৌপদীর অপমান তারা জীবনে ভুলবে না। এখন তাঁদের ছেড়ে দিলে তাঁদের ক্রোধবহ্নিতেই প্রজ্জ্বলিত হব আমরা। কাঁধে বিষাক্ত সাপ নিয়ে ঘোরাঘুরি করাও যা, পাণ্ডবদের ছেড়ে দেওয়াও তাই। পাশের রাজ্যে বসেই তাঁরা আমাদের ওপর ক্রোধে ফুঁসতে থাকবেন। আমরা তাই ভাবছি—আবার পাশা খেলব। এবার শর্তও একটা। বারো বছরের বনবাস আর এক বছরের অজ্ঞাতবাস।

ধৃতরাষ্ট্র সঙ্গে সঙ্গে রাজী হলেন। তাঁকে বোঝাতেও হল না বেশি। পাণ্ডবদের কাছ থেকে ভয়ের কথা দুর্যোধনের মুখে উচ্চারিত হতেই তাঁর নিজের ভয় প্রকট হয়ে উঠল—এই যুক্তিটা মোটেই গ্রাহ্য নয়। কারণ ধৃতরাষ্ট্র জানতেন—মিষ্টি কথার মাধ্যমে, সামনীতির দ্বারা পাণ্ডবদের দমিত করে রাখা তাঁর পক্ষে কিছুই নয়। অতএব ভয় নয়, তিনি রাজি হলেন তাঁর পুত্রের স্বার্থেই। কারণ দুর্যোধন বলেছিলেন—আমরা পাণ্ডবদের বনবাসে পাঠিয়ে এই রাজ্যে দৃঢ়মূল হয়ে বসব, বিপুল সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করে আরও শক্তিমান হয়ে বসব আমরা।

ধৃতরাষ্ট্র সঙ্গে সঙ্গে বললেন—পাণ্ডবরা এখনও যদি রাস্তাতেই থাকে, তবে সেই অবস্থাতেই ধরে নিয়ে এসে তাদের—তূর্ণং প্রত্যানয়স্বৈতান্ কামং বাধ্বগতানপি। আবার পাশাখেলা হবে। কুরুবাড়ির বৃদ্ধরা ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, দীর্ঘদর্শী মন্ত্রী বিদুর সকলেই ধৃতরাষ্ট্রকে আবারও যথেষ্ট বারণ করলেন। কিন্তু সবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি পাণ্ডবদের ডেকে পাঠালেন এই কারণে যে, দুষ্টমতি ছেলের কথা তিনি ফেলতে পারবেন না—অকরোৎ

পাণ্ডবাহ্বানং ধৃতরাষ্ট্রো সুতপ্রিয়ঃ। আমরা গান্ধারীকেও এই মুহূর্তে বেশ দু-কথা শোনাতে দেখছি। তিনি দুর্যোধনকে অনেক গালাগালি দিলেও মূলত দায়ী করেছেন কিন্তু প্রশ্রয়দাতা ধৃতরাষ্ট্রকে। গান্ধারী মনে করেন—দুর্যোধনকে অনেক আগেই ত্যাগ করা উচিত ছিল। তা যখন হয়নি, অন্তত এখন তাকে নির্বাসন উচিত—ত্যজ্যতাং কুলপাংসনঃ। গান্ধারী বলেছেন, দুষ্টমতি বালকদের কথায় কান দিয়ে তুমি এদের মাথায় তুলো না—মা বালানাম্ অশিষ্টানাম্ অভিমংস্থা মতিং প্রভো। এইরকম একটি পুত্রের জন্য তুমি নিজেকে মহাসাগরে নিক্ষেপ করো না। গান্ধারী দুর্যোধনকে তিরস্কার করার সময় ধৃতরাষ্ট্রকেও সমভাবে তিরস্কার করে বলেছেন—শাস্ত্রকথা বলে কখনও দুর্বুদ্ধি ব্যক্তিকে শাসন করা যায় না, তাতে উলটো ফল হয়। কিন্তু মহারাজ! একটি বৃদ্ধ যদি বালকের মতো ব্যবহার করে, সেটা কি খুব উপযুক্ত হয় —ন বৈ বৃদ্ধো বালমতি-র্ভবেদ্ রাজন্ কথঞ্চন। যা আমি চিরকাল বলেছি, অন্ধ পুত্রস্নেহে তুমি তা কখনও করনি। কিন্তু এখন তার ফল পাচ্ছ, তুমি সমস্ত বংশটাকে ছারখার করে দিলে।

তবু ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর কথা শুনলেন না। পুত্রস্নেহে অন্ধ রাজা ধ্বংসের পূর্বমুহূর্তে চরম উক্তি করলেন গান্ধারীর প্রতি—এই বংশের ধ্বংস রোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওদের যেমন ইচ্ছে করছে, তাই হবে। পাণ্ডবরা আবার পাশা খেলুক—অন্তঃ কামং কুলস্যান্তু ন শক্নোমি নিবারিতুম্। ধর্মময় যুধিষ্ঠির এবার অন্তত পাশাখেলার ভালবাসায় খেলতে আসেননি, এসেছেন ধৃতরাষ্ট্রের ইচ্ছা এবং অভিলাষকে সম্মান করার জন্য—নিয়োগাৎ স্থবিরস্য চ। জানন্নপি ক্ষয়করং নাতিক্রমিতুমুৎসহে।

স্বাভাবিক কারণেই যুধিষ্ঠির আবারও হেরে গেলেন। পাণ্ডব-ভাইরা এবং দ্রৌপদী তৈরি হলেন বনবাসে যাবার জন্য। ভীম, অর্জুন, নকুল সহদেব ভয়ংকর সব প্রতিজ্ঞা করলেন কৌরবদের ধ্বংস সাধনের জন্য। যুধিষ্ঠির কুরুবাড়ির সকলকে বিদায় জানিয়ে বনের পথে পা বাড়ালেন। নির্দোষ পাণ্ডুপুত্রদের এইভাবে বনে যেতে দেখে জননী কুন্তীর বিলাপের অন্ত রইল না। তাঁর সঙ্গে কুরুবাড়ির অনেক মেয়েই কাঁদল এবং উচ্চৈঃস্বরে দোষ দিতে লাগল কৌরব-ভাইদের। পৌর-জনপদবাসীরা ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর পুত্রদের নিন্দা করতে লাগল সর্বতোভাবে। ধৃতরাষ্ট্র বেশ চিন্তিত হলেন। পুত্রদের অন্যায় আচরণের কথা চিন্তা করে তিনি এখন আর খুশি হতে পারছেন না কিছুতেই—ধ্যায়ন্নুদ্বিগ্নহৃদয়ো ন শান্তিমধিজগ্মিবান্। পাণ্ডবরা এইভাবে বনে যাচ্ছেন দেখে তাঁর কষ্টও হল বেশ। নিজের অন্যায়ে নিজেই ক্লিষ্ট হয়ে তিনি ডেকে পাঠালেন বিদুরকে।

বিদুর এলেন অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্রের ডাক পেয়ে। ধৃতরাষ্ট্র শঙ্কান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—পাঁচ ভাই পাণ্ডবরা আর দ্রৌপদী কীভাবে বনে যাচ্ছেন। বিদুর বর্ণনা দিলেন ধৃতরাষ্ট্রকে—যুধিষ্ঠির বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢেকে, ভীম হাত উঁচিয়ে, অর্জুন রাস্তা দিয়ে বালি ছড়াতে ছড়াতে—এইরকম প্রত্যেক পাণ্ডব এবং দ্রৌপদী একেকটি বিশেষ ভঙ্গিতে একেকটি বিশেষ আচরণ করতে করতে বনে চলেছেন। এইসব আচরণের মধ্যে কৌরবকুলের ভবিষ্যদ্-ধ্বংসের ব্যঞ্জনা ছিল, বিদুর সে ব্যঞ্জনা বুঝিয়েও দিলেন ধৃতরাষ্ট্রকে। ধৃতরাষ্ট্র যথেষ্ট চিন্তিত হলেন। ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুর যখন কথা বলছিলেন, তখন ঋষি-মুনিদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন নারদ। তিনি প্রায় অভিশাপ উচ্চারণ করলেন কুরুবংশের ভবিষ্যৎ আশঙ্কায়।

ধৃতরাষ্ট্র মোটেই শান্তি পাচ্ছেন না। বাড়িতে স্ত্রীলোকের চিৎকার, বাইরে পৌর-জনপদবাসীদের আন্তরিক ক্ষোভ এবং ব্রাহ্মণ-মুনি-ঋষিদের আকস্মিক আক্ষেপ—সবকিছু বার বার ধৃতরাষ্ট্রকে চিন্তাকুল করে তুলল। একবার তিনি বিদুরকে ডেকে খানিকক্ষণ কথা বলে শান্তি পেতে চেয়েছেন, এবার তিনি ডেকে পাঠালেন সঞ্জয়কে। সঞ্জয় একজন রথচালক সূত। কিন্তু তিনি অসাধারণ পণ্ডিত। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রিসভার অন্যতম মন্ত্রীও

বটে। কিন্তু সঞ্জয় এসে ধৃতরাষ্ট্রের মন রেখে কথা বললেন না মোটেই। সঞ্জয় এসে দেখলেন—ধৃতরাষ্ট্র বসে বসে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ছেন। চিন্তায় আকুল হয়ে খানিকটা বিমূঢ়ও বোধ করছেন তিনি। সঞ্জয় এসেই তাঁকে বললেন—কী মহারাজ! পাণ্ডবদের রাজ্যভ্রষ্ট করে তাড়িয়ে দেওয়ার ফলে সমস্ত রত্নময়ী এই বসুন্ধরা এখন আপনারই করতলগত। এমন সুখে আপনি এমন ব্যাকুল হচ্ছেন কেন—প্রব্রাজ্য পাণ্ডবান্ রাজ্যাদ্রাজন্ কিমনুশোচসি? ধৃতরাষ্ট্র বললেন—ব্যাকুল হব না? পাণ্ডবরা মহাবীর এবং যথেষ্ট যুদ্ধবাজ। তাঁদের সাহায্যকারী রাজারাও কেউ কম যান না। তো তাঁদের সঙ্গে শত্রুতা তৈরি হয়েছে, অথচ ব্যাকুল হব না আমি?

সঞ্জয় বললেন—শত্রুতা সৃষ্টির এই অসাধারণ সুন্দর কাজটা তো আপনিই করেছেন, মহারাজ—তবেদং সুকৃতং রাজন মহদ্ বৈরম্ উপস্থিতম্। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর—কেউ আপনাকে কম বারণ করেননি। কিন্তু কারও কথা আপনি গ্রাহ্য করেননি। আপনার গুণধর পুত্রটি একটি প্রাতিকামীকে অন্তঃপুরে পাঠাল কুলবধূ দ্রৌপদীকে ধরে আনার জন্য। আসলে এইরকমই হয়, মহারাজ! পরমেশ্বর যাঁকে ধ্বংস করতে চান, তার মাথায় এইরকমই মন্দ বুদ্ধি জুগিয়ে দেন তিনি। যেটা ঠিক, তখন সেটাকে সে বেঠিক ভাবে, আর যেটা বেঠিক, সেটাকেই সে ভাবে ঠিক করছে—অনর্থাশ্চার্থরূপেণ অর্থাশ্চানর্থরূপিনঃ। মহারাজ! আরও একটা কথা বলি—মহাকাল বা যম কখনও লাঠি উঁচিয়ে ধ্বংসসাধন করতে আসেন না, বা কারও মাথা কেটে ফেলেন না, মহাকালের অভিশাপ নেমে আসে এইরকম বিপরীত বুদ্ধির মধ্যে, যাতে ঠিক জিনিসটাকে বেঠিক মনে হয় আর বেঠিকটাকে মনে হয় ঠিক—কালস্য বলমেতাবদ্ বিপরীতার্থদর্শনম্।

সঞ্জয় পর পর ধৃতরাষ্ট্রের অন্যায়গুলি বলে গেলেন। ধৃতরাষ্ট্র এখন দারুণ ভয় পাচ্ছেন। একবস্ত্রা রজস্বলা পাঞ্চালীকে সভায় আনতে দেখে স্বয়ং গান্ধারীও যে কুরুস্ত্রীদের সঙ্গে ভৈরব চিৎকার করে উঠেছিলেন—সে কথা এখন ধৃতরাষ্ট্রের মনে পড়ছে। মনে পড়ছে জরাসন্ধহন্তা ভীমের কথা, গাণ্ডীবধন্বা অর্জুনের কথা। নৈতিক এবং শক্তির দিক দিয়ে পাণ্ডবরা যে কৌরবদের চেয়ে ভাল জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন—কুরুভ্যো হি সদা মন্যে পাণ্ডবান্ বলবত্তবান—সে কথা সময়মতো বলেও ছিলেন বিদুর। ধৃতরাষ্ট্রের এখন সেসব কথা মনে হচ্ছে। কৃষ্ণা পাঞ্চালীকে যেভাবে সভার মধ্যে অপমান করা হয়েছে, তাতে পাণ্ডবদের মিত্রপক্ষ পাঞ্চালরা, যাদবরাও যে মোটেই ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের ছেড়ে দেবে না—সেটা ধৃতরাষ্ট্রকে খুব ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বিদুর। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তখন সেকথা শোনেননি। এখন পাণ্ডবদের দৃঢ়বদ্ধ শত্রুতার কথা স্মরণ করে ধৃতরাষ্ট্র নানা অনুশোচনায় ভুগছেন। বার বার বলছেন—আমি ছেলের স্বার্থ দেখতে গিয়ে বিদুরের ভাল কথাগুলোও শুনিনি, এখন আমি কী করি—উক্তবান্ ন গৃহীতং বৈ ময়া পুত্রহিতৈষিণা।

ধৃতরাষ্ট্রের এই কথাগুলো অনুতাপের মতো শোনাচ্ছে বটে, তবে তাঁর পরবর্তী আচরণ লক্ষ করলে বোঝা যাবে—এই অনুতাপ তাঁর হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়নি। পাণ্ডবরা বনে যাবার পর তাঁদের নির্বাসনজাত কোনও দুঃখ তাঁকে পীড়া দেয়নি। যা তিনি ভাবছেন, তা পাণ্ডবদের দিক থেকে ভাবছেন না, ভাবছেন দুর্যোধনের দিক থেকেই। ক্রুদ্ধ ভীম-অর্জুন কী বিপত্তি বাধাবেন, তাতে তাঁর পুত্রদের কত ক্ষতি হবে—সেই অনিষ্ঠাশঙ্কায় তিনি একবার সঞ্জয়কে ডেকে, একবার বিদুরকে ডেকে ভবিষ্যদ্-বিপদের পরিমাপ করতে চাইছেন। মনে আছে—একসময় দুর্যোধন পিতাকে বলেছিলেন—পৌরজানপদ অথবা মন্ত্রী-অমাত্যদের টাকাপয়সা খাইয়ে নিজের পথে নিয়ে আসবেন তিনি। কিন্তু পাণ্ডবরা বনে যাবার পর সহানুভূতির হাওয়ায় চিত্রটা একেবারে পালটে গেছে। পৌর জনপদবাসীদের নিরন্তর বিক্ষোভের মুখে পড়েই ধৃতরাষ্ট্র আবার ডেকে পাঠালেন বিদুরকে। তাঁকে বললেন—বিদুর! তোমার প্রজ্ঞা এবং ধর্মবোধ অসামান্য। পাণ্ডব এবং কৌরব—দু’ পক্ষই তোমার কাছে

সমান। তো এই অবস্থায় কী করলে সমস্ত ব্যাপারটা ঠিক হয়, সেটাই তুমি বলো—পথ্যঞ্চৈষাং মম চৈব ব্রবীহি৷ তা ছাড়া পুরবাসীরা আবার কীভাবে আমাদের অনুকূলে আসে, তারা যাতে আমাদের সমূলে উৎপাটিত না করে—সে ব্যাপারে তুমি ভাল পরামর্শ দিতে পার বলে আমার মনে হয়—পৌরাশ্চেমে কথমস্মান্ ভজেরন্। তে চাস্মান্নোদ্ধরেয়ুঃ সমূলান্ ত্বং ব্রুয়াঃ সাধু কার্যানি বেৎসি॥

বিদুর ভাবলেন বুঝি ধৃতরাষ্ট্রের সুমতি হয়েছে। তিনি বুঝি বিদুরের পথ্য-বচন শুনতে চান। বিদুর তাই নিজের বুদ্ধিমতো বললেন—মহারাজ! ধর্ম বা ন্যায় অনুসারে চললেই একমাত্র বাঁচার উপায় আছে আপনার। কিন্তু সে ধর্ম তখনই নস্যাৎ হয়ে গেছে যখন আপনার ছেলে শকুনিকে সঙ্গে নিয়ে যুধিষ্ঠিরের মতো মহান ব্যক্তিকে পাশার চালে হারিয়েছে। এখন বিপদ থেকে বাঁচতে হলে উলটো দিকে হাঁটতে হবে অর্থাৎ পাণ্ডবদের কাছ থেকে যা যা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, সেগুলো সব তাঁদের ফিরিয়ে দিন। পরের ধনে এমন করে লোভ করবেন না। যেটা সবচেয়ে বেশি করতে হবে, সেটা হল—তাঁদের সন্তুষ্টির চেষ্টা এবং শকুনিকে অপমান করবেন—এতৎ কার্যং তব সর্বপ্রধানং তেষাং তুষ্টিঃ শকুনেশ্চাবমানঃ।

বিদুর আবারও ভীম-অর্জুনের ভয় দেখালেন ধৃতরাষ্ট্রকে। তারপর বললেন—পৌর জনপদবাসীকে শান্ত করার এখন একটাই উপায় আপনার। আপনি দুর্যোধনের প্রভাব খর্ব করে যুধিষ্ঠিরকে আপন রাজ্যের আধিপত্যে স্থাপন করুন। দুর্যোধন কর্ণ শকুনি—এঁরা সব যুধিষ্ঠিরের কাছে আত্মসমর্পণ করুক। দুঃশাসন ভীম এবং দ্রৌপদীর কাছে ক্ষমা চাক উন্মুক্ত রাজসভায়—দুঃশাসনো যাচতু ভীমসেনং সভামধ্যে দ্রুপদস্যাত্মজাঞ্চ। এইভাবে যদি আপনি চলেন, তবেই আপনি যা চান, তাই সম্ভব হবে—এতৎ কৃত্বা কৃতকৃত্যো'সি রাজন্।

বিদুর ভেবেছেন—ধৃতরাষ্ট্র বুঝি সত্যিই পাণ্ডবদের কিছু ছেড়ে দিয়ে শান্তি ফিরিয়ে আনতে চান। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহে এতটাই কাতর যে বিদুরের কথা তিনি ততক্ষণই শুনবেন, যতক্ষণ তাঁর পুত্রদের স্বার্থে ব্যাঘাত না ঘটছে। বিদুর যেভাবে তাঁর ছেলেপিলেদের ক্ষমাটমা চাইতে বলেছেন, তাতে যে তাঁর পুত্রদের মানসম্মান থাকবে না, উপরন্তু ওইভাবে পড়ে-পাওয়া ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্যখণ্ডটিও যে ফিরিয়ে দেওয়া অসম্ভব, সেটা ধৃতরাষ্ট্র নিজেই বিশ্বাস করতেন। ফলে বিদুরের কথা শুনে তাঁর প্রতিক্রিয়া হল সাংঘাতিক। কথা শোনা তো দূরের কথা, তিনি এমনভাবেই বিদুরকে অপমান করলেন যে অপমান বিদুর সয়েছিলেন দুর্যোধনের কাছে। সেই বস্ত্রহরণের সময়—দ্যূতসভায়।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—তুমি এখনই যেসব কথা বললে, সেগুলি তুমি সেই পাশাখেলার সময়ও বলেছিলে। যা বলেছিলে, তাতে বেশ বোঝা যায়, তুমি পাণ্ডবদের ভাল চাইছ এবং আমাদের অনিষ্ট চাইছ—তেষাং হিতম্ অহিতং মামকানাম্। পাণ্ডবদের জন্য তোমার এই ওকালতি থেকেই এটা আজ নিশ্চিত হয়ে গেছে যে, তুমি আমার কোনও হিত চাও না। তুমি কী করে ভাবলে যে পাণ্ডবদের জন্য আমি নিজের ছেলেকে ত্যাগ করব—কথং হি পুত্রং পাণ্ডবার্থে ত্যজেয়ম্। পাণ্ডবরাও আমার পুত্রের মতো হলেও এটা মনে রেখো সব সময় যে, আমারই শরীর থেকে দুর্যোধন জন্মেছে—অশংসয়ং তে' পি মমৈব পুত্রাঃ/দুর্যোধনস্তু মম দেহাৎ প্রসূতঃ। যত সমদৃষ্টিই দেখাও—নিজের দেহ বাদ দিয়ে পরের দেহ নিয়ে থাকো—এই কি তোমার সমতার উপদেশ হল? ধৃতরাষ্ট্র শেষ কথা যেটা বললেন, সেটা পূর্বে দুর্যোধনও বলেছিলেন দ্যূতক্রীড়ার সময়ে। আজকে তিনি পুত্রের বলা তিরস্কারবাক্য পুনরুচ্চারণ করে বুঝিয়ে দিলেন যে, ছেলের সঙ্গে তাঁর কোনও আন্তরিক ভেদ নেই। পুত্র দুর্যোধন হঠকারিতার বশে যা করেন, ধৃতরাষ্ট্র সেটা করতে চান সময় নিয়ে, সাভিনয়ে।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—বিদুর! আমি যা কিছুই করি, তুমি সেটাকেই কুটিলতা এবং অন্যায় বলে চিহ্নিত কর। তোমাকে এত দিন আমি যথেষ্ট সম্মান দিয়েছি—মানঞ্চ তে'হমধিকং ধারয়ামি। আর নয়। তুমি যেখানে খুশি চলে যেতে পার, নচ্ছার চরিত্রহীন স্ত্রীলোককে যেমন যতই বোঝাও শোনে না, তেমনই তোমাকে যতই বোঝাই তুমি আমার কথা বোঝ না—সুসান্ত্বমানাপ্যসতী স্ত্রী জহাতি।

ঠিক এই কথাটিই বিদুরকে শুনতে হয়েছিল ভাইপো দুর্যোধনের কাছে, আর আজকে তিনি সেটা শুনলেন দাদার কাছে। কী ভেবেছিলেন ধৃতরাষ্ট্র—তিনি যেটা বলবেন, সেটাই সবাইকে তাঁরই অনুকূলে বুঝতে হবে? আসলে পুত্রের প্রতি শৃঙ্খলাহীন মমতা এবং প্রথাগতভাবে রাজ্য না পাওয়ার ঘটনা তাঁর মানসিক গঠন এমনই জটিল করে তুলেছিল যে, তিনি যে অন্যায় করছেন, অন্যায় বলছেন—সে ব্যাপারেও তাঁর বোধ ছিল না। দুর্যোধন যা বলেছিলেন, বিদুর তাও সহ্য করেছিলেন কোনওমতে, কিন্তু আজকে যখন তাঁর অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্র বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বললেন, তখন তিনি আর এক মুহূর্তও রইলেন না হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন স্বেচ্ছানিক্ষিপ্ত বনবাসে, যেখানে পাণ্ডবভাইরা আছেন, ধর্মময় যুধিষ্ঠির আছেন। বনের পর বন পেরিয়ে হস্তিনাপুরের পশ্চিম দিকে যেখানে কাম্যকবনে পাণ্ডবরা বনবাসের কষ্টকর দিন কাটাচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে চললেন বিদুর।

কাম্যকবনে পাণ্ডবদের সঙ্গে বিদুরের দেখা হল। ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে যা যা কথা হয়েছিল সব জানালেন বিদুর এবং সেইসঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের স্বভাব সম্বন্ধে একটি অসাধারণ মন্তব্য করেছেন তিনি। বলেছেন—পদ্মপাতার ওপর একফোঁটা জল পড়লে সে যেমন স্থায়ী হয় না, ভাল কথা পথ্য বচন তেমনই ধৃতরাষ্ট্রের মনে দাগ কাটে না। যৌবনবতী কুমারী মেয়ে যেমন ষাট বছরের বুড়ো বর পছন্দ করে না, ধৃতরাষ্ট্রও তেমনই ভাল কথা সহ্য করতে পারেন না। তিনি নিজেই নিজের বিনাশ ডেকে আনছেন।

ধৃতরাষ্ট্র কী সাংঘাতিক ভাষা ব্যবহার করে বিদুরকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, সে কথাও বিদুর জানালেন। অন্যদিকে হস্তিনাপুরে দেখছি—ধৃতরাষ্ট্র আবারও ছটফট করছেন। বিদুর চলে যাবার পর আর যখন তিনি ফিরে এলেন না, ধৃতরাষ্ট্রের তখন নানা ভয় ধরল। বিদুর হস্তিনাপুরের রাজসভার মন্ত্রী ছিলেন—এটাই খুব বড় কথা নয়। ছোটবেলা থেকেই তাঁর বুদ্ধি, প্রজ্ঞা এবং তর্ক যুক্তি এতই বেশি প্রখর ছিল যে, মহামতি ভীষ্ম পর্যন্ত তাঁর মত নিয়ে চলতেন। বিশেষত বিদুরের পররাষ্ট্রনীতি এবং রাজনৈতিক বুদ্ধি তাঁর জীবৎকালেই প্রাবাদিক পর্যায়ে পৌঁছেছিল। ধৃতরাষ্ট্র ভাবলেন—বিদুর যদি পাণ্ডবদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁদের প্রধান রাজনৈতিক উপদেষ্টার কাজ করতে থাকেন, তা হলে হস্তিনাপুরের অন্তকাল ঘনিয়ে আসবে রাজনৈতিকভাবেই। সেক্ষেত্রে দুর্যোধন দুঃশাসনদের আর সুখে রাজ্যভোগ করতে হবে না।

বিদুরের প্রভাব এবং পরামর্শে পাণ্ডবদের যে বিরাট বাড়বাড়ন্ত হবে—সে কথা ভেবেই ধৃতরাষ্ট্র আবার বিদুরের জন্য অনুতাপ করতে আরম্ভ করলেন—বিবৃদ্ধিং পরমাং মত্বা পাণ্ডবানাং ভবিষ্যতি। বিদুরের কথা ভাবতে ভাবতে একদিন রাজসভার দ্বারের কাছে এসে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন ধৃতরাষ্ট্র। জ্ঞান ফিরলে তিনি সঞ্জয়কে ডেকে তাঁর সামনেই কান্নাকাটি করতে আরম্ভ করলেন। অন্ধ চোখ বেয়ে অনেক জল পড়ল। ধৃতরাষ্ট্র অনেক অনুতাপ করলেন—বিদুরের মতো এমন ভাই আর হয় না। কোনও দিন সে আমার কোনও অপ্রিয় কাজ করেনি। কিন্তু সেই পরম প্রাজ্ঞ ব্যক্তিটিকে আমি এইভাবে দুঃখ দিলাম—স ব্যলীকং পরং প্রাপ্তো মত্তঃ পরমবুদ্ধিমান্। সঞ্জয়! তুমি তাড়াতাড়ি যাও, বিদুরকে নিয়ে এসো। তাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।

সঞ্জয় বিদুরকে নিয়ে এলেন কাম্যকবন থেকে। বিদুরও এলেন, কারণ তিনি জানতেন তাঁর পরম প্রিয় বড় ভাইটিকে যথাসম্ভব সামাল দিয়ে না চললে বিখ্যাত ভরতবংশ অন্ধকারে ডুবে যাবে। বিদুর ফিরে এলে ধৃতরাষ্ট্র খুব আদর করলেন বিদুরকে। বললেন—ভাগ্যিস তুমি ফিরে এসেছ। ভাগ্যিস আমাকে তোমার এখনও মনে পড়ে। তুমি জান—এই কদিন ছিলে না। দিন রাত আমার না ঘুমিয়ে কেটেছে। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে কোলের কাছে নিয়ে এসে মস্তক আঘ্রাণ করলেন। এতে দুর্যোধন-দুঃশাসনরা খুশি হলেন না মোটেই। ধৃতরাষ্ট্রও ভ্রাতৃমিলনে মহান কোনও আনন্দ লাভ করলেন তা নয়। তবে বিদুরের রাজনৈতিক বুদ্ধি পাণ্ডবদের কোনও সাহায্যে আসবে না ভেবেই ধৃতরাষ্ট্র পরিতৃপ্ত হলেন।

পাণ্ডবরা বনে চলে যাবার পর পৌর-জনপদবাসীদের বিক্ষোভ যেমন দেখা দিয়েছিল, তেমনই বহিরাগত মুনি-ঋষিরাও ধৃতরাষ্ট্রকে কথা শোনাতে ছাড়ছিলেন না। এমনই একদিন ব্যাস এসেছিলেন মৈত্রেয় ঋষিকে সঙ্গে করে। ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসের আত্মজ পুত্র। পাণ্ডু ও বিদুরও তাই। ভরতবংশের ওপরে এই মুনির প্রাণের টান আছে। ব্যাস কাম্যকবনে পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করে তবেই এসেছেন হস্তিনাপুরে। তিনি এসেই ধৃতরাষ্ট্রকে একহাত নিলেন। বললেন—এইভাবে পাণ্ডবরা বনে গেছে—আমার কিন্তু মোটেই ভাল লাগেনি। অন্যায়ভাবে পাশা খেলে তোমার ছেলেরা যে কাজ করেছে, আজ থেকে তেরো বছর পরে কিন্তু তার ফল ভুগতে হবে তোমার ছেলেদের। আমি এখনও বলছি—তোমার ছেলেকে সামলাও এবং সে পাণ্ডবদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করুক—বার্য্যতাং সাধ্বয়ং মূঢ়ঃ শমং গচ্ছতু পাণ্ডবৈঃ। তা নইলে, তোমার ছেলেকেও বনে পাঠাও। সে একা গিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে থাকুক। সেখানে থাকতে থাকতে সে যদি যুধিষ্ঠিরের স্নেহ লাভ করে, তবেই বুঝবে তুমি বাঁচলে, নইলে সব যাবে। জান তো, স্বভাবের দোষ না মরলে যায় না, কাজেই তুমি কী ঠিক করবে আমি জানি না।

পিতা ব্যাসের ধমক খেয়ে ধৃতরাষ্ট্র একেবারে নিজের হৃদয়ের কথাটুকু উজাড় করে দিলেন। বললেন—আমি কী করব? আমি কিছুতেই চেতনাহীন দুর্যোধনকে ছেড়ে দিতে পারি না। এই যে পাশাখেলা নিয়ে যা হল, তা আমি চাইনি, কিন্তু কেমন করে যেন দৈবলিখনের মতো সব ঘটে গেল। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর গান্ধারী—কেউই চাননি এমন ঘটনা ঘটুক, কিন্তু কেমন করে যেন পুত্রস্নেহের বশেই আমি এসব করে বসলাম—তচ্চ মোহাৎ প্রবর্তিতম্। কী করব, দুর্যোধনকে আমি কিছুতেই মন থেকে দূরে রাখতে পারি না। সে যে অন্যায় করছে তা আমি বেশ বুঝতে পারি। কিন্তু সব বুঝেও—এমনই আমার অপার স্নেহ—আমি তাকে বারণও করতে পারি না, কিংবা তাকে ত্যাগও করতে পারি না—পুত্রস্নেহেন ভগবন্ জানন্নপি প্রিয়ব্রত।

ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের কথা বলছেন, ব্যাস কি সেই পুত্রস্নেহের কথা জানেন না? ধৃতরাষ্ট্র কাকে বোঝাচ্ছেন? আজকের দিনেও যে এমনই হয়—পুত্র পুত্রবধূ তাঁদের পুত্রটির কথা বোঝেন, কিন্তু সংসারে যে জনক-জননী দুটি রয়েছেন, তাঁদের আরও যে দু-তিনটি পুত্রকন্যা রয়েছে, তাঁদের ওপরেও যে জনক-জননীর স্নেহ থাকতে পারে, সেটা কেউ বোঝে না। ব্যাসের কাছে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বিদুর এঁরা সকলেই সমান। সেখানে এক পুত্র রাজার হালে আছেন, আরেক ছেলের পুত্রেরা বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ব্যাসের কি তা ভাল লাগে। ব্যাস তাই বললেন—বুঝি, যথেষ্ট বুঝি। ঠিক বলেছ তুমি, এই পৃথিবীর পুত্রের চেয়ে বড় আর কীই বা আছে—দৃঢ়ং বিদ্মঃ পর পুত্রং পরং পুত্রান্ন বিদ্যতে। তবে কিনা তোমাকে একটা গল্প বলি শোনো।

মহর্ষি ব্যাস তিন ভুবনের গাভী-মাতা সুরভির গল্প বললেন ধৃতরাষ্ট্রকে। বললেন—দেখো, একদিন স্বর্গের দুয়ারে বসে গাভী-মাতা সুরভি খুব কাঁদছিলেন। তাঁর করুণ কান্না শুনে দেবরাজ ইন্দ্র এসে বললেন—তুমি কাঁদছ কেন মা জননী। স্বর্গের দেবতাদের কি কোনও অমঙ্গল হয়েছে? নাকি মর্ত্যলোকে অথবা নাগলোকে কোনও বিশেষ বিপদ ঘটেছে? সুরভিকে পৃথিবীর সমস্ত গাভীর আদি জননী বলা হয়। পৃথিবীর যত গোরু, সব তাঁরই সন্তান। সুরভি বললেন—স্বর্গে-মর্ত্যে কোনও অমঙ্গল নেই দেবরাজ, আমি আমার একটি ছেলের দুঃখে বসে বসে কাঁদছি—অহং তু পুত্রং শোচামি তেন রোদিমি কৌশিক। এই দেখো না, মর্ত্যলোকে ওই কৃষকটির ঘরে ওই ছোট্ট এঁড়ে গোরুটিকে দেখতে পাচ্ছ। দেখো কৃষকের হাতে কীরকম চাবুক খাচ্ছে দেখো। কীরকম করে ওর কাঁধে লাঙল চাপিয়ে দিচ্ছে, দেখো? দেখো, লাঙল বইতে পারছে না, বসে পড়ছে, তবু তাকে দিয়ে লাঙল বওয়ানোর জন্যে

চাবুক মারছে কৃষক—নিষীদমানং সোৎকণ্ঠং বধ্যমানং সুরাধিপ।

যে কৃষকের ঘরের দিকে দেখিয়ে দিচ্ছেন সুরভি, সেখানে আরও একটি এঁড়ে গোরু রয়েছে। সে দিব্যি হৃষ্টপুষ্ট, তার গায়েও অনেক শক্তি। সুরভি তাকে দেখিয়ে বললেন—দেখো দেবরাজ! আমার ওই ছেলেটির জন্য কোনও দুঃখ নেই। ওর গায়ে শক্তি আছে, অনেক ভার বইতে পারে, শরীরটাও শক্ত সমর্থ। কিন্তু ওর পাশেরটিকে দেখো, ওর গায়ে মাংস নেই, শিরা বেরিয়ে গেছে সমস্ত শরীরে। আর গায়ে শক্তি বলতে কিছু নেই। আর তাকে কিনা চাবুক মারছে, লাঙল চাপিয়ে দিচ্ছে ঘাড়ে! ভার বইতে ওর বড় কষ্ট বলেই ওই দুর্বল ছেলেটির জন্য আমি কেঁদে মরছি—ততো'হং তস্য শোকার্তা বিরৌমি ভৃশদুঃখিতা।

ইন্দ্র বললেন—কেন এত কাঁদছ মা জননী। পৃথিবীতে তো এত গোরু আছে, সবই তো তোমার পুত্রকন্যা। হাজার হাজার পুত্র থাকতে, ওই একটা দুর্বল ছেলে তোমার কোথায় চাবুক খেল, কোথায় লাঙল তুলতে পারল না, তার জন্য এত কষ্ট পাচ্ছ কেন—কিং কৃপায়ি তবেত্যত্র পুত্র একত্র হন্যতে? সুরভি বললেন—শোনো, দেবতার কথা শোনো। হাজার ছেলের ওপর আমার সমান দৃষ্টি থাকলেও, যে ছেলেটা আমার দুর্বল, রোগাভোগা, তার জন্যেই যে মায়ের সবচেয়ে বেশি কষ্ট গো—দীনস্য তু সতঃ শক্র পুত্রস্যাভ্যধিকা কৃপা।

সুরভির গল্প শুনিয়ে ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে এবার বললেন—তুমি যেমন আমার ছেলে, তেমনই পাণ্ডুও আমারই ছেলে, বিদুরও তাই। সবার ওপরে আমার সমান ভালবাসা আছে। কিন্তু ভেবে দেখো—তোমার একশোটা ছেলে, এবং তারাও বড় ভাল আছে, সুখে আছে। তা থাকুক, সুখেই থাকুক। কিন্তু পাণ্ডুর কথা ভাবো। সে মারা গেছে। আর তার পাঁচটি মাত্র ছেলে, কিন্তু তারা আজকে কত কষ্টে আছে, বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেমন করে ওরা বাঁচবে, কেমন করে ওরা বড় হবে—এত সব চিন্তা আমায় কষ্ট দিচ্ছে। ওরা কষ্টকর অবস্থায় পড়েছে বলেই ওদের জন্য আমার মনে বড় ব্যথা লাগছে। ওই সুরভি যেমন বলেছিলেন—দুর্বল অবস্থায় আছে বলেই ওদের জন্য আমার বেশি মায়া—তদ যথা সুরভিঃ প্রাহ... হীনেষ্বভ্যধিকা কৃপা। ব্যাস 'আলটিমেটাম' দিলেন—তুমি যদি তোমার ছেলেদের বাঁচিয়ে রাখতে চাও, তবে এক্ষুনি দুর্যোধনকে বলো—পাণ্ডবদের সঙ্গে সমস্ত বিবাদ মিটমাট করে নিতে—দুর্যোধনস্তব সুতঃ শমং-গচ্ছতু পাণ্ডবৈঃ।

আজকের দিনের সমস্ত একপুত্রক পুত্রময়তার জগতে ব্যাসের বলা এই সুরভি-উপাখ্যানের তাৎপর্যই হয়তো নেই। কিন্তু আমাদের যুগে ছিল। আমাদের দিনের বাবা মায়ের সংসারের বৈচিত্রও ছিল অদ্ভুত। এক সংসারে একজন ইঞ্জিনিয়ার, একজন কেরানি এবং অন্যজন মুদিখানার দোকানদার হলেও ওই কেরানিটি অথবা দোকানদারটি ব্যাস-কথিত অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে বাবা মায়ের স্নেহ পেতেন বেশি। তাঁরা আবার মুখে বলতেন—বট্‌টার জন্য চিন্তা করি না, ও নিজেরটা নিজে চালাতে পারবে, কিন্তু ছোট্‌টার দোকানদারির যা কষ্ট! যেন ইঞ্জিনিয়ারটির কষ্ট নেই। আমরা জানি—ওঁরাও বুঝতেন কষ্ট আছে, কিন্তু নিজেদের স্নেহ মমতা দিয়ে অর্থ-দুর্বল পুত্রটির মানসিক জটিলতা ঘুচিয়ে দেওয়াটাই ছিল আমাদের কালের সুরভি জনক-জননীর কাজ। ব্যাসও ঠিক এই কাজটাই করেছেন। স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি বনবাসক্লিষ্ট পাণ্ডবদের পক্ষে।

পিতার মতো এমন করেই বা কে বোঝাতে পারে। সেই মুহূর্তে স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্রও সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে বলেছেন—আপনি যা বলেছেন, তা সর্বাংশে ঠিক। এমনকী ভীষ্ম দ্রোণ বিদুররাও আমাকে এই কথা বলেন। তা আপনার যদি সত্যি কৌরবদের ওপর সামান্যও দয়া থাকে, তবে ওই দুরাত্মা দুর্যোধনকে একটু শাসন করে যান, পিতা—অন্বশাধি দুরাত্মানং পুত্রং দুর্যোধনং মম।

ব্যাস শাসন করলেন না। ইচ্ছাকৃতভাবেই করলেন না। কেননা শাসন করতে গিয়ে যদি তাঁর ক্রোধ উদ্রিক্ত হয়, তবে আপন বংশের ওপরেই তাঁর অভিশাপ নেমে আসবে। সেও তো ভাল কথা নয়। ধৃতরাষ্ট্রও যে তাঁর বড় ছেলে। ব্যাসের কথায় মৈত্রেয়ঋষি দুর্যোধনকে অনেক শাসন করলেন। এমনকী শেষ পর্যন্ত ভীমের সেই ঊরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞাও মনে করিয়ে দিলেন। অভিশাপ দিয়ে বললেন—ভীমের গদাঘাতেই তোর প্রাণ যাবে। দুর্যোধন যখন কোনও কথাই শুনলেন না তখন ধৃতরাষ্ট্রই মুনিকে শান্ত করে, তাঁর কাছে কির্মীরবধের ঘটনা শুনতে চাইলেন। কানাঘুষোয় তিনি শুনেছেন—কির্মীর রাক্ষস জাতির এক প্রধান পুরুষ এবং তাঁকে মেরেছেন ভীমসেন। মৈত্রেয় কোনও কথা না বলেই রাগ করে চলে গেলেন। অতএব কির্মীর-বধের কথা তাঁকে শোনালেন বিদুর। ভীমের শক্তি প্রদর্শনের কাহিনী শুনে ধৃতরাষ্ট্র আপন পুত্রের অনিষ্টাশঙ্কায় গম্ভীর হয়ে গেলেন। শুধু দীর্ঘনিশ্বাসেই বোঝা গেল তিনি কতটা শঙ্কিত—শ্রুত্বা ধ্যানপরো রাজা নিঃশ্বশাসার্তবৎ তদা।

ব্যাস এবং মৈত্রেয়ঋষির কাছে ধৃতরাষ্ট্র যেমন কির্মীর-বধের খবর পেয়েছিলেন, তেমনই সেই ব্যাসের কাছেই পরবর্তী সময়ে তিনি অর্জুনের অস্ত্রলাভের কথা শুনেছিলেন। অর্জুন তপস্যা করে পাশুপত এবং অন্যান্য দিব্য অস্ত্র লাভ করেছেন—এ কথা শোনা অবধি ধৃতরাষ্ট্রের মনে অশান্তি ঘনিয়ে উঠল। অর্জুনের ওপর রাগে তিনি দুর্যোধনের ওপরেই খানিকটা হম্বিতম্বি করলেন। বললেন—আমার এই ছেলে, যতরকম বদমায়েশি আছে, তাই করে। কোনদিন দেখব এই বদমাশ গোটা পৃথিবীটাকেই সর্বনাশের পথে ঠেলে দিয়েছে—মম পুত্র সুদুর্বুদ্ধিঃ পৃথিবীং ঘাতয়িষ্যতি। এই যে অর্জুন, তাঁর যা শক্তি-বলের পরিচয় পাচ্ছি তাতে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণের মতো যোদ্ধারাও তাঁর কিছু করতে পারবে না। আমি তো ভূ-ভারতে এমন কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, যে অর্জুনকে মারতে পারবে অথবা তাঁকে যুদ্ধে জয় করতে পারবে।

ধৃতরাষ্ট্র এখন ভীষণ ভয় পাচ্ছেন। প্রাজ্ঞ মন্ত্রী সঞ্জয় তাঁকে দুর্যোধন কর্ণ দুঃশাসনের অপকীর্তির কথা শুনিয়ে অর্জুনের পাশুপত অস্ত্রলাভ এবং তাঁর সঞ্চিত ক্রোধের কথা বুঝিয়ে দিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বলেন—যার বড় ভাই যুধিষ্ঠির সমস্ত শিক্ষায় শিক্ষিত তাঁর সামনে আমার এই দুর্বুদ্ধি ছেলেগুলো তো দাঁড়াতেই পারবে না। আমার চোখ নেই, সবকিছু আমি দেখতেও পাই না, আর সেই সুযোগ নিয়ে আমাকে ওরা আমলই দেয় না কোনও—দৃষ্ট্বা মাং চক্ষুষা হীনং... ন শুশ্রূষতি মন্দভাক্। ধৃতরাষ্ট্র নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারছেন। বুঝতে পারছেন—ভীম-অর্জুনের শক্তির সঙ্গে যদি কৃষ্ণ-বাসুদেবের বুদ্ধি সংযুক্ত হয়, তবে তাঁর প্রিয় পুত্রেরা সকলেই বিমর্দিত হবে—ক্রুদ্ধে ভীমে চ পার্থে চ বাসুদেবে চ সাত্ত্বতে। ধৃতরাষ্ট্র বুঝতে পারছেন যে হস্তিনাপুরের কৌরবদের বিরুদ্ধে নতুন এক রাজনৈতিক বলয় তৈরি হয়েছে। পাঞ্চাল এবং যাদবদের প্রধান পুরুষেরা কাম্যকবনে এসে কৌরবদের ওপর প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা নিয়ে গেছেন। এই সমস্ত খবর, রাজপুরীতে বসেই পাচ্ছেন ধৃতরাষ্ট্র। যত খবর পাচ্ছেন, তত তাঁর ভয় হচ্ছে। দিনে রাতে তাঁর ঘুম আসে না। বার বার এখন তাঁর মনে হচ্ছে—কেন ওই সাংঘাতিক পাশাখেলার মধ্যে গেলাম—সঞ্চিন্ত্য দুর্নয়ং ঘোরম্ অতীতং দ্যূতজং হি তৎ।

ধৃতরাষ্ট্র যতই ভয় পান, দুর্যোধন-দুঃশাসনদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ তত ছিল না বলেই তাঁরা বনবাসী পাণ্ডবদেরও ক্ষতি করার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। একবার তো দুর্বাসা মুনিকে পাণ্ডবদের অরণ্য-আবাসে সশিষ্য ভোজন করতে পাঠিয়েও কোনও লাভ হল না, অবশ্য তাঁদের সেই দুর্বুদ্ধি চেপেছিল পাণ্ডবদের বনবাসের শেষের দিকে। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। তারও আগে আরও একটা দুর্ঘটনা তাঁরা ঘটিয়েছিলেন। তাতে ফল হয়েছিল বিপরীত। পাণ্ডবরা তখন যেখানে বাস করছেন, তার কাছেই কৌরবদের একটি খামারবাড়ি ছিল। সেখানে গোপালন হত। দুর্যোধন শকুনি কর্ণরা বুদ্ধি করলেন—সেইখানে গিয়ে বনবাসক্লিষ্ট

পাণ্ডবদের রাজঐশ্বর্য প্রদর্শন করে তাঁদের মনে জ্বালা ধরাতে হবে। অজুহাত হিসেবে একটি গয়লাকে খাড়া করে বলা হল—এ চায় খামারবাড়িতে কতগুলি গোরু আছে, তাদের বাড়বৃদ্ধি কেমন হচ্ছে, সেসব খবর নিতে রাজবাড়ির কেউ যাক। দুর্যোধন কর্ণরা ধৃতরাষ্ট্রকে জানালেন —এই সুযোগে একটু মৃগয়াও করে আসা হবে, গোপালনেরও খবর নেওয়া হবে।

ধৃতরাষ্ট্র এখন যেহেতু পাণ্ডবদের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আছেন, অতএব খুব করে তিনি বললেন—দেখো বাপু! মৃগয়াও বেশ ভাল কথা, গোরু দেখে আসাটাও বেশ ভাল কথা। কিন্তু আমি জানি—তোমরা যেখানে যাবে, ঠিক সেইখানেই ওই বাঘের মতো বীরপুরুষেরা এখন বাস করছেন। তোমরা তাঁদের প্রতি অনেক অন্যায় করেছ। কপট পাশা খেলে তাঁদের রাজ্য কেড়ে নিয়েছ, তাঁদের বনেও পাঠিয়েছ—ছদ্মনা নির্জিতাস্তে তু কর্শিতাশ্চ মহাবনে। মনে রেখো, সেখানে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কোপোদ্রেক না হয় কোনও কারণে। কোনও কারণে যেন ক্রোধী ভীম খেপে না ওঠেন। আর ওই যে রমণীটি যাকে তোমরা অবলা বলে ভাব, সে কিন্তু তেজঃপুঞ্জ ছাড়া আর কিছু নয়। তোমরা যেতে পার, কিন্তু তোমরা বা তোমাদের সৈন্যসামন্তরা যাতে কোনওভাবে তাঁদের কোনও ক্ষতি না করে, সে ব্যাপারে তোমাদের কথা দিতে হবে। মনে রেখো—অর্জুন কিন্তু কোনও দিব্যাস্ত্র ছাড়াই এই পৃথিবী জয় করেছিলেন, এখন তিনি দিব্যাস্ত্র লাভ করে সম্পূর্ণ শক্তিশালী। তোমরা যদি কোনওভাবে তাঁদের পিছনে লাগতে যাও, তবে কিন্তু জেনে রেখো সেটা ভাল তো হবেই না, আর ক্ষমতায়ও কিন্তু কুলোবে না—অনার্য্যং পরমং তৎ স্যাদ্ অশক্যঞ্চ বৈ মতম্।

দুর্যোধন-কর্ণরা ধৃতরাষ্ট্রের কথা শোনেননি। শকুনি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তাঁরা কোনও মতেই পাণ্ডব-ভাইদের জ্বালাতন করবেন না। কিন্তু বাস্তবে তাঁরা নিজেদের ক্রূর পরিকল্পনা মতোই কাজ করতে গিয়েছিলেন এবং তার ফলও পেয়েছিলেন। বনবাসে থেকেও পাণ্ডবরা দুর্যোধনের অত্যাচার কিছু কিছু সইলেন; সব ঘটনা ধৃতরাষ্ট্রের মতে হয়নি ঠিকই, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের পূর্ব প্রশ্রয় এতই বেশি ছিল যে, শেষের দিকটায় দুর্যোধন আর জিজ্ঞাসা টিজ্ঞাসা কিছু করছিলেন না। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সময় দুর্যোধন যে কুরু-প্রধানদের নিয়ে বিরাট রাজার গোধন হরণ করতে গেলেন, তাতে ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি-প্রার্থনার অবকাশ ছিল না কোনও। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সময় পেরিয়ে যেতেই পাণ্ডব এবং কৌরব শিবিরে নতুন করে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হল।

হস্তিনাপুরে পাঞ্চাল, যাদব, পাণ্ডবদের একক দূত এসে উপস্থিত হলেন। তিনি দ্রুপদের পুরোহিত স্পষ্টবক্তা এক ব্রাহ্মণ। তিনি এসে নরমে-গরমে পাণ্ডবদের বক্তব্য এবং শক্তিমত্তার কথা শোনালেন, ধৃতরাষ্ট্রকে। প্রথমে তো আইনের কথা উঠল। তিনি বললেন—যদি উত্তরাধিকারের কথাও বলেন, তবে পাণ্ডু এবং ধৃতরাষ্ট্রের আধাআধি সম্পত্তি পাবার কথা। সেদিক দিয়ে দেখলে পাণ্ডুর ছেলেরা তো কিছুই পেলেন না, সবটাই বেদখল করে রাখলেন ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা—ন প্রাপ্তং পৈতৃকং দ্রব্যং ধার্তরাষ্ট্রেণ সংবৃতম্।

আইনের কথা সেরে দ্রুপদের পুরোহিত এবার অন্যত্র বঞ্চনার কথা তুলে বললেন—আপনারা তাঁদের সঙ্গে কপট পাশা খেলে রাজ্য কেড়ে নিয়েছেন। তারপর বনবাসেও পাঠিয়েছেন। সস্ত্রীক বনবাস এবং অজ্ঞাতবাসেও তা দের কষ্টের কোনও সীমা ছিল না। কিন্তু আপনার ছেলেদের যে সব পাপের কথা তাঁরা অতীত ঘটনা বলে ছেড়ে দিয়েছেন সব—তে সর্বে পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা তৎসর্বং পূর্বকিল্বিষম্। জেনে রাখুন—পাণ্ডবরা কোনও যুদ্ধ চান না, তাঁরা ভালভাবেই সবকিছু মিটিয়ে নিতে চান। কিন্তু যদি মনে করেন আপনার ছেলেরা তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেনই, তাহলে যেন এটা মনে করবেন না যে, আপনার ছেলেরা সব দিক দিয়ে অধিকতর শক্তিমান, সেই জন্য যুদ্ধ করছেন—স চ হেতু র্ন মন্তব্যো বলীয়াংসস্তথা হিতে।

দ্রুপদের পুরোহিত এবার পাণ্ডবদের অপরিসীম শক্তির পরিচয় দিলেন। ভীম-অর্জুনের মতো যুদ্ধ-বীরের প্রসঙ্গ ছাড়াও পাঞ্চাল-যাদবদের রাজনৈতিক মিত্রতার কথা বলে তিনি ধৃতরাষ্ট্রের অন্তর কম্পিত করে তুললেন। দ্রুপদের পুরোহিতকে কর্ণ কিছু কথা শোনাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র এই প্রথম তাঁকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন। তাঁর রাজনৈতিক কূটচারিতা অসাধারণ। তিনি নিজের বৃদ্ধ বয়স এবং আত্মীয়-সম্পর্কের মর্যাদা ভাঙিয়ে এমন চেষ্টা করলেন যাতে পাণ্ডবদের রাজ্যও দিতে না হয়, আবার তাঁরা যেন যুদ্ধও না করেন। ধৃতরাষ্ট্র বললেন—আমি সঞ্জয়কে দূত করে পাঠাব। সে সব কথা বুঝিয়ে বলবে।

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মাধ্যমে পাণ্ডবদের অনেক মঙ্গল কামনা করলেন, অনেক আশীর্বাদ করলেন, অনেক ভয় পাবার অভিনয় করলেন, কিন্তু রাজ্য ফিরিয়ে দেবার কথা একবারও বললেন না। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের কথা মতো পাণ্ডবদের সব জানালেন, ধৃতরাষ্ট্রের অকুণ্ঠ আশীর্বাদ আর মোহময়ী স্নেহেচ্ছা জানিয়ে ভাইতে ভাইতে যুদ্ধ যে একদম প্রশস্ত নয়, অস্ত্রের হানাহানিতে লোকক্ষয় যে অত্যন্ত অন্যায়—এই সব গভীর তত্ত্বকথা যুধিষ্ঠিরকে বোঝাতে লাগলেন। কিন্তু এই মত্ন তত্ত্ব-বোধনের কোনও উপপত্তি ছিল না। ধৃতরাষ্ট্র একবারও রাজ্য ফিরিয়ে দেবার কথা সঞ্জয়কে বলে দেননি। অতএব সঞ্জয়ও শুধু যুদ্ধ না করার উপযোগিতা নিয়ে বাগ্মিতা প্রকাশ করে যাচ্ছিলেন।

যুধিষ্ঠির সব কথা শুনে ঠান্ডা মাথায় বললেন—সঞ্জয়! আমরা যুদ্ধের কথা একবারও কি বলেছি, যাতে যুদ্ধ বন্ধ করার ভাবতে হচ্ছে—কা নু বাচং সঞ্জয় মে শৃনোষি যুদ্ধৈনিণীং যেন যুদ্ধাদ্‌বিভেষি। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বিরাট ঐশ্বর্য ভোগ করছেন, তিনি তাঁর দুর্বুদ্ধি পুত্রকেও শাসন করছেন না, আবার এদিকে অসহায় দীনের মতো নানা ভাষণ দিচ্ছেন। আমাদের কথা হল—যুদ্ধ এড়িয়ে গিয়ে যে শান্তির কথা আপনি বলছেন, সে শান্তি আমরাও চাই। তবে কিনা আমাদের ইন্দ্রপ্রস্থ আমাদের ফিরিয়ে দিক দুর্যোধন, তাতে শান্তির পথ সবচেয়ে বেশি প্রশস্ত হবে—ইন্দ্রপ্রস্থে ভবতু মমৈব রাজ্যং সুযোধনো যচ্ছতু ভারতাগ্রাঃ।

ধৃতরাষ্ট্রের কূটচারিতা মাথায় রেখেই সঞ্জয় এবার কথা ঘোরালেন। বললেন—দেখ, যুদ্ধ ছাড়া কৌরবরা তোমাদের ভাগ তোমাদেরই ফিরিয়ে দেবে বলে মনে হয় না। আর যুদ্ধই আমরা চাই না। মহান পাণ্ডবরা ধর্মের পথে চলেন বলেই তাঁদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন

যুদ্ধ করে লোকক্ষয় না করেন। মানুষ কতদিন আর বাঁচে, তার মধ্যে এই মারামারি, কাটাকাটি ভাল লাগে না বাপু। আমার তো মনে হয়—এর থেকে অন্য রাজ্যে গিয়ে ভিক্ষা করাও ভাল, তোমাদের যশ এবং কীর্তির নিরিখে এই যুদ্ধ করে জ্ঞাতি-গুষ্টির সর্বনাশ করা তোমাদের মানায় না—মহাশ্রাবং জীবিতঞ্চাপ্যনিত্যং সংপশ্য ত্বং পাণ্ডব মা বানীনশঃ।

সঞ্জয় যুদ্ধ-নিবৃত্তির সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানের কথা বললেন এবং এগুলি তাঁর কথা নয়, ধৃতরাষ্ট্রের কথা। ধৃতরাষ্ট্র তাঁর বচন-বিভঙ্গে রাজ্যভাগের কথাটা চেপে রেখে যত বড় বড় কথা বলতে চেয়েছিলেন, হুবহু তাইই বলে গেছেন সঞ্জয়। কিন্তু তাতে—যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই —স্লোগানটাই খুব বড় হয়ে উঠেছিল, বাস্তবে যে বুদ্ধিতে যুদ্ধ বন্ধ করা যায়, সেই বুদ্ধির সততাটুকু ছিল না ধৃতরাষ্ট্রের দিক থেকে। যুধিষ্ঠির সেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন পরিষ্কারভাবে। শেষে তিনি ইন্দ্রপ্রস্থের দাবিও ছেড়ে দিয়েছেন। কুশস্থল, বৃকস্থল; বারণাবত ইত্যাদি পাঁচখানিমাত্র গ্রামের ভাগ চেয়ে যুধিষ্ঠির তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন যে, শান্তি এবং সহাবস্থান এর কমে সম্ভব নয়—শান্তিরেবং ভবেদ্ রাজন্ প্রীতিশ্চৈব পরস্পরম্।

সঞ্জয় ফিরে এলেন যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে। সকলের কুশলবার্তা জানিয়ে বললেন— আমি আপনাকেই সর্বাপেক্ষা দোষী সাব্যস্ত করছি, কারণ আপনার কারণেই ভরতবংশের মধ্যে পারস্পরিক এই হানাহানি তৈরি হয়েছে, যা সমস্ত রাজ্যের সর্বনাশ ডাকে আনবে। এই আপনি, ছেলের কথায় নেচে যে সর্বনেশে পাশাখেলার মদত দিয়েছিলেন—তমেবৈকো জাতু পুত্রস্য রাজন্/বশং গত্বা সর্বলোকে নরেন্দ্র—তার ফল এখন ভুগবেন। আপনার পক্ষে এই কুরুবংশ রক্ষা করা আর সম্ভব নয়—ন শক্তস্ত্বং রক্ষিতুং কৌরবেয়। আমি সারা দিন রথ চালিয়ে এসেছি, বড় শ্রান্ত, বড় ক্লান্ত আমি। কাল সকালে আমি সব সবিস্তারে বলব। এখন আপনি আমার শয়নের অনুমতি করুন।

সঞ্জয় অতিসংক্ষেপে যত রাগ দেখিয়ে শুতে চলে গেলেন, তাতেই বোঝা যায় যে, ধৃতরাষ্ট্রের বাস্তব-আচরণহীন মৌখিকতায় কোনও কাজই হয়নি। একজন অসাধারণ দূতের পক্ষেও সেটা বাস্তব অসুবিধের সৃষ্টি করেছে। ধৃরাষ্ট্রের সঞ্জয়ের ক্রোধের অভিব্যক্তি শুনে বুঝেছেন, তাঁর চতুরতায় কোনও কাজ হয়নি। উপরন্তু এই তেরো বছর ধরে তিনি যে সব বিপদের আশঙ্কা করেছেন, তা যে সত্যি হতে চলেছে, সেটাও সঞ্জয়ের অভিব্যক্তি দেখেই বুঝে গেলেন ধৃতরাষ্ট্র। তাঁর মন ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠল। পুত্রদের বিপত্তির আশঙ্কায় এবং নিজের অসহায়তা বুঝে তিনি ভীষণ ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। মানুষ পাপ করে আসার পর যেমন ভাগবত শোনে, মরণকালে যেমন মানুষ হরিনাম করে, প্রায় সেই মানসিকতাতেই ধৃতরাষ্ট্র ডেকে পাঠালেন বিদুরকে।

বিদুর আসার সঙ্গে সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে বললেন—বিদুর! সঞ্জয় এসে আমাকে একটু তিরস্কার করেই চলে গেল—গর্হয়িত্বা চ মাং গতঃ। যুধিষ্ঠির তাকে কী বলেছেন, সে কথা কাল সভাস্থলেই জানাবে সঞ্জয়। কিন্তু যেহেতু আমি কিছুই জানতে পারলাম না, তাই চিন্তায় আমার ঘুমও আসছে না, মনের জ্বালায় শরীরও পুড়ে যাচ্ছে—তন্মে দহতি গাত্রণি তদাকার্ষীৎ প্রজাগরম্। বিদুর বললেন—মহারাজ! ঘুম আসে না কাদের? দুর্বল লোকের ওপর যদি বলবান আক্রমণ করে সেই দুর্বল লোকের ঘুম আসে না। যার ধন-সম্পদ চুরি গেছে, তার ঘুম আসে না। যে স্ত্রী-চিন্তায় মত্ত, তার ঘুম আসে না, আর যে চোর, তার ঘুম আসে না— হৃতস্বং কামিনং চৌরমাবিশন্তি প্রজাগরাঃ। আশা করা যায়—এগুলোর মধ্যে একটা দোষও নিশ্চয়ই আপনার নেই। তবে আবার এমন হয়নি তো যে, কোনওভাবে পরের দ্রব্যে লোভী হয়ে এখন আপনি অনুতাপ করছেন—কচ্চিচ্চ পরদ্রব্যেষু গৃধ্যান্ন পরিতপ্যসে?

বিদুরের ইঙ্গিতটা স্পষ্টতই পাণ্ডবদের রাজ্যহরণের দিকে। কিন্তু তিনি যেন একটু বোকা

সেজে বলছেন। ধৃতরাষ্ট্রও এ কথার সোজাসুজি উত্তর দেননি। তিনি বিদুরের কাছে ধর্মকথা শুনতে চেয়েছেন। বিদুর ধর্মকথা শোনানোর আগে যুধিষ্ঠিরের ন্যায্য প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে বলেছেন, তারপর আরম্ভ করেছেন তত্ত্বোপদেশ। তার মধ্যে নীতিকথা, রাজনীতি, ধর্মনীতি সবই আছে। সে সব কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্রের কোনও শান্তি হল কিনা জানি না, তবে প্রজাগর-কৃশ রাতটি পোহাল।

পরের দিন সভা বসল। কৌরব-ভাইরা সবাই, ভীষ্ম-বিদুর ইত্যাদি কুরুবৃদ্ধেরা, দ্রোণ-কৃপের মতো আচার্যরা এবং অবশ্যই ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের বক্তব্য শোনার জন্য উপস্থিত হলেন। ধৃতরাষ্ট্র প্রথমেই অর্জুনের কথা শুধোলেন। তিনি কী বলেছেন না বলেছেন সে সব কথা শুনতে চাইলেন। অর্জুনের সম্বন্ধে এমনিতেই ধৃতরাষ্ট্রের ভয় ছিল। সে ভয় আরও বাড়ল অর্জুনের বক্তব্য শোনার পরে। অর্জুন বলে দিয়েছেন—দুর্যোধন যদি রাজ্যভাগ না দেন, তবে যুদ্ধই হবে—উপৈহি যুদ্ধং যদি মন্যসে ত্বম্। অর্জুন এরপরে নিজের এবং অন্যান্য যুদ্ধবীরের অসাধারণ যুদ্ধক্ষমতা বর্ণনা করে তাঁরা কীভাবে কৌরবদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বেন এবং তারপর কীভাবে কৌরবদের অনুতাপ করতে হবে—তার একটা ভীষণ চিত্র এঁকে দিয়েছেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। ধৃতরাষ্ট্র একে একে যুধিষ্ঠির, ভীম এবং অন্যান্য বীরদের প্রাথমিক বিনয় এবং সেই পথ ধরেই তাঁদের উগ্র বচনও শুনেছেন। তবে ভীমের বক্তব্য শোনার আগে তিনি নিজেই ভীমের শক্তিমত্তা সম্পর্কে এত বর্ণনা দিয়েছেন এবং ভীমের সম্বন্ধে ভীত হয়ে তিনি নিজেই এত বিলাপ করেছেন যে, সঞ্জয়কে আর ভীমের কথা বেশি বলতেই হয়নি।

ধৃতরাষ্ট্র নিজপুত্রদের ভবিষ্যৎ সর্বনাশের কথা চিন্তা করে আর কূল পাচ্ছেন না কোনও। বারেবার বলছেন—কী করি, কোথায় যে যাই, সঞ্জয়! কেমন করেই বা এই দুরন্ত বিপদ পার হব। এবারে সত্যিই মনে হচ্ছে—কৌরবরা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে—কিংনু কুর্য্যাং কথং কুর্য্যাং ক্ক নু গচ্ছামি সঞ্জয়। ধৃতরাষ্ট্র সভাস্থলে সবার সামনেই বললেন—আমি সবদিক থেকে যুদ্ধ না করাটাই সবচেয়ে ভাল মনে করি। যদি তোমরা সকলেই এই কথা মান তো আমরা পাণ্ডবদের সঙ্গে শান্তি এবং মিত্রতার সম্বন্ধই গড়ে তোলার চেষ্টা করব—বয়ং শান্ত্যৈ যতামহে। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে বললেন—আপনি এক্কেবারে ঠিক কথাটি বলেছেন, তবে আপনার ছেলে এ কথা মেনে নেবে কি না যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মহারাজ! আপনারই কি দোষ কম? ভেবে দেখুন সেই পাশাখেলার দিনটির কথা। শকুনি একটা একটা পাশার দান জিতছিল, আর আপনি বাচ্চা ছেলের মতো আনন্দে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছিলেন —জিতেছি, ওটাও জিতেছি—ইদং জিতম্ ইদং লব্ধং...স্ময়সে স্ম কুমারবৎ।

সঞ্জয় খুব ছেড়ে কথা বললেন না ধৃতরাষ্ট্রকে। ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষকে সঠিক পথে আনবার এই তো সময়। তিনি বললেন—মহারাজ! আপনার দোষ কি কম? পাশাখেলার পর তাঁদের কত কটু কথাই না বলেছে আপনার ছেলেরা। কিন্তু আপনি তখন সে সব উপেক্ষা করেছেন। ভেবেছেন—ছেলেরা আপনার কত লায়েক হয়েছে, রাজ্য জয় করে এনে দিচ্ছে আপনার হাতে—কৃৎস্নং রাজ্য জয়ন্তীতি। কিন্তু মহারাজ! আপনি ভুলে গেছেন—পাণ্ডবরা তাঁদের বাহুবলে অর্জিত ভূমি সৌজন্যবশে আপনার হাতেই নিবেদন করেছিল। আর আপনি ভেবেছিলেন যেন আপনিই অনেক যুদ্ধ জয় করে সেই ভূমি লাভ করেছেন—ময়েদং কৃতমিত্যেব মন্যসে রাজসত্তম। এখন মনে রাখবেন ভীম কি অর্জুন শুধু নয়, মৎস্যরাজ বিরাট, পাঞ্চাল দ্রুপদ, শূরসেন যাদবরা, শাল্ব, কেকয়—এই সমস্ত দেশের রাজারা পাণ্ডবদের পক্ষে যুদ্ধ করবেন। আপনি রক্ষা পাবেন না। আমি এখনও বলছি—আপনার সেই ছেলেটিকে কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করুন, যে আগেও পাণ্ডবদের বহু কষ্ট দিয়েছে এবং এখনও তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে যাচ্ছে। মনে রাখবেন—এতক্ষণ ধরে যে এত অনুশোচনা করলেন, এত বিলাপ করলেন—এ সব কিছুই একেবারে নিরর্থক, যদি না

আপনার পুত্রকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন—অনীশেনেব রাজেন্দ্র সর্বমেতন্নিরর্থকম্।

সঞ্জয়ের সদুপদেশ এবং ভীতিপ্রদর্শন একবারে একফুঁয়ে উড়িয়ে দিলেন দুর্যোধন। তিনি বললেন—ভয় পাবেন না, মহারাজ—ন ভেতব্যং মহারাজ—যুদ্ধ আরম্ভ হলে আমরাও খুব ছেড়ে কথা কইব না, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ কর্ণের কথা উল্লেখ করে দুর্যোধন একদিকে যেমন কৌরবদের শক্তিমত্তার কথা প্রচার করলেন পিতার কাছে, তেমনই অন্যদিকে ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝালেন—এই যে পাণ্ডবরা ইন্দ্রপ্রস্থের দাবি ছেড়ে দিয়ে আজকে পাঁচখানি মাত্র গ্রাম চেয়েছেন, সেটা কীসের জন্য জান? আমার ভয়ে—ভীতো হি মামকাৎ সৈন্যাৎ প্রভাবাচ্চৈব মে বিভো। পিতা! আপনি যে পাণ্ডবদের খুব সমর্থ মনে করছেন, আমাদের যে খুব একটা আমল দিচ্ছেন না—সেটা কিন্তু মিথ্যে। কেননা আমাদের শক্তিমত্তা এবং ক্ষমতা সম্পর্কে আপনার ধারণা সম্পূর্ণ নয় বলেই আপনি এইরকম ভেবেছেন। শত্রুপক্ষের শক্তির মধ্যে সেই উৎকর্ষ নেই, যা আমাদের আছে। ওদের যা সৈন্যসামন্ত আছে, শক্তিতে এবং সামর্থে আমাদের আছে তার তিনগুণ—পরেভ্যস্ত্রিগুণা চেয়ং মম রাজন্ননীকিনী।

দুর্যোধন সঞ্জয়কে প্রায় ‘চ্যালেঞ্জ’ জানিয়ে বসলেন—তুমি কী এত দেখছ, সঞ্জয়! যাতে সাত অক্ষৌহিণী মাত্র সৈন্য নিয়ে ওরা আমাদের সঙ্গে স্পর্ধা করতে আসে। সঞ্জয় যতক্ষণে পঞ্চপাণ্ডবের কীর্তিরাশি শোনাচ্ছেন, ততক্ষণে কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র প্রিয় পুত্রের সম্মোহিনী বক্তৃতায় বিমোহিত হয়ে গেছেন। তিনি ততক্ষণে পাণ্ডবদের এবং কৌরবদের সামরিক শক্তি সম্বন্ধে একটা তুলনামূলক বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। দুর্যোধনের কথাটাই যদি সত্যিও হয়, তবু পুত্রের শুভার্থে পাণ্ডবদের সঠিক শক্তি কতটা, সেটা ভাল করে জেনে নেবার প্রয়োজন বোধ করেছেন ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয়কে তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন—তুমি সেখানে কাদের দেখলে সঞ্জয় —যারা আমার ছেলের যুদ্ধবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে নামবে—যে যোৎস্যন্তে পাণ্ডবার্থে পুত্রস্য মম বাহিনীম্।

সঞ্জয় একে একে সব বলতে আরম্ভ করেছেন—কারা পাণ্ডবদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন, কারা পাণ্ডবদের সমর্থন করছেন। এমনকী পাণ্ডবরা এবং তাঁদের পক্ষপাতী রাজারা কৌরববাহিনীর কাকে কাকে কে মারবেন বলে ভাগ করে নিয়েছেন—সে কথাও সবিস্তারে জানালেন সঞ্জয়। ধৃতরাষ্ট্র আবার যেন একটু ভয় পেলেন। কিন্তু তাঁকে আবারও ঠিক করার জন্য দুর্যোধনের আত্মম্ভরী বক্তৃতা শুরু হল। ধৃতরাষ্ট্র খুব যে এবার জোর পেলেন তা নয়, খুব যে বুঝে গেলেন তাও নয়। সঞ্জয়ের মুখে সমস্ত কিছু শুনে তিনি বরং সবিনয়ে অনুরোধই করলেন দুর্যোধনকে—আমি এত যে চ্যাঁচাচ্ছি, তাও এরা কেউ শোনে না সঞ্জয়—মন্দা বিলপতো মম। বাছা দুর্যোধন! তুমি যুদ্ধের দুরাগ্রহ ত্যাগ করো—দুর্যোধন নিবর্তস্ব যুদ্ধাদ্ ভরতসত্তম।

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা—সবার মত উদ্ধার করে ধৃতরাষ্ট্র বললেন—দেখো বাছা! এরা কেউ যুদ্ধ চান না, তুমিও সেই উপদেশটা মেনে নাও। আমি জানি—এই দুরাগ্রহ তোমার নিজের ইচ্ছেয় নয়। তোমাকে এ ব্যাপারে মদত দিচ্ছে তোমার বন্ধুবর কর্ণ—ন ত্বং করোষি কামেন কর্ণঃ কারয়িতা তব। আর আছে ওই সর্বনেশে শকুনি আর দুঃশাসন, যারা তোমাকে যুদ্ধে প্ররোচিত করছে। অর্থাৎ দুর্যোধনের ব্যাপারে ধৃতরাষ্ট্রের মোহ এতটাই যে, তাঁর পুত্রটিই যে যুদ্ধের ব্যাপারে প্রধান হোতা, সেটা তিনি ভাবতেই পারেন না। দুর্যোধন অবশ্য তাঁর এই মোহ ভেঙে নিজেই যুদ্ধের দায়িত্ব স্বীকার করেছেন, কিন্তু তাতেও ধৃতরাষ্ট্রের মোহভঙ্গ হয়নি। দুর্যোধন বলেছিলেন—এই তুমি যাঁদের নাম করলে, ওই ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, অথবা সঞ্জয় আমি এঁদের কারও ভরসায় যুদ্ধে নামছি না—অন্যেষু বা তারকেষু ভারং কৃত্বা সমাহ্বয়ে। আমি যুদ্ধে নামছি আমার নিজের ক্ষমতায়। কর্ণ, দুঃশাসন—এঁরা আমার সহায়তা করবেন নিশ্চয়ই। কিন্তু সার কথা জেনো—হয় আমি যুদ্ধে জিতে এই পৃথিবী শাসন করব,

নয়তো পাণ্ডবরা। একত্র আমরা কিছুতেই থাকব না—ন জাতু পাণ্ডবৈঃ সার্ধং বসেয়মহমচ্যুত।

যুদ্ধ ছাড়া পাণ্ডবদের সূচ্যগ্র ভূমিও দেবেন না বলে ঘোষণা করে দিলেন দুর্যোধন। ধৃতরাষ্ট্র আর কী করেন! একবার সঞ্জয়ের কাছে পাণ্ডবদের শক্তির কথা শোনেন, একবার দুর্যোধনের কথা শোনেন। একবার কর্ণের বীরমানিতা শোনেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁর শান্তি হয় না। শেষে সঞ্জয়ের পরামর্শে নিজ পিতা ব্যাস এবং গান্ধারীকেও সভাস্থলে ডেকে এনে বোঝানোর চেষ্টা করেন দুর্যোধনকে। কিন্তু কিছুতেই কোনও কাজ হল না। দুর্যোধন নিজের গোঁ ধরে বসে রইলেন।

ধৃতরাষ্ট্র যখন এদিকে কিছুতেই ছেলেকে নিজের মতে আনতে পারছেন না, তখন ওদিকে আরেক চিত্র চলছে। পাণ্ডব শিবিরে তখন সঞ্জয়ের মুখে শোনা ধৃতরাষ্ট্রের নানা বক্তব্য নিয়েই আলোচনা চলছে। যুধিষ্ঠিরের মতো সরল মানুষও বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে, তাঁদের সমস্ত কষ্টের জন্য ধৃতরাষ্ট্রই মূলত দায়ী। তিনি নিজেই লোভী এবং পাণ্ডুপুত্রদের প্রতি তিনি অসম ব্যবহার করেন—লুব্ধঃ পাপেন মনসা চরন্নসমমাত্মনঃ—সঞ্জয়ের মুখে ধৃতরাষ্ট্র যা বলে পাঠিয়েছেন, তাতে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি অনেক শ্রদ্ধা পোষণ করেও নিজেকে স্তব্ধ করতে পারছেন না যুধিষ্ঠির। তিনি বলছেন—ধৃতরাষ্ট্র মোটেই ন্যায়-নীতি মেনে চলছেন না। তাঁর কথা শুনে আমরা এত বছর বনবাস, অজ্ঞাতবাস সব করলাম। কিন্তু পুত্রের মতে মত দিয়ে—বশ্যত্বাৎ পুত্রগৃদ্ধিত্বাৎ—তিনি একটি কথাও রাখছেন না। তিনি আমাদের রাজ্যটিও ফেরত দেবেন না, অথচ যুদ্ধশান্তি চাইছেন। এ কেমন কথা হল—অপ্রদানেন রাজ্যস্য শান্তিমস্মাসু মার্গতি।

দুই পক্ষের অনমনীয় অবস্থা দেখে পরমপুরুষ কৃষ্ণ ঠিক করলেন—তিনি শান্তির দূত হয়ে কৌরব-রাজসভায় যাবেন। যুধিষ্ঠিরের কথাটা তো সত্যিই খুব মিথ্যে নয়। ধৃতরাষ্ট্র যতই পাণ্ডবদের ভয় পান, তিনি কিন্তু দুযোর্ধনের ওপর নিজের শাসন চালাচ্ছেন না। তাঁর যদি যুদ্ধনিবৃত্তির ব্যাপারে সত্যিই আন্তরিকতা থাকত, তা হলে দুর্যোধনের কথা না শুনেই তাঁর বলা উচিত ছিল যে, পাণ্ডবদের প্রাপ্য রাজ্য দিতেই হবে। তাঁর মনের ইচ্ছা—রাজ্যও দেব না, যুদ্ধও না হোক। এইরকম মনোবৃত্তি প্রকাশ পেয়েছে কৃষ্ণ আসবার সময়েও। কৃষ্ণ যখন প্রায় হস্তিনাপুরের কাছাকাছি বৃকস্থলীতে এসে পৌঁছেছেন, তখন বিদুরকে ধৃতরাষ্ট্র জানাচ্ছেন—কীভাবে তিনি আতিথেয়তায় ভুলিয়ে কৃষ্ণকে তুষ্ট করবেন। রাজ্যের কথাটা কিন্তু একবারও বলছেন না।

দুর্যোধন অবশ্য ধৃতরাষ্ট্রের এই অতিথিসৎকারের মানসিকতা মেনে নেননি। কৃষ্ণ যদি ভেবে বসেন—দুর্যোধন ভয় পেয়েছেন, তাই এমন আতিথেয়তা করছেন—এই ভাবনায় তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে আতিথেয়তা বন্ধ করতে বলেছেন। দরকার হলে যে কৃষ্ণকে বন্দি করতেও তিনি পিছুপা হবেন না সেটাও তিনি কঠিন স্বরে জানিয়েছেন ধৃতরাষ্ট্রকে। ভীষ্ম এবং ধৃতরাষ্ট্র দু'জনেই দুর্যোধনের এই কথায় ক্ষুব্ধ হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের উচিত ছিল—দুর্যোধনকেও অনুরূপ কঠিনভাবেই শাসন করা, কিন্তু তা তিনি করেননি। তাঁর পুত্রস্নেহ এমনই দুরবগ্রহ।

কৃষ্ণ গিয়ে দুর্যোধনের সঙ্গে কথা বলেননি। যা বলেছেন ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করেই বলেছেন। কৃষ্ণ বলেছেন—আপনি পারেন, একমাত্র আপনিই পারেন আপনার ছেলেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে। আর যদি না পারেন, তবে এই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি দুই পক্ষের দিকে তাকিয়েই বলছি—যুদ্ধ না হওয়াটা কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আপনার ওপর এবং আমার ওপর—ত্বয্যধীনো শমো রাজন্ ময়ি চৈব বিশাম্পতে। শুধু রাজনৈতিক বা সামরিক

শক্তির তুলনা-প্রতিতুলনা নয়, কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের অন্তর এবং সুবুদ্ধির কাছে নিজের যুক্তি নিবেদন করেছেন। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর ধৃতরাষ্ট্রই যে পাণ্ডবদের পিতা এবং অভিভাবক—সে কথা খুব আন্তরিকভাবেই জানিয়েছেন কৃষ্ণ—বালা বিহীনাঃ পিত্রা তে ত্বয়ৈব পরিবর্দ্ধিতঃ।

কৃষ্ণ অনেকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেও মাঝখান থেকে তার উত্তর দিয়েছেন দুর্যোধন এবং বলা বাহুল্য সে উত্তরের মধ্যে অহংমানিতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কৃষ্ণও মোটেই ছেড়ে দেননি এবং উত্তেজনার তুঙ্গ মুহূর্তে ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছেন—দুর্যোধন-কর্ণ-শকুনিদের বন্দি করে আপনি পাণ্ডবদের হাতে ছেড়ে দিন, তাতে আপনি অনেক ভাল থাকবেন—বদ্ধ্বা দুঃশাসনঞ্চাপি পাণ্ডবেভ্যঃ প্রযচ্ছত। কৃষ্ণের মানসিকতা দেখে ধৃতরাষ্ট্র ভয় পেয়ে বিদুরকে বলেছেন—গান্ধারীকে ডেকে আনো, বিদুর! তিনি যদি ছেলেকে সামলাতে পারেন—অপি সাপি দুরাত্মানং শময়েদ্ দুষ্টচেতসম্। বিদুর তৎক্ষণাৎ ডেকে এনেছেন গান্ধারীকে। ধৃতরাষ্ট্র অনুযোগ করে বলেছেন—তোমার ছেলে সমস্ত শাসনের বাইরে চলে গেছে গান্ধারী—এষ গান্ধারী পুত্রস্তে দুরাত্মা শাসনাতিগঃ।

‘তোমার ছেলে’! খট করে যেন কানে লাগল গান্ধারীর। চিরকাল ছেলেকে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে যিনি মাথায় তুলেছেন, সেই মাথায় তোলার কুফল ফললে ভদ্রলোককেও এমন শুনতে হয়—‘তোমার ছেলে’। গান্ধারী তবু শুনে গেলেন। ধৃতরাষ্ট্র বললেন—ঐশ্বর্যের লোভে সে পাগল হয়ে গেছে। এখন বাকি ঐশ্বর্যও যাবে, প্রাণও যাবে। আর কী ব্যবহার! কাকে কী বলতে হয় জানে না, কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে জানে না। ভাল কথা বলা হল, কিন্তু সে তার অশিষ্ট বন্ধুদের নিয়ে সভা ছেড়ে চলে গেল—অশিষ্টবদ্ অমর্যাদঃ পাপৈঃ সহ দুরাত্মবান্।

গান্ধারী পুত্রের উদ্দেশে প্রথমে একবারমাত্র তিরস্কারবাণী উচ্চারণ করেই ধৃতরাষ্ট্রকে একহাত নিয়েছেন। বলেছেন—এখানে ছেলের থেকেও তোমাকেই বেশি নিন্দা করতে হয়, মহারাজ! তোমাকেই সকলে ছেলে-সর্বস্ব বলে জানে—ত্বং হ্যেবাত্র ভৃশং গর্হ্যো ধৃতরাষ্ট্র সুতপ্রিয়ঃ। এই ছেলের সম্পর্কে দুষ্কর্মগুলি জেনেও তুমি তারই বুদ্ধি অনুসারে চল। লোভ, ক্রোধ আর অহংকারে তার বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে। এতদিন তাকে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়েছ, আজকে তাকে জোর করে ঠিক পথে নিয়ে আসাটা অনেক কঠিন কাজ হবে—অশক্যো’দ্য ত্বয়া রাজন্ বিনিবর্তয়িতুং বলাৎ। দেখো, এখন কিছুতেই সেই মূর্খ তার স্বাদের জিনিস, রাজ্যটি ছেড়ে দেবে না। তার সঙ্গে জুটেছে তাকে উত্তেজনা জোগানোর মতো কুসহায়। এখন সেই লোভী দুরাত্মাকে আশ্রয় জোগানোর ফল পাবেন ধৃতরাষ্ট্র—দুঃসহায়স্য লুব্ধস্য ধৃতরাষ্ট্রো’শ্নুতে ফলম্।

গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে তিরস্কার করেছেন স্ত্রীসুলভ কোনও কপট কোপে নয়, রীতিমতো রাজনৈতিক তত্ত্বের কথা বলে তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, যা সময়কালে অনেক সহজেই তিনি করতে পারতেন, তাই না করার জন্য আজ এই বিপদ নেমে এসেছে। গান্ধারী বলেছেন—মধুর বাক্যে নাই হোক, কারণ দুর্যোধন সেটা সইতে পারবে না, কিন্তু পাণ্ডবদের আলাদা রাজ্য দিয়ে আলাদা করে দিয়েও যদি এই সমস্যা মেটানো যেত, তবে তাই করা উচিত ছিল—যা হি শক্যা মহারাজ সাম্না ভেদেন বা পুনঃ—এখন শুধু শুধু যুদ্ধের উন্মাদনায় কারও মত থাকতে পারে না। আর লোকেই বা তোমায় কী বলবে—তোমার আপন ভাইয়ের ছেলে, অতি নিকট স্বজন বলে কথা, তাঁদের সঙ্গে তোমার বিভেদ সৃষ্টি হল—তোমার এই কাণ্ড দেখে শত্রুরা হাসবে শুধু, আর কিছু নয়—ভিন্নং হি স্বজনেন ত্বাং প্রহসিষ্যন্তি শত্রবঃ।

গান্ধারী তাঁর পুত্রকেও ডেকে যথেষ্ট নিন্দা করেছেন, যথেষ্ট সাবধানবাণী শুনিয়েছেন, কিন্তু পাণ্ডবদের অসহায়তা এবং তাঁদের সঙ্গে আজকের এই যুদ্ধ-সম্ভাবনার মূলে যে

ধৃতরাষ্ট্রই আছেন—সে কথা তিনি একটুও রেখেঢেকে বলেননি। দুর্যোধন কারও কথা শোনেননি। সভা থেকে বেরিয়ে গিয়ে তিনি কৃষ্ণকে বন্দি করবার ফন্দি আঁটছিলেন। ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে গেলে কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে আবারও সাবধান করেছেন ভয়ংকর ফলাফলের জন্য। কৃষ্ণ বলেছেন—আপনার এই ছেলেগুলিকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে আমার সময় বেশি লাগবে না। আমি এক্ষুনিই এই পাপিষ্ঠগুলোকে বেঁধে নিয়ে পাণ্ডবদের হাতে তুলে দিতে পারি, আমার কাছে এটা কিচ্ছু না—নিগৃহ্য রাজন্ পার্থেভ্যো দদ্যাং কিং দুস্করং ভবেৎ। কিন্তু আমি তা করব না। আপনার সম্মানেই আপনার সামনে আমি কোনও ক্রোধের বিকার প্রদর্শন করতে চাই না।

ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের কথায় ভীষণ ভয় পেয়েছেন এবং দুর্যোধনকে সভায় ডেকে এনে যারপরনাই তিরস্কার করেছেন। কিন্তু দুর্যোধনকে শাস্তি দেবার মতো কিছু করেননি। কৃষ্ণকে অতঃপর বিশ্বরূপ দর্শন করাতে হয়েছে, যদিও তাতেও দুর্যোধনের বোধোদয় হয়নি। কৃষ্ণ কুরুসভা ছেড়ে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছেন এবং ধৃতরাষ্ট্র সেই মুহূর্তে তাঁর অসহায়তা জ্ঞাপন করেছেনমাত্র; অবশ্য সেই অসহায়তার মধ্যেও অন্ধ পুত্রস্নেহের পরিব্যাপ্তিই ছিল সবটুকু জুড়ে। পাণ্ডবরা যে শাস্তি পেয়েছেন বনবাসে আর অজ্ঞাতবাসে, এমন কোনও শাস্তি দুর্যোধনকে তিনি দিতে পারেননি, যা অনেকে চেয়েছিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের কাছে নিজের দোষ স্খালন করতে চেয়ে বলেছেন—ছেলের ওপর আমার কতটুকু প্রভাব, দেখলে তো? সামনাসামনিই দেখলে—প্রত্যক্ষং তে ন তে কিঞ্চিৎ পরোক্ষং শত্রুকর্ষণ। শান্তির জন্য আমার যতখানি করার, সে চেষ্টা আমি করেছি। আমাকে কিন্তু কোনওভাবেই দোষ দিয়ো না, বাছা—নাভিশঙ্কিতুমর্হসি। পাণ্ডবদের প্রতি আমার যে কোনও বিদ্বেষ নেই সেটা আমি নিশ্চিত বলতে পারি। আর আমার দিক থেকে আমি কত কথা বললাম দুর্যোধনকে, সে তো তুমি স্বচক্ষেই দেখলে—জ্ঞাতমেব হি তদ্‌বাক্যং যন্ময়োক্তঃ সুযোধনঃ। আর দুপক্ষের মধ্যে শান্তির জন্য আমার যে কত চেষ্টা, সেটা অন্যান্য কুরুপ্রধানরাও জানেন। কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের কথার জবাব দিয়েছেন বেশ কড়া করেই। তিনি বলছেন—দ্রোণ, ভীষ্ম, বিদুর এবং আপনি—এঁরা সকলেই জানেন আজকে কুরুসভায় কী ঘটেছে। আপনার অসভ্য ছেলেটি যেভাবে বার বার সক্রোধে সভাস্থল ছেড়ে চলে যাচ্ছিল, তাতেই বেশ বোঝা যায় আপনার ছেলের ওপরে আপনার কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই—বদত্যনীশমাত্মানং ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতিঃ। কৃষ্ণ এরপর ধৃতরাষ্ট্রের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কুন্তীর কাছে গেছেন ঘটনার বিবরণ দিতে।

সর্বত্র যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠল। যুদ্ধ হবেই। দু'পক্ষের হানাহানি আরম্ভ হওয়ার ঠিক আগে ব্যাস এলেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। ধৃতরাষ্ট্র চিন্তায় আকুল দেখে ব্যাস বললেন—দুঃখ কোরো না বৎস! কাল পরিপক্ক হয়েছে, ছেলেদের পারস্পরিক হানাহানি অনেক দেখতে হবে। অতএব দুঃখ কোরো না। যদি তুমি এই সংগ্রাম দেখতে চাও তো আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দিতে পারি। ধৃতরাষ্ট্র বললেন—আমি আর চক্ষু দিয়ে এই জ্ঞাতি-বধ দেখতে চাই না—ন রোচয়ে জ্ঞাতিবধং দ্রষ্টুং রাজর্ষিসত্তমঃ। আপনি এমন ব্যবস্থা করুন, যাতে আমি সব শুনতে পাই ঠিক ঠিক। ব্যাস সঞ্জয়কে দায়িত্ব দিয়ে গেলেন যুদ্ধের অনুপুঙ্খ বর্ণনা দেবার জন্য। সঞ্জয় দিব্য চক্ষু লাভ করলেন ব্যাসের প্রসাদে এবং ধৃতরাষ্ট্রের কারণেই সঞ্জয়কে আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রথম সার্থক ধারাভাষ্যকার হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।

মহামতি ভীষ্মের সেনাপতিত্বে কুরুক্ষেত্রের বিরাট যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। যুদ্ধ যতই এগোতে থাকল, কৌরবপক্ষের যতই ক্ষতি হতে থাকল, ধৃতরাষ্ট্রের ততই মনে হতে লাগল যে, পুরুষকারের বোধ হয় মূল্য নেই কিছু, সবটাই মানুষের অদৃষ্ট—দিষ্টমেব পরং মন্যে পৌরুষাদিতি মে মতিঃ। ভীষ্ম, দ্রোণের মতো মহাবীর থাকতেও স্বপক্ষের অনুকূল ফল পেতে কেন দেরি হচ্ছে, এটা খুব ভাল করে মেনে নিতে পারছেন না ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয়ের কাছে তিনি আপন পক্ষের সৈন্যদের ক্ষমতা বর্ণনা করেছেন। কত বেশি টাকা দিয়ে কত অস্ত্রকুশল সৈন্য সংগ্রহ করা হয়েছে, সেসব বিবরণ দিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন—এইরকম বিরাট এক সৈন্যবাহিনী, যা সংখ্যায় এবং গুণে সব চাইতে ভাল, সেই সৈন্যও পাণ্ডবদের হাতে যেভাবে হতাহত হচ্ছে, তাকে অদৃষ্ট ছাড়া আর কী বলব সঞ্জয়! সবকিছুই আমার কাছে একেবারে বিপরীত লাগছে—বিপরীতম্ ইদং সর্বং প্রতিভাতি হি সঞ্জয়।

সঞ্জয় বললেন—দৈবের দোষ নয়, মহারাজ! এ আপনারই দোষ। নিজের দোষেই আপনি এই বিপদ ডেকে এনেছেন—আত্মদোষাত্ত্বয়া রাজন্ প্রাপ্তং ব্যসনমীদৃশম্। আপনার দোষেই পাশাখেলার মতো সাংঘাতিক ব্যাপারটা ঘটেছিল এবং এই যে যুদ্ধ হচ্ছে, সেও আপনার দোষেই। আপনি নিজে যে পাপ করেছেন, তার ফল ভোগ করবেন আপনি নিজে—ত্বমেবাদ্য ফলং ভুঙ্‌ক্ষ্ব কৃত্বা কিল্বিষমাত্মনা। ধৃতরাষ্ট্র এখন আর সঞ্জয়ের কথাও তেমন করে বুঝতে পারেন না। তাঁর হাত থেকে এখন সব কিছু বেরিয়ে গেছে। একের পর এক সেনাপতি মারা যাচ্ছেন, একের পর এক ছেলেরা মারা যাচ্ছে, আর তিনি শুধু বিলাপ করে যাচ্ছেন, আর দুর্যোধনকে বৃথা দোষ দিয়ে যাচ্ছেন। সঞ্জয় তাঁকে বলেওছেন—দেখুন মহারাজ! বন্যা হয়ে গেলে সেতুর যে অবস্থা হয়, আপনার অবস্থাও ঠিক সেইরকম। শুধুমুধু কেঁদে কী হবে—বিলাপো নিষ্ফলং রাজন্। এত সুযোগ গেছে যুদ্ধ থামাবার, তার একটাও আপনি কাজে লাগাননি, এখন যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর আপনি পুত্রদের নানারকম দোষ দিয়ে যাচ্ছেন—যৎ পুনর্যুদ্ধকালে তু পুত্রান্ গর্হয়সে নৃপ। এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না।

কী করুণ অবস্থা ধৃতরাষ্ট্রের। শকুনি যখন পাশাখেলার একটি একটি বাজি জিতছিলেন, তখন ধৃতরাষ্ট্রের মনে কত জয়ের আনন্দ ছিল। প্রত্যেকবার বাচ্চাছেলের মতো জিজ্ঞাসা করছিলেন—এ বাজিটা জিতেছি কি? আর এখন কী বিপরীত অবস্থা। একে একে সব যাচ্ছে, স্বজন, আত্মীয়, প্রিয় পুত্রেরা একে একে। অথচ ধৃতরাষ্ট্র এখন প্রাণ খুলে বিলাপ করে কাঁদারও সুযোগ পাচ্ছেন না। বিলাপ করে কাঁদলেই সঞ্জয় বলেন—সব দোষই তো আপনার, কাঁদবেন না, স্থির হয়ে শুনুন এই যুদ্ধ-কথা—শুশ্রূষস্ব স্থিরো ভূত্বা তব হ্যপনয়ো মহান্।

এইভাবে ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করলেন। দ্রোণাচার্যের সেনাপতিত্বকালেও যখন একের পর এক তাঁর ক্ষতি হচ্ছে, তখন তিনি অনেকটা স্থির হয়েছেন। বুঝতে পারছেন পাশার দান এবার উলটো দিকে পড়ছে। সঞ্জয়কে বলছেন—বলো, সঞ্জয়! বলো। এসব

বিশেষ করে আমারই অন্যায়ের ফল ফলছে। তুমি বলো, সঞ্জয়! আমি স্থির হয়ে শুনছি—স্থিরীভূতো'স্মি সঞ্জয়। এরপরে দ্রোণাচার্যও মারা গেছেন। ধৃতরাষ্ট্রের তবু কিছু স্থিরতা ছিল। কিন্তু কর্ণ যখন মারা গেলেন, ধৃতরাষ্ট্র তখন আর নিজেকে সংবরণ করতে পারেননি। তিনি জানতেন—ভীষ্ম-দ্রোণ নয়, প্রধানত কর্ণের ভরসাতেই যুদ্ধে নেমেছেন দুর্যোধন—যমাশ্রিত্য মহাবাহুং...দুর্যোধনো' করোদ্ বৈরং পাণ্ডুপুত্রৈর্মহারথৈঃ।

কর্ণের মৃত্যুতে ধৃতরাষ্ট্র একেবারে ভেঙে পড়লেন। তবু যাও বা তাঁর ক্ষীণ আশা ছিল যে, ভীষ্ম-দ্রোণ যা পারেননি কর্ণ তা করে দেখাবেন। বিশেষত দুর্যোধন তো বটেই, এমনকী কর্ণও মাঝে মাঝে স্বাত্মারোপিত গর্বে ধৃতরাষ্ট্রকে এইরকম বুঝিয়েছিলেন যে, পাণ্ডবদের জয় করা কঠিন হবে না তাঁর পক্ষে। দুর্যোধনের হয়ে কর্ণ পূর্বে যত যুদ্ধ করেছেন, তাতে ধৃতরাষ্ট্রেরও আশা ছিল যে, শেষ পর্যন্ত জয়টা কর্ণের হাতেই আসবে। কর্ণ মারা গেলে তাই ধৃতরাষ্ট্রের শোক উদ্বেলিত হয়ে উঠল। লক্ষণীয় বিষয় হল, দুর্যোধন ছাড়া ধৃতরাষ্ট্রের অন্যান্য পুত্রেরা এমনকী দুঃশাসনও মারা যান কর্ণেরই সেনাপতিত্বকালে। তবু ধৃতরাষ্ট্র এই আশায় বুক বেঁধে বসেছিলেন যে, কর্ণ শেষ পর্যন্ত কৌরবদের বিজয়কেতন উড্ডীন করে তাঁকে এসে প্রণাম করবেন। কিন্তু হল না, কর্ণও মারা গেলেন। প্রথমে তো অজ্ঞানই হয়ে গিয়েছিলেন ধৃতরাষ্ট্র—পপাত জগতীপতিঃ। কিন্তু সংজ্ঞা হওয়ামাত্রই তাঁর বুক চিরে বেরিয়ে এসেছে অনন্ত বিলাপরাশি। শেষে এমনও বলেছেন—জ্ঞাতি-বন্ধু স্বজনদের এমন পরাভব দেখেও আমি ছাড়া আর কোন মানুষ বেঁচে থাকে, সঞ্জয়! বালকরা খেলা করবার বয়সে পাখি ধরে তার ডানাটা ছিঁড়ে ফেলে দেয়, তারপর পাখিটাকে ছেড়ে দেয়। পাখিটার আর চলবার শক্তি থাকে না। আমারও সেই দশা হয়েছে সঞ্জয়—বিসর্জয়ন্তি সংহৃষ্টা স্তাড্যমানাঃ কুমারকাঃ—আমাকে আমার জ্ঞাতিমিত্রের ডানা ছেঁটে ছেড়ে দিয়েছে ছেলেরা। আমি এখন কী করি, কোন দিকে যাই! এর থেকে আমার বিষ খাওয়াও ভাল ছিল সঞ্জয়, ভাল ছিল আগুনে পুড়ে মরা, জলে ডুবে মরা, অথবা পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া—বিষমগ্নি প্রপাতং বা পর্বতাগ্রাদহং বৃণে। আমি আর এ দুঃখ সইতে পারছি না।

শেষ পর্যন্ত দুর্যোধন, ধৃতরাষ্ট্রের প্রিয়তম পুত্র দুর্যোধনও ভীমের গদাঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তখন সূর্য অস্ত গেছে, কৃষ্ণ এবং পাণ্ডবরা হস্তিনাপুরের পথে রওনা দিলেন। প্রিয় পুত্রের ঊরুভঙ্গের সংবাদ জানাতে কৃষ্ণই প্রথম এলেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তিনি নিজেও কাঁদলেন অনেক। কৃষ্ণ অনেক বোঝালেন ধৃতরাষ্ট্রকে। পুত্রশোকে তিনি যেন পাথর হয়ে গেছেন তখন। ধৃতরাষ্ট্র যে কৃষ্ণের সান্ত্বনাবাক্য অনুধাবন করলেন না তা নয়, কিন্তু দুর্যোধন যেহেতু সারা জীবনই তাঁকে পাণ্ডব-বিদ্বেষে মদত জুগিয়ে গেছেন, তাই তাঁর মৃত্যুর পরেও সে বিদ্বেষ তাঁর যায়নি। কৃষ্ণ অনেক করে তাঁকে বুঝিয়েছেন যে, এই যুদ্ধের ঘটনায় বা মৃত্যুর ব্যাপারে পাণ্ডবরা কিন্তু মোটেই দায়ী নন, কিন্তু তবু পাণ্ডবরাই যে তাঁর শতপুত্র-হন্তা, সে কথা তিনি ভোলেননি এবং এটাই যেন তাঁর বিশ্বাস।

এর পরে যখন কৌরববধূরা স্বামীদের বা মৃত আত্মীয়দের তর্পণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন ধৃতরাষ্ট্র আবারও শোকসন্তপ্ত হয়েছেন। সঞ্জয় এবং বিদুর তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সঞ্জয়ের ভাষণে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি দোষারোপ প্রকট হওয়ায় সেটা ক্ষতে ক্ষারের কাজ করেছে। বিদুর কিন্তু হতপুত্র বৃদ্ধকে আর পূর্বকথা স্মরণ করিয়ে দেননি। প্রকৃষ্ট তত্ত্বকথা উপদেশ করে আধ্যাত্মিক উপায়ে তিনি ধৃতরাষ্ট্রের মনের কষ্ট দূর করার চেষ্টা করেছেন। বিদুর যেসব কথা বলেছেন, তাকে ভগবদ্‌গীতার সারাৎসার বলা যায়। ধৃতরাষ্ট্র, সেসব কথা শুনে খানিকটা শান্তি পেয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর প্রিয়তম পুত্রটিকে যে ব্যক্তি গদাঘাতে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে, তার প্রতি এখনও ধৃতরাষ্ট্রের ক্রোধ প্রশমিত হয়নি।

প্রেতকার্য হয়ে যাবার পর গঙ্গাস্নান সেরে পাণ্ডব-ভাইরা ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে দেখা করতে

এলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করার পরেই ধৃতরাষ্ট্র ভীমকে খুঁজতে লাগলেন। এই খোঁজাটাকে সহজভাবে নেননি কৃষ্ণ। পাণ্ডবরা যেখানে পর পর এসে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে আনত হবেন, সেখানে আলাদা করে ভীমকে খোঁজার মানে ছিল না বলেই এর মধ্যে তাঁর গূঢ় কোনও অভিসন্ধি কাজ করছে বলে কৃষ্ণ মনে করেছেন—দুষ্টাত্মা ভীমমন্বীপ্সন্ দিধক্ষুরিব পাবকঃ।

ধৃতরাষ্ট্রের ভাবেভঙ্গিতেই তাঁর ক্রোধের ইঙ্গিত মিলেছিল। সেটা বুঝেই কৃষ্ণ শেষ মুহূর্তে এক ঝটকায় হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন ভীমকে। বদলে দুর্যোধন যে লৌহভীমের অঙ্গে গদাপ্রহার করতেন, সেই ভীমটিকে এক মুহূর্তের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের আলিঙ্গনের পরিসরে এনে দিলেন কৃষ্ণ। ভীমের ওপর কত রাগ ছিল বৃদ্ধের যে, লৌহভীমও তাঁর চাপ সহ্য করতে না পেরে বিদীর্ণ হয়ে গেল। আমরা আগেই বলেছি ধৃতরাষ্ট্রের শারীরিক শক্তি ছিল অসম্ভব এবং সেই শক্তি কাজে লাগিয়েই ধৃতরাষ্ট্র ভীমকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেললেন। এদিকে লৌহভীম চূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র 'হা ভীম কোথা ভীম' বলে কেঁদে আকুল হয়েছেন—হা হা ভীমেতি চুক্রোশ নৃপঃ শোকসমন্বিতঃ। আসলে ভীমের ওপরে তাঁর যে রাগ ছিল, তা তথাকথিত ভীম-হত্যার সঙ্গে সঙ্গেই চলে গেছে, এখন তিনি নিজ কর্মের জন্যই অনুতাপগ্রস্ত।

আসলে ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রের এই হল প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি যে কাজটি করেন, তার ফলাফল নিয়ে সাময়িককালে তিনি একটুও ভাবেন না, পরে তার জন্য অনুতাপ করে মরেন। কৃষ্ণ যখনই বুঝলেন যে, লৌহভীম চূর্ণ করেই ধৃতরাষ্ট্রের ক্রোধ চলে গেছে,—তং বিদিত্বা গতক্রোধং—তখনই তিনি সান্ত্বনা দিলেন ধৃতরাষ্ট্রকে—ভীম মারা যায়নি, মহারাজ। আমি জানতাম যে, আপনার ক্রোধযুক্ত বাহুযুগলের মধ্যগত হলে রক্ষা নেই ভীমের। আমি তাই বুদ্ধি করে দুর্যোধনের তৈরি করা লোহার ভীমটি এগিয়ে দিয়েছি। আমি জানলাম—পুত্রশোকে আপনার ধর্মাধর্ম জ্ঞান লুপ্ত হয়েছে আপাতত এবং সেই জন্যই আপনি ভীমকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন—তব রাজেন্দ্র তেন ত্বং ভীমসেনং জিঘাংসসি।

কৃষ্ণ এবার সুযোগ পেলেন ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝিয়ে বলার। ধৃতরাষ্ট্রের মানসিক কুটিলতা এই মুহূর্তে এত তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে গেছে যে, তাঁকে প্রায় হাতেনাতে ধরে ফেলেছেন কৃষ্ণ। অতএব এই সুযোগ। কৃষ্ণ বললেন—মহারাজ! আপনি বেদ বেদাঙ্গ, ইতিহাস, পুরাণ অনেক শুনেছেন। রাজধর্মও আপনার অজানা নয়। কিন্তু সবকিছু জেনেবুঝেও যেখানে আপনার নিজেরই এত দোষ রয়েছে, সেখানে ভীমকে হত্যা করার মতো একটা ক্রোধ প্রদর্শন করলেন আপনি। এটা কি ঠিক হল—আত্মাপরাধাৎ কস্মাৎ ত্বং কুরুষে কোপমীদৃশম্। আপনার ছেলেকে আমরা অনেক বারণ করেছি, সে শোনেনি। যুদ্ধের ক্ষেত্রেও আপনাদের চেয়ে পাণ্ডবদের সামরিক ক্ষমতা অনেক বেশি ছিল, তাও আপনি অনুভব করেননি। যিনি রাজা হবেন, তাঁর নিজের ছিদ্রটা আগে দেখা উচিত, মহারাজ। আপনি নিজের দিকে তাকান। আপনি নিজেই কোনওদিন নিজের স্বেচ্ছানিঃসারিত সাময়িক বৃত্তিগুলিকে রোধ করতে পারেননি এবং চিরকাল তাই করে গেছেন যা আপনার ছেলে বলেছে—রাজংস্ত্বম্ অবিধেয়াত্মা দুর্যোধনবশে স্থিতঃ। দুর্যোধন পাঞ্চালী কৃষ্ণাকে সভাস্থলে নিয়ে এসে যে অন্যায় করেছিল, তারই ফল পেয়েছে ভীমের হাতে। আপনি কি সেসময় একটুও বারণ করেছিলেন তাকে? করেননি। তা হলে আপনার দোষ থাকা সত্ত্বেও কেন আপনি ভীমকে মারার চেষ্টা করছিলেন—আত্মপরাধাদাপন্নস্তৎ কিং ভীমং জিঘাংসসি।

ধৃতরাষ্ট্র নিজের দোষ স্বীকার করলেন—একেবারেই ঠিক কথাটি তুমি বলেছ, কৃষ্ণ! পুত্রস্নেহের কারণেই আমি সমস্ত ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমার ভাগ্য যে, তুমি বুদ্ধি করে ভীমকে আমার শক্তিশালী হাতদুটোর মধ্যে আসতে দাওনি—ত্বদ্‌গুপ্তো নাগমৎ কৃষ্ণো

ভীমো বাহ্বন্তরং মম। ধৃতরাষ্ট্র একটু লজ্জা পেয়েই বললেন—যা হবার হয়ে গেছে, আমার আর কোনও রাগ নেই জেনো। আমি মন থেকে বলছি—ভীমকে আমি স্পর্শ করতে চাই। কত কত বড় বড় রাজারা এই যুদ্ধের কারণে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন, আমার পুত্রেরাও কেউ বেঁচে রইল না। এখন পাণ্ডবদের ওপরেই আমার সব কিছু, সব শান্তি, সব ভালবাসা—পাণ্ডুপুত্রেষু বৈ শর্ম প্রীতিশ্চাপ্যবতিষ্ঠতে।

জ্যাঠামশাই আর ভাইপোদের মান-অভিমানের পালা মিটলে যুদ্ধভূমিতে এলেন সবাই। সেখানে যাঁরা মারা গেছেন, তাঁদের প্রেতকার্য করার জন্য চিন্তা আছে ধৃতরাষ্ট্রের। যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের মত নিয়ে মৃত ব্যক্তিদের সম্মান এবং পূজ্যতা অনুসারে দাহকার্য সম্পন্ন করলেন। তারপর গঙ্গায় মৃত ব্যক্তিদের জন্য তর্পণ করতে যাবার সময় যুধিষ্ঠির সবার সামনে রাখলেন ধৃতরাষ্ট্রকে, যাতে বৃদ্ধ মনে না করেন—আজ তাঁর ছেলেরা নেই বলে তাঁকে কেউ মানছে না—ধৃতরাষ্ট্রং পুরস্কৃত্য গঙ্গামভিমুখো'ভবৎ।

যুধিষ্ঠির তাঁর পিতৃতুল্য ধৃতরাষ্ট্রকে সামনে নিয়ে সমস্ত কাজ করছেন বটে, কিন্তু তাঁর মনে কোনও শান্তি নেই। স্বজন-আত্মীয়-বন্ধুদের বিয়োগে তিনি ধৃতরাষ্ট্রের চেয়ে কম সন্তপ্ত নন। এইরকম একটি শোক-কর্ষিত রাজ্যে তাঁকে রাজা হতে হবে—এই কথা ভেবে যুধিষ্ঠির মোটেই শান্তি পাচ্ছেন না। যাই হোক গঙ্গার জলে প্রেত ব্যক্তিদের জন্য স্নান-তর্পণ শেষ হলে বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি হাতে ধরে গঙ্গার জল থেকে তুলে আনলেন—ধৃতরাষ্ট্রং-মহাবাহু রুত্ততারাকুলেন্দ্রিয়ঃ। কিন্তু বৃদ্ধকে গঙ্গার তীরভূমিতে তুলে এনে যুধিষ্ঠির নিজেই প্রায় অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় শক্তিহীন হয়ে গেছে। এতদিন ধরে যুদ্ধবিগ্রহের আকুলতার পর গঙ্গাতে আত্মীয়স্বজনের জন্য 'গয়া-গঙ্গা-গদাধরো হরিঃ' করতে গিয়ে তিনি প্রথম শুনেছেন—কর্ণ তাঁর ভাই। এতেও তাঁর অতিসংবেদনশীল হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করেছে। নিদারুণ বৈরাগ্যে এখন তিনি রাজ্যপাট, সিংহাসন থেকে মুক্তি চাইছেন।

যুধিষ্ঠিরের বিপরীতে বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রের অবস্থা নিশ্চয়ই আরও শোচনীয়। কেন শোচনীয়, তাও সহজেই অনুমেয়। তাঁর এতগুলি সুযোগ্য পুত্র মারা গেছে, বিশেষত প্রিয়তম দুর্যোধন। আত্মীয়স্বজন কেউ বেঁচে নেই। যুদ্ধেও তাঁর পক্ষে জুটেছে শোচনীয় পরাজয়। তবু কিন্তু এই বৃদ্ধের 'স্ট্যামিনা' দেখার মতো। যুধিষ্ঠিরের হাত ধরে গঙ্গাতীরে উঠে তিনি যখন দেখলেন যে, যুধিষ্ঠিরই আর টাল রাখতে পারছেন না, তখন তিনিই শক্তি জোগালেন তাঁকে। যুধিষ্ঠির পড়ে গেছেন, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছাড়ছেন, ইন্দ্রিয়-মন সমস্ত ব্যাকুল। সমস্ত রাজন্যবর্গ এবং পাণ্ডব-ভাইরা তাঁর দিকে তাকিয়ে চিন্তিত হচ্ছেন, আর ঠিক সেই সময়ে নিজে পুত্রশোকে ক্লিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে বলে উঠলেন—ওঠো যুধিষ্ঠির! ওঠো। তুমি না মহান ক্ষত্রিয়ধর্মের গৌরবে এই পৃথিবী জয় করেছ। এখন তোমার কাজ হল ভাইদের নিয়ে, মনোমতো বন্ধুদের নিয়ে এই পৃথিবী ভোগ করা। তুমি বাছা এমন শোক করছ কেন? তোমার তো শোক করার মতো কিছু ঘটেনি—শোচিতব্যং ন পশ্যামি ত্বয়া ধর্মভৃতাং বরঃ।

ধৃতরাষ্ট্র, শতপুত্রের মরণক্লিষ্ট ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে সোৎসাহে জানিয়েছেন—কারও যদি শোকগ্রস্ত হওয়ার দায় থাকে, সে শুধু আমার এবং এই গান্ধারীর—শোচিতব্যং ময়া চৈব গান্ধার্য্যা চ বিশেষতঃ। আমাদের একশত পুত্র মারা গেছে। স্বপ্নলব্ধ সম্পত্তি যেমন নষ্ট হয়ে যায়, তেমনই করেই যেন আমার ছেলেরা স্বপ্নে দেখা দিয়ে আমার কাছ থেকে চলে গেল। বিদুর আমাকে কত বুঝিয়েছিলেন, কিন্তু সেসব কথায় আমি একটুও কান দিইনি। কতবার সে বলেছে—এই দুর্যোধনের জন্য এ বংশের সর্বনাশ হবে, এ ছেলেকে আপনার মেরে ফেলাও ভাল। কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন—এদের সম্বন্ধেও বিদুর আমাকে অনেক সাবধান করেছে। এমনকী সে এও বলেছে যে, আপনি এদের সবাইকে তাড়িয়ে দিয়ে কুমার যুধিষ্ঠিরকে রাজা করুন। কিন্তু যুধিষ্ঠির! বিদুর এত কিছু বললেও কুপুত্রের স্নেহে অন্ধ আমি

দুর্যোধনেরই পিছন পিছন চলেছি—দুর্যোধনমিমং পাপমন্ববর্তং বৃথামতিঃ—এবং তার ফলও পাচ্ছি। কত শোক-তাপ আমি পেয়েছি, সে তো তুমি দেখতেই পাচ্ছ, যুধিষ্ঠির! কাজেই বাছা! তুমি আর কোনও কষ্ট পেয়ো না। আমরা দুই বুড়ো-বুড়ি তোমার পিতা-মাতার মতো। আমরা এমনিতেই অনেক কষ্ট পাচ্ছি—বৃদ্ধৌ হি তে'দ্য পিতরৌ পশ্য তৌ দুঃখিতৌ নৃপ। এরমধ্যে আবার তুমি কষ্ট পেলে আমরা কোথায় যাই বলো।

যুধিষ্ঠিরের মানসিক বৈকল্য যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে, তখন শোকস্তব্ধ এই বৃদ্ধের মুখে এমন সযৌক্তিক কথা আমাদের শুধু অবাকই করে না, একইসঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের মানসিক শক্তির কথাও আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। ধৃতরাষ্ট্র, ব্যাস, এবং কৃষ্ণের কথায় শেষপর্যন্ত যুধিষ্ঠির রাজ্য গ্রহণ করলেন। সেকালের ধর্মীয় সংস্কারে রাজারা ভাবতেন যে, অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে যুদ্ধের পাপ চলে যায়, যুধিষ্ঠির তাই সকলের পরামর্শ নিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন। কিন্তু পুরো সময়টা জুড়ে কেমন ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র—এ প্রশ্নটা আমাদের মনে যেমন জাগছে, তেমনই জাগছে পাণ্ডব-বংশধর জনমেজয়ের মনেও। তিনি মহাভারত শুনছেন রাজসভায় বসে, যুধিষ্ঠিরের পরম্পরাপ্রাপ্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আমাদের মতোই তিনি প্রশ্ন করছেন—আমার পাণ্ডব-পিতামহরা রাজ্য পাবার পর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতেন—কথমাসন্ মহারাজ্ঞি ধৃতরাষ্ট্রে মহাত্মনি।

জনমেজয়ের এই প্রশ্ন তুলবার কারণ আছে। আমরা এই প্রবন্ধের আরম্ভে পূর্ববঙ্গবাসী এক বড় দাদার কীর্তি বর্ণনা করেছিলাম। সব জায়গায় বঞ্চিত হয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত ছোট ভাইয়ের আশ্রয়ে এসে সুখে ছিলেন। এখানেও জনমেজয় প্রশ্ন করছেন—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রয় বলতে তো আর কিছুই ছিল না। তাঁর পুত্রেরা মারা গেছেন, মন্ত্রী অমাত্যেরা কেউ বেঁচে নেই, ধনৈশ্চর্যও সব গেছে। তিনি তো একেবারেই নিরাশ্রয়—স তু রাজা হতামাত্যো হতপুত্রো নিরাশ্রয়ঃ। তা তিনি আমার পিতামহদের আশ্রয়ে কেমন ছিলেন, কতদিনই বা ছিলেন।

মহাভারতের কথকঠাকুর উত্তর দিচ্ছেন—ভালই ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। অন্তত তাঁর সম্মান নিয়ে কোনও সমস্যা হয়নি। মহারাজ যুধিষ্ঠির আগে যেমন সর্বকর্তৃত্বময় রাজার সম্মান দিতেন তাঁকে, এখনও তাই দেন। যে কাজই পাণ্ডবরা করতেন, তা ধৃতরাষ্ট্রের মত নিয়েই করতেন—ধৃতরাষ্ট্রং পুরস্কৃত্য পৃথিবীং পর্যপালয়ন্। যেন তাঁর এমন মনে না হয় যে, আজ তাঁর ক্ষমতা নেই বলে কেউ তাঁকে গ্রাহ্য করছে না। ধৃতরাষ্ট্রের সুখ দুঃখের কথা শোনার জন্য, তাঁকে সর্বক্ষণ দেখাশোনা করার জন্য তিনটি মানুষ সদাই তটস্থ থাকতেন। একজন মহামতি বিদুর, একজন প্রাজ্ঞ সারথি সঞ্জয়, আর তৃতীয়জন ধৃতরাষ্ট্রের একটি পুত্র। ভাবতে অবাক লাগে এখনও একটি পুত্র জীবিত আছেন ধৃতরাষ্ট্রের। এই পুত্রটি গান্ধারীর গর্ভজাত নন, ইনি সেই বৈশ্যার গর্ভে জন্ম নেওয়া ধৃতরাষ্ট্রের ঔরস-সন্তান যুযুৎসু। দুর্যোধন-দুঃশাসনের কূটবুদ্ধি এবং অসভ্যতা তাঁর ছিল না। যুযুৎসু অতীব সজ্জন মানুষ এবং দুর্যোধনের অন্যায়-অবিচার সহ্য করতে না পেরে মহাযুদ্ধের পূর্বেই তিনি পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন এবং সেই জন্যই এখনও বেঁচে আছেন। তিনি সদাসর্বদা নজর রাখতেন ধৃতরাষ্ট্রের ওপর।

পাণ্ডবরা প্রত্যেকে—শুধু ভীমসেন ছাড়া—প্রত্যেক কাজে ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নিতেন এবং অনুমতি পেলেই তবে সে কাজ করতেন—পাণ্ডবাঃ সর্বকার্যাণি সংপৃচ্ছন্তি স্ম তং নৃপম্। সকালবেলা উঠেই প্রত্যেক পাণ্ডবের কাজ ছিল ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করে আসা এবং এটাই ছিল ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নির্দেশ। পুরুষমহলে যেমন বিদুর-সঞ্জয়-যুযুৎসুরা ধৃতরাষ্ট্রের সদা-সহায় ছিলেন, মেয়েমহলে তেমনই কুন্তী-দ্রৌপদী-সুভদ্রারা দেখে রাখতেন গান্ধারীকে। ধৃতরাষ্ট্রের রাজোচিত বিলাস-ব্যসনেরও কোনও অভাব রাখেননি যুধিষ্ঠির। দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যা, সুচিক্কণ বস্ত্র, স্বর্ণময় আভরণ এবং রাজোচিত ভক্ষ্য-ভোজের সুব্যবস্থায়

ধৃতরাষ্ট্রের কখনও মনে হয়নি যে, তিনি রাজা নন। ভাল রান্না করতে পারে এমন সূপকার তো ছিলই, কিন্তু বুড়ো বয়সে গুরুভোজন সহ্য হয় না, ভালও লাগে না, অতএব এমন একজন ‘স্পেশালিস্ট’ সবজি-রাধুনে ছিলেন, যিনি বিভিন্ন প্রকার সবজি রান্না করে দিতেন ধৃতরাষ্ট্রকে। একজন ছিলেন, যিনি পিপুল-শুঠের সঙ্গে কিঞ্চিৎ চিনির সহযোগে মুগডালের ‘যূষ’ রান্না করে দিতেন ধৃতরাষ্ট্রকে। মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্রের এই তিন প্রকার রাধুনের পারিভাষিক নাম হল—আরালিকাঃ সুপকারা রাগখাণ্ডবিকাস্তথা। বৃদ্ধ বয়সে স্বল্প পরিমাণ মদ্যপান করলে শরীর চনমনে থাকে, সেই জন্যই হোক, অথবা এতকালের রাজার অভ্যাস —সেই জন্যই হোক, কিঞ্চিৎ মৈরেয়মার্কা মদ্যের সঙ্গে ভর্জিত মৎস্য অথবা মাংসের অনুপান—মৈরেয়-মৎস্য-মাংসানি পানকানি মধূনি চ—সেগুলিও ঠিক একইভাবে যোগানো হত, যেমনটি আগে ছিল।

এ সব কিছুই যুধিষ্ঠিরের নির্দেশ। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে এমনভাবেই রেখেছিলেন, যাতে এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর মনে না হয় যে, আগে আমি রাজা বলে যে সুযোগ পেয়েছি, এখন তা নেই। একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মান যেভাবে দেওয়া যায়—যেমন গণতান্ত্রিক ভারতে রাষ্ট্রপতির যে ক্ষমতা, ধৃতরাষ্ট্রের ক্ষমতাটা ছিল অনেকটা ওই পর্যায়ের। কোনও সামন্ত রাষ্ট্র বা প্রতিবেশী রাষ্ট্র যদি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে সুযোগ সুবিধা প্রার্থনা করত, তা হলে ধৃতরাষ্ট্রের উচ্চারণমাত্রেই সেইসব সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হত। অন্যায় আচরণ করার জন্য যাকে কারাবন্দি করা হয়েছে, তার আত্মীয়স্বজনরা যদি এসে ধৃতরাষ্ট্রকে ধরত—হুজুর আপনি ব্যবস্থা করুন, এবং ধৃতরাষ্ট্র যদি কৃপাপরবশ হতেন, তা হলে তার বন্দিদশার মুক্তি ঘটত। যার ফাঁসির হুকুম হয়েছে, যে যদি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে মৃত্যুদণ্ড প্রত্যাহারের আবেদন করত, তা হলে ধৃতরাষ্ট্র মনে করলে তার ফাঁসির হুকুম রদ করা হত—অকরোদ্ বন্ধ-মোক্ষঞ্চ বধ্যানাং মোক্ষণং তথা।

ধৃতরাষ্ট্রকে এমন রাষ্ট্রপতির মর্যাদা দিয়ে রেখেছিলেন যুধিষ্ঠির স্বয়ং। যে বন্দির মুক্তি হওয়ার কথা নয় অথবা যে আসামির মৃত্যু থেকে বাঁচবার কথা নয়, তাকেও যখন করুণাপরবশ হয়ে মুক্তির আদেশ দিতেন ধৃতরাষ্ট্র, তখন রাষ্ট্রগতভাবে কিছু অসুবিধা হওয়ারই কথা। কিন্তু যেহেতু বৃদ্ধ পিতা ধৃতরাষ্ট্র বলেছেন, অতএব যুধিষ্ঠির সেখানে একটি কথাও বলতেন না—ন চ ধর্মসুতো রাজা কদাচিৎ কিঞ্চিদ্ অব্রবীৎ। বুড়ো হয়েছেন অতএব ঘরে বসে থাকুন—এমন কথাও কখনও আসেনি যুধিষ্ঠিরের তরফ থেকে। সময়কালে হাতে ভালরকম টাকাপয়সা নিয়ে এদিক ওদিক ভ্রমণ করে আসাটাও ধৃতরাষ্ট্র ইচ্ছেমতো করতে পেরেছেন যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে—বিহারযাত্রাসু পুনঃ...সর্বান্ কামান্ মহাতেজাঃ প্রদদাবম্বিকাসুতে।

বেশ বোঝা যাচ্ছে—ভালই ছিলেন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র। নিজের পুত্রের আমলেও তিনি বোধ হয় এত স্বাধীনতা পাননি, যা এখন পাচ্ছেন অথবা বলা যায়—নিজে রাজা থাকার সময় তিনি যে সুখ, যে বিলাস-ব্যসন ভোগ করেছেন—যাবদ্ধি কুরুবীরস্য জীবৎপুত্রস্য বৈ সুখম্। বভূব তদাপ্নোতি—তিনি সে সবই ভোগ করছেন এখনও। মহারাজ যুধিষ্ঠির—ভাইদের ডেকে, মন্ত্রী অমাত্যদের ডেকে কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে আমি যেমন মান্যি করে চলি, তোমরাও তাই করবে। ধৃতরাষ্ট্র যেমনটি বলবেন, তেমনটি যদি কর, তবে জানবে সে আমার বন্ধু, আর এর বিপরীত হলে আমি তাকে শত্রু বলে গণ্য করব। ধৃতরাষ্ট্র ব্রাহ্মণদের দানধ্যান করবেন, আর্থিক নির্দেশ দেওয়াই আছে, তিনি যজ্ঞযাগ করবেন তার ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক দায়দায়িত্ব মেটানোর সমস্ত নির্দেশ আগে থেকেই দিয়ে রেখেছেন যুধিষ্ঠির।

ধৃতরাষ্ট্রও বুঝতেন যে, যুধিষ্ঠির কতটা অনুভব করেন তাঁর জন্য। তাঁর অন্য কোনও কষ্ট ছিল না। পাণ্ডবদের ব্যবহারে তিনিও অত্যন্ত প্রীত ছিলেন। কিন্তু এত সুখ এবং সম্মানের

মধ্যেও মাত্র একটি ব্যবহার ক্ষুদ্র কণ্টকের মতো তাঁকে বিদ্ধ করত। এই ব্যবহার মধ্যম পাণ্ডব ভীমের। যুধিষ্ঠির বা অন্য ভাইদের সামনে ভীম কোনও খারাপ ব্যবহার করতেন না ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে। এমনকী সকালবেলায় তাঁকে প্রণাম করতে যাবার সময় অথবা ধৃতরাষ্ট্র কোনও নির্দেশ দিচ্ছেন, সেটা মেনে নেবার ব্যাপারে ভীম সবার সঙ্গে একই ব্যবহার করছেন। কিন্তু ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আড়াল হলেই ভীম কিন্তু অন্যরকম ব্যবহার করছেন ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে। আসলে ভীম পূর্বের কষ্ট ভুলতে পারেননি। বনবাসে যাবার সময়ে পর্যন্ত দুর্যোধন-কর্ণরা তাঁকে 'গোরু' 'গোরু' বলে ডেকেছিলেন, তার ওপরে দ্যূতসভার সেই অসভ্য ব্যবহার—এগুলি ভীম ভুলতে পারেননি—নহি তত্তস্য বীরস্য হৃদয়ান্নাপসর্পতি। আরও ভুলতে পারেননি, কারণ দুর্যোধনের এই সমস্ত অপকর্মই ঘটেছিল ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্রয়ে। ধৃতরাষ্ট্র একবারের তরেও দুর্যোধনকে বারণ করেননি যে—ভীমকে এমনভাবে অপমান কোরো না। ভীম তাই আড়ালে আবডালে ধৃতরাষ্ট্রকে কথা শোনাতে ছাড়তেন না।

মহারাজ যুধিষ্ঠির বা অন্যান্য পাণ্ডব-ভাইদের বিনীত ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীত ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। কোনও ব্যাপারে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের প্রতি অপ্রসন্ন ছিলেন না—ন দদর্শ তদা কিঞ্চিদ্ অপ্রিয়ং পাণ্ডুনন্দনে। এতদিনে বৃদ্ধের অনুতাপ হয়—দুর্যোধনকে প্রশ্রয় না দিলেই তিনি ভাল করতেন। পাণ্ডবদের আচারে ব্যবহারে তিনি এতই সন্তুষ্ট হয়েছেন যে, সকালবেলায় উঠে স্নান ধ্যান সেরে এখন প্রতিদিন তিনি পণ্ডবদের মঙ্গলকামনা করেন, দেবতার কাছে সর্বদা প্রার্থনা করেন যাতে পাণ্ডবরা যুদ্ধে কখনও কোনও শত্রুর কাছে পরাজিত না হন—আশাস্তে পাণ্ডুপুত্রাণাং সমরেষ্বপরাজয়ম্। ধৃতরাষ্ট্রের জীবন এখন শান্তিতে ভরে গেছে। তিনি মনেপ্রাণে অনুভব করেন যে, তাঁর ছেলেরাও বেঁচে থাকতে এত সুখ ধৃতরাষ্ট্রকে দেয়নি, যা তাঁকে এই পাণ্ডুপুত্রেরা দিয়েছে—যাং প্রীতিং পাণ্ডুপুত্রেভ্যঃ সদাবাপ নরাধিপঃ।

যুধিষ্ঠিরের জ্বালায় কারও কিছু বলার উপায় ছিল না ধৃতরাষ্ট্রকে। কারও এমন সাহসও ছিল না যে, কোনওভাবে ধৃতরাষ্ট্রের সম্বন্ধে কটু কথা বলে পার পাবে। ধৃতরাষ্ট্র কেন, ধৃতরাষ্ট্র যেহেতু দুর্যোধনের নিন্দা শুনলে দুঃখ পাবেন, তাই দুর্যোধনেরও নিন্দা করা চলত না ধৃতরাষ্ট্রের সামনে—ন রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্য ন চ দুর্যোধনস্য বৈ। যদি কেউ এই ভাবে না চলতেন, তবে যুধিষ্ঠিরের শত্রুই হয়ে যেতেন তিনি। কিন্তু একমাত্র মুশকিল হয়েছে ভীমকে নিয়ে। বড় দাদা তথা রাজা যুধিষ্ঠিরের কথামতো ভীম ধৃতরাষ্ট্রের অনুবর্তন করতেন বটে, কিন্তু দাদার এই নির্দেশ মানতে তাঁর মন চাইত না—অন্ববর্তন্ত কৌরব্যো হৃদয়েন পরাঙ্মুখঃ। ভীমের কেবলই মনে হত—এই লোকটা তাদের জতুগৃহে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল, এই লোকটা পাশাখেলার কপটতায় প্রশ্রয় দিয়ে দ্রৌপদীর অপমান ঘটিয়েছিল এবং এই লোকটাই তাদের বনবাসে পাঠাতে চেয়েছিল। অন্যদিকে ভীমের এই মানসিকতা যখন কাজ করছে, তখন ধৃতরাষ্ট্রও কিন্তু ভীমকে কখনও মন থেকে ক্ষমা করতে পারেননি। দুর্যোধনের কথা যখনই তাঁর মনে হয়, তখনই ধৃতরাষ্ট্র ভাবেন—এই লোকটাই তাঁর পুত্রকে বধ করেছে ঊরুভঙ্গ করে—তদা ভীমং হৃদা রাজন্ অপধ্যাতি চ পার্থিবঃ।

আমাদের আধুনিক কথ্য ভাষায় যাকে বলে 'চাপা মার', ভীম সেই ব্যবহারটাই করতেন ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সামনাসামনি তিনি নেহাতই ভদ্রলোক, কিন্তু আড়ালে তিনি ধৃতরাষ্ট্রের অপ্রিয় কাজ করে নিজের পূর্ব-প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করতেন—অপ্রকাশন্যপ্রিয়ানি চকারাস্য বৃকোদরঃ। ধৃতরাষ্ট্রের সেবাদাস ছিলেন যাঁরা, তাঁরা হয়তো ধৃতরাষ্ট্রের কথামতো কিছু করতে যাচ্ছেন বা কিছু আনতে যাচ্ছেন, ভীম তাঁদের কাজ থেকে নিবৃত্ত করে মজা দেখতেন—আজ্ঞাং প্রত্যাহরচ্চাপি কৃতকৈঃ পুরুষৈঃ সদা।

ভীমের আরও একটা বদভ্যাস ধৃতরাষ্ট্রের সামনেই বেশি প্রকটিত হত। মাঝে মাঝেই তিনি ধৃতরাষ্ট্রের সামনে নিজের পেশিবহুল হাতের গুলি দেখাতেন, মাঝে মাঝেই তাঁর সামনে

বন্ধুবান্ধবকে দেখিয়ে দেখিয়ে বগল বাজিয়ে নিজের শক্তি প্রদর্শন করতেন—অথ ভীমঃ সুহৃন্মধ্যে বাহুশব্দং তথাকরোৎ। ধৃতরাষ্ট্রের সামনেই ভীম দুর্যোধনের নাম করে নানা অপকথা বলতেন। দুর্যোধনের চরিত্রেও যেহেতু ভীমের প্রতি বিদ্বেষ ছিল চরম, তাই তাঁর অপকর্মগুলি, বিশেষত তিনি জীবনে যেসব ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেগুলি সবিস্তারে বলতে বলতে হাততালি দিয়ে উঠতেন ভীম। ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর সামনে যখন অন্যান্য লোকেরা রয়েছে—সে কর্মকরই হোক অথবা বাইরের লোক—ভীম তাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন—আমার এই হাতদুটো দেখেছিস তো শক্ত কাঠের খুঁটি ছাড়া আর কিছু নয়, অন্ধ রাজার ছেলেরা সব এই হাতদুটোর মাঝখানে এসে পড়েই যত গোলমাল করল। ওপারে চলে যেতে হল জীবনের মতো—যাবাসাদ্য রণে মূঢ়া ধার্তরাষ্ট্রাঃ ক্ষয়ং গতাঃ।

ভীম তাঁর চন্দন-কুঙ্কুমে অঙ্কিত হাতদুটি দেখিয়ে চিৎকার করে বলতেন—আরে এই হল সেই চন্দনমাখা হাতদুটো, সত্যিই তো চন্দনটন্দন দিয়ে পুজো করা উচিত এই হাতদুটোকে—চন্দনার্হৌ চ মে ভুজৌ—কেননা এই হাতদুটোই দুর্যোধনকে আত্মীয়বন্ধু সহযোগে যমের মুখ দেখিয়েছে—যাভ্যাং দুর্যোধনো নীতঃ ক্ষয়ং সসুতবান্ধবঃ। এইরকম একটা দুটো কথা নয়, আরও পাঁচরকম কথা ধৃতরাষ্ট্রকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন ভীম। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এসব কটুকথার বিন্দুবিসর্গ জানতেন না—নান্ববুধ্যত তদ্রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ—জানতেন না অর্জুন, দ্রৌপদী, কুন্তী কিংবা অন্যান্য ভাইয়েরা। অন্যদিকে বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষেও এমন ছেলেমানুষি করা সম্ভব ছিল না যে, তিনি যুধিষ্ঠিরের কাছে নালিশ করবেন ভীমের সম্বন্ধে।

দুর্যোধনের মৃত্যু বা যুধিষ্ঠিরের রাজা হবার পর পনেরো বছর কেটে গেছে। যুধিষ্ঠিরের দেওয়া অনন্ত সুখের মধ্যে ভীমের এই কটুকথার কাঁটাগুলি ধৃতরাষ্ট্রকে আস্তে আস্তে সংসার-বিরাগী তুলল—রাজা নির্বেদমাপেদে ভীমবাগ্‌বাণপীড়িতঃ। একদিন তিনি স্বজন-সুহৃৎদের ডেকে এবং অবশ্যই যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করে বললেন—আপনারা সব জানেন কীভাবে এই কুরুবংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে আমার অপরাধ কিছু কম নয়। আমি তাদের প্রশ্রয় দিয়েছি এবং সেই প্রশ্রয় পেয়েই দুর্যোধন এক সময় কৌরবদের আধিপত্য লাভ করেছিল। আমি ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, কৃষ্ণ এমনকী পিতা ব্যাসের কথাও কান দিয়ে শুনিনি। তাঁরা পদে পদে আমাকে অন্যায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—পদে পদে ভগবতা ব্যাসেন চ মহাত্মনা।

ধৃতরাষ্ট্র আজকে সত্যিই অনুতাপগ্রস্ত। সকলের সামনে তিনি আজ অপরাধ স্বীকার করে ভারমুক্ত হতে চাইছেন। ধৃতরাষ্ট্র বললেন—আমার সুহৃৎ-সজ্জনেরা অনেক বলা সত্ত্বেও আমি এই গুণবান পাণ্ডবদের হাতে তাঁদের পিতৃ-পিতামহের পরম্পরাপ্রাপ্ত রাজ্যখণ্ড তুলে দিইনি—ন দত্তবান্ শ্রিয়ং দীপ্তাং পিতৃপৈতামহীম্ ইমাম্। অনেক অন্যায়, অনেক পাপ, অনেক দুঃখ আমার এই হৃদয়ে জমা হয়ে আছে। সেইসব পাপের শুদ্ধির জন্য আমার এই শেষ বয়সে আমি কিছু নিয়ম-ব্রত পালন করতে চাই। আজ পনেরোটা বছর হয়ে গেল—মহারাজ যুধিষ্ঠির আমার জন্য অনেক কষ্ট করেছেন। তাঁর পরিজন আজ্ঞাকারীরা সব সময় আমার দেখাশোনা করেছে। কিন্তু আমার এখন উচিত বৈরাগ্য অবলম্বন করা, জাগতিক তৃষ্ণার নিবৃত্তি ঘটানো—তৃষ্ণা-বিনয়নং ভুঞ্জে। আমার যা বয়স হয়েছে, তাতে বৈরাগ্যের বিধানে আমার উচিত ভূমিতে শয়ন করা, অজিন পরিধান করে কুশাসনের ওপর বসে জপযজ্ঞে দিন কাটাতে চাই আমি—ভূমৌ শয়ে জপ্যপরো দুর্ভৈর্ষ্বজিনসংবৃতে।

ধৃতরাষ্ট্রের বৈরাগ্য এসেছে। আমাদের ধারণা—আসত না, তবু এসেছে। সাধুসন্তদের মুখে ছোটবেলায় শুনেছি—সংসার-বৈরাগ্য নানাভাবে আসে। কেউ আজন্ম বৈরাগী, তাঁর জন্য পৃথিবী আপনিই সেজে বসে থাকেন। বনের ফল আর নদীর জল দিয়ে জননী বসুন্ধরা তাঁর সেবা করেন। কারও ভগবৎকৃপায় বৈরাগ্য আসে, কারও বা সাধুমহান্তের কৃপায়। আর বৈরাগ্য আসে ঠেলায় পড়ে, যাকে ঠেলার নাম বাবাজি বলি। সংসারে স্ত্রী-পুত্রের গঞ্জনা

সইতে না পেরে বৈরাগ্য আসে। এক মহান ব্যক্তির কথা শুনেছি, তিনি সংসারে স্ত্রী-পুত্রের কাছে লাথিঝাঁটা খেলেই বলতেন—তোমরা আমার ভগবত-ভজনের পরম সহায়, পরম উপকারী। তোমরা এমন করে গঞ্জনা দাও বলেই ভগবানের কথা আমার এত মনে পড়ে, তাঁর করুণার জন্য এত আর্তি হয়।

যুধিষ্ঠিরের লালনে পালনে পরিষেবায় ধৃতরাষ্ট্র যেমন সুখে ছিলেন, তাতে এই পনেরো বছরে তাঁর তৃষ্ণার নিবৃত্তি হত বলে মনে হয় না। কিন্তু মহাভারতের কবি লিখেছেন—ভীমের বাক্যবাণেই তাঁর বৈরাগ্য উদয় হল। অর্থাৎ এক অর্থে ভীমের দিক থেকে ব্যাপারটা যতই খারাপ হোক, ওই ভীমই কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের সাধন-সহায়। ধৃতরাষ্ট্র নিজের মতো করেই একটা সান্ত্বনা খুঁজে নিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন—আমার ছেলেরা সব মারা গেছে। তা যাক, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সম্মুখসমরে মৃত্যুই তো পরম গতি, তার জন্য আর আমার অনুশোচনা নেই—নানুতপ্যামি তাচ্চাহং ক্ষত্রধর্মং হি তে বিদুঃ। ধৃতরাষ্ট্র এবার হৃদয়ের গভীর থেকে কৃতজ্ঞতা জানালেন যুধিষ্ঠিরকে। বললেন—তোমার কাছে তোমার তত্ত্বাবধানে এতকাল বড়ই সুখে ছিলাম, বাছা—সুখমস্মি-উষিতঃ পুত্র ত্বয়া সুপরিপালিতঃ। তোমার জন্য আমার দানধ্যান যজ্ঞাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করার কোনও অসুবিধে ঘটেনি। তুমি রাজা, তুমি সকলের গুরুস্বরূপ, এখন তুমি যদি অনুমতি কর তবে এই পুত্রশোকাতুরা গান্ধারীকে নিয়ে আমি বানপ্রস্থ অবলম্বন করতে পারি—অনুজ্ঞাতস্ত্বয়া বীর সংশ্রয়েয়ং বনান্যহম্।

যুধিষ্ঠির মোটেই সুখী হলেন না। ধৃতরাষ্ট্র বনে যেতে চাইলে তিনি একেবারে বালকের মতো কাঁদতে কাঁদতে বললেন—এই রাজ্যপাট আমার একটুও ভাল লাগে না। আপনি আমাদের পিতা-মাতা, আপনিই আমাদের প্রথম গুরু। আপনাকে ছাড়া এ রাজ্যে আমি বাস করতে পারব না। আপনি ছাড়া কার কাছেই বা আমরা সমস্ত বিষয়ে সৎপরামর্শ পাব—ভবতা বিপ্রহীণা বৈ কং তু তিষ্ঠামহে বয়ম্। যুধিষ্ঠির বললেন—আপনি বরং আপনার ঔরস পুত্র যুযুৎসুকে রাজ্য দিয়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন। কারণ এ রাজ্যের রাজা মোটেই আমি নই, আপনিই এই কুরুরাষ্ট্রের আসল রাজা, আমরা সকলেই আপনার অধীন—নাহং রাজা ভবান্ রাজা ভবতঃ পরবানহম্। দুর্যোধন যা করেছে, তার জন্য আমার মনে একটুও রাগ নেই, পিতা। কিন্তু যেমন দুর্যোধন আপনার পুত্র, আমরাও তেমনই আপনার পুত্র। আমার জননী কুন্তী এবং গান্ধারীকে আমি কোনও দিন আলাদা করে ভাবিনি। অতএব আপনি পিতা হয়ে যদি আমাকে ছেড়ে চলে যান, তবে জানবেন—আমিও আপনার পিছন পিছন বনে চলে যাব—পৃষ্ঠতস্ত্ত অনুযাস্যামি সতjমাত্মানমালভে।

যুধিষ্ঠিরের আন্তরিকতায় কোনও ত্রুটি ছিল না। কিন্তু শোকতাপ-দগ্ধ বৃদ্ধের তখন সত্যিই সংসারে নির্বিণ্ণতা এসেছে। ধৃতরাষ্ট্রও আন্তরিকভাবে বুঝিয়ে বললেন—মনটা আমার সত্যিই তপস্যা-বৈরাগ্যের দিকে চলে গেছে, বাছা! তা ছাড়া এই কি আমাদের কুলধর্মও নয়? যৌবনোচিত বিষয়-এষণা ত্যাগ করে এই বুড়ো বয়সে বানপ্রস্থই তো আমাদের কুলাচার, বাবা। তা ছাড়া তোমার ঘরে তো অনেককাল সুখে রইলাম, বাবা। তুমি আমার অনেক সেবা করেছ, এবার এই বুড়োকে ছেড়ে দাও—বৃদ্ধং মামপ্যনুজ্ঞাতুম্ অর্হসি ত্বং নরাধিপ।

এতকালের সুখবাস ছেড়ে চলে যাবেন! ধৃতরাষ্ট্রেরও কষ্ট কিছু কম হচ্ছিল না। মায়া তো কম বাড়েনি। সেই পাণ্ডুর বনে যাবার সময় থেকে তিনি রাজ্য ভোগ করছেন। তার ওপরে দুষ্ট অবুঝ ছেলের ওপর মায়া থাকে বেশি। তাকে সর্বাধিপত্য দিয়ে তাঁর নিজের দুর্বলতা চরিতার্থ করেছেন অত্যন্ত সবলভাবে। তারপর একে একে সব পুত্র চলে যাবার পর এখন এই অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের ওপরেও তাঁর কম মমতা তৈরি হয়নি। এই সমস্ত মায়ামমতার বন্ধন হঠাৎ এক ঝটকায় সরিয়ে দেবার সময় ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয়-বিকার শরীরের মধ্যেও ধরা পড়ল।

যুধিষ্ঠিরের আর্তিমাখা মুখের দিকে আর তিনি তাকাতে পারলেন না। তাঁর শরীরটা কাঁপছিল। যুধিষ্ঠিরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ধৃতরাষ্ট্র তাঁর অনেককালের সাথী সঞ্জয়কে বললেন—আমাকে অনুমতি দাও ভাই। আমার মনটাও ভাল নেই, মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, কথাও বলতে পারছি না। বুড়ো বয়সে বেশি কথা বললেও কষ্ট হয়—বয়সা চ প্রকৃষ্টেন বাগ্‌-ব্যায়ামেন চৈব হ। ধৃতরাষ্ট্র আর দাঁড়াতে পারলেন না, গান্ধারীর পিঠে হাত রেখে তিনি একটা অবলম্বন খুঁজলেন। কিন্তু তাতেও কিছু হল না। সংজ্ঞাহীন মানুষের মতো গান্ধারীর পিঠে হাত রেখে তিনি বসে পড়লেন আবার।

যুধিষ্ঠির তাঁকে দেখে খুব কষ্ট পেলেন। ভাবলেন—যাঁর গায়ে একশো হাতির বল, তিনি এমন করে ভেঙে পড়েন কী করে। ধৃতরাষ্ট্রের অবস্থা দেখে চিন্তাকুল ধর্মরাজ সঙ্গে সঙ্গে একটি জলপাত্রের মধ্যে হাত ডুবিয়ে সেই জলস্নিগ্ধ হাতখানি দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের মুখে বুকে শীতল স্পর্শ দিলেন—উরো সুখং চ শনকৈ... জলশীতেন পাণ্ডবঃ। সামান্য সংজ্ঞা ফিরে আসতেই ধৃতরাষ্ট্র আস্তে আস্তে যুধিষ্ঠিরের হাতখানি ধরলেন আলতো করে। স্নিগ্ধ মধুর আর্তিতে বললেন—তোমার এই হাতখানি দিয়ে আমায় স্পর্শ করো বাবা! আমাকে আলিঙ্গন করো—স্পৃশ মাং পাণিনা ভূয়ঃ পরিষ্বজ চ পাণ্ডব। তোমার এই স্নিগ্ধ করস্পর্শেই আমি যেন বেঁচে আছি, বাছা! একবার তোমার মস্তক আঘ্রাণ করতে চাই, তুমি আমার কাছে এসো।

আগেই বলেছি—সমগ্র মহাভারত খুঁজলে ধৃতরাষ্ট্রের মতো এমন স্নেহপ্রবণ ব্যক্তি দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে না। এমন স্নেহময় পিতা আমি বাস্তব জীবনেও দেখেছি। এমন পিতা, যিনি পুত্রের কষ্ট হবে বলে ধুঁকতে ধুঁকতে বাজার যান। এমন পিতা, যিনি পুত্রের কষ্ট হবে বলে তাকে পরিশ্রমের চাকরি করতে দেন না। এমন পিতা, যিনি পক্ষীর অধিক ভালবাসায় এক সময় পুত্রকে ঠুকরে বার করে দেন না কর্মময় পন্থায়। আমরা জানি—এমন স্নেহও এক রিপুর মতো, কিন্তু যিনি এই স্নেহধারার আধার, সেই স্নিগ্ধ প্রস্রবণটিকে আমরা কেমন করে দোষ দিই। অন্তত দুর্যোধনের দিক থেকে দেখলে এমন স্নেহান্ধ পিতাকে কি মায়া না করে পারা যায়?

এখনও দেখুন, এই অরণ্য-গমনের প্রাকমুহূর্তে যুধিষ্ঠিরকে কী অসীম মায়ায় বেঁধে ফেলেছেন তিনি। জ্যেষ্ঠ পিতার কথামতো যুধিষ্ঠির অনেকক্ষণ ধৃতরাষ্ট্রের গায়ে হাত বুলোলেন, তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন সর্বাঙ্গে। আর জ্যেষ্ঠ পিতা! ছোট্ট শিশুর মতো তিনি যুধিষ্ঠিরের মস্তক আঘ্রাণ করে জড়িয়ে ধরলেন যুধিষ্ঠিরকে—বাহুভ্যাং সম্পরিষ্বজ্য মূর্ধ্ন্যজিঘ্রত পাণ্ডবম্। ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয়ে চিরন্তনী স্বত-উৎসারিত স্নেহের ধারায় সিক্ত হয়ে গেলেন যুধিষ্ঠির! সেই কবে তাঁর পিতা স্বর্গত হয়েছেন। তদবধি এমন শিশুর মতো কেউ তাঁকে জড়িয়ে ধরেনি। ধৃতরাষ্ট্র বৃদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃশ, বিবর্ণ হয়ে গেছেন। তার মধ্যে বানপ্রস্থের প্রথম প্রস্থে আজ সকাল থেকে উপবাস করে আছেন তিনি। দেহটি অস্থিচর্মসার অনুজ্জ্বল হয়ে গেছে—উপবাস-পরিশ্রান্তং ত্বগস্থিপরিবারণম্।

যুধিষ্ঠির কেঁদে বললেন—আপনি যা চাইছেন, তাই না হয় হবে। আপনার অপ্রিয় কাজ করে এই পৃথিবীও ভোগ করতে চাই না আমি। আপনি বনে যেতে চাইছেন, আমি আর কী করে মানা করব। কিন্তু আপনি এবেলার মতো স্নান-ভোজন করে যান অন্তত, সেটাই আমার কাছে এখন অনেক কিছু—ক্রিয়তাং তাবদাহারস্ততো বেৎস্যাম্যহং পরম। যুধিষ্ঠির অনুরোধ উপরোধ করছেন ধৃতরাষ্ট্রকে—এই অবস্থায় দ্বৈপায়ন ব্যাস এসে উপস্থিত হলেন সেইখানে। ধৃতরাষ্ট্র তাঁর আত্মজ পুত্র, এত স্নেহান্ধ হয়ে থেকে অনেক কষ্ট পেয়েছেন তাঁর এই পুত্রটি। আজ তিনি তাঁকে মুমুক্ষুত্ব এবং বৈরাগ্যের পথে নিয়ে যেতে এসেছেন। বহুকাল আগে এইভাবে তিনি জননী সত্যবতী এবং তাঁর সন্তানধারিণী দুই পুত্রবধূ অম্বিকা এবং অম্বালিকাকে

এইভাবেই অরণ্যের পথে নিয়ে গিয়েছিলেন। আজ আবার তিনি এসেছেন মায়াচ্ছন্ন পুত্রটিকে মোক্ষের পথ দেখাতে।

ব্যাসই যুধিষ্ঠিরকে বোঝালেন ধৃতরাষ্ট্রকে ছেড়ে দেবার জন্য। এতকাল এই সংসারে বসে কুরুবাড়ির নানান কুটিল রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে জড়িয়ে ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। ব্যাস তা মনে মনে পছন্দ করেননি। মায়ার এই সুদৃঢ় বন্ধন ধৃতরাষ্ট্র এতকাল কাটাতে পারেননি। আজ যখন এই সুমতি হয়েছে, ব্যাস তখন যুধিষ্ঠিরকে অনুরোধ করেছেন—এবার এঁকে ছেড়ে দাও যুধিষ্ঠির, এই রাজধানীতে বসে এক রাজর্ষির মরণ শোভা পায় না—অনুজ্ঞাং লভতাং রাজা মা বৃথেহ মরিষ্যতি। যুধিষ্ঠির বুঝেছেন। কিন্তু শত বুঝেও আবারও সেই বলেছেন—তবু আপনাকে আজ খেয়ে যেতে হবে, তারপর আপনি গমন করুন আপনার অরণ্য-আশ্রয়ে—ক্রিয়তাং তাবদাহারস্ততো গচ্ছাশ্রয়ং প্রতি।

ধৃতরাষ্ট্র আর না করতে পারলেন না। আপন ভুবনে গিয়ে সন্ধ্যাআহ্নিক সেরে খেতে বসলেন। বধূরা তাঁকে পরিতৃপ্ত করে খাওয়ালেন এবং একই সঙ্গে বিদুর-সঞ্জয়-যুধিষ্ঠিররাও সেদিন শেষ আহার করলেন ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে। বনে যাবার আগে ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যের মঙ্গলের জন্য অনেক সদুপদেশ দিলেন যুধিষ্ঠিরকে এবং সেই উপদেশগুলি রাজনীতিশাস্ত্রের পরিসর। রাষ্ট্রের সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা বিবৃত করে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে নিয়ে অন্তঃপুর থেকে রাজপথে এসে পড়লেন।

ধৃতরাষ্ট্র বনগমন করছেন—এ কথা আগেই চাউর হয়ে গিয়েছিল। রাজপথ তখন জনপথে পরিণত হয়েছে। চতুবর্ণের সমস্ত মানুষ আজ একত্র হয়েছেন ধৃতরাষ্ট্রকে শেষ অভিবাদন জানাবার জন্য। ধৃতরাষ্ট্র পৌর-জনপদবাসী সবার কাছে হাত জোড় করে অনুমতি চাইলেন যাবার জন্য। দুর্গপ্রতিম হস্তিনাপুরীর অন্যতম প্রধান দ্বার বর্ধমান। সেই বর্ধমান পুরদ্বার দিয়ে ধৃতরাষ্ট্র রওনা হলেন বনের পথে। পথ লোকে লোকারণ্য। ধৃতরাষ্ট্রের বনযাত্রার সঙ্গী হয়েছেন বিদুর এবং সঞ্জয়। গান্ধারীর সঙ্গে চলেছেন কুন্তী। যুধিষ্ঠির যা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি, সেই ঘটনাও ঘটল যখন কুন্তী বললেন—তিনিও বনে যেতে চান ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর সেবা করার জন্য। যুধিষ্ঠিররা পাঁচ ভাই জননীর কাছে করুণ আবেদন করেছেন ফিরে আসার জন্য। এমনকী ধৃতরাষ্ট্রও গান্ধারীর মাধ্যমে তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু কুন্তী শোনেননি। অতএব ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে আরও চারটি প্রাণী হস্তিনাপুর ছেড়ে বনের পথে পা বাড়ালেন।

এই দিনটি ছিল কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথি। ধৃতরাষ্ট্র বনে যাবার আগে পিতৃপুরুষ এবং পুত্রদের শ্রাদ্ধক্রিয়া করে নিজের এবং গান্ধারীরও শ্রাদ্ধক্রিয়া সমাপন করেছিলেন। সেকালে এমন অনেকেই করতেন। বনের পথে যাবার সময় কুন্তী, গান্ধারী এবং ধৃতরাষ্ট্রের যাত্রাদৃশ্যটি চিত্রপটে আঁকা যায়। যূথবদ্ধ হাতিরা যেমন একজন আরেকজনের পিঠে শুঁড় রেখে চলতে থাকে তেমনই কুন্তী পথ দেখিয়ে চলেছেন সবার আগে, তাঁর পিঠে হাত রেখেছেন কাপড় দিয়ে চোখ বাঁধা গান্ধারী আর তাঁর পিঠে হাত রেখে যাচ্ছেন অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র। বনবাসের প্রথম রাত্রিটি কেটে গেল ভাগীরথীর তীরে কুশশয্যার শয়নে। মহামতি বিদুরই বলেছিলেন—সেদিনটা ওইখানেই কাটাতে। পরের দিন গঙ্গা পার হয়ে বানপ্রস্থী ধৃতরাষ্ট্র এসে পৌঁছোলেন মহর্ষি শতযূপের আশ্রমে। তারপর সেখান থেকে বনে বনান্তরে।

এখনও ধৃতরাষ্ট্রের হদিস পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠির একদিন সবাইকে নিয়ে এসে দেখে গেছেন ধৃতরাষ্ট্র এবং অন্যান্যদের। এই বৃদ্ধ বয়সেও ধৃতরাষ্ট্রের তপশ্চর্যার শক্তি দেখে তাঁরা অবাক হয়ে গেছেন। যুধিষ্ঠির তখনও সপরিবারে বনেই রয়েছেন, এইরকমই একটা সময়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এলেন পুত্রের সঙ্গে দেখা করতে। এরইমধ্যে বিদুর যোগবলে

আত্মবিসর্জন দিয়েছেন—সে কথা ব্যাসের কানে পৌঁছেছে এবং যুধিষ্ঠির ভাইদের নিয়ে সেই মহান দৃশ্য দেখেওছেন।

ব্যাস এসেছেন তাঁর পুত্রের খবর নিতে। বনবাসে ধৃতরাষ্ট্রের মন লেগেছে কি না অথবা এখনও কি মৃত পুত্রদের জন্য তাঁর মন হাহাকার করে ওঠে—কচ্চিদ্ হৃদি ন তে শোকো রাজন্ পুত্রবিনাশজঃ? ব্যাস কিন্তু বুঝেছেন—ধৃতরাষ্ট্র তাঁর অন্য ছেলেগুলির মতো নয়। ধৃতরাষ্ট্র স্নেহে পাগল। বনবাসে এলেও তিনি তাঁর পূর্বকথা ভুলতে পারছেন না। ব্যাস অনুগ্রহ করে বলেছেন—যদি তোমার কোনও দুঃখ থাকে, কোনও কামনা থাকে তবে তোমার দুঃখের নিরসন ঘটিয়ে সে কামনা পূরণ করব আমি—প্রবণো'স্মি বরং দাতুং পশ্য সে তপস্যঃ ফলম্।

ধৃতরাষ্ট্র লুকোননি। এত যে তিনি তপস্যা করছেন, এত যে কৃচ্ছ্রসাধন করছেন এবং এত কিছু উপায়ে এত যে ভুলে থাকার চেষ্টা করছেন, তবু কেমন নিজের অলস অন্তরালে সেই দুষ্ট পুত্রটির কথা তাঁর মনে পড়ে। ব্যাসকে তিনি কথাটা বলেছেন বেশ ঘুরিয়ে। বলেছেন—পরলোকে আমার গতি কী হবে, তা নিয়ে আমার আর ভয় নেই, পিতা! তবে আমার সেই দুষ্টচেতা মন্দবুদ্ধি পুত্রটি, যার জন্য পাণ্ডব-ভাইরা প্রত্যেকে কষ্ট পেয়েছে, যার জন্য নানা রাজ্যের রাজারা যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেছেন, সেই পাপবুদ্ধি ছেলেটির জন্য মনে আমার এখনও কষ্ট আছে, পিতা—দূয়তে মে মনো নিত্যং স্মরতঃ পুত্রগৃদ্ধিনঃ। ধৃতরাষ্ট্র ঘুরিয়ে বলেছেন—ভীষ্ম, দ্রোণ এবং আরও অন্যান্য রাজারা আমারই পুত্রের কারণে আজ স্বর্গত হয়েছেন। আমি এঁদের সবাইকে দেখতে চাই, পিতা।

ধৃতরাষ্ট্র ইচ্ছাটা প্রকাশ করলেন সবাইকে জড়িয়ে নিয়ে। কিন্তু গান্ধারী এই পুত্রবৎসল পিতাটিকে চেনেন। তিনি একেবারে পরিষ্কার করে বললেন—আজকে ষোলো বচ্ছর কেটে গেছে, মুনিবর। দুর্যোধনের মৃত্যুর পর ষোলো বচ্ছর কেটে গেছে—ষোড়শেমানি বর্ষাণি গতানি মুনিপুঙ্গব। কিন্তু আজও ইনি পুত্রশোক ভুলতে পারেননি। সারাটা দিন হা-হুতাশ করে তাঁর কেটে যায়, আর রাত্রেও ইনি ঘুমোতে পারেন না পুত্রশোকের জ্বালায়—ন শেতে বসতীঃ সর্বাঃ ধৃতরাষ্ট্রো মহামুনে।

ব্যাস বুঝেছিলেন, যে, ধৃতরাষ্ট্র এই অরণ্যবাসে এসেও পুত্রের জন্য কষ্ট পান। তিনি বড়ই কৃপাময়, আপন যোগবলে তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধশয়ান ব্যক্তিদের ভাসিয়ে তুললেন জীবিত ধৃতরাষ্ট্রের সামনে। তাঁরা এলেন, সকলেই এলেন। দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পুত্রেরা, দ্রুপদ—সকলেই এলেন সবার চোখের সামনে। ধৃতরাষ্ট্র দিব্যচক্ষুতে সকলকে দেখতে পেলেন। নশ্বর পৃথিবীতে এঁদের পরস্পরের মধ্যে কত ক্রোধ ছিল, কত দ্বন্দ্ব ছিল। এখন এঁরা প্রত্যেকে পরস্পরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। ধৃতরাষ্ট্র দেখতে পেলেন সবাইকে যেন পটে আঁকা ছবি—আশ্চর্যভূতং দদৃশে চিত্রং পটগতং যথা। ধৃতরাষ্ট্রের মন ভরে গেল আনন্দে। তাঁর আর কোনও কষ্ট নেই। এখন তিনি স্বচ্ছন্দে তপস্যায় মনোনিবেশ করতে পারবেন।

এই ঘটনার পর আরও দুটি বৎসর বেঁচেছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। এরপরে যুধিষ্ঠিরও ধৃতরাষ্ট্রের খবর পাননি ভাল করে। হয়তো এ বন সে বন ঘুরতে ঘুরতে ধৃতরাষ্ট্র একদিন পাণ্ডবদের দৃষ্টি এবং সংবাদের বাইরে চলে গিয়েছিলেন। দু'বছর পর—দ্বিবর্ষোপনিবৃত্তেষু—নারদ এসে পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে শেষ সংবাদ জানালেন ধৃতরাষ্ট্রের। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী এবং সঞ্জয় তখন কুরুক্ষেত্রের অরণ্যভূমি হরদ্বার বা হরিদ্বারে (গঙ্গাদ্বার) চলে গেছেন কঠোর তপস্যা করতে। সেখানে একদিন গঙ্গায় স্নান করে উঠে ধৃতরাষ্ট্র আশ্রমের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময়ই টের পাওয়া গেল বনে আগুন লেগেছে। দাবানল। ভয়ংকর সে আগুন এগিয়ে

আসছে ধৃতরাষ্ট্রের দিকে। আগুনের অবস্থিতি অনুভব করে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বললেন—তুমি এক্ষুনি চলে যাও। ধৃতরাষ্ট্র বৃদ্ধ, উপরন্তু তপস্যার কাঠিন্যে একেবারে কৃশ হয়ে গেছেন—ত্বগস্থিসার। গান্ধারী-কুন্তীও তাই। তাঁদের কারোরই এমন শক্তি নেই যে, দৌড়ে পালিয়ে যাবেন বাঁচবার জন্য—অসমর্থো'পসরণে...মন্দপ্রাণ বিচেষ্টিতঃ।

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বললেন পালিয়ে যেতে, যেখানে আগুন নেই সেখানে—গচ্ছ সঞ্জয় যত্রাগ্নি র্ন ত্বাং দহতি কর্হিচিৎ। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে ফেলে যেতে চাননি, কিন্তু কী করবেন! সঞ্জয়কে এই দাবানলের বিপাক থেকে বাঁচাতেই হবে। ধৃতরাষ্ট্র বলেছেন—যেভাবে হোক তুমি পালাও। এই অগ্নিতে মরণ আমাদের কাছে হীন নয়, কিছু অসহ্যও নয়। ধৃতরাষ্ট্র যোগবলে নিজের শরীরটিকে কাঠের মতো শক্ত করে ফেললেন—সন্নিরুধ্যেন্দ্রিয়গ্রামম্ আসীৎ কাষ্ঠোপমস্তদা। সঞ্জয় কোনওমতে পালান এবং দুরন্ত দাবানল গ্রাস করল ধৃতরাষ্ট্রের 'কাষ্ঠোপম' শরীর। তিনি স্বর্গত হলেন এবং তাঁরই সঙ্গে মারা গেলেন গান্ধারী এবং কুন্তী। ধৃতরাষ্ট্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কুরুরাজ্য থেকে এক মহান স্নেহশীল পিতার ইতিহাস লুপ্ত হয়ে গেল।

এই ইতিহাস শৌর্য বীর্যের ইতিহাস নয়, এই ইতিহাস সমাজসংস্কারের বা রাজনৈতিক সূক্ষ্মতার ইতিহাসও নয়। মহাকাব্যের একেকটি চরিত্রে যে নায়কোচিত উদাত্ত গুণ থাকে, তাও এই ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে নেই, এমনকী খলতা, ধূর্ততা, শঠতা—ইত্যাদি মন্দ গুণের কলুষ দিয়ে যদি বা কখনও ধৃতরাষ্ট্রের অন্তর খণ্ডিত করা যায়, তবু সেগুলি তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য রচনা করে না। ধৃতরাষ্ট্র-চরিত্রের আত্মা রচিত হয়েছে পুত্রস্নেহ দিয়ে। অখণ্ড, বাঁধভাঙা, অবুঝ স্নেহ, যেটাকে মহাকাব্যিক বৈশিষ্ট্যের বৈপরীত্যে 'রিপু'ই বলতে হবে। কিন্তু তর্ক, যুক্তি বা বিচারের পরিসর ছেড়ে দিয়ে আমরা যদি এক পুত্রের মতো পিতা ধৃতরাষ্ট্রের দিকে তাকাই, তা হলে দেখবেন—তাঁর সমস্ত আপাতখলতা, শঠতা ধুয়েমুছে গেছে। তখন আপনার ইচ্ছে করবে—যুধিষ্ঠিরের মতো জলসিক্ত শীতল হাতখানি বৃদ্ধ পিতার কপালে রাখি, তাঁর শোকদিগ্ধ মায়াময় শরীর একবার অন্তত জড়িয়ে ধরি অথবা একবার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের মতো তাঁর মন্দবুদ্ধি মৃত পুত্রকে তাঁর সামনে এনে দিয়ে বলি—দেখো ধৃতরাষ্ট্র! তোমার ছেলে স্বর্গসুখে ভালই আছে। তুমি নিশ্চিন্তে মৃত্যু বরণ করো।

বিদুর

ভেবেছিলাম—আমি যখন পরিণত বৃদ্ধটি হব, তখন আমি বিদুরের চরিত্র লিখব। যখন পক্ক কেশ, জীর্ণ দন্ত, ন্যুব্জ দেহ আমার ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং বিষয়বাসনা রোধ করবে, ভেবেছিলাম—সেইদিন আমি বিদুরের চরিত্র লিখব। মৃত্যুপথযাত্রীর শবদেহ অগ্নিসাৎ করার পর গঙ্গার ধারে দাঁড়ালে যে মন্ত্র শুনতে পাওয়া যায়—ভাই-বন্ধু, দারা-সূত কেউ আর তোমার এই পথের সঙ্গী নয়, তোমার সাথের সাথী হয়ে এখন যে তোমার সঙ্গে যাচ্ছে, সে হল শুধু ধর্ম—ঠিক এই মন্ত্র শোনার পর মনের মধ্যে যে বৈরাগ্য আসে, ভেবেছিলাম—সেই বৈরাগ্য এলে আমি বিদুরের চরিত্র লিখব। বাংলাদেশের হতদরিদ্র বৈষ্ণবের বাড়িতে বৈষ্ণব সমাগম হলে হঠাৎ হঠাৎ একটি সাধারণ দিন উৎসবে রূপান্তরিত হয়। সেইরকম একটি দিনে সকালবেলার বাল্যভোগে খুদকুঁড়ো দিয়ে তৈরি করা জাউ গোপালের ভোগে লেগেছিল। ভেবেছিলাম—আবার যদি তেমন দিন আসে, যেদিন একাসনে বৈষ্ণবদের সঙ্গে বসে খুদের জাউ প্রসাদ পাব, সেইদিন অন্তঃকরণ শুদ্ধ করে পুবমুখো হয়ে বসে বিদুরের চরিত্র লিখব।

কিন্তু হল না। সেসব কিছুই হল না। বৃদ্ধত্বের পরিণতি, বৈরাগ্য, শুদ্ধতা অথবা সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য যেসব আন্তর গুণ লাগে, সেইসব আন্তর গুণ আমার মধ্যে সঞ্জীবিত হবার আগেই পরম ক্রোধিত হয়ে আমি বিদুরের চরিত্র লিখতে বসেছি। কেননা, সত্ত্ব, শুদ্ধতা, বৈরাগ্য ইত্যাদি আন্তর গুণ যদি সত্যিই একদিন আমাকে ধীরপ্রশান্ত করে তোলে, তবে আমার মধ্যে যে ক্ষমাবৃত্তির সঞ্চার ঘটবে, তাতে আমি সেইসমস্ত অধম ব্যক্তিকে ক্ষমা করে ফেলব—যাঁরা শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও আপন মনোবিকারে বিদুরের মতো মহান চরিত্রকে কলুষিত করে গেলেন।

কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা আর একটু অন্যরকম হলেই ইতিহাস বদলে যেত। পারিবারিক ইতিহাস তো বটেই, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসও বদলে যেত। এমন মানুষ এই সংসারেই দেখেছি, যাঁর জ্যেষ্ঠ হওয়া উচিত ছিল, তিনি কনিষ্ঠ হয়ে জন্মেছেন। যাঁর রাজা হওয়া উচিত ছিল, তিনি কপালজোরে বড় এক অফিসার হয়েছেন মাত্র, আবার এমনও দেখেছি—যাঁর চাকর হওয়া উচিত ছিল, তিনি মনিব হয়েছেন, যাঁর করণিক হওয়া উচিত ছিল, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হয়েছেন, যাঁর চোর হওয়া উচিত ছিল, তিনি নেতা হয়েছেন। দুভাবে এমন হয়—কখনও কপালগুণে, কখনও কপালদোষে। আর একভাবে হয় —তা হল রাজনৈতিক কারণে। বিদুরের কথা বলতে গেলে কপালের গুণের কথাও আছে, কপালের দোষের কথাও আছে, আবার রাজনৈতিক কারণও আছে—যাতে যা যা তিনি হতে পারতেন, তা তিনি হননি। তিনি ঋষি হতে পারতেন, বিশালবুদ্ধি ব্যাসের তিনি পুত্র, একজন পূর্ণপ্রজ্ঞ ঋষি হওয়ার অধ্যাত্মবীজ তাঁর মধ্যে ছিল। কিন্তু তবু তিনি ঋষি হলেন না, কেননা জন্মমাত্রেই ঋষি পরাশর যেমন ব্যাসকে হাত ধরে আরণ্যক আশ্রমে নিয়ে গিয়েছিলেন, ব্যাস কিন্তু তাঁর এই পুত্রকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যাননি। যাননি, কারণ—তিনি হস্তিনাপুরের রাজা বিচিত্রবীর্যের স্ত্রীদের ক্ষেত্রে কুরুকুলের গুরুজনদের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে পুত্র উৎপাদন করতে এসেছিলেন। এখানে একটা 'অফিশিয়াল' দায় আছে, এখানে তাঁর স্বাধিকার চলে না। যাঁর গর্ভে অবশ্য বিদুরের জন্ম হয় তিনি বিচিত্রবীর্যের স্ত্রী নন, তিনি দাসী। কিন্তু দাসী হলেও তিনি বিচিত্রবীর্যের ভোগ্যা ছিলেন এবং ভোগ্যা দাসীর মর্যাদা রাজমহিষীদের তুলনায় কম হলেও তাঁর স্ত্রীত্বের সংজ্ঞা অসঙ্গত ছিল না, অন্তত তখনকার নিয়মে। কাজেই দায়বদ্ধ ব্যাস বিচিত্রবীর্যের পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেননি এবং অন্যদিকে বিদুরের সমস্ত সংস্কারও হয়েছিল রাজবাড়ির নিয়মমতে। ফলে বিদুরের পক্ষে ঋষি হওয়া সম্ভব হল না।

বিদুর রাজাও হতে পারেননি, কারণ প্রথমত তিনি ভাইদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ এবং দ্বিতীয়ত ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রা দাসীর গর্ভে জাত পারসব বলে রাজত্বে তাঁর অধিকার ছিল না, বিশেষত রাজমহিষীর গর্ভজাত সন্তানেরা যেখানে স্বশরীরে বর্তমান ছিলেন, সেখানে তাঁর রাজা হওয়ার প্রশ্নই ওঠেনি। অথচ তিনি উত্তম রাজা হতে পারতেন, কেননা রাজনৈতিক জ্ঞান এবং নিরপেক্ষতা—এ দুটি তাঁর অন্য ভাইদের চেয়ে বেশি ছিল। রাজ্য চালাতে গেলে এবং পররাষ্ট্রীয় রাজাদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে বুদ্ধির প্রয়োজন হয়, সে বুদ্ধিও তাঁর জ্যেষ্ঠ দুই ভাইয়ের চেয়ে বেশি ছিল। অথচ সেই বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞা থাকতেও তিনি রাজা হতে পারেননি। হলে মহাভারতের ইতিহাস হয়তো অন্যরকম হত। অথচ তাঁকে মানুষ করা হল প্রায় ক্ষত্রিয়ের সংস্কারে। ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডুকে ছোটবেলা থেকে যে সমস্ত শ্রম ব্যায়াম শেখানো হয়েছিল, বেদবিদ্যা, রাজনীতিশাস্ত্র, ধনুর্বিদ্যা, গদাযুদ্ধ, তরবারি চালনা, হস্তিবিদ্যা—ইত্যাদি যা যা ক্ষত্রিয়ের শিক্ষণীয় এবং যা যা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুকে শেখানো হয়েছিল, তা সবই বিদুরকেও শেখানো হয়েছিল। অথচ কনিষ্ঠ এবং শূদ্রা দাসীর পুত্র বলে তাঁর রাজা হবার অধিকার রইল না। পাণ্ডু কেন রাজা হলেন—এ কথা বলতে গিয়ে মহাভারতের কবিকে বলতে হয়েছে—কেন ধৃতরাষ্ট্র বিদুর রাজা হতে পারলেন না। ধৃতরাষ্ট্র হলেন না, তাঁর চক্ষু নেই বলে। বিকৃতাঙ্গ-বিশিষ্ট ব্যক্তি সেকালের নিয়মে রাজা হতে পারতেন না। অন্যদিকে ক্ষত্রিয়াবর অধম যোনিতে উৎপন্ন বলে বিদুরেরও রাজা হওয়া হল না—পারসবত্বাৎ বিদুরো রাজা পাণ্ডুর্বভূব হ। বস্তুত পাণ্ডুর রাজা হওয়ার কারণ বলতে গিয়ে অন্য দুই ভাইয়ের রাজা হওয়ার অকারণ নির্দেশ করার প্রশ্ন তখনই আসে, যখন অন্য দুই ভাইয়ের রাজা হবার অন্য যৌক্তিকতা থাকে এবং যিনি বাস্তবে রাজা হলেন তাঁরও রাজা হওয়ার পরম যোগ্যতা থাকে না।

বিদুর যা শুধুই শেখার চেষ্টা করেছিলেন, তা হল রাজনীতিশাস্ত্র, আইন এবং নীতিশাস্ত্র। এই তিনটিকেই একযোগে ধর্ম বলা যায় সেকালের ভাষায় এবং এই ধর্মের তাৎপর্য নির্ণয়ে

তিনি এতটাই পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন যে, তিন ভাইয়ের পৃথক পৃথক শিক্ষাবৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার সময় মহাভারতের কবি যেখানে ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডুর জন্য একটিমাত্র পংক্তি ব্যবহার করেছেন, সেখানে বিদুরের জন্য ব্যবহার করেছেন দুটি পংক্তি এবং তাও কীভাবে? কবি লিখেছেন—পাণ্ডু ধনুর্বেদে বিশিষ্টতা লাভ করলেন, ধৃতরাষ্ট্র অন্য দুই ভাইয়ের চেয়ে এগিয়ে রইলেন শারীরিক শক্তিতে। আর বিদুর! স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—এই তিন ভুবনে বিদুরের মতো নীতিনিয়মনিষ্ঠ বিদ্বান মানুষ সেকালে ছিলেন না এবং নীতিনিয়ম ও কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণায়ক ধর্ম বিষয়ে তিনি চরম পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন—ত্রিষু লোকেষু ন ত্বাসীৎ কশ্চিদ্ বিদুরসম্মিতঃ। ধর্মনিত্যস্তথা রাজন্ ধর্মে চ পরমং গতঃ।

মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ এখানে যাজ্ঞবল্ক্যের বচন তুলে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, যোগের দ্বারা আত্মদর্শন করাটাই হল পরম ধর্ম। বিদুর সেই আত্মদর্শন করেছিলেন বলেই তাঁর সম্বন্ধে লেখা হয়েছে—ধর্মে চ পরমং গতঃ। সমগ্র মহাভারত এবং ঠিক এই জায়গায় ব্যাসলিখিত শ্লোকটির মর্ম উদ্ধার করলে বলা যায় যে, টীকাকার নীলকণ্ঠ সাধারণ-বোধ্য ধর্মের তাৎপর্যে এখানে যোগের দ্বারা পরমাত্মদর্শনের কথা বলেছেন। আমার ব্যক্তিগত মতে নীলকণ্ঠ ঠিক লেখেননি। প্রথমত মনে রাখতে হবে—যোগের দ্বারা পরমাত্মদর্শনের প্রসঙ্গই নেই এখানে। যদি এখানে মৃত্যুর সময়কালীন যোগজ পরমাত্মদর্শনের কথা বলা হয়ে থাকে, তবে সেই যোগজ মুক্তিলাভ ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র সকলেরই হয়েছিল এবং তা মহাভারতেই পাওয়া যাবে। এখানে 'ধর্মে চ পরমং গতঃ—এই কথাটির তাৎপর্য হল—ধর্ম বিষয়ে (নীতি, নিয়ম, সদাচার, আইন, রাজনীতি) তিনি পারম্য বা বিশিষ্টতা লাভ করেছিলেন, ঠিক যেমন পাণ্ডু বিশিষ্টতা লাভ করেছিলেন ধনুর্বেদে এবং ধৃতরাষ্ট্র বিশিষ্টতা লাভ করেছিলেন দৈহিক শক্তিতে। এমন অর্থ না হলে, মহাভারতীয় শ্লোকটির প্রসঙ্গই নিরর্থক হয়ে যাবে।

বলতে পারেন—এ হল মহাভারতের কবির প্রশ্রয়। বিদুরকে তিনি যেন অন্য চোখে দেখেছেন। আমি বলি—তা দেখার কারণও আছে। মনে রাখতে হবে—পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুর এই তিনজনেই মহামতি ব্যাসের নিয়োগজাত পুত্র। একবার ভেবে দেখুন, যাঁরা নিয়োগের জন্য ঋষিমুনিদের আমন্ত্রণ জানাতেন, তাঁরা নিতান্ত অপারগ হয়েই এই প্রথায় অনুমতি দিতেন। ঘরে পুত্র জন্মায়নি, সম্পত্তির উত্তরাধিকার অন্যত্রগামী হবে—এতসব চিন্তা করে গুরুজনেরা না হয় নিয়োগে অনুমতি দিতেন। কিন্তু নিয়োগের জন্য যে রমণীকে অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে মৈথুন প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত করা হত, তাঁর মনে থাকত অনন্ত অনীহা এবং এক অর্থে ঘৃণা। অন্যদিকে বাইরের যে পুরুষটিকে নিযুক্ত করা হত, তাঁকে এই অনীহা এবং ঘৃণার মুখোমুখি হতে হত সোজাসুজি। সাধারণত নিয়োগপ্রথার মধ্যে একটা রুটিন ব্যাপার ছিল, নিযুক্ত পুরুষের কামচরিতার্থতার যাতে সুযোগ না থাকে, তার জন্য তার সারা গায়ে মাখিয়ে দেওয়া হত ঘি, লবণ, কখনও বা দধি, লবণ, মধু। কাম-সম্ভাষণের জন্য কথা বলাটাও তেমন চলত না। এমন ঘি-জ্যাবজ্যাবে অবস্থায় মৌনী হয়ে যে পুরুষকে রাত্রির অন্ধকারে কেবলমাত্র প্রথাগত মিলন সারতে হত—ঘৃতাক্তো বাগ্‌যতো নিশি—তার মানসিক আহ্লাদ কতটা হত, তা সহজেই অনুমেয়। এর ওপরে থাকত নিযুক্তা রমণীর ঘৃণা, জুগুপ্সা, অনভিনন্দন।

অন্ধ এবং মলিনবস্ত্রধারী দীর্ঘতমা ঋষির সঙ্গে বলিরাজার স্ত্রী মিলিত হতে চাননি এবং সেটা অস্বাভাবিকও নয়, কিন্তু এই ব্যবহারে নিযুক্ত পুরুষ কি যথেষ্ট অপমানিত বোধ করবেন না? ব্যাসের জটা-শ্মশ্রুসমন্বিত রূপ দেখে এবং তাঁর উৎকট গাত্রগন্ধ আঘ্রাণ করে বিচিত্রবীর্যের দুই মহিষীও যেমন পুলকিত হননি, তেমনই গুরুজনদের আদেশে, বিশেষত জননী সত্যবতীর প্রতি দায়বদ্ধ ব্যাসও রাজবধূদের ঘৃণা জুগুপ্সায় আহ্লাদিত হননি নিশ্চয়ই। অম্বিকা ব্যাসের উৎকট উগ্র রূপ দেখে ভয়ে (নাকি ঘৃণায়?) চক্ষু মুদেছিলেন আর অম্বালিকা

পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। একবার এবং প্রথাগত কারণে হলেও মিলনপ্রবৃত্ত পুরুষের এতে সম্মানিত বোধ করার কারণ ছিল না। ব্যাসও সম্মানিত বোধ করেননি। কিন্তু পূনর্নিযুক্ত অম্বিকা যখন নিজের বদলে বিচিত্রবীর্যের ভোগ্যা দাসীকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ব্যাসের সঙ্গে সম্ভোগের ঠিকানা দিয়ে, তখন দুই পক্ষেই বিবেক ছিল পরিষ্কার, ফলে মিলন ছিল স্বাভাবিক মাধুর্যে তন্ময়।

রাজবাড়ির ভোগ্যা শূদ্রা দাসী, এতকাল যে কারণে-অকারণে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় বিচিত্রবীর্যের কাম চরিতার্থ করেছে ক্রীতদাসীর মতো, সে মহামুনি ব্যাসের সঙ্গলাভ করাটাকে ভাগ্য বলে মনে করেছে। যিনি রাজরানিদের কোলে পুত্র দিতে এসেছেন, সেই ঋষির কল্যাণে তারও কোলে এক পুত্র আসবে—এমন আশা সে শূদ্রা স্বপ্নেও করেনি। আজ রাজবাড়ির জ্যেষ্ঠা মহিষী অম্বিকার ব্যাসসঙ্গজাত ঘৃণার কারণে সেই স্বপ্ন সম্ভব হতে চলেছে। অম্বিকা তাকে রানীর মতোই সাজিয়ে দিয়েছিলেন ব্যাসের ভ্রান্তি ঘটানোর জন্য। কিন্তু যে ক্রীতদাসীর পুত্রলাভের স্বাধীনতা ছিল না, সে আজ ঋষির ঔরসে পুত্রলাভ করার আশায় আপনাতে আপনি বিকশিত হয়েছিল। সে নিজেকে লুকোয়নি, তার দাসীত্বকেও নয়। ঋষির কাছে এসে সে সসম্মানে ঋষির প্রত্যুদ্‌গমন করে নিজের পরিচয় দিয়ে স্বেচ্ছামিলনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল—সা তমৃষিমনুপ্রাপ্তং প্রত্যুদ্‌গম্যাভিভাষ্য চ। সেই আমন্ত্রণ মিলনের সমাপন ঘটলে শূদ্রা দাসী ঋষির সৎকার করেছিল যথোচিত মর্যাদায়, হয়তো বা সে আপন অঞ্চল দিয়ে মুছিয়ে দিয়েছিল জটাজূটধারী ঋষির কপালে জমে থাকা মিলনান্তক স্বেদবিন্দু—সংবিবেশানুজ্ঞাতা সকৃত্যোপচচার হ।

যে মুনি এতক্ষণ রাজরানিদের আভিজাত্য অথবা স্বাভাবিক ঘৃণায় তিক্ত হয়ে ছিলেন, সেই তিনি পরম তৃপ্ত হলেন শূদ্রা দাসীর ব্যবহারে, সম্ভাষণে, সমাদরে। বিদায়লগ্নে তিনি দাসীকে আশীর্বাদ করে বললেন—এখন থেকে দাসীত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে তুমি—অভুজিষ্যা ভবিষ্যসি। আর ভদ্রে! আজ তুমি যে গর্ভ লাভ করলে, তা পরম মঙ্গল বহন করবে। অন্য দুই রানির চেয়ে শ্রেয়তর পুত্রও লাভ করবে তুমি—অয়ঞ্চ তে শুভে গর্ভঃ শ্রেয়ানুদরমাগতঃ। ভাবী পুত্রের ভবিষ্যৎ বিবরণ দিয়ে ব্যাস আরও বললেন—নীতি, নিয়ম এবং ধর্মই হবে তার প্রাণ এবং তার সময়ে যত বুদ্ধিমান মানুষ থাকবেন, তাঁদের মধ্যে তোমার পুত্রই হবে অন্যতম শ্রেষ্ঠ—ধর্মাত্মা ভবিতা লোকে সর্ববুদ্ধিমতাং বরঃ।

আজকের দিনে পুত্রজন্মের ক্ষেত্রে পিতার আশীর্বাদের হয়তো মূল্য নেই কোনও। কিন্তু সে যুগে একটি সৎ পুত্রলাভের পিছনে পিতামাতার তপস্যা থাকত। ধর্মজ সন্তান লাভের জন্য সেকালে পিতামাতারা ব্রত নিয়ম তপস্যা আচরণ করতেন। শূদ্রা দাসীর সঙ্গে মিলনোত্তর মুহূর্তেও আমরা ব্যাসের বিশেষণ পাচ্ছি—মহর্ষিঃ সংশিতব্রতঃ। ফলে বিদুর যখন জন্মালেন, তখন মহাভারতের বক্তা বৈশম্পায়ন বিচিত্রবীর্যের পুত্র বলে বিদুরের পরিচয় দিলেন না। তিনি বললেন—বিদুর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের পুত্র—স জজ্ঞে বিদুরো নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়নাত্মজঃ—এবং এই পিতার সম্বন্ধেই তিনি ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর ভ্রাতা। টীকাকার নীলকণ্ঠ সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করলেন—বীজী পিতার সম্বন্ধেই দাসী-গর্ভজাত হওয়া সত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর সাক্ষাৎ ভাই হলেন তিনি—ভুজিষ্যাপুত্রস্যাপি ভ্রাতৃত্বং পিত্রান্বয়াৎ। ভবিষ্যতেও যখন হস্তিনাপুরের উত্তরাধিকারীর প্রসঙ্গে রাজ্যের সমৃদ্ধির কথা এসেছে, তখনও ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুরের উল্লেখ করা হয়েছে সমমর্যাদায়—তেষু ত্রিষু কুমারেষু জাতেষু কুরুজাঙ্গলম্।

রাজশক্তি, প্রভুত্বের শক্তি—এ সব কিছু ছাড়িয়ে ধর্মশক্তিরই যেখানে জয়কার ঘোষিত হয়েছে মহাভারতে সেখানে বিদুরকে স্বয়ং ধর্মস্বরূপ বলে চিহ্নিত করার মধ্যেও একটা গভীর তাৎপর্য আছে। মহাভারতে বলা হয়েছে—স্বয়ং ধর্মই বিদুররূপে জন্মেছেন এবং এক মুনির

শাপবলেই তাঁকে এমন মনুষ্যযোনি লাভ করতে হয়েছে—ধর্মো বিদুররূপেণ শাপাত্তস্য মহাত্মনঃ।

স্বয়ং ধর্মের ওপরে মুনির শাপ নেমে এসেছিল—কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা উৎকর্ণ হয়ে উঠি। এ আবার কেমন কথা। পৃথিবীর সমস্ত অন্যায়, অপরাধ, অসদাচার রোধের জন্য যে ধর্ম পালনের ব্যবস্থা, সেই ধর্মকে শাপগ্রস্ত হয়ে পৃথিবীর মাটিতে নেমে আসতে হবে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে সেই মুনির শাপের কাহিনীটাও জানা দরকার। মাণ্ডব্য বলে এক ঋষি ছিলেন। তিনি তাঁর আশ্রমের এক বৃক্ষমূলে বসে তপস্যা করছিলেন। মুনি আত্মস্থ হয়ে আছেন, ঠিক এই সময়ে রাজরক্ষীদের তাড়া খেয়ে কতগুলি চোর তাঁর আশ্রমে ঢুকে পড়ল। চোরেরা তাদের চুরি করা জিনিসপত্রও সঙ্গে এনেছিল এবং মুনির অজ্ঞাতসারেই সেগুলি তারা লুকিয়ে রাখল মুনির আশ্রমেই। এদিকে রক্ষী রাজপুরুষেরা চোরের খোঁজে মুনির আশ্রমে এসে ঢুকল এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করল চোরদের সম্ভাব্য গতিপথ।

মহর্ষি মাণ্ডব্য কোনও উত্তর দিলেন না। হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না। রক্ষীপুরুষেরা পূর্বাহ্ণেই সন্দেহান্বিত ছিল, অতএব মুনির আশ্রমস্থল ভাল করে খুঁজতে গিয়ে দেখল—চোরেরা সেই আশ্রমেই লুকিয়ে আছে, এমনকী চুরির বস্তুসামগ্রীও সব পাওয়া গেল। চোরদের সন্দেহ করার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষীরা এবার মুনিকেও সন্দেহ করতে লাগল এবং চোরদের সঙ্গে তাঁকেও তারা বেঁধে নিয়ে গেল রাজার কাছে। সব কথা শুনে রাজাও তাঁকে চোরদের সঙ্গে একইভাবে শূলে চড়ানোর আদেশ দিলেন। রক্ষীরা বিনা কোনও ভাবনায় মাণ্ডব্যমুনিকে শূলে চড়িয়ে দিল। এতক্ষণ যত ঘটনা ঘটল সহনশীল মুনি একটি কথাও তার মধ্যে বলেননি, রাজার কাজেও তিনি বাধা দিলেন না।

কিন্তু এবারে ঘটনার পরিবর্তন হল অন্যদিকে। শূলে চড়ানো সত্ত্বেও মুনির মৃত্যু হল না এবং সেই শূলস্থ অবস্থায় নিরাহারেও তিনি যোগযুক্ত হয়ে আপন তপস্যায় নিরত রইলেন। তাঁকে দেখে অন্য ঋষিমুনি-তপস্বীরা বড়ই দুঃখ পেলেন এবং তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসাও করলেন—কোন অপরাধে আপনার এমন কষ্টকর দণ্ড হল। সত্ত্বপ্রতিষ্ঠিত মুনি বললেন—আমি কী অপরাধ করেছি, তাও জানি না, আবার আমার এই অবস্থার জন্য কাকে যে দোষ দেব, তাও জানি না। হয়তো নিজকৃত পূর্ব অপরাধের ফল ভুগছি আমি—দোষতঃ কং গমিষ্যামি ন হি মে'ন্যো'পরাধ্যতি। এদিকে ওই অবস্থাতেও মুনিকে অতদিন জীবিত থাকতে দেখে রক্ষী পুরুষেরা রাজার কাছে গিয়ে সব ঘটনা নিবেদন করল। রাজা মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করে মুনির কাছে গেলেন। অনেক অনুনয় বিনয় করে তাঁকে প্রসন্ন করারও চেষ্টা করলেন। কিন্তু মুনি তো তাঁর ওপরে কখনওই রাগ করেননি, অতএব এখনও কোনও তীক্ষ্ণ আচরণ করলেন না। তিনি পূর্বেও প্রসন্ন ছিলেন, এখনও তাই রইলেন।

রাজা রক্ষীদের সাহায্যে মুনিকে শূলযন্ত্র থেকে নামিয়ে তাঁর শরীর থেকে শূলদণ্ডটি বার করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু দেহ থেকে শূল নির্গত হল না। এ অবস্থায় শূলের অগ্রদণ্ডটি অর্ধেক কেটে দিলেন তিনি এবং শূলের অপরার্ধ মুনির শরীরে অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়ে রইল। শূলের অগ্রভাগকে সংস্কৃতে বলে 'অণী', সেই অন্তর্গত শূলাগ্রভাগ নিজ শরীরে বহন করে বেড়াতেন বলেই মাণ্ডব্যমুনির নাম হয়ে গেল অণীমাণ্ডব্য।

মুনির যে এই অবস্থা হয়েছিল, তাতে তিনি কাউকে দোষ না দিলেও অনুসন্ধিৎসু জনমাত্রেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করত—আপনার মতো শমপ্রধান ব্যক্তির কোন অপরাধে এমন কষ্টকর দণ্ড হল। মুনি এতকাল কাউকে দোষ দেননি, কিন্তু অন্তর্গত শূলের যন্ত্রণায় এবার তাঁর সত্যিই জিজ্ঞাসা হল—সত্যিই তো, কোন পূর্বকৃত প্রারব্ধবশে এমন অবস্থা হল আমার।

তিনি সোজা গিয়ে উপস্থিত হলেন স্বয়ং ধর্মের কাছে, সেই ধর্ম যিনি নীতি, নিয়ম, কর্তব্য, সদাচারের প্রতিমূর্তি। ধর্ম তখন বিচারের আসনেই বসেছিলেন, মুনি সেই আসনস্থ ধর্মের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আমি কী এমন অন্যায় পাপ করেছিলাম জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, যার জন্য এই অন্তর্গত শূল নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে আমাকে—কিং নু তৎ দুষ্কৃতং কর্ম ময়া কৃতমজানতা। আপনি বলুন এবং আমার তপস্যার শক্তিও দেখুন। ধর্ম বললেন—আপনি পূর্বজন্মে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গের পুচ্ছদেশে ধারাল কুশাগ্রভাগ প্রবেশ করিয়ে দিতেন, তারই ফল ভোগ করছেন আপনি। দেখুন, স্বল্প পরিমাণ দান করলেও তার পুণ্যফল যেমন বহুগুণ হয়ে দাঁড়ায়, তেমনই অধর্ম অন্যায়ের ফলও বহু কষ্ট, বহু যন্ত্রণা বয়ে আনে। অণীমাণ্ডব্য ধর্মের প্রবচনে বিচলিত হলেন না। সুস্থিত ধৈর্য সহকারে তিনি বললেন—আচ্ছা! আমি যখন এই অন্যায় করেছিলাম, তখন আমার বয়স কত ছিল—কস্মিন্ কালে ময়া তৎ তু কৃতং হি যথাযথম্। ধর্ম বললেন—তখন আপনি নিতান্তই বালক ছিলেন, তখনও আপনার বুদ্ধি পরিপক্ক হয়নি।

এইবার ক্ষুব্ধ হলেন অণীমাণ্ডব্য। এত কাল এত কষ্টে এত বড় দণ্ড সহ্য করেও যিনি একটি প্রতিবাদ-শব্দও উচ্চারণ করেননি, তিনি এবার ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন—জন্মের সময় থেকে অন্তত বারো বছর পর্যন্ত একটি বালকের কোনও ন্যায় অন্যায়ের বোধ থাকে না, থাকে না ঔচিত্য-নির্ধারক ধর্মশাস্ত্রের বোধ। ফলত অবোধে, অজ্ঞানে সে যা করে, তাতে কোনও মতেই অধর্ম হবার কথা নয়—ন ভবিষ্যত্যধর্মো'ত্র ন প্রজ্ঞাস্যন্তি বৈ দিশঃ। আপনি অতি স্বল্প অপরাধের জন্য আমাকে অতি গুরুদণ্ড দিয়েছেন। এর ফল আপনাকে ভোগ করতে হবে। আমার অভিশাপে আপনি শূদ্রযোনিতে মানুষ হয়ে জন্মাবেন—শূদ্রযোনীবততা ধর্ম মানুষঃ সম্ভবিষ্যসি। আমি লোকসমাজে এই নিয়মও করে দিতে চাই যে, জন্মের সময় থেকে অন্তত চোদ্দো বছর পর্যন্ত একটি বালক যদি জ্ঞানে অজ্ঞানে কোনও অন্যায় করে, তা যেন কোনও মতেই পাপ বলে গণ্য না হয়। চোদ্দো বছরের ওপরে বয়স হলে অবশ্য যে কোনও অন্যায়ই পাপ বলে গণ্য হবে। অণীমাণ্ডব্যের কাছে এই যে অপরাধ করেছিলেন ধর্ম, তার জন্য তাঁকে মানুষ এবং শূদ্রযোনিতে জন্মাতে হল এবং সেই মানুষটিই হলেন বিদুর। এইবারে জানাই—ধর্ম যেভাবে দণ্ডিত হয়ে মানুষ হলেন তার একটা তাৎপর্য আছে। অণীমাণ্ডব্য এবং ধর্মের যতটুকু সংলাপ আমরা শুনেছি এবং তাতে ধর্মের যে স্বরূপটুকুও এখানে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তাতে পণ্ডিতেরা স্বভাবতই একটু দ্বিধান্বিত। কে এই ধর্ম? ইনি তো যমরাজ নন, যিনি পৌরাণিক ঐতিহ্যে মানুষের পাপপুণ্যের বিচারক ধর্মরাজ বলে চিহ্নিত, ইনি তো তিনি নন। ধর্ম বলতে শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত ইত্যাদি যত ধর্ম বুঝি, ইনি তো তাও নন। আবার ধর্ম বলতে যে ফুল বেলপাতা নৈবেদ্যের সমাহার বোঝানো হয় এ ধর্ম তো তাও নয়। তা হলে কে অথবা কী এই ধর্ম?

অণীমাণ্ডব্য যখন ধর্মের কাছে নিজের অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, তখন তার একটা অদ্ভুত বিশেষণ দিয়েছেন মহাভারতের কবি। বলেছেন অণীমাণ্ডব্য যখন ধর্মের কাছে গেলেন, তখন তিনি 'আসনস্থ' হয়েই ছিলেন—আসনস্থং ততো ধর্মম্। সেকালে রাজা যেমন শুচি সত্যসন্ধ হয়ে বিচারাসনে এসে বসতেন, মানুষের ন্যায় অন্যায়ের বিচার করতেন পূর্ববিহিত আইনকানুন অনুযায়ী—শুচিনা সত্যসন্ধেন যথাশাস্ত্রানুসারিণা—তখন তাঁকে 'ধর্মপ্রবর্তক' শব্দে অভিহিত করা হয়েছে। এখনকার দিনের আইনি ব্যবস্থা যেখানে নির্দেশিত হয় সে জায়গাটার নাম ধর্মাধিকরণ এবং যে জজসাহেব বিচারাসনে এসে বসেন তাঁকে ধর্মের অবতার (ধর্মাবতার) বলা হয় অর্থাৎ ধর্ম তাঁর নিরবয়ব শাস্ত্রস্বরূপ ছেড়ে অবতরণ করছেন মানুষের রূপে। তার মানে শুধু শুষ্ক শাস্ত্রনিয়ম নয়, বিচারের সময় আসনস্থ ধর্মকে মানুষের সত্তা দিয়ে অপরাধীর অপরাধ বুঝতে হবে। সেই জন্যই ধর্মের মানুষ হওয়া প্রয়োজন।

অণীমাণ্ডব্যের সঙ্গে ধর্মের যতটুকু কথোপকথন হয়েছে, তাতে বোঝা যায়—এই ধর্ম হলেন ন্যায় অন্যায় নির্ধারক শাস্ত্রের স্বরূপ, কর্তব্য করণীয়তা এবং বিচারের তুলাদণ্ডই যেন এই ধর্মের মূলাধার। অণীমাণ্ডব্য এই শুষ্কবিচারের ফলস্বরূপ শূলদণ্ডখানি নিজের দেহে বয়ে বেড়াচ্ছিলেন। রাজরক্ষীদের কাছে তিনি চোরদের ধরিয়ে দেননি—মানুষ চোর হয়েই জন্মায় না, চোরেরা কেন চুরি করে, কোন সামাজিক পরিস্থিতিতে, কোন ক্ষুধার জ্বালায় একটি মানুষ চোরে পরিণত হয়—এইসব হৃদয়ঘটিত যন্ত্রণাই হয়তো সেই মুহূর্তে তাঁর মনে কাজ করেছিল। তিনি চোর এবং রাজরক্ষী—দুয়ের ক্ষেত্রেই নিরপেক্ষ মৌন ছিলেন। অথচ তিনিও অপরাধী সাব্যস্ত হলেন। ন্যায় অন্যায়ের বিচারপদ্ধতির মূলাধার খুঁজতে গিয়ে তিনি দেখলেন—এ জগতে লঘুপাপে গুরুদণ্ড হয়, কখনও বা গুরুপাপে লঘুদণ্ড। এই পদ্ধতির বিরুদ্ধেই তাঁর অভিশাপ—ধর্মকে মানুষ হয়ে জন্মাতে হবে। শুধু মানুষ নয়, শূদ্রযোনিতে মানুষ হয়ে জন্মাতে হবে।

মানুষ কেন? শূদ্র কেন? মানুষ এই জন্য, যাতে শাস্ত্রবিহিত নিয়মকানুন এবং আইনের বিধিব্যবস্থার সঙ্গে মানুষের হৃদয় সংযুক্ত হয়। অর্থাৎ শুষ্ক তর্কের মধ্যেই যেন ধর্মের প্রতিষ্ঠা না ঘটে। অপরাধ এবং শাস্তির ভয়ানক যৌক্তিকতার মধ্যেই যেন বিচারের পর্যবসান না ঘটে যায়, বিচারের ফলশ্রুতি যেন আকাশ থেকে দৈব এবং নিয়তির মতো না নেমে আসে। এই জন্য ধর্মকে মানুষ হতে বলা হয়েছে, কারণ শাস্ত্রবিধি, আইনকানুন যতই থাকুক, মানুষই মানুষের বিচার করে। আর শূদ্রযোনিতে ধর্মের অবতরণ ঘটানোর পিছনে তো আরও এক বিরাট উদ্দেশ্য আছে মহাভারতের কবির।

দেখুন, শূদ্ররা হলেন সেকালের আম-জনতার প্রতীক। সেকালের একটি জনপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়রা আর ক'জন থাকতেন, যাঁদের নিয়ে জনপদ গড়ে উঠত, তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগই হতেন জাতিতে শূদ্র, আর খানিকটা বৈশ্য। কতিপয় ব্রাহ্মণ আর কতিপয় ক্ষত্রিয়। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও গ্রামবাংলায় এই ধরনেরই জনসন্নিবেশ দেখা যেত। অন্যদিকে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে কৌটিল্য যখন অর্থশাস্ত্র লিখছেন, তখন তিনি নির্দেশ দিয়েছেন—একটি আদর্শ জনপদ হল সেটাই, যেখানে প্রচুর শূদ্র থাকবেন, তাঁদের কৃষিকর্ম এবং পরিশ্রমের সুফল পাবেন রাজারা—জনপদং...শূদ্রকর্ষকপ্রায়ং...নিবেশয়েৎ। এতে বোঝা যায় একটি রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই হলেন শূদ্র। অতএব শূদ্র মানেই জনতার প্রতীক। সেই শূদ্রযোনিতে ধর্মকে জন্মাতে হবে—অণীমণ্ডব্যের ঈপ্সিত তাই। ধর্ম বিদুররূপে জন্মালেন শূদ্রাণীর গর্ভে। যে ধর্ম এতদিন ধর্মাসনে বসে শাস্ত্রের বাণী আউড়ে চলেছিলেন, তাঁকে যখন জনতার মধ্যে নেমে আসতে হল তখনই তাঁর দায় এনে গেল মানুষের হয়ে কথা কওয়ার, নিপীড়িতের হয়ে কথা কওয়ার।

বিদুরের দিকে তাকিয়ে দেখুন—তিনি তাঁর মহান পিতা ব্যাসদেবের মতো ঋষির সংস্কারে চলেননি, তিনি জ্যেষ্ঠ ভাইদের মতো কোনও দিন কারও ওপর রাজার শাসন জারি করেননি। ব্রাহ্মণ-শূদ্রাণীর জাতক হয়ে জন্মালে যেভাবে চলতে হয় সেইভাবেই তিনি জীবনযাপন করেছেন, কিন্তু স্বরূপত নীতি নিয়ম ধর্মের প্রতিষ্ঠা তাঁর মধ্যে থাকার ফলে যেখানেই তিনি অন্যায় দেখেছেন, সেখানেই তিনি প্রতিবাদ করেছেন। তিনি নিপীড়িতের পক্ষে থেকে প্রতিবাদ করেছেন আজ্ঞাকারী রাজার অন্যায় আদেশের, নিপীড়িতা স্ত্রীলোকের পক্ষে থেকে আঘাত করেছেন অত্যাচারী শক্তিমত্ত পুরুষের অভিমানে। প্রতিবাদই তাঁর ধর্ম, তাতে নিয়ম পালটে যায়নি সবসময় অথবা শক্তিমানের শাসনও রুদ্ধ হয়ে যায়নি তখনই, কিন্তু জনতার সাধারণ বোধে যে প্রতিবাদ আসে, সেই প্রতিবাদ তিনি সবসময় করে গেছেন। শূদ্রাণীর গর্ভজাত বলে তিনি জনতার যন্ত্রণা হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন, অন্যদিকে ঋষিপিতার ঔরসজাত বলে ঠিক সময়ে উচিত কথা বলার অধিকারটুকুও তাঁর আছে; এই বিপরীত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই ধর্মের প্রতিষ্ঠা ঘটে সবচেয়ে ভালভাবে। বিদরের জন্মরহস

এই জন্যই এত তাৎপর্যময় যে, তিনি জাতিগতভাবে, অধিকাংশ মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে এবং ধর্ম, নীতি, নিয়ম, শৃঙ্খলার অযান্ত্রিক সত্তা হিসেবে সম্পূর্ণ মহাভারতের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন।

মহাভারতে যে মুহূর্তে প্রায়োচ্ছিন্ন কুরুবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটল পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুরের মাধ্যমে, সেই মুহূর্ত থেকেই ভারত-ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি পালটাতে লাগল। পাণ্ডু রাজা হলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র হলেন না—এই সাধারণ মন্তব্যটি করার পরের মুহূর্তেই আমরা আশ্চর্য হয়ে মহাভারতে দেখছি যে, ভীষ্ম হঠাৎই একদিন বিদুরকে ডেকে নিয়ে আলাদা এক আলোচনায় বসলেন। কেন? না, বিদুর নাকি সময়োচিত কর্তব্য এবং সমাজের রীতিনীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল—বিদুরং ধর্মতত্ত্বজ্ঞং বাক্যমাহ যথোচিতম্। যে ভীষ্ম এই সেদিনও তিন কুমারকে অস্ত্রশিক্ষা, নীতিশিক্ষা দিচ্ছিলেন এবং যে ভীষ্ম নিজেও রাজনীতি, সমাজনীতি সম্পর্কে যথেষ্ট ব্যুৎপন্ন,—সর্বনীতিমতাং বরঃ—তিনি সদ্যযৌবনপ্রাপ্ত বিদুরকে ডেকে কী জিজ্ঞাসা করছেন? না, তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডু এবং ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে কোন মেয়ের বিয়ে দেওয়া উচিত, এবং কেনই বা তা দেওয়া উচিত।

বিদুরের সঙ্গে আলোচনায় যিনি বসছেন, সেই কুরুবৃদ্ধের কথা বলার ভঙ্গিটাও এই মুহূর্তে লক্ষণীয়। ভীষ্ম বললেন—আমাদের এই বিখ্যাত কুরুবংশের মর্যাদা এবং গৌরব সর্বত্র বিদিত। এই বংশের পূর্বজ রাজারা ন্যায়, নীতি এবং ধর্মানুসারে সগৌরবে রাজত্ব করে এসেছেন এতকাল। এই মহান বংশ যাতে উচ্ছিন্ন না হয়ে যায়, সেজন্য এতকাল ধরে আমি, জননী সত্যবতী এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস সকলেই অনেক চেষ্টা করেছি এবং সেই চেষ্টার ফলেই তোমাদের মাধ্যমে আজ কুরু-ভরতবংশের কুলতন্তুগুলি পুনঃস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এখন যাতে এই বংশের বৃদ্ধি ঘটে, তোমাদের সন্তানসন্ততিতে এই রাজগৃহ যাতে পূর্ণ হয়ে ওঠে সেই চেষ্টা আমাকেও যেমন করতে হবে, তেমনই করতে হবে তোমাকেও—তথা ময়া বিধাতব্যং ত্বয়া চৈব ন সংশয়ঃ। কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মের কথা শুনে বুঝতে পারি—তিনি এতদিনে তাঁর আলোচনার উপযুক্ত সঙ্গী পেয়ে গেছেন। সেই শান্তনুর সময় থেকে যাঁকে আপন পিতার বিবাহ নিয়ে ভাবতে হয়েছে, তিনি নিজেও যে কারণে বিবাহ করেননি, সেই কুরুকুলের উচ্ছেদ ঘটে যাচ্ছিল বিচিত্রবীর্যের অকালমৃত্যুর ফলে। জননী সত্যবতীর মন্ত্রণায় শেষ পর্যন্ত ব্যাসকে ডেকে এই রাজবংশের ধারা অব্যাহত রাখা গেছে। কিন্তু সত্যবতী কিংবা ব্যাস তাঁকে যতই সাহায্য করুন, ভরত-কুরুবংশের মর্যাদা সম্বন্ধে সব সময় সব দুর্ভাবনাগুলিই প্রধানত ভাবতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু আজ তিনি সেই দুর্ভাবনা সমভাবে বণ্টন করে নেওয়ার উপযুক্ত আধার পেয়ে গেছেন বিদুরের মধ্যে। ভীষ্ম নিজে যেমন সমস্ত স্বার্থ বলি দিয়ে এই বিখ্যাত রাজবংশের স্থিতিসমৃদ্ধির কথা চিন্তা করেছেন, আজ তিনি বুঝে গেছেন যে, স্বার্থ বলি দেবার মতো আরও একটি মানুষ এসে গেছে এই কুলে। তাঁরও রাজা হবার সম্ভাবনা নেই, কিন্তু ভীষ্মের মতোই এই রাজবংশের সুস্থিতি এবং সুরক্ষা নিয়ে ভাবনা করার নিষ্কাম নিঃস্বার্থ উদারতা এই মানুষটির আছে। এই কারণেই প্রায় সমবয়সি অথবা ঈষদধিক বয়োজ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর বিবাহ নিয়ে বিদুরের সঙ্গে সমস্যা ভাবতে বসেছেন ভীষ্ম। বলেছেন—এসব ব্যাপারে আমাকেও যেমন ভাবতে হবে, তেমনই তুমিও ভাববে আমারই মতো করে—তথা ময়া বিধাতব্যং ত্বয়া চৈব ন সংশয়।

কুরুবংশের এই বিশাল বটবৃক্ষটির সামনে বিদুর তাঁর নিজস্ব কোনও মতামত জানাননি এবং ঠিক এইখানেই তাঁর মর্যাদাবোধ। বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তিকে যদি অকারণে অধিকার দেওয়া যায়, তবে তার যদি বুদ্ধি এবং নিজের মর্যাদাবোধ প্রখর থাকে, সেক্ষেত্রে কখনওই সে বয়োজ্যেষ্ঠের মর্যাদা হানি করে না। অতএব ভীষ্ম তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের কনিষ্ঠ ব্যক্তিটির সঙ্গে যখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রণা করতে বসলেন, তখন বিদুর তাঁকে সংসারের বৃদ্ধ পিতাঠাকুরটির মর্যাদা দিয়ে বললেন—আপনিই আমাদের পিতা, আপনিই আমাদের মাতা,

আপনিই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু। অতএব এই মহান বংশের যাতে হিত হয়, আপনি নিজেই বিচার করে, সেই হিত বিধান করুন—তস্মাৎ স্বয়ং কুলস্যাস্য বিচার্য্য কুরু যদ্ধিতম্।

পাণ্ডু এবং ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ দিলেন ভীষ্ম। বিবাহ দিলেন বিদুরেরও। একটু পার্থক্য অবশ্যই হল। বিদুর যেমন ব্রাহ্মণ পিতা এবং শূদ্রা মাতার গর্ভজাত বলে জাতিতে 'পারসব' বলে পরিচিত ছিলেন, ভীষ্ম সেই বিদুরের বিবাহের জন্য একটি 'পারসবী' রমণীর সংবাদ পেলেন হস্তিনাপুরে ঘুরতে আসা ঋষিমুনিদের কাছ থেকে। তিনি শুনলেন—মেয়েটি সুন্দরী এবং শুভলক্ষণযুক্তা এবং সেও রাজার ঘরের মেয়ে—অথ পারসবীং কন্যাম্ দেবকস্য মহীপতেঃ। বিদুরের বিবাহকালে ভীষ্ম দুটি বিষয় খেয়াল রাখলেন। প্রথমত তিনি সমাজবিহিত সাধারণ বর্ণাশ্রমের আচার অতিক্রম করলেন না। হস্তিনাপুরের যে রাজশক্তি—সেই রাজশক্তি ব্যবহার করলে যে কোনও উচ্চজাতীয়া রমণীর সঙ্গেই বিদুরের বৈবাহিক সম্পর্ক ঘটাতে পারতেন ভীষ্ম। কিন্তু সেকালের দিনে বর্ণাশ্রম ধর্মের যে সাধারণ আচার চালু ছিল, তাতে এইভাবে রাজশক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে প্রতিলোম বিবাহ ঘটালে রাজ্যের মানুষ রাজার সম্বন্ধেই অভিযোগ আনত। বিশেষত এই বিবাহটা যেখানে প্রেম ভালবাসার মতো কোনও আকস্মিকতায় সংঘটিত হয়নি এবং যেহেতু এটা নিতান্তই সম্বন্ধকরা বিয়ে, অতএব এখানে অকারণে জাতিবর্ণের অতিক্রম করেননি ভীষ্ম।

তবে হ্যাঁ, বিদুর যেহেতু রাজবাড়ির সংস্কারে মানুষ হয়েছেন তাই সমান সংকরবর্ণ হলেও একটি রাজার ঘরে মানুষ হওয়া মেয়েই নিয়ে এসেছেন ভীষ্ম। বিদুরের বিবাহের ক্ষেত্রে জাতিবর্ণের মিশ্রতা এবং রাজকীয় মর্যাদা—এই দুই জটিল চাহিদা একসঙ্গে মেটাতে গিয়েই বোধ হয় তাঁর বিবাহ দিতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। লক্ষ করে দেখুন, ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডুর বিবাহই শুধু নয়, বিবাহের পর পাণ্ডু দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়েছিলেন, সেই দিগ্‌বিজয় পর্বও তখন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, অথচ তখনও আমরা দেখছি, বিদুরের বিবাহ হয়নি। দিগ্‌বিজয়ের পর পাণ্ডু যে বিপুল অর্থরাশি হস্তিনাপুরে নিয়ে এসেছিলেন, সেই অর্থের অনেকটাই ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে পাণ্ডু ভাগ করে দিয়েছিলেন পিতামহী সত্যবতীকে, ভীষ্মকে এবং বিদুরকে। বিদুরের কিন্তু তখনও বিবাহ হয়নি।

দিগ্বিজয়ের পরিশ্রমেই হোক অথবা জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রের অন্তর্গত অত্যধিক রাজ্যলালসা দেখেই হোক, পাণ্ডু এরপর তাঁর দুই স্ত্রীকে নিয়ে বন এবং পাহাড়ে বসতি গড়েছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর দুই স্ত্রীর সঙ্গে পরম সরসতায় দিন কাটাচ্ছেন; ঠিক এর পরেই দেখছি—মহারাজ দেবকের বিবাহযোগ্যা পারসবী কন্যার সংবাদ এসে পৌঁছেছে কুরুকুলের অভিভাবকসদৃশ ভীষ্মের কাছে—অথ পারসবীং কন্যাং দেবকস্য মহীপতেঃ। ভীষ্ম সেই রূপযৌবনসম্পন্না পারসবীকে রাজধানীতে আনিয়ে নিয়ে তাঁর সঙ্গে বিদুরের বিবাহ দিলেন। সেই পারসবী রমণীর গর্ভে বিদুরের কয়েকটি পুত্রও হয়েছিল, যদিও কীর্তি এবং গুণের তেমন মহত্ত্ব তাঁদের মধ্যে দেখা যায়নি বলেই, তাঁদের নামও আমরা জানি না।

মহারাজ পাণ্ডু যখন দুই স্ত্রীর সঙ্গে বনে-বনান্তরে ভ্রমণ অথবা মৃগয়াব্যসনে দিন কাটাচ্ছেন, তখন হস্তিনাপুরের রাজ্যশাসন ধৃতরাষ্ট্রের হাতেই ন্যস্ত ছিল। এক প্রাজ্ঞমানিনী লেখিকা নতুন এক উপন্যাস রচনা করে লিখেছেন—বিদুর নাকি কুন্তীর উপভোগ-লালসায় এইসব সময়ে মাঝে মাঝে ধৃতরাষ্ট্রের দানসামগ্রী পাণ্ডুকে পৌঁছে দেবার ছলে সেইসব বনে-বনান্তরে উপস্থিত হতেন এবং তখনই নাকি কুন্তীর এক একটি গর্ভের সূচনা হয়। ঈশ্বর এই অতিকথাজননী লেখিকার হৃদয়বিকার শান্ত করুন, কেননা তিনি জানেন না যে, ভারতবর্ষে সময়াতীত কাল থেকে এখন পর্যন্ত মহাভারতের বিচার যেভাবেই হোক, তাতে শব্দপ্রমাণ অতিক্রম করা হয়নি কখনও। রাজনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, এবং সাহিত্য—যা কিছুই মহাভারত থেকে উদ্ধার করতে হয়, সেখানে মহাভারতের শব্দপ্রমাণ অতিক্রম করা যায় না।

যা করা যায়, তা খুব বেশি হলে, বিশ্লেষণ। কিন্তু সেই বিশ্লেষণভঙ্গি অঙ্গীকার করলেও মহাভারত যেখানে বলছে—ধৃতরাষ্ট্রের দ্বারা প্রেরিত হয়ে কতগুলি লোক নিরলসভাবে পাণ্ডুর ঈপ্সিত ভোগ্যসামগ্রী সেই বন-বনান্তে পৌঁছে দিত—উপজহ্রুর্বনান্তেষু...নরাঃ নিত্যমতন্দ্রিতাঃ—সেখানে কি কোনওভাবেই বলা চলে যে, বিদুর মাঝে মাঝে সেখানে যেতেন কুন্তীর সঙ্গে গোপন মিলন সাঙ্গ করতে? বস্তুত এমন বললে, চরম অপমান-সওয়া কালিদাসের শকুন্তলার সেই চরম অভিব্যক্তিটুকু মনে পড়ে—রাজা! তুমি তোমার নিজের মতো করেই সব ঘটনা দেখতে অভ্যস্ত—অত্তনো হিঅয়ানুমানেন পেক্‌খসি।

যাক এসব কথা। যাঁরা লিখবার সময় নিজেরাই বুঝতে পারেন না যে, তাঁরা উপন্যাস লিখছেন না প্রবন্ধ লিখছেন, তাঁদের কথা অনালোচ্য। তবুও যে মাঝে মাঝে আলোচনায় যাচ্ছি তা শুধুই এই কারণে যে, মহাভারতের কবি যথেষ্ট করুণভাবেই তাঁর প্রিয়তম পুত্রের চরিত্র অঙ্কন করেছেন; সেই কারুণ্যের মাঝখানে যদি অনর্থক কলঙ্কলেপন করে বিদুরকে নিন্দনীয় করে তোলা হয়, তা হলে মহাভারত তথা বিদুরের জনক স্বয়ং ব্যাসের শব্দ-সরস্বতীর শুভ্র বসনখানিই মসীলিপ্ত হয়ে যাবে। সত্যি বলতে কী, বিদুর নামটির মধ্যেই এমন এক বিধুর ভাব আছে, যাতে বোঝা যায়—এই মানুষটি সারা জীবন আপন অনুভূত সত্যের জন্য লড়াই করে যাবেন, অথচ কেউ তাঁর লড়াইয়ের মর্যাদা দেবে না, তিনি সারা জীবন যাঁদের ভালর জন্য কথা বলে যাবেন, তাঁরা তাঁর কথা শুনবেন না, তিনি সারা জীবন যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাটিকে সুপথে চালিত করার চেষ্টা করবেন, সেই ভ্রাতা তাঁকে চিরকাল ভুল বুঝবেন।

যে রাজবাড়িতে বিদুর থাকেন, সেখানে কোনও কর্মে তাঁর একান্ত অধিকার নেই, কোনও শাসন জারি করে তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব নয়—এটাই করতে হবে। প্রতিপদে তাঁকে মনে রাখতে হয় শূদ্রা জননীর গর্ভস্থ হওয়ার যন্ত্রণা। অথচ তিনি রাজভ্রাতা, তাঁর অতিশায়িনী বুদ্ধিবলে তিনি রাজার মন্ত্রণাদাতাও বটে। কিন্তু এই যে চিরকাল মধ্যভূমিতে বিচরণ—শাসন স্বায়ত্ত নয়, অথচ তিনি শাসনের সঙ্গে জড়িত; মন্ত্রণা দেন, অথচ মন্ত্রণা কার্যকর হয় না; তিনি বলেন, অথচ যাঁকে বলেন, তিনি শোনেন না—এই যে কর্তৃত্বহীন ক্রিয়ান্বয়িতা—এই জন্যই বড় বিধুর তাঁর জীবন, হয়তো সেই ঘোষণার কর্তৃত্বহীন অন্তঃস্থ সত্য ঘোষণার কারণেই দুটি অন্তঃস্থ এবং একটি ঘোষবর্ণে তাঁর নাম তৈরি হয়েছে—বিদুর।

স্মরণ করুন, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের প্রথম পুত্রটি যেদিন জন্মাল, সেই দিনটির কথা। প্রকৃত রাজ্যাধিকারী পাণ্ডু তাঁর রাজ্যভার জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত করে দিয়ে বনে চলে গেছেন। রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র যখন যাঁর হাতে থাকে এবং তা যদি অনেক দিন ধরে থাকে, তবে ক্ষমতা এবং প্রভুশক্তি তাঁকে মোহগ্রস্ত করে তোলে। এ যেমন সেকালের রাজতন্ত্রে, তেমনই একালের গণতন্ত্রেও। শুধু অন্ধত্বের জন্য যে জ্যেষ্ঠ রাজা হতে পারেননি, সেই ধৃতরাষ্ট্রের মনে রাজ্যশাসনের যে আকাঙক্ষা ছিল, সেই আকাঙক্ষা পাণ্ডুর অনুপস্থিতিতে লালসায় রূপান্তরিত হয়েছে। মহামতি বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের এই আকাঙক্ষা এবং লালসা দুইয়ের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন। পরিচিত ছিলেন ভীষ্মও। ঠিক সেই কারণেই যেদিন ধৃতরাষ্ট্রের প্রথমপুত্রের জন্ম হল সেদিন ভরতবংশের বংশকর পিতা ব্যাসদেব কিন্তু ভীষ্ম আর বিদুরকে ডেকে একান্তে জানিয়ে গেলেন—দেখো বাপু! দুর্যোধন এই রাজগৃহে জন্মালেন বটে, কিন্তু জন্মের সময় বিচার করলে মহারাজ পাণ্ডুর পুত্র যুধিষ্ঠিরই সকলের জ্যেষ্ঠ এবং তিনিই রাজপদের দাবিদার—জন্মতস্তু প্রমাণেন জ্যেষ্ঠো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।

ব্যাসের কী প্রয়োজন ছিল একথা ধৃতরাষ্ট্রকে না জানিয়ে ভীষ্ম এবং বিদুরকে জানানোর? ভীষ্ম এবং বিদুর এই জন্য যে, তাঁরা এই কুরুবংশের অভিভাবকের মতো। তাঁদের রাজাসনে আসক্তি নেই, কিন্তু ভরত-কুরুবংশের মর্যাদা এবং উত্তরাধিকার সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন। এমন

লোকই নিষ্কামভাবে সত্য উচ্চারণ করতে পারেন এবং তা অপ্রিয় হলেও আইনসিদ্ধ অথবা সেকালের ভাষায় ধর্মসিদ্ধ হবে—ঠিক এই জন্যই ধৃতরাষ্ট্রের রাজমহল থেকে বনে চলে যাবার আগের মুহূর্তে ভীষ্ম এবং বিদুরকে সচেতন করে যাওয়া, কারণ যে বাড়িতে লোভ-লালসার আগুন জ্বলছে, তার আঁচটুকুও আন্দাজ করতে পারবেন না, এমন আহাম্মক মহাকাব্যের জনকও নন, ধৃতরাষ্ট্রের জনকও নন।

আর ধৃতরাষ্ট্রকে কেন তিনি যুধিষ্ঠিরের জ্যেষ্ঠতার কথা বললেন না, তার প্রমাণ ধৃতরাষ্ট্রই দিয়েছেন স্বয়ং। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের জন্মের খবর পেয়ে গেছেন অনেক আগেই। তবুও তাঁর প্রথমপুত্র যেদিন জন্মাল, সেইদিনই তিনি রাজসভায় ডেকে পাঠালেন ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদের, ডেকে পাঠালেন ভীষ্মকে এবং বিদুরকেও—সমানীয় বহূন বিপ্রান্ ভীষ্মং বিদুরমেব চ। ব্যাস কুরুকুলের অভিভাবকতার ভাবনায় ভীষ্ম এবং বিদুরকে যুধিষ্ঠিরের জ্যেষ্ঠতার কথা জানিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেই ভীষ্ম এবং বিদুরকে ধৃতরাষ্ট্রও রাজসভায় ডাকলেন, কিন্তু ঠিক অভিভাবকতার ভাবনায় নয়। তিনি ভাবলেন—অন্তত এই দুজনকে যদি একবার মত করানো যায়, তা হলে তাঁর পুত্রটির ভবিষ্যৎ নিয়ে আর কোনও চিন্তা থাকে না। তিনি নিজে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজা হতে পারেননি কিন্তু তাঁর পুত্র রাজা হতে পারবেন না কেন?

রাজসভায় ধৃতরাষ্ট্রের বক্তব্য নিবেদন করার মধ্যে কৌশল ছিল যথেষ্ট। তিনি বলেছিলেন —যুধিষ্ঠির তো এই বংশের সকলের বড় এবং তার মাধ্যমে আমাদের এই রাজবংশের বৃদ্ধি ঘটবে বলেই আমি আশা করি। চিরন্তন নিয়মে এবং তার নিজের গুণেই যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরের রাজ্যভার পাবে—এতে আমাদের বলার কিছু নেই। কিন্তু একটা কথা সবাই ঠিকঠাক বলবেন কি—যুধিষ্ঠিরের পরে আমার এই ছেলেই রাজ্য পাবে তো—অয়ন্তু অনন্তরস্তস্মাদ্ অপি রাজা ভবিষ্যতি?

একবার ভেবে দেখুন, কথাটার কী মানে হয়! যুধিষ্ঠির এবং দুর্যোধনের বয়সের পার্থক্য মাত্র এক বছর। দুজনেই দীর্ঘজীবী হলে অন্যতরের রাজত্বপ্রাপ্তির আশা প্রায় থাকেই না। প্রায় সমবয়সি মানুষ একই দপ্তরে কাজ করতে ঢুকলে, বয়ঃকনিষ্ঠের বিভাগমুখ্য হওয়ার সম্ভাবনাটুকু যেমন চলে যায়, এখানেও তাই হয়েছে বটে, কিন্তু বিশেষ এইটুকুই যে, তবু ধৃতরাষ্ট্র তাঁর আপন পুত্রের রাজ্যপ্রাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে চাইছেন। এর একটাই মানে দাঁড়ায়—হয় যুধিষ্ঠিরকে তাড়াতাড়ি মরতে হবে, নয়তো তাঁকে মেরে ফেলতে হবে। না হলে ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রশ্ন অমূলক হয়ে ওঠে। মহাভারত বলেছে— ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে নানারকম দুর্লক্ষণ দেখা দিল—বিনা কারণে শেয়াল শকুন ডেকে উঠল, দমকা হাওয়া বইল হঠাৎ করে, চতুর্দিক গরম হয়ে উঠল। এইসব দুনির্মিত্ত দেখেই উচিতকথা বলতে আরম্ভ করলেন বিদুর।

হ্যাঁ, আজকের এই বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে এইসব প্রাকৃতিক দুর্লক্ষণ হাস্যকর মনে হতে পারে, কিন্তু এই ধরনের দুর্নিমিত্ত-কথনের একটা উদ্দেশ্য আছে। একটা ‘মোটিফ’ হিসেবে এই দুর্লক্ষণগুলি কাজ করে, বিশেষত মহাকাব্যে। আসলে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের মধ্যেই ভয়ংকর দুর্লক্ষণ ছিল। একটি দূরস্থিত নিরপরাধ শিশুর জন্মলগ্নেই তার বিরুদ্ধে—এর জন্ম না হলেই ভাল হত—এমন এক পাপীয়সী আকাঙ্ক্ষা ছিল। পুনশ্চ তারপরে—অর্থাৎ অবশ্যই তাঁর মৃত্যুর পরে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রটি রাজা হবে কি না, এই প্রশ্নের মধ্যেই রাজনৈতিক অস্থিরতা তথা উষ্ণতার এক প্রতীকী সম্ভাবনা ছিল, যা প্রকাশিত হয়েছে মহাকাব্যিক উপকরণে—শেয়াল শকুনের ডাক, দমকা হাওয়া এবং দিগ্‌দাহের দুনির্মিত্ত সূচনায়।

বিদুর বললেন—মহারাজ! আপনার জ্যেষ্ঠপুত্রের জন্মলগ্নেই যত দুর্লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি, তাতে বেশ বুঝতে পারছি যে, আপনার পুত্রটি এই মহান ভরতবংশের ধ্বংস ডেকে আনবে।

শুধু প্রাকৃতিক দুর্লক্ষণ দেখেই যে বিদুর একটি শিশুর জন্মমাত্রেই তার ভবিষ্যৎ উচ্চারণ করছেন না, তা তাঁর পরবর্তী বাক্যেই উচ্চারিত। তিনি বলেছেন—এই পুত্রকে ত্যাগ করলেই শান্তি আসবে, কিন্তু একে ভাল করে সুরক্ষা দিলে রাজনৈতিকভাবে পরম অকল্যাণ ঘটবে, মহারাজ—তস্য শান্তিঃ পরিত্যাগে গুপ্তাবপনয়ো মহান্। এ শিশুর জন্মমাত্রেই যে ধৃতরাষ্ট্র রাজনৈতিকভাবে সোচ্চার হচ্ছেন, সে কথাটা সম্যক উপলব্ধি করেই বিদুর জবাব দিয়েছেন সেকালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষা ব্যবহার করে। বলেছেন—এই পুত্রের ত্যাগেই শান্তি, উলটো দিকে একে ঘরে রাখলেই সেটা হবে অপনয়।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেখবেন—রাজনৈতিকভাবে শম বা শান্তির অবস্থা হল সেটাই, যখন রাজা পূর্বকৃত সুকর্মের ফল ভোগ করেন। আর অপনয় হল ভুল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। রাজনৈতিকভাবে যেখানে যে নীতি গ্রহণ করা উচিত নয়, সেখানে সেই নীতি প্রয়োগ করে রাজা যদি সমস্যায় পড়েন, তবে সেটাকে বলে অপনয়। মহাভারতের বহু জায়গায়, বিশেষত রাজধর্মপ্রকরণে এই 'অপনয়'-এর কথা অনেক আছে। অতএব ঠিক এই বিশেষ শব্দগুলি প্রয়োগ করে বিদুর বুঝিয়ে দিলেন যে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নটা যতখানি হৃদয় এবং আবেগতাড়িত, তার চেয়ে অনেক বেশি রাজনৈতিক স্বার্থপ্রণোদিত। বিদুর হৃদয়হীন নন, ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধারও অন্ত নেই, কিন্তু ব্যক্তি-মানুষের থেকে রাষ্ট্রের হিত তাঁর কাছে অনেক বড়, আর ঠিক সেইজন্যেই ধৃতরাষ্ট্রের করা আপাতসরল ওই প্রশ্নের রাজনৈতিক তাৎপর্য বুঝিয়ে দিয়ে বিদুর বললেন—ওই একটি কম নিরানব্বইটি পুত্র নিয়েই আপনি সুখে থাকুন, মহারাজ! কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে ত্যাগ করুন। তাকে ত্যাগ করলে আপনি শুধু এই বংশেরই হিত করবেন না, আপনি এই রাষ্ট্রেরও হিত বিধান করবেন। কথায় বলে—একজনের জন্য একটা বংশ বিপন্ন হলে, সেই ব্যক্তিটিকেই ত্যাগ করা উচিত। একটি বংশ বা পরিবারের জন্য একটি গ্রাম বিপন্ন হলে, গোটা গ্রামের স্বার্থে সেই পরিবারটিকেই ত্যাগ করা উচিত। একটি গ্রামের জন্য সম্পূর্ণ জনপদ যদি বিপদগ্রস্ত হয়, তবে সেই গ্রামটিকেই ত্যাগ করা উচিত। আর যদি শারীরিকভাবে মানুষ নিজে বিপন্ন হয়, তবে বেঁচে থাকার জন্য এই পৃথিবীটাও ত্যাগ করা যেতে পারে।

বিদুর বুঝেছিলেন এবং অন্য সকলের চেয়ে আগে বুঝেছিলেন যে, পুত্রজন্মের সঙ্গে সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের মনের মধ্যে আজ আনুষ্ঠানিক রাজপদবী লাভের অতৃপ্ত লালসা কাজ করতে আরম্ভ করেছে। তিনি নিজে অন্ধত্বের জন্য রাজা হতে পারেননি, তাঁর পুত্রের যদি বা সে সম্ভাবনা ছিল, পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরেব জ্যেষ্ঠতায় সে সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল। বিদুর বুঝেছিলেন যে প্রাপ্য বস্তু না পাওয়ার ফলে যে লালসা এবং ক্ষোভ ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয়ের মধ্যে জমা হয়েছিল, সেই লালসা এবং ক্ষোভই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররূপে জন্মাল দুর্যোধনের চেহারায়। এখনই যদি একে ত্যাগ না করা যায়, তবে পিতার স্নেহান্ধতায় এই লালসাঙ্কুর বিবর্ধিত হয়ে বিষ-মহীরূহে পরিণত হবে। অন্যায় আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে রাজসভায় ধৃতরাষ্ট্র যে মায়াময় প্রশ্ন করেছিলেন, বিদুর সেই প্রশ্নের মায়াজাল যে এমনভাবে মুক্ত করে দেবেন, তা ভাবেননি ধৃতরাষ্ট্র। তাঁর আপাতসরল অভিব্যক্তির অন্তরে যে রাজনৈতিক অভিসন্ধি ছিল সেটা যে এমনভাবে ধরা পড়ে যাবে, তা একবারের তরেও ধৃতরাষ্ট্র বোঝেননি। বুঝলে রাজসভা ডেকে সকলের সামনে তাঁর প্রশ্নটি করতেন না।

বিদুর তাঁকে পুত্র ত্যাগ করতে বলেছেন, সভায় সমবেত ব্রাহ্মণ মন্ত্রীরাও বিদুরের সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন বটে, কিন্তু তাই বলে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের কথা শুনে জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে পারেননি। বিদুরও তাঁকে আর কিছু বলেননি। রাজসভায় মন্ত্রণা চাইলে তিনি মন্ত্রণাই দিতে পারেন, কিন্তু পাণ্ডুর অনুপস্থিতিতে ধৃতরাষ্ট্রই কার্যনির্বাহী রাজা। মন্ত্রণা কার্যকর না করলে রাজার কাছে তিনি জবাবদিহি চাইতে পারেন না বা তাঁকে অতিক্রমও করতে পারেন না। বিদুর রাজার মর্যাদা সম্বন্ধে ততটাই সচেতন, যতটা সচেতন তিনি নিজের সীমা

সম্বন্ধেও।

ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডুরা পুত্রলাভ করার পর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। ইতিমধ্যে শতশৃঙ্গ পর্বতেই স্বকর্মবিপাকে মারা গেছেন পাণ্ডু। শতশৃঙ্গবাসী ঋষিরা পাণ্ডু এবং মাদ্রীর শবশরীর নিয়ে হস্তিনায় উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে অবশ্যই আছেন কুন্তী এবং পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র। সেদিন আবার রাজসভা বসেছে। ভীষ্ম পরম সমাদরে শতশৃঙ্গবাসী ঋষিদের সভায় বসিয়েছেন। সভায় উপস্থিত সকলের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র, বাহ্লিক, সোমদত্তের মতো মান্যগণ্য ব্যক্তিরা যেমন ছিলেন, তেমন ছিলেন বিদুর—ক্ষত্তা চ বিদুরঃ স্বয়ম্। সম্ভবত পাণ্ডুর পুত্রদের এই প্রথম দেখলেন সকলে। কিন্তু আকস্মিক পিতৃহীন পঞ্চপাণ্ডবকে দেখে অন্য সকলের যে ভাবই হয়ে থাকুক, সবচেয়ে বুঝি বিষণ্ণ হয়েছিলেন বিদুর। ভাবলেন বুঝি—যাঁদের পিতা রাজা ছিলেন, তাঁরা আজকে রাজবাড়িতে প্রবেশ করছেন ভিখারীর মতো; তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিতে এসেছেন শতশৃঙ্গবাসী ঋষিরা। রাজবাড়িতে এই বালকদের গৃহস্থিতি নির্ভর করছে ধৃতরাষ্ট্রের সদয় ব্যবহারের ওপর, কারণ পাণ্ডুর অনুপস্থিতিতে তিনিই কার্যনির্বাহী রাজা এবং এখন তো রাজাই। কারণ রাজদণ্ড তাঁর হাতে।

ঋষিরা পাণ্ডুপুত্রদের জন্মপরিচয় দিয়ে চলে গেলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র সঙ্গে সঙ্গে বিদুরকে আদেশ দিলেন পাণ্ডুর প্রেতকার্য এবং শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য। বিদুর ভীষ্মের সঙ্গে কথা বলে উত্তম ভূমিতে পাণ্ডু এবং মাদ্রীর শব-সংস্কার করলেন। সেই শব-সংস্কারের মধ্যে রাজকীয় আড়ম্বর ছিল, ছিল মমতাও! কেননা, সমস্ত ব্যবস্থা করেছেন বিদুর। গঙ্গার তীরে ব্যক্তিগত শ্মশানভূমিতে সেদিন উপস্থিত মানুষের সংখ্যা কম ছিল না। পাণ্ডু এবং মাদ্রীর চিতায় অগ্নিসংযোগ করামাত্র পাণ্ডুর জননী অম্বালিকা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন ভূমিতে। কুন্তীর আর্তনাদের সঙ্গে অনুরোদন করল পৌর-জানপদজনেরা। পিতামহ ভীষ্ম এবং বিদুর সেদিন অন্যদের মতোই গলা ছেড়ে কেঁদেছিলেন এবং এই ক্রন্দন পাণ্ডুর অকালমৃত্যুতে যতখানি, ঠিক ততখানিই হস্তিনাপুর রাজ্যের ভবিষ্যৎ অস্থিরতার ভাবনায়। নইলে দেখুন, যে মুহূর্তে পাণ্ডুর শ্রদ্ধক্রিয়া শেষ হল, সেই মুহূর্তেই পাণ্ডবদের সঙ্গে কীভাবে অসৎ ব্যবহার আরম্ভ হল, সেই প্রসঙ্গে চলে এসেছেন মহাভারতের কবি।

শুধু তাই নয়, সেই ছেলেবেলাতেই—যখন কুমারদের বাল্যক্রীড়ার বয়স পেরোয়নি—সেই ছেলেবেলাতেই দুর্যোধন কীভাবে ঐশ্বর্যলোভ আর রাজ্যলোভে প্রমত্ত হয়ে মধ্যম পাণ্ডব ভীমকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করছেন, কীভাবে পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে কারাগারে নিক্ষেপ করে দুর্যোধন রাজা হবার কথা ভাবছেন—মোহাদ্ ঐশ্বর্যলোভাচ্চ পাপা মতিরজায়ত—এসব প্রসঙ্গ মহাভারতে এসেছে ঠিক পাণ্ডুর শ্রাদ্ধক্রিয়া শেষ হবার পর। দুর্যোধন নিতান্ত ব্যক্তিগত পরিকল্পনাতেই পাণ্ডবদেব জলবিহারে নিয়ে গিয়ে ভীমের খাবারে বিষ মিশিয়ে দিলেন। অপিচ সেই বালক বয়সেও পাকা অভিনেতার মতো যেমন সহাস্যবদনে সেই বিষদিগ্ধ মিষ্টান্ন ভীমকে খাইয়েছিলেন দুর্যোধন, তাতে বোঝা যায়—ভবিষ্যতে তাঁর রাজ্যপ্রাপ্তির ইচ্ছাটা তাঁর একার নয় শুধু, সেখানে উপযুক্ত ইন্ধন আছে। ভবিষ্যতে ভীমের বলবত্তা এবং যুধিষ্ঠিরের বয়োজ্যেষ্ঠতা দুর্যোধনের রাজ্যলাভের অন্তরায় হতে পারে, অতএব ভীমকে এখনই মেরে ফেলে দুর্বল যুধিষ্ঠিরকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেই চলবে—দুর্যোধনের অন্তরে এই দুর্বুদ্ধি লালিত হবার পিছনে স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের নৈতিক ইন্ধন প্রসারিত না থাকলে, অথবা এই বিষয়ে গৃহমধ্যেই বহুল চর্চা না হয়ে থাকলে দুর্যোধনের পক্ষে এত সহজে, এত নিশ্চিন্তে ভীমকে বিষ দেওয়া সম্ভব হত না।

ভীমকে যেদিন বিষ দেওয়া হল, সেদিন পাণ্ডবদের ঘরে হাহাকার লেগে গেল। জননী কুন্তী পাগলের মতো একবার যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেন, আর বার বার পথ চেয়ে দেখেন। পুত্রমুখ না দেখে জননী কুন্তী সন্তর্পণে খবর পাঠালেন বিদুরকে, কেননা এই বিশাল

রাজবাড়িতে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, পাণ্ডবদের জন্য যাঁর সম্পূর্ণ সমব্যথা আছে। বিদুরকে ডেকে কুন্তী বললেন—ভগবান ক্ষত্তা! ভীম কোথায় গেছে? ভীমকে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। —ক্ব গতো ভগবন্ ক্ষত্তর্ভীমসেনো ন দৃশ্যতে। বিদুরকে ক্ষত্তা বলে ডাকা হত; ব্রাহ্মণের ঔরস থেকে শূদ্রার গর্ভে জাত ব্যক্তির কথ্য জাতি-নাম হল ক্ষত্তা। কিন্তু ক্ষত্তা হলেও তাঁর সম্মান যে কত, সেটা বোঝা যায় ক্ষত্তা শব্দের সঙ্গে ভগবান শব্দটা একত্র প্রযুক্ত হতে দেখে। কুন্তী তাঁর সন্দেহের কথা জানালেন বিদুরকে। নিশ্চয়ই দুর্যোধন তাকে মেরে ফেলেছে। কুন্তী বলেছেন—দুর্যোধন কখনওই ভীমকে ভাল চোখে দেখে না—ন চ প্রীণয়তে চক্ষুঃ। তার ওপরে দুর্যোধনের বুদ্ধি ভাল নয়, তার দয়া, মায়া, লজ্জা কিছুই নেই। রাজ্যপ্রাপ্তির লোভে সে ভীমকে মেরে ফেলতে একটুও কুণ্ঠিত হবে না। কুন্তী তাঁর সমস্ত ব্যাকুলতা জানালেন বিদুরকে।

কুন্তীর উদ্‌ভ্রান্ত হবার কারণ আছে, কারণ জলবিহার করতে গিয়ে তাঁর মধ্যমপুত্র ফিরে আসছে না এবং সে দুর্যোধনের চক্ষুঃশূল। অতএব হত্যাকাণ্ড একটা ঘটে থাকতেই পারে। এমনকী বিদুরও যে একথা বিশ্বাস করেন না, তা নয়। কিন্তু বিপৎকালে ধীর শান্ত থাকাটাই তাঁর স্বভাব। একমুহূর্তের মধ্যে তিনি ভেবে নিলেন যে, কুন্তী দুর্যোধনকে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সন্দেহ করছেন—একথা রাজ্যের রাজা হিসেবে ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্যোধন জানলে কী হবে? ধৃতরাষ্ট্রকে এর মধ্যেই বিদুর যেমন চিনেছেন, তাতে তিনি যে কোনওভাবেই তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধনকে প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করবেন না, তা বলা বাহুল্য। এসব ক্ষেত্রে তিনি যা করে থাকেন, অন্তরের সুখ চেপে রেখে বাইরে দুঃখ দেখিয়ে একটা সাড়ম্বর শ্রাদ্ধক্রিয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাতে আর যাই হোক, অন্য বিপদ থাকে না। কিন্তু একই সঙ্গে দুর্যোধনও যখন জানবেন যে, তাঁকেই হত্যাকাণ্ডের জন্য সন্দেহ করা হচ্ছে, তখন তাঁর ক্রোধ আরও বাড়বে। ভীমকে তিনি যেভাবে বিষ দিয়ে তাঁর দেহ নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে প্রমাণলুপ্ত করবার চেষ্টা করেছেন, এবার সেইভাবেই তিনি অবশিষ্ট পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে লাগবেন। ধৃতরাষ্ট্রের আয়ত্ত সম্পূর্ণ রাজযন্ত্র তাঁর হাতে এবং রাজ্যপ্রাপ্তির লোভে এই রাজযন্ত্র ব্যবহার করতে তাঁর বাধে না।

দুর্যোধনের চরিত্রের কথা ভেবেই কুন্তীকে শান্তমনে বুঝিয়ে বিদুর বললেন—আপনার পুত্র হত হয়েছে, এমন অকল্যাণের কথা বলবেন না। আপনার অবশিষ্ট পুত্রদের রক্ষা করার চেষ্টা করুন—মৈবং বদস্ব কল্যাণি শেষ-সংরক্ষণং কুরু। দুর্যোধনের বিরুদ্ধে যদি এমন অভিযোগ আনা যায় যে, কেন তুমি ভীমকে মেরেছ, তা হলে অপমানিত হয়ে সে আপনার অন্য পুত্রদের ওপর আঘাত হানবে। কাজেই আপনি যেমন বলছেন, তেমনটি করা যাবে না —প্রত্যাদিষ্টো হি দুষ্টাত্মা শেষে'পি প্রহরেত্তব। অবশেষে বিদুর পিতা দ্বৈপায়ন ব্যাসের আশীর্বাণী স্মরণ করিয়ে কুন্তীকে সান্ত্বনা দিলেন। বিদুর বললেন—মহর্ষি বলেছেন—আপনার ছেলেরা সব দীর্ঘায়ু হবে। কাজেই ভীম ঠিক ফিরে আসবে, দেখবেন। বিদুর কুন্তীর ঘরে বিলম্ব করলেন না। এই বিপন্নতার মধ্যে কুন্তী তাঁর ছেলেদের নিয়ে একাকী বসে রইলেন ভীমের অপেক্ষায়—দিন, রাত্রি, কয়েকদিন—কিন্তু বিদুর এলেন না পাণ্ডবগৃহে। কেননা, দুর্যোধন যদি একবার বোঝে যে, বিদুর তাঁদের শলাপরামর্শ দিচ্ছেন, তা হলে তাঁর কিছু হবে না, বিপদ বাড়বে পাণ্ডবদেরই। আসলে বহুকাল পরে হস্তিনাপুরে এসে স্থান নেবার ফলে পাণ্ডবরা দুর্যোধনের কাছে অনেকটা উড়ে এসে জুড়ে বসার মতো। ধৃতরাষ্ট্রও তাঁদের অশন আসন পরিধানের ব্যবস্থা যথেষ্ট করেছেন বটে। কিন্তু রাজপুত্রেরা, বিশেষত দুর্যোধন-দুঃশাসনেরা যে গুরুত্ব নিয়ে রাজকীয় পরম্পরা ভোগ করেন, পাণ্ডবরা পূর্ব রাজা পাণ্ডুর পুত্র হওয়া সত্ত্বেও তাঁরই রাজ্যে সেই পরম্পরা ভোগ করেন না। এখনকার ভাষায় এ স্বত্ব দখলী স্বত্ব নয়, ভোগস্বত্ব শুধু। পাণ্ডুর উত্তরাধিকারী হিসেবে যাঁর রাজা হওয়ার কথা, সেই যুধিষ্ঠির তাঁর জননী এবং ভাইদের নিয়ে যেভাবে দিন কাটাচ্ছেন, তা আর কেউ উপলব্ধি না করুক, বিদুর তা উপলব্ধি করেন। অতএব কুন্তীর এক পুত্রের ওপর যেভাবে আঘাত নেমে এসেছে,

সে আঘাত কতখানি, তা এই মুহূর্তে বিদুর পুরোপুরি না বুঝলেও, এ বিষয়ে শোরগোল তুললে যে পাণ্ডবরা রাজনৈতিকভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, সেটা বিদুর বোঝেন সবচেয়ে বেশি।

বিদুর বুঝেছেন—পাণ্ডবদের অনুকূলে যা কিছুই করতে হবে, তা বর্তমান রাজনৈতিক পরিকাঠামোর মধ্যে থেকেই করতে হবে এবং সেই জন্যই তা করতে হবে চুপেচাপে, অন্তরালে। এই কারণেই তিনি কুন্তীকে দুঃখ সহ্য করে অবশিষ্ট পাণ্ডবদের সুরক্ষায় মন দিতে বলেছেন, অপিচ নিজেও তিনি বেশিক্ষণ কুন্তীর ঘরে থাকেননি। উপযুক্ত পরামর্শ দিয়েই তিনি নিজের ঘরে চলে এসেছেন নিশ্চুপে যাতে ভীমের নিরুদ্দেশ হবার পরবর্তী কল্পে দুর্যোধন একেবারেই সন্দেহ না করতে পারেন যে, বিদুর কিংবা অন্যান্য পাণ্ডবরা তাঁর জঘন্য 'প্লট'টি বুঝে গেছেন—এবমুক্ত্বা যযৌ বিদ্বান্ বিদুরঃ স্বং নিবেশনম্।

বিদুরের যুক্তি সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করেছেন যুধিষ্ঠির। এই বিরুদ্ধ পরিবেশেও এই পিতৃব্যটিই তাঁদের সামগ্রিক হিতভাবনা করেন, সেকথা সর্বাংশে বুঝেছেন যুধিষ্ঠির। রাজযন্ত্র যাদের হাতে, তারা ভ্রষ্টাচারপরায়ণ হলে যে কোনও প্রতিরোধেই তাদের আক্রোশ বেড়ে যায়। এই অবস্থায় সহ্য করাটাই বিদুরের নীতি। ভ্রষ্টাচার চরমে পৌঁছোলে তার বিরুদ্ধে আপনিই জনমত তৈরি হবে এবং সেই অবস্থায় প্রতিরোধ করাটাই শ্রেয় মনে করেন বিদুর। ধর্মপরায়ণ পিতৃব্যের এই নীতি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মনে রেখাপাত করেছে এবং তা এতটাই যে, ভীম জীবনলাভ করে ফিরে এসে যখন দুর্যোধনের দুষ্কর্মগুলি বিবৃত করলেন, তখন যুধিষ্ঠির তাঁকে শাসন করে বলেছেন—এসব কথা জোরে বোলো না ভাই, ভবিষ্যতে আরও বিপদ আসতে পারে। আজ থেকে আমরা আরও সচেতন হব এবং সব ভাইরা মিলে পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করার চেষ্টা করব।

মহাভারতের একটি গৌড়ীয় পাঠে দেখতে পাচ্ছি—এই ঘটনার পরে পাণ্ডবদের রথবাহক প্রিয় সারথিটিকে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি হত্যা করে—সারথিং দয়িতঞ্চাস্য অপহস্তেন জঘ্নিবান্। হয়তো সমস্ত ঘটনার প্রমাণলোপের জন্য কোনও অপহস্তের হত্যাকাণ্ড এটি এবং তা দুর্যোধনের কর্ম বলেই সন্দেহ হয়। ভীমের খাবারে আরও একবার বিষ দেবারও নাকি চেষ্টা হয়—কালকূটং নবং তীক্ষ্নং...পুনঃ প্রাক্ষেপয়দ্ বিষম্। হয়তো এই ঘটনাগুলি সত্য নয়, কেননা বেশিরভাগ পাঠে এই ঘটনা দেখি না। কিন্তু এই অন্যায়গুলি বলার উদ্দেশ্য একটাই—দুর্যোধন বিভিন্ন উপায়ে পাণ্ডবদের কাউকে কাউকে শেষ করে দেবার চেষ্টা করছিলেন, চেষ্টা সফল না হলে আবারও সুযোগ খুঁজছিলেন—অনেকৈরভ্যুপায়ৈস্তান্ জিঘাংসন্তি স্ম পাণ্ডবান্। এই জিঘাংসার পথে দুর্যোধন এখন একাও নন, তাঁর সঙ্গে যোগ আছে রাজবাড়ির প্রসাদলোভী উচ্চাকাঙ্ক্ষী দুটি মানুষের—শকুনি এবং কর্ণ।

দুর্যোধনের এই মূলোচ্ছেদী চিন্তাধারার আপাতত কোনও প্রতিবাদ করেননি বিদুর। ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী হবার সুবাদে বহুদিন রাজযন্ত্রের সঙ্গে জড়িত থাকায় তাঁর অভিজ্ঞতা প্রচুর এবং কিছু শুভবুদ্ধি লোকও তাঁর হাতে আছে যাঁরা দুর্যোধন কর্ণ শকুনির অন্তর-ভাবনা বিদুরের কাছে প্রকট করত। এই শুভবুদ্ধি মানুষগুলোর মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন যুযুৎসু, যিনি ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে এক বৈশ্যা দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি কৌরব-গৃহেরই জাতক, অথচ নীতিপরায়ণ মানুষ বলে দুর্যোধন-শকুনিদের অপভাবনাগুলি বিদুরের কাছেও জানাতেন এবং কখনও পাণ্ডবদেরও জানাতেন—বৈশ্যাপুত্রস্তদাচষ্ট পার্থানাং হিতকাম্যয়া। বিদুর অবশ্য সব জেনেবুঝেও চুপ করে ছিলেন এবং রাজবাড়ির মধ্যেই ওই দুষ্ট চতুষ্টয়—দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি এবং কর্ণের দুষ্কর্ম-কৌশল লক্ষ করে তিনি আরও বেশিমাত্রায় পাণ্ডবদের রক্ষায় ব্রতী হন, যদিও তাও একেবারেই নিশ্চপে—ধর্মাত্মা বিদুরস্তেষাং পার্থানাং প্রদদৌ মতিম্। মহাভারত জানিয়েছে—দুর্যোধন শকুনিরা পাণ্ডবদের বিপদে ফেলার জন্য অথবা তাঁদের মেরে ফেলার জন্য যত সব কূট উপায় বার করছিলেন, পাণ্ডবরা সেগুলি

জেনে ফেলে মনে মনে ক্রুদ্ধ হচ্ছিলেন বটে—প্রত্যজানন্ অমর্ষিতাঃ—কিন্তু দুর্যোধনের সমস্ত কূটকৌশলেরও তারা জবাব দিচ্ছিলেন আত্মরক্ষার নতুন নতুন উপায় বার করে এবং তা বার করছিলেন প্রজ্ঞাবান বিদুরের পরামর্শমতো—উদ্ভাবনমকুর্বন্তো বিদুরস্য মতে স্থিতাঃ।

কিন্তু এই প্রতি-উপায় বার করার মধ্যেও সাড়ম্বর একটা ঘোষণা থাকতে পারত, অন্য কেউ হলে তা থাকতই। কিন্তু রাজনীতি এবং সাধারণ ধর্মনীতি বিদুরের মধ্যে একাত্মক হয়ে যাওয়ায় প্রথম থেকেই তিনি প্রত্যক্ষ প্রতিরোধের পথে না গিয়ে সহ্য করার নীতি আত্মস্থ করতে শিখিয়েছেন পাণ্ডবদের। পাণ্ডবরা যেহেতু নিজেদের রাগ, দুঃখ, এমনকী যে যে উপায়ে তাঁরা প্রতিপক্ষের অপচেষ্টাগুলি রুদ্ধ করে দিচ্ছিলেন, সে সম্বন্ধেও নির্বাক এবং নির্বিকার ভাব দেখাচ্ছিলেন, তাতে দুর্যোধনের পক্ষে অন্তরালবর্তী সূক্ষ্ম বৈদুরী নীতি কিছুতেই বোঝা সম্ভব হচ্ছিল না। তিনি অধৈর্য হয়ে পড়ছিলেন এবং বিদুর জানতেন যে, প্রতিপক্ষের ধীরতা এবং সহিষ্ণুতার বিপরীতে দুর্যোধনের এই অধৈর্য এবং অসহিষ্ণুতাই একদিন তাকে 'একস্‌পোজ' করে দেবে। তাঁর আপনা থেকে কোনও প্রচার করবার দরকার নেই। পাণ্ডবরা রাজবাড়িতে আছেন এবং পূর্বরাজা পাণ্ডুর উত্তরাধিকারী হিসেবে এমনিতেই তাঁদের ওপর পুর-জনপদবাসীর সমব্যথা এবং করুণা থাকবে। এই অবস্থায় সারাক্ষণ দুর্যোধনের নিন্দা অথবা চলতি রাজশাসনের বিরুদ্ধে প্রচার চালালে প্রজারা পাণ্ডবদের রাজ্যলোভী বলে সাব্যস্ত করবে। বিদুর তা হতে দিতে চান না।

পাণ্ডবদের বিষয়ে বিদুরের সমস্ত ভাবনাটাই যে ঠিক ছিল, তা কদিন পরেই প্রমাণিত হল জতুগৃহ-রাজনীতিতে। কৌরব পাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষার পালা থেকেই জতুগৃহ-রাজনীতির বীজোদ্ভব ঘটেছে। পিতামহ ভীষ্মের চেষ্টাতেই দ্রোণাচার্যের কাছে সকল রাজকুমারের অস্ত্রশিক্ষা আরম্ভ হয়। অস্ত্রপরীক্ষার আসরে ধৃতরাষ্ট্র কিছু না দেখতে পেলেও বিদুর তাঁকে সমস্ত কুমারের অস্ত্রশিক্ষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছিলেন। এটা বোঝা গিয়েছিল যে দ্রোণাচার্যের পাঠশালায় সবচেয়ে কৃতবিদ্য ছাত্র হলেন অর্জুন এবং গদাযুদ্ধে ভীম ও দুর্যোধন সমকক্ষ বলে পরিচিত হলেন। দ্রোণাচার্যের এই শিক্ষা পাণ্ডবদের মনে বিশাল আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করেছিল। বুদ্ধিমান বিদুর লক্ষ করেছিলেন—কীভাবে হস্তিনাপুরের সাধারণ প্রজারা অস্ত্রপরীক্ষার আসরে কৌরব পাণ্ডবদের আলাদা আলাদা করে উৎসাহ এবং প্ররোচনা জোগাচ্ছিল—পক্ষপাতকৃত স্নেহঃ স দ্বিধেবাভজ্জনঃ। বিদুরের বিশ্বাস ছিল যে, একদিন হস্তিনাপুরের প্রজারা পাণ্ডবদের ওপর চলতি রাজযন্ত্রের নিপীড়নটুকু বুঝতে পারবে। তাই আজকে যখন অস্ত্রপরীক্ষার সময় পাণ্ডবদের সফলতায় প্রজাদের উত্তেজিত দেখতে পেলেন, তখন তিনি বুঝলেন যে, তাঁর পথ ঠিক এবং নির্ভুল। মহামতি বিদুর পরম বিদ্বান হওয়া সত্ত্বেও জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে যেমন আজ্ঞাবহ ভৃত্যটির মতো ব্যবহার করতেন, ঠিক একইভাবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ কুন্তীর ব্যাপারেও তাঁর এই প্রেষ্যভাব ছিল। অস্ত্রপরীক্ষার সময় পরস্পর বিবদমান অর্জুন এবং কর্ণকে দেখে কুন্তী যখন সংজ্ঞা হারালেন, বিদুর তখন দাসীদের ডেকে তাঁর মুখে চোখে চন্দনগন্ধী জল নিষেকের ব্যবস্থা করতে ভোলেননি। রাজনীতির সূক্ষ্ম তত্ত্ব-পরিজ্ঞানেও বিদুরের যত দক্ষতা, তেমনই অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের শুভানুধ্যানেও তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। অন্যদিকে পাণ্ডবদের ওপর রাজনৈতিক নিপীড়নের নিরিখে নিষ্পিতৃক অধিকারহীন পাণ্ডব-পরিবারকে সুরক্ষা দেওয়ার ভাবনাটুকুও তিনি একাই ভাবছিলেন।

যখন অস্ত্রপরীক্ষার আসরে অর্জুনের বিরুদ্ধে দুর্যোধনের সহায়তাপুষ্ট কর্ণের প্রতিস্পর্ধা তুঙ্গমাত্রায় পৌঁছেছিল, বিদুর তখন দেখেছিলেন—ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা কর্ণকে নিয়ে একটি পৃথক রাজনৈতিক অবস্থান রচনা করেছেন, অন্যদিকে কুরুসভার প্রমুখ মন্ত্রী-নেতারা ভীষ্ম দ্রোণাচার্য কৃপাচার্য—তাঁরা এসে দাঁড়িয়েছেন অর্জুনের পক্ষে—ভারদ্বাজঃ কৃপো ভীষ্মো যতঃ পার্থস্ততো'ভবন্। বিদুর বুঝে গেছেন—পাণ্ডবদের শক্তি বেড়ে গেছে। জনসাধারণ

অত্যুৎসাহী বলেই রঙ্গ দেখলে তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দুই পক্ষকে সমর্থন দিচ্ছে অথবা দর্শক স্ত্রীলোকেরাও আবেগবশে এক এক পৃথক পক্ষকে সমর্থন দিতে পারেন—দ্বিধা রঙ্গঃ সমভবৎ স্ত্রীণাং দ্বৈধমজায়ত—কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কৃপের পক্ষে পাণ্ডবদের সমর্থনে চলে আসাটা রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া অস্ত্রশিক্ষায় বলীয়ান পাণ্ডবদের বাক্‌স্বাধীনতাও অনেক বেড়ে গেছে। কর্ণ দুর্যোধনের বিরুদ্ধে ভীম রঙ্গস্থলে সবার সামনেই যা-তা বলেছেন, অর্জুনও ছাড়েননি কিছু; দুই পক্ষে যুদ্ধ লেগে যায় আর কী!

অস্ত্রশিক্ষায় পাণ্ডবদের চরম সফলতার কারণেই হোক, পুর-জনপদবাসীদের চাপেই হোক, অথবা কুরুসভার প্রমুখ নেতাদের সমর্থনের জন্যই হোক, ধৃতরাষ্ট্র এক বছরের মধ্যেই পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজের পদ দিতে বাধ্য হলেন। বাধ্য মানে, বাধ্যই হলেন, কেননা এই যুবরাজ পদবী যুধিষ্ঠিরকে দান করার মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের যান্ত্রিকতাই ছিল শুধু, প্রাণ ছিল না। যুবরাজ পদবী লাভের পর যুধিষ্ঠিরের ব্যক্তিত্ব এবং মান্যতা বেড়ে গেল। ভীম অর্জুনের অমানুষী অস্ত্রক্ষমতার কাছে হার মানল সামন্ত রাষ্ট্রগুলি। হস্তিনাপুরের পুর জনপদবাসীরা গ্রামে, সভায়, হাটে, মাঠে, চত্বরে সর্বত্র পাণ্ডবদের গুণগান করা আরম্ভ করলেন—কথয়ন্তি স্ম সম্ভূয় চত্বরেষু সভাসু চ। এতে যুধিষ্ঠিরের মর্যাদা আরও বাড়ল। পাণ্ডবদের এই বাড়বাড়ন্ত দেখে ধৃতরাষ্ট্র আরও ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়লেন। তিনি কণিক নামে এক কুচক্রী মন্ত্রীকে ডেকে তাঁর পরামর্শ নিলেন। কণিক সে যুগের 'মেকিয়াভেলি' অথবা তার চেয়েও বেশি, তিনি হাবেভাবে, কথায় পাণ্ডবদের মেরে ফেলার উপদেশ দিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র সে উপদেশ সার্থক করার ইচ্ছায় ব্রতী হলেন।

ঠিক এরমধ্যেই দুর্যোধন কর্ণ শকুনি দুঃশাসনের দুষ্ট চক্র সক্রিয় হয়ে উঠল। এই দুষ্ট-চতুষ্টয়কে নিয়েই কৌরবপক্ষের 'কিচেন-ক্যাবিনেট' তৈরি হয়েছিল, যাঁদের আবদার ধৃতরাষ্ট্র মেনে নিতে বাধ্য হতেন। এঁরা ঠিক করলেন—সমাতৃক পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারতে হবে নির্বাসিত অবস্থায়। ধৃতরাষ্ট্রকে দুর্যোধন নির্জনে নিজের দুঃখের কথা জানালেন। যেখানে ধৃতরাষ্ট্রের যন্ত্রণা, ঠিক সেইখানেই সুড়সুড়ি দিয়ে দুর্যোধন তাঁর আর্তনাদের কথা জানালেন। বললেন—পিতামহ ভীষ্ম রাজ্যগ্রহণ করলেন না, আপনিও চক্ষুহীনতার জন্য রাজা হতে পারলেন না। এখন যদি পাণ্ডুর উত্তরাধিকারে তাঁর ছেলে এবং তারপর আবারও তাঁর ছেলেই রাজ্য পেতে থাকে, তা হলে তো এই বিশাল রাজবংশে জন্মে আমরা বংশ বংশ ধরে বঞ্চিতই থাকব—তে বয়ং রাজবংশেন হীনাঃ সহ সুতৈরপি।

পিতার যন্ত্রণার সঙ্গে নিজের যন্ত্রণা মিশিয়ে দিয়ে এমনই এক করুণরসের সৃষ্টি করলেন দুর্যোধন যে, ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধন যা বলবেন, তাই করবার জন্য প্রস্তুত হয়েই রইলেন। দুর্যোধন পাণ্ডবদের সুকৌশলে বারণাবতে নির্বাসিত করতে বললেন। কিন্তু ঘরে আগুন দিয়ে তাঁদের মেরে ফেলবার পরিকল্পনাটা বললেন না। ধৃতরাষ্ট্র এই প্রস্তাবের পূর্বাপর চিন্তা করতে আরম্ভ করলেন। হস্তিনাপুরের প্রতিষ্ঠিত যুবরাজ—যিনি সর্বত্র জনপদবাসীদের দ্বারা প্রশংসিত হচ্ছেন, সেই যুধিষ্ঠিরকে হঠাৎ করে তাঁর ব্যস্ত রাজকর্ম থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া অত সহজ নয়। ধৃতরাষ্ট্র বললেন—দেখো বাছারা! তোমাদের মনে যা আছে, আমার মনেও তাই আছে, কিন্তু হঠাৎ করে তাঁদের বারণাবতে পাঠালে হস্তিনাপুরের প্রজাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে। বিশেষত হস্তিনাপুরের যেসব অমাত্য মন্ত্রীরা আছেন, তাঁরা পূর্ব রাজা পাণ্ডুর অত্যন্ত বশংবদ, সেনা সেনাপতিরাও তাই—ভৃতা হি পাণ্ডুনামাত্যা বলঞ্চ সততং ভৃতম্। সেখানে যুধিষ্ঠিরকে হঠাৎ অন্যত্র পাঠালে—এইসব অমাত্য সেনাপতিরা তো বিক্ষুব্ধ হয়ে আমাদের মেরেও ফেলতে পারেন—কথং যুধিষ্ঠিরস্যার্থে ন নো হন্যুঃ সবান্ধবান্।

দুর্যোধন দুর্বিনীত রাজনীতিকের মতোই বললেন—হস্তিনাপুরের মানুষজন এবং অমাত্যদের টাকা আর পদোন্নতির লোভ দেখিয়েই আমাদের পক্ষে নিয়ে এসেছি আমি, তারা

সব এখন আমার কথায় চলবে—প্রকৃতয়ঃ সর্বে অর্থমানেন পূজিতাঃ। ধৃতরাষ্ট্র বললেন—তা হলে তো ঠিকই আছে, কিন্তু আমাদের মন্ত্রণাসভার পরম মন্ত্রী যাঁরা, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ এবং বিদুর—এঁরা কেউই কিন্তু পাণ্ডবদের দূরে পাঠানোর অনুমতি দেবেন না—ন চ ভীষ্মো ন চ দ্রোণো ন চ ক্ষত্তা ন গৌতমঃ। এঁরা তো কৌরব পাণ্ডব দুই পক্ষকেই সমান চোখে দেখেন। শুধু তাই নয়, যে কোনও কাজেই এঁরা নীতি নিয়ম ধর্মের যুক্তি তর্কগুলো দেখাবেন। পাণ্ডবদের দূরে পাঠালে এই বিষম ব্যবহার তাঁরা মেনে নেবেন না—নৈতে বিষমমিচ্ছেয়ু ধর্মযুক্তা মনস্বিনঃ।

পুত্রস্নেহে অন্ধ হলেও ধৃতরাষ্ট্র জানেন যে, অর্থমানের দ্বারা সবার মুখ বন্ধ করা গেলেও এই চারজনের মুখ বন্ধ করা যাবে না। বস্তুত কৌরবসভায় যেসব মন্ত্রী-অমাত্যদের কথা উঠল এবং দুর্যোধন যেসব অমাত্যদের কথা বললেন, এদের মধ্যে কিছু প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। অমাত্য বলতে বোঝায় রাজার সেইসব কর্মসচিবদের যাঁরা রাজশাসনের বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু মন্ত্রীদের মর্যাদা অমাত্যদের চেয়ে অনেক বেশি। তাঁরা হলেন রাজার ধী-সচিব, সময়ে অসময়ে বিশেষত বিপন্ন অবস্থায় তাঁরা বুদ্ধি দেন রাজাকে। রাজা বললেই তাঁরা শুনবেন, মন্ত্রীরা এমন ব্যক্তিত্বহীনও নন, এমন পরবশও নন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ এবং বিদুর এই পর্যায়ভুক্ত। এঁদের জন্য ইচ্ছে থাকলেও ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের দূরে পাঠাতে সংকুচিত হচ্ছেন।

এঁদের জন্যও যুক্তি আছে দুর্যোধনের। তিনি বললেন—দেখুন, ভীষ্ম পিতামহ খানিকটা নিরপেক্ষ মানুষ। পাণ্ডব কৌরবের ওপর তাঁর সমভাব। পাণ্ডবদের দূরে পাঠালে তাঁর মনে যেমন প্রতিক্রিয়া হবে, তেমনই কৌরবরা কিছু করছে জানলে তিনি উদাসীন থাকবেন। দ্রোণের ছেলে অশ্বত্থামা আমার পক্ষের লোক। তাঁর ছেলে যেদিকে থাকবে, তিনিও সেই পক্ষেই থাকবেন। আর জামাই ভাগ্নে, মানে দ্রোণ অশ্বত্থামা যে পক্ষে থাকবেন, কৃপও থাকবেন সেই পক্ষেই। একমাত্র লোক হলেন বিদুর। তাঁকে নিয়েই যা একটু ঝামেলা আছে। দুর্যোধন বেশ তিক্তভাবে বিদুরের সম্বন্ধে বললেন—তিনি কৌরবদের রাজবাড়ির অর্থ ভোগ করেন বটে, কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে তিনি আমার শত্রুপক্ষের দ্বারা চালিত হন—ক্ষত্তার্থবদ্ধস্ত্বস্মাকং প্রচ্ছন্নং সংযতঃ পরৈঃ। বিদুরের সম্বন্ধে দুর্যোধন ক্ষুব্ধ হলেও ধৃতরাষ্ট্রকে আশা দিয়ে বললেন—তবে কী জানেন, বিদুর হলেন, একা এবং একটি মানুষ। তিনি একা পাণ্ডবদের হয়ে যত কাজই করুন, আমাদের তিনি কিছুই করতে পারবেন না—ন চৈকঃ স সমর্থো'স্মান্ পাণ্ডবার্থে'ধিবাধিতুম।

দুর্যোধন যত খারাপই বলুন, কুরুসভার এই চারটি মানুষের সম্বন্ধে দুর্যোধন যে নির্ণয় করেছেন, তাতে একটা সত্য খুব পরিষ্কারভাবে বেরিয়ে আসে। বোঝা যায়—কুরুকুলের প্রবীণ মন্ত্রীদের মধ্যে বিদুরই হচ্ছেন একমাত্র প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব, যিনি কোনও কিছুরই তোয়াক্কা করেন না। ধর্ম, ন্যায়, নীতি যেদিকে, তিনি সেইদিকেই কথা বলবেন। দুর্যোধন বলেছেন—বিদুর আমাদের অর্থ ভোগ করেন। কীসের অর্থ, কার অর্থ? দুর্যোধন যতই ভাবুন—হস্তিনাপুরের রাজকোষে সঞ্চিত অর্থ তাঁর, কিন্তু সে অর্থ কোনওভাবেই তাঁর নয়। রাজ্যের প্রকৃতি সম্পদ এবং প্রজাদের দেওয়া রাজকর থেকে রাজকোষে যে অর্থ সঞ্চিত হয়, রাজা সেই অর্থরক্ষার প্রতিভূমাত্র—একথা মহাভারতেই বহুবার বলা আছে। তা ছাড়া দুর্যোধন তো রাজাও নন, এমনকী ধৃতরাষ্ট্রও ন্যায়সঙ্গত রাজা নন। তিনি রাজকর্ম চালাচ্ছেন মাত্র। যুধিষ্ঠির যখন হস্তিনাপুর রাজ্যের যুবরাজ হয়েছেন, সেই রাজ্যের রাজকোষ ছলে বলে কৌশলে দুর্যোধন নিজের অধিকারে নিয়ে এসেছেন এবং সেই অর্থ ব্যয় করে অর্থলোভী অমাত্যদেরও বশ করেছেন দুর্যোধন। তিনি নিজেই একথা সগর্বে জাহির করেছেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে—ধনকোষ এবং অমাত্যরা সব এখন আমার হাতে—অর্থবর্গঃ সহামাত্যো মৎসংস্থা'দ্য মহীপতে—কাজেই নিশ্চিন্তে নির্বাসিত করুন পাণ্ডবদের।

যুধিষ্ঠির যুবরাজ হবার পর ভীম অর্জুন বিভিন্ন রাজ্য জয় করে যে বিপুল অর্থরাশি কুরুরাষ্ট্রের রাজকোষে জমা দিয়েছেন—ধনৌঘং প্রাপয়ামাস কুরুরাষ্ট্রং ধনঞ্জয়ঃ—সেই অর্থরাশি নিজের অধীনে নিয়ে এসেছেন দুর্যোধন, আবার দাবী করছেন—বিদুর কৌরবদের অর্থ ভোগ করেন। সত্যি কথা বলতে কী—এমন বলাটা দুর্যোধনের অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। গুরু দ্রোণাচার্যকেও তিনি দু'-চারবার একথা বলেছেন যে, আপনি আমাদেরই অর্থসম্পদ ভোগ করেন এবং আমাদেরই বিরোধিতা করেন। দ্রোণাচার্য একদিন থাকতে না পেরে বলেছিলেন—দেখো বাছা! আমি তোমার খাই না। আমি ভীষ্মের দেওয়া বৃত্তি ভোগ করি। আসলে সেকালে এইরকমই ছিল। রাজবাড়ির বৃদ্ধ, গুরু, রাজমাতা, রাজমহিষী এবং অতিনিকট পোষ্যজনেরা রাজবাড়ি থেকেই বৃত্তি পেতেন। হয়তো বিদুরও পেতেন সেইরকম। অথবা রাজবাড়ির অর্থসঞ্চয়ের কিছু ভাগ এঁদের প্রাপ্যই ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, যে যুক্তিতে রাজবাড়ির অর্থ দুর্যোধনের প্রাপ্য ছিল, ঠিক সেই অর্থে বিদুরেরও প্রাপ্য ছিল। কাজেই দুর্যোধন যে তাঁর সম্বন্ধে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বললেন—তিনি আমাদের কাছে অর্থের দায়ে বদ্ধ হয়ে আমাদের শত্রুর দ্বারা চালিত হন—সেটা একেবারেই অপমান করার জন্য অপমান করা।

দুর্যোধন আরও একটা বড় ভুল করলেন। যাঁর সম্বন্ধে তাঁর এই বিশ্বাস যে, তাঁদের কাছে বিদুর অর্থবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁদের স্বচ্ছন্দচারিতায় মদত দেবেন না, তাঁর শক্তি পরিমাপ করতে দুর্যোধনের ভুল হয়েছে। আরও ভুল এইজন্য যে, তিনি ভেবেছেন—বিদুর একা কিছুই করতে পারবেন না। তাঁর ধারণা নেই যে, কৈশোরগন্ধী যুবক অবস্থা থেকে বিদুর কুরুসভার মন্ত্রী। স্বয়ং ভীষ্ম পিতামহ তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর দুই দাদার বউ এনেছেন ঘরে। পাণ্ডু নিজ তাঁকে যে সম্মান দিতেন, তাও দুর্যোধনের অজ্ঞাত নয়, ধৃতরাষ্ট্রের তো নয়ই। সেই বিদুরকে আজ শুনতে হচ্ছে তিনি কৌরববাড়ির পোষ্য। এই একই কারণে দুর্যোধন যে তাঁকে একাকী দুর্বল ভাবছেন, সেটাই মস্ত বড় ভুল। যে বিদ্বান মানুষ কোনও কারণে, বিশেষত রাজনৈতিক কারণে রাজশক্তির কাছে মাথা নোয়ান না তাঁকে একা এবং দুর্বল ভাবাটাই পরম নির্বুদ্ধিতা। দুর্যোধন সেই নির্বুদ্ধিতাই করলেন, ধৃতরাষ্ট্রের অনুমোদনে।

দুর্যোধন শকুনিরা প্রথমে নাটকটা ভালই অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। হঠাৎ রাজ্যবাসীদের মধ্যে বারণাবতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং স্থানমাহাত্ম্য প্রচার করার পর যুধিষ্ঠিরকে রাজসভায় ডেকে এনে তাঁকে সমাতৃক সভ্রাতৃক বারণাবতে থেকে আসার ব্যাপারে ধৃতরাষ্ট্রের সনির্বন্ধ অনুরোধ—এই সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই বিদুরের কাছে আশ্চর্য ঠেকেছে। সবচেয়ে বড় কথা, দুর্যোধন ভুলে গিয়েছিলেন যে, কুরুসভার মন্ত্রী হিসেবে রাজযন্ত্রের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন একাংশ এখনও বিদুরের হাতে আছে। তা ছাড়া অত্যন্ত তীক্ষ্ণ রাজনীতিতে বিশ্বাসী কণিকের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রণা, ধৃতরাষ্ট্রের ঘরে একান্তে দুর্যোধন শকুনির আনাগোনা এবং অবশেষে বারণাবতের স্থানমাহাত্ম্য সম্প্রচার—এ সব কিছুই বিদুরের মনে সন্দেহ জাগিয়েছিল।

আরও একটা কথা—ইঙ্গিত, আকার এবং চেষ্টা—এই তিনটি শব্দ। সেকালের রাজতন্ত্রে কারা মন্ত্রিপদে মনোনয়ন পাবার যোগ্য, সেই বিচার করতে গিয়ে মন্ত্রীর বহু গুণের মধ্যে একথাটাও মহাভারতের রাজনীতিজ্ঞেরা উল্লেখ করে বলেছেন যে, তাঁরা যেন সত্ত্বগুণসম্পন্ন হন, যেন ইঙ্গিতজ্ঞ হন এবং যেন অনিষ্ঠুর হন—কুলীনান্ সত্ত্বসম্পন্নান্ ইঙ্গিতজ্ঞান্ অনিষ্টুরান্। এখানে এই ইঙ্গিত শব্দটার মধ্যেই আরও দুটো শব্দের অন্তর্ভাব আছে। সে দুটি হল আকার এবং চেষ্টা। এই শব্দ তিনটির অর্থ প্রসিদ্ধ টীকাকারেরা যেমনটি করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে —ইঙ্গিত মানে অভিপ্রায়সূচক বচন—স্বরাদি। আকার হল দেহধর্ম অর্থাৎ মুখের মধ্যে ভাবপরিবর্তনসূচক প্রসন্নতা, বিবর্ণতা ইত্যাদির যে আভাসটুকু পাওয়া যায়। আর চেষ্টা হল

আনন্দে কিংবা রাগে হাত পা ছোঁড়া, লাফানো ইত্যাদি। যিনি যত বড় রাজনৈতিক ব্যক্তি হবেন, তিনি তত নিজের ভাব গোপন করা শিখবেন এবং ততোধিক শিখবেন পরের ইঙ্গিত আকার চেষ্টা ধরে ফেলার কৌশল।

মহাভারতের শান্তিপর্বে এবং সংস্কৃতে লেখা অন্যান্য রাজশাস্ত্রে মন্ত্রীর যেসব গুণাবলী কীর্তিত হয়েছে, তার সবগুলিই বোধ হয় বিদুরের মধ্যে আছে বলে প্রমাণ করা যায়। কিন্তু মজা হল, তার সঙ্গে সাধারণ কৌশলটুকুও তাঁর এতটাই আয়ত্ত, যাতে দুর্যোধন দুঃশাসনদের ইঙ্গিত আকার বুঝে ফেলা তাঁর পক্ষে কঠিন হল না। চেষ্টা ব্যাপারটা বড়ই স্থূল এবং দুর্যোধন নিশ্চয়ই কোথাও হাত পা ছুড়ে পাণ্ডবদের ওপর নিজের ক্রোধ প্রকাশ করেননি, অথবা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পরিকল্পনা অনুমোদন করার পর দুর্যোধন আনন্দে লাফানওনি। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে একান্ত আলোচনার পর দুর্যোধন শকুনিদের মুখে, চোখে, গলার স্বরে যে পরিবর্তন এসেছিল বিদুরের পক্ষে তা ধরে ফেলা অসুবিধের হয়নি—তেষাম্ ইঙ্গিতভাবজ্ঞো বিদুরস্তত্ত্বদর্শিবান্। ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পাণ্ডবদের নির্বাসনের প্রস্তাব পর্যন্ত তবু সহনীয় ছিল, কিন্তু দুর্যোধন যখন সপুত্রা কুন্তীকে আগুনে পুড়িয়ে মারার পরিকল্পনা করে তীক্ষ্ণ কর্মকারী পুরোচনকে হস্তিনাপুরে ডেকে পাঠালেন, তখন সে পরিকল্পনা বিদুরের জানতে দেরি হল না। কারণ আগেই বলেছি—ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রিসভার অন্যতম নীতিনির্ধারক মন্ত্রী হিসেবে রাজযন্ত্রের একাংশ বিদুরেরও অনুগত ছিল নিশ্চয়। তা ছাড়া পুরোচনের সঙ্গে একান্তে আলোচনার পর দুর্যোধনের মুখে পাণ্ডব হত্যার আগামী আনন্দটুকু আগেই ফুটে উঠেছিল। তিনি ভাব গোপন করতে পারেননি এবং বিদুর সে ভাব ধরে ফেলেছিলেন—আকারেণ চ তং মন্ত্রং বুবুধে দুষ্টচেতসাম্।

দুর্যোধনের ইঙ্গিত আকার এবং পরিকল্পনা বুঝে বিদুর তিনটি কাজ করেছিলেন। এক, পাণ্ডবদের বারণাবতে যাত্রার সময় তিনি কতগুলি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলেছিলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে এবং তাও বলেছিলেন ম্লেচ্ছ ভাষায়। ম্লেচ্ছ ভাষাটাকে একেবারে বর্বরদের ভাষা ভাবার কোনও কারণ নেই। ধাতুগতভাবে ম্লেচ্ছ শব্দের অর্থ যে সঠিকভাবে ভাল সংস্কৃত উচ্চারণ করতে পারে না। কিন্তু ঠিক এই অর্থেই বিদুর ম্লেচ্ছ ভাষা বলেননি। ভারতবর্ষ বহু ভাষার দেশ, অতএব এমন কোনও প্রাদেশিক ভাষা বিদুর ব্যবহার করেছেন যা যুধিষ্ঠিরও বোঝেন, অথচ অন্য কেউ বোঝেন না। বিদুর যুধিষ্ঠিরকে এই ভাষায় বলেছেন একান্তে, সমস্ত লোক চলে গেলে তাঁর কাছে গিয়ে। অর্থাৎ কত সাবধান তিনি। কাছে গিয়েও পরিষ্কারভাবে বললেন না। কতগুলি অপ্রাসঙ্গিক কথা বললেন—লোহার তৈরি না হলেও শরীরনাশী আরও কত অস্ত্র আছে, সেটা বুঝলে শত্রুরা কিছু করতে পারে না। বন দগ্ধ করতে করতে আগুন লাগে বিশাল বনে। কিন্তু গর্তে থাকা ইঁদুরের সেখানে কোনও ভয় নেই। যার চোখ নেই সে পথ বুঝতে পারে না, আর ধৈর্য ছাড়া ভবিষ্যতে সম্পদ লাভও হয় না কখনও। গর্তের মধ্যে থাকলেও যদি আগুনের তাপ গায়ে লাগতে থাকে তবে শজারুর মতো গর্তের ওপারে গিয়েও বেঁচে যাওয়া যায়। ঘুরতে ঘুরতে পথ চেনা যায়, দিক নির্ণয় করা যায় নক্ষত্র দেখে। পথ চলার কষ্ট নিজে সহ্য করে যদি আর পাঁচজনকেও সহ্য করানো যায় তাকে আর বেশি কষ্ট পেতে হয় না।

হস্তিনাপুরের সমস্ত লোক যেখানে যুধিষ্ঠির এবং অন্যদের বিদায়লগ্নে নানারকম কষ্টের কথা জানাচ্ছে, কেউ ধৃতরাষ্ট্রকে গালাগালি দিচ্ছে, কেউ অশ্রুমোক্ষণ করছে, মায় ভীষ্ম দ্রোণ পর্যন্ত যেখানে প্রিয়জনবিচ্ছেদে অধীর বোধ করছেন, সেখানে বিদুর একেবারে নিস্তরঙ্গ এবং তিনি যুধিষ্ঠিরের কানের কাছে এসে অপ্রাসঙ্গিকভাবে পাগলের প্রলাপ বকছেন। তাও এমনভাবে, এমন বুঝেই বকছেন যাতে সে প্রলাপ আর এক পাগল বুঝতে পারে—প্রাজ্ঞং প্রাজ্ঞঃ প্রলাপজ্ঞঃ প্রলাপজ্ঞং বচো'ব্রবীৎ। বিদায় মুহূর্তে বিদায়ের পরিচর্যা না করে বিদুর যখনই অপ্রাসঙ্গিক কথা বলছেন, যুধিষ্ঠির তখনই বুঝেছেন যে, অবহিত হতে হবে। আর্যেতর

ভাষায় নিপুণ শব্দপ্রয়োগে বিদুর তাঁর পূর্বজ্ঞাত বিপৎসংকেত যুধিষ্ঠিরের কাছে ব্যক্ত করে, কীভাবে সেই বিপদ থেকে বাঁচতে হবে, তারও উপায় জানালেন সংকেতেই! যুধিষ্ঠির একটিমাত্র শব্দে স্নেহময় পিতৃব্যকে নিশ্চিন্ত করে বললেন—বুঝলাম—জ্ঞাতমিতি।

'কমিউনিকেশন' শব্দটা খুব চলে আজকাল। সঠিকভাবে 'কমিউনিকেট' করতে গেলে যেমন সঠিক ভাষা চাই ঠিক তেমনই চাই—যাকে 'কমিউনিকেট' করছি তার বোধ বুদ্ধির পরিশীলন। মহাকাব্যের লেখক যেমন হবেন, তেমনই তাঁর প্রতিভা বোঝবার জন্য সহৃদয় পাঠককেও তৈরি হতে হয়। একইভাবে যিনি ছবি আঁকেন, যিনি গান গান তাঁদের শিল্পকৃতি বুঝবার জন্যও সমানহৃদয় বোদ্ধা, শ্রোতা চাই। একেলা গায়কের নহে তো গান—এই নিয়মে। বিদুরের মধ্যে যে ন্যায়নীতির বোধ আছে, সত্ত্বের যে প্রাধান্য আছে, যে বিদ্যাবত্তা এবং সর্বোপরি যে সর্বজনহিতৈষিণী বুদ্ধি আছে, তা যুধিষ্ঠিরের মধ্যেও সমপরিমাণে আছে। আছে বলেই বিদুরের কথা বুঝতে যুধিষ্ঠিরের অসুবিধে হয় না। জননী কুন্তী তো অদূরেই দাঁড়িয়েছিলেন। দাঁড়িয়েছিলেন আর চার পাণ্ডব ভাইরাও। কিন্তু বিদুরের বক্তব্য কিছুই না বুঝে কুন্তী কৌতূহল রোধ করতে না পেরে বলেই ফেললেন যুধিষ্ঠিরকে—হাঁ বাছা! সকলের মধ্যে দাঁড়িয়ে তোমাকে কী বললেন বিদুর, আমরা তো কিছুই বুঝলাম না। তিনিও বললেন, আর তুমিও বললে, 'বুঝেছি'— ত্বয়া চ স তথেত্যুক্তো জানীমো ন চ তদ্‌বয়ম্। তা অসুবিধে না থাকলে সেসব কথা কি জানতে পারি আমরা?

যুধিষ্ঠির বুঝিয়ে বললেন—বারণাবতে আমাদের থাকবার ঘরে আগুন লাগানোর চেষ্টা হবে, মা! বিদুর বলে গেলেন—আমাদের সজাগ থাকতে হবে। থাকতে হবে গর্তবাসী ইঁদুরের মতো গর্ত খুঁড়ে। সুড়ঙ্গ তৈরি করে পালিয়ে যেতে হবে শজারুর মতো। আগে থেকেই পালাবার পথ চিনে রাখতে হবে, রাতের আঁধারেও যাতে অসুবিধে না হয়, তার জন্য নক্ষত্র দেখে নির্ভুল পথ নির্ণয় করা শিখতে হবে আগে থেকেই। বিদুর আরও বললেন—যে মানুষ কাম ক্রোধে উন্মত্ত না হয়ে ইন্দ্রিয়জয়ের চেষ্টা করে, সে ঠিক রাজ্য পাবে একদিন।

ইন্দ্রিয়জয়ের কথাটা খুব সাধারণ এবং প্রায় কথার কথা বলেই যেন এখানে উল্লেখ করা হল বটে, কিন্তু এই শব্দটার একটা গভীর তাৎপর্য আছে, বিশেষত রাজনৈতিক তাৎপর্য। বিদুরের মুখে বার বার এই শব্দটা ভবিষ্যতেও শোনা যাবে এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেখবেন—যে কোনও রাজার শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে ইন্দ্রিয়জয় রীতিমতো একটা অধ্যায়। রাজার ঘরে জন্মালে বহির্জগতের প্রলোভন অনেক বেশি থাকে এবং সে প্রলোভন শান্ত করার অর্থ, সামর্থ্য তথা সুযোগও বেশি থাকে। ঠিক এইজন্যই মনু থেকে মহাভারত, কৌটিল্য থেকে কামন্দক প্রত্যেকেই রাজা এবং রাজপুত্রকে ইন্দ্রিয়জয়ের উপদেশ দিয়েছেন। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য এগুলি যাতে কোনও রাজার রাজ্যশাসনের প্রতিবন্ধক না হয়ে দাঁড়ায় সেইজন্যই অন্তর্গত অরিষড়্‌বর্গ জয়ের উপদেশ। এর প্রত্যক্ষ ফল কষ্টকর, কিন্তু পরোক্ষ ফল অপরিমিত। কৌটিল্য লিখেছেন—ইন্দ্রিয়জয়ের ফলে বিদ্যা এবং বিনয় আসে। বিদ্যা এবং বিনয় দুটি শব্দই পারিভাষিক। বিদ্যা বলতে চার রকম বিদ্যা বোঝায়—আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা এবং দণ্ডনীতি।

আন্বীক্ষিকী বলতে বোঝায় তর্ক যুক্তি যার দ্বারা অন্য বিদ্যাগুলির ভাল মন্দ এবং গ্রহণ বর্জনের তত্ত্বটা বোঝা যায়। ত্রয়ী বলতে বোঝায় তিন বেদ অথবা মানুষের পালনীয় আচারব্যবহার, বার্তা হল ব্যবসাবাণিজ্য আর দণ্ডনীতি হল রাজনীতিশাস্ত্র। মানুষ যদি ইন্দ্রিয়জয়ের দ্বারা নিজেকে পরিশীলিত করে, তবে সে কাম ক্রোধ ইত্যাদি ব্যক্তিগত স্বার্থভাবনার ওপরে উঠতে পারে। আর বিনয় জিনিসটা আরও কঠিন। এটা সাধারণ 'মডেস্টি' মাত্র নয়। গুরুর কাছে শেখার ইচ্ছা, শেখা, শিক্ষিত বস্তু ধারণ করা, তর্কযুক্তির মাধ্যমে গ্রহণ বর্জন ইত্যাদি প্রক্রিয়া সমাপ্ত করে যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া, সেইটা নাকি

বিনয়ের ফল। কৌটিল্য লিখেছেন—ইন্দ্রিয়জয়ই শেষ পর্যন্ত বিদ্যা এবং বিনয়ের হেতু হয়ে ওঠে। অপিচ এই জিতেন্দ্রিয়তা না থাকলে কাম ক্রোধ ইত্যাদির একতম বা দুই-তিনটিকে প্রশ্রয় সামগ্রিক জীবনে একটি কুবৈশিষ্ট্য তৈরি করে। তার ফলে কেউ আত্মম্ভরী হয়ে ওঠে, কেউ বা নির্লজ্জ। আশ্চর্য এই, অতি কম কথার লোক যে কৌটিল্য, তিনি এই অজিতেন্দ্রিয়তার প্রসঙ্গেই কুরুরাজ দুর্যোধনের নাম উল্লেখ করে তাঁর বিনাশের কারণ হিসেবে অতিমানিতার কথা বলেছেন। ঠিক এরই প্রতিকক্ষে দাঁড়িয়ে বিদুর যখন যুধিষ্ঠিরকে তাঁর চরম বিপদের মধ্যেও ইন্দ্রিয়জয়ের উপদেশ দেন, তখন বুঝি—রাজধর্মের চরম যে আদর্শ বিদুর অধিগত করেছেন বিপুল পরিশীলনে, এই পরিশীলন তিনি যুধিষ্ঠিরের মধ্যেও দেখতে চান।

কতখানি ধৈর্য থাকলে শত্রুর সমস্ত পরিকল্পনা জেনেও এবং সমস্ত বিপদ মাথার ওপরে নিয়েও বাইরে কোনও উত্তেজনা প্রকাশ না করে মা এবং ভাইদের নিয়ে প্রায় অগ্নিস্বরূপ জতুগৃহে বাস করা যায়? তাও বেশ কয়েকদিন। জতুগৃহে প্রবেশ করেই যুধিষ্ঠির ভীমকে বলেছিলেন—গন্ধ পাচ্ছ ভীম। ঘি, জতু, শন—যত সব দাহ্য পদার্থ দিয়ে এই ঘর তৈরি করা হয়েছে আমাদের মারার জন্য। দুর্যোধনের কাছে বার বার এই পাপাচারী পুরোচনকে আসতে দেখেই মহাবুদ্ধি বিদুর আগেই বুঝে নিয়েছেন তাঁর পরিকল্পনা—ইমাং তু তাং মহাবুদ্ধির্বিদুরো দৃষ্টবান্ পুরা। আমাদের এই কনিষ্ঠ পিতাটি আমাদের সদাসর্বদা স্নেহ করেন এবং সেইজন্যই দুর্যোধনের সমর্থনপুষ্ট পুরোচনের এই অমঙ্গল পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন—পিত্রা কনীয়সা স্নেহাদ্ বুদ্ধিমন্তো' শিবং গৃহম্।

'পিত্রা কনীয়সা'—কথাটা স্মরণে রাখবেন—অর্থাৎ আমাদের কনিষ্ঠ পিতার দ্বারা। কথাটা বিদুরের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন যুধিষ্ঠির এবং তা ব্যবহার করেছেন একেবারে লৌকিক কথ্য ভাষার মতো, ঠিক যেমন ভারতবর্ষের বহু জায়গায়, বিশেষত উড়িষ্যায় জ্যাঠাকে বলে বড়বাবা, কাকাকে ছোটবাবা, জেঠিমাকে বড়মা এবং কাকিমাকে ছোটমা। যাঁরা স্বাত্মপ্রমোদবশে যুধিষ্ঠিরকে বিদুরের অবৈধ পুত্র বলে ভাবেন, তাঁদেরকে শুধু মহাভারতই পড়তে অনুরোধ করি আবার। যুধিষ্ঠির যে ভাষায় বিদুরকে সম্বোধন করেছেন সেটা এমনই এক স্বতঃপ্রমাণ, যার নিরিখে এইসব অভদ্র লেখকদের অভদ্র ভাষাতে গালি দিতে ইচ্ছা হয়। তা ছাড়া এঁরা বোঝেন না, যে সমাজে কানীনপুত্র, বেশ্যাপুত্র পর্যন্ত সমাজ-স্বীকৃত ছিল, সেখানে কবি বিদুরের ক্ষেত্রজ পুত্রটিকে লুকোবেন কেন—যদি তা আদৌ সত্য হত? যে কবি-ঋষি তাঁর পিতামাতার গূঢ়কামতা লুকোননি, যিনি শূদ্রা দাসীর গর্ভে বিদুরের জন্ম দিয়েছেন, তিনি বিদুরের রিরংসাই বা লুকোবেন কেন, যদি তা আদৌ সত্য হত?

বিদুর তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে অকৃত্রিম স্নেহ করতেন, এই বড় দোষ। আকস্মিকভাবে দূরদেশে যারা পিতাকে হারায় এবং দেশে ফিরে এসে যারা পিতার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, তাদেরকে ঠকানোর লোকের অভাব যেমন হয় না, তেমনই সেই বঞ্চনা এবং বিড়ম্বনার অতিচার দেখে কেউ বা তাদের ওপরে স্নেহশীলও হয়ে পড়েন। পাণ্ডবদের এই কনিষ্ঠ পিতাটি হলেন সেই স্নেহশীল মানুষ, যিনি প্রতিপক্ষের রাজনৈতিক প্রকোপগুলি থেকে তাঁর বিপন্ন ভ্রাতুষ্পুত্রদের রক্ষা করে চলেছেন যথাসাধ্য যথামতি। জতুগৃহে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার পরিকল্পনা সম্বন্ধে আগাম খবর পেয়ে পাণ্ডবরা জতুগৃহ ছেড়ে অথবা নিজেরাই আগেভাগে জতুগৃহে আগুন দিয়ে পালিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু বিদুর বুঝেছিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকেও বোঝাতে পেরেছিলেন যে, তাতে রাজনৈতিকভাবে পাণ্ডবদের অসুবিধে হবে।

ভীম তো বলেই ছিলেন যে, এটা যদি জতুগৃহ বলেই বোঝা যাচ্ছে, তা হলে আমরা পালাই চলো। যুধিষ্ঠির বলেছিলেন—পালিয়ে গেলে কোনও রক্ষা নেই আপাতত। আমরা এখনই ভয় পেয়ে পালালে রাজ্যলুব্ধ দুর্যোধন গুপ্তচর লাগিয়ে আমাদের বধ করবে। এর কারণ

হিসেবে চিরন্তন রাজনীতির অন্তর্গূঢ় কথাটি বলেছেন যুধিষ্ঠির—যে কথা হয়তো বিদুরের পরম রাজনৈতিক বোধ থেকেই তাঁর মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে। যুধিষ্ঠির বলেছিলেন—কোষ, সেনা ইত্যাদি রাজশক্তি যাঁদের হাতে আছে, মন্ত্রী এবং মিত্রশক্তি যাঁদের কুক্ষিগত—এককথায় যারা 'পাওয়ারে' আছেন, তাঁরা কোষ, সৈন্য, মন্ত্রবলহীন ব্যক্তিদের বিভিন্ন উপায়ে মেরে ফেলারই চেষ্টা করবেন—হীনকোষান্ মহাকোষঃ প্রয়োগৈ র্ঘাতয়েৎ ধ্রুবম্। কাজেই আমরা আপাতত পালিয়েও যাব না এবং শত্রুদের বুঝতেও দেব না যে, আমরা বুঝেছি।

বিদুর পাণ্ডবদের আসন্ন বিপদ বুঝে একটি বিশ্বস্ত খনক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। ইতিমধ্যে বিদুর খবরও পেয়ে গেছেন যে, কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে পুরোচন আগুন লাগাবে জতুগৃহে। বিশ্বস্ত খনক বিদুরের কাছে পাওয়া সর্বশেষ সংবাদ গোপনে যুধিষ্ঠিরকে জানিয়ে বললেন—এই ঘরে আমার কাজ আছে, আমাকে গর্ত খুঁড়তে হবে আপনাদের বার করে নিয়ে যাবার জন্য। যুধিষ্ঠির এই মুহূর্তে বিদুরের ভাবনা এবং ভবিষ্যৎ-বোধ দেখে অভিভূত হয়ে গেছেন। বিদুর তাঁর পরম সম্মানিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে অতিক্রম করছেন না। চলতি রাজশক্তিকেও তিনি অস্বীকার করছেন না, কিন্তু যে রাজশক্তির হাতে দণ্ড থাকে তার শক্তির সুবাদে দণ্ডের যে অপপ্রয়োগ ঘটে, সেই অপপ্রয়োগ থেকে দুর্বলতর পক্ষকে তিনি বাঁচিয়ে রাখছেনমাত্র এবং তা বাঁচিয়ে রাখছেন কূটনীতির মাধ্যমে। বিদুর অপেক্ষা করছেন সেই দিনের জন্য যেদিন প্রচলিত অন্যায়ী রাজশক্তির প্রতিপক্ষে দাঁড়ানো দুর্বল অথচ ন্যায়সম্মত রাজশক্তি কোষ-বল সমন্বিত হবে অথবা কোনও মিত্রশক্তির সাহায্যে তারা সশক্তিক হয়ে উঠবে।

বিদুরের বুদ্ধি অনুসারে পাণ্ডবরা ধৈর্য ধারণ করে রইলেন এবং কৃষ্ণচতুর্দশীর রাত্রিতে নিজেরাই জতুগৃহে আগুন দিয়ে সেই বিশ্বস্ত খনকের কাটা সুড়ঙ্গপথ দিয়ে পালালেন। সুড়ঙ্গপথের শেষেই এক বন। সেই বনের মধ্যে পাণ্ডবরা যখন ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছেন ঠিক সেই সময়ে একটি লোকের সঙ্গে তাঁদের দেখা হল। সে বিদুরের গুপ্তচর বিশ্বস্ত মানুষ। পাণ্ডবদের পথ দেখিয়ে সে একেবারে গঙ্গার ধারে নিয়ে এল। সেখানে নৌকা বাঁধাই ছিল। গুপ্তচর যুধিষ্ঠিরের বিশ্বাস উৎপাদন করার জন্য সেই কথাগুলি পুনরুচ্চারণ করল—যে কথাগুলি বারণাবতে প্রস্থানের আগে যুধিষ্ঠিরের কানে কানে ম্লেচ্ছ ভাষায় উচ্চারণ করেছিলেন বিদুর। গুপ্তচরকে যে নৌকাটি নিয়ে যেতে বলেছিলেন বিদুর, সেটি যন্ত্রচালিত এবং পালতোলা—সর্ববাতসহাং নাবং যন্ত্রযুক্তাং পতাকিনীম্—অর্থাৎ যত তাড়াতাড়ি সমাতৃক পাণ্ডবদের গঙ্গা পার করে দেওয়া যায় বিদুর সেই ব্যবস্থা করেছিলেন সযত্নে। গঙ্গা পার করে দেবার পর বিদুরের পাঠানো সেই লোকটি পাণ্ডবদের বলল—মহামতি বিদুর আপনাদের মস্তক আঘ্রাণ করে সস্নেহে জানিয়েছেন যে, এরপরে আপনারা নিশ্চিন্তে যেতে পারেন যেদিকে মন চায় সেদিকে—অরিষ্টং গচ্ছতাব্যগ্রাঃ পন্থানমিতি চাব্রবীৎ। আপনাদের বিপদ কেটে গেছে।

বিদুর শুধু এইটুকুই চেয়েছিলেন। প্রতিকূল পরিবেশে থেকে পিতৃহীন, রাজ্যাধিকারহীন পাণ্ডবরা যেন অন্তত প্রাণে মারা না যান। বিদুর তাঁদের বিপদ থেকে বাঁচিয়ে হস্তিনাপুরের রাজ্যসীমা থেকে বার করে দিয়েছেন। ছেড়ে দিয়েছেন জগতের বৃহত্তর ক্ষেত্রে যেখানে তাঁরা বেঁচে থাকলেই আপন কর্ম বুঝে নিতে পারবেন। ওদিকে হস্তিনাপুরের পাণ্ডবদের পুড়ে মরবার খবর এসে পৌঁছোল। খবর এল—পুড়ে মরেছে পুরোচনও—যার ওপরে ভার ছিল জতুগৃহে আগুন দেবার। বারণাবতের মানুষরা যখন পঞ্চপুত্র সহ নিষাদী মাতার দগ্ধদেহ দেখল, তখন তাদের মধ্যে জনরোষ দেখা গেল। রাজবাড়ির অন্তঃকলহের খবর তারাও পেয়েছিল, কিন্তু সেই সূত্রে বঞ্চিত পাণ্ডবদের দগ্ধ করা হয়েছে ভেবে তারা বার বার সোচ্চারে বলল—নিশ্চয় ধৃতরাষ্ট্রের জ্ঞাতসারেই তাঁর ছেলেরা এই অন্যায় কাজটি করেছে। কিন্তু আমাদের আশ্চর্য লাগছে—পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য এবং বিদুর বসে বসে

কী করছেন সেখানে? তাঁরাও কি ধর্মচ্যুত হয়েছেন সকলে? আর ধৃতরাষ্ট্রের বলিহারি যাই, তিনি একবার বারণ করলেন না। তাঁর ছেলেদের উপযুক্ত রাজ্যাধিকারীদের এইভাবে মেরে ফেললেন—দগ্ধবান্ পাণ্ডুদায়াদান্ হ্যেনং প্রতিষিধ্যবান্?

বিদুর এইটাই চেয়েছিলেন। তিনি শূদ্রা মাতার পুত্র, অতএব জনতার প্রতিনিধি। তিনি ঋষি পিতার পুত্র, অতএব সত্য এবং ধর্মকে তিনি বাঁচিয়ে রাখবেন। বারণাবতে যে জনরোষ তৈরি হয়েছিল, হস্তিনাপুরে পাণ্ডবদের মৃত্যুর খবর এসে পৌঁছোলে সেই জনরোষই তৈরি হয়েছিল বলে অনুমান করি।

সত্যি কথা বলতে কী, আমরা তো জানি পাণ্ডবরা রাজ্যের বাইরে বাইরে থাক এবং তাঁর ছেলে হস্তিনাপুর শাসন করুক—ধৃতরাষ্ট্র এটা চেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু পাণ্ডবরা প্রাণে মারা যাক—এটা তিনিও চাননি এবং দুর্যোধনের ওই নৃশংস পরিকল্পনার কথাও তিনি জানতেন না। কাজেই সমাতৃক পাণ্ডবদের মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছোলে নিজের দোষ-চেতনার জন্যই হোক অথবা উদগ্র জনরোষ চাপা দেবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র সঙ্গে সঙ্গে বারণাবতে লোক পাঠালেন এবং ঘটা করে পাণ্ডবদের শ্রাদ্ধক্রিয়া করবার জন্য আদেশ দিলেন।

স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের প্রেতক্রিয়া করলেন। সমস্ত পুর-জনপদবাসীরা যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুনের নাম করে উচ্চৈঃস্বরে কান্নাকাটি করল। কৌরবকুলের প্রধানপুরুষেরা ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণ, কৃপ সকলেই কাঁদলেন। এঁদের একাত্মতায় বিদুরও কিঞ্চিৎ লোকদেখানি কাঁদা কাঁদলেন, কিন্তু সে ক্রন্দনের পরিমাণ নিতান্তই অল্প, কেননা তিনি মনে মনে তখন হাসছেন—বিদুরস্তু অল্পশশ্চক্রে শোকং বেদ পরং হি সঃ। অন্তত দুর্যোধনের কথা ভেবেই তিনি তখন মনে মনে হাসছেন। পাণ্ডবদের সর্বশেষ সংবাদ তিনি পেয়ে গেছেন এবং স্বস্তি পেয়েছেন এই ভেবে যে, রাজদণ্ডের অপপ্রয়োগে যাঁদের মরে যাবার কথা ছিল, তাঁদের তিনি জীবিত রাখতে পেরেছেন একক চেষ্টায়, ধৈর্যে এবং সুস্থ কূটনৈতিক বুদ্ধিতে।

বিদুরের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতা যে কতখানি, তা এইবার বোঝা যাবে। যুধিষ্ঠির বারণাবতে বাস করবার সময়ে তাঁর বুদ্ধি এবং হিতৈষণা দেখে স্তম্ভিত হয়েছেন এবং বার বার একটি বিশেষণ ব্যবহার করেছেন তাঁর সম্বন্ধে। বলেছেন—বিদুর হলেন কবি। কবি যেমন ক্রান্তদর্শী—ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব দেখতে পান, বিদুরও তেমনই রাজনৈতিক বিপন্নতার মধ্যেও স্থির ধৈর্যশালী ব্যক্তির মতো রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ দেখতে পান। নইলে দেখুন, পাণ্ডবদের আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি পর পর যে ধীর পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করেছেন, তারই মধ্যে কিন্তু পাণ্ডবদের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির বীজ ছিল। বিদুর নিজেও বোধ হয় এতটা ভাবেননি, যতটা শেষ পর্যন্ত ঘটেছিল। রাজবাড়ির মধ্যে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যে অন্তর্ঘাতমূলক প্রচেষ্টাগুলি আরম্ভ হয়েছিল, বিদুর সেগুলি প্রতিরোধ করেছেন একান্ত গোপনে, কারণ প্রত্যক্ষভাবে প্রতিরোধ করলে উদগ্র রাজশক্তি প্রত্যক্ষভাবেই তাঁর শাস্তিবিধান করত। তাতে বিদুরও মরতেন, পাণ্ডবরাও বাঁচতেন না। দুর্যোধনের কাছে আচার্য, গুরু, নিকট-সম্বন্ধ, অথবা আত্মীয়তারও কোনও মূল্য নেই। বিদুর তাই রাজবাড়ির অন্তর্ঘাত থেকে পাণ্ডবদের বাঁচিয়ে তাঁদের দূরে সরিয়ে দিয়েছেন, যেখান থেকে তাঁরা নিজেদের পথ খুঁজে নিতে পারেন।

বিপন্নতার মধ্যে পথ চলতে চলতে পাণ্ডবরা নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে আরও অবহিত হলেন। বিপন্ন পথের মধ্যে হিড়িম্ব রাক্ষস, বক রাক্ষসের মোকাবিলা করে একসময় তাঁরা পৌঁছোলেন পাঞ্চাল রাজ্যে। সেখানে রাজা দ্রুপদ রাজত্ব করেন। দ্রুপদের বড় ইচ্ছা ছিল—তিনি তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের সঙ্গে নিজের মেয়ে দ্রৌপদীর বিয়ে দেবেন। সেই সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর অর্জুনের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবার পিছনে কিছু উদ্দেশ্যও ছিল তাঁর। দ্রুপদের বাল্যসখা দ্রোণাচার্য দ্রুপদের প্রতি প্রতিশোধস্পৃহায় কৌরবদের আশ্রয় নিয়েছেন এবং সেই সুবাদে কৌরব রাজপুত্রদের অস্ত্রশিক্ষা দান করার শেষে শিষ্যদের দিয়ে তাঁকে হস্তিনাপুরে বেঁধে এনেছিলেন। সেই বন্ধনের ক্ষেত্রে অর্জুনই যদিও প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন, তবু যুদ্ধের চরম মুহূর্তে এই অর্জুনই দ্রুপদের প্রতি সম্মানবশত তাঁর সৈন্যক্ষয় বন্ধ করেছিলেন আপন ব্যক্তিত্বে। দ্রোণাচার্যের কাছে চরম অপমানিত হয়েও এই অসাধারণ যুদ্ধবীরের কথা তিনি মনে রেখেছিলেন এবং একসময় কৌরব পাণ্ডবদের জ্ঞাতিশত্রুতার কথা যখন দ্রুপদের কানে এসে পৌঁছোচ্ছিল, তখন আরও বেশি করে তাঁর মনে হতে লাগল যে, এই অর্জুনের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিলেই দ্রোণাচার্যের অপমানের চরম উত্তর দেওয়া হবে। বিশেষত এই কথা মনে রেখেই তিনি কন্যা স্বয়ংবরের শর্ত হিসেবে মৎস্যচক্ষু ভেদ করার কঠিন পণ সৃষ্টি করেছিলেন।

যাই হোক, আমরা জানি, পাঞ্চাল রাজ্যের স্বয়ংবরসভায় সকলের আকাঙ্ক্ষা বিফল করে দিয়ে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন দ্রৌপদীকে লাভ করেন। অনবদ্যাঙ্গী দ্রৌপদীকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে যাতে কোনও বিরোধ না ঘটে—মিথো ভেদভয়ান্নৃপ—সেই জন্য পাঁচ ভাই-ই দ্রৌপদীর স্বামী হিসেবে বৃত হন। পাণ্ডবদের পাঞ্চাল রাজ্যে গমন থেকে আরম্ভ করে

পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর আনুষ্ঠানিক বিবাহ পর্যন্ত ঘটনার এক বিরাট রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে এবং ঠিক এইখানেই বিদুরের প্রসঙ্গ এসে যাবে। কেননা, বিদুরই পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরের রাজশক্তির অন্তর্ঘাত থেকে বাঁচিয়ে জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাঁদের মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

আমরা আগে বলেছি যে, বিদুরের বিশেষণ হিসেবে মহাভারতের লেখক 'কবি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন—এতস্মিন্নেব কালে তু যথাসম্প্রত্যয়ং কবিঃ। অর্থাৎ তিনি ক্রান্তদর্শী—কোনও-না-কোনও দিন পাণ্ডবদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটবে এটা তিনি বুঝেছিলেন। সঠিক কী ঘটবে, এটা তিনি পুরোপুরি আন্দাজ করতে না পারলেও নিজের বিশ্বস্ত লোকটিকে দিয়ে গঙ্গা তরিয়ে দিয়ে যেখানে তিনি পাণ্ডবদের এনে ফেলেছিলেন, সেখান থেকে পাঞ্চাল রাজ্যই সবচেয়ে কাছে এবং সেখানে পাণ্ডবদের আশ্রয় মিলতে পারে এটুকু তাঁর অনুমেয় ছিল। পাঞ্চাল রাজ্যে পাণ্ডবরা যে রাজনৈতিক সুবিধে পেলেন, সেটা প্রধানত মিত্রলাভ। রাজ্যভ্রষ্ট রাজপুত্রের পক্ষে সহায়শক্তিসম্পন্ন রাজাকে মিত্র হিসেবে পাওয়াটা এক বিশাল লাভ। পাণ্ডবদের এই লাভ হল দুভাবে।

প্রথমত দ্রুপদ যুধিষ্ঠিরের কাছে তাঁদের বিপদের কথা শুনলেন। কীভাবে তাঁরা রাজ্য থেকে পালিয়ে জতুগৃহের আগুন থেকে বেঁচে শেষপর্যন্ত পাঞ্চালে এসে পৌঁছেছেন—সে সব কথা সবিস্তারে শুনে দ্রুপদ সোজাসুজি ধৃতরাষ্ট্রকে নিন্দা করতে দ্বিধা করলেন না। সবচেয়ে বড় কথা, পুনরায় হস্তিনাপুরে রাজ্যলাভের ব্যাপারে পঞ্চাল রাজ্য যে তাঁকে সর্বাঙ্গীন সাহায্য করবে—দ্রুপদ সে ব্যাপারে যুধিষ্ঠিরকে কথা দিলেন—প্রতিজজ্ঞে চ রাজ্যায় দ্রুপদো বদতাং বরঃ। সাহায্য করার এই নৈতিক সমর্থনই নয় শুধু, দ্রৌপদীর বিবাহের দানসামগ্রীর দিকে যদি দৃষ্টি দেন, তবে দেখবেন সেখানে বসন ভূষণ, দাস দাসী ছাড়াও আর যা আছে, তা সবই যুদ্ধের কাজে লাগে—শত শত যুদ্ধরথ, শত শত যুদ্ধহস্তী—শতং রথানাং বরহেমমালিনাং...শতং গজানামপি পদ্মিনাং তথা। পঞ্চাল দ্রুপদের এই সাহায্য ছাড়াও দ্বিতীয় দফার সাহায্য পাওয়া গেল পাণ্ডবদের পূর্বসম্বন্ধী কৃষ্ণ বলরামের কাছ থেকে। শূরসেন মথুরার যাদব বৃষ্ণিসংঘের প্রধান পুরুষ হিসেবে কৃষ্ণ বলরাম তখন বিখ্যাত। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরসভাতেই কৃষ্ণের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক তৈরি হল পাণ্ডবদের। একই কথা আবার বলতে হয়—যাদব বৃষ্ণিদের কাছ থেকেও যে সাহায্য পাণ্ডবরা পেলেন, তা শুধু নৈতিক সমর্থন নয়, পেলেন যুদ্ধে ব্যবহার্য হাতি, ঘোড়া, রথ—গজান্...সদশ্বাংশ্চ... রথাংশ্চ...দান্তান্...।

পাঞ্চাল দ্রুপদ এবং বৃষ্ণি যাদবের এই সামরিক সাহায্যের বহর দেখে মহাভারতের নিরপেক্ষ বক্তা বৈশম্পায়ন পর্যন্ত মন্তব্য করলেন—পাণ্ডবদের সঙ্গে দ্রুপদের এই যে সংযোগ ঘটল—পাণ্ডবৈঃ সহ সংযোগং গতস্য দ্রুপদস্য হ—তাতে দেবতাদের কাছ থেকেও আর যেন তাঁদের ভয় রইল না। এবার পাণ্ডবদের এই বৈবাহিক তথা রাজনৈতিক মিত্রশক্তির দিকে দৃষ্টি রেখেই আমরা ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় প্রবেশ করব, যেখানে ঠিক ধৃতরাষ্ট্রের সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন বিদুর, যাঁর কাছে অনেক আগেই খবর পৌঁছে গেছে যে, পাণ্ডবরাই দ্রৌপদীকে লাভ করেছেন। শুধু ধৃতরাষ্ট্রই এখনও খবরটা জানেন না। তা ছাড়া এখানে আগাম খবরের কী আছে! এ খবর তো সবাই জেনে গেছে। গুপ্তচরেরা এসে কৌরবকুমারদেরও যেমন খবরটা জানিয়েছে, তেমনই এ খবর আগাম বয়ে এনেছে হাওয়া। এতবড় একটা খবর—পাণ্ডবরা জতুগৃহের আগুনে মারা যাননি, সমস্ত সামন্ত রাজারা যাঁরা দ্রৌপদীকে লাভ করতে এসে ভীমার্জুনের কাছে যুদ্ধে হেরে বাড়ি ফিরলেন, তাঁরাও যখন পাণ্ডবদের প্রকৃত পরিচয় জানলেন, তখন তাঁরাও কুরুবাড়ির প্রধান পুরুষদের গালি দিতে লাগলেন—ধিগ্ অকুর্বংস্তদা ভীষ্মং ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ কৌরবম্। এ ঘটনাও রাজনৈতিক দিক থেকে মোটেই কৌরবদের পক্ষে সুখকর নয়। দুর্যোধন দুঃশাসনেরা নিজেদের মধ্যে তখন কপাল

চাপড়ে বেড়াচ্ছেন। কেন অর্জুনকে চিনতে পারলাম না, পারলে দেখিয়ে দিতাম, পুরোচনটাকে ঠিক করে আগুন লাগাতে বললুম—ব্যাটা আস্ত গাধা—এতসব গালাগালির পরেও অন্তরে অন্তরে যে ঘটনা কৌরবকুমারদের উদ্বেলিত করল, তা হল দ্রুপদের সামরিক শক্তি এবং সেই শক্তির সঙ্গে জতুগৃহের অগ্নিমুক্ত পাণ্ডবদের সংযোগ। পাণ্ডবদের রাজনৈতিক শক্তিবৃদ্ধি দেখে তারা এবার একটু ভয় পেলেন—ত্রস্তা বিগতসংকল্পা দৃষ্ট্বা পার্থান্ মহৌজসঃ।

বিদুর সবকিছু দেখছিলেন এতদিন ধরে। কবি এতদিন যা ভেবেছেন তা একেবারে রাজনৈতিক চিত্রকল্পের মতো রঙে রসে প্রতিকৃতি লাভ করেছে আজকে। দ্রুপদের সঙ্গে পাণ্ডবদের মিলনে তাঁর পরম ঈপ্সিত রাজনৈতিক বৃদ্ধির সংবাদ আগেই পেয়েছেন বিদুর। অপিচ সেই সংবাদে কৌরবকুমারদের অকর্মণ্য দাম্ভিক প্রতিক্রিয়া, পৌর-জানপদজনের সানন্দ বিক্ষোভ এবং কৌরবপ্রধানদের বিরুদ্ধে সামন্ত রাজাদের বিরূপতা—সব লক্ষ করে বিদুর এবার ধৃতরাষ্ট্রের কাছে চললেন। ধৃতরাষ্ট্র এখনও এ খবর জানেন না, কারণ গুপ্তচরেরা দুর্যোধনের কাছে খবর দেওয়াটাই যথেষ্ট মনে করেছে। কিন্তু বিদুর তাঁর কর্তব্য করবেন ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি। তিনি এই গুরুস্থানীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্নেহান্ধতা সহ্যও করতে পারেন না, আবার তাঁকে অতিক্রমও করতে পারেন না। অতএব তিনি সংবাদ দিতে এলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর আপন ইচ্ছা একভাবে ফলবতী হওয়ায় তথা দুর্যোধন-শকুনিদের চক্রান্ত সর্বথা ব্যর্থ হওয়ায় এইমুহূর্তে স্নেহান্ধ কুরুপিতার সঙ্গে একটু রসিকতা করতে চাইলেন।

ধৃতরাষ্ট্র জানেন—তাঁর ছেলেরা প্রত্যেকে বীর পুরুষ। পঞ্চাল রাজ্যে তারা দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে গেছে মানেই তারা দ্রৌপদীকে লাভ করেই ফিরবে। কুরুকুমারেরা রাজধানীতে ফিরে এসেছেন বটে, কিন্তু ভগ্নদর্প কুমারেরা ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে দেখা করেননি। ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রত্যাশার মুহূর্তে বিদুর এসেছেন তাঁর কাছে এবং সোচ্ছ্বাসে বলেছেন—পরম সৌভাগ্য মহারাজ! কুরুকুলের এবার বিশাল বাড়বাড়ন্ত হল—উবাচ দিষ্ট্যা করবো বর্ধন্তে ইতি বিস্মিতঃ।

দেখুন, কুরু হলেন পাণ্ডব-ধার্তরাষ্ট্রদের সকলেরই পূর্বপুরুষ। কুরুকুল বলতে ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের যেমন বোঝায়, তেমনই পাণ্ডবদেরও বোঝায়। বিদুর এই সম্ভ্রান্ত পূর্বপুরুষের দ্ব্যর্থ-দ্বন্দ্ব বাঁচিয়ে রেখেই সবিস্ময়ে বললেন—সৌভাগ্যবশত কুরুকুলের বড় বাড়বাড়ন্ত হল এবার। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের কথা পড়তে দিলেন না। পরম আনন্দে উদ্‌বেগে সগদগদ ভাষায় শুধু বললেন—পরম সৌভাগ্য, এ আমাদের পরম সৌভাগ্য—অব্রবীৎ পরমপ্রীতো দিষ্ট্যা দিষ্ট্যেতি ভারত। ধৃতরাষ্ট্র ভাবলেন—তাঁর পরম স্নেহাস্পদ দুর্যোধন সব রাজাকে হারিয়ে দিয়ে পঞ্চাল-রাজনন্দিনীকে স্বয়ংবরে লাভ করেছেন। বিদুরের সামান্য একটু কথা শুনেই তিনি পরম আহ্লাদে পরিচারকদের ভাল ভাল গয়না নিয়ে আসার জন্য আদেশ দিলেন। আর ওদিকে সোচ্ছ্বাসে সবাইকে বললেন—নিয়ে এসো দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণাকে, নিয়ে এসো এখানে আমার পুত্র দুর্যোধনকে—আনীয়তাং বৈ কৃষ্ণেতি পুত্রং দুর্যোধনং তদা।

ধৃতরাষ্ট্রের অন্তর্গত ভাবটুকু শুনে নিয়ে বিদুর আসল সত্য প্রকাশ করে বললেন—দ্রৌপদীকে লাভ করেছেন পাণ্ডবরা। মহারাজ দ্রুপদ তাঁদের অনেক সম্মান সমাদর করেছেন এবং পাণ্ডবদের সঙ্গে যাঁরা আত্মীয়-সম্বন্ধী মহাশক্তিমান বৃষ্ণি যাদবরা ছিলেন, দ্রুপদ তাঁদেরও খুব খাতির যত্ন করেছেন—তেষাং সম্বন্ধিনশ্চ্যান্যান্ বহূন্ বলসমন্বিতান্। দুর্যোধনের সঙ্গে দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণার বিয়ের ভাবনায় এতক্ষণ যিনি আকুল ছিলেন, সেই ধৃতরাষ্ট্রকে পাণ্ডবদের সৌভাগ্য-সংবাদ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক লহমার মধ্যে কথা পালটে ফেললেন। অন্ধ হলেও ধৃতরাষ্ট্রের বুদ্ধি কিছু কম ছিল না। মহাভারতে বার বার তাঁকে প্রজ্ঞাচক্ষু বলে সম্বোধন করা হয়েছে এবং এই প্রজ্ঞা থাকার ফলে বিদুরের সামান্য কথাটি

থেকেই তিনি বুঝে ফেললেন যে, দ্রৌপদীর মতো এক ব্যক্তিত্বময়ী রমণীকে লাভ করাই শুধু নয়, এই রমণীর পিতার সম্পর্কে পাণ্ডবরা এখন রাজনৈতিকভাবে বলবান হয়ে উঠেছেন এবং সমস্ত মিত্রশক্তি সঙ্গে নিয়ে তাঁদের একটি পৃথক 'অ্যাক্‌সিস্‌' বা রাজনৈতিক কক্ষ তৈরি হয়েছে।

নিজের ভুল এক মুহূর্তে শুধরে নিয়ে তিনি বিদুরকে বললেন—দেখো ভাই! যুধিষ্ঠির ভীমেরা যেহেতু পাণ্ডুর ছেলে, তাই ওরা আমার ছেলেদের চেয়েও আমার কাছে বেশি—যথৈব পাণ্ডোঃ পুত্রাস্তু তথৈবাভ্যধিকা মম। বর্তমান অবস্থায় তাদের মান্যতা কতখানি সে ব্যাপারেও আমি যথেষ্টই অবহিত। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন যে, পাণ্ডবদের আত্মীয়-সম্বন্ধী মানুষজনকেও দ্রুপদ পরম সমাদর করেছেন। এই সাধারণ কথাটার অন্তর্নিহিত অর্থ ধৃতরাষ্ট্র যে কতটা বুঝেছেন, সেটা বিদুরকে শুনিয়ে দিতে তাঁর দেরি হল না। ধৃতরাষ্ট্র বললেন—পাণ্ডবরা নিজেরাও বড় বড় যুদ্ধবীর এবং এখন তারা মিত্রশক্তি লাভ করল। পাণ্ডবদের সঙ্গে যাঁরা আছেন, তাঁদের আত্মীয়স্বজন-সম্বন্ধী, তাঁরাও যথেষ্ট শক্তিমান। আর সবচেয়ে বড় কথাটা কী জান, বিদুর! ঐশ্বর্যকামী কোনও রাজা যদি সমস্ত শক্তিসমৃদ্ধি হারিয়েও থাকেন, তিনিও যদি মহারাজ দ্রুপদকে সবান্ধবে রাজনৈতিক বন্ধু হিসেবে পেয়ে যান, তবে বুঝতে হবে তিনি নিশ্চিতই তাঁর পরম ঈপ্সিত ঐশ্বর্য লাভ করবেন—ন বুভূষেদ ভবেনার্থী গতশ্রীরপি পার্থিবঃ।

সাদা বাংলায় একে বলে 'পালটি খাওয়া'। ধৃতরাষ্ট্রের মুখে এমন জ্ঞানগর্ভ কথা শুনে বিদুরও একটু টিপ্পনী কাটতে ছাড়লেন না। বললেন—আপনি যেমন ভেবেছেন, মহারাজ! শত শত বছর বেঁচে থেকেও যেন আপনার এই বুদ্ধিটুকুই জাগ্রত থাকে। তা হলেই হবে—নিত্যং ভবতু তে বুদ্ধিরেবং রাজন শতং সমাঃ। ধৃতরাষ্ট্রের ঘর থেকে বিদুর নিজের ঘরে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই দুর্যোধন কর্ণরা ধৃতরাষ্ট্রকে ছেঁকে ধরলেন। বিদুরের কাছে ধৃতরাষ্ট্রের স্বীকারোক্তি তাঁদের কানে গেছে। বেশ বোঝা যায়, মুখে এঁরা যতই বড় বড় কথা বলুন, এঁরা অন্তরে অন্তরে বিদুরকে ভয় পান, ভয় পান বিদুরের আন্তর নৈতিক শক্তিকে। দুর্যোধন কর্ণ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এসেই বলতে আরম্ভ করলেন—আমরা তো আর বিদুরের সামনে এসে আপনার দোষ কীর্তন করতে পারি না। কিন্তু এখন জনান্তিকে বলি—আপনি কি আমাদের শত্রু ভাবেন? নইলে বিদুরকে কী আপনার বলার কথা, আর কী-ই বা আপনি বললেন! বিদুরের সামনে পাণ্ডবদের এত প্রশংসা করার কী ছিল—অভিষ্টৌষি চ যত্ ক্ষত্তুঃ সমীপে দ্বিষতাং বর। পাণ্ডবদের মানসিক শক্তি ভেঙে দেওয়াই তো আপনার কাজ। সেখানে এতক্ষণ কী করলেন আপনি? ধৃতরাষ্ট্র ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন—তোমরা যা চাও আমিও তাই চাই। কিন্তু বিদুরের সামনে আমার অন্তরের দুঃখ মুখে চোখে প্রকাশ হয়ে যাক—এটা আমি চাইনি—বিবেক্তুং নাহমিচ্ছামি ত্বাকারং বিদুরং প্রতি। বিদুরের সামনে আমি পাণ্ডবদের গুণ গাইলাম এই জন্য, যাতে বিদুর আমার আকার ইঙ্গিত দেখে কিছুই বুঝতে পারে যে, আমি সত্যিই তোমাদেরই সমর্থন করি—নাব্বুধ্যেত বিদুরো মমাভিপ্রায়মিঙ্গিতৈঃ! নৈতিকতার কাছে এই হল অনৈতিকতার পরাজয়। ধৃতরাষ্ট্র এখনও দুর্যোধন কর্ণদের স্তরে নামতে পারেননি বলেই এই কনিষ্ঠ ভাইটিকে তাঁর এত ভয়। ধৃতরাষ্ট্র জানেন—যেন তেন প্রকারেণ রাজনৈতিক সিদ্ধি লাভ করাটাই বিদুরের উপলব্ধি নয়। বিদুরের কাছে রাজনীতি যতটা রাজার নীতি, তার থেকে অনেক বেশি নীতির রাজত্ব। রাজনীতি যদি জনগণের ঈপ্সিত কল্যাণনীতি থেকে বিযুক্ত হয়ে শুধুই ব্যক্তি রাজার স্বার্থসিদ্ধির উপকরণ হয়ে ওঠে, তবে বিদুর সেখানে প্রতিবাদ করবেন—নৈতিক প্রতিবাদ, আর এই নৈতিকতাকেই ধৃতরাষ্ট্রের ভয়।

দ্রুপদের সঙ্গে পাণ্ডবদের রাজনৈতিক তথা বৈবাহিক সংযোগ ভেঙে দেবার জন্য দুর্যোধন কর্ণরা যেসব যুক্তি প্রতিযুক্তি সাজালেন, ধৃতরাষ্ট্র সেসব খুব মন দিয়ে শুনলেন বটে, কিন্তু এঁরা যেহেতু নিজেরাও কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না এবং ধৃতরাষ্ট্রও

যেহেতু পাণ্ডবদের পক্ষপাতী জনমতের ধারা উপেক্ষা করতে পারলেন না, অতএব কর্ণ দুর্যোধনকে তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন—তোমাদের যাতে ইচ্ছাপূরণ হয় সেইভাবে তোমরা ভাবতে থাকো, কিন্তু এই বৈবাহিক গুরুত্ব নিয়ে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর—এঁদের সঙ্গে আমার আলোচনা করতেই হবে—ভূয়ো এব তু ভীষ্মশ্চ দ্রোণো বিদুর এব চ।

ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রীসভা বসল। প্রধান বক্তা হিসেবে ভীষ্ম পাণ্ডবদের জতুগৃহে পুড়িয়ে মারার পরিকল্পনাকে ধিক্কার জানালেন এবং বললেন—লোকে এতে পুরোচনকে যত দোষ দেবে, তার থেকে বেশি দেবে তোমাকে। যাই হোক, এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা যেটা, সেটা হল পাণ্ডবদের রাজাধিকার ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। আইনসঙ্গতভাবে তাঁরা যদি পিতৃরাজ্যের উত্তরাধিকার না পান, তা হলে তোমারও এই রাজ্যের ওপরে কোনও অধিকার নেই, ধৃতরাষ্ট্র! ভীষ্ম জানতেন যে, এতদিন অধিকার ভোগ করে ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর পুত্ররা হঠাৎই অধিকার ছেড়ে দেবেন না। সেই জন্য ভীষ্ম প্রস্তাব করলেন যে, পাণ্ডবদের অর্ধেক রাজ্য দিয়ে দেওয়া হোক, তাতে খানিকটা ন্যায় যেমন প্রতিষ্ঠিত হবে, তেমনই প্রতিষ্ঠিত হবে কুরুবংশের কল্যাণ।

ভীষ্মের কথা সম্পূর্ণ সমর্থন করলেন কৌরবসভার আর এক মন্ত্রী দ্রোণাচার্য। দ্রুপদরাজা তাঁর ব্যক্তিগত শত্রু হলেও দ্রোণাচার্য দ্রুপদের সহায়তার রাজনৈতিক তাৎপর্যও একটু বুঝিয়ে দিতে ছাড়লেন না। দ্রোণের এই সুচিন্তিত সুস্থ বক্তব্য দুর্যোধন কর্ণের প্রতিবাদে আহত হয়েছিল। দুর্যোধন নিজ মুখে বলতে পারেননি, কিন্তু কর্ণের মুখে কুরুবৃদ্ধ পিতামহ এবং দ্রোণাচার্য দুজনেই এমন নিন্দিত হয়েছেন যে, এই দুই বৃদ্ধকে শুনতে হল—তাঁরা কুরুবাড়ির অর্থমানে পুষ্ট হয়ে কুরুদেরই অনিষ্ট করছেন। দ্রোণাচার্য কর্ণের কথার উত্তর দিয়েছেন সক্রোধে। কিন্তু বিদুর রাগ করেন না। রাজনীতির গূঢ় সত্য তিনি জানেন বলেই কাউকে তিনি ভয়ও পান না, কারও কথায় রাগেনও না। তিনি কথা আরম্ভ করলেন ধীরে।

বিদুর বললেন—মহারাজ! আত্মীয়বন্ধু মন্ত্রীরা আপনার ভাল চেয়ে যে কথাটা বলেন, সেটা যদি আপনি নাই শোনেন, তা হলে তাঁদের কথার কোনও মূল্য থাকে না—ন ত্বশুশ্রূষমানে বৈ বাক্যং সম্প্রতিতিষ্ঠতি। ভীষ্ম আপনার মঙ্গল চেয়ে কথা বললেন, আপনি তাঁর কথা শুনছেন না। দ্রোণাচার্য আপনার হিতের কথা বললেন, আপনি তাও শুনছেন না। শুধু তাই নয়, কর্ণ আবার মনে করছেন যে, ভীষ্ম দ্রোণের কথায় আপনার হিত হবে না। আমার একটু জিজ্ঞাসা আছে। আমার জিজ্ঞাসা হয় এবং সন্দেহও হয় যে,—এই অবস্থায় কাকে আপনি সঠিক বন্ধু বলে ভাবছেন—চিন্তয়ংশ্চ ন পশ্যামি রাজংস্তব সুহৃত্তমম্। বিদুর তাঁর বাগ্মিতার মাধ্যমে ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝিয়ে দিতে চাইছেন যে, নিজের ভাল চাইলে মন্ত্রণা সভায় কার কার মত নেওয়া উচিত, সেটা শাসক রাজার পক্ষে বুঝে নেওয়াটা খুব জরুরি। আর সৎ মন্ত্রণা প্রত্যাখ্যান যদি করতেই হয়, তবে কী কী বিপরীত পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে, সেটা বুঝে নেওয়াটাও জরুরি। বিদুর বললেন—মহারাজ! আগে বুঝুন, বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতায় ভীষ্ম দ্রোণের চাইতে প্রবীণতর আর কে আছেন এখানে। এঁদের বয়স, অভিজ্ঞতা এবং সুনামই যে সব, তা নয়। এঁরা আপনার ব্যাপারে এবং পাণ্ডবদের ব্যাপারে সমান দৃষ্টিসম্পন্ন। দুই পক্ষেরই যাতে ভাল হয়, এঁরা তাই তো বলছেন। এমন কোনও স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারও এঁদের নেই যে, একজনের পক্ষপাতী হয়ে এঁরা অসৎ পরামর্শ দেবেন আপনাকে—ন চার্থহেতোর্ধর্মজ্ঞৌ বক্ষ্যতঃ পক্ষসংশ্রিতম্। আর কেউ কেউ যে বলছেন—বিদুর কর্ণের কথার দিকে ইঙ্গিত করলেন—কেউ কেউ যে বলছেন, এঁরা আপনার খেয়ে পরে আপনারই অপকার করে থাকেন, তা হলে একটা উদাহরণ দেখান, যেখানে বলতে পারেন এঁরা আপনার কোনও অপকার করেছেন—ন চাপ্যপকৃতং কিঞ্চিদনয়োর্লক্ষ্যতে ত্বয়ি—অথবা কোনও সময় আপনার অমঙ্গল চেয়ে কোনও কাজ করেছেন?

ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের কথার কোনও জবাব দেননি এখনও এবং বিদুরও জানেন যে, ভীষ্ম দ্রোণের ভাল এবং উচিত কথায় ধৃতরাষ্ট্র যে খুব অভিভূত হবেন, তা নয়। বিদুর বললেন—দুর্যোধন দুঃশাসনেরা যেমন আপনার ছেলে, পাণ্ডবরাও তেমন আপনারই ছেলে। এটা না বুঝে যারা পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে কথা বলছে, তারা আপনাকে ঠিক মন্ত্রণা দিচ্ছে না এবং আপনার ভালও তারা চাইছে না—মন্ত্রিণস্তে ন চ শ্রেয়ঃ প্রপশ্যন্তি বিশেষতঃ। বিদুরের এ ইঙ্গিতটাও কর্ণের দিকে, কারণ তিনি ভীষ্ম দ্রোণকে অপমানিত করেছেন। বিদুর যেহেতু জানেন যে, তাঁর উপদেশে কিছু লাভ হবে না, ধৃতরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত কর্ণ দুর্যোধন শকুনির মন্ত্রণাই মেনে নেবেন, তাই তিনি নিরুপায় হয়ে পাণ্ডবদের নিজস্ব শক্তি এবং তাঁদের মিত্রশক্তির জোটের প্রসঙ্গটা টেনে আনলেন। অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র কারও পরামর্শ না শুনে একগুঁয়েমি করলে তাঁকে অন্যেরা রাজনৈতিকভাবে কীভাবে মোকাবিলা করবেন, তার ছন্দটা বিদুর বুঝিয়ে দিলেন ধৃতরাষ্ট্রকে।

অর্জুন ভীমের যে বীরত্ব পূর্বাহ্নেই প্রখ্যাতি লাভ করেছে, বিশেষত দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের পর সেই ভয়ংকর যুদ্ধে ভীমার্জুনের কাছে কর্ণ দুর্যোধনেরা যেভাবে পর্যদস্ত হয়েছিলেন, সেই যন্ত্রণা ধৃতরাষ্ট্রের ভুলে যাবার কথা নয় বলেই বিদুর ভীমার্জুনের যুদ্ধবীর্য আরও একবার স্মরণ করিয়ে দিলেন ধৃতরাষ্ট্রকে। তারপরেই স্মরণ করিয়ে দিলেন বৃষ্ণি যাদবদের সংঘশক্তির কথা। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেখবেন—কোনও বিজিগীষু রাজা যদি সংঘরাষ্ট্রকে মিত্রশক্তি হিসেবে পান, তবে সেই মিত্রশক্তির কাছে বহুতর সুবর্ণ লাভও তুচ্ছতর হয়ে যায়। তিনি এই সংঘরাষ্ট্রের (corporation, republic) উদাহরণ হিসেবে বৃষ্ণি যাদবদের উল্লেখও করেছেন। তারমধ্যে আবার এই সংঘরাষ্ট্রের মুখ্যব্যক্তিরা হলেন কৃষ্ণ বলরাম—যাঁদের বলবীর্যে মথুরার পরাক্রান্ত নৃপতি কংসের মৃত্যু হয়েছে। বিদুর সেই বৃষ্ণি যাদবদের প্রধান নেতাদের নাম করে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—বলরাম, কৃষ্ণ, সাত্যকি—এঁরা যাঁদের পক্ষে এসে গেছেন, যুদ্ধে তাঁদের জয় করাটা অত সহজ হবে না, মহারাজ! বরঞ্চ তাঁরাই সব জয় করে নেবেন—কিং নু তৈরজিতং সংখ্যে যেষাং পক্ষে চ সাত্যকিঃ।

আসলে ভয় যে এঁরাও পাচ্ছিলেন না, তা নয়। একটু আগেই দুর্যোধনের লাভের জন্য ধৃতরাষ্ট্র যখন কর্ণের মত চেয়েছিলেন, তখন কর্ণও বলেছিলেন—যতদিন না কৃষ্ণ তাঁর বৃষ্ণি যাদবদের বাহিনী নিয়ে দ্রুপদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন—যাবন্নায়াতি বার্ষ্ণেয়ঃ..... পাঞ্চাল্যসদনং প্রতি—ঠিক ততদিনই আমরা দ্রুপদের সঙ্গে লড়তেও বা পারি, কিন্তু এঁরা একত্র হলে আর কিছুই সম্ভব হবে না। কর্ণের মুখে একথা ধৃতরাষ্ট্রের শোনা আছে বলে বিদুরের পক্ষে রাজনীতি বোঝানোটা তানেক সহজ হল। বিদুর বলতে চাইলেন—যুদ্ধবাহিনী নিয়ে একত্র হওয়াটা বড় কথা নয়, পাণ্ডবদের পক্ষে মিত্রশক্তির জোট বাঁধাটাই কৌরবদের কাছে এক রাজনৈতিক আঘাত। একদিকে যেমন অদম্য বৃষ্ণি যাদবেরা আছেন, অন্যদিকে যে পাণ্ডবদের শ্বশুর হলেন পঞ্চালরাজ দ্রুপদ, যাঁদের শালারা হলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন—শিখণ্ডীরা, সেখানে যুদ্ধ করবার মতো আহাম্মকি রাজনৈতিকভাবে পোষাবে না।

ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের কথা এবার বুঝতে শুরু করেছেন। বিদুর অতএব রাজনৈতিক কাঠিন্যের যুক্তি ছেড়ে হৃদয়ের কোমলতা আশ্রয় করলেন। যুক্তি দিয়ে বললেন—যুদ্ধ করতে গেলে কোনও লাভ যেখানে হবে না, অপিচ পাণ্ডবরাই যেখানে রাজ্যের ন্যায়সঙ্গত অধিকারী, অন্যদিকে জতুগৃহের চক্রান্ত করে একটা অসভ্যতাও যেখানে হয়ে গিয়েছে, সেখানে আপনি যদি এখন পাণ্ডবদের ওপর অনুগ্রহ দেখান, তবে সেটা আপনার পক্ষে এবং সমগ্র কুরুবংশের পক্ষেও মঙ্গল হবে। বিদুর আরও বললেন—দ্রোণাচার্যের কারণে দ্রুপদের সঙ্গে এককালে অত্যন্ত শত্রুতার আচরণ করেছি আমরা, এখন পাণ্ডবদের প্রতি অনুগ্রহ দেখালেই সেই ঘটনার ওপর প্রলেপ দেওয়া যায়। দ্রুপদকে আমাদের পক্ষে নিয়ে এলে পরিণামে সেটা আমাদেরই শ্রীবৃদ্ধি ঘটাবে—তস্য সংগ্রহণং রাজন্ স্বপক্ষস্য বিবর্ধনম্।

সবচেয়ে বড় কথাটি জানেন, মহারাজ! মধুর বাক্যে, মধুর ব্যবহারেই যে কাজটা সুষ্ঠুভাবে সমাধা করে ফেলা যায়, সেখানে কোন অভিশপ্ত ব্যক্তি যুদ্ধবিগ্রহ করে, রক্তপাত ঘটিয়ে সে কাজটা জটিল করে তুলবে—কো দৈবশপ্তস্তৎকার্য্যং বিগ্রহেণ সমাচরেৎ। বিদুর এবার লঘুভাবে বললেন—পাণ্ডবরা বেঁচে আছে শুনে পুর-জনপদবাসীরা সকলেই আনন্দিত। তারা ওদের দেখতে চাইছে। আপনি তাদের ইচ্ছা পূরণ করুন। আমি আগেও আপনাকে বলেছি, মহারাজ—দুর্যোধনের অন্যায় অসভ্যতা এই বংশের ধ্বংস ডেকে আনবে। যে ক'জন মিলে ওরা বুদ্ধি করে, তাদের না আছে ন্যায়-অন্যায় বোধ, না আছে গভীর বুদ্ধি, না আছে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, কাজেই এদের ছেলেমানুষি কথায় আপনি কান দিয়ে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনবেন না—অধর্মযুক্তা দুষ্প্রজ্ঞা বালা মৈষাং বচঃ শৃণু।

বলা যায়, অবস্থার বেগতিকে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের কথা মেনে নিতে বাধ্য হলেন। দুর্যোধনের ক্রমিক প্রতিপক্ষতার মোকাবিলা করতে করতে পাণ্ডবরা নিজেরাই মানসিকভাবে শুধু শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি, তারা এখন সহায়শক্তিসম্পন্ন। ধৃতরাষ্ট্র তাই ঘুরে গেলেন একেবারে। ভীষ্ম দ্রোণের মন্ত্রণার প্রশংসা তো করলেনই, এমনকী সামনাসামনি বিদুরকেও বললেন—তুমি ঠিক কথাই বলেছ—ত্বঞ্চ সত্যং ব্রবীষি মে। সত্যিই তো, পাণ্ডুর ছেলেরা তো আমারও ছেলে। এ রাজ্য যেমন দুর্যোধনের তেমনই পাণ্ডবদেরও বটে। এত কথা বললেও ধৃতরাষ্ট্র কিন্তু পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরে ফিরিয়ে আনার জন্য অন্য কাউকে পাঠাতে পারলেন না, কারণ জতুগৃহের চক্রান্ত প্রকাশ হয়ে যাবার পর এবং দ্রৌপদী স্বয়ংবরে দুর্যোধন কর্ণদের হার হবার পর তাঁদের তো পাঠানোর উপায়ই নেই। অতএব পরিষ্কার বিদুরকেই তিনি আদেশ দিয়ে বললেন—ক্ষত্তা! তুমিই একবার যাও সেখানে। যত্নআত্তি করে তাদের মা-বউ সহ নিয়ে এসো পাণ্ডবদের—ক্ষত্তরানয় গচ্ছৈতান্ সহ মাত্রা সুসংস্কৃতান্।

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে বিদুর পাণ্ডবদের সকলের জন্য, দ্রুপদের জন্য এবং অবশ্যই নববধূর জন্য অনেক ধনরত্নের উপঢৌকন নিয়ে পৌঁছোলেন পাঞ্চাল রাজ্যে। বিদুরের যাবার খবর নিশ্চয় আগে থেকেই পাঞ্চালে চলে গিয়েছিল। ফলে পঞ্চালরাজ দ্রুপদ একেবারে 'প্রোটোকল' অনুযায়ী বিদুরকে পঞ্চালে স্বাগত জানালেন—স চাপি প্রতিজগ্রাহ ধর্মেন বিদুরং ততঃ। কৌরব রাজ্য রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় কৃষ্ণা, কুন্তী, পাণ্ডব, দ্রুপদ—যার জন্য যত উপঢৌকন দ্রুপদের রাজ্যে পাঠিয়েছিলেন সেসব যথাযোগ্য স্থানে ন্যস্ত করে বিদুর জড়িয়ে ধরলেন পাণ্ডবদের—স্নেহাৎ পরিষ্বজ্য চ তান্ পপ্রচ্ছানাময়ং ততঃ। আজকে তিনি সত্যিই কৃতকৃত্য মনে করছেন নিজেকে। জতুগৃহের দাহ-চক্রান্ত থেকে তিনি তাঁরই ওপর নির্ভরশীল পাণ্ডবদের যে বাঁচাতে পেরেছেন, এই তৃপ্তি তাঁকে পরম পুলকিত করেছে।

সকলকে যথাযথ কুশল প্রশ্ন করে বিদুর এবার প্রথাগতভাবে হস্তিনাপুরের রাজার সংবাদ জানাতে চাইলেন। দ্রুপদ এবং বৃষ্ণিবীর কৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডবরা যেহেতু রাজসভাতেই বসে আছেন, অতএব রাজকার্যটি আগে সেরে নিতে চাইলেন বিদুর, কেননা ওই রাজকার্যের মধ্যেই তাঁর পরম ঈপ্সিত লুকিয়ে আছে। এই প্রথম, তিনি যা বলেছেন, ধৃতরাষ্ট্র তা রাজনৈতিক মর্যাদায় করতে চলেছেন। কাজেই সেই আনন্দসংবাদ দেওয়ার জন্য বিদুর বললেন—মহারাজ দ্রুপদ! আপনি, আপনার ছেলেরা এবং আপনার মন্ত্রী অমাত্যরা শুনুন সকলে। হস্তিনাপুরের রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্রদের সঙ্গে এবং অমাত্যবর্গের সঙ্গে আপনার কুশল প্রশ্ন করেছেন আমার মাধ্যমে। পিতামহ ভীষ্ম, আপনার বাল্যসখা দ্রোণাচার্যও আপনার মঙ্গল কামনা করেছেন। এঁরা দুজনেই আপনার প্রতি স্নেহালিঙ্গন জানাচ্ছেন।

লক্ষণীয়, বিদুর পঞ্চালে এসেছেন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের দূত হয়ে। দ্যূতের কাজ—এতটুকু 'সেন্টিমেন্টাল' না হয়ে, এতটুকু নিজের কথা না বলে শুধু রাজা এবং রাজসভাতেই গৃহীত সিদ্ধান্ত পররাষ্ট্রের রাজাকে জানানো। বিদুর ঠিক তাই করছেন। তিনি বললেন—মহারাজ

ধৃতরাষ্ট্র এবং সমস্ত কৌরবমুখ্যরা আপনার সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ লাভ করে নিজেকে কৃতার্থ মনে করছেন—কৃতার্থং মন্যতে আত্মানং তথা সর্বে'পি কৌরবাঃ—একথা স্মরণ করবেন মহারাজ! কৌরবমুখ্য ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যলাভ করেও যত খুশি হননি, সেই সুখ তিনি পেয়েছেন আপনার সঙ্গে মিত্রসম্বন্ধ লাভ করে—যথা সম্বন্ধকং প্রাপ্য যজ্ঞসেন ত্বয়া সহ।

আমরা জানি—এইসব কথার মধ্যে আতিশয্য থাকে, বিশেষত পররাষ্ট্রনীতিতে এসব আতিশয্য সর্বযুগমানিত। মনের কথা ধরলে এ সম্বন্ধে ধৃতরাষ্ট্রের আনন্দিত হবার কিছু নেই। কিন্তু দূতকার্যের প্রথায় রাজনৈতিক দুঃখ সুখ সবই মনের মধ্যে চেপে রাখতে হয়। বিদুরও সেই প্রথায় পুনরায় জানালেন—আপনার সম্বন্ধ-গৌরবে গৌরবান্বিত ধৃতরাষ্ট্র আপনার অনুমতি চাইছেন যাতে আপনি পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। কৌরবরাজ্য দীর্ঘকাল প্রবাসী পাণ্ডবদের দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে রয়েছে, আপনি তো বোঝেন সে কথা। তা ছাড়া এতকাল বাইরে থেকে পাণ্ডবজননী পৃথাও নিশ্চয়ই ঘরে ফেরবার জন্য উৎসুক। কৌরব রাজ্যের সকলে, এমনকী পুর-জনপদবাসীরাও নববধূ কৃষ্ণাকে দেখবার জন্য অপেক্ষমাণ। এ অবস্থায় আপনি এদের সকলকে হস্তিনাপুরে যাবার অনুমতি দিয়ে বাধিত করুন—স ভবান্ পাণ্ডুপুত্রাণামাজ্ঞাপয়তু মা চিরম্—আর বিলম্ব করবেন না, এটা আমারও মত। সবকিছু ধৃতরাষ্ট্রের নামে বলার পর মাত্র দুটি শব্দে এই যে নিজের মত প্রকাশ করলেন বিদুর—এতদ্ অত্র মতং মম—এর মধ্যে দিয়েই সমস্ত রাজনৈতিক মৌখিকতার অবসান ঘটিয়ে আসল প্রয়োজনটুকু বুঝিয়ে দিলেন বিদুর। বিদুর জানেন—কুরুরাজ্যে জ্ঞাতিভেদ নিয়ে যে সমস্যা চলছে, তা দ্রুপদ অবশ্যই জেনে গেছেন, সেখানে বিদুরের ভূমিকাটুকুও পাণ্ডবদের মুখে তাঁর জেনে যাবার কথা। কাজেই দুদিন আগে যারা পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার পরিকল্পনা করেছিল, তারা এখন এমন আহ্লাদিত হয়ে পাণ্ডবদের ঘরে ফিরিয়ে আনতে চাইছে সেটা খুব বিশ্বাস্য নয়। কিন্তু রাজনীতি এমনই জিনিস, দুদিন আগে যাকে মারতে চেয়েছি, সে সহায়সম্পন্ন হয়ে যাওয়ায় এখন রাজনৈতিক কারণে তাঁদের স্বাগত জানাতে হচ্ছে। বিদুর এই রাজনৈতিক শুষ্কতা ধৃতরাষ্ট্রের সাদর আমন্ত্রণবার্তাতেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু পরিশেষে ওই যে কথাটুকু বললেন—এটা আমারও মত—ঠিক এইখানেই বোঝানো হয়ে গেল যে, পাণ্ডবদের ঘরে ফেরাটা রাজনৈতিক কারণেই জরুরি।

মহারাজ দ্রুপদ কিছু কাঁচা লোক নন। তিনি সব বুঝেই প্রথাগতভাবে ধৃতরাষ্ট্রের নাম উল্লেখ না করেই বললেন—মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর! আপনি যেমনটি বলেছেন, আমারও তাই মনে হয়—পাণ্ডবদের ঘরে ফেরা উচিত অবশ্যই। অর্থাৎ নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে এখনই তাঁদের যাওয়া উচিত—এবমেতন্ মহাপ্রাজ্ঞ যথাত্থ বিদুরাদ্য মাম্। বিশেষত দ্রুপদ এবং কৃষ্ণের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্বন্ধ ঘটার পর ধৃতরাষ্ট্র আপাতত চাপে পড়ে যা মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন, সেই অবস্থাটুকুর সুযোগ নিতে হলেও রাজধানীতে ফেরা দরকার তাড়াতাড়ি।

অতএব অবস্থা বুঝেই পাণ্ডবরা জননী কুন্তী এবং পাঞ্চালী কৃষ্ণার সঙ্গে হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন বিদুরের তত্ত্বাবধানে। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের যথেষ্ট সমাদর এবং যত্ন করে কুরুরাজ্য ভাগ করে দেবার প্রস্তাব করলেন। অবশ্য মূল রাজ্যের কোনও সমৃদ্ধ অংশ তিনি পাণ্ডবদের দিলেন না। তিনি তাঁদের জায়গা দিলেন খাণ্ডবপ্রস্থে। জায়গাটা তখনও পর্যন্ত কোনও দিক দিয়েই খুব সুবিধের নয়। ঘন বনে সমাকীর্ণ এবং শস্য সম্পত্তিও সেখানে তেমন সহজলভ্য নয়। যাই হোক, পাণ্ডবরা সেখানে নিজের ক্ষমতায় নগর বসালেন, আগুনে খাণ্ডবদাহ করে বন পুড়িয়ে জনবসতি গড়ে তুললেন এবং শিল্পীশ্রেষ্ঠ ময়দানবকে দিয়ে দেবসভার তুল্য রাজসভা নির্মাণ করলেন। ধৃতরাষ্ট্রের দেওয়া খাণ্ডবপ্রস্থ যখন পাণ্ডবদের ক্ষমতায় ইন্দ্রপ্রস্থে রূপান্তরিত হল, তখনই ঋষিমুনিদের আগ্রহ মান্য করে রাজসূয় যজ্ঞে ব্রতী হলেন যুধিষ্ঠির।

সেই যে জতুগৃহদাহের চক্রান্ত থেকে কোনওভাবে পাণ্ডবদের রক্ষা করতে পেরেছিলেন

বিদুর, সেই সেদিনের পর থেকে পাণ্ডবদের সঙ্গে বিদুরের দেখা হয়েছে একমাত্র পঞ্চাল রাজ্য থেকে তাঁদের হস্তিনাপুরে নিয়ে আসবার সময়। এ সময়ে পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরে থাকা হয়নি বেশিদিন। নববধূকে নিয়ে তাঁরা নতুন রাজ্য পত্তন করলেন ইন্দ্রপ্রস্থে এবং বিদুর কথঞ্চিৎ মানসিক শান্তি পেয়েছিলেন এই ভেবে যে, আর বুঝি পাণ্ডব-কৌরবের জাতিভেদ, সংঘর্ষ নাও হতে পারে। ধৃতরাষ্ট্র নিজে দুর্যোধনের প্রতি যতই স্নেহান্ধ হোন না কেন, ছোট ভাই পাণ্ডুর প্রতি তাঁর যতটুকু মমতা ছিল, তাতে পাণ্ডবরা একেবারে ঘোর-বঞ্চিত হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াক—এটা তিনিও চাইতেন না। খাণ্ডবপ্রস্থে রাজ্য দেবার সময় তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলেও ছিলেন যে—আমাদের নিজেদের মধ্যে যাতে ঝগড়াঝাটি না হয়, সেজন্যই তোমরা খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়ে বসবাস করো—পুনর্নো বিগ্রহো মা ভূৎ খাণ্ডবপ্রস্থমাবিশ।

হয়তো মহামতি বিদুরও সেই কারণে যথেষ্ট নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের শেষ পর্বের কতগুলি ঘটনা সব কিছুই একেবারে উলটেপালটে দিল। রাজসূয় যজ্ঞে হস্তিনাপুরের সকলেরই নেমন্তন্ন হয়েছিল এবং পিতামহ ভীষ্ম থেকে আরম্ভ করে স্বয়ং দুর্যোধন পর্যন্ত প্রত্যেককে এক একটি কাজের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন যুধিষ্ঠির। মহামতি বিদুরকে এখানে ভার দেওয়া হয়েছিল ব্যয়ের। অর্থাৎ সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানে যেখানে রাজা-রাজড়ারা সব একত্র হয়েছেন, সেখানে সমস্ত ব্যাপারেই যা খরচ হবে, সেই খরচের ভার ছিল বিদুরের ওপর। বিদুর এই দায়িত্ব যেভাবেই পালন করে থাকুন, মহাভারতের কবি তার খবর দেননি। কিন্তু রাজসূয়ের যে আড়ম্বর হল এবং সমস্ত ভারতবর্ষের রাজারা যেভাবে যুধিষ্ঠিরের প্রতিপত্তি মেনে নিলেন, তাতে দুর্যোধনের মনে আবারও ঈর্ষা, হিংসা উদ্বেল হয়ে উঠল। যতদিন তিনি যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য দেখেননি, ততদিন হয়তো সুখেই ছিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের সভাগৃহের নির্মাণকৌশল আরও ভাল করে দেখে আরও বহুগুণ ঈর্ষাতুর হবার জন্য তিনি যে কয়েকদিন ইন্দ্রপ্রস্থে থেকে গেলেন, এটাই তার কাল হল।

ইন্দ্রপ্রস্থের সভায় স্ফটিকনির্মিত ভূমিতলে কোথাও পড়ে গিয়ে, কোথাও বা সংশয়িতভাবে বস্ত্র উত্তোলন করে অতিকৌতূহলী দুর্যোধন পাণ্ডবদের কাছে হাস্যাস্পদ হলেন। পাণ্ডবদের সঞ্চিত ঐশ্বর্য তাঁকে পাগল করে তুলল। মামা শকুনির কাছে মনের সব দুঃখ ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের সঙ্গে পাশা খেলতে বললেন। সোজা কথায় পাশার বাজিতে পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য জিতে নেবার প্রস্তাব করলেন শকুনি এবং সে প্রস্তাব দুর্যোধনকে রীতিমতো আলোড়িত করে তুলল। পিতা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে দুর্যোধন নিজের দুঃখের বর্ণনা করলেন সাতকাহন করে। পাণ্ডবদের ঐশ্বর্যের বিপরীতে তিনি যে কত হীন অবস্থায় আছেন, কত যে তাঁর কষ্ট—এসব তিনি স্বাভিমানে জানালেন পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে।

ধৃতরাষ্ট্র হঠাৎ করে দুর্যোধনের ক্ষোভ শুনে বড় আশ্চর্যও হলেন। দুর্যোধনের পরিকল্পনা একেবারে পাকা ছিল। কেননা তাঁর বক্তব্যের মাঝখানেই শকুনি তাঁকে জানালেন—কীভাবে কপট পাশা খেলে যুধিষ্ঠিরের সমস্ত ঐশ্বর্য তিনি দুর্যোধনের হাতে এনে দিতে পারেন। দুর্যোধন শেষ পর্যন্ত নির্লজ্জভাবে ধৃতরাষ্ট্রকে বলেই ফেললেন যে, শকুনিমামা পাশা খেলে তাঁকে যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য লাভে সাহায্য করবেন, অতএব ধৃতরাষ্ট্র এ ব্যাপারে অনুমতি দিন তাড়াতাড়ি। ধৃতরাষ্ট্র অত সহজে রাজি হতে পারলেন না। তিনি জানেন যে, বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে তাঁর সময় পর্যন্ত বাজি রেখে পাশাখেলার আচরণ কেউ সমর্থন করবেন না। এ সময়ে সর্বাপেক্ষা যাঁর কথা তাঁর মনে পড়ল, তিনি হলেন তাঁর ছোট ভাই বিদুর। পাণ্ডুর জায়গায়, পাণ্ডুর সিংহাসনে বসে ধৃতরাষ্ট্র রাজত্ব করছেন। সেখানে একটা তুলনা প্রতিতুলনার ব্যাপার আছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হল রাজধর্ম, যেখানে ব্যক্তিগত কামনা

এবং ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কোনও কাজ করা চলে না; বিদুর তাঁর আদর্শ রাজধর্মের কথা বার বার ধৃতরাষ্ট্রকে স্মরণ করিয়ে দেন, কিন্তু স্নেহান্ধতা, ব্যক্তিগত লাভের লোভে তিনি দিশেহারা হয়ে যান।

এই মুহূর্তে দুর্যোধন যখন তাঁকে সকরুণভাবে আপন কষ্টের কথা জানাল, তখন ধৃতরাষ্ট্র পরিষ্কার বুঝলেন যে, একেবারে সাধারণ ঈর্ষার কারণেই দুর্যোধন এই অসম্ভব প্রস্তাব করছেন। কিন্তু যতই বুঝুন, সোজাসুজি পুত্রকে প্রত্যাখ্যান করার শক্তি তাঁর নেই। তিনি বিদুরের প্রসঙ্গ তুললেন। বললেন—দেখো বাছা! বিদুর হচ্ছেন আমাদের কুরুসভার প্রবর মন্ত্রী। তিনি প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, শুধু রাজধর্মের প্রয়োজনেই তিনি মন্ত্রণা দেন না, যে কোনও বিষয়ের করণীয়তা এবং অকরণীয়তা সম্বন্ধে তাঁর পরামর্শের মূল আছে। আমি বরং বিদুরের সঙ্গে কথা বলে এ বিষয়ে কী করা যায়, তোমাকে জানাব—তেন সঙ্গম্য বেৎস্যামি কার্যস্যাস্য বিনিশ্চয়ম্।

তাত্ত্বিক বিষয়ই শুধু নয়, রাজা-রাজড়াদের মধ্যে একটা পাশাখেলাও যে এক সময় রাজনৈতিকভাবে ভয়ংকর বিপদ ডেকে আনতে পারে, সেটা সেই মুহূর্তে ধৃতরাষ্ট্রের বোধে তেমন করে কুলোয়নি। তিনি শুধু এইটুকু বুঝেছেন যে, ব্যাপারটা ভাল দিকে এগোচ্ছে না। কিন্তু এই পাশাখেলার রাজনৈতিক তাৎপর্য কতখানি সেটা ঠাহর করার জন্য আজ বিদুরের মতো বিশালবুদ্ধি মানুষের প্রয়োজন। ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে বলেছেন—যা কিছুই হোক, বিদুরের চোখের সামনে আজ নীতি নিয়ম এবং করণীয়তার স্পষ্ট ছবি। আজকে যা সামান্য মনে হচ্ছে, ভবিষ্যতে সেটা কী রূপ নিতে পারে বিদুর এটা সবচেয়ে ভাল বোঝেন, সেই দীর্ঘদর্শিতা তাঁর আছে—স হি ধর্মং পুরস্কৃত্য দীর্ঘদর্শী পরং হিতম্।

ধৃতরাষ্ট্র সামান্যও জানেন যে, মনু ইত্যাদি রাজধর্মপ্রণেতারা পাশাখেলাকে রাজাদের সর্বনাশের একটা কারণ বলেছেন। মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, স্ত্রীলোক ইত্যাদি দশটি কামজ ব্যসনের মধ্যে যে কোনও একটি রাজাদের বিপদ ডেকে আনতে পারে। কিন্তু সেটা খুবই সাধারণ মানের কথা। একটি বদ নেশায় আসক্তি মানুষের সর্বনাশ ঘটায়—এটা একটা সাধারণ মানের উপদেশের কথা। কিন্তু এই সাধারণ আসক্তিই একটি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, বিশেষত রাজাকে কতটা অধঃপতিত করে, সে কথা রাজনীতির ইতিহাস না জানলে বোঝা যায় না। বিদুর তাঁর বিশাল অভিজ্ঞতায় সে ইতিহাস জানেন শুধু নয়, তিনি একটি রাজপরিবারের গতি প্রকৃতি দেখছেন ছোটবেলা থেকে। নির্মোহ দৃষ্টিতে কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থের অপেক্ষা না রেখে তিনি কৌরব রাজতন্ত্রের হিতমন্ত্রণায় নিযুক্ত। ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্যোধনকে বলেছিলেন—কৌরব পাণ্ডব দুই পক্ষেরই যাতে ভাল হয়, সেইরকম একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কথা বিদুরই জানাতে পারেন—উভয়োঃ পক্ষয়োর্যুক্তং বক্ষ্যত্যর্থবিনিশ্চয়ম্।

'অর্থবিনিশ্চয়'—উপরি উক্ত শ্লোকে শেষ শব্দটি হল 'অর্থবিনিশ্চয়'। কথাটা খুব সোজা নয়, এমনকী 'অর্থ' কথাটাও একেবারে সোজা নয়। 'অর্থ' শব্দের একটা রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিক তাৎপর্য আছে। কী করে নতুন রাজ্য লাভ করা যায়, পুরাতন ভূখণ্ডের সঙ্গে নতুন ভূখণ্ডের যোগ করা যায় কীভাবে, কীভাবে রাজোচিত ধনসম্পত্তি লাভ করা যায়, 'অর্থ' শব্দের তাৎপর্য নাকি সেইখানেই। কৌটিল্যের লেখা রাজনীতিশাস্ত্রের নামই তাই অর্থশাস্ত্র। অন্যদিকে মহাভারতের শান্তিপর্বে 'অর্থবিনিশ্চয়' নামে একটি সংগ্রহ পর্ব আছে। রাজনীতির যত কূট উপদেশ এই 'অর্থবিনিশ্চয়ে'র মধ্যে সংগৃহীত। যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম উপদেশ করার সময় মহর্ষি ভরদ্বাজের সঙ্গে সৌবীরদেশের রাজা পুরঞ্জয়ের যে রাজনীতি সংক্রান্ত কূট কথাবার্তা হয়েছিল, সেইগুলিই 'অর্থবিনিশ্চয়' নামক এক উপবিভাগের মধ্যে স্থান পেয়েছে মহাভারতের শান্তিপর্বে! অতএব ধৃতরাষ্ট্র যখন দুর্যোধনকে বললেন—এ বিষয়ে বিদুর যে

'অর্থবিনিশ্চয়ে'র কথা শোনাবেন, তা কৌরব পাণ্ডব দু পক্ষের কাছেই হিতকর হবে—তখন বুঝতে হবে—দুটি রাষ্ট্রীয় শক্তির মধ্যে এই অক্ষক্রীড়া হলে তার যে সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক ফল ফলবে—সে সম্বন্ধে বিদুরই সবচেয়ে ঠিক পরামর্শটি দিতে পারবেন।

কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র এত করে বিদুরের পরামর্শ শুনতে চাইলে কী হবে, স্বার্থবুদ্ধি এবং অনুচিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা যাঁর হৃদয় জুড়ে রয়েছে, সেই দুর্যোধন বিদুরের নাক গলানো সইবেন কেন? বিশেষত তিনি বিদুরকে কৌরবদের অন্নপুষ্ট পরজীবী বলে মনে করেন। ধৃতরাষ্ট্রের মুখে বিদুরের সম্বন্ধে প্রশংসাবাণী শুনে দুর্যোধন একেবারে ক্ষিপ্ত অভিমানে ফুঁসে উঠলেন ধৃতরাষ্ট্রের সামনে। তিনি বললেন—আমাদের এই সুন্দর পরিকল্পনার মধ্যে যদি আবার বিদুর এসে নাক গলান, তা হলে তিনি আপনাকে অবশ্যই অক্ষক্রীড়ায় নিবৃত্ত হতে বলবেন। আর তাঁর কথা শুনে আপনি যদি সব বন্ধ করে দেন, তবে আমার মরাই ভাল। দুর্যোধন অভিমানের মাত্রা আরও চড়িয়ে দিয়ে বললেন—তা বেশ, আমি মরি, তাতে আপনার কোনও দুঃখ নেই, এটা বেশ বুঝতে পারছি। আপনি এত বিদুর বিদুর করছেন যখন, তখন বিদুরকে নিয়ে আপনি সুখী হয়ে থাকুন, আর আমার মরা মুখ দেখুন আপনি—স ত্বং ময়ি মৃতে রাজন্ বিদুরেণ সুখী ভব—সত্যিই তো আমাকে কীসের প্রয়োজন আপনার, আমার মরণ হোক, আপনি ভোগ করুন এই পৃথিবী।

ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহান্ধ হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠল। তিনি দ্যূতক্রীড়ার জন্য সভা সাজাবার আদেশ দিলেন দুর্যোধনের ভাবনাকে রূপ দেবার জন্য। কিন্তু এতবড় একটা ব্যাপার হবে, অথচ কৌরব রাজসভার প্রবর মন্ত্রী বিদুর তা জানবেন না, সেটা যেমন অনুচিত হবে, তেমনই বিদুরের সৎ পরামর্শ মেনে নিলে দুর্যোধনের হৃদয় যে চিরতরে দুঃখিত হয়ে উঠবে, সেটাও তিনি সহ্য করতে পারলেন না। ধৃতরাষ্ট্র রাজা। রাজা হিসেবে তিনি বিদুরের মন্ত্রণা অগ্রাহ্যও করতে পারেন। কিন্তু অন্ধ, স্নেহান্ধ পিতা কী করে প্রিয় পুত্রের হৃদয়যন্ত্রণা সহ্য করবেন। অতএব দুর্যোধনকে শান্ত করার জন্য মনে মনে অক্ষক্রীড়ার কথা ঠিক করেও লোক দেখাতে অথবা নিজের মনকে বোঝাতে তিনি ডেকে পাঠালেন বিদুরকে—প্রাহিনোদ্ বিদুরায় বৈ। কী অদ্ভুত দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়েছেন ধৃতরাষ্ট্র। তিনি এই অক্ষক্রীড়ার অন্যায়টুকু বুঝতে পারছেন, কিন্তু নিজে এই অপসিদ্ধান্ত নেবার আগে একবার বিদুরকে জিজ্ঞাসা না করেও পারছেন না—অস্পৃষ্ট্বা বিদুরং স্বস্য নাসীৎ কশ্চিদ্ বিনিশ্চয়ঃ।

বিদুর আগেই খবর পেয়ে গেছেন বোধ হয়। তিনি বুঝলেন—ঝগড়া করার আরও একটা পথ দুর্যোধন খোলা পেয়েছেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের মতো স্নেহান্ধ ব্যক্তি এই মুক্ত দুয়ার বন্ধ করে সাধু বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হবেন, এটা তাঁর মনে হল না। তিনি পড়ি কি মরি করে ছুটে এলেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে—বিনাশসুখমুৎপন্নং ধৃতরাষ্ট্রমুপাদ্রবৎ। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের প্রস্তাব শোনার আগেই যতটুকু তাঁর কানে এসেছে, সেইটুকুই যথেষ্ট, এইভাবেই তাঁকে বললেন—মহারাজ! আপনি যা ঠিক করেছেন, তা আমি মোটেই সমর্থন করতে পারছি না—নাভিনন্দামি তে রাজন্ ব্যবসায়মিদং প্রভো। এই পাশাখেলা নিয়ে ছেলেদের মধ্যে আবার এক বিভেদ তৈরি হবে। যাতে এই বিভেদ, অনর্থক ঝগড়াঝাটি বন্ধ হয়, আপনি কোথায় সেই চেষ্টা করবেন মহারাজ, তা না আপনি ছেলের এই অনুচিত প্রস্তাবে মেতে উঠেছেন—পুত্রৈর্ভেদো যথা ন স্যাৎ দ্যূতহেতোস্তথা কুরু। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে 'ভেদ' শব্দটি উচ্চারণ করে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইলেন যে, পাণ্ডবদের পৃথক রাজ্যখণ্ড ভাগ করে দেবার সময় তিনি যুধিষ্ঠিরের কাছে বলেছিলেন—কৌরব পাণ্ডবে আর যাতে কোনও ভেদসৃষ্টি না হয়, সেই জন্যই পৃথক এক রাজ্যের ব্যবস্থা করছেন তিনি। অতএব হঠাৎ করে কেন আবার তাদের সঙ্গে এই পাশাখেলার উদ্যোগ?

আসলে বৈদিক যুগ থেকেই অক্ষক্রীড়া ভারতবর্ষে এক অতি জনপ্রিয় ক্রীড়ার বিষয়।

বেদের মধ্যে 'অক্ষসূক্ত' বলে একটি সম্পূর্ণ কবিতাখণ্ড রয়েছে যাতে অক্ষক্রীড়ার ভয়ংকর উন্মাদনা খুব প্রকট। এই অক্ষসূক্তের মধ্যে এমন মানুষের খবর পাচ্ছি যে একের পর এক বাজি ধরে নিজের ধনসম্পত্তি হারাচ্ছে, ঘরবাড়ি হারাচ্ছে, নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত হারাচ্ছে। সোজা কথায় আজকে যে জুয়াখেলা চলে, যে জুয়াখেলায় একবার বাজি জিতলেই মানুষ ভাবে আমি এমনই জিততেই থাকব এবং পরিশেষে জুয়া যেমন তার সর্বনাশ করে—এই জুয়াখেলার উন্মাদনার কথাটা হাজার হাজার বছর আগের লেখা বৈদিক অক্ষসূক্তে ভালভাবে বিবৃত আছে। অক্ষসূক্তের প্রতিবেদন থেকে মনে হয় এখানকার মন্ত্রদ্রষ্টা কবষ ঐলুষ নিজেই জুয়াড়ি ছিলেন। এক জায়গায় তিনি বলছেন—জুয়াড়ি যখন খেলার আসরে আসে তখন বুক ফুলিয়ে বলে—আমিই জিতব—জেষ্যামীতি তন্বা শূশুজানঃ। কিন্তু কখন যে পাশার গুটিগুলি আঁকশি দিয়ে তাকে টানতে থাকে যাতে এক সময় বানের ফলার মতো বিদ্ধ হয় জুয়াড়ি, ছুরিতে কাটার মতো আগুনে পোড়ার মতো অবস্থা হয় তার—নিকৃত্বানস্তপনা-স্তাপয়িষ্ণবঃ।

মনে রাখতে হবে—এই বৈদিক অক্ষসূক্ত, তার ভাষার অন্তর্বাহী বেদনা এবং নাটকীয়তায় এতই সম্পূর্ণ যে, এখনকার দিনে সংস্কৃতের পাঠ নিতে গেলেও তাকে অক্ষসূক্ত পড়তে হয়। অন্তত অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূর্খ পাঠক্রমনির্মাতারা বেদের এই অংশটি পাঠ্য বলে মনে করেছেন। এবারে ভাবুন, সেকালের দিনে বেদপাঠ করাটা ধর্ম সংস্কার এবং পাণ্ডিত্যের অঙ্গীভূত ছিল। বেদমন্ত্রের প্রাতিপদিক গুরুত্ব সেকালের দিনে এতই বেশি ছিল যে, বেদের মধ্যে যে অক্ষক্রীড়াকে ঘৃণিত বলা হয়েছে, পণ্ডিত সজ্জনেরা তাকে আমল দেবেন না, তা হতেই পারে না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—মহামতি বিদুর পাশাখেলার এই সর্বনাশা ভাবটুকু মাথায় রেখেই ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁর দুরাগ্রহ থেকে বিরত হতে বলছিলেন এবং তাই যে বলেছিলেন তা পরে আমরা আরও ভাল করে বুঝব। আপাতত জানাই—ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের কথা শুনলেন না। আমি মনে করি না শোনাটাও একটা পথ হতে পারত, তাতে পরিষ্কার তাঁর মনটা বোঝা যেত। কিন্তু বিদুরের কথা তিনি সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান না করে এমন একটা ভাব দেখালেন, যেন পাশাখেলাটা এমনি এমনিই হচ্ছে। ভাব দেখালেন—এ যেন খেলার জন্যই খেলা। এরমধ্যে জুয়ার অংশ যেন নেই-ই।

আমরা জানি—দুর্যোধন, যিনি চক্ষুলজ্জার ধার ধারেন না—তিনি পরিষ্কার পিতাকে জানিয়েছিলেন যে, পাকা জুয়াড়ি শকুনি তাঁর হয়ে পাশা খেলে পাণ্ডবদের সমস্ত সম্পত্তি বাজিতে জিতে দেবেন—অয়ম্ উৎসহতে রাজন্ শ্রিয়মাহর্তুমক্ষবিৎ। কিন্তু বিদুর যখন ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—এই বিভেদ সৃষ্টিকারী পাশাখেলার মধ্যে যাবেন না, মহারাজ—তখন ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের কাছে পাশাখেলার কথাটা এমনভাবেই বললেন যেন এটা কোনও ঘটনাই নয়। ধৃতরাষ্ট্র বললেন—তুমি এত দুশ্চিন্তা করছ কেন বিদুর! আমাদের ছেলেদের মধ্যে ভেদ বিভেদ, ঝগড়াঝাটি কিছুই হবে না—ক্ষত্তঃ পুত্রেষু পুত্রৈর্মে কলহো ন ভবিষ্যতি। মাথার ওপরে ভগবান আছেন, ভাল মন্দের মালিক তিনি। বন্ধুদের মধ্যে যেভাবে পাশা খেলা হয়, সেইরকম একটা পাশাখেলার ব্যবস্থা হোক, তুমি আপত্তি কোরো না। এটা করতেই হবে—প্রবর্ততাং সুহৃদ্দ্যূতং দিষ্টমেতন্ন সংশয়ঃ। তা ছাড়া তুমি এত ভাবছ কেন—সেই পাশাখেলার আসরে আমি থাকব, পিতামহ ভীষ্ম থাকবেন, আচার্য দ্রোণ থাকবেন এবং তুমিও থাকবে। এতসব ন্যায়কামী পুরুষ থাকতেও সেখানে হঠাৎ করেও একটা অন্যায় ঘটে যাবে, এটা আমি মনে করি না—অনয়ো দৈববিহিতো ন কথঞ্চিৎ ভবিষ্যতি।

পাণ্ডবদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ যে এই অক্ষক্রীড়ার মাধ্যমেই করা হবে ধৃতরাষ্ট্র তা পরিষ্কার জানতেন। কিন্তু তাঁর অন্ধ পুত্রস্নেহ এমনই যে তা রোধ করার ক্ষমতা তাঁর নেই। তিনি স্বেচ্ছায় এই অন্যায়ে প্রবৃত্ত হলেন—দ্যূতে দোষাংশ্চ জানন্ স পুত্রস্নেহদাকৃষ্যত। ধৃতরাষ্ট্র সব জেনেশুনে—পরে অন্যায় আচরণ হবে জেনেও—হালকা করে বিদুরকে

বললেন—তুমি বরং আজই তাড়াতাড়ি ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে এসো এখানে। তবে আমি যে ঠিক কী করতে যাচ্ছি, সেটা তাকে পরিষ্কার জানিয়ো না—ন বাচ্যো ব্যবসায়ো মে বিদুরৈতদ্ ব্রবীমি তে।

ধৃতরাষ্ট্রের শেষ কথাটি থেকে বোঝা যায়—বন্ধুর মতো খেলাই হোক অথবা পাকা জুয়াড়ির মতো—পাশাখেলা নিয়ে তাঁর মনেও দ্বন্দ্ব আছে। বিশেষত বিদুর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ধৃতরাষ্ট্রের প্রতিবাদ করায় ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের প্রস্তাবে রাজি হলেও হস্তিনাপুরের কার্যনির্বাহী রাজা হিসেবে তাঁর মনে সন্দেহ ছিল যে, এই পাশাখেলার ঘটনা তাঁর দুর্নাম বাড়াবে। অন্যদিকে বিদুরকে ধৃতরাষ্ট্র যতই আদেশ দিন যুধিষ্ঠিরকে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসার জন্য, তিনি মোটেই সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে রওনা হলেন না। ধৃতরাষ্ট্রকথিত বন্ধুত্বপূর্ণ পাশাখেলার গুরুত্ব কতটা অথবা তার ফলাফলই বা কী, সেটা আলোচনার জন্য বিদুর দুঃখিত মনে পিতামহ ভীষ্মের ঘরে উপস্থিত হলেন—আপগেয়ং মহাপ্রাজ্ঞম্ অভ্যগচ্ছৎ সুদুঃখিতঃ।

পিতামহ ভীষ্ম এবং বিদুর—দুজনেরই একটা জায়গায় গভীর মিল আছে। এঁরা দুজনেই হস্তিনাপুরের রাজা নন এবং রাজা হবার কোনও ইচ্ছাও তাঁদের নেই। কিন্তু এঁরা দুজনেই কৌরব মন্ত্রিসভার প্রাজ্ঞ সদস্য। এঁরা রাজার প্রয়োজনে নিঃস্বার্থভাবে তাঁর হিতকর মন্ত্রণা দেবেন বটে, কিন্তু রাজার আদেশ তাঁরা অমান্য করেন না। মনে রাখা দরকার, দ্যূতক্রীড়ার বিষয় নিয়ে ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রীসভার কোনও বৈঠক ডাকেননি, যেখানে পৃথক পৃথকভাবে ধৃতরাষ্ট্রের বক্তব্য সযৌক্তিকভাবে খণ্ডন করা যায়। দুর্যোধনের চাপে পড়ে ধৃতরাষ্ট্র নিজেই দ্যূতক্রীড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তিনি জানতেন যে, সভা ডাকলে তিনি প্রত্যাখ্যাত হবেন। বিদুরের সমস্যা হল—তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে ডেকে যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে আসার আদেশ দেওয়ায় তিনি তা অমান্যও করতে পারছেন না, আবার তাঁর আদেশ মেনেও নিতে পারছেন না। এ হেন পরিস্থিতিতে তিনি অন্তত প্রারব্ধ ঘটনার ধারা কুলবৃদ্ধ পিতামহকে জানিয়ে রাখছেন।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রস্তাব বিদুর যেহেতু একটুও সমর্থন করেননি, তাই তিনিও মানসিক চাপে পুত্র দুর্যোধনকে আরও একবার বোঝানোর চেষ্টা করেছেন নির্জনে। তিনি বলেছেন—বাছা! এই পাশাখেলার চিন্তাটা আমার ভাল লাগছে না মোটেই। বিদুর যেহেতু একটুও আমাকে সমর্থন করলেন না, তখন এই পাশাখেলাটা একেবারেই ঠিক হবে না মনে হচ্ছে—অলং দ্যূতেন গান্ধারে বিদুরো ন প্রশংসতি। দেখো, এই বুদ্ধিমান মানুষটি, সবসময় আমাদের হিতের কথাই বলছেন এবং সত্যি তাতে আমাদের ভালই হবে—হিতং হি পরমং মন্যে বিদুরো যৎ প্রভাষতে। আগেকার দিনের দু-একটি সংসারে আমি এমন মানুষ দেখেছি, যাঁরা খুব লেখাপড়া জানতেন অথচ চাকরিবাকরি করতেন না। করলেও সামান্য চাকরি করতেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেটা স্কুলশিক্ষকের চাকরি। সেকালে এই অসামান্য শিক্ষিত মানুষগুলির পরম সম্মান ছিল। যে কোনও সমস্যায় যে কোনও কাজে এই মানুষগুলির পরামর্শ ছিল জরুরি। বাড়ি, পাড়া এবং গ্রামের অর্থবান এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরাও হীনবিত্ত বয়ঃকনিষ্ঠ এই জ্ঞানী মানুষদের মন্ত্রণা গ্রহণ করতেন যে কোনও কাজে। লক্ষণীয়, মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র রাজা হলেও, বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও এই কনিষ্ঠ বিদুরের প্রতি পরম শ্রদ্ধা পোষণ করতেন মনে মনে। নিজের স্বার্থান্বেষিতায় অথবা পুত্রের প্রতি অন্ধতায় সবসময় যে তিনি বিদুরের মত মেনে নিয়েছেন তা নয়, কিন্তু বিদুরের প্রাজ্ঞতা এবং নীতি-শুদ্ধতা সম্পর্কে তাঁর উচ্চ ধারণা ছিল নিশ্চিত।

অক্ষক্রীড়ার মতো বিপন্নতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে, অক্ষক্রীড়ার রাজনৈতিক ফলশ্রুতি মাথায় রেখে ধৃতরাষ্ট্রের মতো মানুষও পুত্রকে বলেছিলেন—দেবগুরু বৃহস্পতির মতো ব্রাহ্মণ শিক্ষক দেবতাদের রাজা ইন্দ্রকে যেসব রাজনীতির উপদেশ দিয়েছিলেন, সে সমস্তই কিন্তু জানেন আমাদের বিদুর। তিনি মহাপণ্ডিত ব্যক্তি, যে কোনও কাজের অনাগত ভবিষ্যৎও

তিনি অনুমান করতে পারেন। সমস্ত কুরুবংশীয়দের মধ্যে পাণ্ডিত্যে এবং দীর্ঘদর্শিতায় বিদুরই যে সকলের চাইতে সেরা এবং বৃষ্ণি যাদবদের মধ্যে একমাত্র উদ্ধবের সঙ্গেই যে তাঁর তুলনা হতে পারে, ধৃতরাষ্ট্র এই ব্যাপারে সোচ্চারে বিদুরকে সমর্থন জানিয়ে দুর্যোধনকে বলতে চাইলেন—আমি যে আমি তাঁর দাদা বটে, দেশের রাজা বটে, তবু সবসময় আমি তাঁর মত মেনে চলি—স্থিতশ্চ বচনে তস্য সদাহমপি পুত্রক।

ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের যতই প্রশংসা করুন, যতই তাঁর মত নেবার চেষ্টা করুন, দুর্যোধন তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে আরম্ভ করলেন। তিনি বললেন—বিদুর! বিদুর কে? আমরা কি পরের কথা শুনে নিজেদের সিদ্ধান্ত নেব? যাদের ক্ষমতা আছে, তেমন পুরুষ কখনও পরের কথায় কাজ করে না—নারভেত অন্যসামর্থ্যাৎ পুরুষঃ কার্য্যমাত্মনঃ। দুর্যোধন ঠিক আজকের দিনের একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠিত নেতার মতো কথা বলছেন। আজকের দিনে যদি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলীয় নেতার কোনও সমালোচনা করেন, তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রতিপক্ষীয় দলনেতার নাম উচ্চারণ করে আপনাকে ব্র্যান্ড করে দিয়ে বলবেন—উনি তো অমুক দলের লোক, আমরা কি ওদের কথা শুনে চলব। দুর্যোধনও ঠিক সেইভাবেই বললেন ধৃতরাষ্ট্রকে—বিদুর! বিদুর তো পাণ্ডবদের লোক। তিনি তো সবসময় পাণ্ডবদের হয়েই লড়ছেন—পাণ্ডবানাং হিতে যুক্তো ন তথা মম কৌরব। তো আমরা বিদুরের কথায় চলব কেন? আপনাকে বলছি পিতা, কোনওভাবেই বিদুরের কথা শুনবেন না। আপনি যা ভাল বলে ভাবছেন, সে বুদ্ধি আপনার একেবারে নষ্ট করে দেবে এ বিদুর। উনি পাণ্ডবদের লোক—ব্যপনেষ্যতি তে বুদ্ধিং বিদুরো নাত্র সংশয়ঃ।

অন্যায় রাজনীতির সমালোচনা যিনিই করবেন, তিনিই এইভাবে শত্রু বলে চিহ্নিত হবেন। ক্ষমতাসীন বামপন্থী রাজনীতির সমালোচনা করলে আপনি বি জে পি বলে চিহ্নিত হবেন, আর বি জে পি-র সমালোচনা করলে আপনি সি পি এম। তখনও এই ছিল, কিন্তু সমাজে কতগুলি শিক্ষিত মানুষ থাকেন, যাঁরা ন্যায়ের পক্ষে কথা বলেন, তাঁদের কাছে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থতার চেয়েও রাজনৈতিক ন্যায়ের মূল্য বেশি। হস্তিনাপুরের রাজ-সিংহাসনের অধিকারও যাঁদের প্রাপ্য, তাঁদের রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা হল, তাতেও কিছু বলেননি বিদুর। তাঁদের রাজ্যখণ্ড ভাগ করে দিতে হয়েছে মিত্রপক্ষীয় রাজনীতির চাপে। আর আজকে যখন তাঁরা বন পুড়িয়ে জনবসতি তৈরি করে, রাজপ্রাসাদ তৈরি করে সামান্য সুখের মুখ দেখছেন, তাঁদের সুখ ছিনিয়ে নিতে হবে জুয়াখেলা করে। কী করে এঁদের সমর্থন করবেন বিদুর আর কী করেই বা রাজনৈতিক জুয়াড়িরা বিদুরের মতো নীতিনিষ্ঠ প্রাজ্ঞতা মেনে নেবেন?

ধৃতরাষ্ট্র কিন্তু বিদুরের কথা শুনে যথেষ্ট আন্তরিকভাবেই দুর্যোধনকে বুঝিয়েছিলেন। দুর্যোধন যখন বিদুরকে গালাগালি দিয়ে নিজের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থতাকেই শ্রেয় বলে মনে করলেন, ধৃতরাষ্ট্র কিন্তু তখনও তাঁকে ছেড়ে দেননি। দুর্যোধনকে তিনি বলেছিলেন—তোমার যা ভাল লাগে, তুমি করো দুর্যোধন! কিন্তু তোমার কথা আমার ভাল লাগছে না। আমার কথা না শুনলে ভবিষ্যতে তোমাকে পস্তাতে হবে। বিশেষত পরম প্রাজ্ঞ বিদুর—তিনি পাশাখেলার এমন অনেক সর্বনাশা উদাহরণ দেখেছেন—দৃষ্টং হ্যেবৈতদ্ বিদুরেণৈব সর্বং—তিনি অনেক ভেবেচিন্তেই সাবধান করেছেন আমাদের। তবু যদি তুমি কোনও কথাই না শোন, তা হলে ভবিষ্যতে আমাদের অনেক ভয় আছে বলেই আমি মনে করি—মহদ্ভয়ং ক্ষত্রিয়জীবঘাতি।

ধৃতরাষ্ট্র সবকিছু এবার দৈবের ওপরে ছেড়ে দিয়ে ডেকে পাঠালেন বিদুরকে এবং আদেশ করলেন যুধিষ্ঠিরকে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসতে। রাজসূয় যজ্ঞের আসরে ইন্দ্রপ্রস্থের সভা দেখে দুর্যোধনের ঈর্ষা হয়েছিল। দুর্যোধনের দুঃখ দূর করতে নতুন করে সাজানো হল

সভাগৃহ। ধৃতরাষ্ট্র দ্যূতক্রীড়ার সমস্ত ভয়াশঙ্কা পুত্রস্নেহে লঘু করে দিয়ে বিদুরকে বললেন—সভাটাকে নতুন করে সাজানো হল, তা যুধিষ্ঠিরকে বোলো, সে ভাইদের নিয়ে সভাটাও একবার দেখে যাক আর একটু সুহৃৎ-সম্মত দ্যূতক্রীড়াও করে যাক—স দৃশ্যতাং ভ্রাতৃভিঃ সার্ধমেতৎ/সুহৃদ্দ্যূতং বর্ত্তামত্র চেতি।

ধৃতরাষ্ট্র রাজা হিসেবে আদেশ দিচ্ছেন। বিদুর কৌরব-মন্ত্রিসভার মন্ত্রী হিসেবে সে আদেশ মানতে বাধ্য। কিন্তু এই আদেশের মধ্যে যে অন্যায় আছে, বিদুর তা পুনরায় বলতে ছাড়লেন না। তিনি বললেন—অধস্তন ব্যক্তির ওপর আপনার এই আজ্ঞা আমি মোটেই অভিনন্দন করছি না—নাভিনন্দে নৃপ তে প্রৈষমেতৎ—এমন সর্বনাশা কাজটি করবেন না। আপনার পুত্রেরা—পাণ্ডব কৌরব নিজেদের মধ্যে এমনিই মতভেদ পোষণ করে। সেখানে এই দ্যূতক্রীড়া হলে কলহ অবশ্যম্ভাবী, মহারাজ! ধৃতরাষ্ট্র বললেন—কলহ নিয়ে আমি আর তেমন কষ্ট পাচ্ছি না, বিদুর! বিধাতা তাঁর লিখন লিখে দিয়েছেন আমাদের কপালে, স্বতন্ত্রভাবে আমাদের কিছুই করার নেই। যাও ক্ষত্তা! আমার আদেশ মান্য করো। তুমি যুধিষ্ঠিরকে শীঘ্র নিয়ে এসো এখানে—তদদ্য বিদূর প্রাপ্য রাজানং মম শাসনাৎ। ক্ষিপ্রম্ আনয়...।

ধৃতরাষ্ট্র এত কম কথা বললেন বলেই বিদুর বুঝলেন যে, তিনি আর নিজের বশে নেই। অন্ধ স্নেহ ধৃতরাষ্ট্রকে ভ্রান্ত পথে চালিত করছে এবং এইভাবে চালিত হতে হতে একসময় তিনি এই ভ্রান্ত নীতিকেই সত্য বলে মনে করবেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হিসেবে নয়, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ মেনেই যে বিদুর পাণ্ডবদের কাছে যেতে বাধ্য হলেন, সে কথা মহাভারত জানিয়েছে—ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে জোর করে এই কাজে নিযুক্ত করায়—বলান্নিযুক্তো ধৃতরাষ্ট্রেণ রাজ্ঞা—বিদুর বিশাল রথে অশ্ব যোজনা করে ছুটলেন ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের কাছে। মহাপ্রাজ্ঞ এবং রাজনীতিবেত্তা হিসেবে বিদুরের যেহেতু খ্যাতি ছিল, তাই ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা হবার আগেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়রা তাঁকে সম্মান করে নিয়ে চললেন—পূজ্যমানা দ্বিজাতিভিঃ। সেকালে এমনই ছিল। শুধুমাত্র পাণ্ডিত্যের কারণেই শুদ্রাগর্ভজাত সন্তান বলে তাঁকে কোনও বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়নি।

যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বিদুরের দেখা হল এবং তিনি সপুত্রক ধৃতরাষ্ট্রের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন বিদুরের কাছে। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বিদুরের যে কথোপকথন হবে—আমরা তা বলবও এখনই কিন্তু সেই কথোপকথনের মধ্যে বিদুরের একটা পরিবর্তন লক্ষ করবেন। পাণ্ডবরা যতদিন তাঁদের প্রাপ্য রাজাধিকার পাননি, ততদিন বিদুর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে তাঁদের টেনে তোলবার চেষ্টা করেছেন। কারণ সেটাই তাঁর কাছে ন্যায়সঙ্গত ছিল। রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী তার রাজ্য পাচ্ছে না, বরঞ্চ সে জ্ঞাতিভাইদের দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছে—এই অবস্থায় বিদুর পাণ্ডবদের সাহায্য করেছেন সর্বতোভাবে। কিন্তু আজ যখন যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা এবং তাঁর সত্তা একান্তই স্বাধীন, বিদুর তাই যুধিষ্ঠিরকে হল্‌হল্ করে উপদেশ দিচ্ছেন না। এখানে অবশ্য আরও একটা ধর্ম কাজ করছে। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের দূত হয়ে এসেছেন ইন্দ্রপ্রস্থে। নিজের মত ব্যক্ত করা দূতের কাজ নয়। যে রাজার দূত হয়ে তিনি দূত হিসেবে এসেছেন, তাঁর কথাই শুধু নয়, তিনি যেভাবে ভাবছেন, তাঁর হৃদয় ব্যক্ত করাটাই তাঁর কাজ। বিদুর ঠিক তাই করেছেন, দূত হিসেবে বাড়তি কথা তিনি বলতে পারেন না। কিন্তু বিদুরের বাগ্মিতা অসাধারণ। কথার পৃষ্ঠে কথার মধ্যেও এমন দু-একটি কথা, এমন দু-একটি বিশেষণ তিনি প্রয়োগ করবেন, যা থেকে বিদুর আসল কথাটা বুঝিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু এও তো আবার ভাবতে হবে যে, এখনকার যুধিষ্ঠির, তখনকার যুধিষ্ঠির নন। তিনি এখন রাজা যুধিষ্ঠির। তাঁকে আড়েধরে নিজের মত বোঝানো যায়, কিন্তু বিদুর এখন তাঁকে কোনওভাবে বলবেন না—তুমি এই করো বা এইটাই তোমার করা উচিত।

যুধিষ্ঠিরের মুখে ধৃতরাষ্ট্রবিষয়ক কুশল প্রশ্ন শুনে বিদুর বললেন—ভালই আছেন তিনি। বিনীত পুত্ররা এবং আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হয়ে তিনি সুখেই আছেন—প্রীতো রাজন্ পুত্রগণৈর্বিনীতৈঃ। লক্ষণীয়, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা বিনীত এবং তাদের নিয়ে তিনি সুখে আছেন —এ কথা বলে বিদুর বুঝিয়ে দিতে চাইলেন—ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে যা ভাবছেন, তার সঙ্গে তাঁর পুত্রদের মতের মিল হচ্ছে। বিদুর বললেন—তিনি নিজেকেই যথেষ্ট ভালবাসেন এবং দৃঢ়চিত্ত মানুষও বটে, কাজেই কোনও কষ্টও তাঁর নেই—বিশোক এবাত্মরতির্দৃঢ়াত্মা। তার মানে, নিজেকে যিনি ভালবাসেন তাঁর কাছে নিজের মতই সর্বস্ব। সোজা দৃষ্টিতে রাজারা তো নিজের মতই মানবেন। আর দৃঢ়চিত্ত! ধৃতরাষ্ট্র এমনিতেই মোটেই দৃঢ়চিত্ত নন। একবার এদিকে ঝোঁকেন, একবার ওদিকে। তা হলে এই মুহূর্তে তাঁকে 'আত্মরতি' এবং 'দৃঢ়চিত্ত' বলার মানে হল—তিনি নিজে যা ভাবছেন, তা থেকে তিনি আর সরে আসতে পারছেন না। বিশেষত দুর্যোধন-দুঃশাসনের কোনও দিনই বিনয়ী নন, অথচ তাঁদের বিনীত পুত্র বলে বিদুর বুঝিয়ে দিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা যা ভাবছেন, ধৃতরাষ্ট্রও তাই ভাবছেন। বারণাবতে জতুগৃহে যাবার সময় তিনি বিদুরের ম্লেচ্ছভাষায় বলা অপ্রাসঙ্গিক কথাগুলিও সঠিক 'ইন্টারপ্রেট' করে ফেলেছিলেন, সেই যুধিষ্ঠিরের পক্ষে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশেষণগুলি যে বুঝে ফেলা সম্ভব হল, তা মনে করি না। ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা হবার ফলে তাঁরও বুদ্ধি নিজের মতো করেই তৈরি হয়েছে। পরে আসব সে কথায়। বিদুর এবার ধৃতরাষ্ট্রের প্রস্তাব আক্ষরিকভাবে জানালেন। বললেন—কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র তোমাদের সবার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করে তোমাদের একবার যেতে বলেছেন সেখানে। বিশেষত তাঁর রাজসভাটি তোমার ইন্দ্রপ্রস্থের মতো হয়েছে বলে একবার দেখে আসতে বলেছেন সেটা। আর সেই সময়ে ভাইদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়ায় একটু অক্ষক্রীড়ারও ব্যবস্থা হয়েছে। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের সকলকে দেখে যে খুব আনন্দিত হবেন, সেটা জানিয়ে মাত্র একটি পংক্তিতে এই প্রস্তাবিত বিষয়ে বিদুর তাঁর নিজের 'ইমপ্রেশন'টুকু যুধিষ্ঠিরের কাছে প্রকাশ করলেন। বললেন—অক্ষক্রীড়া করবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র যেসব পাশাড়েদের বেছে রেখেছেন, সেই সব ধূর্তদের তুমি গেলেই দেখতে পাবে। এই পাশাখেলার নেমন্তন্ন দেবার জন্যই আমি এখানে এসেছি। অতএব তুমি চলো—তান্ দ্রক্ষ্যসে কিতবান্ সন্নিবিষ্টান্ ইত্যাগতো'হং নৃপতে তজ্জুষস্ব।

বিদুরের শেষ কথার জোরটা কোথায়, সেটা বুঝে নিতে যুধিষ্ঠিরের অসুবিধে হল না। বিদুর বোঝাতে চাইলেন—খেলা হিসেবে বিনোদনের জন্যই যদি এই পাশাখেলার আয়োজন হত, তাতে কিছু বলার ছিল না। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র ধূর্ত জুয়াড়িদের পাশাখেলার জন্য ডেকে এনেছেন, সেখানে তার অভিপ্রায় সম্বন্ধে প্রশ্ন আসে। যুধিষ্ঠির বিদুরের এই ইঙ্গিতটুকু বুঝেছেন। তিনি বললেন—দ্যূতক্রীড়ার ফলে প্রায়ই বিবাদবিসংবাদ হতে দেখি। কোনও বুদ্ধিমান লোক এই খেলা পছন্দ করেন না। ধৃতরাষ্ট্র যা বলেছেন, শুনলাম। কিন্তু এ বিষয়ে আপনি নিজে ঠিক কী ভাবছেন সেটা বলুন, কারণ আমরা আপনার আদেশ অনুসারেই চলব —কিংবা ভবান্ মন্যতে যুক্তরূপং ভবদ্‌বাক্যে সর্ব এব স্থিতাঃ স্ম।

যুধিষ্ঠির বুঝতে পারছেন না যে, বিদুরের পক্ষে তাঁর নিজের মত খুব প্রকট করে জানানো কিছুতেই সম্ভব নয়। যুধিষ্ঠিরের ভাল চান বলেই তিনি ধর্ম অতিক্রম করতে পারেন না। ধৃতরাষ্ট্রের দূত হিসেবে তিনি তাঁর কথাই বলতে পারেন। বাড়তি যা বলতে পারেন সেটা রাজার ইচ্ছার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া চাই। ফলত যা ঘটেছে, বিদুর তাই জানিয়ে বললেন —দেখো বাছা! অক্ষক্রীড়া সমস্ত অনর্থের মূল। আমি অনেক চেষ্টা করেছি তাঁকে নিবারণ করতে। কিন্তু তবু রাজা আমাকে পাঠিয়েছেন। এসব কথা বুঝেই তুমি যা ভাল বোঝ তাই করো—শ্রুত্বা বিদ্বন্ শ্রেয় ইহাচরস্ব।

বিদুর তাঁর মত পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি দ্যূতক্রীড়া চান না। কিন্তু যুধিষ্ঠির তেমন করে একটা বুঝলেন না। এর পেছনে কারণও আছে। অনেক বড় মানুষেরই কিছু কিছু কু-

অভ্যাস থাকে। আমার ধারণা হয়, অনেক ধৈর্য, তানেক শম-দম-সংযম একজন মানুষের মধ্যে যখন প্রধান হয়ে ওঠে তখন একান্ত মানুষোচিত ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তিগুলি চিত্তবৃত্তি নিরোধের প্রতিক্রিয়ায় একটি বিশেষ কু-অভ্যাসের রূপ নেয়। যুধিষ্ঠির পাশা খেলতে বড় ভালবাসেন। তিনি অক্ষপাটক নন, জুয়াড়ি নন, কপটতা করেও তিনি খেলায় জিততে চান না। কিন্তু পাশাখেলার একটা নেশা তাঁর আছে। সেই নেশা থেকেই তিনি বিদুরকে বললেন—আপনি অক্ষধূর্তদের কথা বললেন। আচ্ছা কারা কারা এই সভায় এসেছে বলতে পারেন? শত শত পণ রেখে যাদের সঙ্গে খেলতে হবে, তাদের নামধাম একটু বলুন তো?

বিদুর যন্ত্রের মতো উত্তর দিলেন—সবার আগে নাম করতে হবে গান্ধার রাজপুত্র অক্ষনিপুণ শকুনির কথা। তারপরে আছেন বিবিংশতি, আছেন রাজা চিত্রসেন, আর আছেন অক্ষশৌণ্ড সত্যব্রত, পুরুমিত্র এবং জয়। পাকা জুয়াড়ি হিসেবে এঁদের এতই নাম যে, যুধিষ্ঠির তাঁদের নাম শুনেই বললেন—ওরে ব্বাবা! এ তো সব ভয়ংকর নাম। যত রাজ্যের ধূর্ত এবং চোট্টা পাশাড়েরা এসে একসঙ্গে জুটেছে—মহাভয়াঃ কিতবাঃ সন্নিবিষ্টা মায়োপধা দেবিতারোত্র সন্তি। এদের সঙ্গে তো পাশাখেলা একেবারেই উচিত নয়। বিদুর ভাবলেন—যুধিষ্ঠিরের সুমতি হয়েছে। তিনি বোধ হয় আর যাবেন না। কিন্তু পাশাখেলা নয়, যুধিষ্ঠিরের যাবার যে আরও কারণ আছে। তাঁর পিতার তুল্য ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন, অতএব যেতে তাঁকে হবেই। যুধিষ্ঠির বললেন—কিন্তু এমন তো হতে পারে না যে, পিতার তুল্য ধৃতরাষ্ট্র পুত্রতুল্য আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, আর আমি যাব না। কাজেই আপনি যেমন বলেছেন, তেমনই হবে, আমি যাব।

সেটাও তো কথা। পাশাখেলার ব্যাপারে বিদুরের অনিচ্ছা যতই থাকুক, তিনি তো একবারও যুধিষ্ঠিরকে পাশার আসরে যেতে না করলেন না। যুধিষ্ঠিরও তাই সেইরকমই বললেন—দেখুন কাকা! পাশাখেলার আমার একটুও ইচ্ছে নেই এবং মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র না বললে আমি শকুনির সঙ্গে পাশা খেলবও না। কিন্তু তিনি যদি খেলাতে ডাকেন, তবে তো আমার ফেরারও কোনও রাস্তা নেই, আমি খেলবই—আহূতো'হং ন নিবর্তে কদাচিৎ।

যুধিষ্ঠিরের পক্ষে অসহায়তা একটা ছিলই এবং সেটা বিদুরও বুঝেছেন। ঘটনা হল, সেকালের দিনে পাশাখেলার নিয়মটা ছিল অনেকটা রাজায় রাজায় যুদ্ধ হবার মতো। একজন যুদ্ধাহ্বান জানালে যেমন আর একজন পিছু না হঠে সাড়া দিতেন, তেমনই এক রাজা পাশা খেলতে ডাকছেন আর অন্যজন পণ রেখে হারার ভয়ে পিছন ফিরে চলে যাচ্ছেন, এমনটি চলত না। যুধিষ্ঠির হাজার হলেও ক্ষত্রিয় রাজা, তিনি যতই ধর্মরাজ হোন, অক্ষক্রীড়ার ফলও তাঁর যতই জানা থাক ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে তাঁর উপায় ছিল না। বিশেষত তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে পিতার মতো শ্রদ্ধা করতেন; পূর্বে বারণাবতের জতুগৃহে যাবার ইচ্ছে না থাকলেও শুধু ধৃতরাষ্ট্রকে মান্য করার জন্যই তিনি বিপদ মাথায় নিয়ে বারণাবতে গিয়েছিলেন। ফলে ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ শিরোধার্য করে ভাইদের এবং স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি হস্তিনাপুরে পৌঁছোলেন। বিদুরেরও কিছু বলার উপায় ছিল না এখানে। মহাভারতের কবি সম্পূর্ণ ঘটনাটি সম্বন্ধে মন্তব্য করে বলেছেন—তেজস্কর পদার্থ হঠাৎ চোখের সামনে পড়লে যেমন দৃষ্টিশক্তি চলে যায়, তেমন করেই দৈব মানুষের বুদ্ধি হরণ করে। যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বান সহ্য করতে পারলেন না বলেই যেন দৃষ্টিহীনের মতো বিদুরের সঙ্গে উপস্থিত হলেন হস্তিনাপুরে—অমৃষ্যমানস্তস্যাথ সমাহ্বানমরিন্দম।

এর পরের ঘটনা সবার জানা। পাশাখেলার আরম্ভে যুধিষ্ঠির শকুনির কাছেও অনেকবার অনুনয় করে বলেছেন—যেন পাশাখেলার মধ্যে ছলচাতুরি না আসে, তিনি সরল মানুষ—যেন অন্যায়ভাবে, পাশাখেলা না হয় তাঁর সঙ্গে। শকুনি উড়িয়ে দিয়েছেন যুধিষ্ঠিরের কথা। একটু অপমানও করেছেন। বলেছেন—তুমি পাশা খেলতে এসে এখন যদি আমাদের

জুয়াচোর বলে গাল দাও তা—এবং ত্বং মাম্ ইহাভ্যেত্য নিকৃতিং যদি মন্যসে—অথবা খেলার ব্যাপারে এত ভয় যখন তোমার তা হলে মানে মানে বাড়ি ফিরে যাও। রাজা যুধিষ্ঠির তেতে গিয়ে বলেছেন—দ্যূতক্রীড়া এবং যুদ্ধ থেকে আমি কখনও পালিয়ে যাই না।

পাশাখেলার সময় ধৃতরাষ্ট্র এসে উপস্থিত হলেন। রাজসভায় বসেছেন, অতএব 'প্রোটোকল' অনুযায়ী ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর—এঁরাও রাজসভায় এসে বসলেন—অত্যন্ত অসন্তুষ্ট মনেই এসে বসলেন তাঁরা—নাতিপ্রীতেন মনসা তে'ন্ববর্তন্ত ভারত। পাশাখেলা আরম্ভ হল। যুধিষ্ঠির একের পর এক পণ রাখতে আরম্ভ করলেন এবং একের পর এক হারতেও আরম্ভ করলেন। যুধিষ্ঠির রাজোচিত মর্যাদায় বহুমূল্য পণ রাখার সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোধনও ততোধিক মূল্যবান পণ উচ্চারণ করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু যতবারই যুধিষ্ঠির পণ রাখেন, তিনি হারেন, অথচ দুর্যোধন হারেন না। তাঁর সবই অটুট থেকে যায়। পাশাখেলার মনস্তত্ত্ব ঋগ্‌বেদের আমলেও যা ছিল, এখনও তাই আছে। জুয়াড়ি সবসময়ই ভাবে আমি জিতব, এবারে না হলে পরের ক্ষেপে। এইভাবে তার তাড়না বাড়তে থাকে, উত্তেজনা বাড়তে থাকে, রক্তচাপ বাড়তে থাকে। যুধিষ্ঠিরেরও তাই হল। তাঁর হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত হল। অসীম দুর্দৈব তাঁকে টেনে নিয়ে চলল সর্বনাশের দিকে।

হস্তিনাপুরের রাজসভার চিত্রটা এমন দাঁড়াল যে, যুধিষ্ঠির পণ রাখামাত্র শকুনি পাশা নিক্ষেপ করেন এবং মুখে বলেন—এই আমি জিতলাম—জিতমিত্যেব। অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র যিনি এই দুদিন আগেও বিদুরের কথা শুনে দুর্যোধনকে পাশাখেলা থেকে বিরত হতে বলেছিলেন, তিনি এখন অন্তর্গত হৃদয়ে গভীর আনন্দ পাচ্ছেন। এখনও তাঁর আনন্দ মুখে চোখে ফুটে বেরোচ্ছে না বটে—কেননা রাজা হলে সুখ-দুঃখের অনুভূতি চাপা অভ্যাস করতে হয়—কিন্তু তিনি যে হৃদয়ে গভীর আনন্দ বোধ করছিলেন, সেটা একেবারে হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়ে—যখন দ্রৌপদীকে পণে জিতবেন শকুনি। তখন তিনি আর আনন্দ চেপে রাখতে পারবেন না। অন্ধ মানুষ তখন বধিরের মতো বার বার জিজ্ঞাসা করতে থাকবেন—শকুনি জিতেছে তো? জিতেছে তো?

পণবন্ধের শেষ লগ্নে যাঁর এই অবাধ অশ্লীল আনন্দ প্রকাশিত হবে, সেই আনন্দের ক্রম চলছিল এখন। এখনও যুধিষ্ঠির ভাইদের বাজি রাখেননি, দ্রৌপদীকে বাজি রাখেননি, এমনকী ইন্দ্রপ্রস্থের রাজধানীটিও বাজির আওতায় আসেনি। কিন্তু ধনসম্পত্তি, দাসদাসী, হাতী-ঘোড়া-রথ সবই এখন তাঁর চলে গেছে। পরিস্থিতি আস্তে আস্তে তাঁর আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। ধৃতরাষ্ট্রের বলা সুহৃদদ্যূত সৌহার্দ্যের মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। সভায় উপবিষ্ট কুরুপ্রধানেরা—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ সব বুঝতে পারছেন। কিন্তু একটি কথাও তাঁরা বলছেন না। আর পুত্রের কু-কৃতিত্বে হৃদয়ে গভীর আনন্দ নিয়ে স্থাণুর মতো বসে আছেন ধৃতরাষ্ট্র। যুধিষ্ঠিরের ক্রমিক পরাজয়ে তিনি আপ্লুত।

সকলের অবস্থা একান্তে দাঁড়িয়ে দেখছেন বিদুর। দেখছেন তাঁর অতিপ্রিয় ধর্মরাজ শুধু কথা রাখার জন্য একের পর এক বাজি ধরে হারছেন। শকুনি যে কপটতা করে পাশার চাল জিতে চলেছেন, তা তিনি ধরতেও পারছেন না। অথবা ধরতে পারলেও তিনি কুহকচালিত কাষ্ঠপুত্তলিকার মতো খেলে চলেছেন। একবার তিনি শকুনিকে বললেন যে, যদিও তুমি জুয়েচুরি করে এইবার চাল জিতেছ তবুও আমি খেলব—মত্তঃ কৈতবেনৈব যজ্জিতো'সি দুরোদরম্—তবুও আমি আবার বাজি রাখব। বিদুর বুঝতে পারছেন—একবার নয়, শকুনি অসীম চতুরতায়, হস্তলাঘবের ক্ষমতায় পাশার চাল জিতেছেন। এবং বাজি রাখতে যুধিষ্ঠির এমন অবস্থায় চলে এসেছেন যে, এরপর রাজ্যটি তো যাবেই, আরও কী যাবে তা তিনি এখনও জানেন না। অন্তত ধৃতরাষ্ট্র যে অক্ষক্রীড়া কিছুতেই বারণ করবেন না—সেটা বিদুর ভালই বুঝতে পারছেন। যিনি বলতে পারতেন এই পরিস্থিতিতে, সেই ভীষ্ম পিতামহ চুপ করে

আছেন। চুপ করে আছেন আচার্য দ্রোণ এবং কৃপাচার্য। কিন্তু আর তো চুপ করে থাকলে সর্বনাশ হবে। এবার তো প্রতিবাদ করতেই হবে। দুর্যোধন শকুনিকে তিনি চেনেন, তাঁদের পরিকল্পনা কতদূর যেতে পারে, তাও তিনি আন্দাজ করতে পারেন। বিশেষত যতক্ষণ দুর্যোধন শকুনিরা জিতে চলবেন, ততক্ষণে যে ধৃতরাষ্ট্র এই দ্যূতক্রীড়া বারণ করবেন না, সেটা খুব ভালভাবে জানেন বিদুর। শেষ যে চালটায় প্রচুর পরিমাণ সোনা হেরে বসলেন যুধিষ্ঠির, ঠিক সেই মুহূর্তে শকুনির জিতেছি জিতেছি চিৎকার ম্লান করে দিয়ে আরও বেশি হাহাকারে চিৎকার করে উঠলেন বিদুর। ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—মহারাজ! যা বলছি একটু শুনুন। ভাল লাগবে না আমার কথা, তবুও শুনুন। মরতে বসেছে যে মানুষ, তার যেমন ওষুধে রুচি হয় না, তেমনই আমার কথাও আপনার ভাল লাগবে না, তবু শুনুন। দুর্যোধন যে শৃগালের ধূর্ততায় ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াই পাণ্ডবদের পাশাখেলার নাম করে ডেকে এনে তাঁদের সমস্ত সম্পদ এবং রাজ্য হরণ করার মতলব করেছেন, সে কথা প্রথমেই ধৃতরাষ্ট্রের মুখের ওপর জানিয়ে দিলেন বিদুর। তারপর বললেন—সবকিছুর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করতে হয়। যারা মধুর ব্যবসা করে, তারা বহু উঁচুতে মধুর চাক দেখলেও তার উচ্চতা বোঝে না। সেখানে উঠতে গেলে হয় সে মৌমাছির কামড়ে মরে, নয়তো নীচে পড়ে গিয়ে মরে—আরুহ্য তং মজ্জতি বা পতনং বাধিগচ্ছতি। দুর্যোধন পাণ্ডবদের শক্তির উচ্চতাটুকু না বুঝে পাশাখেলায় মত্ত হয়েছে, এবং অবস্থার পর্যালোচনা না করেই নিজের পতনের পথ পরিষ্কার করছে।

এমন দুর্যোধনকে ত্যাগ করার উপদেশ দিয়ে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকেও কতগুলি স্পষ্ট কথা বললেন। বিদুর জানতেন—ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য পাবার লোভ ছিল চিরকাল এবং বিধি-নিয়মসম্মতভাবে রাজা না হতে পেরে তাঁর ক্ষোভও কিছু কম ছিল না। ফলে অর্থ-সম্পত্তি, রাজ্য, রাজত্বের লালসা তাঁকে লালায়িত করেছে বরাবর। যে পাশায় যুধিষ্ঠির পরের পর তাঁদের কষ্টার্জিত সম্পত্তি হারছেন এবং দুর্যোধনের খাতায় তা জমা হয়েই চলেছে, কিন্তু এমনটি দেখেও, এমন একপেশে লাভের অঙ্ক দেখেও ধৃতরাষ্ট্রের কোনও মায়া হচ্ছে না ভ্রাতুষ্পুত্রদের ওপর—এটা বিদুর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—জানেন তো মহারাজ! এক দেশের বনভূমিতে কতগুলি অদ্ভুত পাখি ছিল, তাদের মুখ দিয়ে সোনার লালা ঝরে পড়ত। সেই পাখিগুলো এক সময় এক রাজার বাড়িতে আশ্রয় নিল। সোনার লালা দেখে রাজা সোনার লোভে পাখিগুলি বধ করলেন। তাতে পাখিগুলিও মরল আর রাজার সোনা পাবার আশাও লুপ্ত হল। আপনিও ঠিক তাই করছেন, ধনের লোভে পাণ্ডবদের বধ করার চেষ্টা করছেন। গাছের গোড়ায় জল দিলে সে গাছে ফুল ফোটে। আপনি পাণ্ডবদের স্নেহবারিসিঞ্চনে বর্ধিত করুন, তাতেই আপনার লাভ। নইলে এটা মনে রাখবেন, পাণ্ডবরা যদি শত্রুপক্ষে দাঁড়িয়ে একত্র সমবেত হন, তবে তাঁদের সঙ্গে এঁটে ওঠা অত সহজ হবে না—সমবেতান্ হি কঃ পার্থান্ প্রতিযুধ্যেত ভারত।

যেদিন অক্ষক্রীড়ার অজুহাতে পাণ্ডবদের ধনহরণ করার পরিকল্পনা করেছিলেন দুর্যোধন, বিদুর সেদিন থেকেই তাঁর পরিকল্পনা বুঝে গিয়েছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র এ বিষয়ে তাঁর অভিমত জিজ্ঞাসা করলে তাঁর ধারণা আরও দৃঢ়তর হয়েছে। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র অনিচ্ছুক বিদুরকে যুধিষ্ঠিরের কাছে পাঠিয়ে যে চালাকিটা করলেন, তাতে বিদুর এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছেন যে, ধৃতরাষ্ট্রের বলা সেই সুহৃদ-দ্যূতের ফানুসটা তিনি ফাটিয়ে দিতে চাইলেন সবার সামনে। বিদুর ভীষ্মের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন—দুর্যোধন যা করছে, তার ফল হিসেবে কষ্ট ভোগ করবেন প্রতীপ-শান্তনুর বংশধরেরা। আমি জানি, মহারাজ—দুর্যোধন যে যুধিষ্ঠিরকে বাজিতে হারিয়ে দিয়ে ধনসম্পত্তি লাভ করছেন, তাতে আপনি আনন্দ পাচ্ছেন—পিপ্রীয়সে ত্বং জয়তীতি তচ্চ। কিন্তু এই পাশাখেলা থেকেই বিবাদ যুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায়। সেটা মনে রাখবেন। টাকাপয়সা, ধনসম্পত্তির ওপর আপনার লোভ আছে, এ আমি বহুদিন জানি এবং যুধিষ্ঠিরের ধনসম্পত্তি হরণ করার জন্য গোপনে মন্ত্রণা করে আপনি যে আজকে এই কাজে

হাত দিয়েছেন, তাও আমি জানি—আকর্ষস্তে স্বে ধনে সুপ্রণীতে/হৃদি প্রৌঢ়ো মন্ত্রময়ো'য়মাধিঃ—কিন্তু মনে রাখবেন, মহারাজ! পূর্বে সুহৃদ-দ্যূতের কথা বলে আজকে যেভাবে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বিবাদ বাধানো হল, সেটা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি এবং এতে আমাদের মত নেই—যুধিষ্ঠিরেণ কলহস্তবায়ম/অচিন্তিতো'নভিমতঃ স্ববন্ধুভিঃ।

বিদুর নিজের মত ব্যক্ত করলেন ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভার প্রাজ্ঞ মন্ত্রীটির মতোই। বার বার তিনি তাঁর কথায় ভীষ্ম, বাহ্লিক ইত্যাদি বৃদ্ধ মন্ত্রীদের জড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলেন, প্রধানত অসভ্য দুর্যোধনের অপমানকর কথার ভয়েই—কিছুতেই এঁরা কোনও কথা বললেন না। বিদুর একেবারে অসহায়, তাঁকে সমর্থন দেবার মতো একটি লোকও পাওয়া গেল না। পাওয়া গেলে, ধৃতরাষ্ট্র তখনই দ্যূতসভা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হতেন। কিন্তু সমর্থিত হচ্ছেন না অথবা তাঁর হয়ে কেউ কথা বলছেন না বলেই বিদুর উচিত কথা বলবেন না, তা নয়। তিনি প্রধানত ভীষ্মের দিকে দৃষ্টিপাত করে পরোক্ষে বললেন—প্রতীপ-শান্তনুর বংশধরেরা শুনুন, দয়া করে শুনুন। ভয়ংকর আগুন জ্বলে উঠেছে। আপনারা মূর্খের মতো এই আগুনে ঝাঁপ দেবেন না —বৈশ্বানরং প্রজ্বলিতং সুঘোরং মা যাস্যধ্বং মন্দমনুপ্রপন্নাঃ। আজকে মোহের বশে যুধিষ্ঠির পাশা খেলে যাচ্ছে। কিন্তু হারের শেষে রাগ হবে সবার। ভীম, অর্জুন—এঁরা যখন ক্রোধ প্রকাশ করবেন, তখন সেই তুমুল যুদ্ধে কে আশ্রয় দেবেন দুর্যোধন-শকুনিদের।

পর পর শকুনির কপটতা এবং ছলনায় বিদুর ভীষণ বিরক্ত হয়েছেন। এই লোকটিকে তিনি সহ্যই করতে পারেন না। সেই কবে ধৃতরাষ্ট্রের বিয়ের পর থেকে এই শালাবাবুটি তার নিজের রাজ্য গান্ধার ছেড়ে হস্তিনাপুরে এসে গেড়ে বসেছেন, আর ফিরে যাননি। ধৃতরাষ্ট্রের ঘরে তিনি রাজ সমাদরে থাকেন, আর সারাক্ষণ কুমতলব দিয়ে যান ভাগনে দুর্যোধনকে। বিদুর কুরুবংশীয় রাজনীতিতে শকুনির অনুপ্রবেশ একেবারেই পছন্দ করতে পারেন না। একেবারে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি বলেছেন—গান্ধার দেশের পাহাড়ে থাকা এই শকুনির পাশাখেলার মধ্যে কতটা খেলা আর কতটা জুয়োচুরি আছে—সব আমরা জানি—জানীমহে দেবিতং সৌবলস্য বেদ দ্যূতে নিকৃতিং পার্বতীয়ঃ! আমাদের ইচ্ছে সে ফিরে যাক নিজের দেশে এবং আপনিও পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধানোর চেষ্টা করবেন না।

ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের কথার কোনও জবাব দিলেন না, দিতে পারতেনও না। কিন্তু তাঁর জবাবের অপেক্ষা না করেই কথা বলতে আরম্ভ করলেন দুর্যোধন। তিনি দেখেছেন—তাঁর যত স্বার্থান্বেষিতা, পাণ্ডবদের ব্যাপারে যত নৃশংসতা, সব ব্যাপারেই বাদ সাধেন এই কাকা বিদুর। তিনি খালি ন্যায়নীতির কথা শোনাতে চান এবং মাঝে মাঝেই তাঁর স্নেহসিক্ত পিতাটিকে পর্যন্ত ন্যায়নীতি বুঝিয়ে ফেলেন। কিন্তু আজ এই মোক্ষম সুযোগ—যেখানে যুধিষ্ঠির পূর্বাহ্ণেই অনেক বাজি হেরে বসে আছেন এবং এখনও অনেক বাজি জেতার সুযোগ আছে, সেখানে যদি কোনওভাবে খেলাটি বন্ধ হয়ে যায়, তবে তাঁর পরিকল্পনা সমস্ত পণ্ড হবে। অতএব ভদ্রভাবে কেউ যুক্তি দিয়ে কথা বলার সময় যদি চরম অসভ্যতায় কাউকে চুপ করিয়ে দেওয়া যায়, তবে কোনও ভদ্রলোক আর কথা বলবে না। দুর্যোধন সেই পন্থা নিলেন। পিতার জবাব দেবার আগেই তিনি জবাব দিলেন বিদুরকে।

বললেন—ওহে ক্ষত্তা, দাসীর ছেলে! তুমি তো সব সময়ই আমাদের গালাগাল দাও আর পাণ্ডবদের প্রশংসা কর। কারা তোমার প্রিয়, সে আমরা বেশ জানি আর সেই প্রিয়ত্বের কারণেই সব সময় এমন একটা ভাব কর যেন আমরা কিছুই বুঝি না, আমরা বাচ্চা ছেলে—বালানিব অস্মান্ অবমন্যসে ত্বম্। তুমি নিজের লোকদের নিন্দা করে আমার শত্রুদের পক্ষপাতী হয়ে কথা বলছ। ঘাট হয়েছে আমাদের। তুমি সাপের মতো হওয়া সত্ত্বেও তোমাকে আমরা কোলে করে রেখেছি। আর বেড়াল দেখেছ তো? যার ঘরে থাকে, সেই ঘরেই চুরি করে, কিছুতেই পোষ মানে না—তুমি হলে সেইরকম, তোমার প্রতিপালক যিনি, তারই

সর্বনাশ করছ তুমি—মার্জারবৎ পোষকঞ্চাপহংসি। এতেও তোমাকে পাপিষ্ঠ বলব না তো কী? আমরা শত্রুদের জয় করে ফল পেয়েছি, তাতেই তোমার পুড়ছে। কিন্তু তাই বলে আমাদের কোনও গালাগালি দেবার চেষ্টা করো না। শত্রুদের সঙ্গে তোমার ওঠাবসা, অতএব তুমিও আমাদের বিদ্বেষের পাত্র।

দুর্যোধন এত কুবাক্য বললেন বিদুরকে। কিন্তু স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্র একবারের তরেও তাঁর এই কনিষ্ঠ ভাইটির রক্ষায় এগিয়ে এলেন না। কারণ দুর্যোধন যেভাবে পাণ্ডবদের কবজা করেছে, তা তাঁর বেশ ভাল লেগেছে। ফলত দুর্যোধন আরও বেড়ে গেলেন। তিনি বিদুরকে বললেন—তোমার লজ্জা বলে কিছু নেই হে! লোকে যে ঘরে থাকে সেই ঘরে থেকে শত্রুর প্রশংসা করার সময় অন্তত নিজের ভাবটি গোপন করে। কিন্তু তুমি? তুমি পাগলের মতো যা মুখে আসছে তাই বলছ আমাদের—তদাশ্রিতো'পত্রপ! কিং ন্ বাধসে যদিচ্ছসি ত্বং তদিহদাভিভাষণে। তোমার যদি অত ন্যায়নীতি নিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে তবে বুড়োদের কাছে গিয়ে আরও শিখে এসো যাও, তাতে তোমার সুনাম বজায় থাকবে। অন্যের কাজের মধ্যে নাক গলাতে এসো না—মা ব্যাপৃতঃ পরকার্যেষু ভূস্ত্বম্।

বিদুর সতিই এসব ভাবতে পারেননি। অন্ধ বলে জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি তার বড় মায়া ছিল। ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও যে রাজা হতে পারেননি, তাঁর সেই ক্ষোভটুকু তিনি করুণার দৃষ্টিতেই দেখতেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অথবা রাজা হওয়া সত্ত্বেও যে কথা ধৃতরাষ্ট্র কোনও দিন তাঁর এই কনিষ্ঠ ভাইটিকে বলতে পারেননি, আজ সেইসব কথা তাঁকে শুনতে হচ্ছে তাঁর অর্ধেকবয়সি ভাইপোটির কাছ থেকে। কী না বলেছেন দুর্যোধন! বলেছেন—তোমার কথা বলার অধিকার এসেছে কোত্থেকে? আমাদের ভাল, মন্দ যা কিছু হোক, সে ব্যাপারে আমরা কি তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেছি? তা হলে তুমি এসব বাজে কথা বলছ কেন, নিজেকে কি খুব কর্তা ঠাউরেছ—অহং কর্তেতি বিদুর মাবমংস্থা/ ন ত্বাং পৃচ্ছে বিদুর যদ্ধিতং মে...। এমন করে কথা শোনানোর সুযোগ দুর্যোধন পাননি। সেই বালক বয়স থেকে তিনি যত মন্দ পরিকল্পনা করেছেন, তার প্রত্যেকটি এই বিদুরের জন্য কেঁচে গেছে। এই প্রথম কাজ যেখানে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে তাঁদের সাফল্য প্রত্যক্ষ দেখা যাচ্ছে এবং সেই জন্য ধৃতরাষ্ট্রও অনেক উৎফুল্ল বটে। পিতাকে এইভাবে পাশে পেয়ে দুর্যোধন শেষ অপমান করলেন বিদুরকে। বললেন—কথায় আছে, শত্রুর পক্ষপাতী মানুষকে ঘরে রেখো না কখনও, তার মধ্যে তুমি আমার পরম অনিষ্টকারী। তা এতকাল তো থেকেছ, এবার যেখানে ইচ্ছে যাও না। বদমাশ চরিত্রহীন মেয়েছেলেকে কি সদুপদেশ দিয়ে স্বামীর ঘরে রাখা যায়? যায় না। অতএব যেদিকে ইচ্ছে যাও—স যত্রেচ্ছসি বিদুর তত্র গচ্ছ সুসান্ত্বিতা হ্যসতী স্ত্রী জহাতি। দুর্যোধনের এই অপমান সত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্র একটি কথাও বললেন না।

উন্মুক্ত রাজসভার মধ্যে উচ্চনীচ সবার সামনে এই অপমান! সাধারণ মানুষ হলে চলেই যেতেন বাড়ি ছেড়ে, যেমনটি আজকাল দেখি নানা সংসারে। বৃদ্ধ মাতাপিতা পুত্র-পুত্রবধূদের কাছে লাঞ্ছিত হয়ে দূরে চলে যান। সাধারণ মানুষ অপমানের জ্বালা সইতে না পেরে এমন করেন। কিন্তু বিদুর তো সাধারণ নন, তাঁর বুদ্ধিও সাধারণ নয়। তিনি জানেন যে, তিনি চলে গেলেই তো দুর্যোধনের সুবিধে, অতএব সে সুযোগটা তিনি এইভাবে জুগিয়ে দেবেন কেন! ছোটবেলা থেকে তিনি রাজনীতি করছেন, পাণ্ডু সিংহাসনে বসার সময় থেকে তিনি এই রাজসভার মন্ত্রী। স্বয়ং পিতামহ ভীষ্ম তাঁকে পরম মর্যাদা দিয়ে কৌরবসভার রাজনীতিতে প্রবেশ করিয়েছেন। সেই তিনি আজ সেদিনকার ছেলে দুর্যোধনের অপমানের ফাঁদে পা দেবেন, এমন বোকা তিনি নন। রাজনীতি যাঁরা করেন তাঁরা অপমানিত হলেই অভিমান করে দল ছেড়ে চলে যান না। বিদুর শুধু রাজনীতিই করেন না, তার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত আছে এই রাজ্যের মর্যাদা, একটি মহান বংশের প্রতি সম্ভাবনা, এবং ঔচিত্যের ধর্ম। অতএব দুর্যোধন বললেন, আর তিনিও স্বাভিমানে চলে গেলেন, এমন সুযোগ তিনি দেবেন না। তা

ছাড়া এ রাজ্যে তাঁরও তো হক আছে। দাসীপুত্র হলেও তিনি পূর্বরাজা বিচিত্রবীর্যের ভোগ্যা দাসীর পুত্র। রাজা হবার অধিকার তাঁর নাই থাক, এই রাজ্যখণ্ডে তাঁর সম্পূর্ণ ভোগসত্ত্ব আছে। রাজনীতির ধুরন্ধর বিদুর অত সহজে ছেড়ে দেবার লোক নন।

বিদুর আবার তাই ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—আমি এইটুকু সামান্য কথা বলতেই আমাকে ত্যাগ করার প্রশ্ন আসছে মহারাজ! তা হলেই বুঝুন, যারা এসব কথা বলছে, তাদের চরিত্রটা কী? আপনি চুপ করে থাকবেন না, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এই অভিযোগের উত্তর দিন—এতাবতা যে পুরুষাংস্ত্যজন্তি/ তেষাং বৃত্তং সাক্ষিবদ্ ব্রুহি রাজন্। কী উত্তর দেবেন ধৃতরাষ্ট্র! প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে যাঁকে তিনি মাথায় তুলে দিয়েছেন, সে পিতাকেই কত না কিছু বলে, এ তো পিতৃব্য! ধৃতরাষ্ট্র কিছুই বলতে পারলেন না। বিদুর ক্ষুব্ধ হলেন রাজবৃত্তির ওপর। রাজার ঘরে রাজার কাছাকাছি যাঁদের থাকতে হয়, তাঁদের এক ধরনের অসহায় যন্ত্রণা আছে। ধনসম্পত্তির লোভলালসায় এবং ব্যক্তিগত স্বার্থে রাজারা যখন চালিত হন তখন অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের প্রকৃত বিচার কাজ করে না। ফলে এক সময় তাঁরা যা বলেন পরে সেই কথার সঙ্গে কাজের মিল হয় না। বিদুর এই রাজবৃত্তির হঠকারিতা সম্বন্ধে সচেতন, যার জন্যে বলেই ফেললেন—অথবা আপনি কী করে নিরপেক্ষভাবে বলবেন, মহারাজ! রাজাদের মনটাই যে অস্থির। এক সময় যার সঙ্গে ভাল কথা বলেছেন, পরে তাকেই মুষল দিয়ে আঘাত করছেন—রাজ্ঞাং হি চিত্তানি পরিপ্লুতানি/ সান্ত্বং দত্ত্বা মুলৈ র্ঘাতয়ন্তি।

বিদুরের সবচেয়ে দুঃখ হল—যে বড় দাদাটিকে তিনি প্রতিপদে অন্ধের নড়ির মতো সাহায্য করেছেন, তিনি আজ পুত্রগরিমায় তাঁর কথা ভুলেই গেলেন। একটি সামান্য কথা বলেও বিদুরের অপমান-ক্ষতে প্রলেপ লাগিয়ে দিলেন না। বিদুর অবশ্য এই ব্যবহার দেখে অথবা শুধু দুর্যোধনের কথায় রাজ্য ছেড়ে চলে যাবার পাত্র নন। কারণ রাজার উত্তরাধিকারী হিসেবে তাঁরও কিছু হক আছে। ধৃতরাষ্ট্র বার বার আপন মন্ত্রণাকালে বিদুরকে ডেকে পাঠান, অথচ আজকে কাজের সময়ে নিজের সুবিধা বুঝে বিদুরের মন্ত্রণার কোনও মূল্য নেই তাঁর কাছে। ধৃতরাষ্ট্রের এই ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে অভিমান দেখিয়েই তিনি বললেন—যার বুদ্ধিটাই মন্দ হয়ে গেছে, তাকে মঙ্গলের পথে নিয়ে আসা যায় না। আজ নিশ্চয়ই আমাকে পছন্দ করছেন না। ষাট বছরের স্বামী যেমন একটি কুমারী মেয়ের পছন্দ হয় না, আমি বুঝি ঠিক ততটাই অপছন্দের—ধ্রুবং ন রোচে ভরতর্ষভস্য পতিঃ কুমার্য্যা ইব যষ্ঠিবর্ষঃ।

সামান্য একটু অভিমান প্রকাশ করেই বিদুর নিজের ব্যক্তিত্বে ফিরে এলেন। ধৃতরাষ্ট্র এমন অবস্থাতেও কোনও কথা বলছেন না দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, দুর্যোধন যেভাবে, যে কপটতায় পাণ্ডবদের ধন হরণ করছে, তাতে ধৃতরাষ্ট্রের সম্পূর্ণ সায় আছে। তিনিই বলেই দিলেন—মহারাজ! এর পরেও আপনার ভাল-মন্দের বিষয়ে আপনার মনরাখা কথা বলবার লোক চান, তবে আমাকে ডাকবেন না কখনও। মন্ত্রণা দেওয়ার জন্য আপনি স্ত্রীলোকদের ডেকে পাঠাবেন। তারা আপনার ইচ্ছায় সায় দেবে। ডেকে পাঠাবেন জড়, পঙ্গু এবং মূর্খদের, তারা নিজেদের সুস্থিতির জন্য আপনার মনরাখা কথা বলবে—স্ত্রিয়শ্চ রাজন্ জড়-পঙ্গুকাংশ্চ/ পৃচ্ছ ত্বং বৈ তাদৃশাংশ্চৈব মূঢ়ান্।

আজকের দিনের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিদুরের এই বক্তব্য আমি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মনে করি। যিনি ক্ষমতায় আসীন হন, তিনি রাজাই হোন অথবা মন্ত্রী, তাঁর চারধারে ক্ষমতালোভী, জীবিকালোভী এবং স্বার্থান্বেষী মানুষের চক্র তৈরি হয়। রাজতন্ত্রে যা ছিল, গণতন্ত্রেও তাই আছে। আজকে আপনি প্রকাশ্য স্থানে কোনও বামনেতার সমালোচনা করে দেখুন, দেখবেন আপনাকে তারা বি জে পি কিংবা কংগ্রেস বলে চিহ্নিত করবে, ঠিক যেমন দুর্যোধন বিদুরকে পাণ্ডবপক্ষের লোক বলে চিহ্নিত করেছেন। স্বার্থান্বেষীর স্বভাবই এই, তারা বিষয়নিষ্ঠ সমালোচনা শুনলেই শত্রুপক্ষ মনে করে। বিদুর ঠিক এই রাজনীতি করেন না।

তিনি জানেন যে, একজন সার্থক মন্ত্রীর দায়িত্ব রাজার থেকেও অনেক বেশি এবং মন্ত্রীর কাজ হল—রাজার হিত উচ্চারণ করা, অপ্রিয় হলেও সত্য বলাটাই তাঁর ধর্ম, কারণ এমন বাক্য পৃথিবীতে দুর্লভ যা একই সঙ্গে প্রিয়ও হবে, আবার শ্রেয়ও সম্পাদন করবে।

বিদুর বললেন—এমন মোসাহেব পাপিষ্ঠ জনের অভাব নেই এই জগতে, যারা আপনার ইচ্ছানুরূপ প্রিয় কথা বলে আপনাকে তুষ্ট রাখবে। কিন্তু এই পৃথিবীতে অপ্রিয় এবং হিতকর কথা বলার লোকও নেই এবং তা শোনার লোকও নেই—অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ। মনে রাখবেন, মহারাজ! মন্ত্রীর পক্ষে উচিত মন্ত্রণা দেওয়াটাই ধর্ম। যে লোক সেই ধর্মের দিকে দৃষ্টি দিয়ে, রাজার ভাল লাগা, মন্দ লাগার কথা মনে না রেখে তাঁর অপ্রিয় অথচ হিতের কথা বলে, সেই কিন্তু রাজার প্রকৃত সহায়, সেই প্রকৃত মন্ত্রী। দুর্যোধন বিদুরকে যে প্রতিপক্ষতায় পরিত্যাগ করতে বলেছেন, সেই প্রতিপক্ষতা দূর করে দিয়ে বিদুর বললেন—মহারাজ! আমি আপনার এবং আপনার ছেলেদের মান, যশ এবং ধন অন্যের মতোই কামনা করি। কিন্তু বুদ্ধিমান লোক চোখের সামনে সাপ দেখেও সেটিকে ঘাঁটাবেন না। এখানে পাণ্ডবদের সঙ্গে তাই করা হচ্ছে। যাক এসব কথা, আপনার ভাল হোক, মন্দ হোক, যা ইচ্ছে হোক, নমস্কার আপনাকে—যথা তথা তে'স্তু নমশ্চ তে'স্তু—কিন্তু এটা মনে রাখবেন, বোকা লোকের একটা 'ইগো' থাকে, পাণ্ডবদের প্রতি অনুনয় প্রকাশ করে তাদের সন্তুষ্ট করতে গেলে আপাতত ভাল লাগবে না, বরঞ্চ গ্লানি হবে, বিরক্তি হবে, এমনকী যশোহানি ঘটবে বলেও মনে হতে পারে, কিন্তু আমি বলছি, মহারাজ! বুদ্ধিমান লোক দরকার বুঝে এই গ্লানি, ক্রোধ, বিরক্তি গিলে ফেলেন। আপনিও তাই করুন, পাণ্ডবদের সন্তুষ্ট করুন—মন্যুং মহারাজ পিব প্রশাম্য।

বিদুরের কথায় কোনও কান দিলেন না কালপ্রেরিত ধৃতরাষ্ট্র। শকুনি যুধিষ্ঠিরকে খুঁচিয়ে আবারও খেলা আরম্ভ করলেন সকপটে এবং ছলনার আশ্রয়ে জিতেও চললেন পরের পর। যুধিষ্ঠির একে একে ভাইদের ওপর বাজি ধরলেন এবং শকুনির ছলনায় তাঁদের হেরে বসলেন। বাকি রইলেন নিজে এবং শেষে নিজেকেও বাজি রেখে হারলেন যুধিষ্ঠির। দুর্যোধন শকুনিদের লক্ষ ছিল দ্রৌপদীর দিকে কিন্তু খেলার তাড়নায় দ্রৌপদীকে বাজি রাখার কথা তাঁদের মনেও ছিল না। কিন্তু দুরাত্মা শকুনি ছাড়বেন কেন! যুধিষ্ঠির নিজেকে হেরে যাবার পরেও তাঁকে শকুনি বললেন—তোমার অবশিষ্ট ধন এখনও বাকি আছে, তোমার প্রিয়তমা দ্রৌপদীকে বাজি রেখে তুমি নিজেকে মুক্ত করে আবার পাশা খেলো। জেতার আশায় যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর রূপগুণ বর্ণনা করে যেই না তাঁকে বাজি ধরলেন, অমনই সমস্ত কুরুসভা জুড়ে ধিক্কার শোনা গেল।

কুলবধূ দ্রৌপদীকে যুধিষ্ঠির বাজি রাখলেন দেখে তাঁর প্রতিও বটে, আবার শকুনি দুর্যোধনেরা যেভাবে যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে এই পণ রাখতে বাধ্য করলেন, সেই অসভ্যতা দেখেও সভায় উপস্থিত সমস্ত রাজা সমস্ত বয়োবৃদ্ধ ধিক্ ধিক্ করতে লাগলেন—ধিগ্‌ধিগিত্যেব বৃদ্ধানাং সভ্যানাং নিঃসৃতা গিরঃ! শুধু এই প্রতিবাদ ধিক্কারের মধ্যেও নির্লজ্জ পুরুষের মতো ধৃতরাষ্ট্রের আকুল জিজ্ঞাসা শোনা গেল—জিতেছে কি? শকুনি জিতেছে? ধৃতরাষ্ট্র যখন হৃদয়ের আনন্দ প্রকাশ করে ফেলছেন তখন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপের মতো মানুষেরা ঘৃণায় লজ্জায় ঘেমে উঠেছেন। আর বিদুর! অসহায় বিদুর দুহাতে নিজের মাথা টিপে ধরে সংজ্ঞাহীনের মতো বসে পড়লেন রাজসভায়—শিরো গৃহীত্বা বিদুরো গতসংজ্ঞ ইবাভবৎ। পদাহত সর্পের মতো তাঁর দীর্ঘশ্বাস দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হল।

ধৃতরাষ্ট্রের আনন্দ বৃদ্ধি করে শকুনি বললেন—এই বাজিও জিতলাম আমি। আর যায় কোথায়? বিদুর দুর্যোধনকে দোষী সাব্যস্ত করে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। পাশাখেলার জন্য তাঁকেই দায়ী করে সভার মধ্যে তাঁকে অপমানও করেছিলেন। অপমান তো তিনি করতেই পারেন, তিনি বয়োবৃদ্ধ এবং সকলের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন বলেই তাঁকে যেসব কথা শুনতে হয়েছে, সেখানে এখন তো দুর্যোধনের পোয়াবারো। যে রমণী তাঁদের পরম আকাঙ্ক্ষার ধন ছিল, স্বয়ংবরসভায় যুদ্ধ করেও যাঁকে পাননি, তিনি কিনা পাশার চালে তাঁদের দাসীবাঁদী হয়ে গেছেন। দুর্যোধনকে এখন পায় কে! তিনি একমাত্র বিদুরকে চরম অপমান করে চিরতরে মুখবন্ধ করে দিতে চান।

দ্রৌপদীকে জেতামাত্রই নিজের অপমানের চরম শোধ তুলবার জন্য তিনি আপন পিতৃব্য বিদুরকে বললেন— ওরে দাসীর বেটা বিদুর! যাও এবার। অন্দরমহলে গিয়ে পাণ্ডবদের প্রিয় পত্নীটিকে নিয়ে এসো। সে এসে এবার আমাদের ঘরদুয়োর ঝাড়পোঁছ করবে। যাও তাকে নিয়ে এসো এখানে—এহি ক্ষত্তর্দ্রপদীমানয়স্ব। অসহ্য চিৎকার করে উঠলেন বিদুর, অসম্ভব তাঁর ব্যক্তিত্ব। অপমানের কথা শুনেও তিনি দুর্যোধনকে কথা শোনালেন দ্বিগুণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে। বললেন—ওরে অসভ্য! মানুষ যা ভাবতে পারে না সেইরকম প্রস্তাব তোর মতো অসভ্য লোকেরাই করতে পারে। তুই যে কেমন উঁচুতে ঝুলে আছিস জানিস না। হরিণ হয়ে বাঘদের খেপিয়ে তুলছিস, তার ফল বুঝবি সময়ে।

বিদুরই প্রথম মানুষ যিনি রমণীর লজ্জা নিবারণে প্রথমে আইনের কথা তুললেন। বললেন —যুধিষ্ঠির যেখানে নিজেকে আগে হেরে বসেছেন, সেখানে দ্রৌপদীকে বাজি রাখবার অধিকারই তাঁর নেই। কাজেই দ্রৌপদীকে দাসী বলা যায় কীভাবে—ন হি দাসীত্বমাপন্না কৃষ্ণা ভবিতুমর্হতি? বিদুর আরও ক্রোধ প্রকাশ করে বললেন—বাঁশ দেখেছ হে, বাঁশ? যে বাঁশগাছে ফল ধরে সেই গাছটা নিজেই যেমন মরে, তেমনই দ্যূতক্রীড়ার ফলে পাণ্ডবদের ধনসম্পত্তির ফল ধরেছে বাঁশগাছে। এবার তুই নিজেই মরবি।

দুর্যোধনের অসভ্য আচরণ এবং তাঁর কথাগুলি বিদুর আর ঠিক সহ্যই করতে পারছেন না। ধৃতরাষ্ট্রের ছেলে, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র দুর্যোধন যে তাঁর সঙ্গে কখনও এইভাবে কথা বলবেন, সে তাঁর ধারণার বাইরে হলেও তাঁর কাছে অচিন্তিত নয়! রাজসভায় উপস্থিত বৃদ্ধজনেরা দুর্যোধনের এ অসভ্যতা সহ্য করতে পারছেন বলেই কথা বলছেন না হয়তো, কিন্তু বিদুর তাই বলে এই অন্যায় অপমান মেনে নেবার পাত্র নন। একান্ত অপমানে রাজসভা ছেড়ে চলেও যাবেন না, কেননা ভরতকুরু-শান্তনুর পরম্পরা প্রাপ্ত রাজসভা দুর্যোধন বা ধৃতরাষ্ট্রের পিতার সম্পত্তি নয়। রাজা জনকল্যাণের প্রতিভূ হিসেবে রাজ্যশাসন করেন এবং প্রজাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত রাজকরে রাজ্যশাসন চলে—রাজনীতির এই মূল তত্ত্ব তখনও এইরকমই ছিল। কাজেই বিদুর ছেড়ে দেবার পাত্র নন। তিনি দুর্যোধনকে বললেন—তুমি যেভাবে আমাকে বলেছ, এই ধরনের বর্বরোচিত কথা পাণ্ডবরা কাউকেই বলতে পারবেন না। কিন্তু কুকুরের মতো মানুষ তো কিছু থাকে, তারা এইরকমভাবেই কথা বলে—ভষন্তি হ্যেবং শ্বনরা সদৈব। তুমি কি সেই ছাগলের গল্পটা শুনেছ দুর্যোধন। বোকা ছাগল একবার মাটিতে পড়ে থাকা একটা আস্ত ছুরিই খেয়ে ফেলেছিল। তারপর ছুরির আগায় গলা কেটে ছাগলটা মরে। তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রুতা করে সেই শত্রুর ছুরিটা গলায় নিয়েছ—নিকৃন্তনং স্বস্য কণ্ঠস্য ঘোরং তদ্‌বদ্‌ বৈরং মা কৃথাঃ পাণ্ডুপুত্রৈঃ—পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রুতা কোরো না। কুরুবংশ ধ্বংস হয়ে যাবে এই এক পাশাখেলার জন্য।

বিদুর ভবিষ্যৎ দেখতে পান রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার আয়নায়। তিনি জানেন—আপাতত যুধিষ্ঠিরের আচরণ ভাইরা মেনে নিলেও ভীম অর্জুনের মতো বীর ভবিষ্যতে চুপ করে বসে থাকবেন না। কিংবা পাণ্ডবদের মিত্রপক্ষ যাদব বৃষ্ণিরা, পাঞ্চালরা দুর্যোধনের এই অন্যায় মেনে নেবেন না। কিন্তু বিদুরের কথা কেউ শুনলেন না। অবশ্য দুর্যোধন যেভাবে বিদুরকে অপমান করে দ্রৌপদীকে ধরে আনতে বলেছিলেন, বিদুরের কথার দমকে দুর্যোধন কিন্তু তাঁকে আর অপমান করার সাহস পেলেন না। বিদুরের বাক্য প্রতিঘাতে দুর্যোধন নিজের অভব্যতা প্রকাশ করার জন্য অন্যপথ বেছে নিলেন। আদেশ দেওয়ার উপযুক্ত প্রাতিকামীকে ডেকে বললেন—তুমি যাও তো হে, দ্রৌপদীকে ধরে নিয়ে এসো। এই বিদুরটা, সব সময় আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করে আর আমাদের ক্ষতি চায়—ক্ষত্তা হ্যয়ং বিবদত্যেব ভীতো/ ন চাস্মাকং বৃদ্ধিকামঃ সদৈব।

বিদুরের নিজস্ব কতগুলি অসুবিধা আছে এবং তা প্রকটভাবে বুঝতেও অসুবিধে হয় না। প্রথম অসুবিধেটা হল সামাজিক। সেকালের দিনে ক্ষত্রিয়গরিমা তথা ব্রাহ্মণ্য পিরবেশের মধ্যে বিদুরের কিছু জাতিগত অসুবিধে ছিল। ব্যাসের ঔরসে জন্মালেও তিনি যেহেতু দাসীগর্ভজাত, সেই জন্য বিবিধ শাস্ত্রে তাঁর বহুল পারদর্শিতা থাকা সত্ত্বেও ভীষ্ম কিংবা দ্রোণের চাইতে তার সামাজিক সম্মান অপেক্ষাকৃত কম ছিল। কুরুগৃহের অল্পবয়সি একটি ছেলেও তাঁকে দাসীপুত্র বা ক্ষত্তা বলে সম্বোধন করছে, এটা অস্বাভাবিক কিছু নয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই বিদুরও তাতে কিছু মনে করেছেন না, যেন এটা এতই স্বাভাবিক। এমনকী যুধিষ্ঠির—যিনি বিদুরের অতিপ্রিয় ব্যক্তি এবং বিদুরকেও যিনি পিতৃবৎ সম্মান করতেন—সেই যুধিষ্ঠিরকেও এক এক সময় দেখেছি, তিনি বিদুরকে ক্ষত্তা বলে সম্বোধন করছেন। কিন্তু ক্ষত্তা সম্বোধন করেও যুধিষ্ঠির তাঁকে পরম সম্মান করতে পেরেছেন তাঁর পাণ্ডিত্যের গুণে, আর দুর্যোধন তাঁকে চরম অসম্মান করেছেন নিজের অহংকারে।

সামাজিক পরিবেশ অনুকূল না থাকার ফলেই বিদুর যে প্রতিবাদ করছেন, সেটা দুর্যোধনের কাছে ঝগড়া বলে মনে হচ্ছে। বস্তুত এই কথাগুলিই যদি ভীষ্ম বা দ্রোণ বলতেন, তার গুরুত্ব অন্যরকম হত। কিন্তু রাজার পাশে থাকার ফলে কতগুলি অভ্যাস তৈরি হয়। অন্যায় হলেই রাজভৃত ব্যক্তি সব সময় প্রতিবাদ করতে পারেন না এবং দুর্যোধন দ্রৌপদীকে

আনতে বলার পরেও কুরুবৃদ্ধদের একজনও দুর্যোধনের কথার প্রতিবাদ করলেন না অথবা বিদুরকে সমর্থন করলেন না। বিদুর কী করবেন, তিনি অস্ত্র চালনা শেখেননি, শারীরিক শক্তিও তাঁর একান্ত শক্তি নয়, অতএব যে শক্তি তাঁর আছে—নীতি, ধর্ম এবং পাণ্ডিত্যের শক্তি দিয়ে মাঝে মাঝে তিনি শুধু অন্যায়ের প্রতিরোধ তৈরি করছেন। ক্রিকেটবল বাউন্ডারিতে পাঠালে ভাল ফিল্ডার যেমন একবার, দুবার হাত ছুঁইয়ে দিয়েও বলের গতি নষ্ট করে দেন, ঠিক তেমনই দুর্যোধন যেমন দুর্বারভাবে অন্যায়ের গতি তৈরি করেছেন, বিদুর মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করে—একাকী প্রতিবাদ করেও তার গতির তীব্রতা নষ্ট করছেন। কুরুবৃদ্ধরা এখন কেউ কিছু না বললেও তাঁদের মনে 'গিল্টি কনশিয়েনস' তৈরি হচ্ছে, বিদুরের অপমানের মধ্যে তাঁরা আত্মাবমাননা দেখতে পাচ্ছেন।

দুর্যোধন সভ্যতার সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গেলেন। দুর্যোধনের প্রশ্রয়ে কর্ণও হয়ে উঠলেন দুর্দমনীয়। দুঃশাসন দুর্যোধনের আদেশে স্ত্রী-মহল থেকে দ্রৌপদীকে টেনে আনলেন রাজসভায়। সমবেত কুরুবৃদ্ধদের সামনে তাঁর উত্তমাঙ্গের বসন খুলে ফেলেছে দুঃশাসন, অথচ তারা কেউ কথা বলছেন না। দ্রৌপদী এই ব্যবহারে অবাক হয়েছেন। তাঁর অবস্থাও অনেকটা বিদুরের মতোই। দৈহিক শক্তি নেই নিজেকে রক্ষা করার, অপিচ আপন সত্তার জন্য, সম্মানের জন্য যাঁদের ওপরে তিনি নির্ভরশীল, তাঁরা নিজেরাই বিজিত। অতএব কথা, তর্ক, যুক্তি ছাড়া আর কোনও গতিই নেই তাঁর। স্বামীদের প্রতি চরম কটাক্ষই শুধু নয়, সমবেত কুরুবৃদ্ধদের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেছেন—ভরতবংশীয় ধুরন্ধরদের এই কি ধর্মবোধ! আপনারা কি মরে গেছেন—এই ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপকে দেখছি, দেখছি মহামতি বিদুরকে, দেখছি দেশের রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে—এঁরা তো মরে গেছেন বলে মনে হচ্ছে—দ্রোণস্য ভীষ্মস্য চ নাস্তি সত্ত্বং/ ক্ষত্তুস্তথৈবাস্য মহাত্মনো'পি—এমন অধর্মের কাজ হচ্ছে, অথচ এঁরা তো লক্ষই করছেন না বলে মনে হচ্ছে।

দ্রৌপদী জানেন না যে—প্রাণ আছে, এখনও প্রাণ আছে। ভীষ্ম দ্রোণ, কৃপ, ধৃতরাষ্ট্র, কেউ কথা না বললেও অন্তত একজন এখনও মারা যাননি। দ্রৌপদী জানেন না এখনও কুরুসভায় তাঁর নাম উচ্চারিত হতেই অন্তত একজন তাঁর অপমানে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু রাজা যখন রাজধর্ম বিসর্জন দিয়ে স্বার্থান্বেষী হয়ে ওঠেন তখন তিনি শিক্ষিত মানুষের কণ্ঠরোধ করেন সকলের আগে, তাঁকে বিপক্ষীয় দলের চিহ্নে চিহ্নিত করে তাঁর গলা টিপে ধরেন। দ্রৌপদী জানেন না একটু আগেই বিদুরের গলা টিপে দেওয়া হয়েছে। এমনকী সভায় আকর্ষিত হবার আগে তিনি যে আইনের প্রশ্নটি তুলেছিলেন—যুধিষ্ঠির নিজেকে বাজিতে হেরে তারপর তাঁকে বাজি রেখেছেন কি না—সে প্রশ্নও দ্রৌপদীর অনেক আগে তুলেছেন বিদুর। অতএব প্রাণ আছে, এখনও প্রাণ আছে।

আজকাল মাঝে মাঝেই দেখি—রাজনৈতিক সুবিধাবাদ এমন চরমে ওঠে যে, তা আটকানোর জন্য আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়। সেকালের দিনে 'আইন' বলতে প্রধানত বোঝাত ধর্ম, সম্পূর্ণ ওকালতি ব্যবস্থাটাই ধর্ম নামে চিহ্নিত ছিল এবং এই শব্দ এখনও টিকে আছে ধর্মাধিকরণ, ধর্মাধ্যক্ষ, ধর্মাধিকারী, ধর্মাবতার শব্দগুলির মধ্যে। ঠিক এই অর্থেই বিদুর ধর্মমূর্তি। তিনি দুর্যোধনের রাজনৈতিক সুবিধাবাদ এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রথম সেই আইনের প্রশ্নটি তুলেছিলেন—যুধিষ্ঠিরের দ্রৌপদীকে পণ রাখার অধিকারই নেই, যেখানে তিনি নিজেকেই হেরে গেছেন আগে। কথাটা এখনও পর্যন্ত কেউ বিচার করলেন না। বিদুর এই প্রশ্ন তুলেছিলেন, কিন্তু দ্রৌপদী তা জানতেন না। তিনিও এ প্রশ্ন তুলেছেন, কিন্তু উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। কুরুবৃদ্ধেরা সব বিপরীত অবস্থা দেখে একেবারেই বিভ্রান্ত।

এখনকার দিনে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে গেলেই নেতাদের মুখে শুনতে পাওয়া যায়—রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মধ্যে আদালতের অনুপ্রবেশ বড্ড বেড়ে গেছে, এতে

নানারকম কল্যাণকর কার্যের অসুবিধে হচ্ছে। যাঁরা ভোটের রাজনীতি ছাড়া জনকল্যাণের কিছুই বোঝেন না, তাঁদের কী করে বোঝানো যাবে যে রাজনৈতিক সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে জনগণের শেষ আশ্রয় হল আদালত। অর্থনাশ, মনস্তাপ এবং বিলম্ব ঘটলেও আদালতের বিচারের একটা মূল্য আছে। বিদুর সেই শেষ আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। সেকালের দিনে সব সময় পৃথক আইন-আদালতের ব্যবস্থা ছিল না। রাজারা রাজমন্ত্রীরাই অনেক সময় আইনি বিবাদের মীমাংসা করতেন। সেই কারণেই আগে বিদুর এবং পরে দ্রৌপদী ওই একই প্রশ্ন তুলেছেন রাজসভায়, যেখানে বিচার পাওয়া স্বাভাবিক ছিল।

বস্তুত যুধিষ্ঠির এবং শকুনির পাশাখেলার মধ্যে আইনের কিছু প্রশ্ন ছিলই। প্রথম প্রশ্নটা হল—ঠিকভাবে পাশা খেলাটা হয়েছে কিনা? বিনা শঠতায় খেলাটা সম্পন্ন হয়েছে কিনা? সেকালে পাশাখেলা কীভাবে হত, সে বিষয়ে এখন অনেকেরই ধারণা নেই। এখানে সে বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করারও সুযোগ নেই এবং আমিও অন্যত্র এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছি। শুধু এইটুকু জানিয়ে রাখি—অন্তত যুধিষ্ঠিরের সময়ে অনেকগুলি গুটি চেলে পাশা খেলতে হত এবং কড়িখেলার মতো এ ছিল অনেকটা জোড়-বিজোড়ের খেলা। যতগুলি গুটি নিয়ে পাশা খেলা হত, তা একটি পাত্রের মধ্যে রাখা হত, যার নাম 'অক্ষাবাপন'। দান ফেলবার আগে পাশাড়ে জুয়াড়ি একটি ডাক দিতেন, যার নাম ছিল 'গ্লহ', পরবর্তী কালে 'গ্রহ'। পাশাখেলার আগে শকুনি যুধিষ্ঠিরকে এই ডাকের কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন—পাশাখেলায় ওই ঠিকঠাক ডাকের ওপরই খেলাটা নির্ভর করত—অক্ষগ্রহঃ সো' ভিভবেৎ পরং নঃ—ঠিক যেমন 'ব্রিজ' খেলায় ডাকটা একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

মোটামুটিভাবে খেলাটা দাঁড়াত এইরকম। একজন ডাক দিয়ে তার 'গ্রহ' বলল। তারপর 'অক্ষাবাপন' থেকে গুটি নিয়ে 'অধিদেবন' বা 'ইরিন' নামে একটি জায়গায় বা এক টুকরো কাপড়ের ওপর দান ফেলা হত। তারপর পূর্বের গ্রহ বা ডাক অনুযায়ী পাশাড়ে যদি জোড় দান ডেকে থাকে এবং সেই জোড় দানই যদি পড়ে, তবে সে জিতল, নইলে হারল। যাঁরা ভাবেন, শকুনিমামা ছল করে তাঁর পাশাখেলার গুটির মধ্যে ধাতুপিণ্ডের সঞ্চয় পুরে দিয়েছিলেন, অথবা তাঁর পাশার মধ্যে গুবরে পোকা পোরা ছিল অথবা ছিল তাঁর পিতার অস্থি—তাঁরা ভুল ভাবেন। মূল মহাভারতে এসব কিছু নেই। তবে পাশাখেলার মধ্যে ছলনা কীভাবে করা যেতে পারে, তা শকুনি অদ্ভুত চতুরতায় পাশাখেলার আগেই যুধিষ্ঠিরকে বলে দিয়েছিলেন, কিন্তু সরলমতি যুধিষ্ঠির তা ধরতেও পারেননি।

শকুনি বলেছিলেন—যিনি গণনায় চতুর—যো বেত্তি সংখ্যাং—তার মানে দান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুটিগুলি যে যত তাড়াতাড়ি গুণে ফেলতে পারে, তার তত সুবিধে। কেননা তাড়াতাড়ি গোনার সময় সে যদি চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারে যে তার হার হবে, তবে সে নিজস্ব ধূর্ততার পদ্ধতি কাজে লাগাবে—নিকৃতৌ বিধিজ্ঞঃ। এই ধূর্ততা বা ছলনা করার সময় হাতের ক্ষিপ্রতাই হল একমাত্র অস্ত্র। অর্থাৎ জুয়াড়ি যে ডাকটি ডেকেছে, দান ফেলার পর গুটি গোনবার সময়েই সে যদি বুঝতে পারে যে তার ডাক অনুসারে দান পড়েনি, তা হলে সে বাড়তি গুটিটি বা গুটিগুলি হাতের কায়দায় সরিয়ে দেবে, অথবা উলটো দরকার হলে অক্ষাবাপন থেকে একটি-দুটি গুটি হাতের ক্ষিপ্রতায় নিয়েও আসবে। তার মানে দান ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই জুয়াড়িকে সচেতন হতে হয় এবং দান ফেলা থেকে দান গুণে তোলা পর্যন্ত তাকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয় নিজের পূর্বকথিত ডাক সপ্রমাণ করার জন্য। শকুনি বলেছিলেন—পাশার দান জেতার লক্ষণ হল নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা—চেষ্টাসু অখিন্নঃ কিতবো'ক্ষজাসু। মহাভারতে দেখবেন যুধিষ্ঠির পণ রাখার সঙ্গে সঙ্গে শকুনি চাল দিচ্ছেন এবং পরমুহূর্তেই তিনি বলছেন—এই-ই আমি জিতলাম। অর্থাৎ এরমধ্যে চাল দেওয়া গুটি গোনা শেষ।

সরলমতি যুধিষ্ঠির এসব জুয়াচুরির কথা জানবেন কী করে? পাশা খেলতে তিনি ভালবাসেন বটে, কিন্তু খেলতে বসে ছল করে চুরিও করতে পারেন না, আর অন্যের চুরিও ধরতে পারেন না। হাতের ক্ষিপ্রতায় দান ফেলেই দান গুণবার সময় কয়েকটি গুটি এদিক ওদিক করেই যে জোড় দানকে বিজোড়, অথবা বিজোড় দানকে জোড় প্রতিপন্ন করা যায়—এই প্রক্রিয়াটি ধর্মভাবনাযুক্ত যুধিষ্ঠির ধরতেই পারেননি। তিনি শকুনির সঙ্গে পাশা খেলতে বসেছেন বিধাতার দোহাই দিয়ে অর্থাৎ কপালে যা আছে তাই হবে—বির্ধিশ্চ বলবান্ রাজন্—এই বুদ্ধিতে। ফলে হাজার শঠতা করে শকুনি খেলা জিতলেও তিনি সে শঠতা ধরতেও পারছেন না, শঠতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করছেন না এবং নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করছেন—আমি হেরেছি।

ঠিক এইখানেই বিদুর কথিত আইনের প্রশ্নগুলি ওঠে। এটা মনে রাখা দরকার যে, সে যুগে পাশাখেলাটা যেহেতু ভীষণভাবে চলত, তাই তার আইনকানুনও ছিল যথেষ্ট। ছলছাতুরি করে যে পাশা খেলেছে, তার ছলাকলাটা ধরা গেলে, তার জেতাটাও অসিদ্ধ হয়ে যাবে। সবচেয়ে বড় কথা—শকুনি ছল করে পাশাখেলায় জেতেন—এ ব্যাপারটা এতই প্রসিদ্ধ ছিল যে, তিনি পাশাখেলা আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই কিছু কিছু মানুষ তাঁর হাতের দিকে নজর রাখতেন। নিশ্চয় বিদুর যুধিষ্ঠিরের মতো সরলমতি নন। ছোটবেলা থেকে রাজনীতি করে করে তাঁর যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে যেমন দুর্যোধনের জতুগৃহ-চক্রান্ত ধরতে তাঁর অসুবিধে হয়নি, তেমনই শকুনির হস্তলাঘব প্রক্রিয়াটুকুও ধরতে তাঁর অসুবিধে ছিল না। কিন্তু তাঁর সমস্যা ছিল—রাজসভার মধ্যে সমস্ত প্রতিপক্ষ জনের সামনে প্রকাশ্যভাবে শকুনির চাল ধরে ফেলা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। যিনি ধরতে পারতেন সেই যুধিষ্ঠির নির্বিকারভাবে শুধু পণ দিয়ে হারছেন। এবং স্বীকারও করে নিচ্ছেন—আমি হেরেছি।

এদিকে শঠতাও ধরতে পারছেন না, ওদিকে হারের স্বীকারোক্তি—আইনের চোখে এটা যুধিষ্ঠিরকে রীতিমতো বিপদে ফেলেছে। দ্রৌপদী যখন বস্ত্রাকর্ষণে বিপন্ন হয়ে ভীষ্মের দিকে তাকিয়েছেন, তখন ভীষ্ম এই যুক্তিই দেখিয়েছেন। বলেছেন—তোমার প্রশ্নের কী উত্তর দেব আমি। যুধিষ্ঠির নিজেই বলছেন—তিনি হেরেছেন, সেখানে কী বলব আমরা—উক্ত জিতে'স্মীতি পাণ্ডবেন/ তস্মান্ন শক্লোমি বিবেক্তুমেতৎ। ভীষ্ম আরও বলেছেন—যুধিষ্ঠির নিজেই যেখানে একবারও বলছেন না যে, এই খেলার মধ্যে শঠতা আছে, সেখানে তোমার প্রশ্নের কী জবাব দেব আমরা—ন মন্যতে তাং নিকৃতিং যুধিষ্ঠির/স্তস্মান্ন তে প্রশ্নমিমং ব্রবীমি।

বেশ বোঝা যায়, চরম অন্যায়ের জন্য চরম প্রতিবাদ না করে ভীষ্ম আইনের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যেতে চাইছেন। স্বয়ং দ্রৌপদীই ভীষ্মের এই ফাঁকি বুঝেছেন এবং বলেছেন। পাশাখেলার কোনও ইচ্ছাই যুধিষ্ঠিরের ছিল না। বিপক্ষের শঠতাও তিনি প্রথমে বুঝতে পারেননি, তারপরে সবাই মিলে একসঙ্গে একা তাঁকে হারিয়েছে এবং এখন তিনি শকুনির শঠতা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন—পশ্চাদয়ং কৈতবমভ্যুপেতঃ। বিদুর এই শঠতার কথা বহু আগেই বলেছিলেন। কিন্তু এখন আর তিনি বলতে পারছেন না। তাঁর গলা টিপে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় যে আইনের প্রশ্নটা বিদুরই প্রথম রাজসভায় তুলেছিলেন—দ্রৌপদীর সেই প্রশ্নটা শাঠ্য-মীমাংসার থেকেও জরুরি। যুধিষ্ঠির আগে নিজেকে বাজি রেখে হেরেছেন, পরে শকুনি তাঁকে আপন স্বার্থে প্ররোচিত করে দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়েছেন। দ্রৌপদী তাই জিজ্ঞাসা করেছেন—শকুনির শঠতার প্রসঙ্গ থাক, আপনারা সব কুরুসভার মন্ত্রী পদে বসে আছেন। আপনারা শুধু বলুন, আমাকে শকুনি ন্যায়সঙ্গতভাবে জিতেছে কি না?

বিদুর তাঁর সিদ্ধান্ত আগেই জানিয়ে বলেছিলেন—যুধিষ্ঠির আগে নিজেকেই বাজি রেখেছেন, অতএব পরের বাজি জিতলেও কৃষ্ণা পাঞ্চালী জিতা হননি। দ্রৌপদী অবশ্য প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ওপর দুঃশাসনের অত্যাচার বেড়ে গেল এবং অন্য অসভ্যতা শুরু

হল চূড়ান্তভাবে। মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন অসম্ভব বিরক্ত হলেন যুধিষ্ঠিরের ওপর এবং একবার তাঁর পাশাখেলার হাতটি অগ্নিদগ্ধ করার কথাও ভেবেছিলেন তিনি। অর্জুনের মধ্যস্থতায় ব্যাপারটা তখনই থেমে যায় বটে, কিন্তু কুরুসভার বৃদ্ধদের একজনও দ্রৌপদীর প্রশ্নের জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। অত্যাচার যখন বেড়েই চলল, তখন দুর্যোধনেরই এক ভাই বিকর্ণ—ইনি ভদ্রলোক বটে—তিনি প্রতিবাদ করলেন। কুলবধূর অপমানে ক্রুদ্ধ বিকর্ণ বললেন—মৃগয়া, মদ্যপান, পাশাখেলা এবং লাম্পট্য—এগুলো মানুষের বদ নেশা। নেশার ঝোঁকে মানুষ যা করে, নেশা কেটে গেলে তা করেনি বলে মনে করে। এই ধূর্ত পাশাড়েরা যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় আসক্ত করেছে এবং সেই নেশার ঝোঁকেই যুধিষ্ঠির পণ রেখেছেন দ্রৌপদীকে। কিন্তু এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার মধ্যে যেটা খেয়াল করতে হবে, সেটা হল আইনের কথা। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর একক স্বামী নন, তিনি ছাড়াও আর চারজনের তাঁর ওপরে স্বত্ব আছে। সেখানে যুধিষ্ঠিরের পণ রাখার একক অধিকারই নেই। দ্বিতীয়ত যুধিষ্ঠির আগে নিজেকেই হেরেছেন বাজিতে। তাঁর পরে দ্রৌপদীকে পণ রেখেছেন, শকুনিই চাতুরী করে তাঁকে দিয়ে এই পণ রাখিয়েছেন—ইয়ঞ্চ কীর্তিতা কৃষ্ণা সৌবলেন পণার্থিনা। অতএব আমি মনে করি—শকুনি কিছুতেই দ্রৌপদীকে জিততে পারেননি।

বিকর্ণের আইনি যুক্তি, যা পূর্বে বিদুর সূত্রাকারে বলছিলেন মাত্র সেই যুক্তি একেবারে চাপা পড়ে গেল কর্ণের ধমকে। তিনি বিকর্ণকে যা নয়, তাই বললেন। কুরুসভার বৃদ্ধরাও তর্কযুক্তি দিয়ে সত্য কথা বলার ফল বুঝতে পারলেন। কথা বলে বিদুরের যে অপমান ঘটেছে, সত্য উচ্চারণ করে বিকর্ণের যে অপমান হল, তাতেই চুপ করে থাকাটা তাঁদের স্বাভাবিক ছিল। কর্ণের কথার মধ্যেই দুঃশাসন দ্রৌপদীর কাপড় টানাটানি আরম্ভ করলেন নির্লজ্জভাবে। সভায় মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের আস্ফালন শোনা গেল। দুঃশাসনের রক্তপান করার কঠিন প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করলেন তিনি।

বিদুরের যা অনুমান ছিল—অর্থাৎ পাশাখেলার সময় পাণ্ডবরা চুপ থাকলেও সময়কালে যুধিষ্ঠিরের ভাইরা চুপ থাকবেন না—এই অনুমানটা এক্কেবারে মিলে গেল। কৌরবসভায় বিদুরের ভাষণ এবং তাঁর অপমান, বিকর্ণের ভাষণ এবং অপমান, সবার শেষে ভীমের ভয়ংকর ক্ষত্রিয়প্রতিজ্ঞা—এই সবকিছুর একটা প্রতিক্রিয়া কিন্তু হল। দ্যূতক্রীড়ার রঙ্গ দেখতে আসা সামন্ত রাজারা এবার ভীমের প্রশংসা করতে আরম্ভ করলেন। সমবেত কুরুবৃদ্ধরা দ্রৌপদীর প্রশ্নের জবাব দিলেন না দেখে তারা সবাই এবার ধৃতরাষ্ট্রকে একযোগে গালাগাল দিতে আরম্ভ করলেন—সুজনঃ ক্রোশতি স্মাত্র ধৃতরাষ্ট্রং বিগর্হয়ন্। এতে সভার পরিস্থিতি অনেকটা অনুকূল হয়ে উঠল। বিশেষত ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞাই শুধু নয়, দুঃশাসনকে বধের কথায় মধ্যম পাণ্ডব ভীমের প্রতিজ্ঞা সভায় যখন ধৃতরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া তৈরি করল, তখন বিদুর আরও একবার পরিস্থিতি নিজের অনুকূলে নিয়ে এলেন। আইনের প্রশ্নটা বোধ হয় এখন নতুন করে ভাব্য হয়ে উঠল।

রাজনীতির বিশাল তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে বিদুর মনু মহারাজের মতোই জানেন যে, মধুর কথা বা আলাপ আলোচনায় যেখানে কাজ না হয়, সেখানে ঝটিতি দণ্ডবিধানেই বেশ কাজ হয়—সামদণ্ডৌ প্রশংসন্তি। ভীমের একটা ভয়ংকর প্রতিজ্ঞা সভার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবার পর সভার মধ্যে যখন শোরগোল চরমে উঠেছে তখন বিদুর আবার দুহাত উঁচু করে দাঁড়ালেন এবং হস্তের উৎক্ষেপণেই সমস্ত সভাসদবর্গকে চুপ করে বসে পড়তে বললেন—ততোবাহূ সমুৎক্ষিপ্য নিবার্য্য চ সভাসদঃ। বিদুর কথা বলছেন, অতএব সকলেই তাঁর কথা শোনার জন্য বসে পড়লেন। বিদুরের সেই মর্যাদা ছিল—সেকালে দেখেছি, একজন বিশিষ্ট পার্লামেন্টেরিয়ান কথা বলতে উঠলে অন্য সবাই চুপ করে বসে পড়তেন—ঠিক সেইরকমই তাত্ত্বিক রাজনৈতিক নেতা হিসেবে বিদুরের সেই মর্যাদা ছিল। বিদুর বললেন—কৌরবসভার মাননীয় সভ্যরা।

পাণ্ডবঘরণী দ্রৌপদী আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন নিবেদন করেছেন এবং অপমানিত হয়ে অসহায়ের মতো ক্রন্দন করছেন। অথচ এ পর্যন্ত সভাসদ সভ্যেরা কেউ দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। এতে দ্রৌপদী যেমন পীড়িত হচ্ছেন, তেমনই পীড়িত হচ্ছে ধর্ম—ন চ বিব্রূত তং প্রশ্নং সভ্যা ধর্মো'ত্র পীড্যতে। আগেও বলেছি, আবারও বলছি—এখানে ধর্ম কথাটা খুব সহজ নয়। আরও সহজ নয়, যেহেতু বিদুর রাজসভার মর্যাদার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন ধর্মের সঠিক নির্ধারণের সঙ্গে। বিদুর বলেছেন—লোকে অনেক দুঃখ পেয়ে দুঃখের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে বিচারপ্রার্থী হয়ে সভায় আসে—সভাং প্রপদ্যতে হ্যার্তঃ প্রজ্জ্বলন্নিব হব্যবাট্! সভার সভ্য যাঁরা আছেন তাদের উচিত সত্য উদঘাটন করা, ধর্ম অনুসারে তাদের শান্ত করা। সভার মর্যাদা এবং সভ্য সম্বন্ধে বিদুর যে মত প্রকাশ করেছেন, তার তাৎপর্য বুঝতে গেলে একেবারে বৈদিক কাল পর্যন্ত যেতে হবে। সভায় যাবার কারণ হিসেবে বেদে যা পাওয়া যায়, তাতে দেখা যাচ্ছে—ভাল বক্তৃতা দিয়ে নিজের বক্তব্য সঠিকভাবে প্রকাশ করার জন্য লোকে সভায় যেত, নিজের অন্যায় প্রকাশ করে পাপমুক্ত হবার জন্য (কনফেশন) মানুষ সভায় যেত এবং সভায় আসার সবচেয়ে বড় যে কারণ—যা বাজসনেয়ী সংহিতায় বলা আছে, তা হল সম্যক বিচারলাভের আশায় মানুষ সভায় আসত—ধর্মায় সভাচরম্। সেই বিচার হল ধর্ম! ন্যায়বিচারের প্রতিশব্দ হিসেবে এখানে ধর্ম শব্দ ব্যবহৃত।

'সভা' শব্দের গুরুত্ব নিয়ে পণ্ডিতেরা অনেক আলোচনা করেছেন এবং তাতে দেখা যাচ্ছে—বাগ্মিতা, বিচার, ন্যায় ছাড়াও সভায় আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা ছিল এবং পাশাখেলা, এমনকী পণ রেখে পাশাখেলার জন্যও ব্যবহার হত এই সভা। বেদের মন্ত্রে দেখা যাচ্ছে—গোরু, ঘোড়া, রথ যার আছে তিনি যদি হঠাৎ অনেক টাকা পান, তবে তিনি সভায় যান সানন্দে। এখানে পণ রেখে পাশা খেলার কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না এবং আমরা দেখেছি যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা হবার পর আর্থিকভাবে স্ফীত হয়েছেন বলেই, তাঁকে দিয়ে পাশা খেলানোর চক্রান্ত করেছেন দুর্যোধন-শকুনিরা। একটি রাজসভা থেকে আর এক রাজাকে পাশাখেলায় ডাকলে তাঁকে আসতেই হবে এই ছিল নিয়ম। যুধিষ্ঠিরও তাই এসেছেন।

কিন্তু পণ রেখে পাশা খেলা হলেও 'সভা' শব্দের মর্যাদা ততক্ষণই অক্ষুন্ন থাকে, যতক্ষণ পাশাখেলার মধ্যে আমোদপ্রমোদের অংশটুকুই বৃহত্তর থাকে। বস্তুত বেদের যুগে পাশাখেলার জন্য সভাগৃহ ব্যবহৃত হলেও বেদ-পরবর্তী যুগে সভার তাৎপর্য হয়ে গেছে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। সভায় যাঁরা বসতেন সভাসদ হিসেবে, তাঁদের বংশ এবং পরিমর্যাদা তো ছিলই, তাঁরা বীর এবং প্রভাবশালীও বটে, বেদের ভাষাতেই—সুবীরাসঃ শোশুচগুঃ দ্যুমন্তঃ। সভার রাজনৈতিক তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে পণ্ডিতেরা কেউ একে রোমান সেনেট অথবা টিউটনদের কাউন্সিলের সঙ্গে তুলনা করেছেন, কেউ বলেছেন 'ন্যাশনাল জুডিকেচার', আবার রাধাকুমুদ মুখার্জির মতো মানুষ একে 'পার্লামেন্ট'-এব মর্যাদা দিয়েছেন।

বিদুরের কথা থেকে প্রমাণ হয় মানুষের ওপর অন্যায় হলে সভাই তাঁর বিচার করে; বেদের সময় থেকেই সভার সভ্যদের কাছে এই ন্যায় বিচারের প্রত্যাশা ছিল, তা আমরা দেখেছি ওই বাজসনেয়ী সংহিতার উক্তিতে—আমি ধর্মের প্রত্যাশায় সভায় এসেছি—ধর্মায় সভাচরম্। বিদুরও সভ্যদের প্রথাগতভাবে আহ্বান করে বলেছেন—মাননীয় সভ্যরা! আপনারা দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর না দিলে 'ধর্ম' পীড়িত হবে। 'সভা' শব্দের পুরাতন গুরুত্ব বোঝার সঙ্গে সঙ্গে 'ধর্ম' শব্দটার গুরুত্ব বুঝতে হবে। কেননা বিদুর বলেছেন—সত্য নির্ধারণ করে ধর্মের দ্বারা দ্রৌপদীকে শান্ত করাটাই সভ্যদের কাজ।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখবেন—সকলের শ্রেয়সাধন করার জন্য পরমপুরুষ ঈশ্বর ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করলেন অর্থাৎ রাজশক্তির সৃষ্টি করলেন। শুধু রাজশক্তি দিয়েই শ্রেয়সাধন হয় না, অতএব বৈশ্যের সৃষ্টি করলেন; তাতেও হল না, অতএব শূদ্রেরও সৃষ্টি করলেন। সব সৃষ্টি করার পর পরমপুরুষ দেখলেন যে, রাজশক্তির মধ্যে এক ধরনের উগ্রতা আছে, যে উগ্রতা তাকে স্বেচ্ছাচারী করে তোলে, অবাধ্য করে তোলে। অতএব সেই রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণী শক্তি হিসেবেই ঈশ্বর তখন সকলের কল্যাণকর ধর্মের সৃষ্টি করলেন—তচ্ছ্রেয়োরূপম্ অত্যসৃজত ধর্মম্। এই ধর্ম কেমন? না, এটি রাজশক্তিরও নিয়ন্তা, ক্ষত্রিয় রাজা যতখানি উগ্র, ধর্ম তার চেয়েও বেশি শক্তিমান—তদেতৎ ক্ষত্রস্য ক্ষত্রম্ যদ্ধর্মস্তস্মাৎ ধর্মাৎ পরং নাস্তি। এই ধর্মের শক্তি কেমন? এবার সার কথাটা বললেন উপনিষদ। যার শক্তি নেই, বল নেই সেও এই ধর্মের বলে বলবত্তর ব্যক্তিকে জয় করতে পারে। সাধারণ মানুষেরা যেমন অন্যের অন্যায় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাজার সাহায্য চায়, তেমনই রাজারও অবাধ্যতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ধর্মের ব্যবহার হয়—অথো অবলীয়ান্ বলীয়াংসম্ আশংসতে ধর্মেন, যথা রাজ্ঞা এবম্। তা হলে বোঝা যাচ্ছে—ধর্ম হল এমনই এক লোক-ব্যবহার যার দ্বারা অন্যায়ের প্রতিরোধ করা যায়, যার মাধ্যমে দৈহিক বা রাজনৈতিকভাবে দুর্বল মানুষও শ্রেয়োলাভ করতে পারে। উপনিষদ আরও বলেছে—এই ধর্মই হচ্ছে সত্য। সত্য মানে কী? শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য অর্থের যথাযথ বোধ। সেটা যখন লৌকিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তখনই তাকে বলে ধর্ম। মানুষ যখন চিরকালীন ব্যবহার অনুযায়ী ন্যায্য সত্যটুকু উচ্চারণ করে, তখনই বলা যায় সে ধর্ম বলছে, অথবা উলটো দিক দিয়ে দেখলে—ধর্ম উচ্চারণ করলেও বলা যায় সে সত্য বলছে, কারণ ধর্মই সত্য—যো বৈ স ধর্মঃ সত্যং বৈ তৎ, তস্মাৎ সত্যং বদন্তমাহু ধর্মং বদতীতি, ধর্মং বা বদন্তমাহুঃ সত্যং বদতীতি।

উপনিষদের কথার পৃষ্ঠে বিদুরের কথা লক্ষ করে দেখুন। তিনিও বলছেন—মাননীয় সভ্যেরা! লোকে অনেক দুঃখে, আগুনের মতো জ্বলতে জ্বলতে ন্যায়বিচারের প্রার্থী হয়ে সভায় আসে। সভার সভ্যেরা সত্যধর্ম অনুসারেই মানুষের দুঃখ শান্ত করেন—তং বৈ সত্যেন ধর্মেন সভ্যাঃ প্রশময়ন্ত্যুত। বিদুর বলেছেন—আপনারা নিজস্ব কামনা-বাসনা, ব্যক্তিগত ক্রোধ বা স্বার্থ অনুযায়ী বিধান দেবেন না। আপনাদের চেয়ে বেশি শক্তিমান ব্যক্তি এ সভায় আছে, অতএব আপনারা ন্যায়বিচার করবেন না, এমনও যেন না হয়। আপনারা কাম, ক্রোধ এবং অন্যের শক্তিমত্তার অপেক্ষা না রেখে নিরপেক্ষভাবে দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর দিন—বিব্রুয়ুস্তত্র তং প্রশ্নং কামক্রোধবলাতিগাঃ—কেননা সাধুলোক, ভদ্রলোক চিরপ্রতিষ্ঠিত সত্য অনুসারে ধর্ম বলবেন, ন্যায় বলবেন, এটাই রীতি—ধর্মপ্রশ্নমতো ব্রূয়াদার্যঃ সত্যেন মানবঃ।

বিদুর ধর্ম বলতে কী বোঝেন, সেটা বোধ হয় খানিকটা বোঝা গেল। বোঝা গেল, বিদুর-কথিত ধর্ম রাজশক্তির তোয়াক্কা করে না, চিরব্যবহৃত ন্যায়বিচারই বিদুরের ধর্ম, সেই ধর্মেরই প্রতিমূর্তি হিসেবে তিনি এই পৃথিবীতে জন্মেছেন এবং তিনি সেই ধর্মেরই প্রতিষ্ঠা চান সমস্ত দুর্বল মানুষের শ্রেয়োলাভের উপায় হিসেবে। এমনই সে ধর্ম, যা রাজশক্তির উগ্রতা এবং অবাধ্যতাকেও নিয়ন্ত্রণ করবে। বিদুর বলেছেন—নিজের প্রজ্ঞা অনুসারে বিকর্ণ কিন্তু দ্রৌপদীর প্রশ্নের সঠিক জবাব দিয়েছেন, এবার এ বাবদে আপনারা কিছু বলুন।

আসলে বিদুর জানেন, সভায় যদি নিজের মত প্রকাশ করতে হয় তবে একজন বললেই হয় না। এমনকী বিকর্ণের মতো এক ব্যক্তিত্বের কথাও সেখানে তেমন মূল্য পাবে না; কেননা বিকর্ণের বয়স অল্প এবং এতকাল তিনি তেমনভাবে সভায় কথা বলেনওনি। বিদুর জানেন যে সভায় কোনও বক্তব্যের তখনই সফলতা আসে যখন অন্য অসাধারণ ব্যক্তিত্বরা সেই বক্তব্যের সঙ্গে সহমত হন। সেই বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনা শোনা গেছে—সভায় যাঁরা বসে আছেন সেই সভাসদেরা যেন আমার অনুকূলে কথা বলেন—যে চ কে চ সভাসদস্তে মে সন্তু সবাচসঃ—তাঁদের সঙ্গে যেন আমার মত মিলে যায়। বিদুর সেই জন্যই সমবেত

কুরুবৃদ্ধদের কাছে এত মিনতি করছেন, যাতে তাঁরা সত্য বিচার করে ন্যায় কথা বলেন, ধর্ম বলেন—তং বৈ সত্যেন ধর্মেন সভ্যাঃ প্রশময়ন্তুত।

কিন্তু কেউ বললেন না। অন্তত বিদুরের মতো কেউ বললেন না। দ্রৌপদীর ওপর যখন চরম অপমান চলছে, তখন ভীষ্ম শুধু একবার বলেছিলেন—যুধিষ্ঠির তোমাকে বাজি রেখে হেরেছেন না হারেননি, সে প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারব না বটে, তবে যা ঘটছে, তাতে বুঝতে পারি—এই কুরুবংশের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। কামনায়, লোভে, মোহে এঁরা জর্জরিত। আজকে পাশাখেলার অন্যায় যুধিষ্ঠিরকে স্পর্শ করেছে বটে, কিন্তু তুমি যাঁদের কুলবধূ তাঁরা ধর্মপথ থেকে চ্যুত হন না কখনও। এমনকী তুমি যে এই বিপদে পড়েছ, তবু তুমি ধর্মের মীমাংসার দিকেই তাকিয়ে আছ—যৎ কৃচ্ছ্রমপি সংপ্রাপ্তা ধর্মমেবান্ববেক্ষসে। ভীষ্ম আরও বললেন—তুমি শুধু এইটুকু জেনো যে, আজকে যা ঘটল তাতে আমি কিংবা দ্রোণের মতো বৃদ্ধেরা অথবা যাঁরা ধর্ম জানেন, ন্যায়নীতির বিচার জানেন, তাঁরা প্রাণহীন মানুষের মতো বসে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন—শূন্যৈঃ শরীরৈস্তিষ্ঠন্তি গতাসব ইবানতাঃ।

কুরুসভার বৃদ্ধরা, সমবেত রাজারা তবু যে বিদুরের মতো কেউ কিছু বললেন না, তা নাকি ধৃতরাষ্ট্রের অসভ্য ছেলে দুর্যোধনের ভয়ে—নোচুর্বচঃ...মহীক্ষিতো ধার্তরাষ্ট্রস্য ভীতাঃ। অন্তত মহাভারত তাই জানিয়েছে। তাই যদি হয় তবে তো বিদুরকে এই সভার সবচেয়ে সাহসী মানুষ বলতে হবে। তাঁর দৈহিকশক্তি নেই, অস্ত্রচালনার শক্তি নেই অথচ কী তাঁর সাহস! দুর্যোধন, দুঃশাসন এবং কর্ণের সামনে দাঁড়িয়ে বার বার তিনি সত্য উচ্চারণ করেছেন এবং তাও সমর্থন এবং সহায়তা ছাড়াই। কুরুসভার বৃদ্ধরা, বিশেষত ভীষ্ম দ্রোণের মতো প্রধান পুরুষেরা বিদুরের সমর্থনে মুখ না খোলায় বিদুরের একটাই যেটা অসুবিধে দাঁড়াল, তা হল—দ্রৌপদীর ওপর দুর্যোধন-কর্ণদের সমবেত অত্যাচার তাঁকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হল। অবশ্য অসভ্যতা যত বাড়তে লাগল, ভীমের মেজাজও চড়তে লাগল ততই। কর্ণ এবং ভীমের মধ্যে বচসাও হয়ে গেল ভালরকম।

তাও চলছিল একরকম। কিন্তু এরই মধ্যে দুর্যোধন সর্বনাশ ডেকে আনলেন। কর্ণের প্ররোচনায় দুর্যোধন মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহে দ্রৌপদীর দিকে কুৎসিত ইঙ্গিত করে বসলেন, তাঁর উরু থেকে কাপড় সরিয়ে অশ্লীলভাবে দেখালেন দ্রৌপদীকে। দুর্যোধন অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পারেননি। একটু আগেই যে ভীমসেন ভয়ংকর কথাবার্তা বলছিলেন, তা তিনি অসভ্যতার ঝোঁকে খেয়ালও করেননি। ভীম শুধু বলছিলেন—একবার যুধিষ্ঠির বলুন, আমি আমার পরিঘসদৃশ দুই বাহুর মধ্যে নিষ্পেষণ করে ছেড়ে দেব কর্ণ-দুর্যোধনদের। এই সব সময় যে ভীষ্ম, দ্রোণ এবং বিদুর তাঁকে কোনওরকমে থামিয়ে রেখেছিলেন, সেটা দুর্যোধন আন্দাজও করতে পারছিলেন না। কিন্তু দুর্যোধন এখন যে অশ্লীল ইঙ্গিত করে বসলেন, এবারে বিদুর আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, এই অশ্লীল ব্যবহারের ফল হবে মারাত্মক।

দুর্যোধনের কুৎসিত আচরণের সঙ্গে সঙ্গে সভার মধ্যে লাফ দিয়ে দাঁড়ালেন বৃকোদর ভীম; তাঁর রক্তলাল চোখদুটি ক্রোধে বিস্ফারিত। ভীম বললেন—আমি যদি গদার আঘাতে তোর ওই উরু ভেঙে না দিই, তবে জানবি—বাপ-ঠাকুরদার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নেই। ভীমের প্রতিজ্ঞা মানে ভয়ংকর এক ঘোষণা, সে ঘোষণা সত্যে পরিণত হবেই। কী এক পাশাখেলাকে কেন্দ্র করে জ্ঞাতি ভাইদের মধ্যে এমন এক ভয়ংকর বিবাদ আরম্ভ হল—এটা ভেবে বিদুর যারপরনাই শঙ্কিত হলেন। জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র ভীমের এই প্রতিজ্ঞার গুরুত্ব বুঝতে পারেননি বলেই বিদুর এবার শেষ সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন—শোনো হে ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা! এ কিন্তু ভীষণ ভয়ের ব্যাপার হয়ে গেল এবং সে ভয় নেমে আসবে এই ভীমের কাছ থেকেই। এখানে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে 'সুহৃদ-দ্যূত' হবার কথা হয়েছিল, সেখানে

দ্যূতক্রীড়ার সমস্ত নীতিনিয়ম লঙ্ঘন করে রাজসভার মধ্যে স্ত্রীলোককে ডেকে এনে ঝগড়া-বিবাদ আরম্ভ করেছ—অতিদ্যূতং কৃতমিদং ধার্তরাষ্ট্রা/যস্মাৎ স্ত্রিয়ং বিদধ্বং সভায়াম্। এতে তোমাদের ভীষণ খারাপ হবে। এমনভাবে চললে তোমাদের রাজনৈতিক সমৃদ্ধি তো ঘটবেই না, বরঞ্চ যা আছে তাও যাবে। মোদ্দা কথাটা এই জেনো—সাধারণ নীতিনিয়ম যদি মেনে না চল, তা হলে রাজসংসদ দূষিত হয়ে যায়—ধ্বস্তে ধর্মে পরিষৎ সম্প্রদুষেৎ।

আজকের দিনের লোকসভা, বিধানসভায় যেসব নিকৃষ্টমানের নেতারা মূর্খসংখ্যাধিক্যের সুবিধা নিয়ে সংসদভবনে যান এবং সেখানে নজিরবিহীনভাবে যে নীতিবিহীন আচরণ করেন, তাঁরা এই বিদুরকথিত পরিষদীয় ধর্মের কথা মনে রাখবেন। নীতিনিয়মের বালাই না থাকলে পরিষদীয় কার্য, সংসদীয় মর্যাদা লঙ্ঘিত হয়—ধ্বস্তে ধর্মে পরিষৎ সম্প্রদুষেৎ। বিদুর বললেন—আমি পরিষদীয় ধর্ম মাথায় রেখেই বলছি। যুধিষ্ঠির যখনই নিজেকে হেরে গেছেন, তখনই তিনি দ্রৌপদীর ওপর অধিকার হারিয়েছেন, অতএব দ্রৌপদীকে তিনি যেমন পণ রাখতে পারেন না, তেমনই তোমাদের পক্ষে তাঁকে জেতাটাও স্বপ্নে টাকাপয়সা জেতার মতোই।

বার বার, বার বার বলতে বলতে বিদুরের কথার ফল হল। মহাভারতের কবি তখনকার কবিকল্প স্মরণ করে বলেছেন—দুর্যোধনের চরম অসভ্যতার পর ধৃতরাষ্ট্রের সভায় নানা দুর্লক্ষণ দেখা দিল—শেয়াল শকুন ডেকে উঠল, অকারণ উল্কাপাত হল—কিন্তু আসলে আমার মনে হয় বিদুরের নিরবচ্ছিন্ন প্রতিবাদে কুরুসভা জেগে উঠল। কারণ এইবার বিদুরের সঙ্গে আমরা দুর্যোধন-জননী গান্ধারীকে দেখছি—একত্রে তাঁরা ধৃতরাষ্ট্রকে গিয়ে বলছেন যে, কী ঘোর উৎপাতের মধ্যে কুরুসভা আজ নিমজ্জিত হয়েছে—ততো গান্ধারী বিদুরশ্চৈব বিদ্বান্ তমুৎপাতং ঘোরমালক্ষ্য রাজ্ঞে। বিদুরের সঙ্গে গান্ধারীকে একত্রে প্রতিবাদ করতে দেখে ধৃতরাষ্ট্র কিন্তু একেবারে উলটো সুরে গাইতে আরম্ভ করলেন। যে ধৃতরাষ্ট্র এই খানিকক্ষণ আগে দ্রৌপদীকে বাজি ধরার পর উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করছিলেন—জিতেছে কি, জিতেছে কি—সেই ধৃতরাষ্ট্র এবার বিবেক-স্বরূপ বিদুর এবং সহধর্মিণী গান্ধারীর প্রতিবাদে উলটো সুরে দুর্যোধনকে ধমকে বললেন—দুর্যোধন! বদমাশ কোথাকার! তুই একেবারে গোল্লায় গিয়েছিস—হতো’ সি দুর্যোধন মন্দবুদ্ধে—যে সভায় কুরুশ্রেষ্ঠ মন্ত্রীবৃদ্ধরা বসে আছেন, তুই সেই সভায় পাণ্ডবদের ধর্মপত্নীকে ডেকে এনে রংতামাশা আরম্ভ করেছিস—স্ত্রিয়ং সমাভাষসি দুর্বিনীত/বিশেষতো দ্রৌপদীং ধর্মপত্নীম্। এই তামাশা শুধু রাজ্যলোভী দুর্যোধনের নাকি স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের তা ভাল করে বোঝা যায় না। কারণ দুর্যোধনকে যৎপরোনাস্তি গালাগাল দিয়ে এবং অতিপ্রসন্ন মনে দ্রৌপদীকে একাধিক বর দিয়ে পঞ্চপাণ্ডবকে পাশাখেলার হার থেকে মুক্ত করে দিলেন ধৃতরাষ্ট্র। অবশ্য যে অবস্থা তখন তৈরি হয়েছিল, তা থেকে বেরিয়ে আসার মতো উপস্থিত বুদ্ধি তখন ধৃতরাষ্ট্রের ছিল না। দ্রৌপদীকে বরদান করে পাণ্ডবদের মুক্ত করে দেবার বুদ্ধিও জুগিয়ে দেন মহামতি বিদুরই। পরে যখন ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের কাছে আত্মসমালোচনা করেছেন, তখন তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, বিদুরের বুদ্ধিতেই তিনি দ্রৌপদীকে বরদান করে পাণ্ডবদের মুক্ত করে দিয়েছিলেন—ততো’হম্ অব্রুবং তত্র বিদুরেণ প্রচোদিতঃ। কিন্তু বিদুরের বুদ্ধি অনুসারে কতক্ষণ চলতে পারেন অস্থিরমতি ধৃতরাষ্ট্র! পাণ্ডবদের ছেড়ে দেবার পর মুহূর্তে—মানে, তখনও পাণ্ডবরা ইন্দ্রপ্রস্থের পথে হাঁটছেন, সেই অবস্থায় তাঁদের রাস্তা থেকে ধরে আনল ধৃতরাষ্ট্রের দূত—আবার পাশাখেলা হবে। গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে বারণ করেছিলেন—বিদুরের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে দুর্যোধনকে ত্যাগ করতেও বলেছিলেন আবার—কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে বলেছিলেন—শেষ হয়ে যাক এই বংশ, ছেলেরা যেমন চাইছে, তাই করুক। আবার পাশাখেলা হোক।

ধৃতরাষ্ট্র দ্বিতীয়বার এই পাশাখেলার জন্য বিদুরকে আর দূতরূপে পাঠালেন না। তিনি

বুঝেছিলেন যে, এই প্রস্তাব করলে উপযুক্ত জবাব পাবেন বিদুরের কাছ থেকে এবং তা কোনওভাবেই গান্ধারীর বচন থেকে মধুরতর হবে না। সবকিছু জেনেও বিদুরও আর বারণ করেননি ধৃতরাষ্ট্রকে। কেননা, বারণ করলে প্রথমত তিনি মানতেন না। দ্বিতীয়ত পূর্বের দ্যূতক্রীড়ার সময়েই যা কিছু ঘটেছে, তাতে তিনি পরিষ্কার অনুভব করেছেন যে, কুরু-পাণ্ডবের জ্ঞাতিবিরোধ রোধ করা কোনওভাবে তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভব নয় এই কারণে যে, রাজ্যলোভী দুর্যোধন যে কোনও উপায়ে ধৃতরাষ্ট্রকে রাজি করিয়ে তাঁর সমৃদ্ধ রাজ্য কেড়ে নেবেনই। পুনশ্চ যুধিষ্ঠির যেহেতু ধৃতরাষ্ট্রকে পিতার মতো সম্মান করেন, ধৃতরাষ্ট্র সেই পিতৃত্বের অপব্যবহার করছেন। বিদুর খুব ভালভাবে জানেন যে, যুধিষ্ঠির এইভাবে পাশাখেলার লোক নন, কিন্তু পিতৃতুল্য ধৃতরাষ্ট্র এমন ব্যবহার করছেন, যাতে পিতার আদেশটা এমনই সহজ সরল এক অর্থ প্রকাশ করে—যুধিষ্ঠির তুমি শকুনির সঙ্গে খেলো এবং হারো।

যুধিষ্ঠির হারলেন ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ মান্য করে। তেরো বৎসরের বনবাস নির্দিষ্ট হল তাঁর জন্য। বিদুর এরজন্য প্রস্তুত ছিলেন। বিশেষত দ্বিতীয় দফা দ্যূতক্রীড়ার পর ভীম এবং অর্জুন যেভাবে কৌরবদের বধের প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন, তাতে যে ভয়ংকর রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধ ঘটবেই, এ বিষয়ে বিদুর প্রায় নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিলেন। অতএব বিদুর একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না ঘৃণায়, ক্রোধে, দুঃখে। শুধু পাণ্ডবদের যখন বনগমনের সময় হল, তখন প্রস্থানোদ্যতা কুন্তীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বিদুর বলেছিলেন—পরম মাননীয়া কুন্তী রাজার ঘরের মেয়ে, বড় নরম মানুষ তিনি, তাতে আবার বয়সও হয়েছে যথেষ্ট। তাঁর পক্ষে অরণ্যে থাকাটা কষ্টকর। আমার বাড়িতে তাঁর সম্মানের অভাব হবে না, তিনি আমার বাড়িতেই থাকবেন—ইহ বৎস্যতি কল্যাণী সৎকৃতা মম বেশ্মনি।

মানসিক বিকারগ্রস্ত গবেষকেরা বিদুরের সম্ভাবনা ভাল চোখে দেখেননি। তাঁদের হৃদয় অনুসারে তাঁরা বলেছেন যে, কুন্তীর সঙ্গে বিদুরের একটা অবৈধ সম্পর্ক তো ছিলই, অতএব সেইজন্যই তিনি তাঁকে নিজের কাছেই রেখে দিয়েছেন! এইসব গবেষকদের উদ্দেশে কী তিরস্কার বাক্যই বা উচ্চারণ করব! শুধু এইটুকু জানাই যে, কুন্তীর সম্বন্ধে বিদুর যে বিশেষণগুলি প্রয়োগ করেছেন, তাঁর প্রথমটি হল আর্যা অর্থাৎ কুন্তী তাঁর প্রণম্য ব্যক্তি। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিশেষণ 'বৃদ্ধা'; এই বৃদ্ধত্বের মধ্যে কোন অবৈধতার অবকাশ আছে? তৃতীয় শব্দ 'কল্যাণী', বয়স্ক নমস্য ব্যক্তিকে কল্যাণী বলার মধ্যে কন্যাজনোচিত মমতা আছে। এখানে সবচেয়ে বড় তিরস্কারটি আছে ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশে। যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ এখন দুর্যোধনের কবলে, হস্তিনাপুর তো আগে থেকেই ধৃতরাষ্ট্রের অধিকারে। এই অবস্থায় যিনি কয়েক বছর আগে এই রাজ্যের রানি ছিলেন, তাঁর সম্মানে লাগবে না হস্তিনাপুরে থাকতে? কিন্তু কুন্তীকে স্বগৃহে রাখার প্রস্তাব করে বিদুর বুঝিয়ে দিলেন—হস্তিনাপুরের ওপর এখনও ধৃতরাষ্ট্রের নীতিগত অধিকার নেই এবং বিদুরও তাঁর কৃপাপ্রার্থী দাস নন। তিনি নিজের অধিকারে হস্তিনাপুরে আছেন এবং তাঁর বাড়িতে কুন্তী থাকলে একবারও কুন্তীরও মনে হবে না যে, তিনি ধৃতরাষ্ট্রের অন্ন ধ্বংস করছেন, অথবা তিনি কারও ওপরে নির্ভর করে আছেন। বিশেষত পাণ্ডবদের বনগমনের সঙ্গে কুন্তী কোনওভাবে যুক্ত নন। পাশাখেলার কোনও শর্তের সঙ্গেও তাঁর যোগ নেই। অতএব স্বাধীনা কুন্তীকে বিদুর নিজের ঘরে রেখে দিলেন পাণ্ডবদের নৈতিক অধিকারের প্রতীক হিসেবে।

বনে যাবার সময় বিদুর পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে নতুন কোনও উপদেশ দেননি। শুধু পাণ্ডবদের প্রত্যেকের মধ্যে যে ব্যক্তি-শক্তি নিহিত আছে, সেই শক্তিটুকু তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যুধিষ্ঠিরকে। তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বলেছেন বিদুর—অন্যায় দিয়েই যেহেতু তোমাকে জয় করা হয়েছে, তাই পরাজয়ের দুঃখ তোমার থাকবারই কথা নয়। নীতি-নিয়ম-ধর্ম তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত, যুধিষ্ঠির! তোমার ভাই অর্জুন যুদ্ধবিদ, ভীম শত্রুহন্তা, নকুল ধনসঞ্চয়ী

এবং সহদেব সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারেন। তোমার কীসের চিন্তা! এই বিপন্ন অবস্থাতেও তুমি যে অসাধারণ ধৈর্য নিয়ে কৌরবদের ক্ষমা করে চলেছ, এই অবস্থাতেও তুমি যে নীতি অনুসারেই সত্যপালন করার জন্য বনে চলেছ, এই নীতি এবং ক্ষমাই তোমাদের সমস্ত কল্যাণ সুনিশ্চিত করবে—এষ বৈ ধর্মকল্যাণঃ সমাধিস্তব ভারত। বিদুর অনেক আশীর্বাদ করলেন যুধিষ্ঠিরকে। যুধিষ্ঠির এবং অন্য পাণ্ডবদের তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন, কিন্তু তাঁদের বনে যাবার সময় অনর্থক ভাবালুতা প্রকাশ করে তাঁদের তিনি দুর্বল করে দেননি। তিনি এই কঠিন সময়ের মধ্যে তাঁদের নীরোগ স্বাস্থ্য কামনা করেছেন আর বলেছেন—এই বনবাস পর্বের পর তোমরা কৃতকার্য হয়ে ফিরে এলে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে—কৃতার্থং স্বস্তিমন্তং ত্বাং দ্রক্ষ্যামি পুনরাগতম্।

বনে যাবার আগে যুধিষ্ঠির ভেবেছিলেন যে, বিদুরের কাছ থেকে করণীয় কর্ম সম্বন্ধে বেশ কিছু নির্দেশ পাবেন তিনি। কিন্তু বিদুরের নীতিই এটা নয়। বারণাবতে জতুগৃহ-দাহ থেকে মুক্তির উপায় বার করার জন্য তিনি যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক সুবিধা পাবার জন্য একবারও তিনি বলেননি যে, পাঞ্চাল দ্রুপদ অথবা বৃষ্ণি যাদবদের সঙ্গে তুমি বন্ধুত্ব করো। তিনি যে রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন, তা এতটাই নৈতিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, তাতে স্বপক্ষে জনমত তৈরি হয়ে যায় আপনা আপনিই। সবচেয়ে বড় কথা যুধিষ্ঠির স্বয়ং বিদুরের ধৈর্যশীল রাজনীতি এতটাই রপ্ত করেছেন যে তাঁকে আলাদা কোনও উপদেশ দেবার প্রয়োজন বোধ করেননি বিদুর। দু-দুটি পাশাখেলার সূত্রে পাণ্ডবদের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের বঞ্চনা এতটাই প্রকট হয়ে উঠেছিল এবং সে বঞ্চনা যুধিষ্ঠির এমন স্থিতপ্রজ্ঞ স্বভাবে মাথা পেতে নিয়েছিলেন যে, প্রথম পাশাখেলার পর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন—তুমি যেখানে ভাইদের পরিচালনা করছ এবং স্বয়ং বুদ্ধিমান বিদুর যাঁদের মন্ত্রণাদাতা তাঁদের আর ভাবনা করার কিছু নেই—মন্ত্রী চ বিদুরো ধীমান্ সর্বশাস্ত্র বিশারদঃ। কাজেই বনে যাবার আগে যুধিষ্ঠির যখন বিদুরের কাছে জিজ্ঞাসা করে বললেন—আপনি আমাদের পিতার সমান এবং সমস্ত ব্যাপারে আপনার ওপরেই নির্ভর করে আছি—তখন যুধিষ্ঠিরের আত্মশক্তি দেখে বিদুর অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে আলাদা কোনও উপদেশ দেবার প্রয়োজন তিনি বোধ করেননি। শুধু এইটুকু তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—যারা এখনও পর্যন্ত কোনও অন্যায় করেনি—ন হি বো বৃজিনং কিঞ্চিদ্ বেদ কশ্চিৎ পুরা কৃতম্—তারা এইভাবে বঞ্চিত হলেও একদিন তারা সগৌরবে রাজ্যের অধিকার পাবে।

অন্যায় দ্যূতশর্তে পাণ্ডবদের বনে পাঠানোর পর বিদুর একটি কথাও ধৃতরাষ্ট্রকে বলেননি, অন্যদিকে পাণ্ডবদেরও তিনি কোনও অযথা উসকানি দেননি। তিনি এখনও বিশ্বাস করেন যে, ধৃতরাষ্ট্র নিজের ভুল বুঝলে সবকিছুই আবার ঠিক হয়ে যেতে পারে। কিন্তু নিজের ক্ষোভ তিনি প্রকাশ করেছেন একবারও ধৃতরাষ্ট্রের কাছে না এসে। ধৃতরাষ্ট্রের মনে ভয় ধরছিল। যত বড় বঞ্চনা পাণ্ডবদের সঙ্গে করা হল, তাতে ভবিষ্যতে যে খুব উত্তম ফল ফলবে না, এটা তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন। বিশেষত দুর্যোধন রাজসভায় দ্রৌপদীকে এনে যে চরম অসভ্যতা করলেন, কুরুবাড়ির অন্দরমহলেই তার ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া হল। কুরুবাড়ির বউ-ঝিরা তাঁদের বাড়ির পুরুষদের উদ্দেশে কঠোর নিন্দাবাক্য উচ্চারণ করে চিৎকার করে কাঁদল—রুরুদুঃ সস্বনং সর্বা বিনিন্দন্ত্যঃ কুরূন ভৃশম্। ধৃতরাষ্ট্রের কানে সে সব গেছে; তিনি ছেলেদের অন্যায় আচরণ চিন্তা করে মোটেই শান্তি পেলেন না। যুধিষ্ঠিরের নীরব সহ্যশক্তি এবং বিদুরের স্তব্ধ প্রতিবাদ তাঁর মন আতঙ্কিত করে তুলল। তিনি দূতের মারফৎ বিদুরকে ডেকে পাঠালেন। বললেন—তাড়াতাড়ি এসো—ক্ষত্তুঃ সম্প্রেষয়ামাস শীঘ্রম্ আগম্যতামিতি।

বিদুর জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ মেনে তাঁর কাছে এসেছেন এবং ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত শঙ্কিত

হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছেন, কীভাবে কোন ভঙ্গিতে পাণ্ডবরা রাজধানী ত্যাগ করে যাচ্ছেন। বিদুর আবেগরহিতভাবে জবাব দিয়েছেন। বলেছেন—আপনার পুত্রেরা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে প্রতারণা করলেও তিনি ধর্ম ত্যাগ করেননি। তাঁর ক্রোধদীপ্ত চক্ষু থেকে তেজ নির্গত হয়ে যদি সে তেজ আপনার পুত্রদের ভস্মসাৎ করে সেই ভয়ে তিনি চোখ বন্ধ করে বনের পথে চলেছেন। বিদুর বোঝাতে চাইলেন যে, পাণ্ডবদের পক্ষে রইল ধর্ম, পরিণামে যার জয় হবেই। ভীমের আকার-ইঙ্গিত স্পষ্ট করে ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝানোর সময় বিদুর বললেন—ভীম তাঁর দুটি হাত উঁচু করে সবাইকে দেখাতে দেখাতে চলেছেন—বাহু বিশালৌ কৃত্বা তু ভীমো গচ্ছতি পাণ্ডবঃ। এইভাবে তাঁর যাবার উদ্দেশ্য হল—তিনি বোঝাতে চাইছেন পেশিশক্তিতে তাঁর সঙ্গে কেউ এঁটে উঠতে পারবে না। শত্রুপক্ষের ওপর তাঁর এই হাতদুটি ভয়ংকর প্রতিশোধ নেবে, ভীম সেই ইঙ্গিত দিচ্ছেন হাতদুটি ওপরে তুলে ধরে। বিদুর বোঝাতে চাইলেন—অপরিশীলিত যে শক্তি কোনও বাধা বন্ধ মানে না, নিয়ম মানে না, সেই শক্তির প্রতীক হল পেশিবহুল হাতদুটি। ভীম সেই হাতদুটি সকলকে দেখাতে দেখাতে চলেছেন। তাঁর মানে যুদ্ধকাল যদি আসে, তবে যুদ্ধের নিয়মনীতি লঙ্ঘন করেও তিনি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের ওপর প্রতিশোধ নেবেন। অর্থাৎ অপরিশীলিত যে ক্ষাত্র তেজ যুদ্ধজয়ের সহায় হয়, সেই শক্তি যে ভীম বাধাবন্ধহীনভাবে প্রয়োগ করবেন, তারই একটা আন্দাজ তিনি দিয়ে গেলেন সবাইকে।

বিদুর বললেন—অর্জুন ভীমের পিছন পিছন হাতে করে মুঠো মুঠো বালি নিয়ে ছড়াতে ছড়াতে চলেছেন। বোঝাতে চাইছেন—বালুকার কণা যেমন গুণে শেষ করা যায় না, তেমনই অগণিত বাণ-বর্ষণ করে তিনি উত্তক্ত করে তুলবেন শত্রুপক্ষকে। বিদুর একে একে নকুল, সহদেব এবং দ্রৌপদীর বনগমন ভঙ্গিরও টীকা রচনা করলেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। তাঁর বক্তব্য থেকে বোঝা যায়—যুধিষ্ঠিরের রূপকে বাঁধা ন্যায়নীতি এবং ধর্মের সঙ্গে ভীমের অপরিশীলিত ক্ষাত্রশক্তি এবং অর্জুনের অস্ত্রনৈপুণ্য একত্র মিলিত হবার ভবিষ্যৎ পরিণামটুকু বিদুর জানিয়ে রাখলেন ধৃতরাষ্ট্রকে।

খুব স্বাভাবিক যে, বিদুরের চরিত্র পড়তে পড়তে বিরক্ত হবেন অনেকে। অর্জুন ভীম অথবা দুর্যোধন কর্ণের মতো কোনও বিচিত্র কাহিনীর তিনি নায়ক নন। ভীষ্ম দ্রোণের মতো কুরু-গৌরব ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিচিত্র রোমাঞ্চ আছে, এমনকী ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্রের মধ্যেও যে অস্থির উত্থান-পতন আছে, বিদুরের চরিত্রের মধ্যে সেসব কিচ্ছু নেই। তাঁকে নিয়ে কোনও গল্প হয় না, বিদুর এমনই এক মানুষ। অন্যায়ের মুহূর্তে তাঁকে উচিত উচ্চারণ করতে দেখা যায় মুহুর্মুহু, মাঝে মাঝে ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে ডাকেন নিজের বিবেক-বুদ্ধিকে সঠিক পথে চালনা করার জন্য। কিন্তু সেখানেও সেই জ্ঞানের কথা, নৈতিকতার উপদেশ, যা বিদুরের চরিত্রকে ক্লান্তিকর এক শ্রব্য প্রবন্ধে পরিণত করে। বস্তুত জীবন-মন্থনের মধ্যে যে বিক্রিয়া আছে—তা ভালই হোক, আর মন্দই হোক—সেই বিক্রিয়াই তো মর্ত্যরসের সৃষ্টি ঘটায়—শৃঙ্গার, বীর, হাস্য ভয়ানক ইত্যাদি রস—যা শ্রোতা, দর্শক, পাঠকের মনে তরঙ্গ তোলে।

কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে সেই তরঙ্গ, যেখানে আমাদের এই প্রবন্ধ-নায়কের মনটাই এক শান্ত সমুদ্রের মতো? লোকের কাছে তরঙ্গসংকুল উত্তাল সমুদ্রই দৃষ্টিনন্দন, ঢেউয়ের পরে ঢেউ এসে যখন আছড়ে পড়ে চোখের সামনে, তখন সেই তরঙ্গায়িত বারিরাশির মধ্যে জীবনের সমস্ত চঞ্চল সংকেতগুলি ধরা পড়ে। মহাকাব্যের সমুদ্রে এইরকম চঞ্চল রোমাঞ্চকর নাটকীয় জীবনের অধিকারী হলেন কর্ণ, দুর্যোধন, ভীম এবং অবশ্যই দ্রৌপদী। এমন জীবন অর্জুনেরও নয়, যুধিষ্ঠিরের তো নয়ই। ঠিক সেই তুলনায় দেখলে পরে বিদুরের চরিত্রে কোনও চাঞ্চল্য নেই, নেই কোনও নাটকীয়তা, রোমাঞ্চ। ঠিক এই দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলে বিদুরের চরিত্র ভাল লাগানোর কোনও উপাদান মহাভারতের মধ্যেই নেই। তবু বিদুর মহাভারতের এক অন্যতম বিখ্যাত চরিত্র, এমনকী মহাভারতের মূল রসের সঙ্গেও তিনি

একান্তভাবে সংপৃক্ত। তা হলে বুঝতে হবে, বিদুরকে অনুভব করতে গেলে একান্ত পৃথক এক মানসিকতা চাই, চাই এমন এক সংবেদনশীল সমান গম্ভীর হৃদয়, যা সমুদ্রপারের চলোর্মিমালা অতিক্রম করে ভারত-সমুদ্রের মাঝখানে পৌঁছে দিতে পারে।

আলঙ্কারিক পণ্ডিতেরা দেখিয়েছেন যে, মহাভারতের মূল রস নাকি শান্ত রস। তাঁর মানে আমরা আপাতদৃষ্টিতে মহাভারতের মধ্যে মাঝে মাঝেই যে বীর রস, করুণ রস, অথবা শৃঙ্গার রসের উপাদান দেখি এবং যেগুলি দেখে আমরা আলোড়িত বোধ করি, সেগুলি মহাভারতের মৌল রস নয়। স্থায়ি ভাব নয়। সেগুলি আসলে সমুদ্রপারের, সেই উচ্ছল জলধি-তরঙ্গ যা পেরিয়ে আমাদের প্রবেশ করতে হবে মধ্যসমুদ্রে, মহাভারতের অন্তরে যেখানে পাশাখেলা নেই, রাজ্যলোভ নেই, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ নেই, ভীমের হুংকার নেই, কর্ণ দুর্যোধনের প্রতিস্পর্ধা নেই, ধৃতরাষ্ট্রের অস্থিরতা নেই—এমনকী পাপ-পুণ্যের অতীত, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয়ের অতীত, সমস্ত দ্বন্দ্বের অতীত এক প্রশান্তি আছে সেখানে। বিদুর হলেন এই প্রশান্তির সহায়।

বলতে পারেন—এই প্রশান্তির মধ্যে কীসের আনন্দ? এই রসের রসিকই বা কারা? বিদুরই বা কীভাবে জড়িত এখানে? প্রথমেই বলা ভাল এই শান্ত রসের আনন্দ বোঝা আমাদের মতো সাধারণ জনের কর্ম নয়। সমস্ত জাগতিক তৃষ্ণাক্ষয়ের মধ্যে দিয়ে উদার বৈরাগ্যময় যে সুখ, সেই সুখই মহাভারতের প্রতিপাদ্য। সেই পরিণামী সুখ প্রতিপাদন করার জন্য রাজ্যলিপ্সা, ভোগলিপ্সার বিকারটুকু দেখাতে হয় বলেই দুর্যোধন, ধৃতরাষ্ট্র, কর্ণের কথা যেমন বলতে হয়েছে, তেমনই কামনা-বাসনা এবং ক্রোধের বিপরীতে যুধিষ্ঠির বিদুরের মতো ব্যক্তিত্বকেও দেখিয়েছেন মহাকবি।

পাণ্ডবরা পাশাখেলায় প্রতারিত হয়ে বনে চলে যাবার পর ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যের সমস্ত জনপদবাসীদের মধ্যে এক তুমুল আলোড়ন দেখা দিল এবং তারা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য ছেড়ে পাণ্ডবদের পিছন পিছন বনে চলে যেতে চাইল—সাধু গচ্ছামহে সর্বে যত্র গচ্ছন্তি পাণ্ডবাঃ। কিন্তু আশ্চর্য কী জানেন, পাণ্ডবদের ওপর দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্ররা যে বঞ্চনার ভার চাপিয়ে দিলেন, তার দায় এসে পড়ল ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ এবং বিদুরের ওপর। তার মানে, তখনও পর্যন্ত জনপদবাসীরা সমস্ত কল্যাণকারক হিসেবে এঁদেরই চেনেন এবং কল্যাণ বা নীতিবহির্ভূত কাজ হয়ে থাকলে এঁদেরই নিন্দা করেন জনপদবাসীরা—গর্হয়ন্তো'সকৃদ্ ভীষ্ম-বিদুর-দ্রোণ-গৌতমান্। তারা বলতে লাগল—এই বিশাল কুরুবংশ উচ্ছন্নে গেছে। যেখানে দুর্যোধনের মতো রাজ্যলোভী মানুষ শকুনি কর্ণের সহায়তায় রাজ্য চালাবেন, সেই রাজ্যে আর থাকা যাবে না হে। আমাদের ঘরবাড়ি কি আর থাকবে? না আমরাই থাকব? ভালমানুষের ছেলেগুলোকে তাড়িয়ে দিল বনে, ধর্ম গেল, আচার গেল, সব গেল। দুর্যোধন যেখানে রাজা, সেটা আর আমাদের থাকার জায়গা নয় বাপু—নেয়মস্তি মহী কৃৎস্না যত্র দুর্যোধনো নৃপঃ—তারচে চলো, পাণ্ডবরা যেথায় যায়, আমরা সেথায় গিয়ে থাকি।

পৌর-জনপদজনেরা দুর্যোধন-কর্ণ-শকুনিদের গালাগাল দিচ্ছে বটে, কিন্তু কুরুরাজ্যের পরিচালক হিসেবে এতকাল যারা ভীষ্ম-বিদুরকে জানত তাঁদের কথা যে এখন আর দুর্যোধন-কর্ণরা মানছে না, সেটা তারা যেভাবে তোক বুঝতে পেরেছে এবং সেই জন্যই তারা পাণ্ডবদের সঙ্গে চলে যেতে চায় বনে। যুধিষ্ঠির এই প্রস্থানোদ্যত জনসমূহকে কোনওমতে নিরস্ত করলেন বটে, কিন্তু যাঁদের কথা বলে তাঁদের আশ্বস্ত করলেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান কিন্তু সেই ভীষ্ম এবং বিদুরই, অর্থাৎ এখনও তাঁরা কুরুরাজ্যের মানুষকে ধর্ম এবং ন্যায়ের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। কুরুরাজ্যের ব্রাহ্মণসমাজের মধ্যে অনেকেই অবশ্য যুধিষ্ঠিরের অনুরোধ উপরোধ না মেনে তাঁর সঙ্গেই বনে চলে গেলেন। সমাজমুখ্য ব্রাহ্মণদের এই প্রস্থান তথা প্রজাদের বিরুদ্ধ মনোভাব লক্ষ করে ধৃতরাষ্ট্র কিন্তু ভীষণ

আশঙ্কিত হলেন, আর আশঙ্কার কারণ ঘটলেই তো তখন বিদুরের ডাক পড়ে, কেননা বিপন্ন অবস্থাতেও তিনি ন্যায়নীতির সঠিক পথ নির্দেশ করতে পারেন এবং তাঁর রাজনৈতিক বুদ্ধিও অসাধারণ—ধর্মাত্মানং বিদুরম গাধবুদ্ধিং/সুখাসীনো বাক্যমুবাচ রাজা।

ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে সামনাসামনি খুব প্রশংসা করলেন। বললেন—তোমার রাজনীতির বুদ্ধি শুক্রাচার্যের মতো প্রখর, ন্যায়নীতির সূক্ষ্ম তত্ত্বও তুমি জানো। সবচেয়ে বড় কথা—কৌরব এবং পাণ্ডবদের ওপর সমদৃষ্টি আছে। অতএব এ অবস্থায় আমাদের দুই পক্ষেরই কীসে হিত হয়, সেটাই এবার বলো—সমশ্চ ত্বং সম্মতঃ কৌরবাণাং/পথ্যঞ্চৈষাং মম চৈব ব্রবীহি। তা হলে দেখা যাচ্ছে—স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্র, যিনি বিদুরের বিপক্ষ বলেই পরিচিত, সেই ধৃতরাষ্ট্র এটা মানেন যে, কৌরব-পাণ্ডবদের প্রতি বিদুরের সমদৃষ্টি আছে। তা হলে প্রশ্ন ওঠে—তিনি তো প্রত্যক্ষভাবে কৌরবদের প্রতিপক্ষতা আচরণ করেন, সেখানে তাঁকে সমদৃষ্টি বলি কী করে? উত্তরে বলতে হয়—তিনি কৌরবপক্ষের প্রতিপক্ষতা করেন না। কেননা তিনি নিজেও কৌরব। বরঞ্চ কৌরবদের মর্যাদা যাতে অক্ষুন্ন থাকে, তিনি সেই জন্য দুর্যোধন-কর্ণের অন্যায় অসভ্যতার প্রতিবাদ করেন। আরও একটা বলতে হবে মহাভারতের শান্ত রসের সরসতায়। মহাভারতে এই একটু আগেই শৌনক ঋষি বনগমনোদ্যত যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন—কোনও কারণে বিষয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ-ব্যবধান তৈরি হলেই সেই মানুষকে ত্যাগী বলা যায় না, যিনি সংসার-বিষ বিষয়ের মধ্যে থেকেও বিষয়ের দোষ দেখতে পান, তিনিই প্রকৃত ত্যাগী, তাঁর কোনও শত্রু নেই, কারও কাছে তাঁর কোনও পাওয়ার আশাও নেই—বিরাগং ভজন্তে জন্তুর্নির্বৈরঃ নিষ্পরিগ্রহঃ।

বিদুর ঠিক এইরকম, ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন বলেই তাঁর বিষয়-তৃষ্ণার দোষটুকু তিনি দেখিয়ে দেন, কারণ সে দোষ তিনি জানেন। ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বা তাঁর পুত্রদের প্রতি তিনি কোনও ব্যক্তিগত শত্রুতা পোষণ করেন না, কিন্তু রাজার সংসারে আছেন বলেই রাজধর্ম অনুসারে তিনি বিষয়াসক্তির অন্যায় অসদ্ভাবনাটুকু প্রকট করেছেন। দুর্যোধন কর্ণ শকুনিকে তিনি বারংবার তিরস্কার করেছেন কুরুবংশের সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য। বিদুরের এই হিতবুদ্ধি এবং সমভাব ধৃতরাষ্ট্রও সাময়িকভাবে বোঝেন বটে, কিন্তু দুরন্ত স্নেহান্ধতায় বিদুরকে ভুল বুঝতেও তাঁর দেরি হয় না।

এই এখনই ধৃতরাষ্ট্র যখন বিদুরের সমদৃষ্টির প্রশংসা করে তাঁর কাছে কর্তব্য জানতে চাইলেন, তখন বিদুর বললেন—দেখুন মহারাজ! ধর্ম এবং নৈতিকতা হল রাজধর্মের মূল কথা। শকুনির মতো দুষ্ট লোকেরা রাজসভার মধ্যে যুধিষ্ঠিরকে প্রতারিত করার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মকেও প্রতারিত করেছে—স বৈ ধর্মো বিপ্রলব্ধঃ সভায়াম্। আপনার ছেলে দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে রাজসভায় ডেকে এনে পাশাখেলায় প্রতারিত করেছে। আপনার এই অন্যায়ের শোধন কী হবে আমি জানি না। তবে আপনি আগে যেমন পাণ্ডবদের রাজ্য এবং ধনসম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, এখনও তাই করতে পারেন। পাশাক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে প্রতারণা করে এবং পাণ্ডবদের ধর্মপত্নীকে রাজসভায় নিগৃহীত করার ফলে যে অন্যায় ঘটে গেছে, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র রাস্তা হল শকুনিকে অপমান করে যুধিষ্ঠিরের সন্তুষ্টি বিধান করা।

বিদুর তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের অস্ত্রনৈপুণ্য এবং ভীমের শক্তির কথাও বললেন খুব করে। বোঝাতে চাইলেন যে, এই শক্তির কাছে কৌরবদের শক্তি ম্লান হয়ে যাবে। সবার শেষে বললেন—ভাল কথা যদি শোনেন মহারাজ! তা হলে দুর্যোধন শকুনি কর্ণকে বলুন পাণ্ডবদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে। আর দুঃশাসন যেহেতু রাজসভার মধ্যে দ্রৌপদীকে অপমান করেছিল, তাই তাকে রাজসভার মধ্যেই দ্রৌপদীর কাছে ক্ষমা চাইতে বলুন। ভীম তার বুক চিরে রক্ত খাবে বলেছে, তার ক্ষমা চাইতে বলুন দুঃশাসনকে—দুঃশাসনো যাচতু ভীমসেনং/

সভামধ্যেদ্রুপদস্যাত্মজাঞ্চ।

ভণিতাহীন চাঁছাছোলা এমন বক্তব্য শুনে ধৃতরাষ্ট্র ক্রোধে ফেটে পড়লেন। বিদুর বলেছিলেন—আপনি জিজ্ঞাসা করলেন তাই এসব না বলে পারলাম না, মহারাজ—ত্বয়া পৃষ্টঃ কিমহমন্যদ্ বদেয়ম্—কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের এত রাগ হয়েছে যে, তিনি এখন ভাবছেন—কেন এসব জিজ্ঞাসা করলাম বিদুরকে। ধৃতরাষ্ট্র ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন—তুমি সেই পাশাখেলার সময়েও ঠিক এই কথাগুলোই বলেছিলে এবং এখনও একই কথা বলছ। তাতে পাণ্ডবদের ভাল হবে বটে, কিন্তু আমার ছেলেদের মোটেই এতে ভাল হবে না। আমি বেশ বুঝতে পারছি—তুমি পাণ্ডবদেরই ভাল চাও, কিন্তু আমার ভাল মোটেই চাও না। তুমি কী করে ভাবছ যে, পাণ্ডুদের জন্য আমি নিজের ছেলেকে ত্যাগ করব—তেনাদ্য মন্যে নাসি হিতো মমেতি/কথং হি পুত্রং পাণ্ডবার্থে ত্যজেয়ম্? আমি জানি—তুমি এখনই বলবে যে, পাণ্ডবরাও তো আপনারই ছেলে! হ্যাঁ আমি মানি পাণ্ডবরাও আমারই ছেলে, কিন্তু দুর্যোধন যে আমার শরীর থেকে জন্মেছে। সমদৃষ্টির কথা যতই বল—পরের ছেলের জন্য নিজের শরীরস্বরূপ নিজের ছেলেটাকে ফেলে দেব, এও কি হয়—স্বং বৈ দেহং পরহেতোস্ত্যজেতি/ কো নু ব্রূয়াৎ সমতামন্ব বেক্ষ্য। এমন কথা একমাত্র তুমিই বলতে পার।

অন্যায়-আচরণকারী পুত্রকে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে যাঁরা মাথায় তোলেন, তাঁদের কথাবার্তা ঠিক এইরকমই হয়। ধৃতরাষ্ট্র বলেছেন—বিদুর আগে যে কথা বলেছিলেন দুর্যোধনকে, এখনও সেই কথা বলেছেন; কিন্তু আশ্চর্য হল রাজসভার মধ্যে দুর্যোধন তাঁকে যে অপবাদ দিয়ে অপমান করেছিলেন, আজ ধৃতরাষ্ট্র নিজে সেই অপমানটি করলেন বিদুরকে। বললেন—আমি তোমাকে অনেক সম্মান দিয়েছি বিন্দুর, আর নয়। তুমি এই কুরুবাড়িতে থাকতেও পার, অথবা যেখানে ইচ্ছে চলেও যেতে পার; তবে তোমার অবস্থাটা হয়েছে ছেনাল মেয়েছেলের মতো। যতই ভাল কথা বল, সে স্বামীর কাছে থাকে না—যথেচ্ছকং গচ্ছ বা তিষ্ঠ বা ত্বং/সুসান্ত্ব্যমানা হ্যসতী স্ত্রী জহাতি।

এত খারাপ কথা একমাত্র দুর্যোধন ছাড়া আর কেউ বিদুরকে বলেননি। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁর দাদা, তিনি তাঁকে বাড়ি থেকে এইভাবে তাড়িয়ে দেবেন, এটা বিন্দুর স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। শেষ কথাটা বলে ধৃতরাষ্ট্র যেভাবে আসন থেকে উঠে ঘরে চলে গেলেন তাতে তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয়বার তর্কযুক্তি দিয়ে কোনও কথা বলার ইচ্ছে বিদুরের হল না। ভীষণভাবে অপমানিত হয়ে তিনি হস্তিনাপুর ছেড়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে বনেই থাকবেন বলে ঠিক করলেন এবং একটি রথে করে রওনা হয়ে চলে এলেন কাম্যকবনে, যেখানে পাণ্ডবরা তাৎক্ষণিক আস্তানা তৈরি করেছিলেন—জগামৈকরথেনৈব কাম্যকং বনমৃদ্ধিমৎ।

হঠাৎ করে এই সময়ে বিদুরের পক্ষে বনে চলে আসাটা একেবারেই অস্বাভাবিক ছিল। সরলমতি যুধিষ্ঠির তো দূর থেকে বিদুরের ক্লিষ্ট দীর্ণ চেহারা দেখে একটু ভয় পাচ্ছিলেন। ভাবছিলেন—আবার শকুনি তৃতীয় দফা পাশা খেলতে ডাকছে না তো! এখন তো সম্পত্তির মধ্যে আছে শুধু অস্ত্রগুলি। তো শকুনি যদি এখন বাজি রেখে অর্জুনের গাণ্ডীব ধনুকটাই জিতে নেয়, তা হলে এরপরে কী করবেন তিনি? বিদুর পাণ্ডবদের সামনে এসে পড়ার পরেই অবশ্য সমস্ত চিন্তা কেটে গেল। ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বিদুর যে দুর্ব্যবহার পেয়েছেন, তা সবিস্তারে যুধিষ্ঠিরকে জানিয়ে বললেন—ধৃতরাষ্ট্র আমাকে নিজেই মন্ত্রণার জন্য সসম্মানে ডেকে এনে হিতের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কিন্তু ভাল কথা তাঁর ভাল লাগল না। রোগীর যেমন ওষুধ খেতে ভাল লাগে না, কুমারী মেয়ে যেমন বুড়ো বর পছন্দ করে না, তেমনই ভাল কথায় তাঁর রুচি নেই। এই ধৃতরাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য আমি কম উপদেশ দিইনি, কিন্তু পদ্মপাতায় যেমন জল তিষ্ঠোতে পারে না, তেমনই ধৃতরাষ্ট্রের মনেও হিতোপদেশ স্থিরভাবে স্থান পায় না। নইলে এমন হয়, তিনি রাগ করে আমাকে বললেন—যে পাণ্ডবদের তোমার

অত ভাল লাগছে, তুমি সেইখানে যাও—যস্মিন্ শ্রদ্ধা ভারত যাহি তত্র। আমি তাই চলেই এসেছি। বিদুর ভুলতে পারছেন না ধৃতরাষ্ট্রের তিরস্কার। ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে বলেছেন—রাজ্য কিংবা রাজধানী রক্ষা করার জন্য আর বিদুরকে সহায় হিসেবে প্রয়োজন নেই। সেই পাণ্ডুর রাজা হবার সময় থেকে এতকাল তিনি কুরুসভার মন্ত্রী। কুরুদের ভাল ছাড়া, মন্দ কোনও দিন চিন্তা করেননি। আজ যখন ধৃতরাষ্ট্রের সহায়তার প্রয়োজন নেই, তখন বিদুর প্রত্যক্ষভাবে যুধিষ্ঠিরকেই মন্ত্রণা দিয়ে সহায়তা করবেন। এতকাল ধৃতরাষ্ট্রের জন্যই যা তিনি পারেননি, এবার তাই করবেন তিনি। বিদুর বলতে আরম্ভ করলেন—সব মনে আছে তো যুধিষ্ঠির? নাকি আবারও বলব—তৎ প্রবক্ষ্যামি ভূয়ঃ।

বিদুর বলতে আরম্ভ করলেন রাজনীতির কথা, বিশেষত কীভাবে থাকলে, কী আচরণ করলে, অন্যান্য মানী রাজাদের সহায় হিসেবে পাওয়া যায়, বিদুর বলতে লাগলেন সেইসব রাজনৈতিক সিদ্ধির কল্পগুলি। যুধিষ্ঠির তো অত্যন্ত খুশি হলেন। বিপদের সময় আলোচনার জন্য কাউকেই পান না তিনি। বিদুরের মতো এমন অভিজ্ঞ মানুষ যদি মন্ত্রণা দেবার জন্য তাঁর কাছেই থাকেন, তবে তো ভবিষ্যতে তাঁর অনেক সুবিধে, বিশেষত সমস্ত বিষয়েই বিদুরের সঙ্গে তাঁর মত মেলে। বিদুরের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে যেহেতু রাজনৈতিক নৈতিকতার সংযোগ আছে, তাই তাঁর উপদেশ স্থায়ী ফল প্রসব করে। নীতিধর্মের পক্ষপাতী বলে বিদুর অহিংসার ব্রত গ্রহণ করে সাধু হয়ে বসে আছেন এমন নয়। সময়কালে যুদ্ধও যে ধর্মে পরিণত হয়, সে কথা তাঁর মতো করে কেউ বোঝে না। কিন্তু সেই যুদ্ধকে তিনি হঠকারিতার পথে আসতে দেবেন না। যতদূর সম্ভব ক্ষমার দ্বারা যুদ্ধকে তিনি দূরান্বিত করার উপদেশ দেন, কিন্তু সেই কাল প্রতীক্ষার মধ্যে রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করা—ক্ষমাং কুর্বন্ কালমুপাসতে যঃ—এবং পররাষ্ট্রীয় রাজাদের আপন অনুকূলে নিয়ে আসাটাকে তিনি রাজনীতির অন্যতম অঙ্গ বলে মনে করেন।

বিদুর যখন কাম্যক বনে যুধিষ্ঠিরের সহায়তার কাজে নিযুক্ত হবেন বলে ভাবছেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই হস্তিনাপুরের রাজা ধৃতরাষ্ট্র কিন্তু গম্ভীর চিন্তিত মুখে ডেকে পাঠালেন দূত সঞ্জয়কে। বিদুর কাম্যক বনে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, এ খবর তাঁর কাছে চলে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল—পররাষ্ট্র নীতি এবং কূটনীতিতে বিদুরের মতো অভিজ্ঞ লোক দ্বিতীয় নেই। পাশাখেলা এবং দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ নিয়ে যা তাঁর রাজসভায় ঘটেছে, সেই ঘটনাবলী শুধু সঠিকভাবে বিবৃত করেই বিদুর তাঁর বাগ্মিতা এবং নৈতিকতার জোরে সমস্ত প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে পাণ্ডবদের অনুকূলে নিয়ে আসতে পারেন। এ ক্ষমতা তাঁর আছে—বিদুরস্য প্রভাবঞ্চ সন্ধিবিগ্রহকারিতম্। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে তাড়িয়ে দেবার পরই অনুভব করলেন যে, বিদুর এই হস্তিনাপুরে বসে থাকলে তাঁর মত না মানলেও কিছু তাঁর আসত যেত না। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক সূক্ষ্মবুদ্ধি যদি পাণ্ডবদের কাজে লাগে, তবে তো ভবিষ্যতে তাঁদের প্রতিরোধ করা অত্যন্ত কঠিন হবে—বিবৃদ্ধিং পরমাং মত্বা পাণ্ডবানাং ভবিষ্যতি। বিদুরের বিষয়ে বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রের দুশ্চিন্তা এমন পর্যায়ে উপস্থিত হল যে প্রাত্যহিক রাজসভার কাজে যোগ দিতে গিয়ে সভার দরজার মুখেই উপস্থিত রাজন্যবর্গের সামনে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

সংজ্ঞা ফিরে আসার পর তিনি সূত সঞ্জয়ের কাছে কাকুতিমিনতি করে বললেন—আমার ভাই বিদুরকে তুমি এই মুহূর্তে ফিরিয়ে আনো। আমার মনে অনেক পাপ আছে বলেই আমি আমার ভাইকে অনেক কটু কথা বলে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছি। আমি যা করেছি, তাতে সে এখনও বেঁচে আছে কিনা কে জানে—যদি জীবতি রোষেণ ময়া পাপেন নির্দ্ধূতঃ। ধৃতরাষ্ট্র বিদুর সম্বন্ধে অনেক প্রশংসা করলেন। তিনি জ্ঞানী এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান, কোনও দিন তিনি ধৃতরাষ্ট্রের অপ্রিয় আচরণ করেননি—ইত্যাদি অনেক ভাল ভাল কথা বলে সঞ্জয়কে ধৃতরাষ্ট্র আদেশ দিলেন বিদুরকে ফিরিয়ে আনার জন্য। এমন কথাও বললেন যে, বিদুরকে ছাড়া

তিনি বাঁচবেন না।

ধৃতরাষ্ট্রের এই স্নেহব্যক্তির মধ্যে বিদুরের প্রতি স্নেহটা তাঁর কতটা সত্য, তা ধারণা করা মুশকিল। হয়তো থাকলেও কিছু থাকতে পারে। আজকের সম্বন্ধ তো নয়। সেই কবে থেকে তিনি কুরুসভার মন্ত্রী। তার ওপরে ভাই বটে। কাজেই কিছুটা স্নেহ তাঁর নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি যে বিদুরের কথা এত স্মরণ করছেন, সেটা প্রধানত পাণ্ডবদের কারণে। পররাষ্ট্র নীতি সম্বন্ধে বিদুরের অতি সূক্ষ্মবোধ শেষে পাণ্ডবদের উপকারে না লাগে, সেই জন্যই বিদুরকে ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যস্ত হলেন ধৃতরাষ্ট্র। বিদুর পাণ্ডবদের হয়ে কথা বলেন বলে তাঁর ওপরে ধৃতরাষ্ট্রের বিদ্বেষ আছেই। সেই বিদ্বেষকে স্নেহরূপে প্রতিপাদন করার জন্যই তিনি রাজাদের সামনে সভার দ্বারে পড়ে গিয়েই আবার উঠলেন! এটা নাটক। নীলকণ্ঠের মতো গম্ভীর টীকাকার পর্যন্ত এই নাটক ধরে ফেলে লিখেছেন—বিদুরের প্রতি বিদ্বেষটাকে স্নেহের নাটকে দেখাবার জন্যই তিনি সভাদ্বারে রাজাদের সামনে পড়ে গিয়ে আবার উঠে বলতে লাগলেন—বিদুর আমার ভাই, বিদুরই আমার বন্ধু—দ্বেষমেব স্নেহরূপেন নাটয়িতুং সভাদ্বারে রাজ্ঞাং সমক্ষং পতিত্বোত্থায় আহ—ভ্রাতেতি।

যাই হোক, ধৃতরাষ্ট্রের দূত সঞ্জয় এসে যখন ধৃতরাষ্ট্রের পশ্চাত্তাপের কথা শোনালেন বিদুরকে, তখন বিদুরও যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবারও ফিরে এলেন হস্তিনায়। তা হলে কি বিদুরও নাটক করলেন? আমরা বলব—বিদুরের নাটক করার দরকার নেই। তিনি আগেও যা বলেছেন, এখনও তাই বলছেন। বিদুর হস্তিনায় ফিরে এলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। তাঁকে জড়িয়ে ধরে কোলে বসিয়ে, মস্তক আঘ্রাণ করে কটূক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন ধৃতরাষ্ট্র। বিদুরও বলেছেন—আপনি আমার বড় ভাই এবং পরম গুরুস্থানীয়। ক্ষমা আমি আগেই করেছি। কিন্তু কী জানেন, কৌরব-পাণ্ডবদের ওপর আমার সমভাব থাকলেও পাণ্ডবরা যেহেতু দুর্বল, এবং করুণ অবস্থায় পড়ে রয়েছেন, তাই তাঁদের প্রতি আমার মায়াটাও এখন বেশি হয়, আর বুদ্ধিটাও তাদের দিকেই যায়—দীনা ইতীব মে বুদ্ধিরভিপন্নাদ্য তান্ প্রতি।

দুই ভাই আপাতত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি নিলেন বটে, কিন্তু বিদুরের অন্তর্গত ক্ষোভও এতে দূরীভূত হল না, ধৃতরাষ্ট্রও কিছু শোধরালেন না। বিদুর যে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে অত অপমানিত হয়েও ধৃতরাষ্ট্রের এক ডাকেই হস্তিনায় ফিরে এলেন, তাঁর একটা কারণ অনুমান করা যায়। দ্বিতীয়ত বারংবার তাঁকে অপমান করা সত্ত্বেও যে তিনি উচিত কথাটিই বলেন, তার নিদানটাও লুকিয়ে আছে ওই কারণের মধ্যেই। মনে রাখা দরকার, পাণ্ডু যখন রাজ্য ত্যাগ করে দুই স্ত্রীকে নিয়ে শতশৃঙ্গ পর্বতে চলে যান, তখন রাজ্যের সমস্ত কার্যনির্বাহ করার জন্য তিনি কিন্তু একা ধৃতরাষ্ট্রের ওপরেই সমস্ত ভার দিয়ে যাননি। এ ভার অনেকটা বিদুরের ওপরেও ন্যস্ত ছিল। সেই উদ্যোগপর্বে যুদ্ধের আগে গুরু দ্রোণাচার্য দুর্যোধনকে অনেক কথার মধ্যে বলেছিলেন যে, পাণ্ডু তাঁর রাজ্যটা শুধু ধৃতরাষ্ট্রের হাতেই দিয়ে যাননি, সমস্ত রাজকার্য নির্বাহের ভার তিনি ধৃতরাষ্ট্রকেও দিয়েছেন, বিদুরকেও দিয়েছেন—বিসৃজ্য ধৃতরাষ্ট্রায় রাজ্যং স বিদুরায় চ।

যুক্তিটা খুব সোজা। অন্ধত্বের জন্য ধৃতরাষ্ট্র রাজা হননি, শূদ্রাগর্ভজাত বলে বিদুরও রাজা হননি। রাজা হয়েছেন পাণ্ডু। কিন্তু পাণ্ডু যখন থাকছেন না, তখন রাজকার্য নির্বাহের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রের যতটুকু দাবি আছে, কনিষ্ঠ বিদুরেরও ততটুকুই দাবি আছে। ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যলোভ ছিল, ফলে তিনি নিজেকে পুরোপুরি রাজা বলে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন এবং বিদুর তা একটুও করেননি বলে প্রজারাও সাময়িকভাবে ধৃতরাষ্ট্রকে পাণ্ডুর মতোই মেনে নিয়েছে। কিন্তু রাজকার্যের ক্ষেত্রে যে দুটি বিভাগ সবচেয়ে জরুরি সে দুটিই সামলাতেন বিদুর। প্রথম বিভাগটি হল অর্থ এবং দ্বিতীয়টি হল সমস্ত বিভাগীয়

রাজকর্মচারীদের চালানো। রাজ্যশাসনের আর বাকি থাকল কী। কিন্তু বড় দায়িত্ব বিদুর সামলাতেন প্রশাসনিক দায়বদ্ধতায়। তিনি রাজা বলে নিজেকে কোনও দিন জাহির করতে চাননি। কিন্তু জাহির না করলেও রাজ্যের ওপর হকটা যে তাঁর ধৃতরাষ্ট্রের মতোই, সে কথা দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারীও রাজসভার মধ্যে তাঁর পুত্র দুর্যোধনকে শুনিয়েছিলেন। বলেছিলেন—পাণ্ডুর অবর্তমানে এই কুরুরাজ্য শাসন করার ভার পড়ে ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুরের ওপর—রাজ্যে স্থিতো ধৃতরাষ্ট্রো মনীষী তস্যানুজো বিদুরো দীর্ঘদর্শী—এই দুইজনের এই রাজ্য তুই চাস কী করে, দুর্যোধন!

আশ্চর্যের কথা হল, অন্যেরা যতই বলুন, বিদুর নিজেকে কোনও দিনই ধৃতরাষ্ট্রের মতো রাজা মনে করেননি। কিন্তু রাজকার্য নির্বাহের ক্ষেত্রে এইটুকু সচেতনতা তাঁর ছিল যে, তিনি কারও অর্থপুষ্ট নন, যার জন্য তাঁকে দুর্যোধন-কর্ণকে তোষামোদ করে চলতে হবে। ঠিক এই সচেতনতা থাকার জন্যই দুর্যোধন এবং ধৃতরাষ্ট্রের দ্বারা চরম অপমানিত হয়েও তিনি রাজ্য ছেড়ে চলে যাননি এবং ধৃতরাষ্ট্রকে একটু ভাবিয়ে তুলেই আবার তিনি ফিরে এসেছেন হস্তিনাপুরে, যেন এটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু রাজ্যে ফিরে এলেও বিদুর নিজেকে একটু সংযত করলেন। তিনি এখন বুঝে গেছেন যে, বনবাস থেকে পাণ্ডবরা ফিরে আসার পর ভয়ংকর কিছু ঘটবে এবং সেই দুঃখে তিনি খানিকটা স্তব্ধ হয়ে গেলেন। স্তব্ধ হওয়ার কারণ আরও অবশ্য ছিল। বিদুর সকৌতুকে লক্ষ করলেন যে বনবাসে থাকা সত্ত্বেও পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে দুর্যোধনের চক্রান্তগুলি বন্ধ হয়নি এবং ধৃতরাষ্ট্র তো তাঁকে বাধা দিচ্ছেনই না, এমনকী ভীষ্ম দ্রোণও তেমন করে কিছু বলছেন না ধৃতরাষ্ট্রকে।

বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে আগে অনেক বলেছেন, অন্যায় কাজ করতে বহুবার না করেছেন, কিন্তু এখন আর বলছেন না। এর পিছনে তাঁর একটা নিজস্ব নীতি আছে। ভবিষ্যতে ধৃতরাষ্ট্র আবার তাঁকে ডেকে পাঠাবেন যুদ্ধের আগে। সেখানে তাঁকে নানা কথা বলবার সময় বিদুর একবার মূর্খের লক্ষণ উচ্চারণ করে বলেছিলেন—না ডাকলেও যে এমনিই এসে উপস্থিত হয় এবং না জিজ্ঞাসা করলেও যে বেশি উপদেশ দেওয়ার চেষ্টা করে—অনাহূতঃ প্রবিশতি অপৃষ্টো বহু ভাষতে—তেমন লোককেই মূর্খ বলে। বিদুর সেই মূর্খতাটুকু প্রকাশ করতে চাননি। এর আগে একমাত্র দ্যূতসভায় পাশাখেলা এবং দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের অস্বাভাবিক সময় ছাড়া তিনি নিজে কখনও ধৃতরাষ্ট্রকে কিছু বলেননি। ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলে অবশ্যই তিনি সদুপদেশ দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এখন তিনি দেখছেন, ধৃতরাষ্ট্রকে ভাল কথা বলে কোনও লাভ নেই।

আরও একটা বড় অভিমানও তাঁর মনে কাজ করে। তিনি বোঝেন যে, কুরু-পাণ্ডবের এক পিতামহ ভীষ্ম এবং কুরু-পাণ্ডবের এক আচার্য দ্রোণ তাঁর সমস্ত কথাগুলি মনে মনে সমর্থন করলেও বাইরে সেটা পরিষ্কার করে বলতে পারেন না। হয়তো এর পিছনে আর্থিক দায়বদ্ধতাই কারণ। ভবিষ্যতে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের সময় নৈতিকভাবে পাণ্ডবদের সমর্থন করার সময়েও তাঁরা ধৃতরাষ্ট্র-চালিত কুরুরাজ্যের অর্থপুষ্ট বলে কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন এবং অর্থই যে এই পক্ষ গ্রহণের কারণ, সেকথা তাঁরা স্বকণ্ঠে বলেওছেন। যেভাবেই হোক বিদুর তাঁদের এই দৃষ্টিভঙ্গি আগেই বুঝেছেন যে, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপরা কোনওভাবেই তাঁর মতো করে প্রতিবাদ করবেন না। যদি করতেন, তা হলে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের কালই সে বিষয়ে সবচেয়ে উপযুক্ত কাল ছিল। কুরুবৃদ্ধদের এই উদাসীনতার নিরিখে এবং নিজের মর্যাদা নিজেই রাখবার জন্য পাণ্ডবদের সম্পূর্ণ বনবাস কালের সময় বিদুর কিচ্ছুটি ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন না। বনবাসের শেষে পাণ্ডবরা যখন অজ্ঞাতবাসে, তখন দুর্যোধন-কর্ণরা হন্যে হয়ে পাণ্ডবদের খোঁজার পরিকল্পনা করলেন। ঠিক এই সময়েই বিরাটরাজার শালা কুখ্যাত বীর কীচকের মৃত্যুর খবর পাবার পর বিরাটরাজার গোধন-হরণের প্রস্তাব নিয়ে সভা বসল রাজসভায়। বিদুর এ সভায় যোগদান করেননি, কারণ এই অন্যায়ে

তিনি শামিল হতে চাননি। কিন্তু তিনি সবিস্ময়ে লক্ষ করলেন—ভীষ্ম-দ্রোণেরা যেকোনও কারণেই হোক, হয়তো কৌরবদের প্রভাব বিস্তারই তাঁদের মনে ছিল, কিন্তু সেই প্রভাব বিস্তারের জন্য প্রতিবেশী রাজার গোশালা থেকে গোরু ধরে আনবার জন্য ভীষ্ম-দ্রোণেরা দুর্যোধনের সঙ্গে বিরাটরাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চললেন, এটা বিদুর মানতে পারেননি মনে মনে। এতে ভীষ্ম দ্রোণের ওপর তাঁর অভিমান বাড়ছিল।

যাই হোক, বিরাটরাজার সঙ্গে কৌরবদের যুদ্ধের প্রধান ফল যেটা হয়েছিল, সেটা হল দীর্ঘ বনবাস এবং অজ্ঞাতবাসের পর পাণ্ডবরা আবিষ্কৃত হলেন। বৃহন্নলাবেশী অর্জুন যখন উত্তর-সারথি হয়ে বিরাটরাজার গোধন মুক্ত করতে এসেছিলেন, তখন দুর্যোধনের বন্ধু কর্ণ প্রচুর অহংকার করে বলেছিলেন যে তিনি একাই দেখে নেবেন অর্জুনকে। আচার্য দ্রোণ এবং কৃপ অর্জুনের অস্ত্রনৈপুণ্যের প্রশংসা করলে কর্ণ তাঁদের কথা একেবারে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করতে এসে এবং অর্জুনের বিপক্ষে দাঁড়িয়েও দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সেদিন কর্ণকে একহাত নিয়েছিলেন। অর্জুনের সামনে কর্ণ যে দাঁড়াতে পারবেন না, এই শুধু নয়, অশ্বত্থামা সেদিন কর্ণ-দুর্যোধনের সমস্ত অন্যায়গুলি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। বিশেষত দ্রৌপদীকে রাজসভায় টেনে আনার ফলে যে অন্যায় ঘটেছিল, সেই অন্যায়ের পরিণতি যে কর্ণ-দুর্যোধনকে শেষ করে ফেলবে, এ সম্বন্ধে সেই মুহূর্তে বিদুরের ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের—কর্ম কারয়িথাঃ সূত তত্র কিং বিদুরো'ব্রবীৎ।

বেশ বোঝা যায়, বিদুরের কথা গ্রাহ্য হোক বা না হোক, তাঁর কথার মূল্য অনেক। অন্তত তাঁর ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টি নিয়ে কেউ প্রশ্ন করে না। কিন্তু পাণ্ডবরা সেই বনে যাবার পর থেকে এই অজ্ঞাতবাসের কাল শেষ হওয়া পর্যন্ত বিদুর কোনও কথাই প্রায় বললেন না ধৃতরাষ্ট্রকে। বিরাটরাজ্যে পাণ্ডবরা আবিষ্কৃত হয়েছেন, অর্জুনপুত্র অভিমন্যুর সঙ্গে বিরাটকন্যা উত্তরার বিয়ে হয়ে গেল এবং বিরাটরাজ্যে পাণ্ডবদের মিত্রশক্তি বৃষ্ণি যাদব পাঞ্চালরা পাণ্ডবদের ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা সভায় বসলেন। দ্রুপদের পুরোহিত পাণ্ডব এবং তাঁদের মিত্রশক্তির বক্তব্য পৌঁছে দিলেন ধৃতরাষ্ট্রের সভায়। সেই সভাতেও পাণ্ডবদের হৃতরাজ্য ফিরিয়ে দেবার জন্য আমরা ভীষ্মকে কথা বলতে দেখছি, কিন্তু বিদুরকে কথা বলতে দেখছি না। পালটা কূটনৈতিক চাল হিসেবে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে যুধিষ্ঠিরের কাছে পাঠালেন শান্তির প্রার্থনায়, যদিও পাণ্ডবদের হৃতরাজ্য ফিরিয়ে দেবার ব্যাপারে ধৃতরাষ্ট্র কোনও অঙ্গীকারই করেননি।

সরলমতি যুধিষ্ঠির পর্যন্ত ধৃতরাষ্ট্রের এই কূটনৈতিক চাল ধরে ফেলেছেন। সূত-দূত সঞ্জয়ের কাছে তিনি অসহিষ্ণুতা ব্যক্ত করে বলেছেন—সমস্ত ঐশ্বর্য নিজের করায়ত্ত করে 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই' বলে মৌখিক মহানুভবতা প্রকাশ করলেই তো হল না—আপ্তৈশ্বর্য্যো ধৃতরাষ্ট্রো'দ্য রাজা/ লালপ্যতে সঞ্জয় কস্য হেতোঃ। যুদ্ধ কেউ চায় না সঞ্জয়। কিন্তু তিনি তো তাঁর ছেলেদের সংযত করেননি। যুধিষ্ঠিরের এইকথা প্রসঙ্গে বার বার মহামতি বিদুরের কথা এসেছে। যুধিষ্ঠির বলেছেন—যখন ওইরকম অন্যায় পাশাখেলা আরম্ভ হয়েছিল, তখন বিদুর রাজনীতিবিদ শুক্রাচার্যের বচন উল্লেখ করে সেই পাশাখেলা বন্ধ করতে বলেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা সেসব কথা কীভাবে নিয়েছিল? যতদিন ধৃতরাষ্ট্র এবং অন্যেরা বিদুরের বুদ্ধিমতন চলেছেন, ততদিন কুরু রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি ঘটেছে, কিন্তু যেদিন থেকে তাঁরা বিদুরের বুদ্ধি এবং নীতি প্রত্যাখ্যান করেছেন, সেদিন থেকেই সমস্ত বিপদ এসে ভর করেছে তাঁদের ওপর—ক্ষত্তুর্যদা নান্ববর্তন্ত বুদ্ধিং/কৃচ্ছ্রং কুরূন্ সূত তদাভ্যাজগাম। সমস্ত হিতৈষিণী আলোচনার মধ্যে বিদুর যেসব বাস্তব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ধৃতরাষ্ট্রকে, তাতে যে ধৃতরাষ্ট্র ক্ষুব্ধ হয়ে বিদুরকে বাড়ি থেকে বার করেও দিয়েছিলেন, সে কথাও যুধিষ্ঠির উল্লেখ করতে ভুললেন না—প্রব্রাজিতে বিদুরে দীর্ঘদৃষ্টৌ।

দূত সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের কথা নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যুধিষ্ঠিরকে। যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের শান্তি প্রস্তাবকে আন্তরিকতাহীন মৌখিকতা বলে বুঝতে পারলেও ধৃতরাষ্ট্রের কোনও কটু সমালোচনা করতে পারলেন না। কিন্তু কৃষ্ণের তো আর সে ভয় নেই! তিনি ধৃতরাষ্ট্রের পূর্ব ব্যবহারের সমস্ত ইতিহাস বলতে বলতে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। অবধারিতভাবে দ্রৌপদীর সেই অপমানের প্রসঙ্গ এল, এবং সেই প্রসঙ্গে বিদুরের প্রসঙ্গও। কৃষ্ণ বললেন—যেদিন ওই রাজসভার মধ্যে দুঃশাসন আমাদের সঙ্গে চরম শত্রুতা করে দ্রৌপদীকে টেনে নিয়ে এল ভাসুর শ্বশুরের সামনে, সেদিন একটা লোককেও সে নিজের পক্ষে পায়নি। একমাত্র বিদুর ছাড়া তার পক্ষে কথা বলার মতো একটি প্রাণীকেও সহায় হিসেবে পায়নি দ্রৌপদী—নান্যং ক্ষত্তুর্নাথম্ অবাপ কিঞ্চিৎ। বিদুর, একমাত্র বিদুর—অন্য সব লোক কোন দীনতায় চুপ করেছিলেন কে জানে! তাঁরা ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। একমাত্র বিদুর, একমাত্র বিদুরই সেদিন কৌরবদের নীতিধর্মের কথা বলেই শেষ করেননি, এই নীতির সঙ্গেই যে বৈষয়িক লাভ, রাজত্ব এবং নিজেদের জীবনও জড়িয়ে আছে, সেটা একমাত্র বিদুরই তাঁদের প্রতিবাদ করে বলেছিলেন —একঃ ক্ষত্তা ধর্মমর্থং ব্রুবাণো ধর্মাবুদ্ধ্যা প্রত্যুবাচাল্পবুদ্ধিম্। কৃষ্ণ বললেন—অতএব সঞ্জয়! বিদুর যে নীতিধর্মের কথা বলেছিলেন, সেই নীতিধর্ম পাণ্ডবদের উপদেশ না দিয়ে ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর পুত্রেরা নিজেরা বুঝলেই চলবে। আমরা যুদ্ধ চাই না, শান্তিই চাই, কিন্তু সেই শান্তির জন্য ধৃতরাষ্ট্রের যা করণীয়, সেইটে আগে করুন, পাণ্ডবদের রাজ্য তাঁদের ফিরিয়ে দিন। তা না করে 'শান্তি শান্তি' বলে কোনও লাভ নেই—যৎ কৃত্যং ধৃতরাষ্ট্রস্য তৎ করোতু নরাধিপঃ।

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের কাছে ফিরে আসবার আগে যুধিষ্ঠির বারংবার নিজেদের বৈপ্লবিক স্থিতি বুঝিয়ে দিয়েছেন। পুরাতন ইন্দ্রপ্রস্থ না দিন ধৃতরাষ্ট্র, পাঁচ ভাইয়ের জন্য পাঁচখানি গ্রাম অন্তত দিতেই হবে। নিজেদের স্থিতি বুঝিয়ে দিয়েই যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরের প্রত্যেকটি মানুষের কাছে তাঁর শুভেচ্ছা প্রেরণ করেছেন। দূত হিসেবে সঞ্জয়ের সার্থকতার প্রশংসা করে যুধিষ্ঠির তাঁকে দৌত্যকার্যে বিদুরের সমতুল্য বলে বর্ণনা করেছেন—ইহাগচ্ছেদ্ বিদুরো বা দ্বিতীয়ঃ। বেশ বোঝা যায়, সেই পাশাখেলার সময়ে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের প্রতিবাদ করেছিলেন বলেই ধৃতরাষ্ট্র আর তাঁকে দূত হিসেবে পাঠাননি। মনু মহারাজ এক জায়গায় লিখেছেন—পররাষ্ট্রের সঙ্গে ভাল মন্দ সম্পর্ক, সবটাই নির্ভর করে দূতের ওপর—দূতে সন্ধিবিপর্যযৌ। বিদুর এই কাজটি অসাধারণভাবে করতেন বলেই সন্ধিবিগ্রহিক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল চূড়ান্ত। লক্ষণীয়, প্রথম পাশা খেলতে ডাকবার সময়েও বিদুরই গিয়েছিলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। কিন্তু তারপর থেকে যা ঘটেছে, তাতে আর বিদুরকে বলবার মতো মুখ নেই ধৃতরাষ্ট্রের এবং বিদুরও খানিকটা গুটিয়ে নিয়েছেন নিজেকে। কিন্তু রাজসভায় সঞ্জয় যখন যুধিষ্ঠিরের কঠিন ভাষ্য শোনাবেন, তখন আর কেউ নন, বিদুর যাতে যুধিষ্ঠিরকে ভুল না বোঝেন, সেজন্য সঞ্জয়কে আলাদা করে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন—অগাধবুদ্ধি বিদুর আমাদের পছন্দ করেন, সেটা তাঁর নিজের গুণ, তিনি আমাদের পিতা, মাতা, গুরু, বন্ধু—সব। তাঁর কাছে বলো সঞ্জয়—আমরা যুদ্ধ চাই না, বলো যুধিষ্ঠির সকলের মঙ্গল চান—অযুদ্ধং সৌম্য ভাষস্ব হিতকামে যুধিষ্ঠিরে।

এই পরিস্থিতি যে হবে, বিদুর তা অনেক আগে থেকেই জানতেন। ধৃতরাষ্ট্রও যে জানতেন না, তা নয়। কিন্তু জানলেও তিনি পুত্রের স্বার্থত্যাগের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, কিংবা যুদ্ধ থামানোর অনুকূল কোনও পরিস্থিতি তৈরি করার জন্যও তিনি ব্যস্ত হননি। চাইলে এই তেরো-চোদ্দো বছর সময়ের মধ্যে বিদুরের সঙ্গে পজিটিভ কথা বলতেন ধৃতরাষ্ট্র এবং তারপর তাঁকেই দূত করে পাঠাতেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। অবশ্য দূত হিসেবে সঞ্জয়ও মোটেই খারাপ নন। তিনি যথেষ্টই নিরপেক্ষ, কারণ বস্তুর ঔচিত্যবোধই দূতের প্রকৃত গুণ। বিরাট নগরে পাণ্ডবদের সঙ্গে কথা বলে তিনি যখন হস্তিনাপুরে ফিরেছেন, তখন রাত হয়ে গেছে, এবং তিনি ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। কিন্তু সেই বিধ্বস্ত অবস্থাতেও—যখন সমস্ত বিস্তারিত

বিবরণ তিনি পরের দিন জানাবেন বলে অঙ্গীকার করছেন—সেই অবস্থাতেও সোৎকণ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি এটা বলতে ছাড়লেন না যে,—মহারাজ! আপনি স্নেহবশত আপনার পুত্রের অনুগামী হয়েই এই বংশের সর্বনাশ ঘটিয়েছেন। বলতে ছাড়লেন না—আপনি এতদিন তাঁদেরই মন্ত্রণা নিয়ে চলছেন, যাঁরা মন্ত্রণাকার্যে বিশ্বস্ত নন, আর তাঁদেরই আপনি চুপ করিয়ে রেখে দিয়েছেন, যাঁরা আপনাকে উচিত মন্ত্রণা দিতে পারতেন। ঠিক সেই জন্যই আজকে এই বিপাক এসে উপস্থিত হয়েছে আপনার সামনে—অনাপ্তানাং সংগ্রহাত্ ত্বং নরেন্দ্র/ তথাপ্তানাং নিগ্রহাচ্চৈব রাজন্।

সঞ্জয়ের এই সংক্ষিপ্ত তিরস্কারটুকু শুনেই ধৃতরাষ্ট্র বুঝেছেন যে, তাঁর শান্তি প্রস্তাবে মৌখিকতা পাণ্ডবরা প্রত্যাখ্যান করেছেন। আরও বিস্তারিত কী তিরস্কার তিনি পরের দিন শুনবেন, অথবা যে যুদ্ধের আশঙ্কা সকলে করছে, তাই শেষে ঘটবে কি না সেই ব্যাকুলতায় সেই রাত্রে তিনি একটুও ঘুমোতে পারলেন না। অবশ্য সঞ্জয়কে দৌত্যকর্মে নিযুক্ত করার পর থেকেই তাঁর ঘুম হয় না রাত্রিতে। কিন্তু আজকে তাঁর উৎকণ্ঠা বড় বেশি হচ্ছে। বহুদিন পরে আজ তিনি আবার বিদুরকে ডেকে পাঠালেন। জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞা পেয়ে বিদুর সঙ্গে সঙ্গে এলেন বটে কিন্তু বিনা অনুমতিতে ধৃতরাষ্ট্রের কক্ষে প্রবেশ করলেন না। কোথায় যেন একটু দূরত্ব অথবা সংকোচ এসেছে তাঁর মনে। দ্বাররক্ষক এসে ধৃতরাষ্ট্রকে জানাতে তিনি তাঁর ওপরে একটু বিরক্ত হয়েই বললেন—বিদুর আমার কাছে আসবে, তাতে কবে কখন আমার অসুবিধে হয়েছে হে—অহং হি বিদুরস্যাস্য নাকল্পো জাতু দর্শনে—যাও তাঁকে নিয়ে এসো এখনই।

বিদুর এলেন। বহুকাল পরে এমন কাতর আহ্বান শুনে উপস্থিত হলেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। কিন্তু এখন তিনি আর অযাচিত উপদেশ দেন না ধৃতরাষ্ট্রকে। এসেই বললেন—আপনার আদেশ শুনে এসেছি, মহারাজ! আমার যদি কোনও করণীয় থাকে তো আজ্ঞা করুন মহারাজ! ধৃতরাষ্ট্র একটুও ভণিতা না করেই বিদুরকে বললেন—জান তো সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের বার্তা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে এই সন্ধ্যাবেলা। সে আমাকে বেশ খানিকটা তিরস্কার করেই বিশ্রাম করতে গেল। বলল—যা বলার, সে কাল বলবে রাজসভায়। যুধিষ্ঠির কী তাকে বলেছে না বলেছে, তা নিয়ে আমার ভারী দুশ্চিন্তা হচ্ছে। রাত্রি হয়ে গেল, আমার ঘুম আসছে না একটুও। আমার শরীরে মনে জ্বালা হচ্ছে। তুমি ধর্ম, অর্থ সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ, তুমি আমার মঙ্গলের জন্য কিছু বলো—তদ্ ব্রূহি ত্বং হি নস্তাত ধর্মার্থকুশলো হ্যসি।

এরকম কথা বিদুর আগে অনেক শুনেছেন। অনেক মঙ্গলের কথা তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছেন—প্রথমদিকে অযাচিতভাবে, পরে যাচিত হয়ে। আজও হয়তো বলতেন না কিন্তু বুঝতে পারছেন যে, ঘটনাপ্রবাহ এখন ধৃতরাষ্ট্রের বিপরীত মুখে বইছে, তিনি এখন আতঙ্কিত হয়ে বিনিদ্র রজনী যাপন করছেন। বিদুর এও জানেন যে, যুধিষ্ঠির আগে যা বলেছেন, এখনও তাই বলছেন, কিন্তু তফাতটা হল—এতকাল সবাইকে নিয়ে বনবাসদুঃখ ভোগ করার পর তাঁর প্রাপ্য লাভের জন্য তাঁর কথায় জোর আসবে এবং সেটা অন্যায়ও নয়, অস্বাভাবিকও নয়। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের মঙ্গলের কথা অবশ্যই বলবেন, কিন্তু যেহেতু তা ধৃতরাষ্ট্রের ভাল লাগবে না, তাই বিস্তারিতভাবে পাণ্ডব কৌরবের প্রসঙ্গ তিনি উত্থাপন করতে চাইলেন না। তবু প্রসঙ্গ তো আসবেই।

বিদুর বললেন—চার রকম মানুষের রাতে ঘুম আসে না, মহারাজ। রাজনৈতিক বা সামাজিকভাবে প্রবলতর ব্যক্তির চাপ যদি অসহায় দুর্বল মানুষকে সহ্য করতে হয়, তবে সেই বেচারার ঘুম আসে না, মহারাজ। আর ঘুম আসে না সেই ব্যক্তির, যার ধন হরণ করা হয়েছে, যে জৈবিক কামনায় উত্তাল, আর হল চোর। বিদুর বোধ হয় বলতে চাইলেন যে—আজকে আপনার ঘুম আসছে না বটে, কিন্তু এতগুলি বছর পাণ্ডবরাও ঘুমোননি। কারণ, না-

ঘুমোনো চার প্রকারের মধ্যে প্রথম দুটি কল্প পাণ্ডবদের ক্ষেত্রেই খাটে, আর শেষ দুটি কল্প দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে। বিদুর বললেন—এই চারটের মধ্যে কোনওটা আপনার ক্ষেত্রে খাটে না তো? অথবা অন্যর বিত্ত হরণ করে এখন আপনি পরিতাপ করছেন না তো—ক্কচিচ্চ পরবিত্তেষু গৃধ্যন্ন পরিতপ্যসে?

তির যেন লক্ষ্যে এসে বিঁধল। ধৃতরাষ্ট্র মিনতি করে বললেন—তুমি ন্যায় এবং ধর্মের কথা বলো, বিদুর। এই রাজর্ষিবংশে একমাত্র তুমিই প্রাজ্ঞতম ব্যক্তি বলে সবাই মনে করেন—অস্মিন্ রাজর্ষিবংশে ত্বমেকঃ প্রাজ্ঞসম্মতঃ। বিদুর সোজাসুজি একবারমাত্র যুধিষ্ঠিরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বললেন—শৌর্য, দয়া, ধর্ম ইত্যাদি যতরকম রাজোচিত গুণ আছে, তা সবই যুধিষ্ঠিরের ছিল। কিন্তু তিনি ভৃত্যের মতো আপনার অনুগত ছিলেন বলেই আপনি তাঁকে নির্বাসন দিলেন বনে—প্রেষ্যশ্চ প্রেষিতশ্চৈব ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরঃ। অন্যদিকে আপনি ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি হলেও অন্ধত্বের জন্য ভাগ্যও আপনার রাজা হওয়ার সহায়তা করেনি, প্রজারাও আপনাকে চায়নি। যুধিষ্ঠির যে এতদিন আপনার সমস্ত অন্যায় ব্যবহার সহ্য করেছে, তা শুধু এই কারণে যে, সে আপনাকে গুরুর মতো মান্য করে—গুরুত্বাত্ত্বয়ি সংপ্রেক্ষ্য বহূন্ ক্লেশাংস্তিতিক্ষতে। অন্যদিকে আপনি কী করলেন! দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনিদের ওপর বিশ্বাস করে নিজের সমৃদ্ধি চাইলেন। এই কি পণ্ডিতের লক্ষণ মহারাজ? পণ্ডিত হলেন তিনিই মহারাজ, যাঁর নিজের পরিমিতিবোধ আছে, যিনি সময়ে কাজ আরম্ভ করতে পারেন, যাঁর সহিষ্ণুতা আছে এবং যিনি নীতিচ্যুত হন না।

বিদুর যুধিষ্ঠিরের প্রসঙ্গ থেকে সরে এসে পণ্ডিতের লক্ষণ বলতে আরম্ভ করলেন সামগ্রিকভাবে। শুধু পণ্ডিত কেন, মানুষের জীবনে যা করা উচিত এবং যা করা উচিত নয়, কাকে ধরা উচিত, কাকে ফেলা উচিত, কোন গুণ থাকলে রাজা হওয়া যায়, কোন বিদ্যা আয়ত্ত করলে সমৃদ্ধি আসে—এইরকম হাজারো নীতিকথা বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলে গেলেন কোনও ব্যক্তিগত আক্রমণ না করে। বিদুর যা বলেছিলেন, তা মনুষ্যজীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে এতই জরুরি, এতই তা যুক্তিপূর্ণ যে, তাঁর তাৎপর্য অস্বীকার করা কোনও অবস্থাতেই সম্ভব নয়। বিদুরের এই উপদেশগুলিই পরবর্তী কালে 'বিদুর নীতি' বা 'বৈদুরী নীতি' বলে চিহ্নিত হয়েছে। আমাদের দেশে পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশের মধ্যে যত নীতিবচন উদ্ধৃত হয়েছে, তাঁর অনেকগুলিই এই বিদুর নীতি থেকে নেওয়া।

বিনিদ্র ধৃতরাষ্ট্রের দুশ্চিন্তা দূর করবার জন্য বিদুর যে বিশাল নীতি উপদেশ দিয়েছেন, তাঁর মধ্যে মাঝেমধ্যে যুধিষ্ঠিরের কথা এসেছে এবং এসেছে দুর্যোধনের কথাও। ধৃতরাষ্ট্র কখনও গভীর অনুতাপ করেছেন যুধিষ্ঠিরকে বঞ্চনা করার জন্য। আবার কখনও নিজের অসহায়তা প্রকাশ করেছেন পুত্রস্নেহের মোহ থেকে মুক্ত হতে পারছেন না বলে। অনুতাপ এবং অন্ধতা, এই দুয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পূর্বে যেমন তিনি বিধাতার ওপর সব ছেড়ে দিতেন, এখনও ঠিক সেইরকমই বললেন ধৃতরাষ্ট্র—বিধাতার হাতে আমরা কাষ্ঠপুত্তলীমাত্র—সূত্রপ্রোতা দারুময়ীব যোষা—তবু তুমি তোমার কথা বলো বিদুর! আমি শুনতে চাই তোমার কথা।

এটা অবশ্যই ঠিক, পরিস্থিতির শিকার হয়ে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের কথামতো চলতে পারতেন না বটে, কিন্তু এই কনিষ্ঠ ভাইটিকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এবং তাঁর কথা শুনতেনও মন দিয়ে। পাণ্ডবদের ন্যূনতম দাবি পাঁচখানি গ্রাম তাঁদের হাতে তুলে দিয়ে তাঁদের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করার জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করেছেন বিদুর। ধৃতরাষ্ট্রও বলেছেন—তুমি যেমন বলছ, বিদুর! আমারও তাই-ই ইচ্ছে করে। কিন্তু যেইমাত্র দুর্যোধন এর মধ্যে এসে পড়ে তখনই সব গোলমাল হয়ে যায়—পুনর্বিপরিবর্ততে। বেশ বোঝা যায়, দুর্যোধনকে অতিক্রম করার ক্ষমতা ধৃতরাষ্ট্রের নেই এবং বিদুরও সেটা বোঝেন। ধৃতরাষ্ট্রের এই অসহায় স্নেহান্ধতার জন্য বিদুর এই অন্ধ বৃদ্ধের ওপর রাগও করতে পারেন না। ধৃতরাষ্ট্র বললেন—তুমি চলে যেয়ো না, বিদুর! কী বিচিত্র মধুর কথা বল তুমি, কিছু যদি না বলা এখনও থেকে থাকে, তো বলো বিদুর! আমি শুনতে চাই।

সাধারণ নীতিধর্ম এবং রাজনীতির নৈতিকতা সম্বন্ধে বিদুর এতক্ষণ অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র যেহেতু ঘটনাচক্র বিধাতার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন, বিদুর তখনই বুঝে নিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্রকে কিছু বলে লাভ নেই। বরঞ্চ এমন বিষয়েই ধৃতরাষ্ট্রকে অবহিত করা উচিত যা সুখ দুঃখ জয় পরাজয় লাভ অলাভ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের অতীত। ধৃতরাষ্ট্র বৃদ্ধ হয়েছেন এবং মনুষ্যজীবনের শেষ পরিণতি যেহেতু পরম আধ্যাত্মিকতা বা মোক্ষধর্মেই বিশ্রান্ত হওয়া উচিত, বিদুর তাই বললেন—আমার যা বলার আমি তা বলেছি, সূত্রাকারে বলেছি ব্রহ্মবিদ্যার সহায় সাধন-সম্পদের কথা। এখন আপনার শুনতে হবে সেই সনাতন আধ্যাত্মিকতার কথা, যা মহর্ষি সনৎসুজাত বলেছিলেন। তাঁর কথা অবশ্য শুনতে হবে তাঁর কাছেই, আমার কাছে নয়। ধৃতরাষ্ট্র বললেন—তিনি যা বলবেন, তা কি তুমি জান না, বিদুর? সমস্ত প্রজ্ঞা এবং পাণ্ডিত্যের শেষ কথা তো তুমিই বিদুর। অতএব সমস্ত প্রজ্ঞার শেষ সেই মৃত্যুহীন আধ্যাত্মিকতার কথা তুমিই আমাকে শোনাও—ত্বমেব বিদুর ব্রূহি প্রজ্ঞাশেষো'স্তি চেত্তব।

বিদুর অদ্ভুত একটা উত্তর দিলেন এখানে। বললেন—আমি শূদ্রযোনিতে শূদ্রার গর্ভে

জন্মেছি, মহারাজ! পরম আধ্যাত্মিকতার এই গহন উপদেশ ব্রাহ্মণের মুখেই আপনার শোনা উচিত। আমি যতটুকু বলেছি, তার বেশি আমার বলা উচিত নয়—শূদ্রযোনাবহং জাতো নাতো'ন্যদ্ বক্তুমুৎসহে। আমরা বুঝতে পারি, মহাভারতের যুগে জাতিবর্ণের সংস্কার যদিও খুব কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ ছিল না—কারণ, তা থাকলে বিদুর যা বলেছেন, যতটুকু বলেছেন এবং যাঁকে বলেছেন, তাও বলতে পারতেন না—তবু শূদ্রবর্ণের পক্ষে শাস্ত্রীয় বিধান দেওয়া বা আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে উচ্চবর্ণের কাছে বড় বড় ভাষণ দেওয়াটা শাস্ত্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ হয়ে আসছিল। বিদুর, যিনি সর্বক্ষেত্রেই এক প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব বলে গণ্য হয়েছেন, তিনিও যে নিষেধের পক্ষে প্রতিবাদ করেননি, তাঁর কারণ বুঝি রাজধর্ম। শূদ্রার গর্ভে জন্মালেও তিনি রাজবাড়িতে মানুষ হয়েছিলেন এবং রাজশাসনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। রাজা যেহেতু মহাভারতের মধ্যেই বর্ণাশ্রমধর্মের প্রতিপালক এবং প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন, অতএব সেই যুগে প্রত্যক্ষভাবে রাজশাসনের সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি এই বর্ণধর্মের সীমা অতিক্রম করতে চাননি হয়তো।

বলা যেতে পারে, যেখানে কেউ কথা বলেন না, সেখানেও যেহেতু আমরা বিদুরের প্রতিবাদ লক্ষ করেছি, তাই এই বিষম জাতিবর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁর কাছ থেকে এই প্রতিবাদ ঈপ্সিত ছিল। বিদুরের স্বপক্ষ হয়ে কথা বললে একটা উত্তর এখানে দেওয়া যেতে পারে। জাতিবর্ণের প্রথাকে যদি একটু উদার দৃষ্টিতে দেখা যায় তবে দেখবেন এ প্রথা সেকালে যেমন ছিল, একালেও তেমনই আছে। বিশেষত জাতিবর্ণের কর্ম এবং ধর্ম যতদিন জন্মগত না হয়ে গুণকর্মের অনুসারী ছিল (স্মরণীয় ভগবদ্‌গীতাঃ চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ)—ততদিন এই প্রথার কিছু সুফলও ছিল হয়তো। আজকের দিনে জাতিবর্ণের প্রথা আমরা ঘৃণা করি, কিন্তু এই গণতান্ত্রিক সমাজেও উচ্চ নীচ ভেদ যায়নি, জাতিবর্ণের ভেদও সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। বরঞ্চ নূতন নূতন উচ্চবর্ণের সৃষ্টি করা হচ্ছে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠায়। সেকালের রাজতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ব্রাহ্মণরা উচ্চবর্ণ এবং সুবিধাভোগী বর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন, কিন্তু সেখানে ব্রাহ্মণের গুণ হিসেবে ত্যাগ, লোভহীনতা, ক্ষমা, সদাচার এবং শিক্ষা এগুলি আদর্শ হিসেবে ছিল। সুবিধার রাজনীতিতে যেহেতু আদর্শ টেকে না, তাই ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং শিক্ষার আদর্শ থেকে চ্যুত হয়ে ব্রাহ্মণরাও যেহেতু জন্মগত উচ্চতার অধিকার দাবি করলেন, ঠিক তেমনই এই মহান গণতন্ত্রের মধ্যেও উচ্চবর্ণের সৃষ্টি হয়েছে। পূর্বকালের তথাকথিত নিম্নবর্ণীয়রাই এখন সমাজের ব্রাহ্মণশ্রেণীভুক্ত এবং সেখানে গুণগত আদর্শ না থাকলেও চলে, জন্মগতভাবেই সেখানে ব্রাহ্মণত্ব আসে। এ ছাড়াও যাঁরা রাজনীতি করেন, যাঁরা সরকারপন্থী দলভুক্ত ব্যক্তি, যাঁরা রাজনীতিপুষ্ট গুন্ডা বদমাশ, তাঁরাও এখন বর্ণগতভাবে ব্রাহ্মণ। কাজেই জাতিভেদ, বর্ণভেদ ভেঙে দিতে গিয়ে যখন নতুন নতুন উচ্চবর্ণের সৃষ্টি হয়েছে, তখন একথা বলাই যায় যে, বর্ণভেদ তখনও যেমন একভাবে ছিল, এখনও একভাবে আছে।

বুদ্ধিমান মানুষ হিসেবেই বিদুর সমাজসচল প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেননি। আমি যদি আজকে মণ্ডল রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যথেচ্ছাচারের প্রতিবাদ করি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে বামপন্থী রাজনীতির স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি, তা হলে আমার ব্যক্তিগত লাভ তো নেই-ই, বরং ভয় আছে। তাঁর চেয়ে সমাজে যাঁরা উচ্চবর্ণ হিসেবে স্বীকৃত হয়েই আছেন, তা মেনে নেওয়াই ভাল। ভদ্র, শিক্ষিত সজ্জনকে রাজতন্ত্রের দৌরাত্ম্য যেমন সহ্য করতে হত, তেমনই অধিকাংশ মূর্খবহুল গণতন্ত্রের শাসনে শিক্ষিত মানুষেরা একইরকম যন্ত্রণা ভোগ করেন। বিদুর অবশ্য আমার এই যুক্তিতে ব্রাহ্মণ্যের মর্যাদা অতিক্রম করেননি তা নয়। রাজতন্ত্রের সঙ্গে বহুকাল যুক্ত থাকার ফলে তিনি জানেন যে, সমাজ একটা শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে চলে। সেকালের ব্রাহ্মণরা যেহেতু ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং চরম পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত হতেন, তাই বিদুর মনে করেন যে, আধ্যাত্মিকতার উপদেশ দেবার পক্ষে তাঁরাই সবচেয়ে উপযুক্ত পাত্র। বিদুর সেই মর্যাদাটুকু

লঙ্ঘন করেননি।

এই মর্যাদা রক্ষার একমাত্র হেতু সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা। বিদুর কত আত্মসচেতন ব্যক্তি, সেটা তাঁর কথা থেকেই বুঝবেন। তিনি বলছেন—কুমার মহর্ষি সনৎসুজাত যে চিরন্তনী আধ্যাত্মিকতার কথা জানেন, তা আমিও জানি, মহারাজ—কুমারস্য তু যা বুদ্ধির্বেদ তাং শাশ্বতীম্ অহম্—কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণ বলেই সেই আধ্যাত্মিকতার উপদেশ দেবার উপযুক্ত পাত্র। এ এক অদ্ভুত মর্যাদাবোধ, যা আজকের অকারণ গর্বস্ফীত সামাজিকদের বোঝানো সম্ভব নয়। এই মর্যাদাবোধ বর্ণ ব্রাহ্মণের অকারণ উচ্চতা ঘোষণা করে না, এই মর্যাদারোধ সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করে। আমাদের গণতন্ত্রে সাম্যবাদ বা বাক্‌স্বাধীনতা আছে বলেই দলবদ্ধ করণিককুল উচ্চতর অফিসারদের মুণ্ডপাত করে তাঁদেরই করণিকে পরিণত করেছেন। রাজনীতির অধিকারপ্রাপ্ত ছাত্রসমাজ শিক্ষককুলকে কোথায় নামিয়ে এনেছেন। অন্যদিকে শিক্ষকদের দেখুন, তাঁরা রাজনীতি আর টিউশনি করে কোথায় নেমে এসেছেন। আসল কথা, কেউ এখন তাঁর স্বধর্ম পালন করেন না। ছাত্র পড়ে না, রাজনীতি করে। শিক্ষক পড়ান না, রাজনীতি করেন। করণিক কাজ করেন না, রাজনীতি করেন। তা হলে সবাই যদি রাজনীতি করে ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করেন, তা হলে শৃঙ্খলা বলতে কী রইল?

বিদুর যেখানে সমস্ত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব জানা সত্ত্বেও শুধুমাত্র সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সনৎসুজাত মহর্ষির উপযুক্ততা স্মরণ করছেন, সেখানে আজকের সতত জ্বলমান দীপ্র সাম্যবাদের মধ্যে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করার কথা বলাটাও বোধ হয় এক গর্হিত অন্যায়। কিন্তু মনে রাখবেন, আমি জাতিবর্ণে বিশ্বাস করি না, জাতিবর্ণের জন্মগত উচ্চতার ঘোষণাও আমার কাছে ঘৃণ্য সামাজিক অপরাধ, কিন্তু সামাজিক শৃঙ্খলা এমনই এক কাম্য বস্তু, যার অভাবে অধম ব্যক্তি উত্তমকে গ্রাস করে, আর বিদুর ঠিক সেটাই করতে চান না। গণতন্ত্রের শাসনে একজন বিভাগীয় মন্ত্রী যা জানেন, দপ্তর-প্রধান একজন আই এ এস অফিসার তাঁর থেকে বেশি জানেন হয়তো। কিন্তু জানলেই তিনি মন্ত্রীকে অতিক্রম করতে পারেন না। পারেন না, কারণ প্রশাসনিক নিয়মনীতি বাঁধা গতে তৈরি হয়, কিন্তু যিনি মন্ত্রী, তিনি যেহেতু সামগ্রিকভাবে জনগণ এবং জনকল্যাণের সঙ্গে জড়িত, তাই প্রশাসনিক নিয়মনীতির সঙ্গে জনকল্যাণের আন্তরিক যোগ ঘটাবেন তিনি। এর ফলে কী হয়, প্রশাসনিক অধিকর্তা মন্ত্রীকে বুদ্ধি জোগাতে পারেন, কিন্তু জনগণের প্রতিনিধিকে তিনি অতিক্রম করতে পারেন না। মন্ত্রী মূর্খ হলেও পারেন না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মন্ত্রীরা জনগণের প্রতিনিধি, এইটাই যেমন মন্ত্রীর সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা, তেমনই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একজন করণিক যদি তাঁর ঊর্ধ্বতন অফিসারের থেকে অনেক বেশি জ্ঞানীও হন, তবু তাঁকে তাঁর অতিক্রম করা উচিত নয়। কেননা ঊর্ধ্বতন অফিসার শুধু একজন করণিকেরই উর্ধ্বে নন, একটি সম্পূর্ণ দপ্তর তাঁকে চালাতে হবে সুসমঞ্জসভাবে। সেই সামঞ্জস্যের গুহ্য রহস্যটুকু তিনিই জানেন বলেই তাঁকে উচ্চ পদে নিযুক্ত করা হয়েছে।

একইভাবে জানাই, প্রত্যেক বিশিষ্ট জ্ঞানের একটি গুপ্ত রহস্য আছে, একটি পরম্পরা আছে! পদার্থবিদ্যা যিনি জানেন, তিনি রসায়নও কিছু জানেন, অঙ্কও কিছু জানেন। কিন্তু পদার্থবিদ্যার অন্তর বুঝতে গেলে যেমন পদার্থবিদ্যাবিদের কাছেই যেতে হয়, রসায়নশাস্ত্রের অন্তর বুঝতে গেলে যেমন রসায়নবিদের কাছেই যেতে হয়, বিদুর তাই বলছেন—সনৎসুজাত ঋষির চিরন্তন জ্ঞান সম্বন্ধে আমিও সম্পূর্ণ অবহিত, কিন্তু তিনি যেহেতু ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছেন এবং আধ্যাত্মিক পরিবেশ এবং পরম্পরার মধ্যেই যেহেতু বড় হয়েছেন, তাই আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আন্তর বিষয়গুলি তিনিই সবচেয়ে ভাল বলবেন—ব্রাহ্মীং হি যোনিমাপন্নঃ সুগুহ্যমপি যো বদেৎ। একাধারে বিদুরের বিনয়, লোকব্যবহার জ্ঞান এবং আন্তরসাধন যে কতটা তা বোঝা যায়, যখন বিদুরের ধ্যান এবং স্মরণমাত্রেই সেই ঋষি সনৎসুজাত এসে উপস্থিত হলেন ধৃতরাষ্ট্রের সামনে। ধৃতরাষ্ট্র সারা রাত ধরে অত্যন্ত অভিনিবিষ্ট চিত্তে

সনৎসুজাত ঋষির মুখে আত্মতত্ত্বের উপদেশ শুনেছেন। পরের দিন তিনি উপস্থিত হয়েছেন রাজসভায়, যেখানে দূত সঞ্জয়ের মুখে পাণ্ডবদের বক্তব্য শোনার জন্য তিনি উদগ্রীব হয়ে আছেন।

প্রথমে বিদুর এবং পরে সনৎসুজাত ঋষির মুখে ঐহিক এবং পারমার্থিক তত্ত্ব শুনে ধৃতরাষ্ট্র কতটা শান্তি পেলেন, তা বলা যায় না তেমন করে। কিন্তু তাঁর মধ্যে সামান্য যে একটা পরিবর্তন হল, সেটা বেশ বোঝা গেল। সভা বসল। ধৃতরাষ্ট্র প্রশ্ন করলেন। সঞ্জয় পাণ্ডবদের, বিশেষত অর্জুনের কঠিন বক্তব্য শোনালেন সমস্ত সভাকে, যে সভায় বসে আছেন, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর সবাই। অর্জুনের বক্তব্য শুনে ভীষ্ম যথেষ্ট তিরস্কার করলেন, কর্ণ, দুর্যোধন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে। এই মুহূর্তে যুদ্ধের পথে না গিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে যে সন্ধিই করা উচিত, সে বিষয়ে যথোচিত প্রস্তাব দিলেন ধৃতরাষ্ট্রকে। সবকিছু শুনে ধৃতরাষ্ট্র যথেষ্ট শঙ্কিত হলেন। কর্ণ দুর্যোধন—এঁরা ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের বিষয়ে অভয় দিলেও ধৃতরাষ্ট্রের ভয় গেল না। এই সভায় এখনও পর্যন্ত কোনও কথা না বললেও ধৃতরাষ্ট্র কিন্তু কৃতজ্ঞ চিত্তে বার বার বিদুরের পূর্ব সাবধানবাণী স্মরণ করলেন। বললেন—এই ভীষণ যুদ্ধভয়ের কথা বিদুর অনেক আগেই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু আমি শুনিনি। আজ সেই ভয় একেবারে সামনে এসে গেছে—বিক্রুষ্টং বিদুরেণদৌ তদেতদ্ভয়মাগতম্।

ধৃতরাষ্ট্র ভাল মানুষের মতো যতই বিদুরের প্রশস্তি করুন, দুর্যোধন-কর্ণরা আবার যখন তাঁকে যুদ্ধে উদ্দীপিত করে তোলেন, তখনই আবার তিনি পাণ্ডব-কৌরবের বলাবল বিচার করতে শুরু করেন। অর্থাৎ তিনি যুদ্ধের প্ররোচনা লাভ করেন। কৌরবসভায় কথা কাটাকাটি কম হল না। ভীষ্ম দ্রোণ পাণ্ডবদের শক্তিমত্তার কথা বলেন, আবার দুর্যোধন তা নিরসন করেন। ধৃতরাষ্ট্র এই আলোচনার দ্বন্দ্বে প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়েন। পুত্রস্নেহের অন্ধতায় বারংবার যুদ্ধের প্ররোচনা লাভ করলেও ভীষ্ম-দ্রোণের বিরুদ্ধতায় যুদ্ধের মধ্যে না যাওয়াটাই তাঁর কাছে শ্রেয় মনে হল। এক সময় অত্যন্ত হতাশায় বিদুরের কাছে তিনি বলেও ফেললেন—বৎস বিদুর! কর্ণের সঙ্গে আমার ছেলে দুর্যোধনও মৃত্যুর দিকেই যাচ্ছে।

এর আগে বিদুর একটি কথাও বলেননি। যুদ্ধ নিয়ে এত যে কথা কাটাকাটি হচ্ছে, তাঁর মধ্যেও তিনি একবারও নাক গলাননি। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র যেভাবে বিদুরকে উদ্দেশ করেই কথা বলছেন, তাতে তাঁর মনে হল যে, কিছু বলা উচিত। তিনি সভাগৃহে আপন মত প্রকাশ না করে ব্যক্তিগতভাবে ধৃতরাষ্ট্রকেও কিছু কথা বললেন, দুর্যোধনকেও কিছু কথা বললেন। ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি যা বললেন, তা অনেকটাই পূর্বরাত্রে বলা নিজের এবং সনৎসুজাতের বলা উপদেশের প্রতিধ্বনি। বিদুর বোঝাতে চাইলেন—এই বৃদ্ধ বয়সে যুদ্ধোন্মাদনার কথা দূরে থাক, সর্বভূতে সমজ্ঞান এবং আত্মদর্শনের চিন্তা করাটাই অনেক বেশি জরুরি। দুর্যোধনকে উপদেশ দেবার সময়ও তিনি কোনও তিরস্কার-শব্দ উচ্চারণ করলেন না। বরঞ্চ কৌরব-পাণ্ডবের মূল যে সমস্যা, জ্ঞাতিবিরোধের সমস্যা, সেই সমস্যাটাই তিনি বোঝাতে চাইলেন দুর্যোধনকে এবং সেইসঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রকেও।

জ্ঞাতিভাইদের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হলে সর্বক্ষেত্রেই যেটা হয়, তা হল—দুই বিবদমান পক্ষই সম্পত্তি হারায় এবং সুবিধে পায় অন্য লোক। বিদুর তাঁর বিশাল অভিজ্ঞতার ঝুলি খুলে দু-তিনটি গল্প বললেন দুর্যোধনকে যাতে প্রত্যক্ষভাবে তিরস্কৃত হয়ে দুর্বিনীত দুর্যোধন রুখে না ওঠেন। বিদুর বললেন—পুরনো মানুষদের কাছে শুনেছি যে, এক ব্যাধ পাখি ধরবার জন্য মাটিতে জাল পেতে রেখেছিল। দু-দুটো পাখি সেই জালে এসে পড়ল বটে, কিন্তু পাখিদুটো সেই জাল নিয়েই উড়ে চলল। ব্যাধ করল কী, উড়ন্ত পাখিদুটিকে লক্ষ করে পিছন পিছন দৌড়ে চলল। কাছেই এক মুনি বসেছিলেন। তিনি উড়ন্ত পাখির পিছনে ব্যাধকে দৌড়োতে দেখে আশ্চর্য হয়ে ব্যাধকে বললেন—অবাক কাণ্ড!

পাখিদুটো আকাশে জাল নিয়ে উড়ে চলেছে, আর তুমি মাটির ওপর দিয়ে দৌড়ে ওদের ধরতে চাইছ! তুমি কি আর ওই পাখিদুটোকে পাবে?

ব্যাধ বলল—এখন ওই দুটো পাখি মিলেই আমার জালটা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু ওরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবেই। আর ঝগড়া যখন করবে, তখন পরস্পরের তাড়নায় মাটিতে এসে পড়বে। আমি সেই অপেক্ষাতেই ওদের পিছন পিছন দৌড়ে চলেছি। ব্যাধ যা বলেছিল, তাই শেষ পর্যন্ত হল এবং সঠিক সময়ে ব্যাধও পাখিদুটোকে ধরে নিল। বিদুর দুর্যোধনকে এই গল্প বললেন যুদ্ধের জালে জড়িয়ে পড়া কৌরব-পাণ্ডবদের লক্ষ্য করে। বিদুর সামগ্রিকভাবে জ্ঞাতিবিরোধের চিত্রটাও তুলে ধরেছেন একই সঙ্গে। জ্ঞাতিবিরোধের ফলে কী হয়, তা আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও যাঁরা জমিজমা, বিষয়সম্পত্তি নিয়ে থাকতেন, তাঁরা জানেন। বিদুরের বক্তব্য হল—অনেকগুলি কাঠের টুকরো যদি একত্র আগুনে জ্বলতে থাকে, তবে তারা ভালই জ্বলে। জ্ঞাতিরাও যদি একত্র এককাট্টা হয়ে থাকে, তবে তারা অন্যের কাছে দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে। কিন্তু জ্বলন্ত অঙ্গারপিণ্ড থেকে একটি দুটি করে কাঠ সরিয়ে নিলেই যেমন নিবু নিবু হয়ে যায়, বিবদমান জ্ঞাতিও ঝগড়া করে সরে গেলে তাঁর অবস্থা খারাপ হয়ে যায়—ধূমায়ন্তে ব্যপেতানি জ্বলন্তি সহিতানি চ।

বিদুর যুদ্ধ চান না, কিন্তু দুর্বিনীত দুর্যোধনকে তিনি যুদ্ধের ভয় দেখাচ্ছেন গল্প করে। তিনি জানেন যে, মূর্খকে সোজাসুজি তিরস্কার করলে তাঁর রাগ আরও বাড়ে। দুর্যোধন এ ব্যাপারে পরীক্ষিত ব্যক্তি। তিনি তাই আবারও গল্প করে বললেন—একবার আমি কিছু বৈদ্য চিকিৎসক ব্রাহ্মণদের সঙ্গে গন্ধমাদন পর্বতে গিয়েছিলাম। পাহাড়ি বনের পথ, তাই কিছু ব্যাধও ছিল আমাদের সঙ্গে। সে পর্বতে অনেক ওষধি বৃক্ষ, অনেক লতা, বদ্যিদের দরকার ছিল সেইগুলোই। তা পথে যেতে যেতে একটি পাহাড়ের একটি গুহার মধ্যে একটা মৌচাক দেখতে পেলাম। সেখানে হলুদ রঙের মধু পাওয়া যায়। জায়গাটা ভীষণ বিপদসংকুল। ওপর দিক থেকে জলপ্রপাত নামছে, আর গুহানিহিত মৌচাকের পাশাপাশি সাপখোপের বাসা। আমার সঙ্গে যে বদ্যিরা ছিলেন, তাঁরা বললেন—এই পীত মধুর কোনও তুলনা নেই। এ মধু খেলে মরা মানুষ জেগে উঠবে, অন্ধ লোক চোখ পাবে, আর বুড়ো হয়ে উঠবে জওয়ান।

বিদুর বলে চললেন—দেখুন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! বদ্যিরা কিন্তু মধুর চাক দেখলেন, মধুর গুণ বললেন, কিন্তু মধুর ধারও মাড়ালেন না। কিন্তু আমাদের সঙ্গে যে ব্যাধেরা ছিল, তারা কোনও ভাবনাচিন্তা না করে মধুর চাক দেখেই সেদিক পানে দৌড়োল। একবারও ভাবল না —পড়ে যাবে কিনা, সাপে কাটবে কিনা। শুধু মধুর হদিশ পেয়েই দৌড়োল। তারা গেল এবং আর ফিরে এল না। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—আপনার ছেলেরও এমনিধারা অবস্থা হয়েছে মহারাজ! সে মধুর চাকটা দেখছে শুধু, কিন্তু পড়ে যাবার বিপদটা গুনছে না—মধু পশ্যতি সম্মোহাৎ প্রপাতং নানুপশ্যতি।

একটু আগেই দুর্যোধন সকলের সামনে ভীষ্ম-দ্রোণকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছিলেন—আমরা এই ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপের আশায় যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না। আমি, কর্ণ এবং দুঃশাসন মিলে যা যুদ্ধ করব তাতেই পাণ্ডবদের দফা রফা হয়ে যাবে। তখন আমরা এই তিনজনে মিলিত হয়ে একত্রে বিশ্বস্ত সুখভোগ করব। বিদুর সেই কথাটার উত্তর দিলেন এতক্ষণ পরে মৌচাকের উপমায়। বললেন—মহারাজ! আপনার ছেলে ভাবছে—একাই এই পৃথিবী ভোগ করবে। সে কিন্তু রাজ্যের লোভে ওই মধুর চাকটুকু দেখছে, যুদ্ধের বিপদটুকু দেখছে না—তথৈব তব পুত্রো'য়ং পৃথিবীম্ এক ইচ্ছতি। যে অর্জুন বিরাট নগরের যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্যোধন সবাইকে একা পরাজিত করেছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে তেমন তেজের বহর তো কৌরবপক্ষে তেমন দেখছি না বাপু—ন চ পশ্যামি তেজো'স্য বিক্রমং বা তথাবিধম্।

সবচেয়ে বড় কথা, যারা প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে, যুদ্ধ ছাড়া যাদের গতি নেই এবং শক্তিমান বলে যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনাও যাদের আছে—সেই তারাও কিন্তু যুদ্ধ চায় না; অর্জুনের মতো ধনুর্ধর বীরও ধৃতরাষ্ট্রের দিকেই তাকিয়ে আছেন, যাতে ন্যূনতম প্রাপ্যটুকু পাণ্ডবদের ফিরিয়ে দিয়ে তিনি যুদ্ধের পথ বন্ধ করেন—প্রতীক্ষমানো যো বীরঃ ক্ষমতে বীক্ষিতং তব। কেননা যুদ্ধ যদি লাগে তবে সবল এবং দুর্বল দু পক্ষেই যেহেতু লোকক্ষয় হবেই, তাই কোনও যুদ্ধেই কারও একান্ত জয় সম্ভবই নয়—যুধ্যতোর্হি দ্বয়োর্যুদ্ধে নৈকান্তেন ভবেজ্জয়ম্।

যুদ্ধের উদ্যোগপর্বে এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসভায় দূত সঞ্জয় সবার শেষে কৃষ্ণের বক্তব্য শোনালেন। কৃষ্ণের শক্তিমত্তা, রাজনৈতিক সম্ভ্রম এবং তাঁর বুদ্ধিমত্তা তখন এতই বহুলমাত্রায় বিশ্রুত ছিল যে তিনি সমকালীন যুগেই ভগবান বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন, তাঁর অলৌকিক দিব্য মাহাত্ম্যের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। সঞ্জয় সেই কৃষ্ণের কঠিন বক্তব্য নিবেদন করলেন রাজসভায়। কৃষ্ণের বক্তব্য শোনার পরেই রাজসভায় সমাসীন রাজন্যবর্গ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ এবং অন্যান্য সবাই সভা ছেড়ে চলে গেলেন। সভার এই অবস্থা দেখে অত্যন্ত ক্রোধিত হয়ে বসে রইলেন শুধু দুর্যোধন। সামনে বসে রইলেন সঞ্জয় এবং ধৃতরাষ্ট্রের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন, চিরবিশ্বস্ত বিদুর। দুর্যোধনের বন্ধু কর্ণ ভীষ্মের কথার চাপে পূর্বেই উত্ত্যক্ত হয়ে সভা ছেড়ে গিয়েছিলেন, এখন অন্য সকলেও চলে গেলেন। পুত্র দুর্যোধনের ক্রুদ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের আবার মনে হল—তাঁরই জয় হবে। নির্জন রাজসভার মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডব-কৌরবের সৈন্যশক্তি এবং তার বলাবল নির্ণয় করার জন্য সঞ্জয়ের কাছে আবারও প্রশ্ন করলেন। সঞ্জয় জানেন যে, যুদ্ধটা একটা রাজনৈতিক বিষয় এবং এ বিষয়ে যে কোনও নির্ণয়ই সকলের শ্রোতব্য হওয়া উচিত, সিদ্ধান্তও হওয়া উচিত সকলের সমক্ষে। যুদ্ধে কে জিতবে—সেটা সঞ্জয়ের পক্ষে একা শোনানোর বিপদও আছে। কারণ, তা ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনের প্রীতিকর না হতেও পারে।

সঞ্জয় তাই সোজাসুজি ধৃতরাষ্ট্রকে প্রত্যাখ্যান করে বললেন—সবাই যেখানে চলে গেছেন, সেখানে এই নির্জন স্থানে আমি আপনাকে আর কিছুই বলতে রাজি নই। কেননা বললে, আমার ওপর আপনার রাগও হতে পারে—ন ত্বাং ব্রুয়াং রহিতে জাতু কিঞ্চিদ্/ অসূয়া হি ত্বাং প্রবিশেত রাজন্—আপনি বরং আপনার পিতা ব্যাসদেবকে এবং মহিষী গান্ধারীকে এখানে নিয়ে আসুন। যা বলার, তাঁদের সামনে বলব। সঞ্জয়ের কথা শুনেই বিদুর অন্দরমহল থেকে গান্ধারীকে ডেকে আনলেন এবং অন্যপ্রস্থিত ব্যাসকেও তিনি প্রবেশ করালেন রাজসভায়। সঞ্জয় এরপরে কৃষ্ণ এবং অর্জুনের অসীম ক্ষমতার কথা জানালেন এবং ধৃতরাষ্ট্রেরও তাতে প্রত্যয় হল। তিনি দুর্যোধনকে বার বার বারণ করলেন যুদ্ধের মধ্যে না যেতে। জননী গান্ধারীও কম চেষ্টা করলেন না। দুর্যোধনকে তিরস্কার করেও লাভ হল না, বুঝিয়েসুঝিয়েও কিছু হল না।

যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। কৌরবপক্ষ দুর্যোধনের নেতৃত্বে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকলেও পাণ্ডবরা যুদ্ধ বন্ধ করার শেষ চেষ্টা করলেন কৃষ্ণকে হস্তিনাপুরে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। শান্তির প্রস্তাব নিয়ে কৃষ্ণ আসছেন—এই সংবাদে হস্তিনায় একেবারে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র হঠাৎই একটু বেশি প্রফুল্ল হয়ে উঠলেন, এমনকী প্রফুল্ল হলেন দুর্যোধনও। কৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডবদের যা সম্পর্ক এবং কৃষ্ণ যেসব কঠিন কথা সঞ্জয়ের মুখে বলে পাঠিয়েছিলেন, তাতে ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনের এত প্রফুল্ল হয়ে ওঠার কারণ ছিল না একেবারেই। তবু কী আশ্চর্য, কষ্ণের আগমনবার্তা শুনেই ধৃতরাষ্ট্র একেবারে সর্বসমক্ষে নির্দেশ দিলেন যাতে কৃষ্ণকে একেবারে দেবতাজ্ঞানে অভ্যর্থনা করা হয়। কৃষ্ণের প্রতি বিশেষ মর্যাদা দেখিয়ে ধৃতরাষ্ট্র তাঁর সম্বন্ধে দেবত্বসূচক শব্দরাশিও প্রয়োগ করলেন সাধ্যমতো। পথিমধ্যে কৃষ্ণের বিশ্রামের জন্য একটা সুদৃশ্য ভবন নির্মাণ করার জন্য দুর্যোধনকে নির্দেশ দিয়ে ভীষ্মের সামনেই তাঁকে বললেন—কৃষ্ণ আমাদের পূজনীয় ব্যক্তি।

দুর্যোধন! তুমি দেখো যাতে তোমার ওপর সন্তুষ্ট হন তিনি। ভীষ্মকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন ধৃতরাষ্ট্র—এ বিষয়ে আপনার কী অভিমত, ভীষ্ম—আমি সঠিক নির্দেশ দিয়েছি তো—কথং বা ভীষ্ম মন্যসে?

ভীষ্ম আর কী বলবেন! তিনি ভাবলেন—ধৃতরাষ্ট্রের সুমতি হয়েছে। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। দুর্যোধনও ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশ মেনে বৃকস্থল নামে একটি জায়গায় কৃষ্ণের জন্য একটি বাড়ি বানিয়ে ফেললেন। কৃষ্ণের ভবিষ্যৎ আগমন সংবাদে হস্তিনাপুরে যে তোড়জোড় আরম্ভ হল, বিদুর তা গভীরভাবে লক্ষ করছিলেন। পিতাপুত্রের মধ্যে একযোগে হঠাৎ এই মানসিক পরিবর্তন দেখে তিনি বেশ অবাকই হয়ে উঠছিলেন। তিনি দেখলেন—কৃষ্ণ আসবেন বলে নানারকমের আসন, অলঙ্কার, বসন এবং উৎকৃষ্ট খাদ্য-পেয়-র ব্যবস্থা করা হয়েছে নবনির্মিত বৃকস্থলের ভবনে। দুর্যোধন নিজে এই ব্যবস্থা করে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে খবর পাঠিয়েছেন। বিদুর যতই দেখছেন ততই অবাক হচ্ছেন।

কৃষ্ণ বিরাটনগর থেকে বেরিয়ে হস্তিনাপুরের দিকে—সে খবর এসে গেল। কিন্তু বৃকস্থলে দুর্যোধন নিজের তদারকিতে যে বাসভবন নির্মাণ করেছেন, কৃষ্ণ সেখানে না থেকে বৃকস্থলের অন্যত্র রয়ে গেলেন, সে খবরও এসে গেল হস্তিনাপুরে। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র যেন সে খবরে কর্ণপাতই করলেন না এবং পূর্বের মতোই উৎফুল্লভাবে বিদুরকে বললেন—জান তো বৃকস্থলে এসে গেছেন কৃষ্ণ, কাল সকালেই তিনি এখানে এসে যাবেন। বিদুর! তুমি দেখবে—কাল তোমার সামনেই আমি কেমন অভ্যর্থনা দিই তাঁকে। তিনি উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্তত ষোলোখানা সোনায় মোড়া রথ দেব তাঁকে। চার চারটে করে একরঙের তেজি ঘোড়া যোতা থাকবে সেসব রথে। তারপর দেব আটখানি হাতি। সোনার বরণ যুবতী দাসী দেব একশোটা।

ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে তাঁর দানের 'লিস্টি' শোনাতে লাগলেন। দানসামগ্রীর মধ্যে মণিরত্ন, সোনাদানা, দাসদাসী ছাড়াও একেবারে শেষের দিকে একটি কথা বললেন ধৃতরাষ্ট্র, তাতেই বোধ হয় বিদুর বুঝে নিলেন যে, এই আদর আপ্যায়নের সম্পূর্ণ ব্যাপারটার মধ্যেই একটা কৃত্রিমতা আছে এবং রহস্যও আছে। ধৃতরাষ্ট্র বলেছিলেন—দুর্যোধন ছাড়া আর সবকটি ছেলেকে আমি কৃষ্ণের কাছে পাঠাব তাঁকে রথ থেকে নামিয়ে আনার জন্য। পাঠাব সুন্দরাঙ্গী বারাঙ্গনাদের, তারা পায়ে হেঁটে কৃষ্ণকে প্রত্যুদ্‌গমন করে নিয়ে আসবে। নগর থেকে সেই বারাঙ্গনারা যখন যাবে তখন তাদের গায়ে কোনও অবগুণ্ঠন থাকবে না—দ্রষ্টুং কন্যাশ্চ কল্যাণ্যস্তাশ্চ যাস্যন্ত্যনাবৃতাঃ।

এর পরেও ধৃতরাষ্ট্রের বক্তব্য ছিল। কিন্তু বিদুর নিশ্চয় ভাবলেন—কেন, কেন হঠাৎ এই অদ্ভুত আয়োজন? কৃষ্ণকে এমন করে প্রলুব্ধ করারই বা কী প্রয়োজন ধৃতরাষ্ট্রের? বিদুরের ভয়ংকর সন্দেহ হল—নিশ্চয়ই এই অত্যাদরের পিছনে কোনও রহস্য আছে। আর কেউ যদি হতেন, তা হলেও কথা ছিল, কিন্তু কৃষ্ণকে প্রলুব্ধ করে ধৃতরাষ্ট্র যে কী সাধ্যসাধন করতে চান বিদুর তা ভাল করে না বুঝলেও ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যটা যে ভাল নয়, সেটা তিনি আন্দাজ করতে পারছিলেন। কাজেই ধৃতরাষ্ট্র যখন আরও বিভিন্ন দানের প্রস্তাব করতে থাকলেন, বিদুর তখন শান্ত মনে বললেন—মহারাজ! আপনি লোকের কাছে রাজা বলে সম্মানিত, তারওপরে বয়সটাও আপনার যথেষ্ট হয়েছে। এ অবস্থায় আপনি যে কথাটা বলবেন—যত্ত্বমেবং গতে ব্রুয়াৎ পশ্চিমে বয়সি স্থিতঃ—সেটা লোকের বিবেচনায় ঠিক বলে ধারণা হওয়া উচিত। মনে রাখবেন মহারাজ! আপনি ধর্মজ্ঞ এবং গুণী মানুষ বলে সাধারণে আপনাকে শ্রদ্ধা করে, কাজেই সেই ধর্ম এবং গুণ রক্ষা করে চলাটাও আপনার উচিত হবে—গুণানাং রক্ষণে নিত্যং প্রযতস্ব সবান্ধবঃ। আপনি সরলভাবে কাজ করুন, মহারাজ! তা নইলে বিপদ আসবে অনেক।

বিদুর এবার আসল কথায় এলেন। বললেন—আপনি যে এতসব জিনিস কৃষ্ণকে দিতে চাইছেন, হ্যাঁ-—এসব পাবার তিনি যোগ্য লোক বটে। চাই কী এর থেকে বেশিও তিনি পেতে পারেন। কিন্তু আমি বুকে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করে বলতে পারি, মহারাজ! আপনি ধর্মের জন্য অথবা কৃষ্ণের প্রকৃত সন্তুষ্টির জন্য এসব দান করছেন না—ন তু ত্বং ধর্মমুদ্দিশ্য তস্য বা প্রিয়কারণাৎ। আপনি মনে মনে কী চাইছেন, তা আমি বেশ জানি। পাণ্ডবরা আপনার কাছে পাঁচটা গ্রাম মাত্র চেয়েছে, তাও আপনি দিতে চাইছেন না। অন্তত একবারও সেগুলি দেবার কথা আপনি বলেননি। তাতে বোঝা যায় যে, আপনি তাঁদের সঙ্গে সন্ধি চাইছেন না। আপনার মনের মধ্যে এই কূট, অথচ বাইরে নিজেকে খুব দানী বলে দেখাতে চাইছেন। এটা কূট কৌশল, এটা মিথ্যাচার এবং এটাও ছলনা—মায়ৈষা অসত্যমেবৈতচ্-ছদ্মৈতদ্ ভূরিদক্ষিণা। কৃষ্ণকে এতসব বস্তুদানের বাহানা না করে আপনি যদি পাঁচটামাত্র গ্রাম ফিরিয়ে দিতেন পাণ্ডবদের, তাতে তাঁর সন্তুষ্টি অনেক বেশি হত।

ধৃতরাষ্ট্র যে কেন হঠাৎ কৃষ্ণের প্রতি দানের আতিথ্য করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, বিদুর সেটা ভাল করে বুঝে ফেলেছেন। কৃষ্ণকে প্রচুর টাকাপয়সা, মণিরত্ন দিয়ে তাঁকে তিনি পাণ্ডবপক্ষ থেকে নিজের পক্ষে নিয়ে আসতে চান। বিশেষত অর্জুনের বীরত্ব, মাহাত্ম্য, যা নাকি দুর্যোধনের সমস্ত শক্তির প্রতিপক্ষে স্থাপিত হয়েছে বারংবার, সেই অর্জুনের কাছ থেকে যাতে কৃষ্ণকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা যায়, সেই উদ্দেশেই যে ধৃতরাষ্ট্র দান মান দিয়ে কৃষ্ণকে এত প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছেন, সেটা বিদুর বুঝে ফেলেছেন। তিনি বলেছেন—আপনি যা ভাবছেন, মহারাজ! তা কোনওভাবেই হবে না। কোনওভাবেই আপনি কৃষ্ণকে অর্জুনের পক্ষ থেকে সরিয়ে আনতে পারবেন না। আপনি এই দানের বহর ছাড়ুন। তার বদলে, যেমনটি সর্বত্র চলে—একটি জলভরা কলস তাঁর সামনে রাখুন, পা ধোয়ার জল দিন আর কুশল প্রশ্ন করুন। এ ছাড়া তিনি আপনার কাছ থেকে কিছু গ্রহণও করবেন না, সে আমি নিশ্চয় জানি—অন্যৎ কুম্ভাদ্ অপাং পূর্ণাদ্ অন্যৎ পদাবসেচনাৎ। আর সত্যিই যদি কৃষ্ণের আতিথ্য আপনি মন থেকে করতে চান, তা হলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এখানে আসছেন, যাতে পাণ্ডব, কৌরব সকলেরই মঙ্গল হবে, আপনি সেই কাজটা করুন, তাতেই তাঁর পরম আতিথ্য সম্পাদন করা হবে—যেনৈব রাজন্নর্থেন তদেবাস্মা উপাকুরু। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের কথা শুনে একটু অবাক হলেন নিশ্চয়। তিনি বিদুরের কাছে ধরা পড়ে গেছেন। কিন্তু তবু তাঁর কিছু লজ্জা আছে বলে তিনি কোনও প্রত্যুত্তর করলেন না। দুর্যোধন অবশ্য বিদুরের কথারই সুযোগ নিলেন। তার ভাবটা এই, ধরা যখন পড়েই গেছি, তা হলে আর লজ্জা রেখে লাভ কী। খামোখা কৃষ্ণের পিছনে অর্থসম্পদ নষ্ট করাই বা কেন। দুর্যোধন বললেন—হ্যাঁ, বিদুরের কথাই ঠিক। কৃষ্ণ খুব মাননীয় পূজ্য বটে, কিন্তু এতসব জিনিসপত্র তাঁকে দেবার কোনও প্রয়োজন নেই, এবং তা দেবার সময়ও এটা নয়—দেশকালস্তথা'যুক্তো... ন তদ্দেয়ং কদাচন। আর যদি এসব তাঁকে দেওয়া হয়, তিনি ভাববেন—ধৃতরাষ্ট্র ভয় পাচ্ছেন। দুর্যোধন পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজ্য ভোগ করার কোনও বাসনাই তাঁর নেই এবং কৃষ্ণ কৌরবসভায় এলে তিনি তাঁকে কারাগারে বন্দি করে রাখবেন। দুর্যোধনের ধারণা—কৃষ্ণকে বন্দি করে রাখলে বৃষ্ণি-যাদবগোষ্ঠী এবং পাণ্ডব-পাঞ্চালগোষ্ঠী সকলেই তাঁর বশীভূত হবে।

কৃষ্ণকে বন্দি করার কথা কূটবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রও ভাবতে পারেন না। তিনি একেবারে হাঁ-হাঁ করে উঠলেন এবং সেইসঙ্গে মহামহিম ভীষ্ম একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্যোধনের ওপর। ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনের সমস্ত বাচনিক প্রক্রিয়া এবং বিক্রিয়াগুলি বিদুর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলেন এবং দেখলেন। তিনি বুঝেছেন—দুর্যোধন সমস্ত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের ক্ষমতা নেই পুত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার।

পরের দিন কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র হইহই কাণ্ড বেধে গেল। কুরুবৃদ্ধেরা সকলে তাঁকে বহুমানপুরঃসর সভায় নিয়ে এসে রত্নখচিত আসনে বসালেন। ধৃতরাষ্ট্র আর দানের প্রলোভন দেখিয়ে ভুল করার চেষ্টা করেননি। তবে সভায় এসে সামান্য কিছু কুশল বিনিময়ের পরেই কৃষ্ণ কিন্তু আর দেরি করলেন না। ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে দুঃশাসনের বাড়িতে রাখবেন বলে ঠিক করেছিলেন, কিন্তু তিনি সভা ছেড়ে উঠে আসবার সময় তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্বের সামনে সে কথা তিনি বলতেও পারলেন না। কৃষ্ণ সোজা এসে বিদুরের বাড়িতে উঠলেন—বিদুরাবসথং রম্যমুপাতিষ্ঠিত মাধবঃ। বিদুর যথোচিত আতিথ্য সম্পন্ন করার পর কৃষ্ণের কাছে পাণ্ডবদের কুশল প্রশ্নও যেমন করলেন, তেমনই জিজ্ঞাসা করলেন তাঁদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাগুলি। বনবাস এবং অজ্ঞাতবাসের সময় পাণ্ডবরা কেমন ছিলেন এবং এই যুদ্ধোদ্যোগের মুহূর্তেও পাণ্ডবরা যে শান্তি-সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে স্বয়ং কৃষ্ণকেই দৌত্য করার জন্য পাঠিয়েছেন—এসব কথা কৃষ্ণ সবিস্তারে জানালেন বিদুরকে—তস্য সর্বং সবিস্তারং...ক্ষত্তুরাচষ্ট দার্শাহঃ সর্বং প্রত্যক্ষদর্শিবান্।

প্রথাগতভাবে বিদুরের আতিথ্য গ্রহণ করে কৃষ্ণ এরপর পিতৃভগিনী কুন্তীর সঙ্গে দেখা করলেন এবং তাঁর কষ্টের কথাও শুনলেন। তারপর দেখা করতে গেলেন দুর্যোধনের সঙ্গে। রাজপুরীতে আনুষ্ঠানিকভাবে দৌত্যকর্ম করতে এসেও কৃষ্ণ কেন ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনের রাজকীয় আতিথ্য গ্রহণ করলেন না—দুর্যোধন কৃষ্ণের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনলে তিনি তার জবাব দিলেন রাজনৈতিক অভিসন্ধিতেই। কৃষ্ণ বলেই দিলেন যে, পাণ্ডবদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে কৃষ্ণকে বেশি খাতির দেখানোটা তিনি পছন্দ করছেন না। যেখানে প্রীতি নেই সেখানে কৃষ্ণ তাঁর দেওয়া খাবার খাবেন কী করে! কৃষ্ণ বুঝিয়ে দিলেন—সম্পূর্ণ হস্তিনাপুরে বিদুরই হলেন একমাত্র ব্যক্তি যাঁর ঘরে অন্নগ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব। হস্তিনাপুরে বিদুরই একমাত্র ব্যক্তি যিনি কায়মনোবাক্যে পাণ্ডবদের ভাল চান, অতএব পাণ্ডবদের দৌত্য করতে এসে একমাত্র বিদুরের ঘরেই তাঁর খাওয়াটা মানায়, অন্য কোথাও নয়—ক্ষত্তুরেকস্য ভোক্তব্যমিতি মে ধীয়তে মতিঃ। কৃষ্ণ দুর্যোধনের মনোভাব সামান্যও বুঝে নিয়ে আবার বিদুরের বাড়িতে এসে পৌঁছোলেন।

হস্তিনাপুরে বিদুরের বাড়িতে কৃষ্ণ আতিথ্য গ্রহণ করার ফলে ভাবুক-রসিকদের মধ্যে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে। বৈষ্ণব সাহিত্য তথা বৈষ্ণব ভক্তজনেরা এই ঘটনা উল্লেখ করে বিদুরের ভক্তিমহিমা এবং তাঁর দুরূহ সৌভাগ্যের সঙ্গে কৃষ্ণের ভক্ত-বাৎসল্যের প্রমাণ দেন। এমন কথাও বলেছেন কেউ কেউ, বিশেষত কাশীরাম দাস—যে বিদুর বড় দীন হীন অভাজন ব্যক্তি ছিলেন এবং কৃষ্ণ আপন আগ্রহে তাঁর বাড়িতে অতিথি হয়ে এলে বিদুর তাঁকে খুদকুঁড়ো খেতে দেন। অপিচ ভক্তবৎসল ভগবান পরম আনন্দে সেই খুদ খেয়ে তৃপ্ত হন। ভক্তিরসের এই আস্বাদন আমাদের মনে অন্যতর এক আলোড়ন সৃষ্টি করে নিশ্চয়। বিদুর কৃষ্ণের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন এবং কৃষ্ণকে তিনি ভগবদ্‌বিশ্বাসেই শ্রদ্ধা করতেন, সে কথা মহাভারতেও যথেষ্ট আছে। কিন্তু পরবর্তীকালের কতিপয় পুরাণে এবং কাশীরাম দাসের মহাভারতে বিদুরকে পরম ভক্ত হিসেবে চিত্রিত করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে যে দীনদরিদ্র অকিঞ্চন করে ফেলা হল তার পিছনে কারণ মনে হয় বিদুরের সামাজিক অবস্থিতি এবং রাজনৈতিক একাকীত্ব। তিনি শূদ্রাগর্ভজাত এবং হস্তিনাপুরের রাজশক্তির বিরুদ্ধে তিনি একাকী—এই দুই কারণেই হয়তো পরবর্তীকালের কবিরা বিদুরকে একটু দীন হীন করে তুলেছেন তাঁর সততা এবং ভগবদ্‌ভক্তির বিপ্রতীপ মাহাত্ম্যে।

কিন্তু মহাভারতে বিদুরের চরিত্রচিত্র ঠিক এমন নয়। অপেক্ষাকৃত নীচযোনিজতা তথা হস্তিনায় তাঁর রাজনৈতিক একাকীত্ব তাঁর সামাজিক এবং রাজনৈতিক মাহাত্ম্য তথা ব্যক্তিত্ব কিছুই কমতে দেয়নি। বিশেষত তিনি দীন হীন অভাজনও ছিলেন না। নীচযোনিজতা মহাভারতে এমন কোনও পাতক নয়, যা তাঁর কিংবা অন্যান্য ব্যক্তিত্বের সামাজিক মর্যাদা

হরণ করেছে। অপিচ বিদুরের ধনসম্পত্তি কিছুই ছিল না এবং তিনি খুব গরিব ছিলেন, এমন কথা মূল মহাভারতে মোটেই নেই। পূর্বে আমরা দেখেছি—বিদুরের বাড়িখানা যথেষ্টই ভাল—বিদুরবসথম্ রম্যম্। বিদুরের বাড়িতে কৃষ্ণের রাজকীয় অভ্যর্থনার কোনও ত্রুটি হয়নি। কৃষ্ণের মতো ব্যক্তিত্বের যা যা কাম্য হতে পারে বিদুর সেইভাবেই 'হোস্ট' করেছেন কৃষ্ণকে—অর্ভ্যচয়ামাস তদা সর্বকামৈঃ প্রযত্নবান্।

এবারে ভোজনের জায়গায় আসি। বিদুর কৃষ্ণের জন্য যে অন্নপানের ব্যবস্থা করলেন, তা একদিকে যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সাজানো, তেমনই অন্যদিকে তার 'কোয়ালিটি'ও যথেষ্ট ভাল-ততঃ ক্ষত্তান্নপানানি শুচীনি গুণবন্তি চ। সেই অন্নপানের প্রাচুর্য এবং পরিমাণও কিছু কম নয়। কৃষ্ণ যা খেতে পারবেন তার চেয়ে বহু গুণ বেশি খাদ্য তাঁকে দেওয়া হয়েছে—উপাহরদ্ অনেকানি কেশবায় মহাত্মনে। অন্নপানের পরিমাণটা বোঝা যাবে কৃষ্ণের তৎকালীন ব্যবহার থেকেই। খাবার সাজিয়ে দেবার পরেই কৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে দেখা-করতে-আসা ব্রাহ্মণদের আগে বসিয়ে খাওয়ালেন। শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মণভোজনের পর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের হাতে বেশ কিছু দানসামগ্রী তুলে দিলেন কৃষ্ণ—পরমদ্রবিণান্যপি। এগুলি নিশ্চয় তিনি দ্বারকা থেকে নিয়ে আসেননি, নিশ্চয় বিদুরই এসবের ব্যবস্থা করেছিলেন, অভ্যর্থনার নিয়মে এগুলি ব্যবস্থেয় ছিল বলেই।

সামর্থ্য এবং ভোজন প্রাচুর্যের অনভাব সত্ত্বেও ভক্তিরসের প্রাধান্যটা যে পরবর্তীকালে বিদুরের চরিত্র বেশি কারুণ্যমণ্ডিত করে তুলল, তাঁর আর একটা কারণ বোধ হয় বিদুরের বিনয় ব্যবহার। ব্রাহ্মণদের ভোজন তর্পণ হয়ে গেলে কৃষ্ণ যখন নিজে খেতে বসলেন, তখন বিদুর অত্যন্ত বিনয় সহকারে বললেন—এবার আপনি পরিজনদের (সাত্যকি, দারুক, যাঁরা কৃষ্ণের সঙ্গে এসেছিলেন) নিয়ে ভোজন করুন। আমার যা আছে, তাতেই আপনাকে তুষ্ট হতে হবে, এই আমার পরম নিবেদন। নইলে এই পৃথিবীতে তোমাকে উপযুক্তভাবে পূজা করতে পারে—সংবৃতৈস্তুষ্য গোবিন্দ এতন্নঃ পরমং ধনম্। বিদুরের অতিবিনয় ব্যবহারই পরবর্তীকালে তাঁকে দীন হীন অকিঞ্চনে পরিণত করেছে। পরবর্তীকালের 'কবিভাবক-ভাব্যমান' হৃদয়ের কোনও সমালোচনা আমি করছি না, কিন্তু শুধু এইটুকু জানাচ্ছি যে, মহাকাব্যের জগতে একটা আড়ম্বর আছে এবং এখানে অর্থসম্পত্তি যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও ভক্তিভাবের অভাব ঘটে না। কেননা বিদুর সবিনয়ে সশ্রদ্ধচিত্তে কৃষ্ণকে যে অন্নপান নিবেদন করলেন, কৃষ্ণ তা পরিজনদের নিয়ে ভোজন করলেন সেইভাবে, যেভাবে দেবরাজ ইন্দ্র ভোজন করেন দেবতাদের সঙ্গে। প্রাচুর্য এবং উৎকর্ষ থাকলেই ইন্দ্রের উপমা দেওয়াটা মহাকাব্যিক প্রসিদ্ধি এবং সেটা যে শুধুমাত্র বাচনিকতা নয়, সেটা বোঝা যায় যখন কৃষ্ণের খাবার সময় আবারও বলা হল—বিদুরের দেওয়া উৎকৃষ্ট অন্নপান পরম তৃপ্তি সহকারে ভোজন করলেন কৃষ্ণ—বিদুরান্নানি বুভুজে শুচীনি গুণবন্তি চ। এই ভোজন-সৎকারের মধ্যে যে বিদুরের রাজকীয় পরিবেশন যুক্ত হয়েছিল, তার আরও একটা বড় প্রমাণ হল—কৃষ্ণের সম্পূর্ণ ভোজনকাল ধরে সূত-মাগধেরা গানবাজনা চালিয়ে যাচ্ছিল—তং ভুক্তবন্তং বিবিধাঃ সুশব্দাঃ সূতমাগধাঃ। মনে রাখতে হবে, বিদুর রাজবাড়িতে জন্মেছিলেন এবং এখনও তিনি হস্তিনাপুরের রাজসভার মন্ত্রী, তাঁর বাড়িতে খেতে বসলে 'ফুড অ্যান্ড মিউজিক'-এর ন্যূনতম ব্যবস্থা তো থাকবেই। সেটাই স্বাভাবিক।

সারাটা দিন কৃষ্ণের যা গেছে আজ। খাওয়াদাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নিতেই বিকেল গড়িয়ে রাত এসে গেল। এবারে আর দর্শনার্থীর ভিড় নেই। আজ আর কোথাও যেতেও হবে না কৃষ্ণকে। অতএব নিশামুখে বিদুর কথা আরম্ভ করলেন কৃষ্ণের সঙ্গে। পরের দিন রাজসভায় আনুষ্ঠানিকভাবে কৃষ্ণ পাণ্ডবদের পক্ষ থেকে দৌত্যকর্ম করবেন। অতএব এখানকার রাজনীতির পুরোধা ব্যক্তিদের মনোভাব জানা থাকলে কৃষ্ণের সুবিধা হয়। বিশেষত, যুদ্ধ যাঁরা চান, তাঁদের বিপক্ষে শান্তির প্রস্তাব দিয়ে কৃষ্ণ যাতে অন্যায় বিপাকে না

পড়েন, সে ব্যাপারে কৃষ্ণকে একটু সচেতন করে দেবার জন্যই বিদুর দুর্যোধনের একগুঁয়ে স্বেচ্ছাচারী স্বভাবের কথা উল্লেখ করে কৃষ্ণকে বললেন—দেখ, সে এমনই এক মানুষ যে, তুমি শান্তির কথা বলে ভাল প্রস্তাব দিলেও নিজের প্রাজ্ঞম্মন্যতায় তোমাকে গ্রাহ্য নাও করতে পারে—ত্বয়োচ্যমানঃ শ্রেয়ো'পি সংরম্ভন্ন গহীষ্যতি।

কেন দুর্যোধন শান্তির প্রস্তাব মানবেন না, তাঁর কারণগুলোও কৃষ্ণকে বললেন বিদুর। পাণ্ডবদের খবর আসার পর থেকেই ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় যেসব আলোচনা চলছে দফায় দফায় বিদুর তা শুনেছেন, এবং তাতে অংশগ্রহণও করেছেন। দুর্যোধনের ধারণা—পাণ্ডবরা ভীষ্ম-দ্রোণের মতো বীরদের সম্মুখীন হতে পারবেন না এবং যদি তাঁরা পারেন, তবু একা কর্ণের তেজ সহ্য করাটাই তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে। বিদুর কৃষ্ণকে বললেন—এই অবস্থায় দুর্যোধন কর্ণরা ঠিক করেই নিয়েছে যে, তোমার শান্তির প্রস্তাব উড়িয়ে দিয়ে পাণ্ডবদের তারা কিছুই ফিরিয়ে দেবে না এবং সেক্ষেত্রে তোমার সব প্রস্তাবই ব্যর্থ হবে—ইতি ব্যবসিতাস্তেষু বচনং স্যান্নিরর্থকম্। বিদুর জানেন যে, ভীষ্ম, দ্রোণ, তিনি নিজে এবং স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীও যেখানে দুর্যোধনকে বুঝিয়ে কোনও ফল পাননি, সেখানে তার সঙ্গে কৃষ্ণের কথা বলাটা বধির ব্যক্তিকে গান শোনানোর মতো নিষ্ফল হবে—ন তত্রপ্রলেপৎ প্রাজ্ঞো বধিরেষ্বিব গায়নঃ।

এই ব্যবহারিকতা ছেড়ে দিলেও আরও একটি যুক্তি আছে বিদুরের এবং সেটা স্নেহের পরিসর। কৃষ্ণের ক্ষমতা ভগবত্তার চাইতে কোনও অংশে কম নয়—এ কথা জানা সত্ত্বেও বিদুর কৃষ্ণকে পাণ্ডবদের মতোই স্নেহ করেন। আর স্নেহের স্বভাবই হল অনিষ্টাশঙ্কা। বিদুর দুর্যোধনের মুখে শুনেছেন যে, কৃষ্ণকে সে বন্দি করতে চায়। যুদ্ধসন্ত্রস্ত দুর্যোধন সৈন্যসামন্ত জোগাড় করে বসে আছেন এবং অন্যদিকে সে মূর্খ, ফলে শুধুমাত্র সহায়সম্পন্ন বলেই—সো'য়ং বলস্থো মূঢ়শ্চ—সে কৃষ্ণকে কিছু করে বসে কিনা, সে বিষয়ে বিদুর ভয় পান। বিদুর বললেন—দুর্যোধন এবং তাঁর দলবলই যেখানে সংখ্যায় বেশি, তাদের মধ্যে তোমার যাওয়া এবং কথা বলাটা আমার ভাল ঠেকছে না—তব মধ্যাবতরণং মম কৃষ্ণ ন রোচতে। রাজনীতিবোধের পরম সূক্ষ্মতাহেতু বিদুর সাগ্রহে লক্ষ করেছেন যে, পাণ্ডবদের শত্রুরা যেমন দুর্যোধনের পক্ষে এসে যোগ দিয়েছে, তেমনই কৃষ্ণের শত্রুরাও এসে যোগ দিয়েছে দুর্যোধনের সহায় হিসেবে। বিদুর বলেছেন—আমি তোমার প্রভাব, পুরুষকার এবং বুদ্ধির কথা জানি। কিন্তু তবু কী জান, পাণ্ডবদের আমি যেমন স্নেহপ্রীতি করি, তুমি তো সেইরকমই আমার স্নেহের পাত্র—যা মে প্রীতিঃ পাণ্ডবেষু ভূয়ঃ স ত্বয়ি মাধব। আর ঠিক সেই জন্যই এতগুলি শত্রুর মধ্যে তোমার যাওয়াটা আমার অভিমত হচ্ছে না।

বিদুরের স্নেহসিক্ত কথা শুনে কৃষ্ণ ভারী খুশি হলেন। ঠিক এই মুহূর্তে বিদুরের সম্বন্ধে যে প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করেছেন কৃষ্ণ, তারমধ্যে বিদুরের চরিত্রটা একেবারে সামগ্রিকভাবে ফুটে ওঠে। কৃষ্ণ বলেছেন—মহাপ্রাজ্ঞ মানুষ যেমনটি বলেন, সর্ববিষয়ে নিপুণ বিচক্ষণ ব্যক্তি যেমনটি বলেন, একজন সুহৃদ ব্যক্তির কাছে অন্য সুহৃদের যেমনটি বলা উচিত, এবং ধর্ম এবং সমৃদ্ধির উপায়স্বরূপ যে সমস্ত কথা আপনার পক্ষেই একমাত্র বলা সম্ভব, সে সমস্তই আপনি আমাকে বলেছেন—পিতার মতো সম্ভাবনায়, মায়ের মতো সস্নেহে—তথা বচনমুক্তো'স্মি ত্বয়ৈতৎ পিতৃমাতৃবৎ। কৃষ্ণ বলেছেন—তিনি অকপটে পাণ্ডব-পাঞ্চাল এবং কৌরবদের মধ্যে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করবেন। পাণ্ডবদের স্বার্থ যাতে সম্পূর্ণ ক্ষুন্ন না হয়, আবার কৌরবরাও যাতে যুদ্ধ থেকে বিরত হন—এইরকম একটা শান্তিসূত্র কার্যকর করাটাই কৃষ্ণের উদ্দেশ্য। কিন্তু তা যদি না হয়, তা হলে যুদ্ধ যে লাগবেই সে কথাও তিনি জানালেন বিদুরকে। কৃষ্ণ বোঝালেন বিদুরকে যে, তাঁর মতো মানুষের একটা দায়িত্ব আছে এবং সে দায়িত্ব বিবাদ উসকে দেবার কাজে ব্যবহার না করে, শান্তির চেষ্টাতেই ব্যবহৃত হওয়া উচিত। কেননা তা না হলে পাঁচজন বলবে যে, কৃষ্ণের মতো মানুষ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তিনি কুরু-

পাণ্ডবদের বিবাদ মেটানোর কোনও চেষ্টাই করলেন না—শক্তো নাবারয়ৎ কৃষ্ণঃ সংরব্ধান্ কুরুপাণ্ডবান্।

বিদুর কৃষ্ণের কথা শুনছিলেন, শুনে তাঁর বড় ভালও লাগছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর হতাশাও ছিল বড় প্রকট। কারণ, আজকে কৃষ্ণ যে চেষ্টা করতে যাচ্ছেন, সে চেষ্টা বার বার করে তিনি বিফল হয়েছেন। তবু কৃষ্ণকে তিনি একবারও বারণ করলেন না। কেননা, রাজনীতির সূক্ষ্ম বোধ তাঁকে এই কথাই সবসময় বুঝিয়েছে যে, লোকক্ষয়কর যুদ্ধের চেয়ে শান্তির পথই সবচেয়ে ভাল; কিন্তু যে কোনও মূল্যেই তা ভাল হলেও পাণ্ডবদের বঞ্চিত করে তা হওয়া যে উচিত নয়, সেটাও তাঁর অভিমত—কেননা, ধর্ম এবং নীতি তাতে নিষ্পিষ্ট হয়ে যাবে। বিদুরের রাজনীতি বোধের সঙ্গে কৃষ্ণের রাজনীতি বোধ খুব মেলে। সারারাত ধরে কৃষ্ণ যা বলেছেন, বিদুর তাতে যেমন আনন্দ পেয়েছেন, তেমনই বিদুরের রাজনৈতিক উপদেশ শুনেও কৃষ্ণের মনে হচ্ছিল—রাত্রি যেন প্রভাত না হয়—অকামস্যেব কৃষ্ণস্য সা ব্যতীয়ায় শর্বরী।

সকাল হলে কৃষ্ণ সন্ধ্যাহ্নিক করে প্রস্তুত হবার আগেই দুর্যোধন-শকুনিরা রথ নিয়ে উপস্থিত হলেন তাঁকে রাজসভায় নিয়ে যাবার জন্য। কৃষ্ণ নিজের রথে উঠলেন। বৃষ্ণি বীরেরা তাঁর রথ রক্ষা করে চলছিল এবং সেই রথগুলি পরিবেষ্টন করে রেখেছিলেন কৌরববীরেরা। কৃষ্ণ রথে চড়ে এগোতেই ঠিক তাঁর পিছন পিছন চলল বিদরের রথ—অন্বারুরোহ দাশার্হাং বিদুরঃ সর্বধর্মবিৎ—এবং তাঁর পরে চলল দুর্যোধন শকুনিদের রথ। কৃষ্ণ বিদুরের বাড়িতে ছিলেন বলেই আজকে যেন বিদুরের খাতির বেড়েছে। দুর্যোধন-শকুনিরা আজকে তাঁর অনুগমন করতে বাধ্য হলেন। কুরুসভায় গিয়ে কৃষ্ণ প্রবেশও করলেন অদ্ভুত এক ইঙ্গিত প্রকট করে। এক হাতে তিনি বিদুরকে ধরলেন, আর এক হাতে ধরলেন বৃষ্ণি বীর সাত্যকিকে। দুজনের হাত ধরে তিনি প্রবেশ করলেন ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায়। বিদুর যেন শান্তির প্রতীক, সারাটা জীবন তিনি কুরু-পাণ্ডবদের একত্র শান্তিতে বসবাস করার সৎ পরামর্শ দিয়েছেন। আর সাত্যকি হলেন যুদ্ধের প্রতীক। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের পর বিরাটনগরের প্রথম আলোচনাসভাতেই তিনি সোজাসুজি কৌরবদের আক্রমণ প্রস্তাব দিয়েছিলেন যদুমুখ্য বলরামের বিরুদ্ধে গিয়েও। কৃষ্ণ যেন বোঝাতে চাইলেন—আমার এক হাতে চিরাচরিত শান্তি আছে, বিদুরের চেহারায়। আর এক হাতে যুদ্ধ, সাত্যকির মূর্তিতে। যেটা তুমি বেছে নাও, দুর্যোধন!

দুর্যোধন শান্তি বেছে নেননি। বিনা যুদ্ধে তিনি সূচ্যগ্র ভূমিও ছেড়ে দিতে রাজি হলেন না। কৃষ্ণ দুর্যোধনকে অনেক বোঝালেন, ভীষ্ম দ্রোণও অনেক বোঝালেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্রও পুত্রকে কম বোঝাননি। বিশেষত, কৃষ্ণ হস্তিনায় আসবার পর থেকে তিনি বেশ ভয়ও পাচ্ছেন, পুত্রের জীবন নিয়ে তিনি অহরহ শঙ্কিত। কৌরবসভায় বসে কনিষ্ঠ বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের এই নবলব্ধ আন্তরিকতা অনুভব করেছেন। অসহায় বৃদ্ধের অবস্থা দেখে কতবার যে বিদুরকে সভার বাইরে গিয়ে সভা ত্যাগ করে চলে-যাওয়া দুর্যোধনকে ফিরিয়ে আনতে হয়েছে! কৃষ্ণ যখন দেখলেন যে, ভাল কথায় কাজ হল না, তখন তিনি পাণ্ডবদের এবং আপন শক্তিমত্তার কথা শুনিয়েছিলেন দুর্যোধনকে। প্রায় ধমক দিয়েই শুনিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ফল হয়েছিল এই—দুর্যোধন সকলকে অগ্রাহ্য করে সভায় বসে-থাকা স্বপক্ষের লোকজনদের নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন রাজসভা থেকে। পুত্রের এই ব্যবহারের জন্য ফাঁকা মাঠে মাঝখান থেকে ধৃতরাষ্ট্র গালি খেলেন ভীষ্মের কাছে।

কৃষ্ণ অবশ্য ছাড়লেন না। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে সর্বাংশে দায়ী করেননি। দুর্যোধনকে রাজবৎ আচরণ করতে দেবার পিছনে কুরুবৃদ্ধ সকলেরই যে প্রশ্রয় ছিল, সে কথা তিনি বলতে ছাড়লেন না। দ্রৌপদীর চরম অপমানের সময় ভীষ্ম দ্রোণ কৃপরা কেউ যে কোনও কথা

বলেননি—এটা কৃষ্ণ ভোলেননি। আগেও তিনি পাণ্ডবদের কাছে মত প্রকাশ করেছিলেন যে, একমাত্র বিদুর ছাড়া আর একটি মানুষও ন্যায়নীতির মাত্রা মেনে কথা বলেননি। অতএব ভীষ্ম-দ্রোণদের দিকে তাকিয়ে এই মুহূর্তে তিনি বলেই ফেললেন যে—একটা মূর্খকে রাজত্ব দিয়ে তাঁকে যে নিয়ন্ত্রণ করার কোনও চেষ্টাই করা হয়নি, সেটা সমবেতভাবে কুরুবৃদ্ধদের কর্তব্যজ্ঞান সম্বন্ধে সংশয় সৃষ্টি করে—সর্বেষাং কুরুবৃদ্ধানাং মহানয়ম্ অতিক্রমঃ। কৃষ্ণ এমন প্রস্তাব করেছিলেন যাতে ভীষ্ম-দ্রোণরাই দুর্যোধন এবং তাঁর দলবলকে বেঁধে নিয়ে পাণ্ডবদের হাতে সমর্পণ করেন।

স্বভাবতই এই কুরুবৃদ্ধদের আওতা থেকে বাদ পড়েন বিদুর। কারণ তিনি অস্ত্রযুদ্ধে পটু নন এবং ভীষ্ম-দ্রোণের মতো তাঁর দৈহিক ক্ষমতা বা যুদ্ধনিপুণতাও বিখ্যাত নয়। কিন্তু তিনি যা পারেন—সেই প্রতিবাদ তিনি কখনও না করে থাকেননি। অন্যায় হলেই তার প্রতিবাদ করেছেন। আর আন্তরিকতা—সেটাও তাঁর কম ছিল না। এই একটু আগেও ভীষ্ম যখন দুর্যোধনকে কৃষ্ণের যুক্তি মেনে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করতে বলেছিলেন, তখন বিদুর অদ্ভুত এক আন্তরিকতায় বলেছিলেন—দুর্যোধন! আমি তোমার জন্য দুঃখ পাই না। দুঃখ পাই তোমার বৃদ্ধা মাতা এবং অসহায় বৃদ্ধ পিতার জন্য—ইমৌ তু বৃদ্ধৌ শোচামি গান্ধারীং পিতরঞ্চতে। যুদ্ধের পরবর্তী অবস্থা দিব্যচক্ষে দেখে যেন বিদুর দুর্যোধনকে বলেছিলেন—তোমার মতো সর্বনেশে মানুষ যেহেতু এই দুটি বৃদ্ধ ব্যক্তির রক্ষক, তাতে ভয় হয় যে, ভবিষ্যতে সহায়হীন বন্ধুহীন অবস্থায় ডানাকাটা পাখির মতো এঁদের বিচরণ করে বেড়াতে হবে—হরমিত্রৌ হতামাত্যৌ লূনপক্ষাবিবাণ্ডজৌ।

ধৃতরাষ্ট্রের জন্য বিদুরের এই সহানুভূতিটুকু সব সময়ই ছিল। কাজেই দুর্যোধন সভা ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পর কৃষ্ণ যখন সমস্ত কুরুবৃদ্ধদেরই দুষলেন, তখন ধৃতরাষ্ট্রও কিছু আত্মযন্ত্রণা বোধ করলেন নিশ্চয় এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিদুরকেই বললেন দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারীকে সভায় নিয়ে আসতে—যাতে তিনি পুত্রকে কথঞ্চিৎ শাসন করেন। বিদুর গান্ধারীকেও সভায় নিয়ে এলেন এবং তাঁর অনুরোধে দুর্যোধনকেও ধরে নিয়ে এলেন সভায়। গান্ধারী পুত্রকে ভর্ৎসনা করলে দুর্যোধন আবারও সভা ত্যাগ করে শকুনির সঙ্গে মন্ত্রণা আরম্ভ করলেন। সে মন্ত্রণার বিষয় ভাল ছিল না। তিনি কৃষ্ণকে বন্দি করতে চাইছিলেন। কিন্তু এই দুষ্ট মন্ত্রণার খবর কৃষ্ণের আনুচর সাত্যকির কানে চলে গেল। সাত্যকি বৃষ্ণি বীর কৃতবর্মাকে নির্দেশ দিলেন সৈন্য সাজানোর, অন্যদিকে সভায় এসে দুর্যোধনের দুরভিসন্ধির কথা কৃষ্ণকে জানালেন। জানালেন ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুরকেও—ধৃতরাষ্ট্রং ততশ্চৈব বিদুরঞ্চান্বভাষত।

বিদুর প্রমাদ গণলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে সাবধান করে বললেন—মহারাজ! আপনার ছেলেদের যম এসে ছুঁয়েছে। নইলে কী দুর্বুদ্ধি হল তাদের যে কৃষ্ণকে বন্দি করার ইচ্ছে করেছে তারা। মরণের ইচ্ছায় যেমন পতঙ্গের পাল এসে আগুনে পুড়ে মরে, তেমনই কৃষ্ণকে বাঁধতে গিয়ে নিজেরাই যে মরবে তারা—আসাদ্য ন ভবিষ্যন্তি পতঙ্গা ইব পাবকম্। বিদুরের কথা শেষ হলে কৃষ্ণ তির্যকভঙ্গিতে বললেন—দুর্যোধন আমাকে বাঁধতে চাইছে, বাঁধুক না। দেখি, আমিই বাঁধা পড়ি, না, সেই বাঁধা পড়ে আমার হাতে। মহারাজ! আপনি অনুমতি করুন দুর্যোধনকে—এতে বা মাম্ অহং বৈনান্ অনুজানীহি পার্থিব।

ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের অনিষ্টাশঙ্কায় ভীষণ ভয় পেলেন এবং আবারও বিদুরকেই আদেশ দিলেন দুর্যোধনকে ধরে আনার জন্য। কতবার এমন অপ্রিয় কাজ করবেন বিদুর! ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ মেনেই তাঁকে যেতে হয়েছিল যুধিষ্ঠিরের কাছে—পাশাখেলার নেমন্তন্ন করার জন্য এবং আজ বার বার তাঁকে দুর্যোধনের কাছে গিয়ে অনুনয়বিনয় করে তাঁকে সভায় প্রবেশ করাতে হচ্ছে। তবু তিনি যাচ্ছেন। ধৃতরাষ্ট্রের আদেশও তিনি অমান্য করতে পারেন না, অপিচ বার বার অপমান সহ্য করে দুর্যোধনকে ডেকে এনেও যদি ভাল হয় দুর্যোধনের, বিশেষত

ধৃতরাষ্ট্রের, তবে বার বার দুর্যোধনের কাছে যেতে লজ্জা এবং আপত্তি কোনওটাই নেই তাঁর। সভায় প্রবেশ করার কোনও ইচ্ছে ছিল না দুর্যোধনের, কিন্তু অনেক উপরোধ করে আবার তাঁকে সভায় প্রবেশ করালেন বিদুর।

ধৃতরাষ্ট্র যথেষ্ট তিরস্কার করলেন দুর্যোধনকে এবং বিদুরও কৃষ্ণের অমানুষী শক্তিমত্তার উদাহরণ দিয়ে তাঁকে তাঁর দুরাগ্রহ থেকে বিরত থাকতে বললেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা। সবার সামনে কৃষ্ণ এবার বিকট হাস্য করে অতিলৌকিক বিশ্বরূপ প্রকট করলেন। ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর এমনকী ধৃতরাষ্ট্রও দিব্যচক্ষে সেই ভীষণ রূপ প্রত্যক্ষ করলেন, কিন্তু দুর্যোধনের কোনও চৈতন্যোদয় হল না। সুকৃতির অভাবে কৃষ্ণের এই অত্যদ্ভুত রূপও তিনি দেখতে পেলেন না। বিশ্বরূপের এই প্রকটন যদি লৌকিক দৃষ্টিতে বিশ্বাস নাও করা যায় তবে লৌকিকভাবে এই বুঝতে হবে যে, সমগ্র কুরুসভার মধ্যে কৃষ্ণ এমন ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন, যাতে সমস্ত মানুষ ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল এবং মুনিঋষিরা তাঁকে ক্রোধ সংবরণ করতে বলেছিলেন। কেননা কৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব তাঁরা জানেন। কৃষ্ণ তাদের কথা শুনেছেন এবং যেভাবে তিনি পূর্বে সভায় প্রবেশ করেছিলেন, সেইভাবেই বিদুর এবং সাত্যকির হাত ধরে সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন—ততঃ সাত্যকিমাদায় পাণৌ বিদুরেমব চ।

কুরুসভায় শান্তির আলোচনা যখন নিষ্ফল হয়ে গেল, কৃষ্ণ তখন আরও একবার কুন্তীর সঙ্গে দেখা করে বিরাটনগরে পাণ্ডবদের কাছে ফিরে গেলেন। কুরুসভায় কে কী বলেছেন, বিশেষত ভীষ্ম দ্রোণ এবং বিদুর কী বলেছেন, সে সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করেছেন কৃষ্ণকে। বিদুরের প্রসঙ্গে যুধিষ্ঠির একটু বেশি আবেগপ্রবণ বটে। কেননা, সমগ্র হস্তিনাপুরে তিনিই বোধ হয় একমাত্র ব্যক্তি যিনি চিরকাল বঞ্চিত পাণ্ডবদের প্রধান সহায়। যুধিষ্ঠির তাই বলেছেন—আমাদের কনিষ্ঠ পিতা বিদুর কী বলেছেন সভায়—পিতা যবীয়ানস্মাকং ক্ষত্তা ধর্মবিদাং বরঃ। তিনি নিশ্চয়ই এতদিন আমাদের না দেখে পুত্রশোকে কাতর হয়ে আছেন। তা তিনি কী বললেন দুর্যোধনকে—পুত্রশোকাভিসন্তপ্তঃ কিমাহ ধৃতরাষ্ট্রজম্।

যাঁরা বিদুর আর কুন্তীর মধ্যে আত্মচ্ছায়াময় কামনার সম্পর্ক দেখেন, তাঁদের কাছে যুধিষ্ঠির-কথিত এই আবেগপ্লুত শ্লোকটি প্রধান উপজীব্য বটে। যুধিষ্ঠির এখানে বিদুরকে পিতা বলে সম্বোধন করছেন, নিজেদের পুত্র বলে চিহ্নিত করছেন, অতএব আর যায় কোথা? মক্ষিকাবৃত্তি লেখকদের সকাম রসনা বড় তৃপ্ত হয় এইসব জায়গায়। মহাভারতের কবি এঁদের চেনেন এবং ভাল চেনেন বলেই পিতা শব্দের পূর্বে কনিষ্ঠ শব্দটি যোগ করে দিয়েছেন—পিতা যবীয়ান্। ঘা খুঁজে বেড়ানো মাছিদের এসব শব্দ চোখে পড়ে না। আর যুধিষ্ঠির যে নিজেকে এবং সমস্ত পাণ্ডব ভাইদের তাঁর পুত্র বলে নির্দেশ করছেন, এই নির্দেশ তো আমাদের সমাজব্যবস্থার মধ্যেই ছিল। আমাদের একান্নবর্তী পরিবারের বড় মা, ছোট মায়েরা আজ হারিয়ে গেছেন নাকি কে জানে, কিন্তু উড়িষ্যার বহু জায়গায় বড় বাবা, ছোট বাবারা এখনও বহাল তবিয়তে আছেন। কাজেই যুধিষ্ঠির যদি বিদুরকে ছোট বাবা পিতা যবীয়ান—বলে ডাকেন, তা হলে বিদুর পাণ্ডবদের পুত্র ছাড়া কীই বা ভাববেন! আমার মেজ কাকার ছেলে যদি আমার পিতাঠাকুরকে পিতার চাইতে কম না দেখে থাকেন, তা হলে আমার পিতাই বা তাঁকে পুত্রের চেয়ে কম ভাববেন কেন? তাই বলে কি মায়েদের জার-সম্বন্ধ অনুমান করতে হবে ভাশুর-দেবরদের সঙ্গে? এসব কোন প্রতিভায় সৃষ্টি হয়?

যাই হোক, যুধিষ্ঠির যে তাঁর কনিষ্ঠ পিতার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে ব্যস্ত হয়েছিলেন তাঁর উত্তরে কৃষ্ণের বয়ান আমরা শুনতে চাই। ঘটনা কী জানেন—রাজসভার মধ্যে দুর্যোধনের উদ্দেশে ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর তথা ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর যে তিরস্কার আক্ষেপ আমরা লক্ষ করেছি মহাভারতের কবির প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে, যুধিষ্ঠিরের কাছে কৃষ্ণের বক্তব্যে তার চেয়ে বেশি কিছু আমরা লক্ষ করছি। দেখা যাচ্ছে—কৌরব রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে আইনি দিক থেকেও

একটা সর্বাঙ্গীন আলোচনা হয়েছিল, যার বিবরণ সভার প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা দেখিনি। কৃষ্ণের বয়ান থেকে দেখা যাচ্ছে—রাজ্যের উত্তরাধিকারের প্রশ্নে কুরুপিতামহ ভীষ্ম একেবারে পুরাতন ইতিহাস তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—এই বংশে রাজা হবার কথা ছিল আমারই। আমি আমার পিতার একমাত্র পুত্র ছিলাম। কিন্তু পিতা শান্তনু নিশ্চিন্ত ছিলেন না। বংশ লুপ্ত হওয়ার ভয়ে তিনি দারপরিগ্রহ করার ইচ্ছা করেন এবং আজীবন ব্রহ্মচারী থাকার প্রতিজ্ঞা করে জননী সত্যবতীকে পিতার স্ত্রী হিসেবে নিয়ে আসি এবং সেও এই শর্তে যে, আমি রাজা হব না—অরাজা চোর্ধ্বরেতাশ্চ যথা সুবিদিতং তব।

ভীষ্ম এরপর বিচিত্রবীর্যের জন্ম বিবাহ, এবং মৃত্যুর বিবরণ দিয়ে কীভাবে তাঁর ওপরে পুনরায় বংশরক্ষার চাপ এবং রাজা হওয়ার চাপ আসে, তার ইতিহাস সবিস্তারে জানিয়েছেন। হস্তিনাপুরের রাজবংশ অক্ষুন্ন রাখার জন্য তিনিই যে তাঁর জননী সত্যবতীর প্রয়াসে সম্মত হয়ে ব্যাসকে ডেকে এনেছিলেন, সে কথাও দুর্যোধনকে জানিয়েছেন ভীষ্ম। কিন্তু সবার শেষে তাঁর সাহংকার ঘোষণাটি ছিল অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তিনি বলেছিলেন—আমি যদি রাজা হতে চাইতাম, তা হলে আমি জীবিত থাকতে কোনও মানুষ এই সিংহাসনে রাজা হয়ে বসতে পারত না—ময়ি জীবতি রাজ্যং কঃ সংপ্রশাসেৎ পুমানিহ। ভীষ্ম বোঝাতে চাইলেন যে, ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর বাবাও যে এই হস্তিনাপুরের রাজত্ব ভোগ করেছেন, তা শুধুই এই কারণে যে, ভীষ্ম তাঁর প্রাপ্য ছেড়ে দিয়েছেন এবং রাজা হননি। রাজা হওয়ার জন্য তাঁর কাছে অনুরোধও কম আসেনি কিন্তু তবু তিনি সব বাসনা ত্যাগ করে হস্তিনাপুরের রাজত্ব ছেড়ে দিয়ে পরম্পরাগত রাজাদের সেবা করে যাচ্ছেন। রাজত্ব ত্যাগ করার বিষয়ে ভীষ্মের যে এই স্বেচ্ছাতাড়না এবং ত্যাগবৃত্তি কাজ করেছে তার পিছনে একমাত্র কারণ ছিল—নিজের কুলের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কলহের নিবৃত্তি করা। ভীষ্ম তাই খুব সচেতনভাবে বলেছেন—আমি বেঁচে থাকতে এ রাজ্য কারওরই পাওয়ার কথা নয়, কারওরই শাসন করার কথা নয়—ময়ি জীবতি রাজ্যং কঃ সংপ্রশাসেৎ পুমানিহ।

ভীষ্মের এই কথার মধ্যে একটা শাসন আছে। শাসনটা এই যে, আজকে যারা রাজ্যের অধিকার নিয়ে ভাইদের সঙ্গে পর্যন্ত যুদ্ধ করতে প্রস্তুত তাদের বস্তুত রাজ্যে কোনও অধিকারই নেই। যে স্বজন-বিরোধ নিবৃত্ত করার জন্য ভীষ্ম রাজ্য ছেড়েছেন, সেই রাজ্যের পরম্পরাগত অধিকার পাণ্ডুর হাতে ছিল। পাণ্ডুর অবর্তমানে ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুর সেই রাজ্য রক্ষা করছেন মাত্র। সেখানে দুর্যোধনের অধিকার আছে কী করে? দ্রোণাচার্য ভীষ্মের কথা শুনে এই আইনি ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন সবার সামনে। তিনি বলেছিলেন—লোকে বিশ্বাসী মানুষের কাছে টাকাপয়সা গচ্ছিত রেখে গেলে সে ধনের ওপরে যেমন স্বত্ব-স্বামিত্ব জন্মায় না, তেমনই এখানেও পাণ্ডু তাঁর রাজ্য গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন দুজনের কাছে। অন্ধ হলেও জ্যেষ্ঠ বলে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে, শূদ্রাগর্ভজাত হলেও অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে বিদুরের কাছে। এই দুজনের হাতেই তিনি রাজ্যের রক্ষার ভারমাত্র দিয়ে গিয়েছিলেন—জ্যেষ্ঠায় রাজ্যমদদদ্ ধৃতরাষ্ট্রায় ধীমতে। যবীয়সে তথা ক্ষত্রে...।

এই অবস্থায় বিদুর কী করলেন, সেটা দেখবার মতো। দ্রোণাচার্য ব্যাখ্যা করে বললেন। বলতে চাইলেন—দুজনকে রাজ্যের ভার দেওয়া সত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্র যে একক রাজবৎ আচরণ করতে পেরেছেন, তাঁর পিছনে বিদুরের অবদান সবচেয়ে বেশি। দুজনই যুগপৎ রাজ্যের ভার পেলেও বিদুর বুঝলেন যে, একই রাজ্যে দুইজনের শাসন চলবে না, তাতে অশান্তি বাড়বে। বিশেষত যদি জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রকে প্রজাদের কাছে রাজবৎ গ্রাহ্য করাতে হয়, তবে তাঁকেই নিচু হতে হবে। অতএব বিদুর কী করলেন? বিদ্যায় এবং বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ মানুষদের অন্যতম হওয়া সত্ত্বেও তিনি ধৃতরাষ্ট্রের চাকরের মতো ভাব দেখাতে লাগলেন। এমনকী নীচ ভৃত্যজনে যা করে, তিনি সেই ভৃত্যের হাত থেকে চামর কেড়ে নিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের মাথার ওপর চামর দোলানো আরম্ভ করলেন প্রতিদিন—প্রেষ্যবৎ পুরুষব্যাঘ্রো বালব্যজনমুৎক্ষিপন্। ঠিক

বিদুরের এই আচরণ দেখেই প্রজারা তখন ধৃতরাষ্ট্রকে রাজা বলে মেনে নিয়েছে—ততঃ সর্বাঃ প্রজাস্তাত ধৃতরাষ্ট্রং জনেশ্বরম্। অন্বপদ্যন্ত বিধিবৎ...। প্রজারা যখন এইভাবে ধৃতরাষ্ট্রকে মেনে নিয়েছে, তখনই বিদুর চামর দোলানো ছেড়ে তাঁর রাজ্যের কোষসঞ্চয়ে এবং বিভাগীয় শাসনগুলি শক্তপোক্ত করায় মন দিয়েছেন।

দ্রোণাচার্য বোঝাতে চাইলেন যে, রাজা হিসেবে ধৃতরাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠিত করার পিছনে বিদুরের অবদানই সবচেয়ে বেশি। ধৃতরাষ্ট্রের শাসনে তিনি সদাসর্বদা ধৃতরাষ্ট্রের পিছনে থেকেই সহায়তাই করে গেছেন শুধু—অম্বাস্যমানঃ সততং বিদুরেণ মহাত্মনা। কিন্তু তাঁর যা বিদ্যেবুদ্ধি ক্ষমতা ছিল, তাতে বিদুর চাইলে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে বিবাদ করে হস্তিনাপুরের রাজত্বভার করায়ত্ত করতে পারতেন নিশ্চয়। কিন্তু তিনি তো তা করেননি। সেখানে দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের ঘরে জন্মে এই ভ্রাতৃবিবাদ বাধাতে চাইছেন।

মনে রাখবেন—কৃষ্ণ কিন্তু রিপোর্ট করছেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। কুরুদেশের রাজত্ব নিয়ে অধিকারের প্রশ্ন ছিল—সে বিষয়ে ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্যের বক্তব্য রিপোর্ট করছেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণ জানাচ্ছেন—কুরুসভায় রাজ্যের উত্তরাধিকার সম্পর্কে যে গুরুত্বপূর্ণ আইনি প্রশ্ন উঠেছিল, তাতে ভীষ্ম দ্রোণের মতো গান্ধারীও শামিল ছিলেন। ভীষ্ম দ্রোণের মত সম্পূর্ণ স্বীকার করে গান্ধারী বলেছিলেন—ঠিকই তো! এই রাজ্যের রাজা হবার কথা ছিল ভীষ্মেরই এবং তিনি যদি রাজা থাকতেন তা হলে ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুর ভীষ্মের শাসনমতোই রাজত্ব চালাতেন—ভীষ্মে স্থিতে পরবন্তৌ ভবেতম্। কিন্তু তিনি রাজ্য নিতে ইচ্ছা করেননি এবং পাণ্ডুও এখন বর্তমান নেই। কিন্তু পাণ্ডুর অবর্তমানে তাঁর রাজ্য পরিচালনা করছেন বুদ্ধিমান ধৃতরাষ্ট্র এবং দীর্ঘদর্শী বিদুর। এই দুজনকে অতিক্রম করে দুর্যোধন কী করে রাজ্য প্রার্থনা করে তাতে অবাক হয়েছেন জননী গান্ধারী—এতাবতিক্রম্য কথং নৃপত্বং দুর্যোধন প্রার্থয়সে'দ্য মোহাৎ।

ধৃতরাষ্ট্রের রাজমর্যাদার জন্য বিদুর কী করেছেন—দ্রোণ বা গান্ধারী সেই আত্মত্যাগ নিরূপণ করার চেষ্টা করলেও মহাবিনয়ী বিদুর সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন। তিনি বরং ভীষ্মের ওপরেই খানিকটা অভিমান করেছেন, অন্তত কুরুসভায় কৃষ্ণ সেইরকমই দেখেছেন। বিদুর পূর্বেও দেখেছেন এবং এখনও দেখছেন যে, মহান ব্যক্তিত্বময় কুরুবৃদ্ধ পিতামহ সব সময়ই বিবাদ চাপা দিয়ে চলেছেন, তার মূলটুকু ধ্বংস করার ব্যাপারে তিনি যেন কেমন ভাবাতুর হয়ে পড়েন। সেই পিতা শান্তনুর আমল থেকে যখনই কোনও বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে, ভীষ্ম তখনই তাকে চাপা দেবার চেষ্টা করে গেছেন সব সময়। আর নিজে এই বিশাল কুরুবংশের একটার পর একটা রাজাকে সেবা করে চলেছেন সেবাদাসীর মতো। ভীষ্ম তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং মর্যাদা খাটিয়ে কঠিন করে কিছু বলেন না বলেই বিদুরের মতো মানুষ আজ সঙ্গীহীন হয়ে পড়েছেন।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বিদুরের এই অসম্ভব ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন। বিদুর কোনও দিন ভীষ্মের বিরুদ্ধে একটি বর্ণও উচ্চারণ করেননি। কিন্তু সভায় পাণ্ডুর অবর্তমানে যখন ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুরের সমতা প্রতিষ্ঠিত হল, দ্রোণ যখন রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুরের সমান অধিকার মেনে নিলেন, বিদুর তখন ক্ষিপ্ত হয়ে ভীষ্মের দিকেই তাকিয়ে বলেছিলেন—আপনি শুনুন কুমার দেবব্রত! কুরু বংশের সর্বনাশ উপস্থিত হয়েছিল, আপনি সেই বংশকে রক্ষা করেছিলেন। আজকেও সেই বংশের সর্বনাশ উপস্থিত। কিন্তু আমি শুধু চেঁচিয়ে মরছি, আপনি শুনছেন না—তন্মে বিলপমানস্য বচনং সমুপেক্ষসে। আমি শুধু জিজ্ঞাসা করছি—কে এই দুর্যোধন? তাঁর কীসের অধিকার? যে লোকটা নাকি লোভে জর্জরিত, লোভের বশবর্তী হয়ে যে নাকি পিতার আদেশও মানছে না, সেই অকৃতজ্ঞ দুর্জনের বুদ্ধিতে আপনি চলছেন কেন—যস্য লোভাভিভূতস্য মতিং সমনুবর্তসে?

বিদুর এবার সাভিমানে বলেছেন ভীষ্মকে—চিত্রকর যেরকম ছবি এঁকে ছবিটাকে অচল নিষ্ক্রিয় করে রাখে, আপনিও সেইরকম ধৃতরাষ্ট্র এবং আমাকে নিশ্চল নিষ্ক্রিয় করে রেখেছেন—চিত্রকার ইবালেখ্যং কৃত্বা স্থাপিতবানসি। প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন লোকসৃষ্টি করে আবার সেই সৃষ্টি সংহার করেন, তেমনই আপনিও এই বংশের সৃষ্টি করে আবার তাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। এখন যে ভয়ংকর বিনাশ উপস্থিত, অথচ আপনার বুদ্ধি সঠিক কাজ করছে না। এর চেয়ে বরং এই ভাল হত যে এই বংশ ধ্বংস না দেখে আমি বনে চলে যাই এবং আপনিও ধৃতরাষ্ট্রকে নিয়ে আমার সঙ্গে বনে চলুন—বনং গচ্ছ ময়া সার্দ্ধং ধৃতরাষ্ট্রেণ চৈব হ। আর সে ইচ্ছে যদি না থাকে, তবে আপনার উচিত এখনই এই বদমাশ দুর্যোধনটাকে বেঁধে রেখে নিজেই এই রাজ্যটাকে শাসন করুন। পাণ্ডবরা যথোচিতভাবে আপনাকে সাহায্য করবেন—শাধীদং রাজ্যমদাশু পাণ্ডবৈরভিরক্ষিতম্।

আমরা জানি—বিদুর কোনও দিন এত ক্ষুব্ধ হয়ে ভীষ্মের সঙ্গে কথা বলেননি। কিন্তু বোধ হয় শেষ সময় উপস্থিত বলেই অথবা যুদ্ধ লাগবার আগে শেষ চেষ্টা হিসেবেই বোধ হয় বিদুর এমন করে বলেছিলেন ভীষ্মকে। কুরুসভার প্রক্রিয়া এবং কৃষ্ণের জবানীতে আমরা বুঝতে পারি যে, ভীষ্মও কম চেষ্টা করেননি যুদ্ধ থামাবার, এমনকী স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্র এবং জননী গান্ধারীও কম চেষ্টা করেননি, কিন্তু বিষবৃক্ষ একবার দৃঢ়মূল হয়ে উঠলে সে বৃক্ষ যেমন আর ছেদন করেও লাভ হয় না, দুর্যোধনকে তেমনই বারণ করা যায়নি। সবই বোঝা গেল, কিন্তু বিষবৃক্ষ যখন একটু একটু করে বড় হচ্ছিল, তার মূল যখন একটু একটু করে হস্তিনাপুরের ভূমিতে প্রোথিত হচ্ছিল, তখনই দুর্যোধনকে ছেঁটে ফেলার যে চেষ্টাটুকু করা যেত, সে চেষ্টায় ত্রুটি ছিল ভীষ্মের। বিদুর তো দুর্যোধনের জন্মলগ্ন থেকেই তাঁকে ত্যাগ করতে বলছেন। কিন্তু তাঁর হাতে ক্ষমতা ছিল কম এবং তিনি অস্ত্রযুদ্ধ করেননি কখনও। কিন্তু যে ভীষ্ম-দ্রোণেরা দেবতাদেরও অপ্রতিরোধ্য ছিলেন, তাঁরা দুর্যোধনকে অনেক তিরস্কার করেও কিন্তু দুর্যোধনের পক্ষভূত কৌরববাহিনী থেকে নিজেদের সরিয়ে নেননি। কিংবা একবারেব তরেও দুর্যোধনকে বলেননি যে,—না দুর্যোধন! আমরা তোমার মতো অন্যায়ী লোকের পক্ষে থেকে যুদ্ধ করব না। দুর্যোধনের পক্ষ ত্যাগ না করার পিছনে তাঁদের নিজস্ব যুক্তি আছে হয়তো, কিন্তু সে যুক্তি যুদ্ধ থামানোর ঐকান্তিকতাকে স্পর্শ করে না। ঠিক সেই জন্যেই যুধিষ্ঠিরকে ‘রিপোর্ট’ করার সময় সূক্ষ্মবুদ্ধি কৃষ্ণ বলতে বাধ্য হয়েছিলেন—সভায় একমাত্র বিদুর ছাড়া আর কেউই সঠিক কথা বলেননি, ভীষ্ম-দ্রোণও না। বিদুর ছাড়া আর সকলেই বোধ হয় দুর্যোধনের মতেই চলেছেন—সর্বে তমনুবর্তন্তে ঋতে বিদুরমচ্যুত।

হস্তিনাপুরে বিদুর যে এই একক ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত হয়েছেন, তার কারণ বিদুরের প্রতিবাদী চরিত্র। কোনওদিন তিনি অন্যায়ের সঙ্গে আপস করলেন না, রাজা বলে, রাজপক্ষ বলে, অথবা স্ববংশ বলেও কাউকে তোষামোদ করলেন না। রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছিলেন—যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে—তা সত্যিই কেউ তাঁর ডাক শুনে আসেননি। তিনি একলা চলেছেন। দুর্যোধন যখন সূচ্যগ্র ভূমি দিতেও রাজি হল না এবং তাই যুদ্ধও যখন অনিবার্য হয়ে পড়ল, তখন বিদুর কোনও পক্ষেই যোগ দেননি—না কৌরবদের সঙ্গে, না পাণ্ডবদের সঙ্গে। কারণ তিনি জানতেন—যুদ্ধ দুই পক্ষেরই ক্ষতি করে। তিনি যুদ্ধ চান না। সমস্ত যুদ্ধপর্ব জুড়ে তাই আমরা বিদুরের একটি কথাও শুনিনি। উপদেশ শুনিনি, তিরস্কারও শুনিনি, হা-হুতাশও শুনিনি। বিদুর কোনও কথা বলেননি বটে, কিন্তু বিদুরের কথা স্মরণ করেছেন সকলে এবং তা মৃত্যুকালে। শকুনি স্মরণ করেছেন, স্মরণ করেছেন দুর্যোধন। যুদ্ধের শেষ পর্বে ভাইবন্ধু সকলকে হারিয়ে দুর্যোধন যখন একা প্রাণভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, সেইদিন তার মনে পড়েছে বিদুরের কথা—সমার বচনং ক্ষত্তু-ধর্মশীলস্য ধীমতঃ।

যুদ্ধ যত এগিয়েছে, যুদ্ধের লোকক্ষয়কর ধ্বংস-শব্দ শুনতে শুনতে বিদুর তত সংহত

হয়েছেন আপন অন্তরের মধ্যে। তিনি জানেন—বড় কঠিন সময় আসছে, এবং তাঁকে এমন সময়ে ধৃতরাষ্ট্রের পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হবে, যখন আর কারও কথা বলার ইচ্ছে থাকবে না। সত্যিই তাই হল। মাত্র আঠারো দিনের মধ্যে যুদ্ধকল-সংকুল কুরুক্ষেত্র নিস্তব্ধ হয়ে গেল। আত্মীয়বন্ধু এবং প্রিয় পুত্রদের শোকে আকুল হয়ে ছিন্নশাখ দ্রুমের মতো পড়ে আছেন ধৃতরাষ্ট্র। সূত সঞ্জয়, যিনি এতদিন বিবিধ যুদ্ধের বিচিত্র উচ্চাবচ বর্ণনা দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে কোনওমতে ধারণ করে রেখেছিলেন, আজ তাঁকে বলতে হচ্ছে—আর শোক করেও লাভ নেই। মহারাজ! শোকের মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার কোনও সহায়তা পাবেন না। পৃথিবী এখন নির্জন শূন্য হয়ে গেছে—নির্জনেয়ং বসুমতী শূন্যা সম্প্রতি কেবলা।

মানুষ হিসেবে সঞ্জয় খুব আবেগপ্রবণ নন। ধৃতরাষ্ট্রের কূট ভাবনা, দুর্যোধনের ঔদ্ধত্য এবং সে ব্যাপারে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্রয়ও তিনি দেখেছেন। যুধিষ্ঠিরের কাছে তাঁকে ধৃতরাষ্ট্রের দূত হয়ে যেতে হয়েছিল। সেখানেও তাঁকে ধৃতরাষ্ট্রের দ্বৈত সত্তা দেখতে হয়েছে—মুখে শান্তির বাণী, অথচ রাজ্য ফিরিয়ে দেবার কোনও প্রতিশ্রুতি নেই। সঞ্জয়কে এইসব দুর্ভোগ পোয়াতে হয়েছে এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ তাঁকে দেখতে হয়েছে। অতএব আজকে যখন হৃতরাজ্য হতবন্ধু ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ করছেন, তখন সঞ্জয় কোনও মায়া বোধ করছেন না। দুর্যোধন যেসব অন্যায় করেছেন এবং সেই অন্যায় ঔদ্ধত্যের প্রতি ধৃতরাষ্ট্র যেভাবে ঔদাসীন্য দেখিয়েছেন, সঞ্জয় সেগুলি বলতে ছাড়ছেন না। সঞ্জয় আবেগহীন।

ধৃতরাষ্ট্রের শোকদিগ্ধ অন্তর-ক্ষতের মধ্যে সঞ্জয়ের এই ক্ষারক্ষেপণ বিদুর সইতে পারেননি। সঞ্জয়ের সব কথা সত্য হলেও সেই কথা বলে চিরকালের অস্থির এই বৃদ্ধকে যে আর কষ্ট দিয়ে লাভ নেই, সে কথা কবিজনোচিত বেদনায় বোঝেন বিদুর। ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এসে বেদান্তবেদ্য দার্শনিকভাবে অমৃতবিন্দু সিঞ্চন করে বিদুর বললেন—আপনি উঠুন মহারাজ! নিজের মধ্যে নিজেকে ধারণ করুন। সমস্ত প্রাণীর মৃত্যুই তো শেষ গতি। তাঁর জন্য শোক করে লাভ নেই। দেখুন, যা কিছু আমাদের সঞ্চিত ধন, তাঁর ক্ষয় আছে। যার উত্থান আছে, তারই পতন আছে। মিলনের পরিণতি বিচ্ছেদে এবং জীবনের শেষ পরিণতি মৃত্যু। জন্ম জন্ম ধরে শত সহস্র মাতাপিতা, স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ হয়। তাঁদের সঙ্গে আমাদের এবং আমাদের সঙ্গে তাঁদের কোনও স্থায়ী সম্বন্ধ নেই—কস্য তে কস্য বা বয়ম্। আপনি বুদ্ধিমান মানুষ, মহারাজ! আপনি আপনার প্রজ্ঞার দ্বারা আপনার মানসিক দুঃখকে জয় করবেন। দুঃখের যত কারণ ঘটে, সেই দুঃখকারণগুলি নিয়ে বেশি ভাবনা না করাটাই দুঃখনিবৃত্তির উপায়। চিন্তা করলে কখনও কখনও দুঃখের উপশম হয় না, তাতে দুঃখ আরও বাড়ে—চিন্ত্যমানং হি ন ব্যেতি ভূয়শ্চাপি বিবর্ধতে।

ধৃতরাষ্ট্রকে শোকমুক্ত করবার জন্য বিদুর এখানে অনেক কথা বলেছেন। সব কথা এখানে বলার পরিসর নেই, তবে একটা কথা না বললেই নয় যে, বিদুরের উপদেশ শুনতে শুনতে আমাদের ভগবদ্‌গীতার কথা মনে পড়ে যাবে। গীতায় অর্জুনকে আমরা দেখেছি, যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে পিতার সমান ভীষ্ম দ্রোণ, ভ্রাতৃসমান দুর্যোধন দুঃশাসনকে বধ করার আশঙ্কায় শোকসন্তপ্ত হয়ে ধনুকবাণ ন্যস্ত করে রেখেছিলেন অর্জুন। কৃষ্ণ তখন বিভিন্ন দর্শনোক্ত পরম জ্ঞানের উপদেশ দিয়ে অর্জুনকে পুনরায় যুদ্ধে নিযুক্ত করেন। সমস্ত জ্ঞানোপদেশের পূর্বে শরীরের অনিত্যতা এবং শোক-মোহ-দুঃখের নিবৃত্তিমূলক যে শাস্ত্রজ্ঞান, সেগুলি অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন কৃষ্ণ। কিন্তু গীতার উপদেশের চাইতে বিদুরের উপদেশের বিশিষ্টতা হল—গীতায় অর্জুন তখনও যুদ্ধ করেননি, যুদ্ধের উদ্যোগেই তিনি শোকগ্রস্ত। আর এখানে ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র মারা গেছে এবং তিনি বৃদ্ধ। গীতার উপদেশে কৃষ্ণ অর্জুনের সখা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর যতটুকু মায়ামমতা দেখেছি, তার চাইতে দার্শনিক উপদেশের প্রাবল্য সেখানে। বেশি। কিন্তু বিদুরের উপদেশের মধ্যে গীতার দার্শনিকতাটুকু তো আছেই, তার সঙ্গে আছে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের স্নিগ্ধতা। বিদুর

নীতিশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি বলে এমন সুন্দর সুন্দর সব উদাহরণ দিয়ে দার্শনিকতার প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, তা শুনলে মানুষের বৈরাগ্য উদ্দীপিত হবে। সেই বৈরাগ্য শুষ্ক নয় একটুও এবং শুষ্ক যে নয়, তার কারণ বিদুরের স্নিগ্ধ অনুভূতি এবং স্থান কাল-পাত্রের বোধ। ঠিক সেই জন্যই বিদুর কথা আরম্ভ করার আগে মহাভারতের বক্তা বৈশম্পায়ন বিদুরের বিশেষণ না দিয়ে তাঁর কথার বিশেষণ দিয়েছেন। বলেছেন—বিদুর তাঁর অমৃতময়ী কথায় ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বস্ত করেছিলেন—ততো'মৃতময়ৈর্বাক্যৈর্হ্লাদয়ন্ পুরুষর্ষভম্।

ধৃতরাষ্ট্রের যে শোকদিগ্ধ অবস্থা হয়েছিল শত শত শান্ত উপদেশেও সে শোক যাবার নয়। তবু বিদুরের দার্শনিক স্নিগ্ধতায় তাঁর সংবিৎ ফিরে এল। এক সময় তিনি দাঁড়িয়ে বিদুরকেই আদেশ দিলেন হতপুত্রা গান্ধারী এবং কুন্তীকে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে। এই বুঝি প্রথম ধৃতরাষ্ট্র তাঁর স্বামীহীনা ভ্রাতৃবধূর মর্মবেদনা প্রথম এমন করে উপলব্ধি করলেন। হস্তিনাপুরের অন্দরমহলে তখন শোকের ঝড় বইছে। কত শত রমণী বিধবা হয়েছেন, কত জনে পুত্র হারিয়েছেন, আর জননী গান্ধারী শত পুত্র হারিয়ে কীরকম শোকদগ্ধ হয়ে আছেন, তা অনুমান করা যায়। শোকের এই আর্তভূমিতে যে ব্যক্তিকে প্রথম এসে সান্ত্বনা দিতে হয়, তাঁকে যে কী সইতে হয়, তা যিনি প্রথম যান তিনিই জানেন। বিন্দুর স্ত্রী-সমাজে এসে তাঁদের যথাসম্ভব শান্ত করে বিভিন্ন যানে আরোহণ করিয়ে হস্তিনাপুর থেকে বেরোলেন যুদ্ধভূমি কুরুক্ষেত্রের পথে। যুদ্ধভূমিতে সমস্ত যুদ্ধবীরদের ক্ষতবিক্ষত শরীরগুলি দেখে রমণীকুলের মধ্যে যে শোক-সন্তাপ তৈরি হয়েছিল, সেই সন্তাপ থেকে বিদুরও রক্ষা পাননি। সব তাঁকে দেখতে হয়েছে এবং যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছাক্রমে যুদ্ধবীরদের দাহকার্যও সম্পন্ন করতে হয়েছে বিদুরকেই। সব মিটে যাবার পর অনেক উপরোধ-অনুরোধের পর যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। এই আরোহণ তাঁর পক্ষে খুব সহজ এবং আনন্দের হয়নি। আত্মীয়বন্ধু হারিয়ে এমন মানসিক অবস্থা তাঁর হয়েছিল যে, ভোগ-সুখ ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করাটাই তাঁর কাছে শ্রেয় মনে হচ্ছিল। যাই হোক, হস্তিনাপুরের সমস্ত সজ্জন-শুভার্থীর চাপে যুধিষ্ঠির রাজ্য গ্রহণ করলেন বটে, কিন্তু হতপুত্র ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি সম্মান দিলেন অধিরাজের মর্যাদায়। অভিষেকের পরেই তিনি প্রজাদের তথা সমাজমুখ্য ব্রাহ্মণদের বলে দিয়েছিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্রকে আপনারা আগে যেমন রাজা বলে সম্মান করতেন, এখনও তাই করবেন। মনে রাখবেন, এই রাজ্য তাঁরই এবং আমরা পাণ্ডবরাও তাঁরই অধীন—অস্যৈব পৃথিবী কৃৎস্না পাণ্ডবাঃ সর্ব এব চ।

যুধিষ্ঠিরের কাছে ধৃতরাষ্ট্র যে সম্মান পাচ্ছেন, তা বুঝি তিনি পুত্র দুর্যোধনের কাছেও পাননি। শত পুত্রের মৃত্যুর পর এখন ধৃতরাষ্ট্র বুঝতে পারেন যে, সত্যিই এতদিন তিনি ভুল করেছেন। বিশেষ করে ভীষ্ম পিতামহ যখন যুদ্ধের দীর্ঘদিন পরে স্বর্গারোহণ করলেন, ধৃতরাষ্ট্র তখন সত্যিই অনুভব করলেন যে, মহামতি বিদুরের কথা না শুনে তিনি সত্যিই বড় ভুল করেছেন। এখন তিনি বার বার অনুতাপ করেন। যে সময় থেকে বিদুর তাঁকে দুর্যোধনের সম্বন্ধে সাবধান করেছেন, সেই সময় যেকোনও একবারও যদি তিনি দুর্যোধনকে রাজকার্য থেকে সরিয়ে রাখতেন, তা হলে আজকে তাঁর পুত্রেরাও মারা যেতেন না, আত্মীয়বন্ধুরাও বেঁচে থাকতেন সকলে। আর যুধিষ্ঠির রাজা হওয়া সত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্র কতটা মর্যাদা পাচ্ছেন, এখন তা তিনি বুঝতে পারেন। একদিন তিনি যুধিষ্ঠিরের কাছেই অনুতাপ করেছেন বিদুরের কথায় কান দেননি বলে। তিনি বলেছেন—বিদুর আমাকে বার বার বলেছিল যে, দুর্যোধনকে সরিয়ে দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে রাজা করুন। বলেছিল—আর তা যদি না পারেন, তবে আপনি নিজেই রাজা হোন অন্তত। আপনার জ্ঞাতিরা না হয় আপনার ওপরেই নির্ভর করবেন। কিন্তু আমি শুনিনি যুধিষ্ঠির! শুধু তাঁর কথা না শোনার ফলেই—অশ্রুত্বা হিতকামস্য বিদুরস্য মহাত্মনঃ—আজকে আমি এই দুর্গতি ভোগ করছি।

মনের এই পশ্চাত্তাপ এবং শোকাতুরতাই ধৃতরাষ্ট্রকে আর সুস্থ থাকতে দেয়নি। বিদুরও

যে খুব ভাল ছিলেন তা নয়। যুধিষ্ঠির রাজা হবার পর তাঁকে অনেক সম্মান দিয়েছেন বটে, কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যে প্রাণী-বিয়োগ ঘটেছে তা বিদুরের আন্তর বৈরাগ্যকে আরও প্রদীপিত করেছে। যুধিষ্ঠির রাজা হবার পর বিদুরকে শুধু মন্ত্রীপদেই নিযুক্ত করেননি, যেকোনও সিদ্ধান্ত নেবার সময় বিদুরের অভিমত ছাড়া তিনি চলতেন না। অন্যদিকে পররাষ্ট্রনীতির সমস্ত কূটনৈতিক অভিসন্ধিগুলি তিনি বিদুরের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছিলেন—মন্ত্রে চ নিশ্চয়ে চৈব ষাড়্গুণ্যস্য চ চিন্তনে। বিদুর পূর্বেও এইসব গুরুত্বপূর্ণ রাজকর্মগুলি করেছেন, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের আমলে তাঁর যে স্বাধীনতা ছিল, তাঁর চেয়ে স্বভাবতই এখন তাঁর স্বাধীনতা বেশি। কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা সত্ত্বেও যে সময়ে তিনি মন্ত্রী-অমাত্যের দায়িত্ব পেলেন, সেই দায়িত্বের মধ্যে আর তাঁর মানসিক বন্ধন ছিল না।

বন্ধন ছিল না ধৃতরাষ্ট্রের জন্যই। যুধিষ্ঠিরের ধীর-মধুর ব্যবহারে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী এবং বিদুর যথেষ্টই মুগ্ধ ছিলেন। কিন্তু মধ্যম পাণ্ডব ভীমকে নিয়েই একটু মুশকিল হল। তিনি ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে শুনিয়ে শুনিয়ে, কীভাবে তাঁর ছেলেদের গদাঘাতে চূর্ণ করেছেন—সে সব কথা খুব সরস করে বলতেন লোকের কাছে। যুধিষ্ঠির ভীমের এই নিষ্ঠুর ব্যবহারের খবর রাখতেন না এবং ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে দুঃখ পেলেও ভীমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যুধিষ্ঠিরের শান্তি বিঘ্নিত করতেন না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ভীমের এই ব্যবহার ধৃতরাষ্ট্রের কাছে অসহ্য হয়ে উঠছিল। ভীম যে তাঁর ব্যবহারে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে উত্ত্যক্ত করছেন—এটা বিদুরও জানতেন এবং বৃদ্ধ দম্পতীর সঙ্গে তিনিও এই ব্যবহারে মোটেই সন্তুষ্ট হননি। কিন্তু তিনিও এ ব্যাপারে যুধিষ্ঠিরের কাছে অনুযোগ করেননি। কারণ, তিনি বুঝতে পারছিলেন—ভীমের ব্যবহার নিমিত্তমাত্র, এবার সবকিছু ছেড়ে দেবার সময় হয়েছে—ধৃতরাষ্ট্রেরও। তাঁরও।

ধৃতরাষ্ট্র একদিন নিজেই তুললেন সে কথা। যুধিষ্ঠিরের কাছে ধৃতরাষ্ট্র বানপ্রস্থী হবার বাসনা জানালেন। যুধিষ্ঠির অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বৃদ্ধের আগ্রহাতিশয্যে রাজি হলেন শেষ পর্যন্ত। ধৃতরাষ্ট্র বনে চলে যাবেন বলে বিদুরের মনও বিষন্ন হয়েছে। বনে যাবার আগে যুদ্ধপ্রেত বীরদের ঊর্ধ্বদৈহিককার্যের জন্য ধৃতরাষ্ট্র কিছু অর্থ চেয়ে বিদুরকে পাঠালেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। যুধিষ্ঠির এবং অর্জুন ধৃতরাষ্ট্রের এই ইচ্ছায় সানন্দে রাজি হয়েছেন বটে, কিন্তু মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন এই প্রস্তাবে বাধা দিয়েছেন এবং বিদুরের সামনেই তিনি দুর্যোধন দুঃশাসন এবং ধৃতরাষ্ট্রের পূর্বকৃত অপব্যবহারগুলি এমনভাবেই উচ্চারণ করেছেন—যা বিদুরের ভাল লাগেনি। যুধিষ্ঠির এবং অর্জুন অবশ্য ভীমকে সঙ্গে সঙ্গে তিরস্কার করে ধৃতরাষ্ট্রের মর্যাদা সম্বন্ধে অবহিত হতে বলেছেন, কিন্তু ভীমের উত্তাপ তাতে স্তিমিত হলেও নিরস্ত হয়নি।

বিদুর অবশ্য এতটাই বাস্তববাদী যে, ভীমের ক্ষোভটুকু তিনি অনুধাবন করেন, কাজেই ধৃতরাষ্ট্রের কাছে যখন তিনি পাণ্ডব ভাইদের মনোভাব বর্ণনা করেছেন, তখন যুধিষ্ঠির অর্জুনের সানন্দ সম্মতির কথা বলবার সময়েও ভীমের ক্ষোভটুকুও তিনি লুকোলেন না। এর দুটো কারণ আছে। তিনি বোঝাতে চাইলেন ভীমই দুর্যোধনের শত্রুতা সবচেয়ে বেশি সহ্য করেছেন। সেই তাঁকে বিষ দিয়ে মারবার চেষ্টা থেকে আরম্ভ করে জতুগৃহদাহ, দ্রৌপদীকে সভায় নিয়ে আসা এবং বনবাস-দুঃখ—এসবের সম্পূর্ণ অত্যাচারটুকু তাঁর উপর দিয়ে বেশি, কারণ সমস্ত অপমানের প্রতিকার করার দৈহিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁকে সব সইতে হয়েছে যুধিষ্ঠিরের সত্যরক্ষার কারণে। বিদুর তাই বলেছেন—ভীমের কথায় কিছু মনে করবেন না, মহারাজ। ক্ষত্রিয়দের স্বভাবই বোধ হয় এইরকম—এবং প্রায়ো হি ধর্মো'য়ং ক্ষত্রিয়াণাং নরাধিপ।

ভীমের অসন্তোষের কথা ধৃতরাষ্ট্রকে জানানোর আর একটা কারণ বোধ হয় বিদুরের

ইচ্ছাকৃত। হয়তো তিনি ভেবেছেন—ভীমের অপব্যবহারে ধৃতরাষ্ট্রের যে আঘাতটুকু লাগবে, সেই আঘাতটুকুকে সত্য জানাই ভাল। কারণ ধৃতরাষ্ট্রের মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য আসা দরকার। একটা বয়সের পর বৈরাগ্য অবলম্বন করে বানপ্রস্থে না গেলে সংসারের বহু দুঃখকষ্ট তাকে দেখে যেতে হবে। ধৃতরাষ্ট্র এমনিতে আঁকড়ে পড়ে থাকতেই ভালবাসেন। এতকাল পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে রাজ্য আঁকড়ে পড়েছিলেন এবং যুধিষ্ঠির সিংহাসন লাভের পর যদি ভীমের ওই চোর্যকৃত বাক্যবাণ ধৃতরাষ্ট্রকে আঘাত না করত, তবে তিনি রাজ্য আঁকড়েই পড়ে থাকতেন। বিদুর তা চান না। বিদুরের পিতা ব্যাসের শিক্ষা এটা নয়। তাঁর জননী সত্যবতী যথেষ্ট রাজনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনিও শান্তনুর মৃত্যুর পর, দুই পুত্রের মৃত্যুর পরও পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্রদের নিয়ে সুখে ছিলেন। কিন্তু দুর্যোধনের পরেও যখন তিনি সংসার থেকে নড়ছেন না, তখন ব্যাস জননী সত্যবতীকে প্রায় জোর করেই বানপ্রস্থের উপদেশ দেন। ব্যাসের এই শিক্ষা বিদুরের মনে আছে বলেই ভীমের অপমানজনক ব্যবহারটুকু তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই হয়তো উল্লেখ করেছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে।

যাই হোক, শ্রাদ্ধ এবং দানধ্যান সেরে ধৃতরাষ্ট্র বনে গেলেন এবং তাঁকে সময়োচিত সেবা করবার জন্য বিদুরও গেলেন তাঁর সঙ্গে। তবে বনের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র খানিকটা সুস্থিত হবার পর বিদুরকে কিন্তু আর তাঁর সঙ্গে থাকতে দেখছি না। ধৃতরাষ্ট্রের বনগমনের বেশ কিছু দিন পর যুধিষ্ঠির যখন ধৃতরাষ্ট্র এবং জননী কুন্তীর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন, তখন তিনি বিদুরকে দেখতে না পেয়ে অবাক হলেন। ধৃতরাষ্ট্র জানালেন—বিদুরকে প্রায় দেখাই যায় না। তিনি আরও দূরে নির্জন বনের মধ্যে নিরাহারে তপস্যা করে যাচ্ছেন। তপশ্চর্যার পরিশ্রমে এবং অনাহারে তাঁর শরীর কৃশ হয়ে গেছে, সমস্ত শরীরের শিরা-উপশিরাগুলি তাঁর দেহের অস্তিত্ব জানান দেয়মাত্র—বায়ুভক্ষো নিরাহারঃ কৃশো ধমনিসন্ততঃ। তাঁকে দেখাই যায় না প্রায়। ব্রাহ্মণেরা কেউ ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে তাঁকে কোথাও বা দেখতে পান এবং ধৃতরাষ্ট্র তখন জানতে পারেন যে, তিনি বেঁচে আছেন—কদাচিদ্ দৃশ্যতে বিপ্রৈঃ শূন্যে'স্মিন্ কাননে ক্বচিৎ।

ধৃতরাষ্ট্র এসব কথা বলছিলেন, ঠিক সেই সময়ই দূর থেকে তাঁকে দেখতে পেলেন যুধিষ্ঠির। তাঁর মাথায় জটার ভার, মুখ শুকনো, শরীর কৃশ। গায়ে নোংরার চিট পড়েছে, সারা শরীর ধুলোমাখা, একটি পরিধেয় বস্ত্রও নেই তাঁর গায়ে। ধৃতরাষ্ট্রের কাছে অনেক লোক এসেছে দেখে দূর থেকেই ফিরে চললেন বিদুর। যুধিষ্ঠির একা তাঁর অনুসরণ করে চললেন। গহন বনের মধ্যে কখনও তিনি যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টিগোচর হচ্ছেন, কখনও বা নয়, পথ চলতে চলতে এক সময় তিনি স্থির হয়ে একটি গাছের তলায় দাঁড়ালেন। যুধিষ্ঠির আগে দৌড়োতে দৌড়াতে নিজের পরিচয় দিচ্ছিলেন বার বার। বলছিলেন—আমি আপনার যুধিষ্ঠির। একবার ফিরে তাকান। কিন্তু বিদুরকে বৃক্ষতলে স্থির হয়ে দাঁড়াতে দেখে ইঙ্গিতজ্ঞ যুধিষ্ঠির বেশি আবেগপ্রবণ না হয়ে শুধু একবার তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—আমি যুধিষ্ঠির।

বিদুর একটি কথাও বললেন না। শুধু সামনে দাঁড়ানো যুধিষ্ঠিরের দিকে অনিমিখে তাকালেন এবং তাঁর সম্পূর্ণ দেহের ওপর দৃষ্টি দিয়ে সমাধি অবলম্বন করলেন—সংযোজ্য বিদুরস্তস্মিন্ দৃষ্টিং দৃষ্ট্যা সমাহিতঃ। যুধিষ্ঠিরের প্রাণে বিদুরের প্রাণ, যুধিষ্ঠিরের সমস্ত ইন্দ্রিয়ে বিদুরের সমস্ত ইন্দ্রিয় লীন হয়ে গেল। বিদুর যোগবলে প্রবেশ করলেন যুধিষ্ঠিরের শরীরের মধ্যে। বৃক্ষতলস্থিত বিদুরের নশ্বর দেহ চৈতন্যহীন হয়ে পড়ে রইল। এদিকে বিদুরের তেজ আপন দেহে প্রবেশ করায় তিনি বহুগুণ তেজস্বী। বলে অনুভব করলেন নিজেকে—বলবন্তং তথাত্মানং মেনে বহুগুণং তথা।

যুধিষ্ঠিরের দেহের মধ্যে বিদুরের এই যোগজ অনুপ্রবেশের মধ্যে একটা দার্শনিকতা

আছে, একটা রূপক আছে—যা না বললেই নয়। না বলে পারছি না এই জন্য যে, এই অতিলৌকিক ঘটনা অধম মানসিকতায় কুব্যাখ্যাত হয়েছে। অনেকে এই ঘটনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ হিসেবে ধরে নিয়েছেন এই মতবাদ প্রচারের জন্য যে—যুধিষ্ঠির বিদুরের পুত্র ছিলেন এবং কুন্তীর গর্ভে বিদুরই তাঁর জন্ম দিয়েছেন। এঁরা অবশ্য ভীম অর্জুনদেরও বিদুরের পুত্র বলেছেন যদিও একবার ভাবলেন না যে, সেক্ষেত্রে ওই যোগজ অনুপ্রবেশের ঘটনাটিও প্রমাণ হিসেবে নেই।

যাই হোক, যাঁরা এই সূত্রে যুধিষ্ঠিরকে বিদুরের ঔরসপুত্র ভাবেন, তাঁদের জানাই—মহাভারত পড়তে গেলে শুধু শব্দার্থ জ্ঞান থাকলেই হয় না। মহাভারত বুঝতে গেলে আমাদের দর্শনশাস্ত্র বুঝতে হবে, বেদ এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি বুঝতে হবে এবং সবার আগে বুঝতে হবে মহাভারতের সমকালীন কাল এবং তার ইতিহাস। অবশ্য মুশকিল এই যে, এই অল্প পরিসরে আমিও আমার পাঠকদের এতসব বুঝিয়ে দিতে পারব না। কিন্তু এটুকু জানাতে পারি যে, যোগজ আধান খুব লৌকিক ব্যাপার নয় এবং ব্যাপারটা অত সহজ নয়। মহাত্মা পুরুষ আপন আন্তর তপস্যার শক্তি অন্য উপযুক্ত পাত্রের মধ্যে আধান করেন যোগের মাধ্যমে। ভগবদ্‌গীতায় ভগবান যখন অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাতে চাচ্ছেন, তখন তিনি তাঁর তেজ আধান করেছেন অর্জুনের মধ্যে। পুরাকালে উপনয়নের সময় সাবিত্রীমন্ত্রদাতা গুরু তাঁর আন্তর তেজ আধান করতেন শিষ্যের মধ্যে, তাঁর হৃদয়ে হাত রেখে।

তেজ আধান করবার এই যে রীতি, তা ভারতবর্ষের চিরন্তন এক দার্শনিক কল্প। পিতা এইভাবে পুত্রের সঙ্গে একাত্ম হন, গুরু এইভাবে শিষ্যের সঙ্গে একাত্ম হন, এমনকী ভগবানও এইভাবে ভক্তের সঙ্গে একাত্ম হন। তেজ আধান করার এই ঐশী ভাবনা পরম্পরাক্রমে নেমে আসছে উপনিষদের কাল থেকে এ কাল পর্যন্ত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যে বৈষ্ণবীয় দীক্ষার সময় শিষ্যের অন্তরে এবং শরীরে আচার্যের তেজ কীভাবে সমাহিত হয় সে সম্বন্ধে স্বয়ং মহাপ্রভুর অনুভূতি দেখিয়েছেন। মহাপ্রভু তখন ব্রাহ্মণ্যের মূর্তভূমি কাশীতে এসেছেন। বৈদান্তিক পণ্ডিতেরা প্রভুর আচারব্যবহারে খুশি হননি। বিশেষত কৃষ্ণনামে তাঁর উন্মত্ত অবস্থা দেখে সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতী তাঁর ভাবরহস্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন। প্রভু বিনয় করে বলেছেন—আমি তো কিছুই বুঝি না। কিন্তু গুরু আমাকে মূর্খ দেখে হরিনাম জপ করতে বলেছেন। সেই মন্ত্র জপ করতে করতেই আমার এই উন্মত্ত অবস্থা। গুরুদত্ত সেই ঐশ তেজের স্বরূপ বলবার সময় মহাপ্রভু অত্যন্ত সরলভাবে বলেছিলেন—কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি কিবা তার বল। জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল।

অন্যত্র ওই চৈতন্যচরিতামৃতেই দেখবেন—স্বয়ং চৈতন্যদেব গুরুকৃত এই শক্তিসঞ্চারের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে বলছেন—দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ। সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম। মহাভারতে বিদুর এবং যুধিষ্ঠিরের ক্ষেত্রেও দেখুন—যে মুহূর্তে যুধিষ্ঠির গিয়ে বিদুরের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছেন—আমি যুধিষ্ঠির—যুধিষ্ঠিরো'হমস্মীতি বাক্যমুক্তাগ্রতঃ স্থিতঃ—সেই মুহূর্তেই বিদুর সমাহিত হয়েছেন যুধিষ্ঠিরের মধ্যে। এই একাত্মক সমাধির পর যুধিষ্ঠির ধর্মকে সম্পূর্ণ অনুভব করেছেন নিজের মধ্যে। শুধু যোগের মাধ্যমেই যে এই একাত্মতা সম্ভব সে কথা ব্যাস বলে দিয়েছিলেন যুধিষ্ঠিরকে—যোগধর্মং মহাতেজা ব্যাসেন কথিতং যথা। যুধিষ্ঠির সেই ব্যাসকথিত যোগজ শক্তিসঞ্চার নিজের মধ্যে অনুভব করেই বিদুরের শক্তিতে তিনি আরও শক্তিমান মনে করলেন নিজেকে।

বিদুরের লুপ্তচৈতন্য দেহখানি বৃক্ষতলে স্পন্দনহীন অবস্থায় পড়ে ছিল। যুধিষ্ঠির বিদুরের দেহ সৎকার করার জন্য চিতা সাজাবার চিন্তা করতেই দৈববাণী হল—বিদুর সন্ন্যাস আশ্রম

অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর দেহ অগ্নিদগ্ধ করবেন না। এখনও তাই হয়—সন্ন্যাসী মানুষের ভূমি-সমাধি হয়, তাঁদের দেহে অগ্নিসংস্কার করা হয় না। অতএব চলে আসতেই হল যুধিষ্ঠিরকে। ধর্মের স্বরূপে উৎপন্ন বিদুরের আন্তর তেজ শরীরে মনে সমাহিত করে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে ফিরে এলেন যুধিষ্ঠির।

মহাভারতে বিদুরের কাহিনী এর বেশি লেখা নেই, কিন্তু মহাভারতের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত বিদুর রয়ে গেলেন পরিব্যাপ্ত ধর্মের স্বরূপে। এই ধর্ম পুষ্প-নৈবেদ্যের ধর্ম নয়, এই ধর্ম শৈব শাক্ত পাশুপত ধর্ম নয়, এ ধর্ম গার্হস্থ, ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ সন্ন্যাসও নয়—এ হল এক বৃহদর্থক ধর্ম যার মধ্যে জীবনধারণের সমস্ত সাত্ত্বিক উপায়গুলি আছে, যার মধ্যে রাজনীতি, সমাজনীতি এবং পারিবারিক নীতির সত্য সার মধুর অংশটুকু আছে। এ এমনই এক ধর্ম—যার বহুলাংশটুকুই সৎ আচার এবং সর্বতো ভদ্র অনুশাসনের দ্বারা সংপৃক্ত। এর শেষ পরিণতি মোহমায়ামুক্ত উদার বৈরাগ্যময় মোক্ষাভিসন্ধির মধ্যে। বিদুর এই বিশাল ধর্মের বলবান মূর্ত বিগ্রহ।